বঙ্গবাণী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ—প্রথমার্দ্ধ

ফাল্গুন, ১৩৩২ হইতে শ্রাবণ, ১৩৩৩

সম্পাদক—

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কার্য্যাধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী

শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কার্য্যালয়—৭৭নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ৪৸০]   [প্রতি সংখ্যা ।৴০

পঞ্চম বর্ষ

প্রথম ষাণ্মাষিক বর্ণানুক্রমিক

বিষয় সূচী

ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ

১৩৩২—'৩৩

লেখক সূচী

চিত্রসূচী

ফাল্গুন

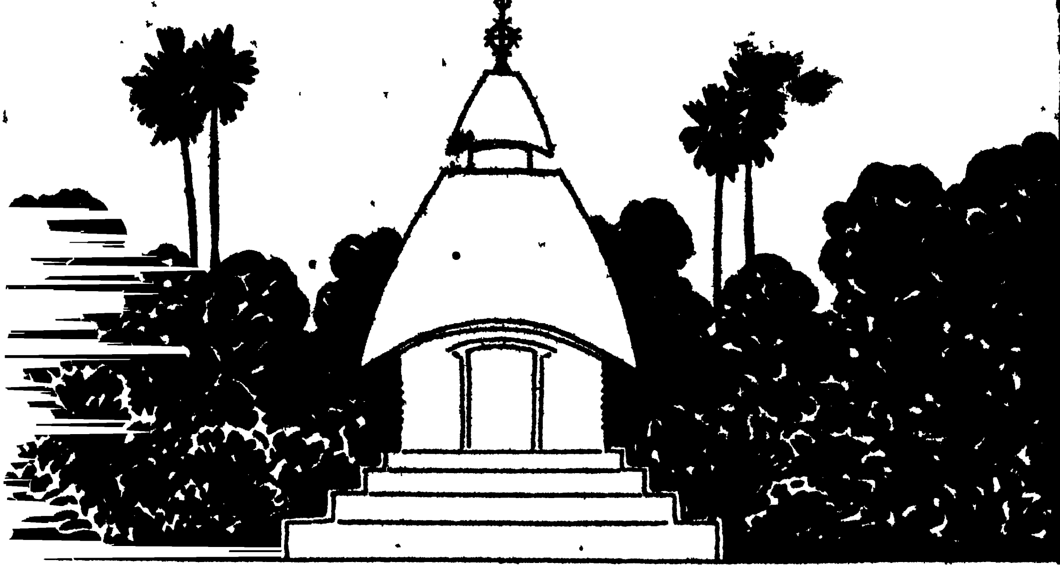
চৈত্র

বৈশাখ

আষাঢ়

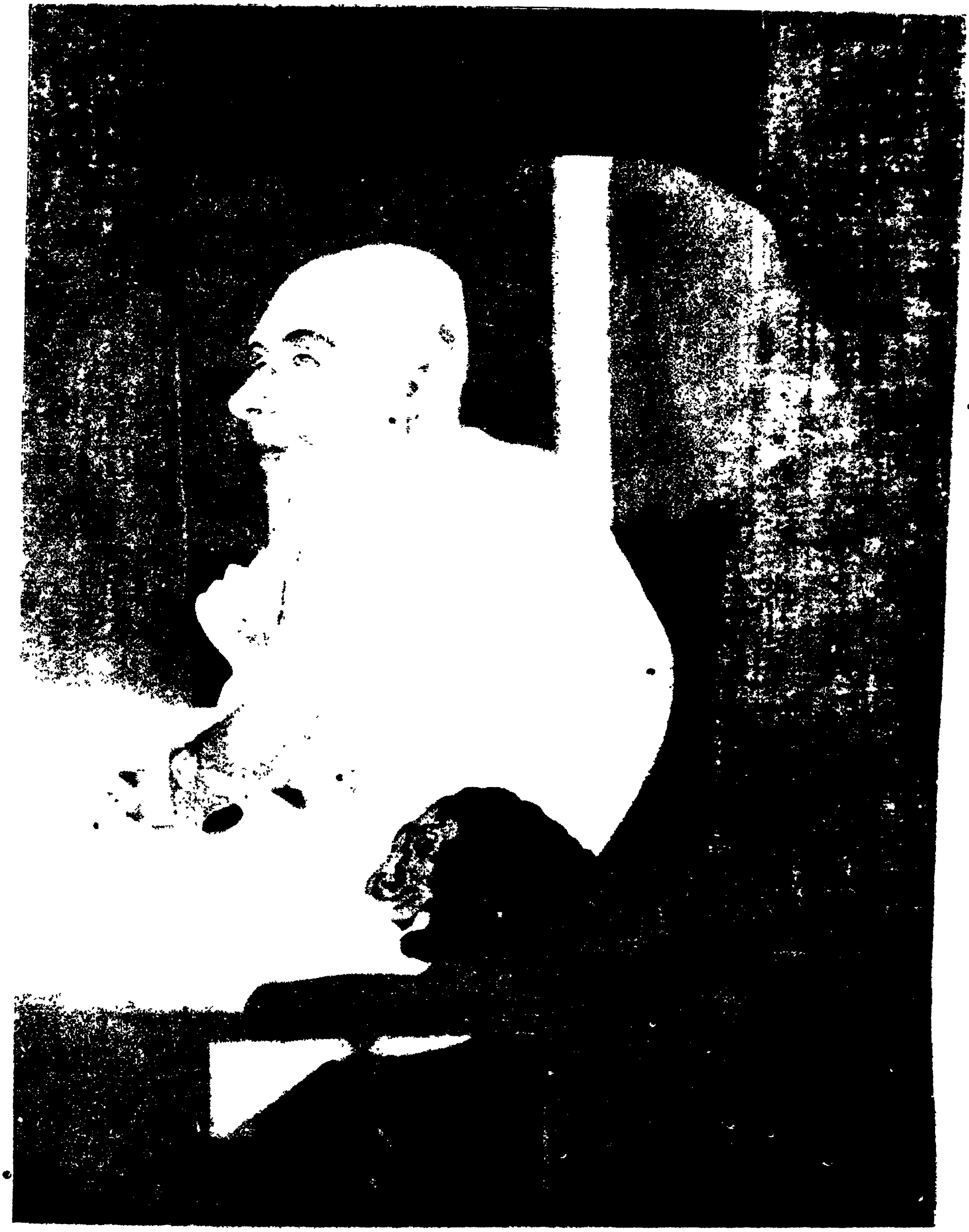
শ্রাবণ

বঙ্গবাণী





কলেজষ্ট্রীট মার্কেট



আবুহোসেন

শিল্পী—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৫ম বর্ষ
৩৩২-'৩৩

ফাল্গুন

প্রথমার্দ্ধ
১ম সংখ্যা

আবৃত্তি ও বঙ্গ কাব্যসাহিত্য

"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।"

শাস্ত্রের আবৃত্তিকে 'বোধ' হইতেও গরীয়সী বলা হইয়াছে। শুধু বার বার অধ্যয়ন র্থেই এই আবৃত্তিশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না—ছন্দোবদ্ধ বাণীর পক্ষে বিহিত সুসমঞ্জস উদীরণ-ও আবৃত্তি-শব্দের মর্ম্মার্থের অন্তর্গত। সর্ব্বশাস্ত্রের কথা বলিতে ারি না, কাব্য সম্বন্ধে যে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হ্রস্ব, দীর্ঘ, দাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, দ্রুত, বিলম্বিত ইত্যাদি স্বরবৈচিত্র্যের মিলনে যে সুর-গাম্ভীর্য্যের ঝঙ্কার-মাধুর্য্যের সৃষ্টি হয়,—তাহাই পদ্যকে গদ্য হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করে,—আর এই াধুর্য্যই পদ্যের সর্ব্বপ্রধান ঐশ্বর্য্য,—এমন কি প্রাণস্বরূপ। এই ঐশ্বর্য্যের সন্ধান আমরা সঙ্গত আবৃত্তি ব্যতীত লাভ করিতে পারি না; সেজন্য আবৃত্তি, কাব্যের পক্ষে "বোধাদপি রীয়সী।" যখন সর্ব্বশাস্ত্র কাব্যেই রচিত হইত, তখন বোধ হয় সর্ব্বশাস্ত্র সম্বন্ধেই এ থা খাটিত।

উদাবৃত্ত না হইলে বেদের কোন বিশিষ্ট মূল্যই থাকে না। বেদসূক্তের উক্থের বা গীথের মধ্যে যে অর্থ নিহিত আছে তাহাই বেদের সর্ব্বস্ব হইলে বেদ ভারতের মনো-

অপূর্ব্ব মন্ত্রশক্তি সঞ্চারিত হয় তাহাই মনোলোকে আলৌকিক ক্রিয়া সাধন করে। "পাদাক্ষরসমাসস্বরলক্ষণ-জ্ঞান-সমন্বিত" আবৃত্তি সম্ভব হইলে, তাহা যে "বোধাদপি গরীয়সী" হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এ যুগে সে আবৃত্তি সম্ভব হইলে যাহারা বেদার্থজ্ঞানরহিত তাহাদিগকেও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া বা শুনাইয়া বেদের মর্য্যাদা কতকটা রক্ষিত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাজক ও যজমান উভয়েই বেদমন্ত্রের শ্রুতিসঙ্গত আবৃত্তি করিতে পারেন না বলিয়া সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানই পণ্ড হইয়া যায়।

কবিতার শব্দ-সমূহে বৈদিক গাথার মত মন্ত্রশক্তি না থাকিলেও মন্ত্রমুগ্ধ করিবার শক্তি আছে। যাহাকে "কাণের ভিতর দিয়াই মরমে প্রবেশ" করিতে হইবে তাহাকে আগেই কর্ণরাজ্য জয় করিতে হইবে। কবি এমনভাবে অক্ষরের উপর অক্ষর সাজাইয়া যান যে তাহাদের মিলিত কলধ্বনি শ্রুতিকে সহজেই বশীভূত করিয়া ফেলে। কর্ণও বিনা লাভে বশ্যতা স্বীকার করে না। লীলাহিল্লোলিত ছন্দোঝঙ্কার কর্ণের স্নায়ুমণ্ডলকে এমনি তালে তালে স্পন্দিত করে যে তাহাতে প্রাণমূলে একটি অপূর্ব্ব সুখানুভূতি হয়। এই সুখানুভূতিই পাঠক বা শ্রোতার পক্ষে যথেষ্ট লাভ। বিনা অর্থবোধে যে আনন্দ-সঞ্চার তাহার সম্ভোগকে বলে 'অপ্রবুদ্ধ উপভোগ'। সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন,—"অবিদিতগুণাপি সৎকবিভনিতিঃ বমতিহি কর্ণেষু মধুর ধারাম্।" রসরচনা 'অবিদিতগুণা' হইলেও কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করে। অর্থই যে বড় একটা লাভ নয়, তাহা ত ইংরাজ কবি Wordsworth তাঁহার The Solitary Reaper নামক কবিতায় স্পষ্টই ইঙ্গিত করিয়াছেন। দুর্ব্বোধ ভাষায় বা বিদেশী ভাষায় রচিত সঙ্গীত বা শুধু স-রে গা-মায় সাধা সঙ্গীতের প্রভাব প্রাঞ্জলার্থক সঙ্গীতের প্রভাব হইতে কিছুমাত্র অল্প নহে। আবৃত্তি, সুর-তাল-মান-লয়-যুক্ত সঙ্গীত নহে বটে, কিন্তু উহা স্বরগ্রামের স্তরপর্য্যায়ে পাঠ ও সঙ্গীতের মাঝামাঝি,—এমন কি সঙ্গীতের কতকটা সমীপবর্ত্তী, সেজন্য আবৃত্তি সঙ্গীতের ধর্ম্ম ও মর্ম্মপ্রভাব অনেকটাই লাভ করিয়াছে। যাঁহারা বলেন কবিতার অর্থ না বুঝিলেই কবিতাপাঠ ব্যর্থ হইল, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহারা কেবলমাত্র সুবিহিত আবৃত্তি হইতেই যে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে, সে বিষয়ে অজ্ঞ। মেঘদূতের

"বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষং"

বা রবীন্দ্রনাথের—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,—
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে,—
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,—
শ্যামগম্ভীরসরসা।"

ইত্যাদি আবৃত্তি করিলে অন্তর স্বতঃই 'মেঘৈর্মেদুরং' হইয়া উঠে, নয়নে ঘনজাল ঘনাইয়া আসে। জয়দেবের,—

"ললিতলবঙ্গলতাপরীশীলনকোমলমলয়সমীরে,
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জ-কুটীরে।"

ইত্যাদি আবৃত্তি বসন্তকে প্রমূর্ত্ত করিয়া নয়ন সম্মুখে আনিয়া দেয়। সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা' আবৃত্তির গুণে যেন আমাদের চারিপার্শ্বে নাচিয়া বেড়ায়। তাঁহার "দূরের পাল্লায়" যেন নৌকার দাঁড় হইতে জলের ছিটে গায়ে লাগে। এ সকল কবিতার অর্থ জানাই কি খুব বড় লাভ? যাহাদের সহিত আবৃত্তিসাহায্যে 'প্রত্যক্ষ' পরিচয় ঘটিয়া যাইতেছে তাহাদের সহিত অর্থজ্ঞানগত 'পরোক্ষ' পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজনই বা কি?

শ্রুতিসুখদানেই আবৃত্তির মূল্য পরিচ্ছিন্ন নয়। আবৃত্তি অর্থবোধেরও যথেষ্ট সাহায্য করে। যে অর্থ সাধারণ পাঠে বিশদ হয় না, তাহা উদাবৃত্তিতে অনেক সময় সুবোধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু আবৃত্তির সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয়তা রসবোধে। অন্তর্নিহিত রসের সহিত সামঞ্জস্যরক্ষা করিয়াই কবি ছন্দোনির্ব্বাচন ও পদবিন্যাস করেন, এবং গতি, যতি, বিরতি, মাত্রা, ছন্দঃস্পন্দ ইত্যাদি নির্দ্দেশ করেন,—সেজন্য সম্পূর্ণ অর্থবোধ না হইলেও ছন্দের রসানুগত আবৃত্তি মাত্রই শ্রোতার চিত্তে রসসঞ্চার করিয়া থাকে। যেখানে অর্থগত রস অনায়াসগম্য, সেখানে আবৃত্তি, রসকে ঘনায়িত ও সুগম্য করিয়া তুলে। রসসৃষ্টির পক্ষে "কাকুর" প্রয়োজন উপেক্ষণীয় নহে, অর্থবোধেও 'কাকু' যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়া থাকে। ঐ 'কাকু'ই আবৃত্তির প্রধান অঙ্গ। আবৃত্তি-কালে স্বরভঙ্গিই মৃদুহাস্যকে অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত করে, কণ্ঠের গদগদ ভাবই কারুণ্যকে অশ্রুতে উচ্ছলিত করিয়া তুলে—স্তবপাঠ বা মন্ত্রোচ্চারণ কালে ধীরগম্ভীর স্বরতরঙ্গ অর্থানভিজ্ঞ ব্যক্তিরো শীর্ষকে স্বতঃই অবনত করিয়া দেয়, ধর্ম্মদ্রোহীর চিত্তকেও বিগলিত করিয়া দেয়—রোষ-অরুণকেও রস-বরুণের বশাধীন করিয়া তুলে। নাট্যাভিনয় দেখিয়া লোকে যে হর্ষ, সংক্ষোভ, ভাবোন্মাদ, সমবেদনা ইত্যাদিতে অভিভূত বা উত্তেজিত হইয়া পড়ে—অথচ নাটক-পাঠে অবিচলিত থাকে,—তাহার একটি কারণ নাটকীয় রচনার ভাবানুগত আবৃত্তি। শিশুর চিত্তে আবৃত্তি যে কি প্রভাব সঞ্চার করে তাহা সর্ব্বদেশের ঠাকুরমারা জানেন,—শিশুরাও জানে, তাই তাহারা অর্থহীন 'আগাডুম বাগাডুম' ছড়া শ্লোকও যখনতখন আবৃত্তি করিয়া থাকে। শিশুগণ যখন আবৃত্তি করে তখন প্রয়োজনমত ভাবানুযায়ী অঙ্গভঙ্গী না করিয়া থাকিতে পারে না—এমন কি তালে তালে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ লীলায়িত ও চরণদুটি নৃত্যচপল হইয়া উঠে। শিশুগণের আবৃত্তি শুনিয়া ও 'দেখিয়া (?)' মনে হয় আবৃত্তির মধ্যে একাধিক কারুকলা মিলিয়া-মিশিয়া একটি 'অপরূপ মিশ্রচারুকলার সৃষ্টি করিয়াছে। কবিতা, সঙ্গীত, অভিনয়বিদ্যা, নৃত্যকলা এই চারিটী কলা-

বিদ্যাই কোনটি স্ফুট, কোনটি অস্ফুটরূপে সচিত্র 'সরূপ' আবৃত্তি-শিল্পের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। রসনাগত ও ভাবানুগত অঙ্গভঙ্গিসহকারে আবৃত্তি করিলে আমরা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে উপহাস করিয়া থাকি। "নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা, রে দূত," ইত্যাদি অংশের অঙ্গভঙ্গিসহ আবৃত্তির উল্লেখ করিয়া আমরা হাস্য-পরিহাস করিয়া থাকি। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে যখন কলাচাতুর্য্যময় অঙ্গবিলাসসহ আবৃত্তি শুনি তখন প্রশংসায় হাততালি দেই। শোভনাঙ্গী রমণী ও সুকুমার বালক যখন আবৃত্তিকালে অঙ্গভঙ্গি করে তখন আমরা আনন্দ লাভ করি। যদি কোন বালিকা বিদ্যাপতির,—

"হাতক দরপণ, মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল॥
হৃদয় মৃগমদ, গীমক হার।
দেহক সরবস, গেহক সার॥
পাখীক পাখ, মীনক পানি।
জীবক জীবন হম তুঁহু জানি॥

এই পদ্যাংশটীর অঙ্গিভঙ্গিসহকারে আবৃত্তি করে, প্রয়োজনমত তার ক্ষুদ্র পাণি ও অঙ্গুলি-গুলিকে একবার দর্পণ, একবার অঞ্জনশলাকা, একবার তাম্বুল, একবার পাখীর পাখায় পরিণত করিতে থাকে—তবে সে আবৃত্তি আমাদের চিত্তহরণ করিতে বাধ্য। ঐরূপ আবৃত্তি-ভঙ্গী মনে কল্পনা করিতেই আনন্দ হয়—আমাদের রাঢ়দেশের বালিকাদের ভাদু বা ভাজার ছড়া আবৃত্তির কথা মনে হয়। আবৃত্তি স্বতঃই অঙ্গের লাসবিলাসে প্রমূর্ত্ত ও সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে চায়—আমরাও ভাবকে ভঙ্গিতে ও রসকে রূপে অভিব্যক্ত দেখিতে ভালবাসি,—তবে যে অঙ্গে উহা অভিব্যক্ত বা মূর্ত্ত হইবে সে অঙ্গটি সুকুমার ও লীলায়িত হওয়া চাই এবং আবৃত্তি কারকের কণ্ঠেও বাক্‌স্পষ্টতা, মাধুর্য্য, চাতুর্য্য ও স্বাস্থ্য চাই। সঙ্গীত, অভিনয় বিদ্যা ও নৃত্য-কলাও আবৃত্তির মতই ঐরূপ প্রত্যাশা করে। তিথ্যাদিতত্ত্বে আবৃত্তি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বিধান আছে।

" বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষর পদং তথা।
কলস্বর সমাযুক্ত রসভাব সমন্বিতং॥

* * * *

সপ্তস্বর সমাযুক্তং কালে কালে বিশাম্পতে।
প্রদর্শয়ন্ রসান্ সর্ব্বান্ বাচয়েদ্বাচকোনৃপ॥"

" শঙ্কিতং ভীতমুদ্‌ঘুষ্টমব্যক্তমনুনাসিকং।
বিস্বরং বিরসঞ্চৈব বিশ্লিষ্টং বিসমাহতং।
কাকস্বরং শিরসিতং তথা স্থানবিবর্জ্জিতং।
ব্যাকুলং তালহীনঞ্চ পাঠদোষাশ্চতুর্দ্দশ।
সংগীতং শিরসঃ কম্পমল্পকণ্ঠমনর্থকং ॥

কবির রচনায় কোন ত্রুটী থাকিলে আবৃত্তিকালে ধরা পড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে নির্দ্দোষ আবৃত্তি না হইলে কবির রচনার গুণগুলিও অলক্ষিত রহিয়া যায়—কবির শব্দালঙ্কারগত অনেক প্রয়াস ও অনেক কলাচাতুর্য্যই ব্যর্থ হইয়া যায়—অনুপ্রাস, যমক, ছন্দঃস্পন্দ, মিল ও পদবিন্যাস-গত কলা কৌশল অনুপভুক্ত ও অনাদৃত রহিয়া যায়।

সংস্কৃতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের প্রভেদ থাকায় স্বতঃই স্বরবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। সুরচিত সংস্কৃত শ্লোকের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃত মূল্য আবৃত্তির উপরই নির্ভর করে। সেজন্য সংস্কৃতের প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রই আবৃত্তি করিয়া পড়িবার নিয়ম ছিল। বেদের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চতুষ্পাঠীর বালকছাত্রগণকে ব্যাখ্যা না করাইয়া ব্যাকরণ, অভিধান, আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত কেবল আবৃত্তি করান হইত। বালকের মেধা তীক্ষ্ণ ও অক্ষুণ্ণ,—কিন্তু বাল্যে ধীশক্তির উন্মেষ হয় না, আবৃত্তি সহজেই আবৃত্ত গ্রন্থকে স্মৃতির বশীভূত ও ধৃতির অধিগত করিয়া তুলে। আবৃত্তির দ্বারা বালকের ধৃতিশক্তির সদ্ব্যবহার হইলে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ও গুরুর উপদেশে বোধের উন্মেষ হইতে থাকে।

আবৃত্তি মানবমনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে দেবতার মনের উপরও সেই প্রভাব সঞ্চার করিবে এই প্রত্যাশায় আর্য্যগণ আপনাদের প্রার্থনা ছন্দে আবৃত্তি করিতেন—তাই পজ্ঝটিকা, তোটক, দোধক, স্রগ্ধরা ইত্যাদি শ্রুতিসুভগ ছন্দে বহু স্তোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারা স্তোত্রের নির্দ্দোষ আবৃত্তি না হইলে আপনাদিগকে অপরাধী ভাবিতেন, তাই স্তবান্তে বলিতেন—

" যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ মহেশ্বরি ॥"
" যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ময়া বিসর্গবিন্দ্বক্ষরহীনমীরিতং।
পূর্ণং তদেবাস্তু তব প্রসাদতঃ সঙ্কল্পসিদ্ধিশ্চ সদৈব জায়তাং ॥"
" যন্মাত্রাবিন্দুবিন্দুদ্বিতয়পদপদদ্বন্দ্ববর্ণাদিহীনং
ভক্ত্যাভক্ত্যানুপূর্ব্বং প্রভবকৃতিবশাদ্ব্যক্তমব্যক্তমম্ব।
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতন্তে স্তবেঽস্মিং
স্তৎসর্ব্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ ॥"

" যোঽসৌ ধন্যোমুনিনিগদিতং পঠ্যতে ভক্তিভাবান্
. মাত্রাহীনং পদমধিগতং পাদগাথাক্ষরং বা।
জিহ্বাদোষৈঃ পবনরহিতৈঃ শ্লেষ্মদোষৈঃ প্রকারৈ
র্যূয়ং দেব্যস্ত্রিভুবনগতা মাতৃরূপাঃ ক্ষমধ্বং ॥" ইত্যাদি

স্তবাদির আবৃত্তিতে ত্রুটী হইলে কেবল দেবতার কাছে নয় মানুষের কাছেও অপরাধী হইতে হয়। স্তোতা ও শ্রোতা উভয়েরই অকল্যাণ হয়। চণ্ডীপাঠ ও গীতাপাঠ ইত্যাদির প্রসঙ্গে অপরাধ ও তাহার আশঙ্কিত দণ্ডের কথা উল্লেখ আছে। ধর্ম্মের প্রসঙ্গ থাকুক ;—সকল প্রকার আবৃত্তির সম্বন্ধেই প্রকারান্তরে একথা খাটে। নির্দ্দোষ সুবিহিত আবৃত্তি না হইলে অভিজ্ঞ শ্রোতা মাত্রেই আবৃত্তিকারকে অপরাধী মনে করেন। শ্রদ্ধাশীল শ্রোতা তাহার বন্দনীয় কবির ছন্দের বিরূপ বিকৃত বিরস আবৃত্তি সহ্য করে না—কাব্য সরস্বতীর কোন সেবকই সে অপরাধ ক্ষমা করে না আবৃত্তি নিজের কাছেও নিজে অপরাধী। নির্দ্দোষ সুসঙ্গত আবৃত্তিতে যে নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ অন্তর হইতে পুরস্কার স্বরূপ পাইবার কথা তাহা তিনি পান না। নির্দ্দোষ আবৃত্তি সারস্বত জগতের একটি শোভন সৃষ্টি চিরসুন্দরের একপ্রকার অর্চ্চনা একটি কল্যাণময় বাঙ্ময় অনুষ্ঠান। ইহাতে যে রসানুভূতি জন্মে তাহাতে Intellectual, Moral ও Aesthetic Sentiment তিনিই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে জন্য নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তি বিবেকের তাড়নায় অন্তরে যে অস্বস্তি ও অশান্তি ভোগ করে—আবৃত্তি নির্দ্দোষ না হইলে আবৃত্তিকারকের চিত্তে সেই অশান্তি ও অস্বস্তির উদয় হয়—সরস্বতীর অবমাননা করিয়া সে নিজেই লজ্জাকুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

বৈতালিকগণ প্রভাতে সন্ধ্যায় স্রগ্ধরা মন্দাক্রান্তা ইত্যাদি ছন্দে রাজবন্দনা আবৃত্তি করিত। মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্তের চারণদ্বয়ের রাজপ্রশস্তি আবৃত্তির প্রভাব কেমন কবি তাহা দেখাইয়াছেন। বন্দী বৈতালিকের মুখে আপনার মহিমা কীর্ত্তন শুনিয়া রাজার অন্তরে রাজোচিত গৌরব, আত্মনির্ভরতা, শৌর্য্য, ওজঃশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিত। পরবর্ত্তীযুগে ভাটও নকীবগণ বৈতালিকের কাজ করিত। নান্দী, মঙ্গলাচরণ স্বস্তিবাচন, ভরতবচন, প্রণতি, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি সমস্তই আবৃত্তিতেই নিষ্পন্ন হইত। কবি পণ্ডিতগণ রাজসভায় শ্লোক আবৃত্তি করিয়া পুরস্কার লইয়া আসিতেন। ব্যাখ্যার জন্য নহে কেবল মাত্র আবৃত্তির জন্য আজও অনুষ্ঠান বিশেষে চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, বিরাটপাঠ চলিয়া আসিতেছে। নির্দ্দোষ আবৃত্তি আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত—মন্ত্রোচ্চারণের ও সূক্ত-শ্লোকের আবৃত্তিতে কোন দোষ থাকিলে অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি হইত। কাব্যের ত কথাই নাই,—বিনা আবৃত্তিতে মেঘদূত মেঘদূতবধে, কুমারসম্ভব কুমার সংহারে ও ঋতুসংহার সত্যসত্যই ঋতুর সংহারে দাঁড়াইবে। নৈষধের যাহা প্রাণ-স্বরূপ, সেই পদলালিত্য, আবৃত্তির উপরই

নির্ভর করিতেছে। সুরজ্ঞান না থাকিলে গান গাওয়া যায় না, কিন্তু সামান্য ছন্দোজ্ঞান থাকিলেও গীতগোবিন্দ আবৃত্তি করা চলে। কেবলমাত্র আবৃত্তিই গীতগোবিন্দকে এত শ্রুতি-সুভগ করিয়া তুলে যে পরিগীত না হইলেও গীতগোবিন্দের গীত বা গোবিন্দের অমর্য্যাদা হয় না—স্বরতরঙ্গের হিন্দোলায় দুলিয়া দোলগোবিন্দও অপ্রসন্ন হন না। অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিগণ মৈথিলীতে পদরচনা করিয়াছেন; মৈথিলীতেও সংস্কৃতের মতই হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের প্রভেদ রক্ষার নিয়ম ছিল, সেজন্য বৈষ্ণবপদগুলি আবৃত্তির উপযোগী। কীর্ত্তনীয়াগণ কীর্ত্তন গান কালে কতক গাহিয়া কতক কেবল মাত্র আবৃত্তি করিয়া আমাদের চিত্তরঞ্জন করেন। "মঙ্গলকাব্য" গুলিও পালা হিসাবে কতক 'গীত' কতক আবৃত্ত হইত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত সুরসংযোগে আবৃত্তি করিয়া পঠিত হইত বলিয়াই বাঙালী নরনারীর চিত্তগঠনে এত সহায়তা করিয়াছে। কবি তাই কৃত্তিবাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"গদ গদ প্রৌঢ় কণ্ঠে, প্রবীণের দন্তহীন মুখে
কিশোরীর সুধাস্বরে হাসি অশ্রু করুণার দুখে
তোমার বিজয়বার্ত্তা কোটী কণ্ঠে...............
তেজপাতা চিহ্নটি খুলিয়া—
দিনের বেসাতীশেষে মুদী তার ভাঙা কণ্ঠস্বরে,—
লঙ্কাকাণ্ড শেষ করে' বিশ্রামের আয়োজন করে।"

মনসার ভাসান, মাণিকপীরের গান ইত্যাদি নামে মাত্র গান, উহা সুর করিয়া আবৃত্তি মাত্র। সত্যনারায়ণের পাঁচালি হইতে ছেলে ভুলানো ছড়া পর্য্যন্ত সমস্ত লোক-সাহিত্য এবং ব্রত পার্ব্বণের অঙ্গস্বরূপ সমস্ত অন্তঃপুর-সাহিত্যই আবৃত্তিকেই আশ্রয় করিয়াছে। আবৃত্তিকেই আশ্রয় করিয়া কথকতা বহুকাল আমাদের দেশের লোকশিক্ষার ভার লইয়াছিল। আজও অনেক বাঙালী পল্লীবাসিনী পুণ্যশ্লোকগণের নামে পুণ্য শ্লোকমালার সহিত নরোত্তম দাসের শ্রীকৃষ্ণের শত নাম প্রভাতে আবৃত্তি করিয়া গাত্রোত্থান করেন। আবাল বৃদ্ধ বণিতার কণ্ঠস্বরে স্তোত্র, ছড়া, পাঁচালী, শ্লোক ও শিশুরঞ্জন ছন্দের মিলিত ঝঙ্কারে পল্লীসন্ধ্যাগুলি কলমুখরিত হইয়া উঠিত।

বর্ত্তমান কাব্যসাহিত্যের মধ্যে মেঘনাদবধ 'মেঘনাদে' আবৃত্তি করিয়া না পড়িলে কবির প্রতি অবিচার করা হইবে। বাঙলাকাব্যে সংস্কৃতের ন্যায় স্বরবৈচিত্র্যের ও হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদের অভাব ছিল, সেজন্য মৈথিলীভাষার কবিদের পর মাইকেলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গ কাব্যসাহিত্য আবৃত্তির কতকটা অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। তাই মাইকেল যখন বহুদিন পরে বঙ্গ কাব্যসাহিত্যকে আবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিলেন বঙ্গীয় পাঠক প্রথমতঃ তাঁহার সৃষ্টির মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। অনেকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত রচনাভঙ্গিকে

ব্যঙ্গ করিয়া অনেক কুকাব্য অকাব্য রচনা করেন এবং অনেকে ব্যঙ্গাত্মক বিকৃত আবৃত্তি করিয়া মেঘনাদবধকেই বধ করিবার চেষ্টা করেন। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়া একটি অপূর্ব্ব স্বরতরঙ্গের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিলেন, পয়ার পংক্তিকেই একটি সচ্ছন্দ সাবলীল গতিদানে ও যুক্তাক্ষরবহুল শব্দের প্রভূত সমাবেশে কাব্যের ভাষাকে একটি সবল বন্ধুর স্বাস্থ্য দান করিলেন। ছেদ ও যতি সংস্থানের মুহুর্মুহুঃ বৈচিত্র্য ঘটাইয়া ছত্র হইতে ছত্রান্তরে ভাবধারাকে বেগানুযায়ী গতিস্বাধীনতা দিয়া ও তেজস্বিতা - ও তেজস্বিতায় বলিষ্ঠ কাব্য ভাষার 'পদবিক্রমকে' পৌরুষশক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। মাইকেলের ছন্দোভঙ্গি আবৃত্তির উপযোগী হওয়ার পরে বঙ্গদেশের কাব্য ও নাট্য সাগ্রহে অনুকৃত হইতে লাগিল। আবৃত্তির উপযোগিতা হেমচন্দ্রও বুঝিয়াছিলেন—তাই দশ মহাবিদ্যায় জয়দেবের ছন্দঃস্পন্দ আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু বাংলাভাষায় উহা সাবলীল ও স্বাভাবিক হয় না ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তাই শেষে মাইকেলের ওজস্বিনী ভঙ্গিরই অনুসরণ করিয়াছেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ বহুবিচিত্র, শ্রুতিসুভগ, সম্পূর্ণ-রসানুগত, ভাবসমঞ্জস ছন্দের প্রবর্ত্তন করিলেন এবং যুক্তাক্ষরের জন্য দীর্ঘমাত্রার মর্য্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। নানা কৌশলে ছন্দঃস্পন্দ সৃজনে রচনাকে তরঙ্গায়িত করিয়া, শিশুরঞ্জন ও জনরঞ্জন হসন্তবহুল ছড়ার ছন্দকে ভাবগর্ভ সৎকাব্যে আভিজাত্য-গৌরব দান করিয়া এবং অসমমাত্রিক স্বচ্ছন্দগতি 'তাজমহলী' ছন্দের প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গকাব্যসাহিত্যকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য, ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ হসন্ত ও স্বরান্ত অক্ষরের মিলন মাধুর্য্য লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সন্নিবেশ-ব্যবধানকে নিয়মিত করিলেন। তাহার ফলে বঙ্গকাব্যসাহিত্যে অপূর্ব্ব ছন্দোহিল্লোলের সৃষ্টি হইয়াছে। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালও ঐ হসন্তবহুল ছড়ার ছন্দে নানাবিচিত্র ভঙ্গী সৃষ্টি করিয়া তাঁহার রচিত কৌতুক কবিতাগুলিকে আবৃত্তির সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের কাব্যসাহিত্য এখন আবৃত্তির উপযোগিতায় সংস্কৃত, পারসী, ইংরাজী, ফরাসী ইত্যাদি ভাষার কাব্যসাহিত্য হইতে হীন নহে,—বরং ছন্দোবৈচিত্র্যের এবং নব প্রবর্ত্তিত ছন্দোহিল্লোলের জন্য ইংরাজীকেও অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কবিরা ত তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন—কিন্তু—"একাকী গায়কের নহেত গান।—তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবেত কলতান উঠে। বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে—তবেত মর্ম্মর ফুটে।" রসপিপাসু পাঠকেরো কর্ত্তব্য আছে—তাহাকেও প্রস্তুত হইতে হইবে, নতুবা তাহার বর্ত্তমান যুগের বাংলা কবিতা পাঠ ব্যর্থ হইবে। সকল শাস্ত্রেরই মর্ম্মজ্ঞ হইবার জন্য সকল জ্ঞানশাখায় রসজ্ঞ হইবার জন্য সাধনা করিয়া শিক্ষার্থী হইয়া পূর্ব্বেই উপযোগিতা ও অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়। কাব্যের বেলায় অন্যথা হইতে পারে না। অবশ্য

আমাদের পাঠকগণের বিশ্বাস কাব্যের রসগ্রহণের জন্য কোন প্রকার পূর্ব্বতন শিক্ষাসংস্কারের প্রয়োজন নাই। সেজন্য পল্লীবিপণির গন্ধবণিক হইতে নগরের গ্রন্থবণিক পর্য্যন্ত সকলেই নিঃসঙ্কোচে কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে দায়িত্বশূন্য মতামত ব্যক্ত করেন—সেজন্য এদেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সম্যক্ সমাদর হয় নাই। পাঠককে বর্ত্তমান কাব্যের ছন্দ, যমক, অনুপ্রাস, ছন্দঃস্পন্দ, যতি, মাত্রা, মিল ও কাব্যের অন্যান্য কারুকৌশল সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে—শ্রুতি ও মতিকে রস গ্রহণের অধিকারী ও উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। বাগ্‌যন্ত্রের স্বাস্থ্য ও সৌকণ্ঠ্য সকলের না থাকিতে পারে, কিন্তু ছন্দবোধ, শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা সকলেই অর্জ্জন করিতে পারেন। আবৃত্তির পক্ষে স্বরব্যঞ্জনের মাত্রাজ্ঞান, গুরুলঘুবোধ, হ্রস্বদীর্ঘ বোধ বিশেষ প্রয়োজনীয়। কোন্ কোন্ ছন্দ সগোত্র, সবর্ণ, ও সপিণ্ড এবং কোন্ গুলি নয় কোন্ কোন্ ছন্দের সঙ্কর মিলন বৈধ, কোন্ শ্রেণীর পদের সহিত কোন্ শ্রেণীর পদ পাংক্তেয়—কোন্ শ্রেণীর পদ অপাংক্তেয়—সে বিষয়ে রীতিমত জ্ঞান চাই। মনে রাখিতে হইবে ছন্দগুলি বর্ণাশ্রমী। প্রাচীন ভট্টচারণের ন্যায় ছন্দঃসমাজের কুলপঞ্জিকা ও ঘটক-কারিকা আবৃত্তিকারের অভ্রান্তভাবে অধিগত থাকা চাই। বিশ্রামের আশ্রমকেও ভুলিলে চলিবে না। যতিজ্ঞান আবৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। শব্দান্তে যতি ধরা সহজ। সংস্কৃত শ্লোকে শব্দের মধ্যে মধ্যে যতি থাকে - যতিজ্ঞান না থাকিলে সংস্কৃত ছন্দের আবৃত্তি অসম্ভব। বাংলা কবিতাতেও অনেক সময় শব্দের মধ্যে যতি থাকে।

"চরণ পদ্মে। মম চিত নিস্। পন্দিত করহে।
নন্দিত কর। নন্দিত কর। নন্দিত করহে॥

উপরের পংক্তিতে 'নিস্' এর পর যতি দিতে না পারিলে 'নিস্পন্দিত' দেবতার পদে ও কবিতার পদে - দুয়েতেই নিস্পন্দিত রহিয়া যাইবে।

আবৃত্তিযোগ্য কয়েকটী আদর্শকবিতার নামোল্লেখ করিয়া এই নিবন্ধের উপসংহার করি। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের বহুপদ আবৃত্তির পক্ষে উপযোগী। জগদানন্দের বিখ্যাত পদ 'জাগর বৃকভানু নন্দিনি মোহন যুবরাজে,' জ্ঞানদাসের "কনয় কিশোর বয়স অতি রসময়" অথবা গোবিন্দদাসের "কাঞ্চন শোণ কুসুম কনকাচল জীতল গৌরতনু লাবণিরে" ও "আঘন মাস রাস রস সায়র নাগর মাথুর গেল। পুর-রঙ্গিণীগণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন বন ভেল" ইত্যাদি পদ যখন কীর্ত্তনীয়াগণ কেবল আবৃত্তিও করেন—তখন সঙ্গীতের মতই মধুময় বলিয়া মনে হয়। কবিকঙ্কণের "বিড়ঙ্গ বদলে কুরঙ্গ পাওর পদটিকে স্বরতরঙ্গ রক্ষা করিয়া সুন্দর আবৃত্তি করা যায়। মাইকেলের মেঘনাদবধে, নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্যত্রয়ে অনেক অংশ, (কর্ণদুর্ব্বাসা সংবাদ, কৃষ্ণব্যাস সংবাদ ইত্যাদি) হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের শেষাংশ দশমহাবিদ্যার ১মাংশ, ভারতভিক্ষা, ভারতসঙ্গীত

আবৃত্তির যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু', 'স্বদেশ' পলাতকা ও কথা ও কাহিনীর অধিকাংশ কবিতা, তাজমহল, সোনারতরী, হৃদয়-যমুনা, বর্ষামঙ্গল, বিদায়অভিশাপ, কবিচরিত, পুরস্কার, কবিতার বাণীবন্দনা, বৈশাখ, মৃত্যুর পারে, সিন্ধুতরঙ্গ, প্রতীক্ষা, মরণ, পতিতা, জন্মান্তর, "দেশ দেশ নন্দিত করি……", "জনগণ মন অধিনায়ক জয়হে……", প্রতিজ্ঞা, মদনভস্মের পরে ও পূর্ব্বে, বধূ, উর্ব্বশী, বর্ষশেষে, সমুদ্রের প্রতি, "এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" "বসন্ত জাগ্রত দ্বারে……" "শেফালি বনের মনের কামনা—" শেষখেয়া ইত্যাদি অসংখ্য কবিতার আবৃত্তি চলিতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের ও রজনীকান্তের অনেক কমিক্ কবিতা আবৃত্ত হইলে সভায় অট্টহাস্যের এমনকি হট্টহাস্যের সৃষ্টি করিতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক সঙ্গীতের আবৃত্তি চলিতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের যে সকল কবিতা সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা, চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত, মালিনী ইত্যাদি ছন্দে রচিত এবং যে কবিতাগুলিতে হসন্ত ও স্বরান্ত অক্ষরের নিয়মিত সন্নিবেশ আছে সেই কবিতাগুলি ও তাঁহার দিল্লীনামা, মাতামনু, ছন্দোহিন্দোল, দূরের পাল্লা, পাল্কী বেহারার গান, চরকার গান, ঝর্ণা, মহাসরস্বতী, সিংহল, গান্ধীজি, গুজরাটী, গর্‌বা, আমরা, কিশোরী, ঘুমগুম্ফা, বেলাশেষের গান ও বিদায় আরতির বহু কবিতা, করুণানিধানের শ্রীক্ষেত্রে, রেবা, হরিদ্বারে, মর্ম্মর স্বপ্ন ইত্যাদি, কুমুদরঞ্জনের ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ফুরসৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি, যতীন্দ্রমোহনের বিজয়চণ্ডী, ভারতবর্ষ, অন্ধবধূ, বৃন্দাবনী, জেলের ছেলে, চরকার গান, মোহিতলালের নাদিরশাহ, গজল গান, ইরাণী, হাফেজের অনুকরণে, উচ্চৈঃশ্রবা, মহামানব ইত্যাদি, হেমেন্দ্রকুমারের "বাঙ্‌লা দেশের শাম্‌লা মেয়ে," কিরণধনের, ফাঁসীর আগে, দ্বীপান্তরে, দুনিয়াদারী, ইত্যাদি, কাজী নজরুলের মহরম্, কামালপাশা বিদ্রোহী, মিসর ইত্যাদি কবিতা আবৃত্তির উপযোগী। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর ভারতের মানচিত্র, ছাত্রগণের পক্ষে বেশ উপযোগী। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটকের গরীবের অত্যাচার, সোণার ঘড়ী ইত্যাদি কমিক কবিতা আবৃত্তিতে বেশ জমে। বিজয়বাবুর চিত্রোৎপলা, হিমাদ্রি, পরিচয়, ষ্টিভিক্ষা, উদ্বোধনগাথা, সুজাতা ও বুদ্ধ ইত্যাদির নামও উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়কুমার, ভুজঙ্গধর, প্রমথনাথ, রমণীমোহন ইত্যাদি কবির কাব্যেও অনেক আবৃত্তি যোগ্য কবিতা আছে। আর কত নাম করিব? নবীন প্রাচীন সকল কবিই আবৃত্তিযোগ্য কবিতায় বঙ্গকাব্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীকালিদাস রায়।

পূর্ব্বজন্মের প্রিয়া—

উপরি-উপরি তিন বছরে হাজার পঞ্চাশেক টাকা লোকসান দিয়ে হরিদাস আবার আমাদের আড্ডার খাতায় নতুন কোরে নাম লেখালে। বছর দশেক আগে সিন্ধবাদের বণিক-পুত্রের মত হঠাৎ একদিন সে ব্যবসা-সমুদ্রে তরণী ভাসিয়ে দিয়েছিল। তারপরে লাভের পণ্য বোঝাই কোরে ফেরবার মুখে মাঝ-সমুদ্রে নৌকো বান্‌চাল হোয়ে প্রায় ডুবুডুবু অবস্থায় কোনো রকমে বন্দরে ফিরে লক্ষ্মীর পায়ে গড় কোরে একদিন বেলা দশটার সময় সে আড্ডার দরজায় এসে দেখা দিলে।

আমাদের আড্ডার অবস্থা যথা পূর্ব্বং তথা পরং। কেবল দুটো তিনটে অত্যন্ত পরিচিত স্থানের গুটিকয়েক লোক সরে গিয়েছে মাত্র। হরিদাস অদৃশ্য হবার পর আমাদের মধ্যে আরও দু-চার জন লক্ষ্মীর দরজায় কিছুদিন কোরে ধন্না দিয়েছিল, কিন্তু দেবীর সেদিকে কোনো রকম আকর্ষণ না থাকায় দিন থাক্‌তে থাক্‌তেই ফিরে এসে তারা সুবোধ বালকের মতন আড্ডার পরমানন্দে তুরীয়ভাবে জীবন-যাপন করছিল।

অনেকদিন পরে হরিদাস ফিরে আসায় আমাদের আড্ডার মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। এর একটু কারণও ছিল। লাভ লোকসানের জমা খরচে তার লাভেরঅঙ্কটাই ছিল বেশী। অবশ্য অঙ্কটির সঠিক সন্ধান আমরা কেউ জানতুম না; অঙ্কশাস্ত্রের তিন আইনের সেই রহস্যময় অঙ্করটার মত সেটাও আমাদের কাছে রহস্যই থেকে গিয়েছিল।

যাক্, হরিদাসের সিন্ধুকের সন্ধান না পেলেও আমাদের দুঃখ ছিল না। মাথার ওপরকার অসীম নীল রহস্যের কোনো সংবাদ না রাখলেও বৃষ্টিধারা দিয়ে সে যেমন ধরণীকে তার পরিচয় দিয়ে যায়, আমাদের দারুণ অনাবৃষ্টির সময় হরিদাসের সিন্ধুকও মাঝে-মাঝে তার পরিচয় দিয়ে যেত। এতে আমরা খুশীই ছিলুম।

একদিন, বেলা তখন প্রায় তিনটে। আড্ডাধারীরা যে যার আহার্য্য সংগ্রহের চেষ্টায় বেরিয়েছে, শুধু আমি আর পঙ্কজ বসে আছি। পঙ্কজ প্রায় ছ-মাস দেশে ছিল সম্প্রতি ফিরে এসে কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখছিল। সেদিন দুপুর বেলা তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ হোয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখে আমি বল্লুম ওহে অত ভেবো না, ভেবে কি হবে?

পঙ্কজ বল্লে না, ভাবনা কিসের। তবে মনটা বড় খারাপ হোয়ে আছে।

হঠাৎ মন খারাপের কারণ জিজ্ঞাসা করায় পঙ্কজ যা বল্লে তার তাৎপর্য্য এই— সম্প্রতি তার বহুকালের পুরাতন পোষমানা পত্নীটি অনেকদিন ধরে শাসিয়ে-শাসিয়ে কোনো রকম অবসর না দিয়ে দেহপিঞ্জর ছেড়ে পলায়ন করেছেন। এরই কিছুদিন পরে তিন পুরুষ ধরে ধোঁকা দিয়ে পোষা একটি বাস্তু সাপ তার একমাত্র ভাইটিকে নিখরচায় খেয়া পারের ব্যবস্থা

পেশ্যারে দিয়েছে। স্পষ্ট বোঝা গেল সর্পজাতির এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা এমন আকস্মিকভাবে তার কাছে প্রকাশ হোয়ে পড়ায় পঙ্কজ বেচারী একেবারে মর্ম্মাহত হোয়ে পড়েছে। সে আরও বল্লে যে, তার একটিমাত্র পিতৃমাতৃহীন ভাগ্নে যাকে তার স্ত্রী নিজের ছেলের মতন মানুষ করেছে সেটিও প্রায় যায়-যায়।

কাহিনী শেষ কোরে পঙ্কজ বল্লে—সময়টা একটু খারাপ যাচ্ছে।

আমাদের বিলাসকুমার দিন কতকের জন্য সন্ন্যাসী হয়েছিল। সে হাতটাত গুণ্‌তে পারত। পঙ্কজের কথা শুনে আমি তাকে বল্লুম—তোমার সময়টা সত্যিই খারাপ যাচ্ছে দেখছি; বিলাসকে একবার হাতটা দেখিও তো। আর কতদিন সময় খারাপ আছে সে বলে দিতে পার্‌বে।

পঙ্কজ বল্লে—বিলাস-দাকে হাত দেখিয়েছিলুম। তার থিওরী হচ্ছে—চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। অর্থাৎ একটা কোরে খারাপ সময়ের পরেই একটা সুখের সময় আসে। সে বলে দিয়েছে,—স্ত্রী, ভাই, মারা গিয়েছে এবার ভাগ্নেটা মারা গেলেই তোমার সুখের সদর রাস্তা একেবারে সাফ হোয়ে যাবে, কিছু ভাবনা নেই।

পঙ্কজের মনটা খারাপ আছে দেখে মৃত্যু সম্বন্ধে নানা রকম দার্শনিক তত্ত্ব আওড়াতে সুরু করা গেল। শেষে বল্লুম—বাড়ীতে কেউ মারা যাবার আগে জানতে পারলে প্রস্তুত হোয়ে থাকা যায়।

দেখলুম পঙ্কজ এ বিষয়ে আমার চেয়ে অনেক উঁচুদরের দার্শনিক। সে বল্লে—হ্যাঁ, তা হোলে ঘাট-খরচটা যোগাড় কোরে রাখতে পারা যায়। না হোলে সে সময় তাড়াতাড়িতে টাকা ধার পাওয়াও মুস্কিল।

পঙ্কজ একটু চুপ কোরে থেকে বল্লে—কিন্তু ভাই, আমার এ বিষয়ে অভিযোগ কর্‌বার কিছু নেই। আমার স্ত্রী ও ভাই যে মারা যাবে সে কথা আমি অনেক আগেই জানতে পেরেছিলুম।

বসে বসে আমার একটু ঘুম ধরেছিল, কিন্তু পঙ্কজের কথা শুনে চট্‌কা ভেঙে গেল। বলে উঠ্‌লুম —বল কি! স্বপ্নে নাকি?

সে বল্লে -স্বপ্নে নয়, একজন আমায় গুণে বলে দিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলুম—কে বল দিকিন? বিলাস দা নাকি?

পঙ্কজ বল্লে—না বিলাস-দা নয়, তবে তার নাম করলে তুমি তাকে চিনতে পারবে; সে আমাদের মধ্যেই একজন।

পঙ্কজ অবাক করলে! আমাদেরই মধ্যে এতবড় একজন গুণী আত্মগোপন কোরে বসে আছে কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস হোলো না। লোকটার নাম জানবার জন্য জেদ করতে লাগ্‌লুম।

শেষে আমার কাছ থেকে নানা রকমের দিব্যি আদায় কোরে নিয়ে সে বল্লে—প্রায় মাসছয়েক আগে হরিদাস তার হাত দেখে সব বলে দিয়েছিল।

হরিটা ভেতরে-ভেতরে এতবড় একজন গুণী হয়েছে শুনে বিশ্বাস হোলো না। পঙ্কজ তার ভবিষ্যদ্বাণীর আরও ছুটো চারটে প্রমাণ দিয়ে বল্লে—হরিদাসকে কিছু বোলো না দাদা, তা হোলে সে আমায় খেয়ে ফেল্‌বে।

পঙ্কজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলুম, হরিকে কিছু বল্‌ব না।

প্রতিজ্ঞারক্ষার সনাতন রীতি অনুসারে প্রথম দিনকয়েক চুপচাপ থেকে একদিন নির্জ্জন পেয়ে হরিদাসকে বলে ফেল্লুম—দাদা, আমার অদৃষ্টটা একটু হাত্‌ড়ে দেখতে হবে, আর তো পারি না।

মুখের উপর কপট বিস্ময় এনে সে এমন অজ্ঞতার ভাণ করলে যে, আমার মনে হোলো পঙ্কজ নিশ্চয় আমায় বোকা বানিয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী কববার বিদ্যায় পরিপক্ব হোলেও অভিনয়-বিদ্যায় হরিদাস ছিল অত্যন্ত কাঁচা। একটু চাপাচুপি করতেই তার স্বরূপ প্রকাশ হোয়ে পড়্‌ল। সে কাগজ পেড়ে তাতে রাশি চক্র ফেলে বিচার কোরে আমায় বলে দিলে—সময়টা তোমার এখন ভারী খারাপ। তুলা লগ্নের ওপর শনি ও মঙ্গল এই দুই গ্রহ এখন ঘোড়দৌড় খেলা খেল্‌ছে; মাঝে মাঝে দু-একটা চাঁট্‌ এসে লাগ্‌তে পারে। মোটের ওপরে, অবস্থাটি বিশেষ সুবিধার নয়।

অবস্থা কোনো কালেও বিশেষ সুবিধার ছিল বলে মনে না পড়্‌লেও হরির কথা শুনে সেদিন মনে হয়েছিল যেন পাহাড়ের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি, সামনে শনি ও মঙ্গল ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসছে, পালাতে গেলে খাদের মধ্যে পড়তে হবে আর দাঁড়িয়ে থাকলে মাথার খুলি চুর্ণ হবে।

ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কি করা যায় বল দিকিন?

সে বল্লে—যেমন কোরে পার হাতে একটা নীলা, গলায় একটা পলা আর ডান পায়ের কড়ে আঙুলে একটা লোহার আংটি ধারণ কর।

হরিদাসের ব্যবস্থা অনুসারে কয়েকদিন বাদে সেই রত্ন-আভরণে সজ্জিত হোয়ে আড্ডায় উপস্থিত হওয়া-মাত্র চতুর্দ্দিক থেকে প্রশ্ন বৃষ্টি হতে লাগ্‌ল—ব্যাপার কি?

অনন্যোপায় হোয়ে হরির গুণের কথা সবার সমক্ষে প্রকাশ করতে হোলো। আমার কথা শুনে ভূপতি বল্লে—আরে ছি ছি, শেষকালে তোমার এই অবনতি!

কিন্তু ভূপতির অনাস্থা থাকলেও দেখলুম আড্ডার আর সকলেই নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ক্রমেই সতর্ক হোয়ে উঠতে আরম্ভ করলে। সবার অবস্থা দেখে হরিরও উৎসাহ লেগে গেল। ব্যবসালব্ধ যে কটা টাকা তখনো সিন্দুকে অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়ে মোটামোটা

পুঁথি কেনা হোতে লাগ্‌ল। আড্ডায় দিবারাত্র আর কোনো কথা নেই। কেবল মকর, বৃশ্চিক, কর্কট ইত্যাদি জলে স্থলে যত রকম সাংঘাতিক জীব আছে তাদের নাম আর তারি সঙ্গে বৃহস্পতি, রাহু, মঙ্গল, কেতু, বুধ, সোম, শনি সব গ্রহের ধরণ-ধারণ। স্বাতী বা অনুরাধার অমাবস্যার অন্ধকারেও অভিসারে বেরুবার যো নাই, সব আমাদের কাছে ধরা পড়তে হবে। অত বড় বিশাল নভোমণ্ডল একেবারে নখদর্পণে এনে ফেলা গেল।

একে-একে আড্ডাধারীদের হাত পা গলা গোমেদ, জামিরা, চুণী প্রভৃতি রত্নে শোভিত হোতে লাগ্‌ল। একদিন ভূপতির পকেট থেকে মস্ত একটা লোহার পুরোনো গজাল পর্য্যন্ত বেরিয়ে পড়্‌ল। জেরায় জানা গেল যে হরি সম্প্রতি একখানা একশো বছরের পুরোনো ভাউলে কিনেছে। সে বলে যে, একশ বছরের জোয়ার ভাঁটা খাওয়া এই লোহা জীবন-যাত্রায় পাকা মাঝির কাজ তো করেই, এমন কি মৃত্যুর পর বৈতরণীও বিনা মাশুলে পেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা কোরে দেয়।

সেদিন সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে আড্ডা থেকে হরিদাসকে লগ্নাচার্য্য উপাধি দেওয়া হোলো।

দিনগুলো নিজেদের মধ্যেই বেশ হুল্লোড়ে কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু সুকার্য্যের দীপ্তি চাপা কখনো থাকে না। হরির এই অসামান্য গুণের কথা কেমন কোরে আড্ডার চৌকাট পেরিয়ে বাইরে গিয়ে পড়্‌ল। তারপরে সকাল, সন্ধ্যা দুপুর হরির আর বিরাম নাই। দলে-দলে লোক দিনরাত তাকে ঘিরে বসে আছে। সকলেরই সময়টা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। হরিদাস মহা উৎসাহে মঙ্গলে পলা, শুক্রে হীরা, রাহুতে গোমেদ প্রভৃতি ব্যবস্থা দিতে লাগ্‌ল। ক্রমে একশো বছরের পুরোনো ভাউলের গজাল পর্য্যন্তও দুর্ল্লভ হোয়ে উঠ্‌ল।

কিছুদিন যেতে না যেতে আমাদের আড্ডাটি রীতিমত জ্যোতিষের টোল হয়ে দাঁড়াল। কোষ্ঠী বিচারের জন্য বাইরে থেকে মহা-মহা দিগ্‌গজ পণ্ডিত আমদানী হোতে লাগ্‌ল। কেউ মুখ দেখেই বলে দেন—এখনো দেরী আছে। কারুকে বা প্রশ্ন করলে একটা নদী কিংবা ফুলের নাম করতে বলেন। কেউ বা প্রশ্ন শুনে নাকের তলায় হাত দিয়ে দেখেন ইড়া বইছে কি পিঙ্গলা বইছে। সে সব পণ্ডিতদের হাল-চালই আলাদা। কেউ বা ভৃগুর শিষ্য কেউ বা অষ্টোত্তরী, কেউ বা বিংশোত্তরী। এই নিয়ে দিনরাত তর্ক, ঝগড়া, গোলমাল। পুরাতন আড্ডাধারীরা পালাই-পালাই ডাক ছাড়লে।

সেদিন তিথি ছিল অমাবস্যা। দুপুরবেলা, আড্ডাঘরে একলা বসে আছি। সন্ধ্যাবেলা একটা কোষ্ঠী নিয়ে বিচার সভা বসবার কথা আছে, এমন সময় আমাদের নন্দনন্দ জ্যোতিষার্ণব মশায় এসে উপস্থিত হলেন। এ পণ্ডিতটী আমাদের আড্ডায় নবাগত। ইনি ভৃগুসংহিতা অনুসারে বিচার করেন। সেদিন তাকে এক্‌লা পেয়ে খোলসাভাবে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা পণ্ডিতজী, সত্যি কোরে বল তো আমার আর কত দেরী আছে?

পণ্ডিত কৌটা থেকে এক টিপ নস্য নাকে টেনে নিয়ে বল্লে—দেরী আছে। আপনি পূর্ব্বজন্মে একটি মহাপাপ করেছিলেন, এ জন্মে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।

—কি পাপ করেছিলুম দাদা?

পুনরায় আর এক টিপ নস্য গ্রহণ, তৎপরে কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কোরে পণ্ডিত বল্লে—গত জন্মে আপনার যখন নব্বই বৎসর বয়স সেই সময় একটি এক বৎসরের ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিপীড়ন করেছিলেন। এই বিবাহের কয়েকমাস পরেই আপনার মৃত্যু হয়। কন্যাটির এই বৈধব্যের কারণ আপনি। সেই পাপের এখন প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।

পণ্ডিতেরা প্রায়ই এই ধরণের কথাবার্ত্তা বলতেন বটে কিন্তু সেগুলো আমার মোটেই হজম হোতো না। আমি স্পষ্টই বলে ফেল্লুম—ও সব কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। যদি—

পণ্ডিত ইতিমধ্যে আর এক টিপ নস্য নাকের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিল। আমার বক্তব্যটা শেষ করতে না দিয়েই সে দস্যির মতন গর্জ্জন কোরে বল্লে—কী! ভৃগুর কথা অবিশ্বাস! আপনার পত্নী এখনো জীবিত। তাঁর বয়স এই আপনার চাইতে বছর দুয়েকের বেশী হবে।

অবস্থা বিপর্য্যয়ে যদিও বড়-বড় রুই কাতলা ময়দার টোপও গিলে থাকে, তবুও পূর্ব্বজন্মের প্রিয়ার এই টোপ্‌টা আমি গিলেও গিল্‌তে পারলুম না, বেধে গেল।

কথাটা তেমন আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ না করায় পণ্ডিতজী বল্লে—কি তোমার বিশ্বাস হোলো না বুঝি?

অতি বিনীতভাবেই বল্লুম—এত বড় একটা সংবাদ সাদা চোখে কি কোরে বিশ্বাস করি দাদা?

পণ্ডিত উত্তেজিত হোয়ে বল্লে—ভৃগুর গণনা কখনো মিথ্যা হবে না। আমি বলছি তিনি এখনো জীবিত আছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় আছেন?

পণ্ডিত বল্লেন—তা বলতে পারি না, সেটা গুণে দেখতে হবে। তবে এটা বলতে পারি যে, তিনি এখনো জীবিত এবং বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী।

পণ্ডিত অনেক কাল জ্যোতিষশাস্ত্র নাড়াচাড়া করছে, মানবচরিত্র তার নখদর্পণে। এই শেষ চালটীতে সে আমায় একেবারে মাত্ করলে। কিন্তু সেদিন তার সঙ্গে এই কথা নিয়ে আর আলোচনা হোলো না। লোকজন এসে পড়ায় অন্য কথা সুরু হোলো।

তারপরে তিন দিন ধরে শয়নে স্বপনে আমার পূর্ব্বজন্মের প্রথম প্রিয়ার চিন্তা আমায় একেবারে পাগল কোরে তুল্লে। ঘুমের ঘোরে সে আমার কানে কানে এসে বলে, আর কত ঘুমুবে? আমি যে আর থাকতে পারি না, এবার আমার যাবার সময় হোলো;

স্বপ্নে দেখি আমি যেন আমার পূর্ব্বজন্মের প্রিয়ার সন্ধানে বেরিয়েছি। খুঁজতে-খুঁজতে

চলে গেছি ভারতের অন্য এক প্রান্তে। প্রিয়ার সঙ্গে দেখা হোলো। আমার প্রাসাদের সোপানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমি অবাক হোয়ে দাঁড়িয়ে তার রূপরাশি দেখছি। শিপ্রা নদীর জল-কল্লোল বাতাসে ভেসে আমার কানে এসে লাগ্‌ছে, তার মধ্যে কত শত বিস্মৃত কাহিনীর ইতিহাস। প্রিয়ার হাতে বিজয়মালা, মরণযজ্ঞের অগ্নিপরীক্ষা পার হোয়ে এসে আমি তার সম্মুখে জানু পেতে বসেছি। প্রিয়া হাসিমুখে আমার গলায় জয়মালা পরিয়ে দিলে। হঠাৎ আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে জ্যোতিষার্ণবের হাঁচি আমার স্বপ্নের জাল ছিন্ন-ভিন্ন কোরে দিয়ে চলে যায়। ক্ষোভে বুক ফেটে দীর্ঘনিশ্বাস বইতে থাকে।

একদিন নন্দনন্দনকে চেপে ধরলুম—দাদা, আমার প্রথম প্রিয়ার ঠিকানাটা গুণে বলে দাও, মনটা বড় উচাটন হয়েছে।

পণ্ডিত কোনো জবাব দিলে না, চুপ কোরে রইল। আমি আবার বল্লুম—সে ধনী, তার অর্থে আমারও অধিকার আছে। পূর্ব্বজন্মের হোলেও সে তো আমারই অর্থ।

পণ্ডিত এবার নাকে নস্যি ঠেসে বল্লে—নিশ্চয়, নিশ্চয়! তোমার পরধনপ্রাপ্তি যোগ আছে। তার ওপরে তোমার কেন্দ্রে বৃহস্পতি, তোমার টাকা মারে কে?

বলেই তিনি শ্লোক আওড়ালেন—

কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাসর্ব্বে কেন্দ্রী যত্র বৃহস্পতি
মত্ত কুঞ্জর নাশয়েৎ কেশরী যথা—

ব্যস! ধনপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সংস্কৃত সাক্ষী রয়েছে দেখে আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল তা চলে গেল। পণ্ডিতকে বল্লুম—ঠিকানাটা আমায় বলে দাও দাদা, তোমার দুঃসময়ে আমি এ উপকারের কথা ভুলব না।

পণ্ডিত একটু গম্ভীরভাবে থেকে বল্লে—ঠিকানা জান্‌তে হোলে এখন কুলকুণ্ডলিনী যাগ করতে হবে। কিছু খরচ আছে।

—কত খরচ?

পণ্ডিত ভেবে-চিন্তে বল্লে—পঞ্চাশটী টাকার কম হবে না।

ধনপ্রাপ্তির আগেই এতখানি ধনক্ষয়ের চিন্তা আমার উৎসাহকে একটু খর্ব্ব কোরে দিলে। কিন্তু আশাই শেষকালে জয়লাভ করলে। পঞ্চাশটী টাকা যোগাড় কোরে পণ্ডিতকে দিয়ে বল্লুম—যা থাকে কপালে লাগাও তুমি কুলকুণ্ডলিনী।

যজ্ঞের কথা যাতে গোপন থাকে সে বিষয়ে পণ্ডিতকে প্রস্তাব করতেই বুঝতে পারলুম যে, এ সম্বন্ধে আমার চাইতে তার আগ্রহ অনেক বেশী।

যা হোক্, অমাবস্যা দেখে যাগ হোলো। যজ্ঞক্ষেত্রে আমায় যেতে হয়-নি, পণ্ডিত

নিজের দেশেই যজ্ঞ করতে লাগ্‌ল। তার আশাপথ চেয়ে বসে থাকা ছাড়া এ যজ্ঞে আমার আর অন্য কাজ রইল না।

দিন দুয়েক পরে নন্দনন্দন ফিরে এসে বল্লে—ব্যস্‌, সব ঠিক। ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে, আর কোনো চিন্তা নাই।

আগ্রহে আমার তালু শুকিয়ে উঠেছিল। জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায়? এই শহরেই তো?

পণ্ডিতজী এবার হাসতে-হাসতে বল্লেন—তা বল্‌চি না, আগে বল অর্থপ্রাপ্তি হোলে আমায় কত দেবে?

— চার আনা বারো আনা। যা পাব তার চার ভাগের এক ভাগ তোমার।

পণ্ডিত উৎসাহিতভাবে বল্লে—রাজি রাজি খুব রাজি।

আমি বল্লুম— তা হোলে কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

পণ্ডিত তাতেও বিশেষ অমত করলে না। যাত্রার সব আয়োজন হোতে লাগ্‌ল। প্রথমে শহর থেকে ত্রিশ মাইল উত্তরে যেতে হবে। সেখানে শতাধিক বৎসরের পুরাতন এক স্থাপিত বটগাছ আছে, সেই গাছকে দক্ষিণে রেখে প্রায় মাইল পাঁচেক পশ্চিমে গিয়ে আবার মাইল দুয়েক উত্তরে গেলেই আমার পূর্ব্বজন্মের জন্মভূমিতে পদার্পণ করা যাবে। সেইখানে আমারই বাড়ীতে আমার পূর্ব্বজন্মের প্রিয়া সমারোহে বাস করছেন।

পণ্ডিত ঠিক করলে আমাদের সন্ন্যাসীর বেশে বেরুতে হবে। উপলক্ষ্য নিয়ে হাঙ্গামা কোরে লক্ষ্যভ্রষ্ট হোতে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল, তাই পণ্ডিতের সব কথাতেই তখন আমি রাজি। যাত্রা সম্বন্ধে কিছুকাল গোপনে পরামর্শ চলবার পর একদিন অমাবস্যার অন্ধকারে অর্দ্ধদেহ গৈরিক বসনে আবৃত কোরে দুজনে বেরিয়ে পড়া গেল।

পণ্ডিতজীর আদেশ অনুসারে আমি হলুম গুরু আর তিনি হলেন শিষ্য। সারারাত্রি চলি, দিনের বেলায় গ্রামে ডেরাডাণ্ডা ফেলে বসি। কাছে সামান্য কিছু অর্থ ছিল তা ছাড়া পণ্ডিতের সংস্কৃত শ্লোকের বন্যায় গৃহস্থের ভাণ্ডার থেকে চাল, ডাল, ঘি ভেসে এসে আমাদের চরণমূলে আশ্রয় লাভ করতে লাগ্‌ল। যাত্রা শুভই ছিল।

পণ্ডিত গণনা অনুসারে পথ চিনে চলতে লাগ্‌ল। প্রায় আট দশ দিন পরে একদিন গভীর রাতে এক গ্রামে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়িয়ে সে অঙ্ক কসে দেখলে যে ঠিক স্থানে আমরা পৌঁচেছি, এইখানেই আমাদের আস্তানা করতে হবে।

নন্দনন্দন আমায় উপদেশ দিলে সমস্ত দিন ধুনির সামনে চোখ বুঁজিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে থাকতে হবে, বাকী যা কাজ তা সে করবে এখন। রাতারাতি এদিক-সেদিক

থেকে শুক্‌নো কাঠ সংগ্রহ কোরে সে ধুনি জ্বালিয়ে দিলে। ভোর হোতে না হোতে আমি আগুনের সামনে আসন নিয়ে বসে পড়লুম।

সকাল বেলা গ্রামের মেয়েরা পুকুরে নাইতে এসে সন্ন্যাসী দেখে অবাক! তারা এসে আমার চারিদিকে গোল হোয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ বা স্নান কোরে ফেরবার সময় আমায় নমস্কার করতে লাগ্‌ল। একবার চোখ খুলে ব্যাপার দেখেই প্রাণপণে চোখ দুটোকে চেপে বন্ধ কোরে রাখলুম। থেকে-থেকে পণ্ডিত ভীষণ চীৎকার করতে থাকে - তারা - তারা। সে চীৎকার শুনে আমারই বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করতে লাগ্‌ল।

ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটবার পর পণ্ডিত তাক্ বুঝে একটি মেয়েকে বলে ফেল্লে—মা তোর স্বামীর বড় অসুখ না?

মেয়েটী তখুনি সজলকণ্ঠে বল্লে—হ্যাঁ বাবা, স্বামীর আমার বড় ব্যারাম। পিত্তশূল আছে, কদিন বুকের ব্যথায় উঠ্‌তে পার্‌চে না।

পণ্ডিত তাকে আর কোনো কথা না বলে একটা বিকট চীৎকার করলে—তারা—!

চোখ বোঁজা থাকলেও সেবারের চীৎকার শুনে বেশ বুঝতে পারলুম যে, সেটা অব্যর্থ শর-সন্ধানীর উল্লাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

উত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রমণী আবার জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ বাবা কি হবে? সে কি আর ভাল হবে না?

পণ্ডিত অত্যন্ত উদাসীনভাবে বল্লে—যা বেটী যা, ঘরে ফিরে যা। জীবন মৃত্যু এ তো সংসারের নিত্য খেলা।

চোখ বুঁজিয়েই বুঝতে পারলুম যে, রমণী কাঁদতে-কাঁদতে বল্লে—বাবা, সংসারে আমার কেউ নেই, আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দাও বাবা।

পণ্ডিত বল্লে—গুরুর কৃপা থাকলে বেঁচে যাবে। আমি কে, আমি ওঁর দাস মাত্র।

-- তা বাবা তুমি যদি --

রাত্রি বারোটার সময় ওঁর ধ্যান ভঙ্গ হবে। সে সময়ে আসিস্, ঔষধ মিল্‌লেও মিল্‌তে পারে।

এই সময় আরও কয়েকটী রমণীকণ্ঠের অস্ফুটধ্বনি আমার কানে ভেসে এল। বুঝলুম পণ্ডিত দিব্যি আসর জমিয়েছে।

পূর্ব্বোক্ত রমণীটি আবার কাতরস্বরে বল্লে—দিনের বেলায় ওষুধ পাওয়া যায় না বাবা।

পণ্ডিত- "ওঃ বাবা!" বলে শিউরে চীৎকার কোরে উঠ্‌ল।

সাপ টাপ কিছু বেরিয়েছে মনে কোরে তাড়াতাড়ি চোখ খুলে ফেল্লুম। কিন্তু পণ্ডিত তখুনি বলে ফেল্লে—গুরুর ধ্যান ভেঙে কি কোটি কল্পকাল নরকগামী হব? কিছু বুঝতে পারিস্ না বেটি!

বড্ড রক্ষা পেয়েছি মনে কোরে চোখ দুটোকে চেপে বন্ধ কোরে শিরদাঁড়া সোজা কোরে আবার ধ্যানস্থ হওয়া গেল।

মেয়েটী বল্লে—আচ্ছা বাবা তাই আসব।

তারপরে সমস্ত দিন ধরে গ্রামের নরনারী একে-একে আমার চারপাশ ঘুরে গেল। কেউ বল্লে—ব্যাটা পাকা ভণ্ড! কেউ বা বল্লে—না হে, কার মধ্যে যে কি গুণ আছে কিছু বলা যায় না। বর্ষীয়সীরা বল্লেন—বাবাজীর বয়সটা বড় কাঁচা।

সন্ধ্যার পর যখন ভিড় সরে গেল তখন আমার প্রায় মূর্চ্ছা যাবার অবস্থা। সমস্ত দিন বসে-বসে শিরদাঁড়া আর সোজা রাখতে পারলুম না, সেইখানেই দেহযষ্টি বিছিয়ে দিলুম। পণ্ডিত প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে সর্ব্বাঙ্গে তেল মালিস কোরে দিয়ে আমায় চাঙ্গা কোরে তুলে বল্লে—ও রকম করলে চল্‌বে না, একটু শক্ত হোতে হবে। আজ রাত্রে একজন চরণামৃত নিতে আস্‌বে, তার স্বামীর আরোগ্যের জন্য। এইটে যদি লেগে যায় তো ব্যস্‌—আর দেখতে হবে না।

প্রায় সমস্ত দিন ও অর্দ্ধেক রাত্রির পর পণ্ডিতের হাতের তৈরি খিচুড়ী খেয়ে একটু আরাম কোরে বসলুম। পণ্ডিতের কিন্তু আর বিরাম নাই। সে খেয়ে উঠেই আসন-পিঁড়ি হোয়ে বসে চীৎকার কোরে মোহমুদ্গর আওড়াতে লাগ্‌ল—কা তব কান্তা—

এমন সময় সেই অভাগ্যের কান্তা আরও দুটি তিনটি রমণীকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাকে প্রণাম কোরে একটু দূরে গিয়ে বস্‌ল।

পণ্ডিতের শিক্ষামত আমি শিষ্যের উদ্দেশ্যে বল্লুম—মা লক্ষ্মীরা বড় ভক্তিমতী। এই রাতে সাধু দর্শন করতে এসেছে।

পণ্ডিত বল্লে—বাবা, এর স্বামীর বড় অসুখ, একটু চরণামৃত দিতে হবে।

একটু হেসে বল্লুম আমি আশীর্ব্বাদ করছি সেরে যাবে।

পণ্ডিত হাত জোড় কোরে বল্লে—না বাবা ওকে দয়া করুন। একটু চরণামৃত দিন।

অত্যন্ত অবহেলাভরে আবার বলা গেল—যার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে তাকে আমি কি কোরে বাঁচাব? আমি অতি সামান্য লোক।

বলা বাহুল্য সব কথাই পণ্ডিতজী আমায় আগেই শিখিয়ে রেখেছিল। আমি কিছুতেই দেব না, সে-ও কিছুতেই ছাড়বে না। শেষকালে শিষ্যের আগ্রহে চরণামৃত দিতেই হোলো। মেয়েরা সবাই প্রণাম কোরে ঘরে ফিরে গেল।

গ্রহ সুপ্রসন্ন ছিল কি অপ্রসন্ন ছিল বলতে পারি না। দু-দিন পরে সেই মেয়েটি আবার এসে প্রণাম কোরে জানালে যে, চরণামৃতের গুণে তার স্বামীর অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে, ভয়ের আর কোনো কারণ নাই। আর একটু অমৃত পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় পণ্ডিত তাকে বলে দিলে সেই বাটী ধুয়ে জল খাওয়াও তা হোলেই চল্‌বে।

যেদিন সেই মেয়েটীর স্বামী পথ্য পেলে সেদিন আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। সকাল বেলা স্নান কোরে সে আমাদের ষোড়শোপচারে সিধা দিয়ে গেল। তারপর গ্রামের প্রায় সমস্ত নরনারী আমার সামনে এসে লম্বা হোয়ে শুয়ে পড়্‌ল—বাবা রক্ষে কর!

ধ্যানস্থ হোয়ে থাকা আর চল্‌ল না। চোখ খুলে সবাইকে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করতে লাগ্‌লুম। পণ্ডিত সবাইকে প্রশ্ন করতে লাগ্‌ল। কেউ বল্লে—ছেলের কালাজ্বর তাকে সারিয়ে দিতে হবে। কারুর বা মামা মরলে কিছু পাবার আশা আছে তারই একটা সুরাহা করতে হবে। কারুর বা মাদুলী চাই, কেউ বা হাত দেখাবে। সবারই চোখে উৎকণ্ঠা আর মুখে বুলি—বাবা রক্ষে কর!

এত বড় সাংঘাতিক বিপদ মাথায় নিয়ে লোকগুলো এতদিন কি কোরে নিশ্চিন্ত হোয়ে বসেছিল তা ভেবে আশ্চর্য্য হোতে লাগলুম। সকাল থেকে ভিড় আর ভাঙে না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পণ্ডিতের অমন যে বৃষ-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর তাও ভেঙে গেল।

সন্ধ্যাবেলা জলযোগ কোরে একটু নিশ্চিন্ত হোয়ে বসেছি এমন সময় একটি লোক এসে বল্লে—রাণীমা আপনাদের প্রণাম দিয়েছেন, একবার যেতে হবে।

পণ্ডিত গম্ভীরভাবে তাকে বল্লে—আমরা কোনো গৃহস্থের আশ্রমে যাই না। রাণীমার প্রয়োজন থাকে তাঁকে এখানে আস্‌তে বোলো।

লোকটি বল্লে—রাণীমা একটু নির্জ্জনে বাবার সঙ্গে কথা বলতে চান।

পণ্ডিত বল্লে—বেশ রাত্রি বারোটার পর আসতে বোলো। তখন লোকজন থাকে না।

লোকটী চলে যেতে নন্দনন্দন আমায় বল্লে—এইবার, এইবার তোমার পূর্ব্বজন্মের পত্নী আসবে। তুমি দেখলেই চিনতে পারবে। তাড়াতাড়িতে কি কিছু হয় শনৈঃ পন্থা—

উৎসাহের আবেগে সে প্রায় এক মুঠো নস্যি নাকে ঠেসে দিলে।

রাত্রি বারোটা বেজে গেছে। আমি বসে-বসে প্রিয়তমার কথা ভাবচি। পণ্ডিত বলেছে দর্শনমাত্রেই তাকে চিনতে পারব। মনের মধ্যে নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে এক তরফা চিনলে তো চল্‌বে না, সে আমায় চিনতে পারবে কি না। এই চেনাশোনার কল্পনায় মসগুল হোয়ে গিয়েছি এমন সময় পাঁচ ছটি মেয়ে এসে আমাকে একে-একে প্রণাম করলে। তাদের সঙ্গে একজন দরোয়ান লণ্ঠন নিয়ে এসেছিল সে দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলে—রাণীমা এসেছ?

রমণীদের মধ্যে একজন বল্লেন—হ্যাঁ বাবা এই এসেছি আমি।

পণ্ডিত বল্লে—এস মা লক্ষ্মী এগিয়ে এস, গুরুদেবকে নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন কর।

রাণী এগিয়ে এসে আমায় প্রণাম কোরে সামনে বস্‌লেন। পণ্ডিতজী দরোয়ানের হাত থেকে উজ্জ্বল লণ্ঠনটা নিয়ে আমাদের দুজনের সামনে রেখে দিলে।

আমার বুকের স্পন্দন তখন মিনিটে প্রায় দুশোর কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। বেশীক্ষণ চোখ চেয়ে থাকতে পারলুম না। চোখ বুঁজে স্মৃতিসাগরে ডুব দিলুম যদি এ মুখের সাক্ষাৎ কোথাও পাওয়া যায়। হায় হায় কোথাও তার দর্শন পেলুম না। স্বপ্নে যে দেবী আমায় দেখা দিয়ে আজ এই দুঃসাহসে ব্রতী করিয়েছে তার মুখ স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও বিস্মরণের সে কঠিন যবনিকা টল্‌ল না।

আমার সেই সমাধিস্থ অবস্থা দেখে রাণী বল্লেন—আমি আপনার কাছে কিছু উপদেশ শুনতে চাই। আমি বড় দুঃখী—

চোখ বুঁজিয়ে থাকা আর চল্‌ল না। নন্দনন্দনের শিক্ষামত বল্‌তে হোলো—জানি, আমি সব জানি।

রাণী যেন চমকে উঠলেন। তিনি বল্লেন—আপনি জানেন! আপনি—

জ্যোতির্ষাণর্ব তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে—কিছু সঙ্কোচ কোরো না। ওঁকে জীবনের সব কথা খুলে বল, ওঁর কৃপা হোলে তোমার সমস্ত সন্তাপ চলে যাবে।

রাণী আর একবার নিজেকে বেশ কোরে গুছিয়ে নিয়ে বসে বল্লে—এ দুঃখিনীর জীবন-কাহিনী বড় রহস্যময়, আপনি কি দয়া কোরে শুনবেন।

আমি বল্লুম—শুন্‌ব বৈ কি! বল তুমি।

রাণী একবার এদিক ওদিক চেয়ে বল্লেন—আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলুম। কিন্তু দরিদ্র হোলেও তিন ছেলের পর মেয়ে হওয়ায় আমার বাবা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র জানতেন। নিজের কোষ্ঠী বিচার কোরে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে মেয়ে থেকে তাঁর অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু তাঁর এ আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী হোলো না। কারণ, আমার কোষ্ঠী বিচার কোরে তিনি জানতে পারলেন যে আমার অদৃষ্টে আছে চির-বৈধব্য। অদৃষ্টের এই লিখনকে ফাঁকি দেবার জন্য তিনি চিন্তা কোরে আমার বৈধব্যযোগ খণ্ডাবার এক উপায় আবিষ্কার করলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা ও তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপের জন্য তাঁর অনেক ধনী শিষ্য ছিল। এই শিষ্যদের মধ্যে একজন অতিবৃদ্ধের সঙ্গে পরামর্শ কোরে গোপনে তার সঙ্গে আমার বিবাহ দিলেন। তখন আমার বয়স মাত্র এক বৎসর। সেই সময় বিয়ে দেবার উদ্দেশ্য এই যে, বৃদ্ধ মারা গেলেই আমি বিধবা হোলে, সঙ্গে সঙ্গে বৈধব্যযোগ যা ছিল তা কেটে যাবে, পরে বয়স হোলে অন্য লোকের সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন।

কিন্তু ভবিতব্য ছিল অন্য রকমের। যে বৃদ্ধের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল মরবার সময় কি মনে কোরে সে আমার বাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আরও পাঁচজন সাক্ষীর সামনে তাঁর বিশাল জমিদারী আমায় দিয়ে গেল। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে এ প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব

হোলো না। তিনি নিজ গ্রামের বসবাস তুলে সপরিবারে আমার স্বামীর বাড়ীতে এসে বাস করতে লাগলেন। তারপরে আমার যখন বাইশ বছর বয়স তখন আমার বৈধব্যের বিনিময়ে পাওয়া এই সম্পত্তি আমায় বুঝিয়ে দিয়ে বাবা ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন।

রাণী এই অবধি বলে চুপ করলে। তার কথা শুনে বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। উঃ! নন্দনন্দনের কি অদ্ভুত জ্যোতিষ জ্ঞান। তখুনি তার পায়ে মাথা লুটিয়ে দিতুম, কিন্তু তখনকার মতন সে ইচ্ছা সম্বরণ কোরে বল্লুম—আশ্চর্য্য তোমার জীবনকাহিনী!

রাণী বল্লে—ইহকাল তো গিয়েছে এখন পরকালের জন্য কিছু সংগ্রহ করতে চাই। আপনি আমায় দীক্ষা দিন।

আমি বল্লুম—দীক্ষা নেবার আগে কিছুকাল তোমাকে ধর্ম্ম উপদেশ শুনতে হবে। সময় হয়েছে বুঝলে আমি নিজেই দীক্ষা দেব।

রাণী বল্লে—কবে থেকে আমায় উপদেশ দেবেন?

আমি বল্লুম—যেদিন থেকে তোমার ইচ্ছা। কাল থেকেই এস। তবে এই রকম রাত্রে আসবে, নির্জ্জন না হোলে অসুবিধা হবে।

রাণী আবার পায়ের ধূলো নিয়ে সে রাত্রের মত উঠে চলে গেল।

তারপর থেকে রাণী রোজ রাত্রে আমার কাছে উপদেশ শুনতে আসতে লাগ্‌ল। রোজ রাত্রে অনেকখানি রাস্তা হেঁটে আসতে তার অসুবিধা হয় বলে সে তাদের বাড়ীর পিছন দিককার বাগানের এক কোণে আমাদের জন্য সুন্দর একটী কুটীর তৈরি করিয়ে দিলে। সেখানে তার দরোয়ানদের তাড়ায় বাইরের লোকজন বেশী আসতে পেত না, রাণী প্রায় সকল সময়ই আমাদের কুটীরে আস্‌ত-যেত। সকালে আমি যোগস্থ থাকতুম বলে সে আমার শিষ্য নন্দনন্দনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌ত, আর রাত্রিবেলা ঘণ্টা দুয়েক ধরে আমি তাকে শাস্ত্র শোনাতুম। শাস্ত্র মানে চাণক্য শ্লোক, তার বেশী শাস্ত্র আমার জানা ছিল না।

পণ্ডিতজীর ঘর ছিল আমার ঘরের পাশেই। একই চালার মাঝে দেওয়াল দিয়ে দুটো ঘর করা হয়েছিল। সে যা বল্‌ত তা আমি প্রায় সবই শুনতে পেতুম। একদিন শুনলুম পণ্ডিত রাণীকে বল্‌ছে—রাণীমা তোমার স্বামী আবার জন্মগ্রহণ করেছেন। তাকে দেখতে ইচ্ছা হয়?

স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে রাণীর এ সম্বন্ধে আরও কথাবার্ত্তা হোয়ে গিয়েছে। পণ্ডিতের প্রশ্ন শুনে রাণী বল্লেন কোথায় আছেন তিনি, একবার দেখাও বাবা!

নন্দনন্দন মুখে একবার 'চক্ চক্' আওয়াজ কোরে যেন আপনার মনেই বল্লে—বেটী এখনো চিন্‌তে পারলি-নে। যাক্ সময়ে সবই চিন্‌বি।

চাণক্য-শ্লোক শেষ হোয়ে গেল। হিতোপদেশের গোটা কয়েক শ্লোক তখনো মুখস্থ

ছিল ; তাই আওড়াতে লাগলুম। শ্লোকগুলোর মধ্যে বেদান্তদর্শনের এমন গূঢ় অর্থ গোপন রয়েছে দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হোয়ে যেতে লাগলুম। সংস্কৃত শ্লোক আওড়াবার ধরণ-ধারণ দেখে আমার প্রতি রাণীর ভক্তির মাত্রা দিনে-দিনে বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ওদিকে জ্যোতিষার্ণব প্রত্যহ সকালে দু-ঘণ্টা তার গুরুর গুণ বর্ণনা কোরে রাণীর মনটা আমার ব্যাখ্যা উপলব্ধি করবার মতন তৈরি কোরে রাখে—এই রকমে দিন কাট্‌চে, এমন সময়ে একদিন পণ্ডিতকে বল্লুম—ওহে আসল কাজের কি হোলো? এ অবস্থায় আর কতদিন কাটাতে হবে?

পণ্ডিত বল্লে—আর কটা দিন সবুর কর। এখন ব্যস্ত হোয়ো না—তীরে এসে তরী ডুবিও না।

আরও কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন নন্দনন্দনের শিক্ষামত রাণীকে বল্লুম—দেখ, তুমি কাশীতে একটি বাবার ও একটি মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা কর। উপযুক্ত সেবায়েত নিযুক্ত কর। তোমার পরকালে সদ্‌গতি হবে।

রাণী যেন আমার মুখে এই পরামর্শটি পাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে বল্লে—আপনি যদি সেবার ভার নেন তা হোলে আমি টাকা দিতে পারি। আমি আর কাকেই বা চিনি, বিশ্বাসই বা করি কাকে?

আমি বল্লুম—আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আজ এখানে আছি তো কাল সেখানে। ওসব টাকাকড়ির ভার আমি নিতে পারব না।

রাণী বল্লে—টাকাকড়ির হিসাব আপনার শিষ্য দেখবে, আপনি খালি তাদের খাটাবেন আর বাবা-মার সেবা করবেন।

আমি এ দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে পারব না বলে তখনকার মতন রাণীকে বিদায় করলুম। কিন্তু শেষকালে সে কিছুতেই ছাড়লে না। হ্যাঁ না করতে-করতে নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে রাজী হোতে হোলো।

পরদিন থেকে আমরা তিনজনে মিলে মন্দির নির্ম্মাণের খরচ ও অন্যান্য বিষয়ের হিসাব-পত্র সুরু করলুম। অনেক পরামর্শের পর স্থির হোলো মন্দির তৈরির জন্য লক্ষ টাকা খরচ হবে। রাণী এই লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ আমার নামে লিখে দিবে। আমি টাকা নিয়ে কাশীতে গিয়ে মন্দির স্থাপন করব। তারপর ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হোয়ে গেলে তাঁদের খরচের জন্য সে একখানা তালুক লিখে দেবে।

সেদিন রাত্রে আনন্দের আতিশয্যে আমাদের ঘুমই হোলো না। ঠিক হোলো মন্দির তৈরীর টাকা থেকে বেশ দু-পয়সা থাকবে, তার উপর সেবায়েতের টাকা আছে। যাক্ ভবিষ্যৎ জীবনটা নিরুদ্বেগে কাটবার এতদিনে একটা সুবিধা লাগ্‌ল।

পরদিন রাণী এসে বল্লেন—মন্দির প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের কথা শুনে তার ভাইয়েরা ভয়ানক খাপ্পা হোয়ে উঠেছে।

কথাটা শুনে একেবারে দশ হাত মাটীর নীচে বসে গেলুম।

পণ্ডিত প্রশ্ন করলে—বিষয়-আশয় কি ভাইদের নামে লিখে দিয়েছ নাকি ?

রাণী বল্লেন—না তা দিই-নি, কিন্তু তারা সব দেখাশুনা করে। টাকাটা তারাই তুলবে কিনা।

আমাদের মুখের ভাব দেখে রাণী আশ্বাস দেবার জন্য বল্লে—কিন্তু তা হোলেও আমি টাকা দেবোই।

টাকা হাতে এসে ফস্‌কে যায় দেখে দমে গেলুম। পণ্ডিত বল্লে—টাকা আসবেই আসবে। দেখ না এমন একটা ক্রিয়া করব যে ভাইয়েরা এক লাখের জায়গায় দু লাখ এনে হাজির করবে।

পণ্ডিত এক অমাবস্যা দেখে খুব সমারোহ কোরে কি একটা যজ্ঞ করলে। কিন্তু সেবার সে নিশ্চয় গুণতে ভুল করেছিল, কারণ সে ক্রিয়া রাণীর ভাইদের মনে কোনো ক্রিয়াই করতে পারলে না।

রাণীও ক্রমে নিরাশ হোয়ে পড়তে লাগল। সে বল্লে—আমি বিষয়ের মালিক হোলেও ভাইয়েরা সব দেখে শোনে বলে প্রায় গ্রামশুদ্ধ লোক তাদের অনুগত। গ্রামের সবাই নাকি রাণীর এই সৎকার্য্যে বাধা দিচ্ছে।

রাণী আরও বল্লে—ভাইয়েরা বলেছে যে যদি তাদের অমতে টাকা দেওয়া হয় তবে সন্ন্যাসীকে তারা দেখে নেবে।

সেইদিন রাতেই পণ্ডিতকে বল্লুম—আর নয় দাদা, এইবেলা সরে পড়ি এস। নইলে বরাতে দুঃখু আছে। এ বয়সে অনাহার যদি বা দু-একদিন সয়, লাঠি সহ্য হবে না, সে কথা আগে থাকতে বলে রাখছি।

পণ্ডিত হুঙ্কার ছেড়ে বল্লে—কি আমাদের মারবে! দেখি না কতবড় মারণবাজ তারা। বাণ মেরে সব ঠাণ্ডা কোরে দেব না।

নন্দনন্দন আমার কথা না শুনে রাণীকে সৎকাজে উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগল। শেষে রাণী একদিন আমাকে বল্লেন—শীগ্‌গির একটা তালুক থেকে হাজার তিরিশ টাকা আসবার কথা আছে। টাকার সিন্ধুকের চাবি থাকে আমার কাছে, সেই টাকা আপনাকে এনে দেব। এমনি কোরে দু-তিনবারে লাখ টাকা পূরিয়ে দেব।

পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ কোরে ঠিক হোলো, লাখ টাকা যখন পাওয়া গেল না তখন

আপাততঃ তিরিশ হাজারেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সে বল্লে—এই টাকা নিয়ে তুমি কাশী গিয়ে জমি কেনবার ব্যবস্থা কর, আমি এখানে থেকে বাকী টাকার তাগাদা করি।

সে আমাকে ভরসা দিয়ে বল্লে—তোমার কোন ভয় নেই। আমি আছি, টাকা না নিয়ে এক-পা নড়্‌চি না।

সেই সাব্যস্ত হোলো। পণ্ডিত থাক্‌বে আর আমি যাব। সে রোজই রাণীকে তাগাদা দিতে লাগ্‌ল--কৈ গো মা লক্ষ্মী, টাকার কতদূর কি হোলো ?

রাণী রোজই আশ্বাস দেয়—এইবারে আস্‌বে বাবা !

সেদিন সন্ধ্যার সময় আমার ঘরের মধ্যে তখনো প্রদীপ জ্বালানো হয়-নি। আমি ও পণ্ডিত অন্ধকারে বসে ভবিষ্যতের পরামর্শ করছি এমন সময় ধীরে-ধীরে রাণী সেখানে এসে উপস্থিত হোলো।

পণ্ডিত উঠে বাতি জ্বালাতে গেল। আমি বল্লুম—এস রাণী, আজ সমস্ত দিন বড় ব্যস্ত ছিলে বুঝি ?

রাণী আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে একেবারে পা দুটো জড়িয়ে ধরলে। আমি তার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বল্লুম—কি হয়েছে, এত কান্না কিসের ?

রাণী কাঁদতে কাঁদতে যা বল্লে তার অর্থ এই যে, আমেদপুরের নায়েব ত্রিশ হাজার টাকা খাজনা পাঠিয়েছিল পথে ডাকাতেরা সে টাকা লুঠে নিয়েছে। সে স্পষ্টই বল্লে—ডাকাত টাকাত সব মিথ্যে কথা, এ নিশ্চয় আমার ভাইদের কাজ।

রাণী আবার আমার পায়ে মাথা গুঁজে পড়্‌ল। সে বল্লে—আমার ইহকাল তো গিয়েছেই, ঠাকুরকে মানত কোরে দিতে পারলুম না আমার পরকালও গেল।

রাণীর অবস্থা দেখে আমার সত্যই দুঃখ হোলো। নিজের দোষের কথা আর মনে পড়্‌ল না যত রাগ হোতে লাগ্‌ল নন্দনন্দনের ওপরে। সেইতো যত নষ্টের গোড়া। ভদ্রলোকের মেয়ে সুখে ভাইদের নিয়ে সংসার করছিল, কোথা থেকে আমরা জুটে তার মনের শান্তি তো নষ্ট হোলোই সংসারের শান্তিও গেল। আমি তাকে বুঝিয়ে বল্লুম—রাণী ঠাকুরের কাছে মানত করেছ বলে যে আজই দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তোমার যখন সুবিধা হবে তখন দিও। তার ওপরে বিশেষ একটা কাজে এখান থেকে আমায় চলে যেতে হচ্ছে। এখন টাকা পেলেও কাজের সুবিধা হবে না।

রাণী আমার কথা শুনে কান্না সুরু করলে। সে বল্লে - না না আপনি কোথাও যাবেন না। এখানকার সবাই আমার শত্রু হোয়ে দাঁড়িয়েছে, একমাত্র আপনারাই আমার বন্ধু। কাশীতে আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা হোয়ে গেলে এই পাপপুরী ছেড়ে আমিও আপনাদের সঙ্গে চলে যাব। আপনি আমায় চরণে ঠেলবেন না।

এই কথা বলে রাণী আবার আমার পায়ে মাথা গুঁজলে। নন্দনন্দন দূরে বসেছিল, একবার চেয়ে দেখলুম যে মুখখানা তার বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠেছে। আমার মুখে সান্ত্বনার ভাষা যোগাচ্ছিল না, ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লুম।

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছিল বল্‌তে পারি না, হঠাৎ একটা বিরাট গোলমালে চমক ভাঙ্‌ল। রাণী আমার পা থেকে মাথা তুলতেই ঘরের মধ্যে একেবারে দশ বারোজন লোক চেঁচাতে-চেঁচাতে ঢুকে পড়্‌ল। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালুম—ব্যাপার কি ?

রাণীর এক ভাই চেঁচাতে লাগ্‌ল—বেটা বদমাইস ভদ্রলোকের কুল মজিয়ে বেড়াও !

আর এক ভাই বলে উঠ্‌ল—যবে থেকে ঢুকেছে সংসারটা একেবারে লণ্ডভণ্ড কোরে খাচ্ছে।

বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা চীৎকার করতে লাগ্‌ল—মারো—মারো—

আমি যে কি করব তা ঠিক করতে পারলুম না। ততক্ষণে আমায় ঘিরে কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। রাণী আমার কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, আমার দিকে কিছুক্ষণ মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল।

রাণীকে ঐভাবে মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়তে দেখে লোকগুলো যেন আরও ক্ষেপে উঠ্‌ল। চারিদিকে ভীষণ চেঁচামেচি সুরু হোলো—জল নিয়ে এস, হাওয়া কর—জায়গা ছাড়—

আমি যে কি করব কিছু ঠিক করতে না পেরে সেই অবসরে চিম্‌টেটা মাটি থেকে তুলে নিলুম।

একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—আগে চেলা ব্যাটাকে মারো—সেইটেই আসল বদমাইস।

সবাই মিলে চেলার অনুসন্ধান করতে লাগ্‌ল, কিন্তু কোথায় সে ! চেলা যে গুরুর চেয়ে কত বেশী ওস্তাদ সে খবরতো আর তারা জানে না ! পণ্ডিতকে না পেয়ে তারা আবার আমায় আক্রমণ করলে। এতক্ষণ তারা আমায় কিছু বলে-নি, কিন্তু এবার তাদের কথা-বার্ত্তা শুনে মনে হোতে লাগ্‌ল দুই এক ঘা না দিয়ে বোধ হয় ছাড়্‌বে না। সাবধান হোতে না হোতে একগাছা লাঠি পেছন থেকে ধাঁ কোরে আমার বাঁ কাঁধে এসে পড়্‌ল। বাল্যকাল থেকে লাঠির সঙ্গে সম্পর্কটা আমার খুব ঘনিষ্ঠ হোলেও সেদিন সে আমায় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পথ যত সহজে চিনিয়ে দিলে এমন আর কোনো দিন দেয়-নি। কোনো চিন্তা না কোরে চিম্‌টে ঘোরাতে-ঘোরাতে সামনের দরজা দিয়ে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়্‌লুম। দু চারজন লোক তেড়ে এসেছিল কিন্তু ইতিমধ্যে চিমটের তামাচায় একজন ধরাশায়ী হোতেই তারা দাঁড়িয়ে গেল। তারপরে আঁদাড়, পাঁদাড়, পগার ডোবা পেরিয়ে, কাঁটানটে শেয়াল কাঁটা, বাবলা কাঁটায় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত কোরে নিরাপদস্থানে গিয়ে আত্মরক্ষা করা গেল।

তারপরে প্রায় দশবারো দিন পদব্রজে ঘুরে-ঘুরে শহরে ফিরে এলুম। পূর্ব্বজন্মের প্রিয়ার বরাতে নেহাৎ দ্বিতীয়বার বৈধব্যযোগ ছিল না তাই কোনোরকমে প্রাণটা নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলুম।

আড্ডায় ফিরে আসতেই সবাই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—আরে এস এস—কোথায় ছিলে এতকাল ?

গম্ভীরভাবে বল্লুম—বোম্বাই ঘুরে আসা গেল। পাশ পেয়েছিলুম কিনা—।

আবার একদিন নির্জ্জন পেয়ে হরিদাসকে সব কথা খুলে বল্লুম। সে বল্লে সর্ব্বনাশ! করেছিলে কি! এখন তোমার রন্ধ্রে গত শনি, এখন এ সব করতে আছে।

সে বল্লে পণ্ডিত কোথায় ?

আমি বল্লুম—সে বেচারীর সেই থেকে আর দেখা পাই নি। আমার জন্য সে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। টাকাও পেলে না কষ্টেরও একশেষ।

হরিদাস হেসে বল্লে—ক্ষেপেছ তুমি! সে নিশ্চয় তার চার আনা অংশ আদায় কোরে নিয়ে গেছে, পণ্ডিতে আর মূর্খে তফাৎ ঐখানে।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

চর্‌কা

সহসা নিশীথ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া আমার
স্তব্ধতার রন্ধ্র ভেদি' ঘর্ঘর নিনাদ
পশিল শ্রবণে। মুক্ত প্রাঙ্গন মাঝার
দাঁড়াইনু আসি। নেত্র-পথে অকস্মাৎ
কি অপূর্ব্ব দৃশ্য-পট পড়িল অমনি!—
গগনের দুগ্ধ-শুভ্র দূর ছায়ালোকে
শুভ্র-বাসা জ্যোতির্ম্ময়ী কে ওই রমণী
ঘুরায় কিরণ-চক্র কৌমুদী-আলোকে
রজত-মৃণাল জিনি' সূক্ষ্ম তন্তুদাম
অঙ্গুলি পরশে মরি করিছে রচন!
তুলিছে ঘর্ঘর রব চক্র অবিরাম,
স্মিততার ওষ্ঠ-পুটে মধুর গুঞ্জন
মৃদু মৃদু।—স্বাধীনতা আত্ম-নিমগনা
ভারতের ভাগ্য-সূত্র করে কি রচনা ?

কুমারী-কঙ্কণ

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ে (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়) একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে। এই আখ্যায়িকা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের নবম অধ্যায়েও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কুম্ভকার জাতকে (জাতক সংখ্যা ৪০৮) এই গল্পের উল্লেখ আছে।

মহাভারতের আখ্যায়িকা এইরূপ। "একদা এক কুমারী প্রচ্ছন্নভাবে কতকগুলি অতিথিরে ভোজন করাইবার বাসনায় উদূখল মুষল দ্বারা তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সমুদায় বারংবার শব্দায়মান হইতে লাগিল। তখন সে, অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই মহা কলহ উপস্থিত হয় এই বিবেচনায় ক্রমে ক্রমে শঙ্খ চূর্ণ করিয়া একমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। অতএব একাকী বিচরণ করিলে কাহারও সহিত বিবাদ হইবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই।"

ভাগবতে গল্প আর একটু বিস্তারিত। "কোন সময়ে কতকগুলি ব্যক্তি কোন এক কুমারীকে বরণ করিবার নিমিত্ত তাহার গৃহে উপস্থিত হয়; তৎকালে তাহার বন্ধুজন স্থান বিশেষে গমন করিয়াছিল, সেই জন্য কুমারী নিজেই তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিল। হে মহীপতে! কুমারী তাহাদিগের আহারের নিমিত্ত নির্জ্জনে শালি ধান্য কুটিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই কুমারীর প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সকলের অতি শব্দ হইতে লাগিল। সে তাহাকে লজ্জাজনক বোধ করতঃ এক এক করিয়া শঙ্খ সকল ভগ্ন করিল, দুই দুই গাছি করিয়া এক এক হস্তে অবশিষ্ট রাখিল। তথাপি আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শঙ্খদ্বয়ের শব্দ হইতে লাগিল। তাহা হইতেও এক একগাছি ভগ্ন করিল; একগাছি হইতে আর শব্দ হইল না। হে অরিন্দম! লোকতত্ত্ব জানিবার অভিলাষে এই সকল লোকে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই কুমারী হইতে এই উপদেশ শিক্ষা করিয়াছি,— বহু জনের একত্র বাস, বা দুইজনের একত্র বাসও কলহের কারণ হইয়া থাকে; অতএব কুমারী-কঙ্কণের ন্যায় একাকীই বাস করিবে।

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি।
এক এব চরেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণঃ॥"

বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থেও এই আখ্যায়িকা প্রায় এই আকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এখন, প্রশ্ন এই যে এই সামান্য ঘটনায় কি এমন বিশেষত্ব আছে যাহার কারণে ইহা আর্য্য মহাকাব্যে ও পুরাণে দুইবার এবং তৃতীয়বার বুদ্ধদেবের জাতিস্মরত্ব প্রতিপাদক বৌদ্ধ উপাখ্যানমালায় উল্লিখিত হইয়াছে? ভাগবত হইতে যে শ্লোক উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে শ্রীধর স্বামী কৃত তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। চিত্তৈকাগ্রতা দ্বৈতাস্ফূর্ত্তিলক্ষণ সমাধিহেতুরিতি শরকারাৎ শিক্ষিতমিত্যাহ মন ইতি। তত্রোপায়মাহজিতেতি।

আসনজয়ে শ্বাসজয়স্তস্য চ জয়ে শ্বাসাধীনং মনো নিশ্চলং ভবতি। নমুক্ষনং নিশ্চলং সদপি মনো বিষয়বাসনয়া যদি বিক্ষিপ্যেত সুষুপ্তাবিব সর্ব্বথা লীয়েত বা তদা কিং তত্রাহ বৈরাগ্যেত্যাতি। বৈরাগ্যেণাবিক্ষিপ্যমানম্ অভ্যাসযোগেন লক্ষ্যে ধ্রিয়মাণম্ স্থিরীক্রিয়মানম্।" শ্লোকের অর্থ—"জিতাসন ও জিতশ্বাস হইয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য ও অভ্যাসযোগ দ্বারা মনকে এক বিষয়ে সংযুক্ত করিয়া রাখিবে।" অর্থাৎ কুমারী কঙ্কণ কাহিনীর গূঢ়ার্থ আধ্যাত্মিক।

এই উপাখ্যানে বিচিত্র বা অলৌকিক ঘটনা কিছুই নাই। ইহা হইতে পুরাকালের সমাজের অবস্থা কিছু জানিতে পারা যায়। বিবাহের জন্য যেমন কন্যা দেখিবার প্রথা ইহা সেইরূপ ঘটনা। তখন পরদা ছিল না, আর্য্য কুমারী অথবা বিবাহিতা মহিলাগণ পরদায় থাকিতেন না। পরদা মুসলমানী প্রথা, দক্ষিণ ভারতে মুসলমানেরা প্রবল হইতে পারেন নাই, দক্ষিণ ভারতে হিন্দুসমাজে এখনও পরদা নাই। কন্যা ঘরে একাকিনী, অগত্যা আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনা তাহাকেই করিতে হইল। অতিথিদিগকে ভোজন করাইতে হইবে, হাটবাজার প্রচুর ছিল না, ঘরের ধান ভানিয়া তাহারই অন্ন প্রস্তুত করিতে হইবে। ধান ভানিবার সময় উদূখলে মূষল আঘাতের শব্দ ত আছেই, তাহার উপর হাতের শাঁখা ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতে লাগিল। ধান ভানিবার শব্দ নিবারণ করিবার উপায় নাই, কিন্তু শাঁখা খুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে আর শব্দ হইবে না। কুমারী শাঁখা খুলিয়া না রাখিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল কেন? কারণ ব্যস্ততা ও বিরক্তি। যত শীঘ্র সম্ভব আহার প্রস্তুত করিতে হইবে, শাঁখা খুলিতে সময় লাগে, ভাঙ্গিতে কালবিলম্ব হয় না।

ইহার পূর্ব্বে আর কখনও কুমারীর মনের ভাব এরূপ হয় নাই। ধান আগেও ভানিত, হাতের শাঁখারও শব্দ হইত, কিন্তু তাহাতে কুমারীর মনের কোনরূপ বিকার হইত না। এখন তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। যাঁহারা তাহাকে বরণ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন তাঁহারা তাহার অবিশ্রাম করকঙ্কণ শব্দ শুনিয়া কি মনে করিবেন? লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়া কুমারী হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিন্তু অনেকগুলি ভাঙ্গিতে তাহার মায়া হইতে লাগিল। অবশেষে প্রত্যেক হস্তে দুই দুই গাছি শাঁখা রহিল, কিন্তু তাহাতেও কঙ্কণশব্দ একেবারে রহিত হইল না। আরও একগাছি ভাঙ্গিয়া যখন একটীমাত্র কঙ্কণ অবশিষ্ট রহিল তখন কঙ্কণের শব্দ থামিয়া গেল, কুমারী নিশ্চিন্ত অবিক্ষিপ্ত চিত্তে ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করিল।

"বাসে বহূনাং কলহো ভবেৎ"—এ কথার তাৎপর্য্য কি? কঙ্কণের ঝনৎকার কলহধ্বনির অনুরূপ। মুখে মুখে অথবা অঙ্গে অঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাত কলহের লক্ষণ। অলঙ্কারের মুখরিত শব্দও শান্তিভঙ্গের সূচনা, অতএব কলহের নিদর্শন। কিন্তু এস্থলে কলহের উল্লেখ কেন?

কলহ শব্দে এই শ্লোকে ঝগড়া মারামারি বুঝায় না, মানসিক বিক্ষেপ, চিত্তের চঞ্চলতা বুঝিতে হইবে। কঙ্কণের শব্দে কুমারীর চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছিল, যে কর্ম্ম করিতেছিল তাহাতে ব্যাঘাত হইতেছিল। কলহ তাহার কাযের ও মনের সহিত। "শঙ্খাঃ স্বনং মহৎ"— শঙ্খসমূহের অতি শব্দে কুমারী "মহতী ব্রীড়িতা," অতিশয় লজ্জিতা হইল—শঙ্খধ্বনি ও ও কুমারীর মনের সংঘর্ষই এস্থলে কলহ। এরূপ কলহ পরিত্যাগ করিতে হইলে একা থাকিবে, অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে একমাত্র কঙ্কণ ধারণ করিবে।

আখ্যায়িকার মুখ্য অর্থ আধ্যাত্মিক, ভাগবতকার পরের কয়েকটী শ্লোকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আর একটী উদ্ধৃত করিতেছি।—

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো
ন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্ত—
মিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে॥

"যেমন বাণে নিবিষ্টচিত্ত বাণনির্ম্মাতা ব্যক্তি পার্শ্বে গমনকারী রাজাকে জানিতে পারে না, সেইরূপ চিত্তকে অবরুদ্ধ করিলে, তখন বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কিছুই জানিবে না।" সকল কার্য্যই একপ্রকার সাধনা, একাগ্রচিত্ত হইয়া করিতে হইবে। চিত্তবিক্ষেপ হইলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। যাহাতে সাধনার ব্যাঘাত জন্মে অথবা চিত্তের চঞ্চলতা উৎপাদন করে তাহাকে ত্যাগ করিবে। ধান ভানা হইতে শিবের গীত পর্য্যন্ত সমস্তই সাধনাসাপেক্ষ। ধান ভানিতে শিবের গীত আরম্ভ করিলে ধান ভানাও হয় না, শিবের গীতও হয় না।

এই ছোট আখ্যায়িকায় গভীর নীতি নিহিত আছে এবং সেই কারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

স্মৃতির ব্যাকুলতা

—কালিদাস

দেখিয়া সুন্দর দৃশ্য সুর শুনি সুমধুর,
সুখে আছে, তবু প্রাণ কি আবেগে ভরপুর ;
আপনার অজানিতে স্মরণেতে জাগে বা তা'
পূর্ব্ব জনমের প্রেম, হৃদয়ে যা আছে গাঁথা।

শ্রীগণেশচরন বসু

মধু-মঙ্গল

পৌরোহিত্য-শাসনের দৃঢ়-বন্ধন-রজ্জুতে লোকাচারের গাঁট পড়িয়া পড়িয়া যে সময়ে বঙ্গের হিন্দুসমাজের অঙ্গ অসাড়প্রায় হইয়া গিয়াছিল সেই সময়ে ইংরাজী সাহিত্যের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্যভাবের প্রথম ধাক্কা আসিয়া এই দেশবাসী সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকগণের অন্তর একটা মুক্তির কাতর কম্পনে ধড়ফড়াইয়া দিয়াছিল।

দৈবশক্তিসম্পন্ন সেক্সপীয়ারের লেখার মধ্যে এলিজাবেথীয় যুগের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ, মিল্টনের মহতী কল্পনার মধ্যে ক্রমওয়েল কালের উন্মুক্ত উদ্দীপনা, রোমের পোপের প্রতাপ-বিজয়ী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ প্রভুত্বের শক্তি আর ফরাসী-বিপ্লবের রক্তবর্ণ জ্বালাময়ী জ্যোতিঃ ইংরাজী সাহিত্যের আদিত্যকে প্রাচ্য মধ্যাহ্নের তাপে তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে; সুতরাং য়ুরোপীয় ভাবের প্রভা তখন নবদীক্ষিত ছাত্রবৃন্দের অন্ধকার অন্তরে দীপমাত্র প্রজ্জ্বলিত না করিয়া অনেকস্থলে যেন শুষ্ক পর্ণে অগ্নিসংযোগ করিল।

মধুসূদন দত্ত ঐ ছাত্রদলের মধ্যে একজন গণনীয় অগ্রণী। সীমাশূন্য উচ্চাভিলাষ, আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভের অদম্য তৃষ্ণা, অপরিমেয় মূল্যে নিজের অন্তর্নিহিত প্রতিভাশক্তির পণনির্দ্ধারণ, গগনস্পর্শী উচ্চচূড়াযুক্ত যশমন্দির নির্ম্মাণের ইচ্ছা, পূর্ব্বগামী বা পারিপার্শ্বিক বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে অর্দ্ধ হস্তপরিমিত দৈর্ঘ্যে দণ্ডায়মান হইবার কল্পনা এবং ভোগবিলাসের অকূল ক্ষীরসাগরে সন্তরণের অভিলাষ বোধ হয় মধুসূদনের মনে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্জাত হয়। এর সকলগুলিই গুণ; সকলের পক্ষে নয়, তবে প্রতিভার আধারকে কার্য্যকরী করার জন্য এই সকল গুণের প্রয়োজন। কিন্তু অতি উপসর্গ যোগে গুণও নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া যায়।

মদিরা (Wine) মানব মনকে শক্তিবিশিষ্ট উদ্দীপ্ত ও প্রফুল্ল করে; কিন্তু সুরা (Spirit) বিষ, ইহা মত্ততায় উন্মাদ করে, জ্ঞানহারাও করে।

সারস্বত ব্রত-পালনে পৃথিবী পবিত্র করিবার জন্য মধুসূদনের ব্যোমচারী প্রতিভা নরদেহ-ধারণে ধরণীতলে ভূচররূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, কাজেই সুরার মাত্রা অধিক হইয়া কেবল যে তাঁহার পা টলাইয়াছে তাহা নহে মধ্যে মধ্যে সংসার-পথপার্শ্বস্থ পয়ঃপ্রণালীতেও তাঁহার দৈহিক সত্তাকে পাতিত করিয়াছে।

সেকালে ছিল এবং একালেও আছে অনেকের ধারণা যে ইংরাজ না হইলে সারস্বতকার্য্যে, সামাজিক কার্য্যে, স্বদেশের কার্য্যে, স্বরাজের কার্য্যে প্রভৃতি কোন উচ্চকার্য্যে সম্পূর্ণ সাফল্য প্রদান করা যায় না, তবে অধুনা অনেকেই কলেবর বিবর্ত্তনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বুঝিয়া বিলাতী মনকে দেশীয় আবরণে আবৃত করিয়া, বিপণীগ্রাহ্য করিয়া লয়েন; এই যেমন জার্ম্মাণ

সিন্‌থেটিক্ এসেন্স বকুল জুঁই-চাঁপা পুষ্পসারাদিভাবে অনেকের স্বদেশী আশা মেটায় বা বাঙ্‌লা নামে বাঙ্‌লা কথায় বাঙ্‌লা অক্ষরে পশ্চিমে প্রেম মধুমুখীদের সুখপাঠ্য হয়।

প্রথমে মধুসূদনের মনের বাসনা ছিল তিনি জগতে যশের ধ্বজা প্রোথিত করিবেন য়ুরোপীয় বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া, ইংরাজী ভাষায় কাব্য লিখিয়া। ইংলণ্ড তাঁহাতে দ্বিতীয় মিল্টন দেখিবে; গ্রীক পুরাণের পরিবর্ত্তে হিন্দুর পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক গাথা ইংরাজী গীতে ধ্বনিত শুনিয়া পাশ্চাত্য জগৎ বাঙ্‌লার মধুসূদনকে হোরেস্ ভার্জ্জিল ওভিড্ প্রভৃতি দ্বিতীয় অবতার মনে করিবে।

চর্ম্মান্তর গ্রহণে অক্ষম হইয়া মধুসূদন প্রথম যৌবনে কেবল যে ধর্ম্মান্তরমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, সুন্দরবনের চক্রসঞ্চিত মধুতে পাছে আভিজাত্যের সৌরভ না পায় এই ভয়ে নামান্তর গ্রহণ করিয়া মাইকেল হইয়াছিলেন।

সময় কাল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া সেই মহত্ত্ববিশিষ্ট দত্ত কুলোদ্ভবকে এ বিষয়ে কিছুমাত্র দোষ দেওয়া যায় না। সুপাঠ্য বাঙলা গদ্যের তখন বোধ হয় সৃষ্টিই হয় নাই; কাশীদাস কৃত্তিবাস ও বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অতি অল্পই প্রচলিত ছিল আর বাঙলার বালক বালিকা শৈশবে তাহার যা কিছু পিতামহ পিতামহী মাতা প্রভৃতির মুখে আবৃত্তি বা কাহিনীতে শুনিতে পাইত; পদের মাধুর্য্যে শৈশব মন মোহিত হইলেও ভাবগুলি পূজ্যমাত্র বলিয়াই গ্রাহ্য করিতে শিক্ষিত হইত। পাছে নিজেদের বিদ্যা ধরা পড়ে বা প্রভুত্ব লাঘব হইয়া যায় এই আশঙ্কায় পণ্ডিতাখ্যাধারী জেঠামশাই প্রদত্ত উপাধিগ্রস্ত তর্কালঙ্কারেরা তখন সংস্কৃতের দ্বারপথে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ লিখিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং যে মধু পরিণত বয়সেও "টঁ্যাক্‌চাঁদের আলালের" ভাষাকে মেছোর ভাষা বলিয়াছিলেন সেই প্রাংশুশাখা বিলম্বিত ফললোভী অতিকায় মধুসূদন যে খঞ্জনী গোপীযন্ত্র হইতে আপনার দীপক রাগের সুর বাঁধিয়া লইবে এমন আশা সেই দিনে সেই স্থানে সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া কখনই করিতে পারা যাইত না।

স্পষ্ট বোঝা যায় যে আত্মপ্রেমের ঔজ্জ্বল্যাতিশয্যের মধ্যেও তাঁহার হৃদয় মন্দিরে স্বদেশ প্রেমের ও স্বজাতি প্রেমের মঙ্গল মৃৎপ্রদীপ শিখাবিশিষ্ট ছিল; তবে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে সেই প্রদীপের মৃত্তিকাকে কাঞ্চনে পরিণত ও ক্ষীণ দীপ্তিতে বিজলীর প্রভা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে একমাত্র য়ুরোপ হইতে।

এ নেশার ভুলটুকু কাটিতে কিন্তু মধুসূধনের বেশী বিলম্ব হয় নাই; আর বোধ হয় সংস্কৃতের হিমালয়নিঃসৃত প্রস্রবণের তলায় মাথা পাতার পরেই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বুঝিতে পারেন যে তাঁহার দেশের মাটিতেই হিরণ্য আছে, দেশের আকাশেই বিজলী আছে।

আমার বিশ্বাস যিনি সংস্কৃতের সহিত পরিচিত নহেন, সংস্কৃত ভাষার ভাব প্রবণ

াালিত্যোজ্জ্বল উদ্দীপনা যাঁহার প্রাণে ভক্তি শ্রদ্ধা আদর আকর্ষণ করে নাই, সংস্কৃত কাব্য াটক দর্শনাদির ভিতর দিয়া যিনি ভারতবর্ষকে দর্শন করেন নাই, তিনি স্বদেশীই হউন্ আর বিদেশীই হউন্ ভারতবর্ষকে যথার্থ গৌরবের চক্ষে সম্মানের চক্ষে দেখিতে সক্ষম হইবেন না।

শকুন্তলাপাঠে মোহিত সংস্কৃতানুরাগী সার উইলিয়াম্ জোন্সের গ্রন্থাদি প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে য়ুরোপীয় লেখকগণের অভিধানে ভারতের হিন্দুজাতি "জেন্টু" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

নেশা কাটিতেই মধুসূদনের গর্ব্বিত মন আস্ফালনের স্বরে বলিয়া উঠিল "কি লজ্জা, কি ঘৃণা, রাজরাজেন্দ্রাণীর পুত্র আমি—আমি কিনা পরের দ্বারে ভিখারী সাজিয়া লালায়িত হস্ত প্রসারিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। হায়! হায়!

পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি,
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি।"

পরাজিতের এরূপ সতেজ উক্তি কাব্যজগতে বড় অধিক দেখা যায় না। বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস ভবভূতি শ্রীহর্ষ প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন কবিগণকে বরেণ্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া বঙ্গের মধুসূদন তখন ধন্য হইলেন। মাইকেলের সময় ও পরে অনেক স্বদেশপ্রেমী কবিবরের আবির্ভাব এই বঙ্গদেশে হইয়াছে কিন্তু কয়জন তাঁহার মত জয়দেব, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গকবিগণের গৌরবগান পুলকিতকণ্ঠে গাহিয়াছেন? খৃষ্টান মাইকেলের চক্ষে যে বিজয়া দশমীর অশ্রুজল ঝরিয়াছে তাহার এক বিন্দুও আজকাল অল্প হিন্দুকবির চক্ষে দেখিতে পাই। শিক্ষিত বঙ্গের যে যুগ কৃষ্ণযাত্রার অধিকারীগণের একমাত্র পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া অনুভূত হইত সেই যুগেই খৃষ্টানের আকুল তৃষ্ণা রাধিকার স্বরে গাহিয়া ফেলিয়াছিল ;—

নাচিছে কদম্বমূলে		বাজায়ে মুরলী রে,
রাধিকা-রমণ।
চল, সখি! ত্বরা করি,		দেখিগে প্রাণের হরি,
গোকুল-রতন।

*	*	*	*	*

হায় রে, কোথায় আজি শ্যাম-জলধর,
তব প্রিয়-সৌদামিনী,	কাঁদে, নাথ! একাকিনী
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধা-মনোহর?

রত্নচূড়া শিরে পরি, এস বিশ্ব আলো করি,
কনক-উদয়াচলে যথা দিনকর।

আবার ভবভূতির ন্যায় দম্ভের উচ্ছ্বাসে যিনি লিখিয়াছেন ;—

রচিব সে মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

সেই লেখনী যেন দীনকবি ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যুতে মাটিতে লুটাইয়া লিখিয়াছিল ;—

দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য ? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে ?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্যব্রজ-ধামে
জীবে তুমি ;

একেই বলে স্বদেশ প্রীতি স্বদেশ ভক্তি স্বদেশের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা।

সদ্য প্রজ্জ্বলিত ইংরাজী উন্নয়নে বাঙ্গালী জীবনের যখন প্রথম পাক চড়িয়াছে সে সময়ে মধুসূদনের সাহিত্য-লীলা আরম্ভ হইলেও তখন পর্য্যন্ত ন্যাশানালিটি কথা এদে আমদানী হয় নাই কাজেই অনুবাদিতও হয় নাই। তথাপি তাঁহার অমর পদাবলীর মধে জাতিপ্রেমের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। জাতির পার্ব্বণ, জাতির উৎস জাতির স্মরণীয় নাম, জাতির বরণীয় ধাম, সূতিকাগারের স্মৃতি, কপোতাক্ষীর প্রীতি তাঁহা বার বার উল্লসিত উচ্ছ্বসিত বিষাদিত পুলকিত করিয়াছে।

হায়! মধুসূদন মাত্রাধিক্যে তোমার প্রকৃতিগত ত্রুটিগুলির যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত তু আপনার নানাভারাক্রান্ত জীবনে করিয়া গিয়াছ আর সমস্ত দেশবাসিগণকে বংশপরম্পরা অতুল আনন্দে ভোগ করিবার জন্য যে অক্ষয় ঐশ্বর্য্য দিয়া গিয়াছ কিরূপ দানসাগর শ্রাদ্ধে আয়োজনে সে প্রাচুর্য্যের পরিমাণ জগৎকে বুঝাইবে তাহা বঙ্গবাসী আজপর্য্যন্ত নির্ণ করিতে পারে নাই।*

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

* খিদিরপুরে মধুসূদনের স্মৃতি উৎসবে পঠিত।

স্মৃতি ও শক্তি

" অন্তর বজে তো যন্তর বজে " মনে বাজলো যে সুর যে রূপ তারি ছন্দ-ছাঁদ পেয়ে যন্ত্রীর যন্ত্র বাজলো, রাগ রাগিণীর রং ও রূপ ধরে। অহোরাত্র মনে রাখা অথবা না রাখার ক্রিয়া চলেছে আমাদের মধ্যে। এখানে একটা লাইব্রেরীতো আছে তার বইয়ের সংখ্যা কত কেবল লাইব্রেরিয়ান জানেন, হয়তো দপ্তরি সেও শুনে শুনে মুখস্ত করে নিয়েছে। এই-যেমন বইগুলোর সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় আর যেমন তাদের বিষয় নাম ইত্যাদি, তাদের রাখার স্থানের হিসেব ইত্যাদিরও মোটামুটি আন্দাজ সেই ভাবের পরিচয় নানা রূপের সঙ্গে মানুষ করে চলে সারা জীবন ধরে। কিছুর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ট ভাবে হল, কিম্বা ভাসা ভাসি হল, কিম্বা হয়েও হল না, এতে করে স্মৃতি রইলো মনে ধরা পরিষ্কার কি আবছায়া! কিম্বা জলের লেখার মতো অস্থায়িভাবে।

আনন্দের ব্যাপার, দুঃখের ব্যাপার, কাযের ব্যাপার এবং নানা বাজে ব্যাপার নিয়ে একরাশ স্মৃতি যেন নানা বিষয়ের বই একটা লাইব্রেরীতে। এরমধ্যে কতকগুলো ব্যাপার তারা বিজ্ঞাপন নোটিস দৈনিক ঘটনার খবরের সঙ্গে মনের একটা কোনে জমা হতে থাকলো, কতক তারা চিরকুট কাগজের মতো যেমন এল তেমনি গেল ধরা রইলো না মনের ফাইলে গাঁথা হয়ে। এমন লোক যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যারা খুব চেনা মানুষের ছবি দেখে মোটেই ধরতে পারে না ছবিটা কার। আঁকা ছবির কথা ছেড়ে দিই, ধর জগন্নাথের মন্দিরের একটা ফটোগ্রাফ, একজন যে শ্রীক্ষেত্র করে এসেছে তাকে ফটোখানা দেখাও, বুঝতেই পারবেনা সে দৃশ্যটা কোথাকার—সেটা যে একটা স্থানের চিত্র এ বিষয়টাও বোঝে না, একটা হেঁয়ালীর মতো ঠেকে তার কাছে চিত্র-মাত্রেই! গাছ দেখে যে বলতে পারে গাছ, সে গাছের ছবিকে দেখে গাছই যে বলবে এমন কথা নেই! ছবি দেখতে অভ্যস্ত নয় এমন চোখের পরীক্ষা ঘরের দাসী চাকর বেহারা এমন কি ভদ্রলোকেরও অনেককে নিয়ে করে দেখতে পারো। এইতো গেল সহজ দেখার বেলায়, তারপর নিরীক্ষণ করে দেখা, মন দিয়ে দেখা, ভালবেসে দেখা ইত্যাদি নানা রকম দেখার হিসেব আছে যা অনেকের কাছে একবারেই ধরা নেই!

এই যে সেনেট হাউসে এলেম, কিন্তু আসার পথে কি দেখলেম—কি কি ঘটনা, কোন কোন মুখ, তা কার মনে আছে—হয়তো একজন বন্ধু গেছে পাশ দিয়ে তারি একটুখানি, নয়তো কেউ মটর চাপা পড়ছিল তার একটু, কিম্বা একটা বরাত্ চলছিল তারই ঝকমক্ ঝম্ঝম্ এমনি খানিক—সেগুলো জোর করে মনের মধ্যে এল, তাদেরই একটু ছাপ রইলো মানসপটে, তার বেশি একটুও নয়।

কাল কি দিয়ে ভাত খেয়েছি মনে পড়ে, কিন্তু পরশুর কথা মুছে যায় মন থেকে যদি না

সে দিন একটা বিশেষ রকম ভোজ খেয়ে থাকি। বড় ভোজের সন্দেশ কেমন, দই কেমন, রান্না কেমন, কে কে খেতে বসলেন, কি কি কথা হল তার অনেক খানিই মনে রইলো!

চোখ নিরীক্ষণ করে দেখলে একটা কিছু তার আকার প্রকার ধরা রইলো মনে, চোখের সঙ্গে মনও দেখলে—না হলে দেখাই হল না—চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেল রূপটি! মন দিলে অভিনিবিষ্ট হল মানুষ কিছুতে ধারণা হল তবে সম্পূর্ণ রূপে পদার্থটির বা বিষয়টির।

অনেকবার একে দেখার ফলে মানুষ না দেখে তাকে আঁকতে, না বই খুলে তার কথা মুখস্থ বলতে, নির্ভুল করে নামতা তাড়াতাড়ি বলতে অঙ্ক এবং অঙ্কন করতে বেশ সক্ষম হয়ে উঠে। এই ভাবের রূপচর্চ্চায় রচনা করার মাল মসলা যথেষ্ট দখল হয়, কিন্তু রচনাশক্তি পাওয়া হয় একথা বলা চলে না। অদ্ভুত শক্তিবলে বেদ বেদান্ত ইতিহাস পুরাণ সবই একজন না হয় মুখস্থ রাখলে, কিন্তু সেইটুকু হলেই কথক হয় না তো কেউ, কবি হয় না তো কেউ! মুখস্থ বিদ্যে কণ্ঠস্থ সরস্বতী নিয়ে অনেকখানি বিস্ময়কর ব্যাপার করে দেখানো যায়, একভাবের দক্ষতাও প্রকাশ করা হয়, কিন্তু প্রবন্ধ করে কিছু বলা, ছন্দে বন্ধে বলা লেখা এ সবের দক্ষতা অন্য পথে লাভ করে মানুষে। মনঃকল্পিত যা কিছু তার প্রকাশ মুখ্যতঃ মানুষের কল্পনা ও স্মৃতি শক্তির উপরে নির্ভর করে। একে ঘিরে ঘিরে স্মৃতি ঘোরে ফেরে, কল্পনা অনেককে ধরে ধরে উধাও হয়ে চলে। একের স্মৃতি কল্পনার শতদলে ধরা—এই হল রূপদক্ষের রূপ কর্ম্মের উদ্দেশ্য।

ফটোগ্রাফ যন্ত্র তার তো কোনো কিছু কল্পনা করার শক্তি নেই, সে শুধু আকার মাত্র পুনরুক্তি করে চলে হাজার দুহাজারবার—যে ভাবে নামতা বলে ছেলে! আর কবি যখন তার মনের একটি কিছুর কথা বলছেন তখন নানা কল্পনা নানা জল্পনা নানা বর্ণনা ধরে ধরে ফুটছে সেখানে মনে-ধরা স্মৃতি। রূপদক্ষ মাত্রেরই মধ্যে প্রখর স্মরণশক্তি কায করছে দেখা যায়— 'The great writer is one who has profusion of words at his command, together with a great stock of observation" এখন একটা কথা হচ্ছে এই যে স্মৃতির ভাণ্ডারে না হয় নানা জিনিষ সংগ্রহই হল, কিন্তু সে গুলো কি ভাবে কাযে খাটানো গেল তারি উপরে সমস্তটা নির্ভর করছে।

জমা টাকা অনেক রইলো কিন্তু ভোগে এলনা মানুষটির - এমন ঘটনা বিরল নয়, কিম্বা জমা টাকা অপচয় হয়ে পাঁচ ভূতের পেট ভরালে, এও হয়! এইখানে রূপদক্ষের দক্ষতার কথা ওঠে-কথা বেছে বেছে নেবার ভাব বেছে নেবার। এইজন্যে অলঙ্কার শাস্ত্রে শক্তির কথা বলেই নিপুণতার কথা বল্লেন পণ্ডিতেরা—শক্তি, নিপুণতা, অবেক্ষণ, শিক্ষা, অভ্যাস, এমনি পরে পরে বলা হল।

একটা শক্তি যা রূপ-রচনার বিশেষ সহায় হয় তা হচ্ছে এই অভ্যাস। চলার অভ্যাস যার আছে সে সহজ সচ্ছন্দ গতি পেলে, লেখার অভ্যাস যার আছে, ছবি লেখার মূর্ত্তি কাটার

নানা কৌশল যার অভ্যাস সে রচনা সহজে নিষ্পন্ন করলে। হাত পা সব থাক্‌তেও অচল থাকি শুধু চলার অভ্যাস নেই বলেই। অক্লান্তভাবে নানা শক্তি একটা ছবি কি একটা কবিতার রচনার বেলায় প্রয়োগ করতে হয় রূপদক্ষকে, এর সব শক্তি গুলোই বহু সাধনা-সাপেক্ষ, কিন্তু এমন আস্তে আস্তে নিজের অজ্ঞাতে রূপদক্ষ মানুষ এই সব শক্তি অর্জ্জন ও প্রয়োগ করে চলেন যে রচনা যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে ওঠে। কষ্টকল্পিত রচনা এবং সহজ রচনা দুটো পাশাপাশি রাখলেই কোনখানে রচয়িতা নিজের শক্তি প্রয়োগ বিষয়ে বেশ একটু সজাগ এবং কোনখানে তিনি একেবারেই তা নয়, এটা ধরা পড়ে। ইঞ্জিন যখন চলে তখন শক্তি বিষয়ে সজাগ একটা দৈত্যের মত চলে—আর নৌকো যখন চলে পাল ভরে, বাতাসের প্রচণ্ড শক্তিকে ধরে চলে সে, কিন্তু দেখে মনে হয়, যেন স্রোতের উপর আপনার সবখানি এলিয়ে দিয়ে ভেসে চলেছে। ঝড়ের বাতাস জান্‌লা দরজায় ঝাঁকানি দিয়ে বলে শক্তি কাকে বলে দেখ। দক্ষিণ বাতাস দিকে দিকে ফুল পাতার মধ্যে এমন গোপনে নিজের দিগ্বিজয়ের ইতিহাস ধরে যায় যে সকালে উঠে দেখি ফুল যেন আপনি ফুটে উঠলো আপনার কথা বলতে, পাতা সব সবুজ হয়ে উঠলো আপনা আপনি। অথচ কি প্রচণ্ড শক্তির প্রেরণা বসন্ত ঋতুর মধ্যে দিয়ে পৌঁছয় গাছের শিকড় থেকে গাছের আগার ফুলের কুঁড়ির প্রতি পাপ্‌ড়িতে,- তার একটু আভাস পাওয়া যায় বায়স্কোপের ফুল ফোটার নানা ব্যাপার লক্ষ্য করলে। আমরা শুধু চোখে ফুল ফোটার সবটা তো দেখতে পাইনে, ধরতেও পারিনে যে, একটা ফুলের পাপ্‌ড়ি কেমন করে বিকাশ-শক্তির তাড়নায় আলোর দিকে বন্ধ চোখ মেলছে, কিন্তু একটা কল প্রচণ্ড শক্তির সমস্ত ঘুর্ণন বিঘুর্ণন নিয়ে মূর্ত্তিমান করে ধরে যখন ব্যাপারটা আমাদের চোখে, তখন ফুলের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব সেখানে দেখিনা, কেবল ফুলটির বিস্ময়কর বিপুল শক্তির গতিবিধি লক্ষ্য করে অবাক হয়ে থাকি। মানুষের রচনাতেও এই শ্রেণীর কাযের ধারা লক্ষ্য করা যায়।

কবিতা সঙ্গীত ছবি যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত নয়, কিন্তু যন্ত্র-শক্তির পরিচয় দিয়েই বিস্ময় জন্মায়, তাতে করে মন অভিভূত হল। কালোয়াতের গানে প্রায়ই এই যন্ত্রশক্তির ব্যাপার সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং গীতটা মাধুর্য্য হারিয়ে বসে খানিক শোনার পরেই, অনেক ছবি অনেক কবিতাও দেখি যার বাঁধুনি চমৎকৃত করে, কিন্তু মন টানেনা। এই তাক্ বনিয়ে দেওয়া শক্তির কায, স্মৃতির নয়। স্মৃতিসভায় গেলেই দেখা যায়, কেউ কবিতা কেউ বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের তাক্ বনিয়ে চলে গেল, আবার একজন হয়তো মানুষটির স্মৃতি পরিষ্কার করে মনোহর করে দু কথায় ধরে দিয়ে গেল মনে। যার সঙ্গে যার স্মৃতি তার সঙ্গে সেই স্মৃতিটুকু মধুর করে নানা কথায় নানা ভাবে ফলিয়ে মনে ধরানোর কৌশলও শক্তি ধরা।

মানুষের সব রচনাকে মোটামুটি দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা চলে; একটা হল শক্তিমন্ত আর একটা হল শ্রীমন্ত রচনা। শক্তিমন্ত রচনা তারও অবশ্য শ্রীআছে এবং শ্রীমন্ত রচনা

তারও মধ্যে শক্তি যে নেই তা নয়—যেমন রূপবান এবং রূপসী বলতে ভিন্ন বুঝি, তেমনি এখানে শক্তিমন্ত রচনায় একটা পরুষভাব আর শ্রীমন্ত রচনায় একটা সুকুমার ভাব লক্ষ্য হয় বলেই ছুটো আলাদা ঠেকে।

মানুষ যখন তার বাহিরের কোনো শক্তিকে বাধা দিতে চেয়ে, কিম্বা নিজেরই গঠনশক্তি ধীশক্তি ইত্যাদির পরিচয় দিতে চেয়ে, রচনা করলে কিছু, তখন সেই কায শক্তির পরিচয় না দিয়ে থাকতে পারে না; যেমন—চীনের প্রাচীর, ইজিপ্তের পিরামিড, একটা যুদ্ধ জাহাজ, একজোড়া গোরার বুট, এরা সব কেউ শক্ত, কেউ পোক্ত, মানুষের স্মৃতি-ক্ষেত্রের ফসল এরা নয়, এরা শক্তির শক্ত মাটি ও পাথরের সন্তান- যদি কোনো স্মৃতি এদের সঙ্গে জড়ানো থাকে তাও শক্তিমন্ত রূপের স্মৃতি। জগদ্দল পাথরের স্তূপের স্মৃতি শক্তকরে চাপা দিয়েছে ইজিপ্তের রাজারাণীর শ্রী ও স্মৃতির সৌন্দর্য্য, প্রকাণ্ড বিপুলকায় শক্ত চামড়া-মোড়া অজগর যেন কত কালের কোন একটা যক্ষের ধনভাণ্ডারের প্রহরী—এই তো হল চীনের প্রাচীরের শক্ত রূপ। যুদ্ধ জাহাজ সবাই দেখি আগাগোড়া শুধু ইস্পাত আর শক্তি দিয়ে সাজানো, বৃহৎ বিরাট শক্তির প্রাচুর্য্য এদের কল্পনায়! তাজবিবির কবর, মন্দিরের গোপুর ও প্রাচীর সেখানেও শক্তিমান শিল্পিরা কায করছে, কিন্তু সে কায তাদের মনে-ধরা নানা স্মৃতি দিয়ে গড়ে গেছে সুকুমার স্বপ্নমণ্ডিত করে। চীনের ফুলদানি—বড় কম শক্তির দরকার নয় সেটা গড়তে, কিন্তু ফুলের স্মৃতি, ফলের স্মৃতি ধরে শ্রীমণ্ডিত হল। একটি লোহার চিমটে—কোন একটা পাখির স্মৃতি ধরলে কে জানে; একখানি বাঁকা তলোয়ার—সে দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার মনোহরণ স্মৃতি-চিহ্ন ছাড়া আর কি! একটা লোহার বেড়ি—কিন্তু ফুলের ফাঁস কিব াহুপাশ বলে তাকে ভুল ক্বচিৎ হয়, হাতুড়ি সেখানে শক্তি শক্ত হয়ে বসেছে, শাবল আর ছুঁচ একটা সবল আর একটা সবলের স্মৃতির অবশেষ ঝিক্ ঝিক্ করছে শরতের জল ধারার প্রায়। ঝরণা পাথর ঠেলে চলে—এত শক্তি তার, কিন্তু সে আনে স্মৃতি—ফুলের মঞ্জরীর চাঁদের আলোর সাদা একখানি শাড়ির এমনি কতকির। স্মৃতির আবরু ঢাক্‌লে গঠন শক্তি—শক্ত করে বাঁধা কঙ্কালের কথা মনে রাখে না কেউ, রাখতে চায় ও না, কঙ্কাল ঢেকে যেটুকু স্মৃতির ঘোমটা তারি কথা মনে রাখলে সবাই! গ্রীক শিল্পের একটা বীরমূর্ত্তি আর একটা কুস্তিগিরের ফটো ছুটোর একটাকে কারিগর ভীমকান্ত রূপ দিলে অদ্ভুত কৌশলে আর ফটোগ্রাফ সে শক্তরূপটাই দেখিয়ে চুকলো! যেমন ভিতরের কঙ্কাল তেমনি বাইরের আকৃতির কঙ্কাল মাত্র পেলেম ফটোতে, ফটোযন্ত্রের স্মৃতি-শক্তি কল্পনা-শক্তি তো নেই যে ছবি দেবে! লাবণ্যের আবরণ পড়ছে শক্ত পাহাড়ের উপরে যেমন, সেইভাবেরই স্মৃতির আবরণ সৌকুমার্য্য দিচ্ছে দেখি মানুষের রূপ-রচনায় একেই বলেছেন শাস্ত্রকার নিপুণতা—শক্তি গোপনের নিপুণতা, রচনাটিকে শক্ত হয়ে না উঠতে দেওয়ার নিপুণতা!

চাঁদের যে মণ্ডল আর লোহার কলের চাক্কার যে মণ্ডল—এর মধ্যে একটা শক্ত, একটা সুকুমার। সকালের সূর্য্য আলোর সৌকুমার্য্যে ঢাকা দিলে আপনার তেজ ও শক্তির ইতিহাস, সকালে ফোটা সূর্য্যমুখী ফুল তাকেও এই হিসেব দিয়ে রচেছেন বিশ্বশিল্পী, কিন্তু একটা মোমের ফুলের রচনা শক্তি ধরে হল! কোর্টের পেয়াদা যখন সূর্য্যের মতো লাল গালার শিলমোহর ছেপে যায় বাড়ির দুয়োরে, সেটাকেও তো রূপ-সৃষ্টি বলে ভুল হয় না—সে আইনের নিছক শক্তিকেই প্রকাশ করতে থাকে রক্ত বর্ণ নিয়ে, কিন্তু একখানি সুন্দর করে গড়া তাম্রশাসন— সেখানে শাসন-শক্তি ঠেলে দেখা দেয় জিনিষটির সৌন্দর্য্য। একটা প্রাচীন মুদ্রা—সেখানেও এই হিসেব কাযের কথা ঢেকে দিতে সেখানে অনেকখানি কারিগরি। কিন্তু এই আজকের কালে আমাদের বাজারে চলতি যে এক-টাকার নোট আধুলী সিকি দোয়ানী, এদের তো রূপ-সৃষ্টির হিসেবেই গড়ন দেওয়া হয়, কিন্তু রাজশক্তির শিলমোহরের ছাপ পেয়ে এরা কাযের উপযুক্ত হল—বাজে ঠিক—কিন্তু বাজে কায ওর মধ্যে যতটা সম্ভব কম রইলো! পুরোনো টাকা দেখতে হল সুন্দর কিন্তু কতখানি বাজে সোনা তামা কায কর্ম্ম তার মধ্যে থাকলো তার ঠিক নেই, রাজশক্তির চেয়ে রাজ ঐশ্বর্য্যের শোভা সেখানে ধরা পড়লো অনেকখানি সোনায় রূপায়! একটা বুট জুতো—যে ছয়টা ব্যাপার নিয়ে চিত্রলেখা, মূর্ত্তিগড়া কবিতা লেখা, গান গাওয়া হয়—তার সব কয়টাই বুটের নির্ম্মাণে লাগলো—রূপ ভেদ প্রমাণ ভাব লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ কারিগরি নৈপুণ্য সবই প্রয়োগ হল ওখানে, এ সত্ত্বেও জিনিষটা সুকুমার রূপসৃষ্টির অন্তর্গত হল না—শক্তির পরিচয় ধরে শক্ত একটা কাযের জিনিষ হল, আর সেদিন ইজিপ্তের এক রাজার পায়ের দুপাটি চটি জুতোর ছবি দেখলেম—কারিগর কি সৌকুমার্য্য দিয়েই জুতোপাট গড়েছে—কত স্মৃতি তাতে ধরেছে, সুন্দর দুখানি পায়ের ভূষণ—কাযের জুতো নয়—ধূলা আর পায়ের মাঝে দুখানি লঘুভার যেন পদ্মের পাপড়ি, একটা কবিতা, একটা গানও বল্লে বলা যায়—জুতোপাটিকে! রূপ সৃষ্টির নিয়ম ধরে গড়া হল অথচ এই যে দুটো জুতো দুরকম ভাব জানালে, এই যে একটা কেল্লার প্রাচীর আর মন্দির বা রাজপ্রাসাদের গোপুর দুটো একই স্থাপত্যবিদ্যার বলে তৈরী হল, অথচ দিলে দুরকম রস মানুষের মনে এবং রূপও দেখালে দুরকম—এর রহস্য কোন্‌খানে! চীনের রাজার অর্থাভাব হয়েছিল সেই কারণে চীনের প্রাচীর তাজমহলের প্রাচীরটার মতো সুন্দর হল না, কঠোর শক্ত রূপ ধরে রইলো, অথবা চীনের কারিগর ভারতবর্ষের কারিগরের চেয়ে গেঁথে তুলতে কম ওস্তাদ ছিল বলে এমনটা হল—এ কথাই নয়—মানুষের ইচ্ছা কোন পথ ধরলে কায করার বেলায়, সে শক্তি দিয়ে আর একটা শক্তি-বেগ প্রতিহত করতে চাইলে, অথবা নিজের মনে-ধরা স্মৃতির মাধুরী দিয়ে পাষাণ গলাতে চাইলে—এই নিয়ে তফাৎ হল দুটো রচনায়। আগুন যখন আতস বাজিতে লাগালেম, তখন আকাশ থেকে আগুনের পুষ্পবৃষ্টি ঝরে পড়লো,

আবার যখন কামানের বারুদে আগুন দিলেম তখন একটা প্রাণঘাতী বিরাট শক্তির আবির্ভাব হল। আতসবাজি যে আবিষ্কার করেছিল, সে তার স্মৃতিকে আগুনের ফুল দিয়ে বরণ করবে এই তার মনে ছিল। আর যে কামান রচনা করলে, সে মনে রেখে ছিল দূরে থেকে বিরাট শক্তিকে অন্যের উপরে নিক্ষেপ করার শক্তির ভাবনা। মানুষের প্রতিভার প্রেরণায় তার যত কিছু শক্তি সমস্তই চালিত হয়ে এই দুই পথ ধরে শক্তিরূপ ও স্মৃতিরূপ পেয়ে চলেছে—ভাষা স্বর রংরেখা নাট্যভঙ্গি এমনি নানা উপাদানের সাহায্যে।

ছেলেদের মধ্যে দেখি একটা দুটো খেলুড়ি থাকে তারাই খেলার সর্দ্দার অন্য ছেলেরা তার দেখাদেখি খেলে! এই যে খেলুড়ে সর্দ্দার এ প্রতিভাবান, সারাদিন ধরে নানা খেলা কল্পনা করে চলে, খেলার নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে, এই রকম বয়স্কের মধ্যেও দুএকজন দেখা দেয় রচয়িতা লোক রূপ বিষয়ে এদেরই বলা যায় রূপ-দক্ষ, এরা কথা দিয়ে সুর দিয়ে রংরেখা ইত্যাদি দিয়ে রূপ ফোটায়, রচনার অপূর্ব্ব কৌশল সমস্ত আবিষ্কার করে চলে, নতুন নতুন সব রূপ সৃষ্টি নিয়ে যেন খেলে চলে।

ছেলেখেলায় থাকে ছেলেটির অফুরন্ত কল্পনা, নতুন নতুন সমস্ত খেলার রূপ সে রচনা করে চলে, কোন একটা পূর্ব্বেকার খেলার স্মৃতি ধরে, ছেলে যে খেলে চল্লো সব সময়ে তা নয়, অপরূপ সমস্ত ব্যাপার কল্পনার দ্বারায় মূর্ত্তিমান করে তুল্লে ছেলে। রূপদক্ষের মধ্যেও এই রকমের প্রবৃত্তি প্রবৃত্ত করায় তাকে নতুন নতুন সৃষ্টি করার দিকে। অসামান্য শক্তি পেয়ে রূপ দক্ষ সে রূপ-কল্পনায় দক্ষ হল, আর যে মানুষটি শুধু সামান্য রূপ দখল করলে, রূপ কল্পনা করতে পারলেনা—যেমন হাতি যেমন ঘোড়া যেমন মানুষ যেমন গাছ তেমনিই দেখিয়ে চল্লো--সে হল সামান্যরূপকর্ম্মী। সঙ্গীত এবং হরবোলার বুলি স্বরের রূপ, দুজনে দুরকমে—একজন অসামান্য-ভাবে আর একজন সামান্য রকমে, দিয়ে গেল, এমনি লেখার বেলায় কথা বলার বেলায় সামান্য অসামান্য ভেদাভেদ হল রূপ কল্পনার ক্ষমতা এবং রূপ কল্পনা করার অক্ষমতার দিক দিয়ে।

কবি তাঁর একটা রূপ-কল্পনা আর যার কাছে শুধু কবিতা লেখার হিসেব আছে কিন্তু যে শক্তি নিয়ে মানুষ রূপ কর্ম্মে দক্ষতা পায় তা মোটেই নেই, এমন দুইজনের দুটি রচনা পাশাপাশি ধরলেই এক রূপ-কর্ম্মের অসামান্যতা ও অন্যের সামান্যতা ধরা পড়ে। জলতরঙ্গ আনাড়ির হাতে বাজলো—অর্থাৎ জলতরঙ্গের সঙ্গে মানুষটির নাড়ির সম্বন্ধ নেই, শুধু হাতের কৌশলের সম্বন্ধ রইলো—এবং জলতরঙ্গ গুণীর হাতে পড়লো, বিষম তফাৎ হল দুই বাজানোর মধ্যে, যেমন—তরঙ্গের রূপকল্পনা ধরা হচ্ছে এক কবির লেখায়—

(তরঙ্গবালাগণের গীত)

মোরা তরঙ্গবালা পরি তরঙ্গমালা

তরঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গে করি গো খেলা।

সমীরণ সঙ্গে   তরঙ্গে তরঙ্গে
(খেলি) করি নানা রঙ্গে লহরী লীলা ॥
শিকর সিঞ্চিত চন্দ্রমা কিরণে
সুষমা শোভিত তটিনী পুলিনে
কুলু কুলু তানে   আকুল পরাণে
ঢালি সুধা ধারা নিবারি জ্বালা
তারকিত অম্বরে সম্বরি সরমে
বহিয়া চলেছি সাগর সঙ্গমে
সুরতরঙ্গিনী   জাহ্নবী সঙ্গিনী
ফেনিল সলিল চুমিছে বেলা ॥"

কোন ভাল মন্দ সমালোচনা না করে এরি পাশে আর একটি লেখা ধরি আপনিই বুঝি কোনটা তরঙ্গের সামান্য আর কোন্‌টা অসামান্য রূপকল্পনা। পূর্ব্বেকার লেখায় যেমন দেখছি তরঙ্গসব সাগর সঙ্গমে চলেছে -- এখানেও সেই কথা বলা হচ্ছে—

" অবিনাশী দুলহা কব মিলিহৌ
আদি অন্ত কমাল ॥
জল উপজী জলহী সোঁ নেহা
রটত পিয়াস পিয়াস।
মৈঁ ঠাঢ়ী বিরহিন মগ জোউঁ
প্রীতম তুমরী আস ॥
ছোড়ের গেহ নেহ লগী তুম সোঁ
তজী চরণ লব লীন।
তালাবেলি ঘট ভীতর
জৈসে জল বিন মিন।"

আদি নেই অন্ত নেই অপরিসীম পরিপূর্ণতার সমুদ্র তারি সঙ্গে মিলতে চায় জীবন। জলের তরঙ্গ জলের সঙ্গেই তার প্রেম, জলের জন্যে কত না তার পিয়াস, সাগর-বিরহিনী নদী সে পথ চেয়েই থাকলো—প্রিয়তমের আশাপথ। সাগরের প্রেমে চেয়ে নদী ছাড়লে আপন ঘর, সাগরের ধ্যানে নদী রইলো স্বপ্নে মগ্ন, জল জল করে তার অন্তরের অন্তর, জলহারা মীনের সমান কাতর থাকলো।

যা দেখছিলে, যাকে দেখা হয়নি, তাদের কল্পনা ধরে মন চলতে থাকে নতুন নতুন রূপ সৃষ্টি করে,—আর যাকে দেখা হয়ে গেল—মন তার স্মৃতি বহন করে নতুন নতুন রস পেতে পেতে একই স্মৃতিকে নানা ভাবের মধ্যে বিচিত্র করে দেখে চলে। কল্পনার

ক্রিয়া আর স্মৃতির গতি দুয়েরই কায এককে, বহু করে দেখা, কল্পনা দেখায় রূপের দিক দিয়ে বিভিন্ন এবং বহু, স্মৃতি দেখায় ভাবের দিক দিয়ে বিভিন্ন এবং বহু। অজ্ঞাত রূপের কল্পনা আর জ্ঞাত রূপের স্মৃতি—এই হল দুই পথ রূপ-জগতের যাত্রি শক্তিমান মানুষের সামনে ধরা এবং এই দুই পথের খবর এঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায়।

শিশুর জীবনে অনেকখানি পথ অজ্ঞাত, সেখানে কল্পনার অবাধ গতি দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক শিশু এই অজ্ঞাতকে নিজের নিজের চরিত্র ও শক্তি অনুসারে নানা বিভিন্ন মূর্ত্তি দিয়ে চলে।

বড় হলে মানুষের অনেক জিনিষকে জানা হয়ে যায়—স্মৃতি কাজ করতে থাকে তখন তার মনে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ নিজের চরিত্র ও শক্তি অনুসারে এই স্মৃতি সমস্ত নিয়ে ব্যবহার করতে থাকে এবং এইভাবে কল্পনার সঙ্গে স্মৃতি, স্মৃতির সঙ্গে কল্পনার মেলামেশা সম্পন্ন হয় মানুষের রচনায়।

সোনার কর্ণ-ফুল তার সঙ্গে দেখা-ফুলের স্মৃতি এবং না-দেখা ফুলের রূপকল্পনা এক হয়ে সেটিকে সুন্দর রূপ দিলে, জলতরঙ্গ চুড়ি সেটি দেখা এবং না-দেখা নদীর রূপ একসঙ্গে মিলিয়ে দেখালে! তাবৎ অলঙ্কার শিল্পের মূলের কথা হল কল্পনা এবং স্মৃতির যথাযথ মিলন।

একটা কথা আছে—কণ্ঠস্থ করা! স্মরণ শক্তি এখানে বিনা ভাবনা বিনা কল্পনায় নামতা কণ্ঠস্থ করিয়েই চুকলো, কোন জিনিষ দু একবার দেখে ঠিকঠাক এঁকে দেওয়া গেল এখানে স্মরণ শক্তি কণ্ঠস্থ মুখস্থ করিয়ে দিয়ে থামলো—এই ভাবের স্মরণ শক্তি দিয়ে ছবি লেখা কি কবিতা লেখা যায় না তো—মুখস্ত কথা, কণ্ঠস্থ সুর, করতলগত রূপ—রূপ সৃষ্টির লোকে যাবার একটা একটা ধাপ সত্য, কিন্তু শুধু ধাপ নিয়ে ওঠানামা করলেই ধাপ অতিক্রম করে পৌছনো হল, কোথাও এটা বলিনে।

যে কিছুই মনে রাখতে পারলে না, এই দেখলে শুনলে, এই ভুল্লে, তাকে কোনো কিছুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সে হয় চুপ থাকে নয়তো স্বকপোলকল্পিত একটা উল্টো-পাল্টা জবাব দিয়ে বসে! যার প্রখর স্মরণ শক্তি সে বিষয়টির যথাযথ হুবহু বিবরণ দিয়ে যায়। এই যে হুবহু দেখানো শোনানো এদের রূপ-সৃষ্টিতো বলা যায়না—কাক হুবহু আঁকলে, ফটো যন্ত্র ও মানুষ দুজনেরই করা হল প্রায় একই রকমের এ ক্ষেত্রে, কিন্তু এই হলেই যে কাকের আকৃতিটি পেয়েই কাগজের টুকরো একটা ছবি হয়ে রূপ সৃষ্টির শ্রেণীভুক্ত হল তা নয়, কাকের আকৃতির ছাপ এবং কাকের ছবি দুটী স্বতন্ত্র ব্যাপার! গান্ধার সুর একটা কোন জন্তুর ডাক থেকে নেওয়া—এটা শাস্ত্রের কথা এবং এর মধ্যে খানিকটা সত্যও আছে। এখন একজন যদি নিজের স্মরণ শক্তির জোরে ঐ জানোয়ারের ডাকটুকু ঠিক মনে রেখে বারবার ডেকে চলে, তবে সে

গান্ধার সুরই গাইলে একথা কেউ বলে না। ঠিক এই ভাবেই একটা কিছুর যখন ছাপ কাগজে ধরা গেল তখন সেটি সেই কিছুর ছবি হলনা, ছাপ হল বলতে পারি।

এটা অট্টালিকা, এটা কুটীর, এটা সহর, এটা সহরতলী কিম্বা এ অমুক ব্যক্তি, সে অমুক লোকটি—দেখে-আঁকার শক্তি নিয়ে ও-পর্য্যন্ত ধরা চল্লো! এই ভাবে যা রইলো তার কায রূপটাকে ধরে দেওয়া মাত্র, চিনিয়ে রাখা মাত্র, কথাটাকে ধরে রাখা জানিয়ে রাখা মাত্র। দরকার হলেই যাতে সেটা ঠিকঠাক পায় এই জন্যই রইলো তারা ধরা হাতের মুঠোয়, কণ্ঠে গাঁথা বা মস্তিষ্কে বন্ধ করা—ঘরে ধরা দরকারি বেদরকারি নানা জিনিষের মতো—অভিধানে ধরা নানা কথার মতো!

অভিধানে ধরা কথা—তাই নিয়েইতো কবিতা নভেল রূপকথা সবই লেখা হয়, কিন্তু তাই বলে অভিধানকে রূপকথাও বলা চলে না, কবিতা নভেল কিছুই বলা চলে না। ব্যাকরণ ধরে কর্ত্তাকর্ম্ম ইত্যাদি নিয়মে কথা সাজিয়ে গেলে কিম্বা ঘটনা পরম্পরার অন্তর্গত করে সব কথা বলেও দেখি সেটা খবরের কাগজের প্রবন্ধ হয়, সাহিত্য হয় না, রূপ-রচনা হয় না!

উত্তমাধম ভাবে একদল লোক বসিয়ে তার ফটো—সেতো একটা নিপুণভাবে লেখা চিত্রের লোক-সন্নিবেশের সমান হয়ে উঠতে পারে না!

কথা, সুর, আকৃতি, স্মরণ শক্তি, এদের শক্ত করে ধরলে তালা বন্ধ ঘরে—যে ভাবে জমা-টাকা ধরা থাকে লোহার বাক্সয়—খরচের বেলায় কথা উঠলো মানুষটা কি ভাবে কেমন করে তা খরচ করলে!

কেমন ভাবে রূপ প্রকাশিত হল কথায় সুরে রংএ রেখায় নানা অঙ্গ ভঙ্গীতে—এই খানে এল মানুষের মন নিয়ে কথা, ভাব নিয়ে কথা, শুধু বাক্স খুল্লেম আর টাকা দিলেম তা নয়—কিসের কি মূল্য দিলেম, কোন্ কথার সুরের রংএর রেখার বা অঙ্গভঙ্গীর বিনিময়ে কতখানি রস ভাব সৌন্দর্য্য ইত্যাদি রূপ-রচনার জন্যে পেয়ে গেলেম এ বিচার বিতর্ক ওঠে। রূপ-সংগ্রহের মুহূর্ত্ত সেখানে স্মরণ শক্তি কায করছে, আর রূপ রচনার মুহূর্ত্ত—সেখানে মানুষের মনে ধরা নানা বিষয়ের নানা জিনিষের স্মৃতি কায করছে।

রাস্তায় যেতে দেখলেম একজনকে, অচেনা লোক, মনে তার কোনো স্মৃতি ধরে গেলনা, কিন্তু স্মরণশক্তির দ্বারা তার চেহারা ধরা গেল আমার কাছে, বৃদ্ধ কি যুবা শিশু মাত্র হয়ে—কালো কি সুন্দর শ্যাম বর্ণ হয়ে, লম্বা কি খাটো কি গোলগাল মাঝারি মানুষটি হয়ে, রইলো সে ধরা—এর বেশি একটুও নয়—পথ চলতে হাজার হাজার রূপ-সংগ্রহের মধ্যে সেও একটা সংগ্রহ—তলিয়ে রইলো, হয়তো তার কথা মনেই পড়লো না আর। কিন্তু ঐ একজনের সঙ্গে ভাব হয়ে যাক্, ঘরে বাইরে ওর স্মৃতি জড়িয়ে যাক মনে, তখন বুকের কৌটোয় সে যত্নে ধরা রয়ে গেল, বিশ্বের জিনিষের যত্নে ধরা স্মৃতির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল সে। একটি মুখের স্মৃতি—

সে যে ফুলের স্মৃতি চাঁদের স্মৃতির সঙ্গে সমান হয়ে ওঠে, একটুখানি মুখের হাসি, একটি কথ একটু সুর সে যে আকাশের আলো জলের কলধ্বনির সঙ্গে সমান হয়ে যায়,—তা এই স্মৃ শক্তির যাদুমন্ত্রে! স্মরণ শক্তির মধ্যে বদ্ধ রূপ সে সসীম এবং চিরকালেরও নয় কিন্তু স্মৃতি মধু যাকে স্পর্শ করলে সেই রূপটি জলে স্থলে আকাশে অসীম রূপের সঙ্গে কালের অতী জিনিষ হয়ে দুলতে থাকলো।

জগতের যে কেউ এবং যা কিছু মন বিঁধলে তারই রইলো স্মৃতি মনে, সেই স্মৃতি যখ রূপ পেতে চল্লো, তখন মনোহর পথ ধরে প্রকাশ করতে চল্লো আপনাকে—বড় দুঃখের স জড়ানো কোনো স্মৃতি কিন্তু মনোহর, বড় সুখের সঙ্গে জড়ানো স্মৃতি সেও মনোহর, কবিতা গানে নাট্যে নৃত্যে ছবিতে মূর্ত্তিতে এর অজস্র সাক্ষী ধরা রয়েছে।

তাজবিবির স্মৃতি বড় দুঃখের, কিন্তু সেটা তো একটা দুঃখের বিমলিন প্রকাশ হলনা, কত সু বিলাস কত মধুরতা কত সৌন্দর্য্যের স্মৃতির সঙ্গে এক হয়ে বাজলো সেই বেদনার সুর। বাঁশি গান সকরুণ সুখের স্মৃতি দিয়ে বাজে বুকে, "রূপ দেখি আঁখি ঝুরে" এসব তো মিছে কথা নয়।

স্মৃতি একেরই কিন্তু ছন্দে বন্ধে নানা প্রবন্ধে বারে বারে তার কথা বলে শেষ ক গেলনা, আর একটা কিছু স্মরণ করে রাখা গেল, সময় মতো সেটা উচ্চারণ করে দিলে ঠিকঠাক,—এ অন্য জিনিষ।

চীনের প্রাচীর আর তাজমহল—পৃথিবীতে, দুই আশ্চর্য্য রচনা বলেই বিখ্যাত কিন্তু এ দুয়ে মধ্যে রচনা মুহূর্ত্তের দুটো আশ্চর্য্য রহস্য ধরা পড়েছে। চীনের প্রাচীরের বেলায় স্মৃতি কা করছেনা, রাজশক্তি জোর হুকুম জোর তলব দিলে গঠন শক্তিকে—শক্রকে বাধা দিতে প্রকা শক্তিমান অজগরের মতো প্রাচীর সেখানে পর্ব্বত ঘিরে দেখা দিলে দুই দেশের মানুষের মধ্যে স্মৃতি ধরলেনা মানুষ পাথরের প্রাচীরে শক্তিকেই ধরে গেল। তাজমহলের দেওয়া সেখানে স্মৃতির স্পর্শ অম্লানভাবে পড়লো। বর্ম্মার একটি মন্দিরের প্রাচীর—সেও সাপের মতো আঁক বাঁকা, কিন্তু চীনের প্রাচীরের মতো শক্ত ব্যাপার নয়, কোন কালের রূপ-কল্পনা তারি স্মৃতি ঢে দিয়ে এল মন্দির ঘিরে নিতে। পদ্মার পুল সেখানে শক্তি এবং হয়তো বিলাতের কোন একট শক্ত বাঁধুনীর স্মৃতি আছে একটু একটু, কিন্তু চীনদেশের বাসন্তী নদীর (Yellow river) একটি শাখার এপার ওপার এক করে একটি মনোহর সেতু দুই তীরের মাটির বুকের একটুখানি স্পন্দনের স্মৃতি ধরে প্রকাশ পেলে সুন্দর বাঁক নিয়ে, তার সঙ্গে তুলনায় পদ্মার ব্রিজে শক্তি ছাড় আর কিছুই নেই বল্লেও চলে, কিন্তু রূপদক্ষ এই পদ্মাব্রিজ আঁকুক স্মৃতির মাধুরী মিশিয়ে—ে হবে একটি অপূর্ব্ব ছবি,—ফটোগ্রাফ যা দিতে পারে না, আসল ব্রিজ যা দিতে পারে না। রূপে সংক্ষেপ, রূপের বিস্তৃতি, এমনি নানা ব্যাপার যা রূপ-কর্ম্মের অন্তর্গত—সবই নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষে স্মরণ শক্তি এবং স্মৃতি শক্তির দ্বারায়—স্মৃতির প্রেরণা না স্মরণ শক্তি ধী শক্তি এমনি নানা শক্তি

প্রেরণা এই নিয়ে রচনা সমস্ত নানা শ্রেণীতে বিভুক্ত হয়ে যাচ্ছে আপনা আপনি। রূপ কর্ম্মের খুঁটি-নাটির মধ্যে না গিয়ে সহজ উপায়ে রূপের সঙ্গে পরিচয় করে নেওয়া হতে পারে এই স্মৃতি এবং যাকে বলতে পারি যান্ত্রিক শক্তির পথ ধরে। যা নিজের মনে ধরা রইলো না সে মুঠোতেই থাক গলাতেই থাক বা মাথাতেই থাক তা নিয়ে মনোহর কিছু করা মুস্কিল। আমার যা মনে ধরলো সেইটিকেই অপরের মনে ধরানোর পক্ষে কত যে বাধা তার ঠিক ঠিকানা নাই, স্থান কাল পাত্র এঁরা নানা বাধা নিয়ে দাঁড়ায় রসদাতা ও রস-পিপাসুর মধ্যে। রূপ-রচনার মর্ম্ম উদ্ঘাটন সেও স্থান কাল পাত্র সাপেক্ষ হয়ে পড়ে—এ বিপত্তি নিবারণের উপায় তো রচয়িতার হাতে নেই, সে আছে রসিক সমালোচকদের হাতে। সমালোচনা একটা শক্তির কায, তার দ্বারায় তাই সব সময়ে রসের ব্যাপারের ঠিক যাচাই হয় না, রচনার শক্ত দিকের কথাই জানিয়ে চলে সমালোচনা। স্মৃতির প্রকাশ সে পদ্মের মতো বিকাশের পরিপূর্ণতা পেয়ে থামে, পরিমল তার বাতাস বয়ে আনে, যারা দেখছেনা ফুল তাদের কাছে জানায় ফুল ফুটলো! রসিকের সমালোচনার শক্তি যেখানে বাতাসের পরিমল বহনের মতো কায করে, সেখানে রচনার রস বিস্তৃতি পায়, তখন রসিকের স্মৃতির সঙ্গে রচয়িতার স্মৃতির মিলনে রসভোগের বাধা সমস্ত দূর হয় এক মুহূর্ত্তে। বাতাস একাধারে সু-কু দুয়েরই খবর দেয়, সে সংবাদবাহক, কিন্তু রসিক সে শক্তিধর জীব, রসের খবরই নেয় ষট্পদের মতো। মক্ষিকার সমালোচনা সে রূপের ও রসের বিপরীত সমালোচনা। রচয়িতার ইচ্ছার সঙ্গে যেমন রচনার যোগ তেমনি মক্ষিকা ও ষট্পদ দুই সমালোচকের ইচ্ছার সঙ্গে রচনার উপভোগেরও যোগাযোগ, কাযেই একই কথা নানা রকমে বলে মানুষ এবং সেই একই কথার নানা ব্যাখ্যা দেয় মানুষ। কাল হচ্ছে সব চেয়ে বড় বিচারক এ ক্ষেত্রে, সে দেখি কোনো রচনাকে স্মৃতির মধু দিয়ে অমর করে রাখলে, কোনো কিছুকে একেবারে লোপ করে দিয়ে গেল।

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে এই ভাবে কত জিনিষ কালে কালে স্মৃতির ও সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারে ধরা রইলো, আবার কত জিনিষ একবারে লোপ পেয়ে গেল, তার হিসেব নিলে দেখা যায় যা স্মৃতির বিষয় হল সেই রইলো ধরা, আর যা তা না হলো সে গেল মরে। রচনার নিত্যতা এবং অনিত্যতা স্মৃতি জাগিয়ে রাখার হিসেবের মধ্যে অনেকখানি ধরা আছে দেখি।

"মত্ত দাদুরি" এরি ডাকটুকু যদি কোন শক্তি ও কৌশলে ধরে কানের কাছে বাজানো যায় তবে সেটা বিষম ব্যাপার হয়ে ওঠে, কিন্তু বর্ষা রাতের নানা স্মৃতির দ্বারায় মধুর হয়ে যখন সে ডাক আসে কানে, তখন কবিতা লেখা হয়ে যায় দাদুরির ডাকের উপরে।—

"মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওয়ত ছাতিয়াঁ।"

সানায়ের পোঁ এমন কিছু মিষ্টি নয় কিন্তু স্মৃতির স্পর্শ হলো তাতে, তাই মধুর লাগলো!

একটা চন্দ্রোদয় কি সূর্য্যোদয় কি সমুদ্র কি পর্ব্বত দেখে কোন একটা কবিতার দুতিন ছত্রের স্মৃতি মনে জাগে, সেখানে কবির স্মৃতি পথ খুলে দিলে একভাবে সাধারণের দর্শনের, নিজের চোখ এবং মন নিয়ে জিনিষটাকে ধরা হল না এখানে, তা যদি হতো সবাই রূপদক্ষ হয়ে যেতো।

রচয়িতাতে রচয়িতাতে একই জিনিষের বর্ণনায় বিভিন্নতা দেখি যখন তখন, জানি রূপটিকে দুয়ের স্মৃতি দুই ভাবে ধরলে। সাধারণ মানুষের বেলায় এ হয় না। তারা সবাই দেখে মাঠকে মাঠ, পাহাড়কে পাহাড়, সমুদ্রকে সমুদ্র মাত্র, যেমন ভূগোলের ক্লাসের সব ছেলেই পর্ব্বতের চিহ্নটাকে পাহাড় ছাড়া সমুদ্র বলে না, কিন্তু ওর মধ্যে একটা ছেলে—যদি তার রচনা শক্তি থাকে—তবে হয়তো সে পাহাড়ের চিহ্নটাকে এক সাপ বা বিছে দেখে ফেলে এবং মাষ্টারের ধমক্ খায়, সহপাঠিদেরও টিটকারি পায়, অথচ এই স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার ক্ষমতা রূপদক্ষের সাধনার বিষয় এতো অস্বীকার করা চলে না। একটা পর্ব্বতের রূপ যে প্রকাশ-বেদনার কথা জানায়, একটি ফুলের রূপও সেই প্রকাশ-বেদনার কথা বলে! মানুষের হাতে এতবড় ভাষা নেই যে এই বেদন পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে, তাই মানুষের বুকে রূপের জন্যে বেদনা বাজে, 'রূপদেখি আঁখি ঝুরে', সেই বেদনার স্মৃতি বয়ে চলে মানুষ, সেই বেদনার কথা নানা সুরে নানা ছন্দে নানা রংএ রেখায় ধরে উল্টে-পাল্টে প্রকাশ করতে চায় মানুষ, রূপদক্ষ তা পেতে চায় মানুষ রূপ যে বেদনা ধরলে বুকে তারি স্মৃতিকে উল্টেপাল্টে নানা ভাষায় প্রকাশ করতে। রূপের অন্তরে যে বেদনা বাজছে তারি সাক্ষির রূপ রচনা। স্মৃতির করুণ স্পর্শ দিয়ে যে সমস্ত রচনা মানুষ করে চলে তা মধুর হয়ে ওঠে মনোহর হয়ে ওঠে, আর শুধু রূপকে দৃষ্টিশক্তি বাক্‌শক্তি এই সব দিয়ে যেখানে ধরলে মানুষ সেখানে, রচনাতে শক্তির পরুষ-ছাপ পড়লো। রূপের সঙ্গে ভাব হলো তখনি, যখন রূপের বেদনার স্মৃতি রূপদক্ষের প্রাণে গিয়ে পড়লো, রূপের সবটা জয় করে নেওয়া হল তখনি, যখন স্মৃতির বিষয় করে নেওয়া গেল রূপকে। মানুষের রচা তাবৎ সুকুমার শিল্প বিশ্বে ধরা রূপের সঙ্গে এই ভাবের অন্তরের সম্পর্ক পাতিয়ে বসার সাক্ষ্য দেয়।

অন্তরের সবটুকুর স্পর্শ পেয়ে কোথায় মধুর হয়ে ফুটলো রূপের নিবেদন কোথায় শক্তির স্পর্শ পেয়ে রূপ সে হয়ে গেল চুপ স্থির নির্ব্বাক, রূপ চর্চ্চার বেলায় এই দুই রকমের প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে চলা চাই না হলে দুটো রচনার রসের তারতম্য ধরা পড়ে না।

রূপ সমস্ত বেদনা জানাচ্ছে, আকাশ বেদনা জানাচ্ছে, বাতাস বেদনা জানাচ্ছে, জল চলেছে বেদনা জানিয়ে, মাটি কাঁপছে রংএর বেদনায়, আলোর বেদনায়—বড় মধুর এই বেদনার স্মৃতি সমস্ত—দুঃখের বেদনা, সুখের বেদনা, সুরূপের বেদনা, কুরূপের বেদনা, মিনতি জানাচ্ছে, সবাই বলছে 'মনে রেখো মনে রেখো'; সকালে পূর্ব্বদিক বলছে—আজকের প্রকাশ মনে

রেখো, সন্ধ্যার সূর্য্যাস্ত বলে যাচ্ছে—এই শেষ মনে রেখো, ভুলো না ভুলতে দিও না—এই নিবেদন। শুক তারা আসে, সন্ধ্যা তারা আসে, ঋতুর পর ঋতু আসে—মনে ধরতে মনে পড়াতে ধরা পড়তে, মানুষের মাঝে তারা বুকের বাসা খুঁজে বেড়ায়। মানুষের মধ্যে কারু প্রাণে তারা স্থান পায়—এই আশায় চেয়ে থাকে জল স্থল অন্তরীক্ষে ধরা রূপসমস্ত। সামান্য মানুষ সন্ধ্যা তারার কথা বোঝে না, শুধু দেখে বলে, কি সুন্দর! কিন্তু রূপদক্ষের প্রাণে তারার কথার স্মৃতি জাগে—সুর দিয়ে কথা দিয়ে—

"তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।"

*　　*　　*　　*

যদি থাকি কাছা কাছি—
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি
তবু মনে রেখো"

(রবীন্দ্রনাথ)

একথা আজকের কবি শুধু নয় প্রাচীন কবিরাও বলেছেন বারবার করে শ্রীরাধিকাকে দিয়ে তাঁরা মিনতি জানিয়ে দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। এর মধ্যে দুই কথা নেই স্মৃতির অমৃত পরশ—চাচ্ছে রূপ—স্মৃতির মধ্যে জাগতে চাচ্ছে রূপ। রসের ঝরণা—বিরাট শক্তির প্রেরণা—স্মৃতির মাধুর্য্যে ডুবিয়ে দিয়ে বইছে। স্মৃতিশক্তি হচ্ছে সোনার কাঠি, ঘুমন্ত রূপকে জাগিয়ে তোলে, লাবণ্য আনে, ভাব ভঙ্গী সবই আনে রূপে, আর শুধু রচন শক্তি বাচন শক্তি তানিয়ে রূপ কাঠামো পায় সুন্দর, ভাব ভঙ্গী সবই পায় কিন্তু বেঁচে উঠে না। একপাটি জুতো সে যতক্ষণ স্মৃতির স্পর্শ পেলে না ততক্ষণ জুতো মাত্র পূর্ব্বেই বলেছি কিন্তু এই জুতো পাটি কিম্বা একটু খানি ছেঁড়া কাঁথা যখন কারু স্মৃতির স্পর্শ পেলে তখন সিণ্ডারিলার জুতো এবং আমাদের ঘরের ছেলে ভোলানো ছড়ায় সে দুপাটি অপূর্ব্ব জুতোর খবর পাই, সে লাল জুতুয়া হয়ে দেখা দিলে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

———

গুচ্ছ

প্রেম

—ভবভূতি

এ জীবনে যাহা রহে সমতুল সকল দুঃখে সুখে,
সব দশাতেই অনুকূল হয়ে সদা যাহা জাগে বুকে ;
যাহাতে ক্লান্ত মানব-হৃদয় লভে বিশ্রাম তা'র,
রসটুকু যা'র কোন দিন হরে' নিতে নারে জরাভার ;
গাঢ় পরিণত হয় যাহা ক্রমে গোপনতা ঘুচে গেলে
মধুর প্রাণের অকপট প্রেম—অনেক পুণ্যে মেলে॥

ফরাসী কোম্পানির ভাগীরথী তীরে উপনিবেশ স্থাপন

ইংরাজ কোম্পানির কুঠি-সংক্রান্ত নথি-পত্রে ফরাসীদের ভাগীরথী তীরে উপনিবেশ স্থাপন একটা দৈব ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত আছে। ওয়াল্‌টার ক্ল্যাভেলের (Walter Clavel) ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বরের বালেশ্বর হইতে কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টরকে লিখিত পত্রে জানা যায়,—ফরাসী কোম্পানির দেলা হে (De La Haye) কর্ত্তৃক প্রেরিত বহরের ফ্লেমেন্‌ (Flemen) নামক জাহাজ সেণ্ট্‌ থোমে ফিরিবার কালে বাত্যা বিতাড়নে পথ ভ্রষ্ট হইয়া করোমণ্ডেলের পরিবর্ত্তে বালেশ্বরের পথে গিয়া পড়ে এবং তথা হইতে তিনখানি ওলন্দাজ জাহাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হুগলীতে আনীত হয়। ইংরাজ লেখকের মতে চন্দননগরে উপনিবেশ স্থাপনের ইহাই ভিত্তি। [১]

দেশে দ্রব্য বিশেষের অকাল হওয়ায় উহার অনুসন্ধানেই আর ব্যবসা ব্যপদেশেই হউক যে জাতি এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন তাঁহাদের মুখে ফরাসীদের চন্দননগরে উপনিবেশ স্থাপন একটা দৈব ব্যাপার বলা বেশ শোভন বটে। দৈবেই হোক আর ক্ষমতাতেই হোক, সকল ইউরোপীয় জাতির ভারতে ভূমি-লাভের মূলে যে মুসলমান বাদসার অনুকম্পা নিহিত আছে, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই এবং এদেশে রাজত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া প্রথমে কেহই সাগর পার হন নাই ইহাও ঠিক। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি ইংরাজ ও ফরাসীর ভারতে প্রথম প্রতিষ্ঠা বিষয়ে মূলতঃ পার্থক্য বড় বেশি নয়।

বাঙ্গলার মধ্যে ফরাসী কোম্পানির স্থানে স্থানে জমি খণ্ড অধিকৃত হইলেও একমাত্র চন্দননগরেই তাঁহারা উপনিবেশ সৃষ্টি করেন। চন্দননগরে ফরাসীদের উপনিবেশ সৃষ্টি, একথা বলিতেই কিন্তু একটা ভুল হয়। কারণ তাঁহারা যখন এখানে আগমন করেন, তখন এই স্থানের নাম চন্দননগর ছিল এরূপ প্রমাণ ত পাওয়াই যায় না বরং এ স্থান ইহার অন্তর্গত পল্লী বিশেষের নামেই বা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইত; তাহা প্রাচীন কবি বিপ্রদাস কৃত মনসামঙ্গল গ্রন্থে, দিগ্বিজয়প্রকাশ গ্রন্থে ও কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে উল্লেখ পাওয়া যায়। [২]

যতদূর জানা যায় তাহাতে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর মার্ত্যাঁ (Martin) দেলান্দ

(১) Bengal District Gazetteers, Hughly.

(২) মনসামঙ্গল—বোরো, দিগ্বিজয় প্রকাশে—খলিসানি এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে গোন্দলপাড়া এবং কোন পুঁথিতে বোয়ো নামের উল্লেখ পওেয়া যায়। এই সকল পল্লীই চন্দননগরের অন্তর্গত।

(Andre Bourean Desland) এবং পেলে্এ (Pelle) স্বাক্ষরিত তদানীন্তন ডিরেক্টরকে লিখিত এক পত্রেই চন্দননগরের নাম প্রথম উক্ত হইয়াছে। ৩ এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থাদি হইতে যেরূপ স্থির করিতে পারা যায় তাহা প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি। ৪

বহু ইংরাজি ও ফরাসী গ্রন্থে এমন কি ফরাসী গভর্ণমেণ্টের কাগজ পত্রে যাহা জানা যায়, তাহাতে ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে ফরাসী কোম্পানি বা কোম্পানির জন্য অপর কেহ এখানে আসিয়াছিলেন বা কোন জমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায় না। নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে ১৬৭৩ না ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ৫ ডুপ্লেসি (Du Plessis) নামক একব্যক্তি এখানে আসিয়াছিলেন, জমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তথায় সামান্যভাবে গৃহাদিও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে আর কাহারও নাম পাওয়া যায় না।

এই জমিখণ্ড কোথায়, পরিমাণ কত এবং উহা কিরূপ ছিল, তাহার বিবরণ কোন স্থানে উল্লেখ নাই। যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা যায়, ফরাসীদের এখানকার প্রথম সংগৃহীত জমি খণ্ডের মাপ ২০ আরপাঁ, (arpents) ৬ উহা হুগলী হইতে দেড় লিয়ে (league) দক্ষিণে ৭ ওলন্দাজ কুঠির নিকট বোড় পরগণার কিষণপুর নামক গ্রামে এবং সহরের উত্তর সীমায় অবস্থিত। মূল্য চারিশত এক টাকা। ৮ এই সকল এবং পর্য্যটক দিগের বিবরণ ও প্রাচীন অপ্রকাশিত নক্সাদি হইতে যতদূর নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই জমি খণ্ড সহরের উত্তর প্রান্তস্থিত তালডাঙ্গার বর্ত্তমান তাউৎখানার (আরবি "তাঅৎখানা" হইতে) বাগান বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহা গড়বন্দি করা হয়। ৯ এই স্থানেই প্রথম সামান্যভাবে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবসা পত্তন হয়। কিন্তু অর্থসাচ্ছল্য না থাকায় বা অন্য অসুবিধা বিধায় কয়েক বৎসর পরে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়।

তৎপরে ফরাসী কোম্পানি পুনরায় কিরূপে এখানে আইসেন, কি উপায়ে মোগল

(৩) La Compagnie des Indes Orientales.

(৪) "চন্দননগরের আদি পরিচয় ও বঙ্গে ফরাসীদের আদি স্থান নির্ণয়।"—প্রবাসী—চৈত্র ১৩৩,

(৫) L' Inde Francaise, La Compagnie Francaise des Indes (1604-1785), Hedges Diary vol. 111. Imperial Gazetteer, La Compagnie des Indes Orientales প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সময় লেখা আছে।

(৬) ফ্রান্সে পূর্ব্বেকার জমির এক প্রকার মাপ। উহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মাপে ব্যবহৃত হইত।

(৭) এক লিগ প্রায় ১॥ ক্রোশের সমান।

(৮) La Mission du Bengale Occidental, vol. 1.

(৯) La Mission du Bengale Occidental, vol. 1.

বাদসা আরঙ্গজেবের নিকট হইতে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ব্যবসা করিবার অনুমতি এবং এখানকার মালিকানি স্বত্ব লাভ করেন, তাহার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এই মালিকানি স্বত্ব সম্বন্ধে একখানি মাত্র ফরাসীগ্রন্থে দেখা যায়, আরঙ্গজেবকে ৪০০০০৲ টাকা দিয়া ফরাসীরা ৯১২ হেক্টর জমি প্রাপ্ত হন।[১০] অন্য কোন ঐতিহাসিক একথা বলিয়াছেন বলিয়া জানা নাই এবং নথি পত্রেও ইহা পাওয়া যায় না। ইহা সম্পূর্ণ ই ভ্রমাত্মক। ৪০০০০৲ মুদ্রা বিনিময়ে বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যা মধ্যে বাণিজ্য করিবার ফারমান্ পাওয়া গিয়াছিল, ইহাই কাগজ পত্র হইতে সংগ্রহ করিতে পারা যায়।[১১] বহু গ্রন্থেই এই ফারমান প্রাপ্তির সময় ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও উহা প্রকৃত প্রস্তাবে আরও কয়েক বৎসর পরে পাওয়া যায়। ১৬৮৮-৮৯ হইতে লেখালিখি ও অন্য প্রকার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল ইহা ঠিক।

আরঙ্গজেবের ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ষ রাজত্ব কালে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে সাতগাঁর অধীনস্থ বোড় পরগণার রাজধানী বোড়কিশন পুরের কর্ম্মচারীদিগকে ঢাকার নবাব এব্রাহিম খাঁর লিখিত পরওয়ানা হইতে, ফরাসী কোম্পানির ডিরেক্টরের ঐ স্থানে ৬১ বিঘা জমি খরিদের কথা জানা যায়। এই পরওয়ানায় লিখিত বিষয় হইতে মনে করিতে পারা যায়, উহাই প্রথমোক্ত সংগৃহীত জমি।

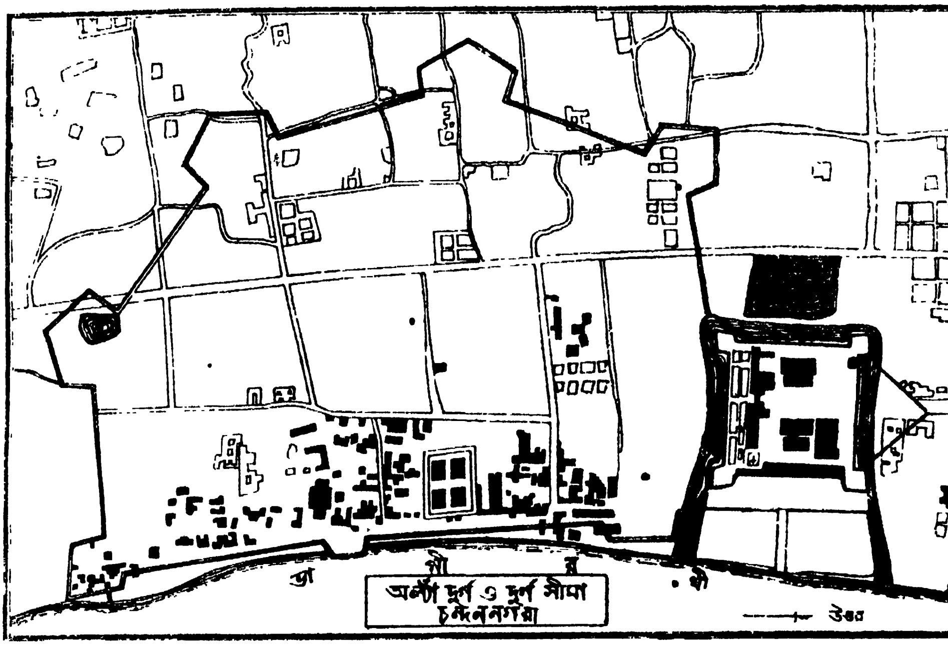
একত্রে কোন বড় জমি খণ্ড লাভের কথা ফরাসী দপ্তরের কাগজ পত্রে দেখা যায় না। খণ্ড খণ্ড করিয়া সংগ্রহের দ্বারা জমির পরিমাণ বর্দ্ধিত হয় এবং ক্রমে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হয়, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। টয়েনবি সাহেব (George Tyonbee) ও ব্র্যাড্লে বার্ট্ (F. B. Bradley Birt, I. C. S.) বলিয়াছেন[১২] অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্ভবতঃ মুরশিদাবাদের নবাব কর্ত্তৃক প্রদত্ত কুঠি নির্ম্মাণের জন্য প্রায় সাত বিঘা মাত্র নিষ্কর জমি কোম্পানির নিজস্ব ছিল। উঁহারা আরও বলেন চন্দননগরের সীমার মধ্যে অধিকাংশ জমির খাজনা বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়। এখানে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে কর দিতে হয় এরূপ এবং পত্তনি বা তালুকদারের জমি বেশী থাকিলেও, সরকারি জমির পরিমাণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা কতদূর ঠিক বলিতে পারা যায় না। এখানকার সাধারণ বিশ্বাস

(১০) La Mission du Bengale Occidental Vol 1. এক হেক্টর—৮ বিঘা ১০ কাঠার সমান।

(১১) Firman of the Emperor Aurangzeb on the 14th of the month of Safar of the 36th year of his reign (1693) and Parwana of Ibrahim Khan, Nawab of Dacca and of Kefact Khan, Dewan, on the 16th of the month of Jemadiolawl of the same year.

(১২) a sketch of the administration of the Hoogly District ও Calcutta Review 1918—Chandernagore.

সহরের মধ্যস্থলে যে স্থানে আল্যঁা দুর্গ (Fort de Orleans) ছিল উহাই পূর্ব্বোক্ত ৬১ বিঘা জমি। কেহ কেহ ৬০ বিঘা নিষ্কর জমির কথাও বলিয়া থাকেন।



১৬৯০।৯১ খৃষ্টাব্দের কয়েকখানি নবাবি পরওয়ানা ও হুগলীর মুসলমান ফৌজদারের দস্তক বা অনুমতি পত্র হইতে ফরাসী কোম্পানির দ্বিতীয়বার ডুপ্লেসি দ্বারা সংগৃহীত জমিতে কুঠি নির্ম্মাণের চেষ্টা ও নিকটবর্ত্তী ওলন্দাজদের বাধা দেওয়ার কথা জানা যায়। গ্রন্থাদিতেও এ কথার উল্লেখ আছে। ইতিপূর্ব্বে কোম্পানির ডিরেক্টর, চন্দননগরবাসী মোল্লা আব্দুল হাদি নামক নদীয়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের দাবি এঙ্গলোয়া (Dabisse Anglois) সাহেবের দরুণ একটি বাড়ি ভাড়া লওয়ার কথা জানা যায়। [১৩]

সম্রাট আরঙ্গজেবের যে সনন্দ দ্বারা ফরাসী কোম্পানি বঙ্গ উড়িষ্যা ও বিহারে অবাধে বাণিজ্যের এবং বাসের জন্য গৃহ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হন, তাহা এই সম্রাটের ষড়-ত্রিংশৎ বৎসর রাজত্ব কালে পাওয়া গিয়াছিল। উহার মুসলমান তারিখ ১৪ই শফর, ইংরাজি ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ। যে ৪০০০০৲ টাকা সম্রাটকে নজর দিবার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উহা

(১৩) Parawana of Ibrahim Khan to Mr. Deslandes on the 20th of the month of Chaban, in the 33rd year of the rule of the Emperor Aurangzeb (29th May 1690) ও অন্যান্য পরওয়ানা।

এই কারণেই দেওয়া হয়। মুরশিদাবাদের শাসনকর্ত্তাকেও ১০০০০৲ টাকা এই জন্য দিতে হয়। এই বিষয় কথা স্থির হইলেও টাকা লেনদেনের পূর্ব্বে চন্দননগরের তদানীন্তন ডিরেক্টর দেসলান্দকে উক্ত টাকা দিবার একটি মুচলেখা লিখিয়া দিতে হইয়াছিল। এই পরওয়ানা প্রাপ্তিতে ওলন্দাজ কোম্পানির সহিত নির্দ্ধারিত হারে অর্থাৎ শতকরা ৩॥০ হিসাবে কর দিবার স্থির হয়। মুরশিদাবাদের দেওয়ানের পরওয়ানা হইতে অবগত হওয়া যায়, যে এই সময় আকবর নগর (রাজমহল) হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত করাইবার জন্য ওলন্দাজদের ন্যায় শতকরা চারি টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য হয়। বাঙ্গলার নবাব জসের খাঁ নসিরির পরওয়ানা হইতে জানা যায় কোম্পানির শতকরা ৩॥০ টাকা শুল্কের সহিত জিজিয়া কর দিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। [১৪] হুগলী, পিপ্‌লি, বালেশ্বর, ইংলি প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের জাহাজ নোঙ্গর করিবার অধিকারও সেই সঙ্গেই প্রাপ্ত হন এবং সম্রাট আরঙ্গজেবের অষ্টত্রিংশ বৎসর রাজত্বকালে রাজবের ৮ই তারিখে (১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে) সম্রাটপুত্র কর্ত্তৃক নিশান ঝিশান [১৫] দ্বারা ঐ আদেশ পুনর্ণবীকৃত হয়।

দেলখান্দের পর ডুলিভিয়ে (Du Livier) এবং তৎপরে হারদানকুর্ (M. Hardan court) যখন চন্দননগরের ডিরেক্টর হন, তখন পুনরায় সম্রাটকে ৪০০০০৲ টাকা ও বাঙ্গালার নবাবকে ১০০০০৲ টাকা নজর দিতে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার উকিলকে পাঠাইয়া সম্রাটের নিকট হইতে শুল্কের হার কমাইয়া ওলন্দাজদের ন্যায় শতকরা আড়াই টাকা করাইয়া লন। এই টাকার মধ্যে দশ সহস্র টাকা সেই সময় এবং অবশিষ্ট চল্লিশ হাজার টাকা ছয় বৎসরে দেওয়া হয়। মহম্মদসার চতুর্দ্দশ বৎসর রাজত্বকালে ডুপ্লের সময়ে (১৭৩১ খৃষ্টাব্দে) জাভর খাঁ যখন বাঙ্গালার নবাব, তখন আর একবার উক্ত পরিমাণ টাকা দিয়া শেষোক্ত হারে শুল্ক পাকা করিয়া লওয়া হয়।

কোন গ্রন্থে কোম্পানির এখানে ৯৪২ হেক্টর জমি সংগ্রহের কথা উল্লেখ পাওয়া যাইলেও, [১৬] ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তাঁহাদের এস্থানে ব্যবসাকার্য্যের সুবিধা ও তজ্জন্য অনুমতি সংগ্রহের চেষ্টা ভিন্ন এখানকার জমি সংগ্রহের দ্বারা পাকা করিয়া বসিবার চেষ্টার কথা নথিপত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। কাগজপত্র দৃষ্টান্তে অল্পে অল্পে একটির পর একটি করিয়া পর পর কতিপয় পল্লীর অধিকার করায়ত্ত করার কথা জানা যায়।

বোড় পরগণার রাজধানী গঙ্গ শুক্রাবাদের মধ্যে বোড়কিষণপুর নামক পল্লী খরিদের

(১৪) এই পরওয়ানায় ভিন্ন জিজিয়া করের কথা আর কোন দলিলে দেখা যায় না।

(১৫) সম্রাটের যেমন ফরমান, নবাব ও দেওয়ানের যেমন পরওয়ানা ইহাও তেমনই সম্রাটপুত্রের স্বাক্ষরিত সনন্দ বা আদেশপত্র।

(১৬) La Mission du Bengale Oeccidental Vol. I

হিজরি ১১২৭ শকের ১৭ই শফর (১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি) তারিখের পাট্টা হইতে জানা যায়,—এই পল্লীর অন্তর্গত মসজিদ ও উহার সংলগ্ন বার বিঘার অধিক পারিমাণ উদ্যান ও পুষ্করিণী এবং কৃপারাম, প্রভুরাম ও অপর দুই ব্যক্তির বাসবাটি বাগান ও পুষ্করিণী ভিন্ন যে সমস্ত আবাদি ও অনাবাদি জমি বাগান জলাশয় ফলকর ও অন্যান্য বৃক্ষ, যাহা নদীয়া সিবাসী মোল্লা আবদুল হাদির পুত্র সেক আবদুলরারি এবং উহার পৌত্র সেক আহামেদি, হরিরাম চৌধুরীর পুত্র রাজারাম শর্ম্মা চৌধুরীকে [১৭] আটশত পঁচিশ টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন, তাহা, ঐ খরিদ টাকা ও খরিদার্থ সরকারের কাজি, কানগুঁই মুহুরি প্রভৃতিকে নজর দেওয়া ও অন্যান্য রসুম প্রভৃতিতে চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়িত ছয় শত ছিয়াত্তর সিক্কা টাকা,—মোট পনেরশত এক সিক্কা টাকা দিয়া হারদানকুর (Hardancourt) ও ব্লাঁস্লিয়ের (Blancheliere) নামে খরিদ করা হয়। ১১২২ সালের ১৯শে ফাল্গুন (১লা মার্চ্চ ১৭১৫) [১৮] এই দলিল প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে একটি সর্ত্ত থাকে যে, এই জমির মধ্যে ৪১ বিঘা নিষ্কর তাঁহার নিজস্ব থাকিবে, উহা চিরদিনের জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ভোগ দখল করিবেন এবং বৎসরে একশত করিয়া টাকা পাঠাইবেন। রাজারাম চৌধুরীর নামে জমি খরিদের কারণ আর কিছু নহে, তৎকালে কোম্পানীর জমি খরিদ নিষিদ্ধ ছিল।

এই বোড় কিষণপুরের পরিমাণ কত বা সীমা কি, তাহার কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। উল্লিখিত দলিলে লেখা আছে মাত্র,—সাতগাঁর অন্তর্গত বোড় পরগণার রাজধানী বোড় কিষণপুর যাহার সীমা সহরদ্দ সকলের জানা আছে। এই পল্লীটির প্রাচীনতা সম্বন্ধে 'মনসামঙ্গলের' পূর্ব্বে কোন গ্রন্থ বা পুঁথিতে উল্লেখ আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। [১৯] উহা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত। বোরো পরগণা বিস্তৃত, এখনও হুগলির কলেক্টারি সংক্রান্ত কাগজ পত্রে বা জমি সংক্রান্ত দলিলাদিতে এই নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চন্দননগরের যে অংশকে বোরো কিষণপুর বলিত এখন সে স্থানকে বোর বা বোড় বলা হয়। উহা সহরের উত্তরপূর্ব্ব অংশ। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন দলিলে বোড়ো কৃষ্ণপুর নাম দেখা

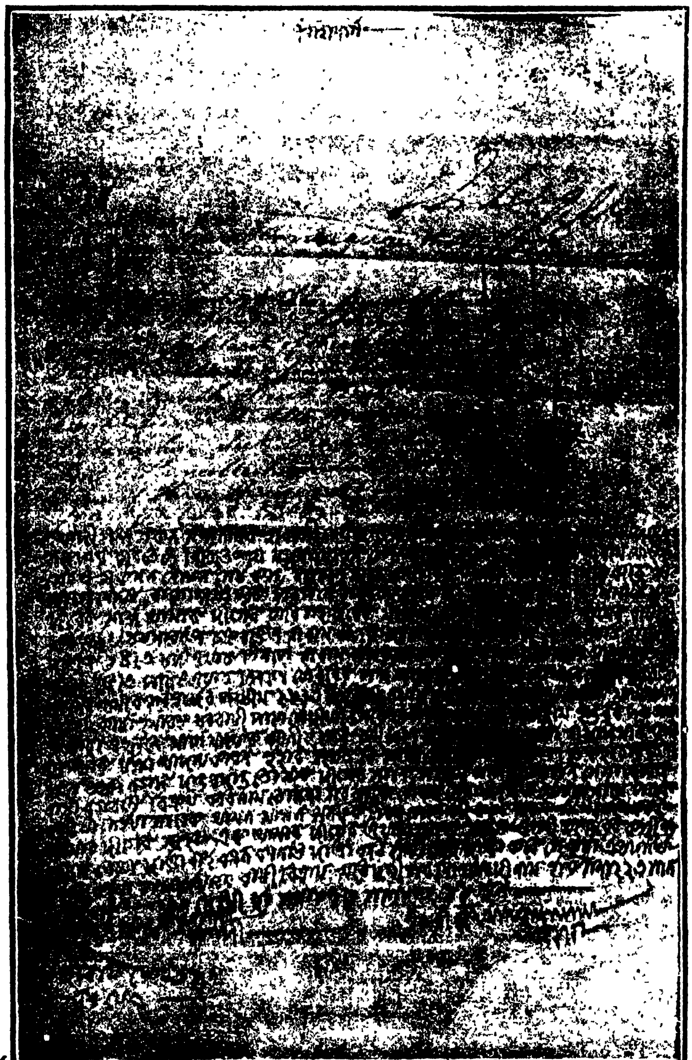
(১৭) ইনি সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অগ্রজ ছিলেন।

(১৮) সম্ভবতঃ তারিখে কোন ভুল আছে, কারণ ১৯শে ফাল্গুন ১লা মার্চ্চ হওয়া সম্ভব নহে।

(১৯) উহাতে এইরূপ লেখা আছে ;—

"ডাহিনে হুগলী রহে বামে ভাটপাড়া
পশ্চিমে রহিল বোরো পূর্ব্বে কাঁকিনাড়া
মুলাযোড় গাড়ুলিয়া বাহিলা সত্বর
পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর।"

যায়। ১৮৭০—৭১র সার্ভে ম্যাপে এই স্থানের নাম বোড়ো লেখা থাকিলেও, বুরো কৃষ্ণপুর নামে একটি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়।



এই গ্রামটি কোম্পানির হস্তগত হওয়ার পর পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে আর কোন স্থান অধিকৃত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। অন্ততঃ পণ্ডিচারীর এই সংক্রান্ত কাগজ পত্রে নাই। তৎপরে যে স্থানটি কোম্পানির অধিকারে আইসে তাহার নাম প্রসাদপুর।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারীর কাউন্সিলের প্রস্তাবমত এই পল্লীটি লওয়া স্থির হয়। এই স্থানের সহিত অন্যান্য জমি ও শ্যামপ্পারা নামক পল্লীস্থ বাটি চালাঘর ও বৃক্ষাদি, যাহা মণিরাম সেনের পৌত্র ও গোপীনাথ সেনের পুত্র লাল সেন নামক একজন অধিবাসী এগার শত পঁচিশ সিক্কা টাকায়, হরিচরণ চৌধুরীর পৌত্র বৃন্দাবন চৌধুরীর পুত্র রামরাম চৌধুরীকে বিক্রয় করিয়াছিল, তাহা সমস্তই কোম্পানি খরিদ করেন।[২০] চন্দননগর কলেক্টারিতে খাজনা সংক্রান্ত কাগজ পত্রে এই প্রসাদপুরের নাম এখন দেখা যায় এবং বর্ত্তমান হাটখোলা নামক পল্লীতে গড় প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী থাকিলেও সাধারণে প্রসাদপুর এই নাম পরিচিত নহেন। শামপ্পারা নামটি কাগজ পত্রেই পাওয়া যায়, কিন্তু উহার স্থান নির্ণয় করিতে পারি নাই। সহরের দক্ষিণাংশে শ্যামপটি বা শ্যামবাটী নামক একটি স্থান আছে, জানিনা এই নামের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না।

সাবিনাড়া নামে যে পল্লীটি এখনও খ্যাত আছে, উহার মধ্যে ৮ বিঘা ১৫ কাঠা জমি এবং প্রসাদপুর সংলগ্ন উহার অংশ, ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর তিন শত আটচলিশ টাকা মূল্যে বৈকুণ্ঠ সুরের পৌত্র ও নিধিরাম সুরের পুত্র রামচরণ সুরের নিকট হইতে কোম্পানি খরিদ করেন এবং উহার বাৎসরিক খাজনা সিক্কা সাত টাকা এক আনা জমিদারকে দিতে স্বীকার থাকেন।[২১] সাবিনাড়া পল্লীর অবশিষ্ট অংশ কি সুত্রে পাওয়া যায় তাহা কোথাও পাই নাই। ডুপ্লের সময়ে এখানে একটি বাজার ছিল জানা যায়।[২২] বর্ত্তমান হাটখোলার বাজারটিই সেই বাজার কি না বলিতে পারা যায় না। নবাব খাঁ জেহান খাঁর সানবিনাড়া' নামে একটি মূল্যবান তালুক ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৩] ইহা পরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে যায়। যদিও গোন্দলপাড়া গ্রামটি তাঁহার তালুকদারি ছিল, তথাপি এই সানবিনাড়া নামের সহিত সাবিনাড়ার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না, যেহেতু উহা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি লইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

গোন্দলপাড়া স্থানটিও প্রাচীন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে সকলের বর্ণনার মধ্যে গোন্দলপাড়া নাম পাওয়া যায়।[২৪] উহার পূর্ব্ব ইতিহাস অজ্ঞাত। এই

(২০) প্রসাদপুর বিক্রীর পাট্টা। পণ্ডিচারী দপ্তর হইতে প্রাপ্ত তর্জ্জমা।

(২১) প্রসাদপুর ও সাবিনাড়ার জমি খরিদ সংক্রান্ত দলিল। পণ্ডিচারী দপ্তর হইতে প্রাপ্ত তর্জ্জমা।

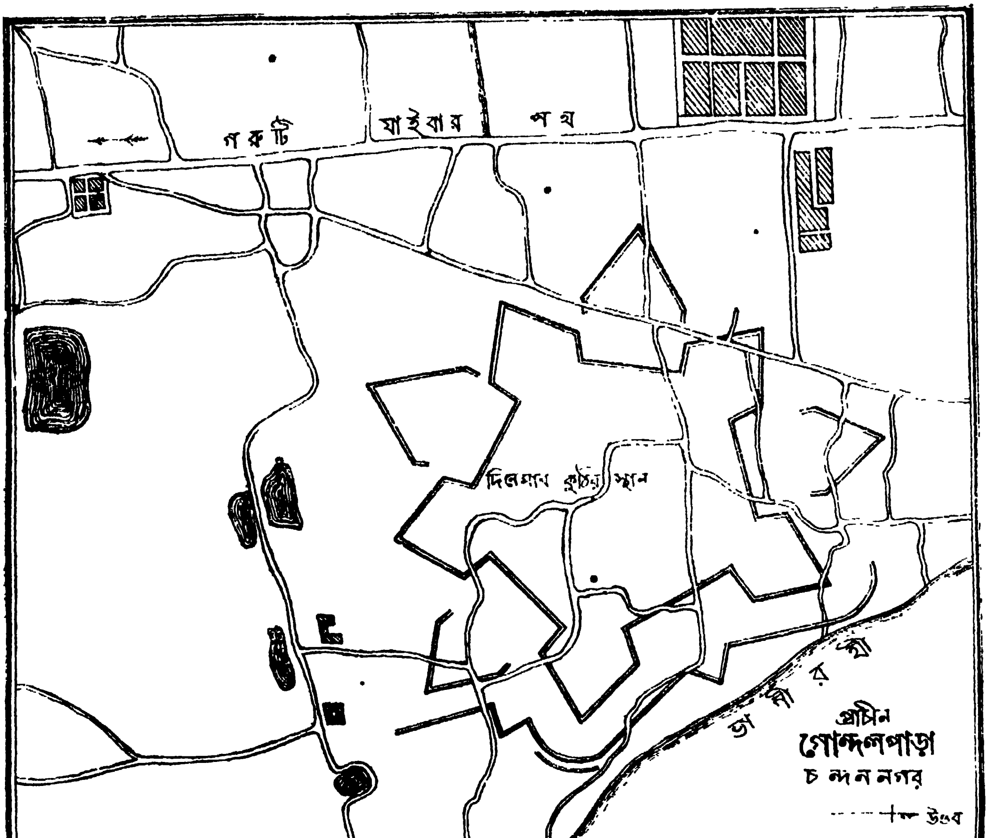
(২২) ডুপ্লে ও ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বাক্ষরিত ইজারা সংক্রান্ত দলিল।

(২৩) Hooghly, Past and Present.

(২৪) " নায়ে তুলিয়া সাধু লইল মিঠাপানি।
বাহ বাহ বলিয়া ভাবয়ে পরমানি ॥
গরিফা বহিয়া সাধু বাহে গোন্দলপাড়া।
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া ॥"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

পর্য্যান্ত জানা যায় দিনেমারেরা যখন প্রথম এই স্থানে আসিয়া তাহাদের কুঠি স্থাপন করেন, তখন ইহা হুগলীর শেষ ফৌজদার নবাব খাঁ জেহান খাঁর সম্পত্তি ছিল। দিনেমার কোম্পানি এই স্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুর যাইবার পর একটা নির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক খাজনায় উহা ফরাসী কোম্পানিকে পত্তনি বিলি করেন। সেই পর্য্যন্ত ইহা ফরাসীদের আছে। এই তালুক পরে নবাবের এক ভ্রাতা সম্পর্কীয়, চুঁচুড়ার মতিঝিলের মির্জ্জা নসরতুল্লা খাঁকে বিক্রয়



করেন। [২৫] কোম্পানির এই স্থানটি পত্তনি লওয়ার সময় সম্বন্ধে কোথাও উল্লেখ পাই নাই। দিনেমারদের গোন্দলপাড়া হইতে শ্রীরামপুরে যাওয়ার সময় হইতেছে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দ [২৬] এবং নবাবের মৃত্যু হয় ১৮২১ খৃষ্টাব্দে। [২৭] সুতরাং এই সময়ের মধ্যেই ইহা কোম্পানির হস্তে আইসে।

(২৫) Hooghly, past and present.

(২৬) A sketch of the administration of the Hooghly District.

(২৭) Hooghly, Past and Present.

গোন্দলপাড়া তালুকটি মির্জ্জা নসরতুল্লা খাঁ খরিদ করেন ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সাবিনাড়ার সন্নিকট চক নসিরাবাদ নামে যে পল্লীটি আছে উহার নসরতুল্লার নামের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। বলা যায় না উহার সহিত এই স্থানের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা।

এই সকল ভিন্ন বড়নগর, খলিসানি, ইন্দ্রনগর, কৃষ্ণপটী, বলরামপটী, গন্ধ শুক্রাবাদ প্রভৃতি আরও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্থান চন্দননগর সীমার মধ্যে দেখা যায়। এই সকলের মধ্যে গন্ধ-শুক্রাবাদ—ইহাও মোল্লা আবছুল হাদির সম্পত্তি ছিল, কোম্পানি পরে খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়েন। অন্য গুলি কবে এবং কিরূপে ইহাদের হস্তে আসিল তাহা জানা যায় না। খলিসানি নামক স্থানটি অতি প্রাচীন। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" গ্রন্থে ইহার নাম উল্লেখ আছে। [২৮]

এই সময় পর্য্যন্ত চন্দননগর উপনিবেশটির ঠিক পরিমাণ কত হইয়াছিল তাহা অভ্রান্তরূপে স্থির করিবার কোন উপায় পাওয়া যায় না।

হারদানকুরের পর দিরোয়া (M. Dirois) ডিরেক্টর হইয়া আসেন। তিনিই প্রথম এই সমগ্র স্থানটিকে গড়বন্দি করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার সময়ে বাৎসরিক খাজনা সর্ব্বসমেত ১২৯১৷৷৩ পাই দিতে হইত। [২৯]

দিবোয়ার পর ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ডুপ্লে চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। তাঁহার সময়ে যখন চন্দননগর সর্ব্বাংশে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে, তখন এই নগরের পরিমাণ ৩০০ বিঘা বলিয়া কোন ঐতিহাসিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। [৩০] ইহাতে সংশয়ের যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ যে খাজনার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইহা সত্য হইলে জমির পরিমাণ এত কম হইতেই পারে না। এক্ষণে বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে ত্রৈমাসিক ৩৩৬৲ টাকা দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন বোর, প্রসাদপুর, সাবিনাড়া প্রভৃতি যে সকল স্থানের কথা বলা হইয়াছে, ইহারই পরিমাণ ৩০০ বিঘা অপেক্ষা অনেক অধিক তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।

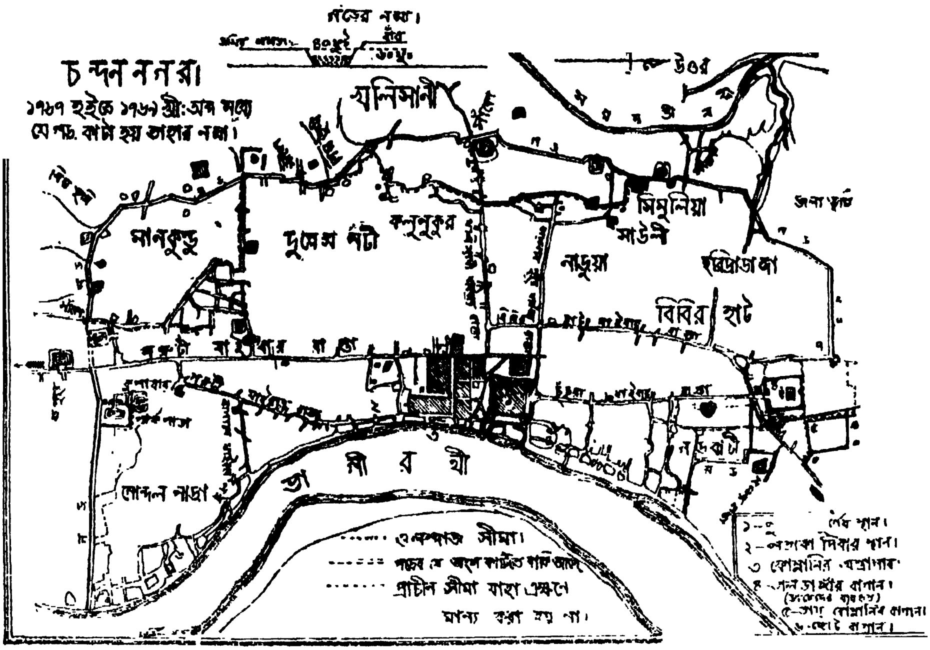
১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও ফরাসীর সহিত চন্দননগরের সীমা নির্দ্ধারণ চুক্তিপত্র মত কোন কোন স্থান অদল বদল হইয়া, চন্দননগরের এই বর্ত্তমান আকার হইয়াছে। [৩১] এই সময় সহরের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব্বদিকের সীমা বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। এই শেষোক্ত দিকে বর্ত্তমান গড়বাটী ও বৃটীশ চন্দননগর নামক স্থানের ঠিক কতটা অংশ ফরাসী চন্দননগর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা উচ্চ চুক্তি পত্র সংলগ্ন নক্সা দৃষ্টে

(২৮) "খলসানি মহাগ্রাম যত্র রাজায় ধীবরঃ।" দিগ্বিজয় প্রকাশ।

(২৯) পণ্ডিচারীর অপ্রকাশিত রেকর্ড।

(৩০) পণ্ডিচারী দপ্তরের তত্বাবধায় মসিয়ে সিঙ্গারাভেলু প্রদত্ত টীকায় দেখা যায়।

(৩১) Aitchison's Treatise Engagements and Sanads Vol. II.



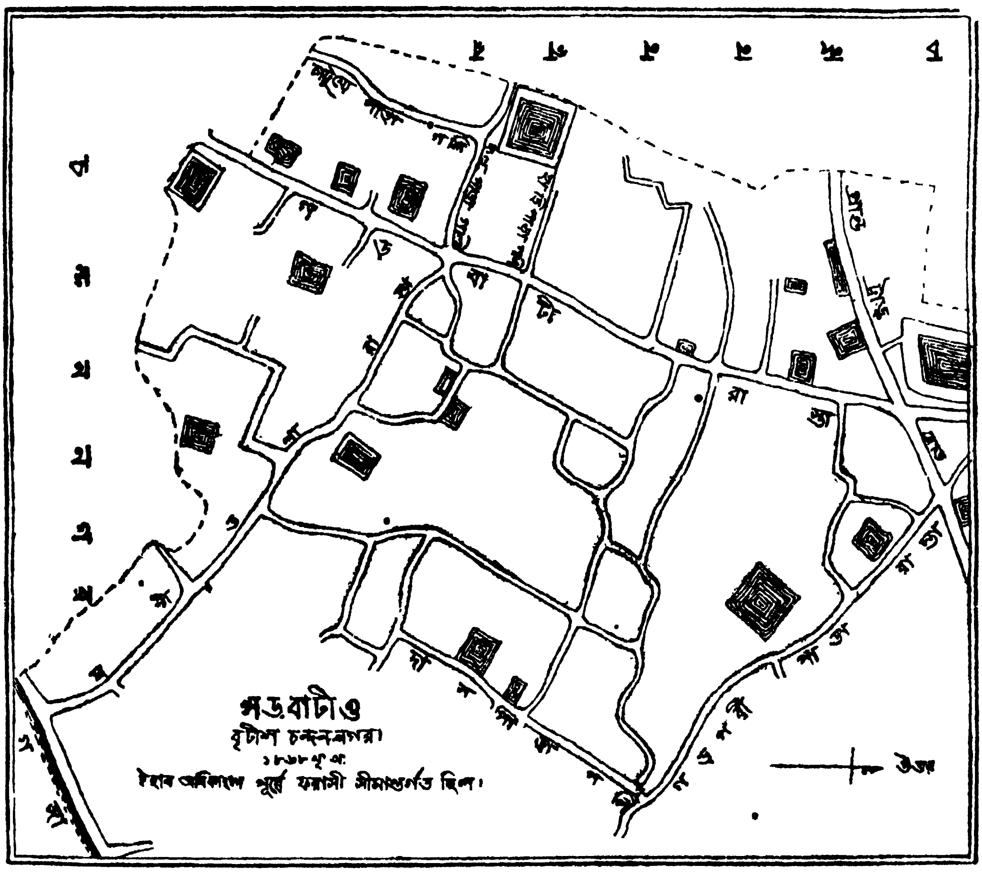
চন্দননগর।

১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে মার্চ্চের পূর্ব্বের নক্সা।



ক — আরল্যাঁ দুর্গ। খ — দুর্গের সীমাভুক্ত স্থান। গ — দিনেমার কুঠি।
ঘ — তালডাঙ্গার বাগান। ঙ — ডাচ্‌ কুঠি। চ — লাল দিঘী। ছ — গোরস্থান।
জ — গরুটী যাইবার রাস্তা। ঝ — চুঁচুড়া ও হুগলী যাইবার রাস্তা। ঞ — আরল্যাঁ দুর্গের সীমা।

বুঝা যায় না। গভর্ণর মসিয়ে শেভালিয়ের (Mons Chevelier) সময়ে ১৭৬৭-৬৯ খৃষ্টাব্দে, সহরের চারিদিকে শেষবার যে পরিখা কাটান হয়, তাহার তৎকালীন প্রস্তুত নক্সা এবং পণ্ডিচারী দপ্তরে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের যে হস্তলিখিত মানচিত্র আছে [৩২] তাহা হইতে বর্ত্তমান চন্দননগরের মানচিত্র মিল করিয়া সেই জমি খণ্ডের সীমা কতকটা নির্ণয় করা যায় মাত্র। শেভালিয়ে প্রথমে স্থানটিকে মাটির প্রাচীর-বেষ্টিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই।



এই গড়বাটী মৌজাও নসরৎউল্লা খাঁর জমিদারী ছিল। উহা তখন চন্দননগরের মধ্যে ছিল তাহারও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। [৩৩] কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাঙ্গলার

---

(৩২) সাধারণ সভার সভ্য বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নায়েব বি, এস সি মহাশয়ের চেষ্টায় এই মূল্যবান মানচিত্র দুইখানির নকল সংগৃহীত হয়। এই অবসরে তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইতিহাসে কিঙ্করসেনের গড় প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেও বুঝা যায় ঐ স্থান পূর্ব্বে চন্দননগরের সীমার মধ্যে ছিল।

কোম্পানির এখানে আগমন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠার সহিত যে রূপে ক্রমে উপনিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা লিখিত হইল কিন্তু ইহাই যে সম্পূর্ণ তাহা নহে, এবং যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে তাহা যে একেবারে সংশয় শূন্য তাহা বলিতে পারি না। [৩৪] পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন যে মানচিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার। উহাতে বর্ত্তমানের সাউলি, নাড়ুয়া হরিদ্রাডাঙ্গা প্রভৃতি আরও বহু পল্লীর সন্নিবেশ দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝা যায়, এ সকল স্থান যে উপায়েই হউক পূর্ব্বেই এই সহরের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। গোন্দলপাড়া এবং দিনেমার কুঠির স্থানের নক্সা ও উক্ত মানচিত্র পাওয়া যায়। দিনেমাররা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ফরাসী কোম্পানি ইহা লইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহাতে কোন ভুল দেখা যায় না। পূর্ব্বের সহিত এখন সহরের আকার প্রকারে যে পার্থক্য দেখা যায়, উহা প্রথম গভর্ণর মসিয়ে তুপ্লে ও তৎপরে শেভালিয়ে দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। তদবধি দেড়শতাধিক বৎসরের মধ্যে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের চুক্তি অনুসারে উত্তর পূর্ব্বদিক ও অন্য সামান্য কোন কোন স্থান ভিন্ন, চন্দননগরের সীমা ও পরিমাণ সংক্রান্ত আর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। [৩৫]

শ্রীহরিহর শেঠ

ব্যর্থ-প্রতিকার

তপ্ত হয়েছে অঙ্গ বিরহানলে,
সখীরা বালারে ঢাকে যে নলিনী দলে;
জুড়াতে তাহারে না পেরে ক্ষণেক তরে,
ম্লান হয় তারা অমনি লজ্জাভরে।

শ্রীগণেশচরণ বসু

(৩৪) চন্দননগরের গঠনাদি সম্পর্কে পূর্ব্বে অন্য প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে দুই এক স্থানে যে পার্থক্য আছে, তাহাই ভুল বলিয়া এখন মনে করি।

(৩৫) ফরাসী ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর মসিয়ে জারবিনিসের (Mons. Gerbinis) আদেশ ক্রমে, পণ্ডিচারী দপ্তরের অধ্যক্ষ মসিয়ে সিঙ্গারাভেলু (Mons. A. Singaravelou) বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে ফরমান, পরওয়ানা প্রভৃতির নকলগুলি কোন মূল্যাদি না লইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমোকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে জন্য উহাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সমুদ্রগুপ্ত

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বসুলার প্রেম

তখন পাটলীপুত্রের নগর সীমায় সহস্র সহস্র মাগধ বৌদ্ধ বাস করিত। তাহারা বৌদ্ধ হইলেও স্বধর্ম্মী শকগণের সহিত তাহাদিগের প্রীতির বন্ধন ছিল না। শকগণ প্রাচীন মৌর্য্যসম্রাট্গণের প্রাসাদের চারিদিকে বাস করিত এবং শকাধিকার কালে মহারাজ খণ্ডে মাগধগণের বাস নিষিদ্ধ ছিল। এই মহারাজ খণ্ডে অর্থাৎ মৌর্য্যসম্রাট্গণের প্রাসাদ-সীমায় যে সমস্ত শক বাস করিত তাহাদিগের মধ্যে দুইটী স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল, শ্বেত শক আর কৃষ্ণ শক, যাহারা শকদ্বীপ হইতে নূতন আসিয়াছিল অথবা তখনও পর্য্যন্ত শ্বেতবর্ণ ছিল তাহারা প্রাচীন প্রাসাদের সীমার মধ্যে বাস করিত। প্রাসাদ সীমার বাহিরে অথচ মহারাজ খণ্ডের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ শকেরা বাস করিত। সকল শকই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। নগরে মাগধ বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। তবে বৌদ্ধেরা মনে করিত যে তাহারা শকরাজার স্বধর্ম্মী বলিয়া মাগধ-বৈষ্ণব অপেক্ষা অধিকতর উচ্চপদস্থ। সেইজন্য সেইদিন প্রভাতে বৈষ্ণবগণ পুত্রকলত্র গঙ্গাপারে পাঠাইয়া দিলেও বৌদ্ধ নাগরিকেরা নিশ্চিন্তমনে নগরে বাস করিতেছিল।

রক্তাক্ত বৈষ্ণব সেনা যখন নগরে প্রবেশ করিল তখন দুইটী সুন্দরী নারী সৌণ্ডিক বীথির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে একটী গণিকা অপরটী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী। গণিকাটীর নাম বলাকা। তার অঙ্গের বর্ণ রাজহংসের মত শুভ্র, আজানুলম্বিত কেশপাশ ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ, নয়নদ্বয় আকাশের মত নীল, ক্ষীণ তনুখানি সর্ব্বদাই যেন যৌবনের ভরে নমিত। ভিক্ষুণীর নাম বসুলা, তাহার অঙ্গের বর্ণ সুবর্ণের মত হরিদ্রাভ, মস্তক মুণ্ডিত, অঙ্গে চীবর কিন্তু বেশভূষার পারিপাট্য দেখিলে তাঁহাকে সংসারত্যাগিনী ভিক্ষুণী বলিয়া বোধ হইত না। পাটলীপুত্রের দুষ্ট নাগরিক তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিত। বৈষ্ণবেরা বলিত যে ভিক্ষুণী বসুলা মহাস্থবীর যশোদত্তের পট্টমহিষী এবং তুলনা করিলে হয়ত গণিকা বলাকা অপেক্ষাকৃত সুচরিত্রা। বসুলার কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। সুন্দর পুরুষ দেখিলে তাহার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত কিন্তু কদাকার বা কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিলে তাহার মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন হইত না। চীবরের কঠোর আবরণের মধ্যেও বসুলার যে পরিপাট্য ফুটিয়া উঠিত নবীনা বা প্রবীণা আর কোন ভিক্ষুণীর

হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন; তিনি বলিতেন যে আর্য্য বসুলা স্বভাবতঃ সুপরিচ্ছন্না, সেইজন্য হিংসায় অন্য ভিক্ষুণীরা তাহার দেবী-চরিত্রে দোষারোপ করিয়া থাকে।

বলাকা তরুণী হইলেও পাটলীপুত্রের গণিকা সমাজে প্রধানা হইয়া উঠিয়াছিলেন। শক কর্ম্মচারীরা ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিত সুতরাং মাগধগণ তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। গণিকা হইলেও বলাকা পাষাণী ছিলেন না। লোকে বলিত যে করুণাময়ী আর্য্যা ভিক্ষুণী বসুলার অপার করুণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায় বলাকা। আর্য্য ভিক্ষুণী বসুলা ও গণিকা বলাকা বাল্যকাল হইতে সখীভাবে আবদ্ধ ছিলেন। রাজদণ্ডে দণ্ডিত বহু নাগরিক গণিকা বলাকার শরণ লইয়া পরিত্রাণ পাইত কিন্তু যাহারা আর্য্যা বসুলার কোপবহ্নিতে দগ্ধ হইত, স্বয়ং বুদ্ধ ভট্টারকও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। সুপুরুষ বা অপরিণত বয়স্ক সুন্দর যুবা দেখিলে ভিক্ষুণী বসুলা তাহার পরিচয় লাভের জন্য এত ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন যে, পাটলীপুত্রের নাগরিকেরা তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিনী বলিয়া ডাকিত। যে হতভাগ্য যুবা আর্য্য ভিক্ষুণী বসুলার পরিচয় লাভ করিয়া চরিতার্থ হইত কিছুদিন পরে হয় সে অদৃশ্য হইত, না হয় তাহার মৃতদেহ কোনদিন প্রভাতে পাটলীপুত্রের রাজপথে আবিষ্কৃত হইত।

বাসুদেব মন্দিরের যুদ্ধের পরে বৈষ্ণব-সেনা যখন নগরে ফিরিয়া আসিতেছিল তখন আর্য্য ভিক্ষুণী বসুলা ও গণিকা বলাকা সৌণ্ডিক বীথির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সেই ক্ষুদ্র রক্তাক্ত সেনাদলের সম্মুখে বালক সমুদ্রগুপ্ত চলিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া ভিক্ষুণী বলিয়া উঠিলেন "আহা মরি মরি কি সুন্দর"! বলাকা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে সুন্দর?"

"কেন ঐ বালকটী।"

"তোমার মুখে আগুন, ওযে তোমার পুতের বয়সী।"

"তা হতে পারে কিন্তু সুন্দর বলতে দোষ কি?"

"দোষ তোমার বলার ভাবে।"

দেখিতে দেখিতে নাগরিকগণ সেই ক্ষুদ্র সেনাদলকে চারিদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। কেহ যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, কেহ বা শক সেনার পলায়ণের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, সমুদ্রগুপ্ত বহুকষ্টে জনতার বাহিরে আসিবামাত্র আর্য্য ভিক্ষুণী বসুলা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আহা তোমার মুখখানি যে শুকায়ে গেছে, এস তুমি আমার সঙ্গে এস।"

সমুদ্রগুপ্ত তরুণীর লালসাদীপ্ত আলিঙ্গন পাশমুক্ত হইয়া কহিল "আমি বৈষ্ণব, তুমি ভিক্ষুণী, তুমি আমাকে স্পর্শ কর না।"

আর্য্য বসুলা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হলেই বা তুমি বৈষ্ণব, আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি!"

ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া বলাকা বলিল "ছি ছি বসুলা তোর আচরণ দেখে আমি যে সাধারণ বেশ্যা,—আমারও লজ্জা বোধ হচ্ছে।"

সখীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া বসুলা সমুদ্রগুপ্তের হস্তধারণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ছুটিলেন। কিন্তু তরুণ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিল, "মাধব, এই ভিক্ষুণী দুশ্চরিত্রা, একে দূর করে দাও।"

আর্য্য ভিক্ষুণী বসুলার সুন্দর স্বভাবকোমল মুখখানি প্রথমে কর্কশ ও পরে রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু এই শক্তিশালিনী রমণী মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বাভাবিক মনোবৃত্তি দমন করিয়া কহিল "ছি! ভাই রাগ কর্ত্তে আছে কি? মাধব, তুমি বাড়ী ফিরে যাও, আমি ওকে একটু পরে নিয়ে যাব।"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বসুলা সমুদ্রগুপ্তের হস্তধারণ করিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে বালক সমুদ্রগুপ্তের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, ভিক্ষুণীর হস্ত দূরে ঠেলিয়া দিয়া সমুদ্রগুপ্ত বলিয়া উঠিল "মাধব!" প্রবল উত্তেজনায় তাহার দেহের সমস্ত রক্ত মস্তকের দিকে ছুটিয়াছিল, কর্ণের ও কপালের শিরা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। বালকের সে রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভিক্ষুণী বসুলা ও নাগরিক মাধব উভয়েই ভীত হইল। সমুদ্রগুপ্ত উগ্রকণ্ঠে দ্বিতীয়বার কহিল, "মাধব, এই বেশ্যাটাকে দূর করে দে।"

পুরাতন সৈনিকের মত মাধব আদেশ করিল, "দশজন।" দশজন রক্তাক্ত যুবক ও বালক, বসুলা ও সমুদ্রগুপ্তের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রমে ধীরে আর্য্য ভিক্ষুণীকে রাজপথ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া গেল।

সহসা বসুলার মোহ দূর হইল, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সামান্য মাগধ নাগরিক পুত্র তাঁহার দেবদুর্ল্লভ প্রেম অযাচিতভাবে পাইয়াও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। অকস্মাৎ বিকট চীৎকার করিয়া আর্য্যা বসুলা মূর্চ্ছিতা হইলেন। সকল বিষয়েই বসুলার এমন একটা নিপুণতা ছিল যে তাহার কোমল অঙ্গে কখনও ব্যথা লাগিত না, চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমনভাবে সখী বলাকার অঙ্গে দেহলতাখানি এলাইয়া দিলেন যে তাঁহাকে ধীরে ধীরে সখীর অঙ্গ পথে নামাইয়া দিতে হইল। সুতরাং পাটলীপুত্রের প্রাচীন রাজপথের কঠিন পাষাণ-আচ্ছাদনে লাগিয়া আর্য্যা বসুলাকে কোমলাঙ্গে বেদনা পাইতে হইল না।

তাহার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সমুদ্রগুপ্ত আদেশ করিল "শীঘ্র চল।" রক্তাক্ত বৈষ্ণবসেনা দ্রুতপদে রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

সুন্দরী রমণীর হস্তে আকস্মিক মূর্চ্ছা অতি ভীষণ অস্ত্র। ইহা প্রেমিকের জাল, হৃদয়-দুর্গ জয়ের কামান এবং পরাজয়ে ভেদনীতি। এমন অস্ত্র বিফল হওয়ায় আর্য্যা বসুলা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। সমুদ্রগুপ্ত চলিয়া গেল, তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল

না ; এমন সুন্দর মূর্চ্ছা, কমনীয় অঙ্গের লোভনীয় পতন, সুন্দর মুখে রক্তরাগ এবং বসনের অসংযম, বর্ব্বর দেখিয়াও দেখিল না ; সুতরাং তাহার সমস্ত উদ্যম বৃথা হইল বুঝিয়া আর্য্যা বসুলা রাজপথের গভীর ধূলায় বসিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা তাহাকে চিনিত তাহারা প্রমাদ গণিল। একজন বৈষ্ণব দ্রুতপদে আর্য্য চন্দ্রগুপ্তকে সংবাদ দিতে গেল। যাহারা আর্য্যা বসুলা ও তাহার জন্য মহাস্থবির যশোদত্তর কৃপাকণার আশা করিত তাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে আর্য্যা বসুলা উঠিলেন, তিনি অঙ্গের ধূলা ঝাড়িলেন না বা বসন সংযত করিলেন না। তাঁহার বক্ষের উপরে বসনে রক্তের দৃঢ়রেখা অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া শান্ত, শিষ্ট বৌদ্ধ নাগরিক শিহরিয়া উঠিল। কারণ, বৌদ্ধরাজ্যে ভিক্ষুণীর রক্তপাত মহাপাতক এবং সে পাপের একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড। তাহারা জানিত না যে সে রক্ত সমুদ্রগুপ্তের। তাহারা দলে দলে কৌতূহলী হইয়া আর্য্যা ভিক্ষুণীর সঙ্গে সঙ্গে কাপাতিক সঙ্ঘারামের দিকে চলিল।

ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ফাগুন রাতে

ফাগুন এসেছে কোকিল কণ্ঠে
আগুন লেগেছে বনে,
তরু-জীবনের আজ হলো সুরু
মলয়ার পরশনে।
চাঁদের কিরণে ভরেছে কুঞ্জ,
হেসে সারা হোল কুসুমপুঞ্জ,
যাপিবে বলিয়া সারাটী রজনী
মধুময় আলাপনে।
এতদিনে আজ ফাগুন এসেছে
জীর্ণ জরার পরে,
কেমনে রহিগো একেলা বসিয়া
বদ্ধ-দুয়ার ঘরে।
বনলক্ষ্মীর তনু পরিমল,
ভরে গেছে আজ সারা বনতল,
আম্র-মুকুল সুরভি স্বপন—
ঘনায়ে তুলেছে মনে।

শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী

আরাবিক্ ছন্দ

আরাবিক্ ছন্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দ্বারা মাত্রা গণনা করিতে হয়, অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে Syllable বলে। এই Syllableএর গুরু লঘু উচ্চারণের উপর ছন্দ মাধুর্য্য সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। আরাবিক্ ছন্দ সর্ব্ব শুদ্ধ ১৬টি। এই ১৬টি ছন্দ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে তিনটি ছন্দ আছে। যথা :—ত্যাবিল্, মদীদ ও বশীত্। ইহারা চতুষ্পদী। তিন মাত্রা ও চার মাত্রা একের পর অপর এইরূপ ভাবে গণনা করা হয়।

১ম ত্যাবিল

ফা-ঊ-লুন | মা-ফা-ঈ-লুন | ফা-ঊ-লুন | মা-ফা-ঈ-লুন |

জগৎ-জেতা জাহাঙ্গীরের জগৎ আজি অন্ধকার।
জাগ তুমি জাহান্ নূরী আলোয় ভর দিক্ আবার॥

(সত্যেন দত্ত)

২য় মদীদ

ফা-ঈ-লা-তুন | ফা-ঈ লুন | ফা-ঈ-লা-তুন | ফা-ঈ-লুন |

মেঘলা থম্ থম্ সূর্য্য ইন্দু ডুবল বাদলায় দুলল সিন্ধু।
হেম কদম্বে তৃণ গুচ্ছে ফুটল চক্ষের অশ্রুবিন্দু॥

(সত্যেন দত্ত)

৩য় বশীত

মোস্-তাফ-ঈ-লুন | ফা-ঈ-লুন | মোস্-তাফ-ঈ-লুন | ফা-ঈ-লুন

ভারতের দৈন্য ঘুচ্‌বে নাকো? অবিচার যত ছাইছে দেশ।
আমরা কি সবাই কলের পুতুল নাইক আমরা মুর্গমেষ॥

দ্বিতীয় ভাগে দুইটি ছন্দ আছে। যথা :—ওয়াফির এবং ক্যামিল। ইহারা ত্রিপদী। প্রত্যেকটি ছন্দের পাঁচটি করিয়া মাত্রা আছে।

১ম ওয়াফির

মা-ফা-ঈ-লা-তুন | মা-ফা-ঈ-লা-তুন | মা-ফা-ঈ-লা-তুন

কঙ্কের কিঙ্কিণি ফুলের রিনিঝিনি হাসি ভরা চিত্ত।

২য় ক্যামিল

মো-তা-ফা-জে-লুন | মো-তা-ফা-জে-লুন | মো-তা-ফা-জে-লুন
ত্রিশ্ কোটি দেশবাসী আম্‌রা বসে কাঁদি শক্তি কি নাইরে।
আয় সব মিলে ভাই দেশের কাজে লাগি উন্নতি অচিরে॥

তৃতীয় ভাগে তিনটি ছন্দ আছে। যথায়—হযাজ্। রযাজ্, রামাল ইহারা চতুষ্পদী। প্রত্যেকটির চারিটি করিয়া মাত্রা আছে।

১ম হযাজ্

মা-ফা-ঈ-লুন | মা-ফা-ঈ-লুন | মা-ফা-ঈ-লুন | মা-ফা-ঈ-লুন |
হাজার বাতি নিব্‌ল ধীরে রাজার সভা অন্ধ কার।
গলায় মালা টোপর পরা ঘোড়ায় ছুটে রাজ কুমার॥
(রবিবাবু)

২য় রযাজ্

মোস্-তাফ-জে-লুন | মোস্-তাফ-জে-লুন | মোস্-তাফ-জে-লুন | মোস্-তাফ-জে-লুন |
উড়িল গগনে বিজয় পতাকা ধ্বনিতে লাগিল শতেক শঙ্খ।
রহিয়া রহিয়া প্রলয় আরবে বাজে ভৈরব ভীষণ ডঙ্ক॥
(রবিবাবু)

৩য় রামাল

ফা-জি-লা-তুন | ফা জি-লা-তুন | ফা-জি-লা-তুন | ফা-জি-লা-তুন |
আস্‌ছে এবার অনা গত প্রলয় নেশার নৃত্য পাগল।
সিন্ধু পারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙ্‌বে আগল॥
(নজরুলইসলাম)

চতুর্থ ভাগে ছয়টি ছন্দ আছে। যথায়—মুনাস্ আরি-ই, খাফিফ্, মুযারি, মুখ্‌তাযাব, মুত্‌তাকাত, সর-ই।

১ম মুনাস্ আরি-ই

মোস্-তাফ-জে-লূন | মাফ্-জূ-লা-তো | মোস্-তাফ-জে-লূন

বনের হাওয়া　উঠ্‌ল মেতে　জুট্‌ল ভুবনে।

মনের পাগল　জাগ্‌ল, ওসে　জান্‌ল কেমনে॥

(সত্যেনদত্ত)

২য় খাফিফ্

ফা-জে-লা-তূন | মোস্-তাফ-জে-লূন | ফা-জে-লা-তূন |

যাঁর মহিমায়　জন্ম লভেছে　হিমানী গিরি।

রস ধারা যাঁর　নদী ও সাগরে　রয়েছে ঘিরি॥

(প্যারিমোহন)

৩য় মুযারি

মা-ফা-ঈ-লূন | ফা-জে-লা-তূন | মা-ফা-ঈ-লূন

জোছ্‌নার মত　স্বচ্ছ শীতল　সিন্ধুর মাঝে।

রঙিন রবীর　রক্ত কিরণ　সন্ধ্যা সাঁঝে॥

৪র্থ মুখ্‌তাযাব

মাফ-জূ-লা-তো | মোস্-তাফ-জে-লূন | মোস্-তাফ-জে-লূন |

শিশির ভেজা　ভোরের পাতায়　কিরণ ছটা।

রঙিন সাজে　খেল্‌ছে কেমন　কর্‌ছে ঘটা॥

৫ম মুয্‌তাফাত

মোস্-তাফ-জে-লূন | ফা-ঈ-লা-তূন | ফা-ঈ-লা-তূন |

বিশ্বের মাঝে　লজ্জাহীনের　লজ্জা নাই তো।

৬ষ্ঠ সরি-ই

মোস্-তাফ-জে-লুন | মোস্-তাফ-জে-লুন | মাফ্-জু-লা-তো

উত্তাল গঙ্গে খেল্‌ছে উর্ম্মি হাস্‌ছে নৃত্যে।
সূর্য্যের কিরণ পড়েছে কেমন মন্থর চিত্তে॥

পঞ্চম ভাগে দুইটি ছন্দ আছে। যথা :—মুতাক্যারির, মুতাদ্ আরিক্। ইহারা চতুষ্পদী। প্রত্যেক পদে তিনটি করিয়া মাত্রা আছে।

১ম মুতাক্যারিব

ফা জু-লুন | ফা-জু লুন | ফা-জু-লুন | ফা-জু-লুন |

সুন্দর মুখ খঞ্জন চোখ জাফ্‌রান্ রঙ অঞ্চল।
নৃত্যের শেষ সঙ্গীত বেশ ফুলবান সব চঞ্চল॥

(করুনানিধান)

২য় মুতাদ্ আরিক্

ফা-জে-লুন | ফা-জে-লুন | ফা-জে-লুন | ফা-জে-লুন |

নন্দপুর চন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
বহেনা চল মন্দানিল লুটিয়ে ফুল গন্ধভার॥

(কালিদাস রায়)

এই ১৬টি ছন্দ ব্যতীত আরবী ভাষায় আরও ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—কেৎআ, কাছিদা রোবায়ী ইত্যাদি। ইহাদের আলোচনা এপ্রবন্ধে করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

কাছিদা, কেৎআ প্রায় অনেকটা এক-ই রকম। তবে কেৎআতে প্রথম পাদের সহিত দ্বিতীয় পাদের ও তৃতীয়ের সহিত চতুর্থের মিল থাকে। কিন্তু কাছিদাতে প্রথম পাদের সহিত দ্বিতীয়ের মিল নাও থাকিতে পারে। ফল কথা কবির ইচ্ছার উপর পাদের মিল নির্ভর করে। এই কাছিদা হইতে রোবায়ী ও গজলের উৎপত্তি। রোবায়ীতে প্রথম পাদের সহিত দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদের মিল থাকে। তৃতীয় পাদের সহিত প্রায়ই থাকে না। আর গজল হইতেছে ছোট ছোট কবিতা যাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা, ঈশ্বরের গুণগান কিম্বা বিরহের গান অথবা প্রেমের কাহিনি আমরা বেশীর ভাগ দেখিতে পাই। গজল উর্দ্ধ সংখ্যায় ৫ হইতে ১২ Stanzaর বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। যাক্ এ সমস্ত বলা আমার উদ্দেশ্য নহে তবে মোটামুটি যাহা যাহা জানা দরকার তাহাই বলিলাম। আর্‌বী সাহিত্যে উক্ত ১৬টি ছন্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাই তাহাদেরি কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম মাত্র।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

খেয়ালী

(১৪)

কয়েকদিন সীতার না আসায় ধীরার দিনগুলা খুব ভাল কাটিতেছিল না। যদিও ধীরা প্রত্যহই একবার সীতাদের বাড়ী যাইত, কিন্তু সীতার সঙ্গে তেমন অবাধ প্রাণখোলা হাসি গল্প জমিয়া উঠিত না। কিরণের ভারি মুখ কিশোরী দু'টির উচ্ছলতা দমিত করিয়া রাখিত। ধীরাকে কিরণ কোন দিন অনাদর করিত না বটে, তথাপি ধীরা তাহার সম্মুখে মুখ খুলিতে পারিত না। জমিদারের বৃহৎ ভবনে তাঁহার পোষ্যবর্গের মধ্যে ধীরার সমবয়স্কার অভাব ছিল না, তাহারা ধীরার সঙ্গলাভের জন্য লালায়িতই ছিল, কিন্তু মিতভাষিণী মৃদু স্বভাবা ধীরা কেন যে মুখরা চঞ্চলা সীতাকে অধিক পছন্দ করিত, তাহা বলা কঠিন।

দ্বিপ্রহরে ধীরা ঘুমাইতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া রামায়ণ লইয়া পড়িতে বসিল। ভরতের কথা পড়িতে পড়িতে তাহার সুন্দর কালো চোখ দুটি যখন আর্দ্রতায় চক্ চক্ করিতেছিল, তখন অমিয় সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি পড়ছ ধীরা?"

অমিয়র স্বরটা ধীরার কাণে যেন তখন কেমন বেসুরা লাগিল। সে বই খানা মুড়িয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল "রামায়ণ।"

অমিয় বিরক্তি প্রকাশক ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিল, "যত বাজে বই পড়া। খানিকটা ইংরেজী বা সংস্কৃত পড় না।"

ধীরা বলিল, "রামায়ণের এই গদ্য সংস্করণটা নাকি খুব ভাল হয়েছে, দাদা তাই আমাকে পড়তে বলেছেন।"

ধীরার কথা শেষ হইতে না হইতে অমিয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ধীরা সেই উচ্চ হাস্যে এমন একটা অবজ্ঞার ঝঙ্কার অনুভব করিল যে, তাহার দেহ মন জ্বালা করিতে লাগিল। সে বলিল, "ছোড়দা, তুমি দাদাকে একটুও শ্রদ্ধা কর না।"

অমিয় তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি তো তোমার ভরতও নই, লক্ষ্মণও নই। বিধাতার ভুল,—তুমি মেয়ে হয়েছ। ছেলে হলে নিশ্চয় কলির ভরত বা লক্ষ্মণ হতে পারতে।"

ধীরাকে নিরুত্তর দেখিয়া অমিয় একটু থামিয়া বলিল, "তা তোমার দাদা তো তোমাকে পড়তে বারণ করেনি, লেখাপড়া ছেড়ে দিলে কেন? মণি বাবু সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ধীরা এখন পড়ে না কেন?"

মণিভূষণের কথা শুনিয়া ধীরার কপোল ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল। সে ভূমিতল বদ্ধ দৃষ্টি হইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আমি আর পড়ব না।"

অমিয়র অধরে শ্লেষতীব্র হাসি প্রস্ফুট হইল। সে বলিল, "দাদার ভক্ত বোনের যোগ্য কথাই বটে!"

ধীরা এবার রাগ না করিয়া থাকিতে পারিল না। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দাদাকে তুচ্ছ করা, অবজ্ঞা করাও পুণ্য নয়। তুমি আমাকে জ্বালাতন করোনা, নিজের কাযে যাও।"

"আমি তোর কেউ নই, দাদাই সব" বলিয়া অমিয়ও রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ধীরা ইহাতে আশ্চর্য্য হইল না। অজিতের কথা লইয়া ধীরাকে জ্বালাতন করা এবং তাহার প্রতিবাদ করা হইলে রুষ্ট পদক্ষেপে চলিয়া যাওয়া আজকাল অমিয়র যেন নিত্যকর্ম্ম হইয়াছে। কিন্তু অমিয়র মুখে আজ মণিবাবুর কথা শুনিয়া অজিতের উপরই ধীরার রাগ হইতে লাগিল। অজিত যদি সেদিন মণিবাবুর কাছে ধীরার কথা না বলিত, তবে তো তাঁহার কাছে পড়িতে ধীরার এমন লজ্জা করিত না। তাঁহার প্রতি ধীরার 'ভক্তির' কথা শুনিয়া তিনি যেন কি-ই মনে করিয়াছেন। সীতাও কি দুষ্ট মেয়ে! যখন তখন সে মণিবাবুর কথা লইয়া তাহাকে ঠাট্টা করে। সীতার পরিহাসের কথাগুলা মনে পড়ায় নির্জ্জন কক্ষেও ধীরার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পরে যখন হরপ্রসাদ শৈলজার সঙ্গে ধীরার বিবাহ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তখন অজিতকে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। অজিত তো স্বেচ্ছায় কখনও তাঁহার সম্মুখে আসে না। অন্নপূর্ণার মৃত্যুর পরে পিতাপুত্রের মধ্যে যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছিল, ঘটনা পরম্পরায় তাহা দৃঢ়তরই হইতেছিল। পিতাতে যে পুত্রের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে, এ ধারণাই পিতার ছিল না। পিতার সম্বন্ধে পুত্রেরও বোধ করি সেইরূপ ধারণাই ছিল।

অজিত কক্ষে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, কৃষ্ণপুরের জমিদার যে সে দিন ধীরাকে দেখতে এসেছিলেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে কি ধীরার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?"

অজিতের কথা শুনিয়া হরপ্রসাদ বিস্মিত হইলেন। অজিত ধীরাকে খুব ভালবাসে, তাহা তিনি জানিতেন; কিন্তু তাহার বিবাহ বিষয়েও তাহার কিছু বক্তব্য বা জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে, তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, "এখনো হয়নি, কিন্তু শীগগিরই হবে বোধ হয়।"

"ওখানে ধীরার বিয়ে না দিয়ে মণি বাবুর সঙ্গে দিলে হয় না?"

"মণিবাবু কে?"

"আমাদের প্রফেসর মণি বাবু। রূপ, গুণ, বিদ্যা, বংশ-মর্য্যাদা সবি তো তাঁর আছে।"

হরপ্রসাদ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। শৈলজা নীরব ঔৎসুক্যের সহিত স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল। অজিতের প্রস্তাব শুনিয়া সে বিস্মিত হইলেও খুসী না হইয়া থাকিতে পারিল না। জমিদারী ছাড়া মণিভূষণের এমন সব আছে যে, তাহাকে জামাতৃ-পদে বরণ করিবার লোভ স্বতঃই

জন্মিতে পারে। এই কথাটাই যে শৈলজার মনে দু'একবার জাগে নাই, তাহা নহে; কিন্তু হরপ্রসাদ কন্যার জন্য জমিদারের ঘরেই সুপাত্র খুঁজিতেছিলেন, তাই সে কথাটা মুখ ফুটিয়া স্বামীকে বলিতে পারে নাই। কৃষ্ণপুরের জমিদারের ছেলেটি দেখিতে তেমন সুশ্রী নয়, লেখাপড়ায়ও খুব ভাল নয়। তবে আই, এ, পড়িতেছে বটে এবং জমিদারের ছেলেও বটে। ধীরারও বয়স হইয়াছে, এখন আর বেশী দিন রাখাও চলে না। অগত্যা কৃষ্ণপুরে সম্বন্ধ স্থির করিতেই শৈলজা স্বামীকে বলিতেছিল, এহেন সময়ে অজিতের এই প্রস্তাব।

অনেকক্ষণ পরে হরপ্রদাদ আবার অজিতকে বলিলেন, "মণিভূষণ সুপাত্র বটে, কিন্তু ধীরা যেভাবে মানুষ হয়েছে, তাতে ওদের ঘরে গেলে হয়তো ওরা অসুবিধায় পড়বে। চাকরী ছাড়া ওদের আরতো কিছুই নেই।"

অজিত বলিল, "জমিদার না হলেও মনিবাবুদের আর্থিক অবস্থা ভাল। ওঁর বাবা ময়মনসিংহে উকিল, তিনি ঢের টাকা পান। বড় ভাই আলিপুরে ওকালতি করেন, মেজ ভাই ডিপুটি।"

হরপ্রসাদ আবার ভাবিতে লাগিলেন।

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, "মণিভূষণের এত খবর তুই জানলি কি করে অজিত?" অজিত বলিল, "তাঁকে জিজ্ঞেস করেই জেনেছি। মা, এ সম্বন্ধে কি তোমার কোন আপত্তি আছে?"

শৈলজা স্মিতমুখে বলিল, "না বাবা, সব রকমেই মণি জামাই হওয়ার যোগ্য।" হরপ্রসাদ বলিলেন, "যদি তার কিছু ভূসম্পত্তি থাকত, তবে আর আমার কোন আপত্তিই ছিল না।"

পিতার আপত্তি শুনিয়া অজিত ম্লান ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে ভাবিতে নিকটস্থ টেবিলের ফুলদানী হইতে একটা গোলাপ তুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। কাহারও মুখে কথা ছিল না। কক্ষটি শব্দশূন্য। সহসা অজিত অতিশয় উদ্দীপ্ত হইয়া পিতার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। হারানো প্রিয় জিনিস খুঁজিয়া পাইলে মানুষ যেমন কণ্ঠে কথা কহে, অজিত তেমনি কণ্ঠে বলিল, "বাবা, আমার তালুকটাতেও বছরে পাঁচ ছ' হাজার টাকা আয় হয়ে থাকে, বিয়েতে সেইটাই আমি ধীরাকে যৌতুক দেব। তাহলে ধীরার আর কোন অসুবিধে হবে না।"

অন্নারম্ভের দিন হরপ্রসাদ অজিত ও অমিয়কে এইরূপ মূল্যের দুইখানি তালুক যৌতুক দিয়াছিলেন।

অজিতের কথা শুনিয়া নীরব প্রশংসায় শৈলজার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু হরপ্রসাদের মুখে তাহার মনোভাবের কোন ছাপই পড়িল না। তিনি শুধু অজিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিকে তোর এতটা ভাল লাগল কেন বল দেখি?" অজিত বলিল, "তাঁকে আমার খুবই ভাল লাগে। তাঁকে জানবার যে সুযোগ পেয়েছি, সব জায়গায় তা পাব না। তা ছাড়া এই বিয়ে হলে ধীরা সুখী হবে বলেই আমার মনে হয়।" অজিতের কথার শেষাংশ খানিক সঙ্কোচজড়িত মৃদুকণ্ঠে

অজিতের ইচ্ছা জয়যুক্ত হইল। ধীরার বিবাহ সম্বন্ধ মণিভূষণের সঙ্গেই স্থির হইল। মণিভূষণের পিতা আসিয়া ধীরাকে দেখিয়া খুব খুসী হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

যখন বিবাহের বিপুল আয়োজন চলিতেছিল, তখন একদিন অমিয় মায়ের কাছে আসিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাদার তালুকটা তোমরা নাকি ধীরাকে যৌতুক দিচ্ছ ?"

শৈলজা প্রশ্নের ধরণে বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমরা দিতে যাব কেন ? অজিত নিজেই দিচ্ছে।"

"কিন্তু দাদার তালুকটা না নিয়ে বাবা নিজেওতো একটা তালুক যৌতুক দিতে পারতেন ?"

"তিনি কেন অজিতের তালুক নিতে যাবেন ? তবে অজিতের যৌতুক দানে বাধা দিচ্ছেন না বটে।"

"বাধা দেওয়া উচিত ছিল। তুমি কেন বাধা দাওনা ?"

"আমি বাধা দেব ! মা হয়ে ছেলের মহৎ কাযে বাধা দেব !"

"মহৎ কায ! সবাই বলবে কি, জান ? ঘরে সৎমা আছে বলেই অজিত এমন কায করতে বাধ্য হয়েছে।"

"তা বলুক। মিথ্যা নিন্দা আমি অগ্রাহ্য করতে পারি। কিন্তু আমি যে সৎমা, একথাটা শুধু তোরই মনে আছে; আমারো নেই, অজিতেরও নেই। আশ্চর্য্য! অজিতের একটা ভাল কাযও তুই সহ্য করতে পারিসনে! কিন্তু তোর ভয় নেই, তুই ধীরাকে তালুক যৌতুক দিলিনে বলে কেউ তোর নিন্দা করবে না।"

দুঃসহ ক্রোধে অমিয় চুপ করিয়া রহিল।

নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে মহাসমারোহে মণিভূষণের সহিত ধীরার বিবাহ হইয়া গেল।

ফুলশয্যার রাত্রে মণিভূষণ ধীরার মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া সেই মুখের পানে পুলকিত দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। তাহার মনে হইল, ধীরার সুন্দর মুখে লজ্জাজড়িত আনন্দ রেখায় রেখায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সেই সানন্দ লজ্জার রক্তিম লীলা নিকেতন দেখিতে দেখিতে সে ভাবিল, ধীরাকেই সে জন্ম জন্ম প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে। তাহার জন্মজন্মান্তরের প্রিয়া আজ আবার নূতন হইয়া তাহাকে ধরা দিয়াছে মাত্র!

(১৫)

বিবাহের পরেই মুঙ্গের কলেজের অধ্যাপক হইয়া মণিভূষণ চলিয়া গিয়াছে। শ্বশুরের অনুরোধেও সে ওকালতি করিতে রাজি হয় নাই। বিবাহের ছ'মাস পরে আজ ধীরাও শ্বশুর ঘর করিতে চলিয়া গেল। বিদায়কালীন তাহার অবিরাম ধারাবর্ষণকারী চক্ষুদু'টির রক্তিমা এবং স্ফীতি রহিয়া রহিয়া অজিতের মনে পড়িতে লাগিল। সে খানিক বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু অতুল, রামু প্রভৃতির সঙ্গ আজ আর তাহার অসাড় নিস্পন্দ মনের মধ্যে [illegible]

জাগাইতে পারিল না। ঘুরিতে ঘুরিতে সে কখন যে সীতার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। করুণা তাহার শুষ্ক মুখ লক্ষ্য করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "পাগলা ছেলে, কিছু না খেয়েই বুঝি ঘুরতে বেরিয়েছ? মুখ যে শুকনো দেখছি।"

অজিত নিঃশব্দে একটুখানি হাসিল। সত্যই সে আজ না খাইয়াই ভোরবেলা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। বেলা যে কত খানি হইয়াছে, সে হিসাব তাহার ছিল না। করুণা একখানা রেকাবীতে কিছু জলখাবার আনিয়া অজিতকে দিলেন। অজিত খাবার খাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী সীতাকে বলিল, "রাণি, পাণ দিবি নে?"

"দিচ্ছি" বলিয়া সীতা দু'টি পাণের খিলি আনিয়া অজিতকে দিল। অজিত পাণ চিবাইতে চিবাইতে ম্লান হাসির সহিত বলিল, "রাণি তুইওতো ধীরার মত শীগগিরই শ্বশুর বাড়ী চলে যাবি।"

বিবাহের কথা শুনিয়া সীতা ঈষৎ হাসিল, ধীরার মত লাল হইয়া উঠিল না। করুণা বলিলেন, সেই আশীর্ব্বাদই কর বাবা, সীতা যেন ধীরার মত ঘর বর পায়।" অজিত হাসিয়া বলিল, "ধীরার বিয়ের ঘটকালি তো আমি করেছি। তোর বিয়ের ঘটকালিটাও আমি করব নাকি রাণি?"

সীতা করুণার পশ্চাতে সরিয়া গিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া চোখ ঘুরাইয়া অজিতকে ছোট্ট একটি কিল দেখাইল।

করুণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অজিত, তোমার, কি তোমার বন্ধুদের খোঁজে কি কোন ভাল ছেলে নেই?"

অজিত বলিল, আছে বৈকি পিসিমা, কিন্তু সীতাকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। ও এখনো আমাকে মারবে বলে শাসায়।"

করুণা সীতার পানে চাহিয়া সস্নেহে হাসিলেন। তারপর কি কাযের জন্য চলিয়া গেলেন।

সীতা বলিল "শুনলাম, তোমার বিয়েও নাকি শীগগির হবে।"

অজিত কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "বোধ হয়।"

সীতা সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "কবে? কোথায়? মেয়ে দেখতে কেমন? লেখা পড়া কেমন জানে? তুমি নিজে দেখেছ?"

অজিত মনে মনে হিসাব করিয়া সীতার প্রশ্ন সমূহের জবাব দিল, "বোধ হয় দু'এক মাসের মধ্যে। রাম নগরে। দেখতে বেশ সুন্দর। লেখা পড়া বেশ জানে, আমাকে শেখাতে পারবে বোধ করি। আমি নিজে দেখিনি।"

অজিতের গাম্ভীর্য্যে ও জবাবে সীতা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। হাসির বেগ থামিলে বলিল, "নিজে দেখনি, তবে 'বেশ সুন্দর' কেমন করে জানলে?"

অজিৎ বলিল, "তারা খুব বড় ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে মার জন্যে। মা সেটা আমার ঘরে

"তাই নাকি ? এক্ষুনি তা হলে দেখতে যাব।"

"এক্ষুনি যেওনা, তা হলে তোমার মার কাছে বকুনি খাবে। ও-বেলা পিসিমাকে নিয়ে যেও। আমি এখন উঠি, ঢের বেলা হয়ে গেছে।" বলিয়া অজিৎ উঠিল।

অজিৎ বাড়ী আসিয়া দেখিল, অতুল তাহার কক্ষে প্রতীক্ষা করিতেছে। সে প্রবেশ করিতে না করিতেই অতুল জিজ্ঞাসা করিল, "এই ছবিখানা কোথা পেলে ? অজিত একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। তারপর উৎফুল্ল নেত্রে ভাবী বধূর চিত্র প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আন্দাজ করে বল দেখি, কোথায় পেলাম ?"

অতুলের আন্দাজ করিতে বিলম্ব হইল না। অজিতের বিবাহের কথা সে শুনিয়াছিল। সে বলিল, "এ তোমার ভবিষ্যৎগৃহ-লক্ষ্মীর ছবি তো ?"

অজিত মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঠিক তাই।"

"একে তোমার পছন্দ হয়েছে ?"

"হবেনা কেন ? দেখতে বেশ। তা ছাড়া—"

"হাইকোর্টের নামজাদা উকিলের মেয়ে। লেখা পড়া, গান বাজনা, সবি জানে।"

"তুমি এসব খবর কেমন করে জানলে ?"

"অমন আশ্চর্য্য হলে কেন ? তোমার রত্নটিকে তুমি গোপন ক'রে রাখতে চাইলেও সেকি তার আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত হতে পারে না ?"

"ঠাট্টা রাখ। সত্যি, তুমি একে চেন নাকি ?"

"চিনি বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ আলাপ পরিচয় নেই।"

"তা হলে কি করে চিনলে ?"

"অন্যের মারফতে।"

"কেমন ক'রে, আমায় বলনা।"

"বিয়ে এখনো হয়নি, তবু এর কথা শুনবার জন্যে এত আগ্রহ! বিয়ে হলে বোধ হয় তোমার টিকিটিও আমরা দেখতে পাবনা। আচ্ছা, বলছি শোন। এর নাম যে শোভনা, তা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। একজনে এই শোভনার 'লভে' পড়েছিল। ওকি! ভয় পেলে নাকি ? ভয় নেই। তোমার মানসী মনে মনে আর কাউকে বরণ করেনি; করলে তো একখানা মিলনান্ত নাটকই হতে পারত, আর আমরা সেটা প্লে করতাম। 'লভ' টা একতরফাই হয়েছিল। শোভনা তার বিন্দু বিসর্গও জানে না। আমি তিন বার চেষ্টা করেও আই, এ, পাস করতে পারলাম না। বাবা বোধ হয় বিয়ের বাজারে দর বাড়াবার জন্যে কলকাতার মেসেই আমাকে রাখলেন, কলেজ থেকে নামটাও আমার বিচ্ছিন্ন করে নিলেন না। বাবার আশা পূর্ণ করবার

মধ্যে আমার মত ছেলেরও অভাব ছিল না। আমি শুনেছি, মেসওলার ধারে যদি কোন বাড়ী থাকে—যার অধিবাসিনী দু'একজন যুবতী বা কিশোরী—তাহলে মেসগুলিই হয় নাকি প্রেমের উদ্ভব স্থান। বাঙ্গালীর ছেলেদের প্রেমে পড়বার জন্যে তপোবন বা দ্বীপের দরকার হয় না। আর সে সব তারা পাবেই বা কোথায়? কিন্তু প্রেমে না পড়লে চলে কেমন করে? যাক্। আমাদের মেস শোভনাদের বাড়ীর সংলগ্নই ছিল। পশ্চিম ধারের ঘরটার জানালা খুললেই শোভনাদের একটা ঘরের সব দেখা যেত। ছাদে উঠলে তাদের উঠানের সবখানটাই প্রায় নজরে পড়ত। সেই পশ্চিমধারের ঘরটায় একলা থাকত ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র অমল। সে 'শরীরিণী' শোভনাকে দেখে এবং তার মিষ্টি গলার অশরীরী গানগুলি শুনে খুব তাড়াতাড়ি তার 'লভে' পড়ে গেল। সে ছাদে উঠে লুকিয়ে লুকিয়ে পদ্য লিখতে আরম্ভ করে দিল। মেঘের সজল শোভা, মলয় বাতাস এবং চাঁদের আলো তার প্রিয় ভক্ষ্য হয়ে উঠল। আর সে মাঝে মাঝে গদ্ গদ্ স্বরে 'শেলী'র 'লাভ্‌স ফিলোসফি' আওড়াত। তার এই সব লক্ষণ দেখে আমার সন্দেহ হলো। একদিন তার কবিতার খাতা আবিষ্কার করে ফেললাম। শোভনাকে উদ্দেশ করে খাতায় অনেক কবিতাই লেখা হয়েছিল। তারপর অমল বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী চলে গেল, আমিও ভারতীর চরণে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। কিন্তু শুনেছি, অমলের পক্ষ হতে নাকি শোভনার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাবও করা হয়েছিল।

"তবে সে বিয়ে হলো না কেন?"

'অমলের বাবা জমিদার হলেও তোমাদের মত এত বড় লোক নন। রাজডাঙ্গার জমিদার বংশ বাঙ্গালা দেশে পরিচিত, অমলের বাবা তাঁর দেশেই শুধু পরিচিত।"

"আমার সঙ্গে যদি বিয়ের কথা না হতো, তবে শোভনার বাবা অমলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতেন?"

"খুব সম্ভবতঃ দিতেন। কারণ অমল খুব ভালভাবেই বিয়ে পাস করেছে, আর সে জমিদারের ছেলেও বটে। শোভনা একটা 'চিজ' বটে। তাকে দেখেই একজন ভালবেসে ফেলল, আর একজন তার ছবি দেখেই পছন্দ করে বসল। আজকাল বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে এটা পরম সৌভাগ্য বটে।" বলিয়া অতুল হাসিতে লাগিল। এমন সময়ে শৈলজা আসিয়া ছেলেকে ধমকাইল, "বারোটা বেজে গেছে, আজ খাওয়া দাওয়া নেই নাকি তোর? আর কতক্ষণ গল্প চলবে, শুনি?"

"আমি এখন আসি" বলিয়া অতুল কুণ্ঠিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

শৈলজা বলিল, "না অতুল, এখন না খেয়ে যেতে পারবে না। অজিতের সঙ্গে খাবে, এস।"

"তাতে আর আপত্তি কি?" বলিয়া অতুল হাসিতে হাসিতে শৈলজা ও অজিতের অনুসরণ

সেদিন সারাদিনই অজিতের মনে অমলের কথা জাগিতে লাগিল। আচ্ছা, অজিতের তো আরও চাঁর পাঁচটা সম্বন্ধ উপস্থিত আছে। সুন্দরীবধূও তাহার অমিল হইবে না। অমলের সঙ্গেই শোভনার বিয়ে হোক্ না কেন? কিন্তু শোভনার ঢলঢলে মুখ খানি কি সুন্দর! কি মিষ্টি! না-ই বা হইল অমলের সঙ্গে বিবাহ। শোভনাকে তো অজিত আর কাড়িয়া আনিতেছে না। তাহার পিতাই তো তাহাকে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত।

অজিত রাত্রে স্বপ্নে দেখিল, উজ্জ্বল দীপালোকিত, মূল্যবান সজ্জামণ্ডিত বিবাহ সভায় সে বরাসনে বসিয়া আছে, তাহার পাশে বধূবেশিনী শোভনা। শোভনার পিতা কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন। অতুল আসিয়া অজিতের কাণে কাণে বলিল, "চেয়ে দেখ, অমল অই থামটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।" অজিত চাহিয়া দেখিল, থামে হেলান দিয়া এক সুদর্শন তরুণ যুবা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার জামা কাপড় বিশৃঙ্খল ও ময়লা। সর্ব্বরিক্তের গভীর বেদনা তাহার বিবর্ণ মুখে এতই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া বিবাহসভার ভাস্বর আলোকমালা তাহার কাছে একান্ত নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া আসিল, বিবাহ মন্ত্রগুলা সে কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিল না।

অজিত ভোরে উঠিয়া মুখ ধুইয়া শৈলজার কাছে যাইয়া বলিল, "মা, যে মেয়ের ছবি আমার ঘরে রেখেছ, তাকে কিন্তু আমি বিয়ে করতে পারব না।"

শৈলজা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে বলিল, "সে কি! সে দিন ধীরার কাছে বললি পছন্দ হয়েছে। আজ আবার কি হলো?"

অজিত দৃষ্টি নত করিল, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "আমি কিছুতেই এবিয়ে করতে পারব না মা।"

"তোমার মত জানতে পেরে এই মেয়ের কথাই ওঁকে বলেছি। আজতো আবার আমাকে 'না' বলতে হবে। আমি আর এসব কথায় নেই। তোমার বিয়ের কথা তুমি জান, আর উনি জানবেন" বলিয়াই শৈলজা দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া গেল। তাহার ক্রোধ ও বিরক্তির আতিশয্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াও অজিত নিজের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না।

ক্রমশঃ

৺সরোজবাসিনী গুপ্তা

ধরণী

ধরণী, ভরণী, মোর জীবন-দায়িনী!
তৃণে পুষ্পে শস্যে অয়ি প্রাণ প্রবাহিনী!
ধূলিময়ী মৌন মূক নিস্তব্ধ নিশ্চলা,
বিরাট মৃত্তিকা-পিণ্ড বিমূঢ় বিহ্বলা,
অয়ি ধীরা অয়ি স্থিরা, প্রশান্ত অন্তরে
রেখেছ জীবন-বহ্নি ধূলি-স্তরে-স্তরে ;
কোটি কোটি জীবনের জাগ্রত অঙ্কুর
তব ঐ মূক গর্ভে রহে পরিপূর ;—
ধ্যানময় প্রাণময় নির্ব্বাক্ সঞ্চয়—
সৃষ্টির সাগ্নিক শক্তি পোষিছ দুর্জ্জয়।
ঐ ক্লিন্ন ধূলিজাল জীবন-চঞ্চল,
ঐ মৌন মাটিস্তূপ সৃজনে উচ্ছল।
পুষ্পে হাসিয়াছ তুমি, পর্ব্বতে উদ্দাম
প্রাণ-বেগে ঊর্দ্ধে উঠে শাসো অবিরাম ;
বিহঙ্গে মেলিয়া পাখা শূন্যে কর জয় ;
সমুদ্রে তোমারি প্রাণ বিরাট্ নির্ভয়
উদ্বেল উত্তাল ক্ষিপ্ত ভীম দুর্দ্দমন ;
বৃক্ষে তুমি শ্যামদ্যুতি নয়ন-শোভন ;
মানবে প্রমূর্ত্ত তুমি চরম বিকাশ,—
বিজয়ী করুণ দৃপ্ত সংযত প্রকাশ ;
শ্বাপদে হিংস্রক তুমি দুরন্ত ভয়াল।
হে বহু-জীবন-ধাত্রী করুণ করাল।

আজি স্তব্ধ নিশীথের সুপ্ত অন্ধকারে
দাঁড়ায়ে নিরখি তোমা এপার ওপারে ;—
পড়ে' আছ শব্দহীনা যেন নাহি প্রাণ,
সুপ্তিস্বপ্নজালঘেরা এক অবসান।

তুমি যে গড়িছ কোটি প্রাণ পলে পলে,
একথা যায় না জানা আজি সুপ্তিতলে।
দাঁড়াইয়ে ধ্যানমৌনা শান্তা তব পাশে
হেরি একি বক্ষ মোর ফুলিছে নিশ্বাসে,
হস্ত দোলে! এ চেতনা এই প্রাণ-গতি
ছিল কি ধূলির গর্ভে এই পরিণতি ?
বাঁচিবার ধরিবার গ্রাসিবার লোভ,
ইচ্ছা-আশা-বাসনার এই যে বিক্ষোভ,
ছিল হোথা ?—ছিল ছিল ; মৃত্তিকার রস
এ মোর শোণিত বিন্দু, মাটির হরষ
আমার এ প্রাণবেগ, ঐ ধূলিরাশি
মাংস মোর, মোর মাঝে উঠেছে উচ্ছ্বাসি'
ঐ ধীর স্থির ধরা আপাত-নিষ্প্রাণ।
তৃণ যথা তোলে মাথা মাটির পাষাণ
করি' ভেদ, সেইমত জাগিয়াছি আমি,
আমার সর্ব্বস্ব এই ধূলি-অনুগামী।
হে মাত ধরণী ধাত্রী. করি নমস্কার,
আড়ম্বরহীনা অয়ি জননী আমার!

দাঁড়াইয়ে সুপ্তিময়ী ধরণীর শিরে
ভাবি আজ কি দিয়েছি কি দিয়েছি ফিরে
ও স্নেহের প্রতিদান ? পেনু প্রাণ, দেহ,
অন্ন পাই, পাই ছায়া সুশীতল গেহ,
জীবন আনন্দে চলে, মিটে প্রয়োজন,
সকল অভাব মোর দৈন্য অগণন।
আমি অকৃতজ্ঞ নর জননীর ঋণ
শোধিতে নারিনু কণা, সুধু স্বার্থলীন।

সহসা শুনিনু শান্তি ভেদিয়া ক্রন্দন
উঠে কার,—আসে কাছে কে নম্র-বদন
শুভ্রবাস সাশ্রু-আঁখি, দেহ জরজর
বেদনার নির্দ্দয় প্রহারে, থরথর
হস্তপদ, স্থানে স্থানে শোণিতের লিখা
শুভ্র অঙ্গে, হেমাগ্নির স্বর্ণময় শিখা
ব্যথিত বিবর্ণ যেন সলিল-সিঞ্চনে।
"কে মা তুমি ?" জিজ্ঞাসিনু বিনম্র বচনে।
"আমি ধাত্রী, জন্মদাত্রী তোমার ভরণী,
আমিই ধরণী, পৃথ্বী, সবার জননী।"
"ধন্য আমি ধন্য আজ হেরিয়া তোমায়,
ঈপ্সিত-দর্শনা অয়ি, শোভা-সুষমায়
শ্যামকান্তি তুমি মাতা, একি হেরি আজ
ম্লানজ্যোতি হতরূপ!—কপোলের মাঝ
ওকি দগ্ধ ক্ষত! কি যাতনা তব মাতা ?"—
কহিনু বিস্ময়ে। "ব্যথা কত বলি না তা"
কহে মাতা সবেদন ভাষে—"সহি সব
অত্যাচার তোমাদের সব উপদ্রব।
আমার অন্তরে যত শ্রেষ্ঠ অভিলাষ
ছিল যত অনুপম আশা ও উল্লাস
সব দিয়ে গড়েছিনু তোমায় মানবে,
আকাঙ্ক্ষা সার্থক হল, মোর অনুভবে
দিলে রূপ সকল আশায় তুমি নর।
কিন্তু বাছা একি আজ প্রহারে জর্জ্জর
কর মোরে অবিরাম, অঙ্গ চিরি' চিরি'
করিছ কর্ষণ, ধর্ষণ পেষণে ঘিরি'
বক্ষে মোর কাট ক্ষত নির্দ্দয় আঘাতে ;
মোর শ্যাম-সুষমায় অত্যাচারী হাতে
করিছ বিলোপ ; মোর প্রিয় পশু পাখী
আমারি সন্তানে তব হিংসাতীক্ষ্ণ আঁখি
সন্ধান করিছে নিত্য ক্ষিপ্ত বুভুক্ষায় ;
দলনে সুদক্ষ তুমি হিংস্রক লীলায়।
তোমারে গড়িনু যবে ছিল মনে আশা
সৃজন সার্থক হবে, সকল পিপাসা
পূর্ণ হবে শান্ত সুতে লয়ে। কিন্তু হায়,
একি ব্যথা একি ক্লেশ একি বেদনায়
আমারে পিষিছ নিত্য।"—মুছিলা নয়ন
ব্যথাতুরা ধাত্রী ধরা। অব্যক্ত ক্রন্দন
বক্ষে ফুলে ওঠে তাঁর।

* * *

সুপ্ত অন্ধকারে
বিরাজে নিবিড় শান্তি স্বপ্ন-পারাবারে।
স্বপ্ন সম হেরিলাম জননীর মুখ,
স্বপ্নে শুনিলাম তাঁর অন্তরের দুখ।
স্বপ্ন-পারাবার-তীরে দাঁড়ানু উদাস,—
জননীর এ যাতনা হবে নাকি হ্রাস ?
বেদনায় নম্র বক্ষে করি অনুভব
ধরণীর' পরে মোর যত উপদ্রব।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

মৃতের কাহিনী

মন্তব্য :—মৈমনসিং-এর সুহাসিনী দেবীর দুঃখ, দৈন্ত ও দুর্দ্দশার কাহিনী,—তাঁহার প্রতি মুসলমান গুণ্ডাগণের অত্যাচার,—কোর্টে আসামিগণের বিচার,—স্বামী কর্ত্তৃক পুনর্গ্রহণ ও সমাজের অত্যাচার প্রভৃতির কথা, আশাকরি এখনও সকলের মনে জাগরূক রহিয়াছে। সুহাসিনী দেবী মৃত্যুর পূর্ব্বে যে পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—সমাজের গতি কোন্ মুখে তাহা বুঝিবার জন্ত নিম্নে মুক্তাগাছার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইল।—বং সং।

(মৃত্যুর পূর্ব্বে সুহাসিনী দেবীর আত্ম-কথা)

প্রকৃত প্রস্তাবে আমি জীবন্মৃত হইয়া আছি। এই মৃতের কাহিনী শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে আত্মা এই পঞ্চভূতাত্মক নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রেতরূপ পরিগ্রহ করতঃ কথা বলিতেছে। ইহা সত্য সত্যই আমার মৃতবৎ অভিশপ্ত জীবনের করুণ কাহিনী।

শুনিয়াছি হিন্দু শাস্ত্রে মৃত্যু আট প্রকার। আমার মৃত্যুও পূর্ব্বেই একপ্রকার হইয়া গিয়াছে। তাই আমি হিন্দুশ্রেষ্ঠ পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুলবধূ হইয়াও প্রেতাত্মার মত কত স্থানে অস্থানে জীবনের এই তরুণ বয়সেই অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কাযেই আমি নিজকে মৃত বলিয়াই মনে ধরিয়া লইয়াছি।

দরিদ্র হইলেও অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশে আমার জন্ম। নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুলবধূ হইয়াও আমি পূর্ব্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলাম জানিনা। বালিকাসুলভ চপলতার ফলে যেদিন শ্বশুর গৃহ হইতে পিতৃগৃহে গমন করিলাম, সেইদিন হইতে আমার এই অভিশপ্ত জীবনের সুত্রপাত। নিষ্কলঙ্ক শ্বশুরকুল হইতে বিচ্যুত হইয়া কোন্ নরকের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হইলাম, কতই না স্থানে অস্থানে ঘুড়িয়া বেড়াইলাম, তাহা এখন ভাল করিয়া মনে করিতেও পারি না। কিন্তু স্মৃতি ত মুছিয়া যায় না। অদ্য পর্য্যন্ত যে বৃশ্চিক দংশন জ্বালা ভোগ করিতেছি তাহা জানি একমাত্র আমি—আর জানেন ভগবান।

শ্বশুর গৃহ হইতে আসিবার পর চিরদুঃখিনী আমি বিদেশে পিতৃগৃহে আশ্রয় লাভ করিয়াও শান্তি পাইলাম না। শ্বশুরগৃহে যাইবার আর কোন আশা নাই দেখিয়া দিন দিন পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিলাম। তিনি যেন আমাকে জঞ্জাল মনে করিতে লাগিলেন। পিতৃ-নিন্দা আর করিব না, আমার কর্ম্মফলের জন্য আমিই দায়ী। এর পর আমার জীবন নাট্যের তৃতীয় অঙ্ক।

আমি যৌবন প্রারম্ভেই দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানগণের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিলাম। কামান্ধ

পশু কি প্রকারে আমাকে নিয়া তাহার পাপ অন্তঃপুরে বন্দিনী করিল তাহা ইতিপূর্ব্বে সকলেই শুনিয়াছেন। রমণীর চিরসম্বল একমাত্র সতীত্ব রত্ন রক্ষা করিবার জন্য পাষণ্ড কর্ত্তৃক কিভাবে দলিতা, লাঞ্ছিতা ও নির্য্যাতিতা হইয়াছিলাম—কেশগুচ্ছ ছিন্ন, দন্ত পংক্তি ভগ্ন ও নিষ্ঠুর আঘাতে সর্ব্বশরীর কিরূপ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। কাযেই সেই বীভৎস দৃশ্যের কথা আর বেশী বলিয়া লাভ নাই।

তরুণ বয়সেই সংসারের কত ভীষণ লীলা খেলা ও ঘাত-প্রতিঘাতের পর অবশেষে দেশ ও সমাজের আশ্রয়স্থল রংপুরের হিন্দু জমিদার শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের বীরত্ব ও মহত্ত্বে দুরাত্মাদের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলাম। তারপর মামলা মোকদ্দমা, আসামী, সাক্ষী, জবানবন্দী, জেরা, জুরী, জজ, রায় প্রভৃতি কতকিছু ঘটনা ঘটিল। তাহা মনে করিতেও মস্তিস্ক বিকৃত হইয়া উঠে।

বর্ষার ঘনঘটা কাটিয়া যাইতেই একদিন প্রভাতে দেখি, নারীজন্মের ইহ পরকালের সাক্ষাৎ দেবতা আমার স্বামী আমাকে তাঁহার শ্রীচরণতলে আশ্রয় দিবার জন্য উপস্থিত। সংসার ও সমাজের ভীষণ ভ্রুকুটির কথা একবারও মনে হইল না, ঝাঁপাইয়া গিয়া আমার স্বামীর চরণ তলে পতিত হইলাম। তিনিও আশ্রয় দিলেন। সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা এমন কি বিশ্ব সংসার পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলাম।

তিনি আমাকে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত আনিয়া প্রথমতঃ এক কংগ্রেসকর্ম্মীর আশ্রয়ে, তৎপর মহাপ্রাণ বিপিনবাবুর আশ্রয়ে রক্ষা করিলেন। উদারচেতা পরদুঃখকাতর ময়মনসিংহের ডাক্তার বিপিনবাবুও আমাকে পিতৃবৎ যত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে জ্যেষ্ঠতাত-শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর অনুগ্রহে তাঁহাদের আশ্রয়ে মুক্তাগাছা আসিলাম। তাঁহারাও হাসিমুখে স্থান দিলেন। বুঝিলাম এতদিনে কুল পাইলাম। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। অদৃষ্ট চক্রের আবর্ত্তনে বিরুদ্ধ ফল ফলিল। এমনই অভিশপ্ত জীবন আমার, এমনই কাল সাপিনী আমি যে আমার নিশ্বাসে পর্য্যন্ত সমস্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া দগ্ধ হইয়া যায়। শ্বশুর গৃহেও আগুন ধরাইলাম।

গঙ্গাস্নান ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গৃহে আসিবার কয়েকদিন পরেই শুনিলাম শ্বশুর মহাশয়ের কাজ আর নাই। তিনি আশ্রয়শূন্য ও সমাজচ্যুত হইয়াছেন। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সহিত অবাধে চলা ফেরা করিতেন, তাঁহারা এখন সকলেই বিরূপ হইলেন। ক্রমে কত নিন্দা চর্চ্চা, শ্লেষ বিদ্রূপ, কত অত্যাচার অবিচার, লাঞ্ছনা গঞ্জনা তাঁহার মাথায় বর্ষিত হইতে লাগিল তাহা আর কত কি বলিব। বুঝিলাম সমাজে দুর্ব্বলের স্থান নাই। বুঝিলাম সমাজ কেবল নিপীড়ন করিতেই পারে। আহতকে হত করিতে পারে কিন্তু কাহাকেও রক্ষা করিবার শক্তি তাহার নাই।

ক্রমে অন্নসমস্যা দেখা দিল। সংসার আর চলেনা। একবেলা জুটে ত অপর বেলা জুটেনা। এতেও কিন্তু শ্বশুর মহাশয় অচল অটল, সৌম্য ও শান্ত। আমার প্রতি তাঁহার করুণার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে দারুণ ধিক্কার উপস্থিত হইয়াছে। হায়! এই অভাগিনীর জন্যই একটী সুখশান্তিপূর্ণ পরিবার পথে বসিতে চলিয়াছে। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূর নাম নিয়া মাঠে ঘাটে, হাটে, বাজারে, কত আন্দোলন আলোচনা, তর্কবিতর্ক, ঝগড়া বিবাদ, এমনকি কুৎসিৎ ইঙ্গিত পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল। সমাজের বজ্রদণ্ড তাঁহার মস্তকোপরি সদ্য উত্তোলিত দেখিয়াও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হ'ন নাই। ইতিমধ্যে একদিন আবার শুনি আমার সর্ব্বনাশকারী আসামিগণের পুনঃ বিচারাভিনয় হইবে। আবার আমাকে জজসাহেবের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া অভিনয় করিতে হইবে। ক্রমে এইসব কথা যতই ভাবি সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে, মস্তক বিঘূর্ণিত হয়, নরকের সেই বীভৎস দৃশ্যপট চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জ্বালা দেয়। এখন আর আমার এই যন্ত্রণা, এই জীবন্মৃত অবস্থা সহ্য হয় না। দুর্ব্বল নারী আমি, সহ্য করিবার শক্তিই আর আমার কতটুকু? এখন কেবল দিন রাত্রি এই ভাবি আর মা জগজ্জননীর চরণে করুণা প্রার্থনা জানাই যে তোমার চরণে স্থান দিয়া আমার শ্বশুরকুলে শান্তি ফিরাইয়া আন। আমাকেও তোমার চিরশান্তিময় দেশে লইয়া যাও। নারীজাতি আমরা, তোমারই অংশ হইতে উদ্ভূত। এই পাপ পৃথিবী ও স্বার্থান্ধ সমাজে স্থান না পাইলেও তোমার চিরশান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দাও। তুমি ত জান মা আমি কতখানি নিষ্পাপ। এই পার্থিব বিচারে আমি নিরপরাধিনী হইয়াও দোষক্ষালন করিতে পারিলাম না সত্য, কিন্তু তোমার সূক্ষ্ম বিচারে আমি নিশ্চয়ই মুক্তি পাইব।

(সুহাসিনী দেবীর মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

বাস্তবিক সুহাসিনী দেবী যে কি নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে; তাহা তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলেই পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়। এত নির্য্যাতন নিপীড়ন, লাঞ্ছনা গঞ্জনার হাত হইতে যদিও এক মহাপুরুষ তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন, তাঁহার স্বামী ও শ্বশুর তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন, কিন্তু অভাগিনীর কর্ম্মফলে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের অসহনীয় মর্ম্মান্তিক যাতনা তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। মাতৃজাতিকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা সমাজের কিছুমাত্র নাই। কিন্তু দৈবাৎ কোন কারণে কেহ উদ্ধার পাইলে তাহাকে পদদলিত ও লাঞ্ছিত করিবার শক্তি এখনও যথেষ্ট আছে। সমাজ উৎশৃঙ্খল ও ব্যভিচারীর দণ্ডদানে সর্ব্বদাই শিথিলহস্ত হইলেও অবলার প্রতি নির্য্যাতনের সময় তাহা কঠোরতার সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে।

কুট আইন মাহাত্ম্যে মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের আদেশ হওয়ায় অভাগিনীর হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। ঘৃণায় লজ্জায় ত্রাসে পার্থিব সমাজ ও বিচারের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য করুণাময়ীর চরণে প্রার্থনা জানাইল। সন্তানবৎসলা জননী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উপেক্ষিতাকে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার স্নেহ-কোমল হস্ত প্রসারণ করিলেন। ক্রমে ফিট্ আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। গলা দিয়া অবিশ্রান্ত রক্তপাত হইতে লাগিল। অবশেষে সর্ব্বংসহ কাল আসিয়া তাঁহাকে সকল নিন্দাগ্লানির অতীত রাজ্যে লইয়া গেল। ইহাতেও কিন্তু পরিত্রাণ হইল না। তাঁহার শব-দেহের সংকার লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। সারাদিন তাহা ঘরে পড়িয়া রহিল। শুচিবাগীশগণের মধ্যে নাকি কেহ কেহ মিউনিসিপ্যালিটীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অনায়াসে কয়েকজন সৎসাহসী যুবক অগ্রসর হইয়া অপরাহ্নে চিরদুঃখিনীর শবদেহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়া, অপরিণামদর্শী ও আচারভ্রষ্ট প্রভৃতি আখ্যায় বিঘোষিত হইল। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেছিলাম। দেখিতেছি তাহাও বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। সত্যমিথ্যা জানিনা, কোন মহাত্মা নাকি এইসমস্ত ব্যভিচার সহ্য করিতে না পারিয়া অভাগিনীর মৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়া প্রকাশ করায় যথাসময়ে পুলিশ তদন্তও হইয়া গিয়াছে। জনরব, দাইকারী ও চিকিৎসকগণের দিনাজপুরে দায়রা আদালতে ডাক পড়িবে। অপরংবা কিং ভবিষ্যতি।

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

প্রেমের নশ্বরতা

(হাল)

অদর্শনে প্রেম নাহি থাকে,
বেশী দেখা নষ্ট করে তা'কে।
নিন্দুকের বাক্যে পায় ক্ষয়,
অকারণও বিনষ্ট প্রণয়।

শ্রীগনেশচরণ বসু

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি

মন্তব্য—এই প্রবন্ধের লেখক গিরিশচন্দ্রের সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার যে সমস্ত আলোচনা হইত, তাহার যতদূর তাঁহার স্মরণ আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। বং সঃ

আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের বাণীর বরপুত্র মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্টভাবে আমার পরিচয়-সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। তখন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায় অবরুদ্ধ, স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল উচ্ছ্বাস বাংলাদেশে স্বার্থত্যাগী যুবকবৃন্দ সহর্ষে কারাবরণ করিতেছে এবং জাতীয় নাট্যকবি গিরিশচন্দ্র শিবাজী নাটক রচনা করিতেছেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

"দেশের সরল নির্ভীক ছেলেরা কতকগুলো professional রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্চে।" এই বলিয়া তিনি একটী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আমি প্রতিবাদচ্ছলে তাঁকে বল্লাম "আপনি কি এই আন্দোলন কৃত্রিম ও অসরল মনে কর্‌ছেন?"

গিরিশচন্দ্র। নিশ্চয়ই। আজ যদি কেহ প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক বর্ত্তমান থাক্‌তেন, তবে তিনি আজ এই দুর্দ্দশায় অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌তেন। শুধু বঙ্গভঙ্গ রহিত কর্ব্বার জন্য দেশের তরলমতি ছেলেরা জেলে যাবে আর নেতারা বক্তৃতা ক'রে হুজুগে হাততালি পাবে আর যশের মুকুট মাথায় পর্‌বে।—এটা কি স্বদেশপ্রেম?

আমি তদুত্তরে বল্লাম "কিন্তু তা ছাড়া আর গতি কি?"

গিরিশচন্দ্র। কেন? যেখানে লাখ লাখ লোক অনাহারে অর্দ্ধাহারে রয়েছে, ম্যালেরিয়া, প্লেগ আর অন্যান্য উৎকট ব্যারামে লাখ লাখ ভারতবাসী মর্‌ছে—যেখানে নৈতিক চরিত্র-হীনতায়, মূর্খতায়, ব্যভিচারে—কদাচারে—কোটী কোটী লোক উচ্ছন্ন যাচ্ছে—তাদের উদ্ধার, তাদের সেবা করা কি তোমাদের Bengal partition রদ্ কর্ব্বার চেয়ে বড় নয়? আর এখন শুধু বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখ্‌লে কি চল্‌বে? সমগ্র ভারত যাঁতে একভাবে প্রণোদিত হয়ে organised হয় তা করাই দরকার।

আমি বল্লাম "মহাশয়! শুধু বড় আদর্শ চোখের সামনে ধরছেন—তাই ব'লে ছোট খাট আদর্শকে ছেড়ে দিতে হবে? এই যে স্বদেশী আন্দোলন—এটা কত বড় ব্যাপার।

গিরিশচন্দ্র। [illegible] ভাবপ্রবণ লোকেরা

হাজার হাজার টাকার কাপড় পুড়িয়ে ফেল্‌ছে। একে গরীব দেশ—তাতে কত কষ্টে লোক এক জোড়া কাপড় কিনতে পারে। দেশের আর্থিক অবস্থা কি এতই সচ্ছল যে লাখ লাখ টাকার জিনিষ লোকে আগুনে আহুতি দিতে পারে? বল্‌বে—পুড়িয়ে ফেলা বিলেতী কাপড়ের উপর ঘৃণাপ্রকাশ। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই বড়াই কর্‌বার মুরোদ আছে? আর এই লোকশান আমাদের না বিলেতের? আমাদের দেশী মহাজনেরা ক্রোর ক্রোর টাকার কাপড় আগাম খরিদ ক'রে রেখেছে। সে লোকসান আমাদের না বিলেতের? দেড়টাকার জোড়ার মিহি কাপড় পুড়িয়ে বল্‌বে পাঁচটাকা জোড়ার দেশী মিলের কাপড় কেনো। কিন্তু এই পাঁচটাকা আসে কোত্থেকে?

সস্তাদরে বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি কাপড় তৈয়ারী ক'রে লোকের সাম্‌নে ধর্‌তে পার—তবে স্বদেশী আন্দোলন সফল হ'তে পারে। আগে দেশে সুতো তৈরী হোক্ কাপড় বোনা হোক্ আর দরে সস্তা হোক্! এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর অভাবের দিনে শুধু উত্তেজনায় কিছু হ'বে না—শুধু তখন জগতে মুখ হাসাবে যখন দেখবে **যে-তোমরা** বক্তৃতা ক'রে সভা ক'রে লাখ লাখ টাকার কাপড় পুড়িয়েছ—**সেই-তোমরা** ক্রোর ক্রোর টাকার বিলেতী কাপড় কিন্‌তে ছুটেছ। দেশের স্বাধীনতা এত সহজ নয়, শুধু উত্তেজনায় দেশকে চালিত কর্‌লে হয় না। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বিচার ক'রে নির্দ্দিষ্ট পথে চল্‌তে হয়।

একতা—একতা কর্‌চো—কল্‌কাতার প্রতি পল্লীতে এরূপ organisation হোক্ দেখি, যেখানে প্রত্যেক পল্লীর সাধু বিশ্বাসী পবিত্রচরিত্র মুরুব্বি স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটী Board of Directors গঠিত হতে পারে এবং পল্লীর প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ততঃ ১০৲ টাকা দিয়ে অংশীদার হ'বে। এতে—এক কলিকাতায় ক্রোর টাকার উপর উঠতে পারে। সেই মূলধন ক'রে আগে এই কল্‌কাতায় হউসআলাদের oust কর দেখি। ধরনা এই কলকাতায় হউসওয়ালারা শুধু বিলেতী এজেন্সি নিয়ে চল্‌চে। আগে এদের তাড়াও দেখি। বেশ ক'রে বুঝে দেখ এই বাণিজ্যের উপর ইংরাজজাতির রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত। ভারতে ইংরাজের একচেটে বাণিজ্যের মূলে যতক্ষণ আঘাত না লাগ্‌বে ততক্ষণ তারা কংগ্রেস কনফারেন্সের চেঁচামেচিতে ভুল্‌বে না। সমগ্র দেশ এইভাবে যদি organised হয় তবে স্বদেশী আন্দোলন সফল হ'তে পারে। তা না হ'লে দেশলাইয়ের কাঠির মত দপ্ ক'রে জ্বলে উঠেই নিবে যাবে।

ভারতে ধীরে ধীরে ইংরাজের অধিকার—মূল বাণিজ্য। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইংরাজের যে চরিত্র ছিল এখনও তার একটুও বদ্‌লায় নি। এদেশে Chamber of Commerce এর voice শুনে লাট বড়লাট চলে—এদেশে আইনকানুন তৈয়ারী হয়।

আমি বল্লাম "মশায়! ঠিক এরই জন্য আমাদের কংগ্রেস কনফারেন্সের রাজনৈতিক আন্দোলন দরকার। আমরা যদি Self Government পাই বা আমাদের যদি Status

হয় তবেই আমরা আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি করতে পারবো এবং ইউরোপের অবাধ বাণিজ্য-নীতির দমন করতে পারবো।"

গিরিশচন্দ্র। কি আবোল-তাবোল বল্‌ছো? ইংরেজ কি এতই মূখ্যু মনে কর যে তোমাদের হাতে সব অধিকার তুলে দিয়ে তারা পোট্‌লা পুট্‌লি বেঁধে বিলেতে গিয়ে ঘোড়ার দানা চিবিয়ে খাবে? কেউ কখনও নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে। বিশেষ বণিক জাত। কংগ্রেস কনফারেন্সে যে রাজনৈতিক আন্দোলন—তা বক্তৃতার ফোয়ারা। পড়তে বেশ—শুনতে বেশ। তাতে কি হবে? প্রত্যেকেই নেতা হ'তে চান তাই নিয়ে দলাদলি। দেশের দুর্দ্দশা মোচন, দেশের দুর্দ্দশার জন্য keen feeling, দুই একজনের থাকতে পারে—কিন্তু অপর সকলে একটা হুজুগে যায় এইতো আমার বিশ্বাস।

আমি বল্লাম "সে কি মশায়! এই যে স্বদেশী আন্দোলন যার জন্য শত শত ছেলে জেলে যাচ্ছে—সেটা কি শুধু হুজুগ? তাদের ভিতর দেশাত্ম-বোধ জন্মেছে,—স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত হ'য়েই তারা জীবনকে তুচ্ছ বোধ করছে, মরণকে উপেক্ষা করতেও প্রস্তুত—সেই সব কি শুধু হুজুগ? আর সেই ভাবে যাঁরা সমগ্র জাতকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন তারা যে পেশাদারী রাজনৈতিক নেতা আমি তা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই।

গিরিশচন্দ্র। যদি নেতারা প্রকৃত patriot হ'তেন আর ছেলেরা স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত হ'ত তবে মুসলমানরা জামালপুরে কালী প্রতিমা ভাঙ্গতে সাহস করতো না বা ভাঙ্গতে সাহসী হ'তো না!—যদি দেশে প্রকৃত নেতা থাকতো আর ছেলেরা স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত হ'ত তবে মুসলমান গুণ্ডারা মা বোন্ স্ত্রীর উপর অত্যাচার করচে তাই শুনে শুধু বক্তৃতা ক'রে লাফাতো না। আর ছেলেরা লাঠির কস্‌রত ক'রে লোক দেখান parade ক'রে বেড়াত না! ভারতের ইতিহাসে এটা বলে না। রক্তনদীর স্রোত ব'য়ে না গেলে গুণ্ডারা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারতো না—আর প্রতিমা ভাঙ্গার, স্ত্রীলোকের অত্যাচারের প্রতিশোধ না দিয়ে তারা লাঠি ত্যাগ করতো না। কি বল্‌ছো তুমি—বাংলাদেশে কি মানুষ আছে? ভীরু বাঙ্গালী আগে ভয় ত্যাগ করুক—তবে অন্য কথা।

আমি বল্লাম—মশায়! এটা মানতে হবে যে বাঙ্গালী আর ভীরু নয়।

গিরিশচন্দ্র। তবে কি বীর সাহসী বলবো! তা যদি হ'তো তবে বাংলার অর্দ্ধেক দুঃখ ঘুচ্‌তো। জেনো আজ যদি ইংরেজ তোমাদের প্রকৃত বীর প্রকৃত সাহসী মনে করতো তবে রাস্তায় ঘাটে নেটীভ ব'লে মুখ ফেরাত না।—তোমরাও রাঙ্গামুখ দেখলে ভয়ে আঁৎকে উঠতে না।

আগে গায়ে জোর হোক্, শরীর মনের বল যাতে বাড়ে তাই কর। স্বাধীনতা শুধু বীরেরই প্রাপ্য। এটা ঠিক জেনো—অভিমানহীন না হ'লে পরের সেবা করবার

অধিকারী হয় না। সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগী অভিমান শূন্য না হ'লে কেউ দেশের প্রকৃত সেবা ক'র্তে পারে না। বড় বড় বীর, বড় বড় মহাপুরুষেরা এই অভিমানের বশবর্ত্তী হ'য়ে নিজের সর্ব্বনাশ ও দেশের সর্ব্বনাশ করেছেন। এই দেখ চিতোরের মহারাণা প্রতাপ সিংহ—তাঁর মত ত্যাগী তাঁর মত বীর তাঁর মত স্বাধীনতাপ্রিয় তাঁর মত স্বদেশপ্রেমিক শুধু ভারতে কেন জগতে দুর্ল্লভ! কিন্তু আভিজাত্যের অভিমানে তিনি অম্বরের মানসিংহের সঙ্গে যে ব্যবহার কর্লেন—তার শোচনীয় পরিণাম ফলের সাক্ষী ইতিহাস। যদি প্রতাপসিংহ অভিজাত্যের অভিমান ত্যাগ ক'রে মিলনপ্রয়াসী মানসিংহকে সাদরে আলিঙ্গন কর্তেন—তবে মোগল ইতিহাস অন্য আকারে পাওয়া যেত। এই স্থানে শিবাজী প্রতাপের অপেক্ষাও বড়।

বড় আদর্শ সম্মুখে ধ'রে কাজ না কর্লে কোনও জাত বা ব্যক্তি উন্নত হ'তে পারে না। এই, ধর শিবাজী—তাঁর গুরু রামদাসের প্রেরণায় সমগ্র ভারতে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য গো-ব্রাহ্মণ ও অত্যাচারিত দুর্ব্বলকে রক্ষার জন্য এক মহা রাষ্ট্র গঠন কর্তে প্রয়াস ক'রেছিলেন। শিবাজী নিঃস্বার্থ ত্যাগী দেশসেবক—তাই তাঁর রাজ্য তাঁর গুরুদেবের নামে উৎসর্গ ক'রেছিলেন। তাঁর রাজসিংহাসন গৈরিক বসনে মণ্ডিত ছিল তাঁর ত্যাগের দীপ্তিতে রাজ্য সমুজ্জ্বল—জাতীয় পতাকা গৈরিক রঙ্গে রঞ্জিত ছিল, এইরূপ ত্যাগের উচ্চাদর্শ না থাক্লে সেই "পার্ব্বতীয় মূষিক" মোগল সিংহাসন কম্পিত কর্ত্তে পার্তো না। স্বাধীনতা, মুক্তি শুধু কথার কথা নয়। এটা ছেলে খেলা নয়। শুধু ইংরাজের সঙ্গে পাল্লা দিলেই হ'ল? তোমাদের দুজন লোক একসঙ্গে হয়েছে তো কথাবার্ত্তা হবে সবাই ছোট আর তুমি মস্ত বাহাদুর! কোনও ইউরোপীয়দের সঙ্গে আলাপ কর্তে, হয় তাদের নিকটে বল যে তোমরা পাশ্চাত্য সভ্যতায় শিক্ষিত হ'য়ে বুঝেছ সাবেক ধর্ম্ম, সমাজ, আচার—ভ্রান্ত কুসংস্কার পূর্ণ। আর না হ'লে বল্বে সাহেব! ভাগ্যি তোমরা এসেছিলে তাই অবনতির মহাপঙ্ক থেকে ভারতকে উদ্ধার ক'রেছ। এই তো তোমাদের জাতীয়তা-বোধ। বল দেখি, কোন্ জাতীয়ভাবে দেশ মেতে উঠেছে?

আমি বলিলাম "মহাশয়! আপনি যা বল্ছেন তা ঠিক। তবে বর্ত্তমান আন্দোলন যে জাগরণের সূচনা—তা স্বীকার কর্তে হবে।

" গিরিশচন্দ্র। তা তোমার কে অস্বীকার কর্ছে! Don't misunderstand me. আমার বিশ্বাস এই আন্দোলন misdirected—কতকগুলি পেশাদার রাজনৈতিক নেতার হুজুগে ছেলেরা মেতে উঠেছে। আমার বিশ্বাস দেশ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের আর আদেশের অনুসরণ না ক'র্লে কিছুতেই অগ্রসর হ'বে না।—তিনি বারবার দেশকে ব'লে

গেছেন যে ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূল প্রাণ ধর্ম্মে। বার বার তিনি সাবধান ক'রে গেছেন যে বিদেশীয় অনুকরণে রাজনীতির আন্দোলনে দেশকে চালিত ক'রো না—ক'র্‌লেই ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্ট হবে!

আমি বল্লাম—"এই ধর্ম্ম মানে কি? শুধু ঠাকুর পূজা ধ্যান ধারণা নিয়ে থাকার নাম কি ধর্ম্ম? এটা শুধু আমার নয়—আমার মত অনেকেরই গোলমাল ঠেকে, ধর্ম্ম কি?"

গিরিশচন্দ্র অবাক হয়ে বল্লেন "সে কি—তোমার গোলমাল ঠেকে? স্বামী বিবেকানন্দ তো তা বেশ বিশদভাবে বুঝিয়েছেন।"

আমি। স্বামিজী তাঁর প্রাচ্য পাশ্চাত্যে বলেছেন—মহাউৎসাহে ধন উপার্জ্জন কর, দশজনকে পালন কর—তবে তুমি ধার্ম্মিক! বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—সামদান ভোগদণ্ডনীতি প্রকাশ কর পৃথিবী ভোগ্ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক!

গিরিশচন্দ্র। নিশ্চয়ই!

আমি। কিন্তু ধার্ম্মিক বল্‌তে আমরা সচরাচর বুঝে থাকি ত্যাগ বৈরাগ্য ভগবদ্‌ভাবে বিভোর নিষ্কিঞ্চন অনাসক্ত ঈশ্বর প্রেমিক।

গিরীশচন্দ্র। তাও ঠিক! কি জান মানুষের ভিতর শ্রেণী বিভাগ আছে। সবাই পূর্ণ সাত্বিক, পূর্ণ রাজসিক কিম্বা পূর্ণ তামসিক নয়। সেই গুণানুযায়ী সে কর্ম্ম করে। প্রত্যেকে গুণানুযায়ী কর্ম্মে অধিকারী! যিনি পূর্ণ সাত্ব-গুণান্বিত, তিনি ভগবদ্ভাবে বিভোর, তাঁর দ্বারা পৃথিবী ভোগ করা হয় না। এরূপ সত্ব গুণান্বিত লোক জগতে খুব বিরল। কিন্তু যাঁরা রাজসিক গুণান্বিত তাঁরা মহা উৎসাহে ধন উপার্জ্জন কিম্বা যশঃ খ্যাতি অর্জ্জন ক'রে পৃথিবী ভোগ করেন।—তাঁদের ধর্ম্মই সচরাচর ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়ে থাকে—কেন না নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপে এই ভাবটা প্রবল। প্রত্যেক স্তবের পরে স্তব রচয়িতা যে ফল প্রাপ্তির প্রলোভনে প্রলুব্ধ ক'রেছেন—তাও ধর্ম্ম। চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই সব নিয়ে যে লাভ তাই ধার্ম্মিকের লক্ষ্য। মুমুক্ষু শুধু মুক্তি প্রার্থনা করেন। তা ছাড়া ধর ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা ধর্ম্ম, আততায়ীকে বিনাশ করা ধর্ম্ম, অত্যাচারিত দুর্ব্বলকে রক্ষার নিমিত্ত পীড়নকর্ত্তার বিনাশ ধর্ম্ম, এবং যুদ্ধ বিগ্রহে প্রাণীহিংসা ধর্ম্ম! মনে কর "শিবাজী" র মিঠাইয়ের ঝুড়িতে পলায়নও ধর্ম্ম।

আমি। আচ্ছা মশায়! লোকে ধর্ম্মের নাম শুন্‌লে ক্ষেপে ওঠে, বলে "রাখ তোমার ধর্ম্ম—এই ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে হিন্দু জাত রসাতলে গিয়েছে!" ভারতে তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা, তেত্রিশ কোটী জাতের বিচার তেত্রিশ কোটী আচার বিচার—এই দিয়ে দেশ উঠ্‌বে?

গিরিশচন্দ্র। তুমি যা বল্‌লে—এই সমুদায় আমরা ইংরেজদের ইতিহাসে পড়ি—কিন্তু ধর্ম্মের নামে সাম্য নীতি স্বাধীনতা এদেশেই প্রচার হ'য়েছে। চণ্ডাল গুহক রামচন্দ্রের

আলিঙ্গনে বদ্ধ। শবরী-দত্ত ফল শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়। রাজপূজ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাখালের প্রেমের অধীন। দাসীপুত্র নারদ ত্রিলোকপূজ্য—জাবালি-পুত্র সত্যকাম ব্রাহ্মণ মহিমায় আদৃত। শাস্ত্র পুরাণের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত র'য়েছে।—আজ চারশো বছর আগেও শ্রীচৈতন্যদেব "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ।"—প্রচার ক'রে গেছেন—তা এদেশেরই Message, ইউরোপ থেকে ধার করা নয়। গীতায় "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তি"—তা' এদেশেরই Message ইউরোপের ধার করা নয়। এই ধারণা বাংলা দেশে সে দিনও মহাসাধক রামপ্রসাদ গেয়ে গেছেন "কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে"—এই Catholicity এই দেশেরই, ইউরোপের ধার করা নয়—আর ভারতের—জগতের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী আবির্ভূত হ'য়ে ছিলেন নিরক্ষর দীন ব্রাহ্মণ পূজারী বেশে—তোমাদের ইংরাজী শিক্ষায় পণ্ডিত হ'য়ে নয়। সব দেশে, কালপ্রভাবে আবর্জ্জনাস্তূপ আসে তাই ব'লে কেহ মূল বস্তুকে ত্যাগ করে না। ইউরোপের প্রত্যেক জাতির দুশ তিনশো বৎসর আগেকার ইতিহাস প'ড়ে দেখো দেখি। যে কারণ গুলো বল্‌ছো সব তাদের বিদ্যমান ছিল কিনা দেখতে পাবে। আজও বর্ণ-বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা পরহিংসা কিছু কম নয়। Anglo-Saxon সময় হইতে Wales, England, Scotland, Irelandএর পরস্পর কত যুদ্ধ কত নর শোণিত পাতে আজ United Kingdom of Great Britain and Ireland হয়েছে—তাও Irishরা গা-মোড়া দিচ্ছে। একটা Common Cause or grievance একতার সহায়ক। ভারতবর্ষে সেই Common Cause ধর্ম্ম। এই ধর মুসলমান জাত। এরা সে দিনও বাদশা ও নবাবের জাত ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে এই জাতির সহিত একতা অসম্ভব।

আমি বলিলাম "ধর্ম্মে আরও অসম্ভব? মুসলমানের চক্ষে হিন্দু কাফের—হিন্দুর চক্ষে মুসলমান যবন!"

গিরিশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা। কিন্তু এই যবন ফকীরের পদতলে হিন্দুর মস্তক বিলুণ্ঠিত—আজও লাখ লাখ হিন্দু নরনারী এই মুসলমান পীরের দরগায় সিন্নি মানত করে আর হিন্দু সাধুর পাদমূলে ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের শির লুণ্ঠিত। কবীর নানক প্রভৃতির জীবন—এর জ্বলন্ত উদাহরণ। দেখ প্রেমে লোককে এক করে। প্রেমে বিদ্বেষ হিংসা দূর করে। ধর্ম্মাচরণে মানুষের হৃদয়ে প্রেমপদ্ম বিকশিত হয়। সেই প্রেমে শাক্ত বৈষ্ণব বৌদ্ধ জৈন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পার্শী এক হ'বে। রাজনীতির আসরে মূলে একতা না থাক্‌লে নেতাগিরি নিয়ে অধিকারের দাবী নিয়ে পরস্পরের লড়াই হবে। জেনে রেখ সর্ব্ববিধ একতার মূল প্রেম, সেবা। স্বামিজীকে যার ইচ্ছা জ্ঞানী বৈদান্তিক বলুক আমি দেখি মহাবীর মহাপ্রেমিক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। যেদিন জয়দৃপ্ত গর্ব্বিত সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির সমক্ষে এই নগ্ন কৌপীনধারী সন্ন্যাসী ভারতের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা ক'রে

বিজয়মাল্য গ্রহণ ক'রছিলেন—জেনো সেইদিন থেকে ভারতের ডাক পড়েছে। ভারতবর্ষের এখনও অনেক দুর্দ্দশা আছে তাই সেই মহাবীরের আহ্বান ভুলে দেশ রাজনৈতিক আন্দোলনে মত্ত হ'য়েছে।

আমি বল্লাম "তবে সব ত্যাগ ক'রে দেশ কি শুধু ধ্যান ধারণায় মত্ত হ'বে?"

গিরিশচন্দ্র। স্বামিজী কি তাই ব'লেছেন? এখনকার বর্ত্তমান কার্য্য—সেবা! জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সেবা! এই সেবাধর্ম্ম প্রকৃতভাবে পালন করলে সব হিংসাদ্বেষ দূর হ'য়ে যাবে। দুঃস্থ আর্ত্ত রুগ্ন উৎপীড়িত মুসলমানের সেবা ক'রে দেখ—সে তোমাকে ভাই ব'লে আলিঙ্গন দেয় কি না। কিন্তু স্বামিজীর এই কথা মনে রেখ "চালাকীদ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না, প্রেম সত্যানুরাগ মহাবীর্য্যের—" Policy ক'রে সেবা নয়—প্রকৃত সরল প্রেমানুরাগে সেবা ক'রে দেখ। দেখ ঠাকুর একটা বিষয়ে সবাইকে বিশেষ সাবধান ক'রে দিয়েছেন সেটা "ভাবের ঘরে চুরি ক'র না।" Policy দ্বারা কায করলে কখনও হবে না। আমার বিশ্বাস দেশের বর্ত্তমান আন্দোলনের ভিত্তি Policy. এর জীবন বিদ্যুতের মত ক্ষণস্থায়ী, কিছু চোখ ঝল্‌সাতে পারে বটে!—শিবাজীতে আমি এই আদর্শ দেখাবার চেষ্টা কর্‌ছি যে ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অত্যাচারিত দুর্ব্বল পীড়িতকে রক্ষা করার জন্য ত্যাগের উপর সেই মহাবীর মহারাষ্ট্র গঠন কর্‌তে প্রয়াস ক'রেছিলেন। শিবাজীর দেহত্যাগে সেই মহান্ আদর্শ ত্যাগ ক'রে যাই তাঁর ভাবী বংশধরেরা ক্ষমতাগর্ব্বে ও বিলাসব্যসনে অনুরক্ত হ'ল—তখনই সমগ্র জাতির অধঃপতন। বীর মারাঠা তখন বর্গী দস্যু তস্করে পরিণত হ'ল। পৃথ্বিরাজের সময় থেকে এমন কি তার পূর্ব্বেও মহাপুরুষদের ভাব পরবর্ত্তীয়েরা ঠিক অনুসরণ করতে না পেরে সমগ্র জাতকে উন্নত কর্‌তে পারেনি। ভারতের ইতিহাসে এই এক অভিশাপ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাপুরুষদের আবির্ভাবে ভারতের প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত থাকে—তারই ফলে আমরা পরপদদলিত পরপদানত হ'য়েও বেচে আছি। স্বামিজী তাই ব'লেছেন যে জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে আমাদের কিছু দেবার আছে তাই আমরা বেঁচে আছি। দেখ বাবা বিশ্বাস কর জগতে মহাশক্তি সঞ্চার কর্‌তে ভারতকে শ্রেষ্ঠ অধিকার দান কর্‌তে ঠাকুর এসেছিলেন। দেশের মধ্যে এখন প্রধান কার্য্য ঠাকুর যে ধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শ দেখিয়ে গেছেন—তা প্রচার করা, যাতে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ দূর হয়। Solidarity of nations এর জন্য এটা বিশেষ দরকার। সেবাধর্ম্ম ও শিক্ষার প্রচার বিশেষ আবশ্যক, যত narrowness, bigotry meanness শিক্ষার বিমলালোকে তিরোহিত হ'বে। কিন্তু জেন সাহস বল বীর্য্য চাই—তাই স্বামিজী "ব্রহ্মচর্য্যে"র উপর এত stress দিতেন। স্বামিজীর নির্দ্দিষ্ট পন্থার অনুসরণ করাই বর্ত্তমান বাঙ্গালীর—ভারতবাসীর প্রধান

কার্য্য। আমার "সৎনাম" নাটকে দেশসেবার কি আবশ্যক তা দেখাতে চেষ্টা ক'রেছি। কিন্তু পঞ্জাবীদের আপত্তিতে ২।১ রাত্রি অভিনয় হ'য়েই বন্ধ হল। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শিবাজীর অদৃষ্টে কিআছে কি জানি।

আমি বল্লাম "আচ্ছা মশায়। আপনার এরূপ আশঙ্কা হচ্চে কেন?"

গিরিশচন্দ্র। নাটক যে পুলিশে পাশ হওয়া চাই। এই দেখ না দেশের কি দুর্ভাগ্য যে নাটকের বিচারকর্ত্তা সমালোচক পুলিস। সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের কোনও প্রতিবাদ নাই। পুলিসের নির্দ্দেশমত চরিত্র dialogue ও scene বদ্‌লাতে হয়।

আমি বল্লাম "এটা থিয়েটার সম্প্রদায় থেকে আপত্তি করা উচিত।"

গিরিশচন্দ্র। থিয়েটার সম্প্রদায়ের আপত্তি কে শুন্‌বে? এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই তো থিয়েটারের নামে খড়্গহস্ত। public থিয়েটার কর্‌তে হলেই পুলিসের সঙ্গে আমাদের ঘর কর্ন্না কত্তে হয়। তারা দুটো কথা শোনে, বোঝালে একরকম বোঝে, কিন্তু বর্ত্তমান রুচিবাগীশ সাহিত্যিকদের আমার আরও ভয় আছে। সাহিত্যক্ষেত্রে কিম্বা অভিনয়োপলক্ষে কাহারও দ্বারস্থ হই নাই—আর নাটক পাশ হবার জন্য আবার কার উমেদারী কর্‌বো।

আমি। কেন আপ্‌নি কি বর্ত্তমান সাহিত্যিকদের পছন্দ করেন না?

গিরিশচন্দ্র। তুমি আমার কথা বুঝ্‌লে না। বাংলাদেশে প্রকৃত সাহিত্যিক সমালোচক জন্মায় নাই। আমার কথা ছেড়ে দাও, বংলায় বড় বড় কবি ও ঔপন্যাসিকদের জিজ্ঞাসা ক'রো তাঁরা সরলভাবে বলুন—আজ পর্য্যন্ত তাঁদের গ্রন্থের প্রকৃত সমালোচনা হয়েছে কি না। সমালোচনার মূলে সহানুভূতি চাই। গ্রন্থকার যে সত্য ও আদর্শ প্রচার কর্‌তে প্রয়াস কচ্ছেন তা সাধারণের নিকট পরিস্ফুটভাবে ধরা সমালোচকের কাজ। সেই সত্য ও আদর্শ সর্ব্বত্র চরিত্রে বিকশিত হয়েছে কি না, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমাবেশ স্বাভাবিক কিনা ঘটনার সন্নিবেশে ঘাতপ্রতিঘাত সহজ সরলভাবে পরিচালিত কিনা এবং নরনারীর কথোপ-কথনে চরিত্রগত সুসঙ্গতি রক্ষা হয়েছে কিনা ইত্যাদি আনুপূর্ব্বিক আলোচনায় গ্রন্থের সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্য প্রদর্শন করাই প্রকৃত সমালোচকের কাজ। সাহিত্যিক মাধুর্য্য, কল্পনা সৌষ্ঠব ও বিচিত্রতা বিশ্লেষণ করিয়া দেখানই সমালোচকের কাজ। এইরূপ সমালোচনায় প্রকৃত সাহিত্যের উন্নতি হ'য়ে থাকে। আজকাল মাসিকপত্রের সমালোচনা দেখনি? গ্রন্থকারের সহিত যদি আত্মীয়তা আর বন্ধুত্ব থাকে কিম্বা গ্রন্থকার অর্থশালী ও পদস্থ হন তবে তিনি সাহিত্যের মহারথী—তিনি বাইরণ শেলী সেক্ষপীর মিল্টন সব একাধারে। লোকে কিন্তু মূলগ্রন্থ সম্বন্ধে যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকে। আর গ্রন্থকার যদি অপরিচিত কিম্বা অপ্রিয়ভাজন হন—তবে তাঁর একেবারে অনন্ত নরকের ব্যবস্থা। দেশে সমালোচক কোথায়?

আমি। দেশে এত গ্রাজুয়েট এবং সাহিত্যিকের ছড়াছড়ি আর আপনি বল্‌ছেন, সমালোচক নাই। সময়ে সময়ে লোকের সমালোচনায় তিতবিরক্ত হ'তে হয়।

গিরিশবাবু হাসিয়া বলিলেন "বটে," পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখ, এখনকার শিক্ষাপ্রণালীই বোধ হয় এর জন্য দায়ী। ছেলেরা ক্রমাগত মুখস্থ ক'রে পাস কর্‌তে ব্যস্ত; deep regular study নাই। আমি ছেলেদের কোনও দোষ দিই নি। আসল কথা সাহিত্যের গতি আরও বর্দ্ধিত হ'লে—সাহিত্য আরও পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক হ'লে সমালোচক আপনি জন্মাবে! গোড়াতে এমনিই হ'য়ে থাকে!

আমি। আপনার কথার ভাবে বুঝচি যে সমালোচনাও একটা art বিশেষ।

গিরিশবাবু। তাতে আর সন্দেহ আছে। Artist এর চোখ না থাক্‌লে কি art বুঝ্‌তে পারে, না বোঝাতে পারে! প্রকৃতির Hidden truth prophet কবি গায়ক চিত্রকর ভাস্কর আবিষ্কার করেন। যে সত্য সাধক সাধনায় উপলব্ধি করেন কবি কল্পনায় তা অনুভূতি ক'রে দেখান, গায়ক সুরে সেই সত্যের প্রকাশ করেন, চিত্রকর বিভোর হয়ে তা আঁকেন, আর ভাস্কর স্থাপত্যে তার মাধুর্য্য ফুটিয়ে তোলেন। সমালোচক বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে তা প্রচার করেন। দেখ ভাস্কর একখণ্ড পাথর কুঁদে স্থুলরূপে ভাবের লীলাবৈচিত্র্য দেখান, চিত্রকর নানাবর্ণের সমাবেশে স্থুলে সূক্ষ্ম ভাবের প্রতিফলন করেন, গায়ক বাদক সুরে সেই কল্পনালোকের সৃজন করেন কবি কথায় ছন্দে গেঁথে ভাবের রসবৈচিত্র্যে সত্যকে নয়নগোচর করান আর সাধক মহাপুরুষ তাঁর নিজ জীবনের লীলাগতির ঝঙ্কারে সেই সত্য মুখরিত করেন। চতুঃষষ্ঠিকলা সঙ্গিনী করে মহামায়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়ত খেলা কচ্চেন! নানা বর্ণে নানা ছন্দে তাঁরই মাধুরী লীলা। এই বলিয়া গিরিশবাবু নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলে তিনি "কাল এসো" বলিয়া সহাস্যে বিদায় দান করিলেন।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন।

অনুযোগ

(কালিদাস)

চূত-মঞ্জরী সোহাগে চুমি
অভিনব মধু-লোলুপ তুমি,
কমলে-বসতি মাত্রে কেন,
মধুকর, তা'রে ভুলিলে হেন?

শ্রীগণেশচরন বসু

পুত্র-স্নেহ

(১)

অনেক দিন পরে কমলা ও শতদলের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। ছোটবেলায় মহাকালী পাঠশালায় একত্র পড়া, "যা কুন্দেন্দুতুষারহার ধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা" অথবা "প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং" প্রভৃতি শ্লোক একত্র সুর করিয়া আবৃত্তি করা, পুতুলের বিয়ে উপলক্ষ্যে ছোটজামায় লেস লাগানো প্রভৃতি কত কথাই না মনে পড়ে! তখন উভয়ের কতই না ভাব ছিল! পাশাপাশি বাড়ী; কমলা দিনের মধ্যে একশ'বার ছুটিয়া আসিয়া শতদলের খোঁজ করিত। রাত্রে জানালার ধারে বসিয়া দুই সখীতে কত কি চুপে চুপে বলিতে থাকিত। উভয় বাড়ীর অভিভাবকদের তাড়া খাইয়া রাত্রি দশটার সময় শেষে যে যার ঘরে শুইতে যাইত।

দুইজনেরই এক সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর ঘনিষ্ঠতা যেন আরও নিবিড়তর হইল। তাহাদের বরের গল্প করিতে করিতে কথার শেষ হইত না, স্বামীদের চিঠির প্রত্যেক অক্ষর তাহারা মনে করিয়া পড়িত,—একজন পড়িত, আর একজন ব্যাখ্যা করিয়া যাইত। সেই সকল চিঠি ও তাহার ব্যাখ্যা লইয়া তাহারা কখনও খিল খিল করিয়া হাসিত; কখনও কাণে কাণে কথা কহিয়া কত সুখী হইত; কিন্তু হঠাৎ অপর কেহ আসিয়া পড়িলে সে হাসি থামিয়া যাইত—যেন কিছুই হয় নাই এমন ধারা উদাসীনতা দেখাইত। তাহারা কখনও একজনের পত্র অন্যজনে মুসাবিদা করিয়া দিত। শতদল একদিন বলিল, "কম্‌লী, তুই এমনই গুছিয়ে লিখেছিস্ যে আমার নিজের কথা আমি নিজে অমন চমৎকার করে লিখ্‌তে পারতুম্ না।" এইভাবে পরস্পরের প্রতি নিবিড় ভালবাসায় আবদ্ধ হইয়া তাহারা শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করিল।

(২)

তারপর এই দশ বছর আর দেখা শুনা নাই। কমলার স্বামী পাটনার ইঞ্জিনিয়ার, সেইখানেই বারমাস থাকেন। শতদলের স্বামী রাজকিশোর চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় প্রফেসারি করেন। রাজকিশোর বাবু ছাত্রপাঠ্য কয়েকখানি বই লিখিয়া বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতায় চা'র কাঠার উপর একখানি ঝক্‌ঝকে নূতন বাড়ী করিয়াছেন; তাহা ছাড়া ব্যাঙ্কে বেশ দু'পয়সা জমা করিয়া সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন।

দশ বছর পরে কমলার স্বামী নরেশ মুখার্জ্জি কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কমলা ও শতদলের মধ্যে মাঝে মাঝে পত্র ব্যবহার চলিয়াছে। কিন্তু শৈশবে যাহারা একদিনের অদর্শনে প্রলয় মনে করিত, তাহাদের সে ভাব তো আর নাই।

তথাপি কমলা কলিকাতায় আসিয়া প্রথমদিনই ছুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়ার পরে ১০নং বালাখানা রোডে শতদলকে দেখিতে আসিয়াছে।

(৩)

শতদল কমলকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাহারা পরস্পরকে দেখামাত্র মনে করিল, এই দীর্ঘকালের ব্যবধান চলিয়া গিয়াছে— আবার যেন চোখে মুখে কৈশোরের প্রসন্নতা ও প্রাণঢালা ভালবাসা ফিরিয়া পাইয়াছে।

শতদল ঘুরিয়া ফিরিয়া কমলাকে তাহার ঘরগুলি দেখাইল। তাহার ছুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে। বড় ছেলে চন্দ্রকিরণ সাত বছরের, মেয়ে দিগঙ্গনা পাঁচ বছরের এবং কোলের খোকা সবে দেড় বছরের। কমলার কোন ছেলে হয় নাই। ফুলের মত সুকুমার শিশুগুলি দেখিয়া কমলা বড় সন্তুষ্ট হইল। চন্দ্রকিরণ চন্দ্রকিরণের মতই ফুট্‌ফুটে—দিগঙ্গনা সারাদিনই হাসে, কথা কম কয়। তারা "মাসী মা এসেছে" ব'লে আনন্দে তার আঁচল ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কমলা বলিল, "তুই কোন্ ঘরে থাকিস্?"

"কেন, ঐযে ছোট্ট ঘরটি—দক্ষিণের দিকে তুমি তো' দেখেই এলে।"

"আর রাজকিশোর বাবু?"

"তুই কানা নাকি? ঐ যে বড় সাজানো হল্‌ঘরটা দেখিয়ে আন্‌লুম।

"এ যে একঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। মাঝে তিনটা বড় ঘর, এসকল ঘরে থাকে কে?"

"কে আর থাক্‌বে? আমাদের কে আর আছে? জিনিষপত্র, বইয়ের আলমারি, জাপানী ও বোম্বাইয়ের সখের জিনিষে ঘর ভর্ত্তি।"

"তা' ত বুঝলুম, তিনি আর তোমার মধ্যে তো দেখ্‌ছি ক্ষীরসাগর। আমরা তো, ভাই, একঘরে শুয়ে খাট ছু'খানি তফাৎ থাক্‌লে হাঁপিয়ে উঠি। তোরা তো খুব পারিস ভাল।"

"তোর ভাই কোন ঝঞ্ঝাট নেই। ছেলে-পিলে হ'লে কি আর তেমন সখের বহর চিরদিন চালাতে পারা যায়?"

কথাটার মধ্যে কতকটা সত্য থাকিলেও শতদল যেভাবে কথাগুলি বলিল, তা'তে কমলার মনে হ'ল যেন তার সখীর কণ্ঠে একটা খেদের সুর বাজিয়া উঠিল। কমলা চমকিয়া উঠিয়া শতদলের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তোদের দাম্পত্য প্রেম তো খুব গভীর ছিল; তা'তে কি এত শীঘ্রই চড়া পড়্‌ল নাকি?"

"পাগ্‌লী; তোর কল্পনার দৌড় তো খুব? তিনি আমাকে খুবই ভালবাসেন।"

"শতি, ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার কাছে কোন কথা লুকোলে তোর

ঘুম হ'ত না। আজ এত দিনের পর দেখা, আমার কাছে কিছু লুকোতে পার্‌বি না। তোর কথার ভিতর আমি একটা বেদনার সুর টের পেয়েছি। ঠিক বল্‌তো, বোন্‌টি আমার।"

কমলা দেখিল, বর্ষার আগমনে যেমন হঠাৎ একটা কালো মেঘের ছায়া আকাশে বড় হইয়া উঠে, তেমনই একটা বিষন্নতা শতদলের মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কমলার বুঝিতে বাকি রহিল না যে "শতি"র মনে কোন গূঢ় বেদনা আছে। সে তাহা ঢাকিতে যাইয়া ঢাকিতে পারিতেছে না।

কমলার স্নিগ্ধ আদরে ও আপ্যায়নে ক্রমশঃ কিন্তু তাহার সমস্ত সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; ছোট বেলার মত সে তাহার ক্রোড়ে লোয়াইয়া পড়িল। তখন একটি তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া কমলার হাতে পড়িল।

শতদল বলিল, "এমন কোন কথা নয়, যাতে আমি সত্যই কোনরূপ বিপন্ন হইছি। কথাটা খুব বড় নহে। হয়ত আমি মনের ভিতর সেটাকে খুব বাড়াইয়া দেখ্‌ছি। কিন্তু আমি যে কথাটা লইয়া দিন রাত মনে খুব আঘাত পাচ্ছি, তা' নিশ্চয়ই। আর কারু কাছে, এমন কি আমার মায়ের কাছেও আমি এ কথা বলতুম না। কিন্তু তোর কাছে জীবনে সুখ দুঃখের কথা কিছুই ছাপাইনি– আজও ছাপাব না। তবে বিষয়টা বিশেষ গুরুতর নয়।"

(৪)

শতদল বলিল, "আমার স্বামীর মেজাজটা বড্ড সাহেবী রকমের; তিনি বড় ফিট্‌ফাট্‌, পরিষ্কার। তিনি মনে করেন, বাড়ীটাও ঠিক আফিসের মত হবে। দিন রাত লেখাপড়া নিয়ে থাকেন। বাড়ীতে 'টু' শব্দটি হবার জো নেই। আমাকে অবশ্য ভাল বাসেন, প্রাণ দিয়ে ভাল বাসেন। ছেলেপিলেদের যা কিছু দরকার, সে সব দিকে খুবই দৃষ্টি আছে। কিন্তু তারা একটু কলরব ক'ল্লেই চটে উঠেন। তিনি বাড়ী থাক্‌লে তারা নূতন বউদের মত ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলে —সূর্য্যের উত্তাপে ফুলের পাপড়ির মত তারা শুকিয়ে পড়ে—'বাবা' ব'লে ডাক্‌তে সাহস পায় না। তাঁর ঘরের কাছে যাবার সময় পা টিপে টিপে হাঁটে, খুকীটা পর্য্যন্ত ভয়ে জড়সড় হ'য়ে থাকে। নূতন খোকার কান্না তো কিছুতেই বন্ধ করতে পারি না, তাকে নিয়েই হয় বিপদ। এইজন্য ভাই আমাকে দূরে থাক্‌তে হয়। স্বামীর কাছে সন্তানগুলি নিয়ে একত্র বাস করার যে সাধ, তা' মেয়েদের সব চাইতে বড় সাধ। আমার ভাগ্যে ভগবান্ তা লিখেন নি। পাশের বাড়ীতে ধনেশ বাবু সারাদিন আফিস থেকে খেটে এসে ছেলেগুলিকে নিয়ে কি স্ফূর্ত্তি করেন, তা যদি দেখতিস্! নিজে ঘোড়া হ'য়ে, তাঁর একটি খোকাকে পিঠে বসিয়ে বাগানময় ছুটে বেড়ান, চা'র বছরের খোকা একটা চাবুক নিয়ে সপাং সপাং ক'রে তাঁর পিঠে মার্‌তে থাকে; তিনি হেসে হেসে সেই মা'র সহ্য করেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে রোজ বকেন, "তুমি অতিশয় আদর দিয়ে ছেলেগুলিকে একেবারে বাঁদর ক'রে তুল্লে।" তিনি বলেন, "আমার দাসত্বের জীবনের এই

একটু সুখের ঝরণা, এ নিয়ে আমায় ব'কোনা। এসকল শুধু ও-বাড়ীর কথা নয়। ঘরে ঘরেই তো বাপের স্নেহ ছেলেরা পেয়ে থাকে। কিন্তু ছেলেদের জন্য তিনি আমায় তেপান্তরের মাঠে বনবাস দিয়েছেন।"

এই বলিতে বলিতে শতদলের চোখ দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কমলা কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে, তাহার মুখে কথা জুটিতে ছিল না। চোখের জল আঁচলে মুছিয়া শতদল আবার বলিল, "ছেলেদের কারু অসুখ হ'লে তিনি শিশিতে শিশিতে 'ডিস্ইন্‌ফেক্‌টাণ্ট' এনে ঘরে ছড়িয়ে রাখেন। একটা দুটো নার্স এনে তাদের সেবায় লাগিয়ে দেন। আমার ছেলেদের ঘরে যেতে মানা। যদি দু একবার যাই, তবে কাপড় ছেড়ে সর্ব্বাঙ্গে ঔষধ মাখিয়ে,—কোন বীজাণু আমি আঁচলে কি গায়ে করে না আনি তৎসম্বন্ধে সাবধান হ'তে হয়। নানারূপ মেডিকেল পুস্তক পড়িয়ে বীজাণুর ভয়ঙ্কর শক্তির কথা ভাল করে বুঝিয়ে দেন। পীড়িত ছেলে দেখবার জন্য মাতৃ-হৃদয়ের যে ক্ষুধা তা' কি সেই ছাই ভস্ম উপদেশে ঠেকিয়ে রাখতে পারে? আমি তাদের আমাকে না দেখার কষ্ট অনুভব করে কি যন্ত্রণা যে পাই, তা আর কি বল্‌ব? মনে হয়, লক্ষ বীজাণুও যদি আমায় গিলে ফেলে দেয়, তা হ'তে ছেলেদের চোখের কাতর দৃষ্টি ও 'মা' 'মা' বলে ক্ষুব্ধ কান্না আমার পক্ষে বেশী যন্ত্রণাদায়ক।"

এইবার শতদল কাঁদিতে কাঁদিতে আর কথা বলিতে পারিল্ না। আঁচল দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমলা বলিল, "ভাই, কেঁদনা। তোমার স্বামীর মাথায় একটা খেয়াল চেপেছে; চিরকাল এভাব নাও থাক্‌তে পারে। ভাই, অদৃষ্টে যতদিন দুঃখ থাকে ততদিন তা' রোধ ক'র্‌বে কি ক'রে? এমন চাঁদমুখ ছেলেরা, এদের যে দিনরাত কোলে ক'রে রাখ্‌লেও তৃপ্তি হয়না! কারু ভাগ্যে জোটেনা, কেউ পেয়েও তার যত্ন জানেনা। ভাগ্যবিধাতার কাজ, একটা প্রহেলিকার মত। তিনি কি পীড়ার সময়ও এদের কাছে এসে বসেননা?"

"ঘরে উঁকি মেরে এক আধবার দেখে যান। তারপর নানারূপ সাবান ঔষধ দিয়ে আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু তা' ব'লে চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়না।"

শতদলকে ভুলাইবার জন্য কমলা বলিল, "চল্, তোদের ড্রয়িং রুমটা ভাল ক'রে দেখে আসি।" এই বলিয়া রোরুদ্যমানা কমলাকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিতে দিতে কমলা তাহাকে লইয়া সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে লইয়া উপস্থিত হইল। রাজকিশোর বাবু অনেক ছবি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে ছবিটা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির। নেপোলিয়ন আল্পস্ অতিক্রম করিতেছেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একদল অশ্বারোহীর পুরোভাগে শিরস্ত্রাণশোভিত কি জ্বলন্ত বীরমূর্ত্তি, যেন অগ্নিকণা! কমলা বলিল, "এ ছবিখানি কোত্থেকে কেনা হ'য়েছে ব'ল্‌তে পারিস্, শতদল?"

"ছবিখানি নকল নয়, বিলাতী একজন খ্যাতনামা চিত্রকরের আঁকা আদত ছবি। উনি ২০০০৲ দু-হাজার টাকা দিয়ে নিলামে ছবিখানি কিনেছেন। একটা সাহেব পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ও'র দর দিতে চেয়েছিল। উনি ছাড়েন নি। ঐ ছ্যাখ্ আল্পস পর্ব্বতের উন্নত, নত, অসম পাহাড়শ্রেণী,—মেঘের মত অস্পষ্ট। তা'র মাঝে এই দৃপ্ত সৈন্যদলের কি অদ্ভুত তেজস্বী মূর্ত্তি! সৈনিকদের বিচিত্র বর্ণের পোষাক, বিশালকায় কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়াগুলির উদ্যত পদ- এবং মূর্ত্তিমান্ ক্ষাত্রতেজের মত নেপোলিয়ান অঙ্গুলি সঙ্কেতে কি দেখাচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ বাধা চূর্ণ বিচূর্ণ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'য়ে একটা বৃহৎ কামান রক্ত চক্ষে যেরূপ রণক্ষেত্রে নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত করে, যোদ্ধৃদল যেন তেমনি সম্মুখের দিকে তাকাচ্ছে।"

কমলা দেখিল, শতদলের মন সম্পূর্ণরূপে অপর প্রসঙ্গের অনুবর্ত্তী হইয়াছে। সে খুসী হইল। তখন একখানি বড় রকমের তৈলচিত্রের দিকে বিস্ময়ের সহিত তাকাইয়া কমলা বলিল, "এ ছবি কার? এযে ঠিক তোর কোলের ছেলের মত মুখ?" ছবিখানি ৬০ বছরের এক বৃদ্ধব্যক্তির; তাঁর বর্ণ ফুটফুটে গৌর, দাড়ি গোঁপ কামান। আশ্চর্য্যের বিষয়, শতদলের ছোট খোকাটির মুখের সঙ্গে সেই বৃদ্ধের মুখের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। এইবার শতদলের মুখে হাসি দেখা দিল। সে গলবস্ত্র হইয়া চিত্রপটকে প্রণাম করিয়া বলিল, "এ ছবি আমার স্বর্গীয় শ্বশুর ঠাকুরের। খোকার মুখ আর এঁর মুখ অবিকল একরকম। মনে হচ্ছে যেন তাঁর বড় মুখখানি মন্ত্রবলে ছোট্টটি হ'য়েছে, আর কোন তফাৎ নেই। একথা অনেকে বলেন,—যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের তো কথাই নাই।"

কমলা বলিল, "তোর বড় খোকা চন্দ্রকিরণ কিন্তু ঠিক তোর বরের মত হ'য়েছে। আমি তাঁকে দশবছর আগে দেখেছি, তবু মনে হচ্ছে, যেন এঁর মুখখানি তাঁরই মত।" শতদল সলজ্জভাবে বলিল, "বড়খোকা ঠিক তাঁরই মত হ'য়েছে। লোকেও তাই বলে।"

"আর এই ছোট লক্ষ্মীটি, যার তোরা একটা বিদ্‌ঘুটে নাম দিয়েছিস্, কি দিগঙ্গনা না দিগ্‌বধূ! এটি তো ঠিক তোর মত হ'য়েছে। তোর সঙ্গে যেমন ছোটবেলা খেলা কর্‌তুম, হঠাৎ ওকে দেখে সেই কথা মনে প'ড়ে গেছিল। ভাব্‌লুম, আবার বুঝি মহাকালী পাঠশালায় একত্র বের হতে হবে।"

এই ব'লে কমলা অতি স্নিগ্ধ আদরের সহিত খুকীকে কোলে নিয়ে বারংবার চুমো দিতে লাগিলেন।

জলটল খাওয়ার পর এইবার বিদায়ের পালা। শতদল তার ছোট ছেলেটীকে কোলে করিয়া গাড়ী পর্য্যন্ত কমলাকে আগাইয়া দিয়া আসিলেন। কমলা ছেলেটির চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "কি সুন্দর ছেলে! ঠিক যেন গোসাঞিটী!" শতদল বলিল, "ওর একটা আশ্চর্য্য রকম আছে, উনি তো কোনদিন ওকে কোলে নেন নি, কিন্তু তবুও

ওঁকে দেখ্‌লে হাত বাড়িয়ে কোলে যেতে চায়। কাঁদ্‌বার সময় যদি উনি ঘরে উঁকি মারেন, তবে হঠাৎ কান্না থামিয়ে দিয়ে হাস্‌তে থাকে। তখন ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে, চোখ দিয়ে জল পড়ে। যতক্ষণ ওঁকে দেখা যায়, যে দিকে উনি যান, সেইদিকে চোখ দুটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওঁকে দেখতে থাকে। আর-ছেলেরা ওঁকে ভয় করে, কিন্তু ছোট খোকা ওঁকে দেখলে যে কত খুসী হয়, তা' ব'লতে পারিনা। তবু একটা দিন উনি হাত দুটি ধ'রে ওকে আদর ক'ল্লেন না।" আবার চোখ ঝাপসা হইয়া পড়িল। এইবার কমলা একটু দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "নে, তুই আর এই ব'লে চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করিস্ না। সোণার চাঁদ ছেলেরা বেঁচে থাক্, যত্নের কোন ত্রুটি হচ্ছেন', রাজার হালে আছে। পুরুষ মানুষের স্নেহ ঠিক আমাদের মত নয়; অনেক সময় তা' বাইরে টের পাওয়া যায় না তাই ব'লে তা' কম নয়।"

এই বলিয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইয়া আবার নামিয়া কমলা ছোট খোকার রক্তিম অধরে দুইটা চুমো খাইয়া সখীর কাছে বিদায় লইল।

(৬)

কমলার সঙ্গে শতদলের দেখাসাক্ষাতের পর আজ ছয়মাস চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ছোট খোকার বড্ড 'এক্‌জিমা' হইল, প্রথম প্রথম মুখে ছোট ছোট ঘায়ের মত হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইল। ছোট ছেলেদের চিকিৎসা সে-বাড়ীতে হোমিওপ্যাথিক মতে হইত। 'এক্‌জিমা' ছেলেদের পক্ষে আশঙ্কাজনক পীড়া নয়, তবে বড় যন্ত্রণাদায়ক, ছোঁয়াচেও বটে। শতদল আর তাকে ছুঁইতে পারিবেন না- এই কড়া হুকুম জারি হইয়া গেল। একটি নার্স দিবারাত্র খোকাকে লইয়া একটা ভিন্ন ঘরে থাকিত। দণ্ডে দণ্ডে বিছানার চাদর, বালিস ইত্যাদি বদলান হইত। ফিনাইল দিয়া ঘর রোজ তিন চারবার ধোয়া হইত। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবু বৃদ্ধ। তিনি বলিলেন, "এ ব্যারাম কঠিন নয়, নানারূপ পেটেণ্ট ঔষধ আছে; যে কোন ঔষধ দিলেই ঘা শুকোতে পারে। কিন্তু জোর ক'রে বন্ধ ক'রে দিলে গ্ল্যাণ্ড ট্ল্যাণ্ড ফুলে উঠ্‌তে পারে, কিংবা অন্য কোন শক্ত রকমের ব্যারাম হ'তে পারে। ধীরে ধীরে ঔষধ খেয়ে খোকা সেরে উঠ্‌বে। আমি জোর ক'র্‌তে চাইনা। ঘা ভাল ক'রে ধুয়ে 'অলিভ অয়েল' মাখিয়ে রাখ্‌তে হবে। বড্ড ছোঁয়াচে ব্যারাম, আর খোকাদের সাবধানে রাখ্‌বেন।"

একেত উন্মত্ত গঙ্গা, তাতে পবনের জোর। বড়খোকা ও খুকীর সেদিকে উঁকি দেওয়া এবং উত্তরের বারান্দা—যা হ'তে সেই ঘরের হাওয়া চলাফেরা করে—সেদিকে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। শতদল এবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি ওকে ছাড়া থাক্‌তে পার্‌ব না। রাত্রে আমি ওর কাছেই শোব।"

"তা হ'লে তোমারও ঐ ব্যারাম হবে; তার মানে বাড়ীটা হাসপাতাল ক'রে তুল্‌বে। দেখ, যে মমতার কোন অর্থ নাই, আমি সেটা বুঝিনা। একটা নার্স রেখেছি, বল আর একটি রেখে দি। কিন্তু তুমি খোকার কি উপকারে আস্‌বে? কোন্ সময় বিছানা বদ্‌লাতে হয় ঔষধ খাওয়াতে হয়, কি ক'রে ব্যাণ্ডেজ বাঁধ্‌তে হয়, এসব কি তুমি নার্সের মত পারবে? এই বাহিরের মমতা দেখিয়ে কি সারা গোষ্ঠীর একজিমা করে ছাড়বে?"

"তা তুমি যাই বল না কেন! আমি ওকে নার্সের কাছে রেখে—ছেড়ে থাক্‌তে পারব না; কিছুতেই পারব না। তোমার অনেক অত্যাচার সয়েছি, আর না। আমার কোলের বাছাকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারব না।"

"আচ্ছা, এটা তোমার কি অন্যায় আব্‌দার বল দেখি! সেদিন ঐ জানেলাটা নার্স খুলে রেখেছিল। দেখ্‌লুম, চুলকিয়ে চুলকিয়ে মুখে কিছু রাখেনি, সমস্ত মুখ দিয়ে রক্ত পড়্‌ছে। নার্স তার হাতে 'মেডিকেটেড' তুলোর 'প্যাড' ক'রে বেঁধে রেখেছিল। এত কান্না সত্ত্বেও চুলকোতে দেয়নি। তুমি হ'লে কি এই কঠোরতা অবলম্বন ক'রতে পারতে? ওর রক্ত এখন শত শত 'ব্যাসিলি'তে পূর্ণ। এ সকল অন্যায় আব্‌দার ক'রে বাড়ী শুদ্ধ জ্বালাতন ক'রে মেরো না।"

"তা আমি তোমায় ব'ল্‌ছি, তুমি তার একটা নার্স রাখ, সে বড় খোকা ও খুকীকে নিয়ে এক ঘরে থাকুক। আমি ও এখনকার নার্সটি খোকাকে নিয়ে থাক্‌ব। যতদিন খোকা ভাল না হয়, ততদিন আমি না হয় বড় খোকা ও খুকীর কাছে যাব না। কিন্তু তোমায় ঠিক ব'লছি, ঐ ঘরে ও 'মা' 'মা' ব'লে কাঁদ্‌বে, আর আমি পাষাণ হ'য়ে এঘরে বসে থাক্‌ব এ আমাকে দিয়ে হবে না। প'ড়ে প'ড়ে তোমার মাথাটা বিগ্‌ড়ে গেছে। তুমি মাতা পিতার স্নেহ জিনিষটা যে কি, তাও টের পাচ্ছনা। আমার কথার উপর যদি তুমি কথা চালাও, তবে আমি আত্মহত্যা ক'রে মরব।"

"কি বিপদ! বাঙ্গালীদের সাহেবদের মত হ'তে ঢের দেরী। আমাদের মেয়েগুলির কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু আছে?" এই বলিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে তিনি বাহিরে চলিয়া যাইলেন।

(৭)

এই ঘটনার তিন দিন পরে শতদল ও নার্স খোকাকে লইয়া তাদের নির্জ্জন কারাগারে বসিয়া আছেন, এমন সময় রাজকিশোর বাবু একেবারে সেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। এ চৌকাঠের পার থেকে খোঁজ নেওয়া নয়, সে সৌভাগ্যও খোকার কোনদিন হয় নাই, কিন্তু এযে একেবারে সত্য সত্যই ঘরে ঢোকা।

শতদল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজকিশোর বাবু ঘরে ঢুকিয়া সেই রোগীর শয্যায় বসিয়া পড়িলেন এবং খোকাকে নার্সের কাছ হইতে লইয়া তার ঘাশুদ্ধ মুখে অজস্র চুম্বনদান করিয়া বুকে চাপিয়া যেন প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে একটার পর একটা অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া কপোল সিক্ত করিতে লাগিল।

একি অসম্ভব ব্যাপার! এযে কি রহস্য, তা শতদল বুঝিতে পারিল না। ইহাতে সে সন্তুষ্ট হইবে কি শঙ্কিত হইবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। হঠাৎ কি স্বামীর মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে, এ ভাবান্তরের কারণ কি?

তদবধি দিনরাত করিয়া রাজকিশোর তাহার ছেলের নিজে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বিছানা তিনি নিজ হাতে ধুইতে লাগিলেন. ছেলেকে পরিষ্কার করিতে হইলে তিনি তাহা নিজে করেন। নার্স বসিয়া থাকে, তাকে সে সব কাজ করিতে বারণ করেন। আর ছেলেটা— সে যে কি আশ্চর্য্য, তাহা বোঝা মুস্কিল! সে রাতদিন তার পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে এবং ভাঙ্গা কথায় খুব আলাপ সালাপ করিতে চেষ্টা করে। যখন ঘায়ের দরুণ অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তখনও সে কাঁদেনা, বাপের বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাতরস্বরে গুঞ্জন করিতে থাকে। তার মা তাকে কোলে লইতে চাহিলে, তাহাতে সে রাজি হয়না। রাজকিশোর বাবু ছুটি লইয়াছেন, আহার নিদ্রা নাই, ছেলের মুখ দেখেন আর চোখ জলে ভাসিয়া যায়। স্বামীর এই ভাব দেখিয়া শতদল বাস্তবিকই ভীত হইয়া পড়িল। সে চাহিয়াছিল কাণাকড়ি, কিন্তু একটা মোহর সে পাইয়া গেল। এই অতিরিক্ত প্রাপ্তিই তাহার ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। হয়ত ইহার মধ্যে কোন অজ্ঞাত বিপদের সূচনা আছে। কি হইয়াছে তাহা সে যতই বুঝিতে চেষ্টা করে, ততই তাহার ভয় ও দুশ্চিন্তা ঘনীভূত হইয়া উঠে।

কোন কোন সময় সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, "আমার যা ছিল, তাই ভাল। আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবার ছলনায় এই সংসারে কোন বিপদ এননা প্রভু।"

একদিন নার্স বাহিরে গিয়াছে, শতদল তার স্বামীর পায়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে? বল দেখি, তোমার এরূপ ভাবান্তর কেন হ'ল? কেউ কি গুণে ব'লেছে, ছেলে বাঁচবে না? তাই কি তোমার অনুতাপ হয়েছে? তুমি তো জ্যোতিষ টোতিষ মান না। তোমার এই ভাবান্তর দেখে আমার প্রাণে সোয়াস্তি পাচ্ছিনা। কোথায় আনন্দিত হব, না মনে অবিদিত কোন বিপদের কল্পনা ক'রে কোনও কূল কিনারা পাচ্ছিনা। তোমার পায়ে পড়ি আমায় সব খুলে বল।" এই বলিয়া শতদল কাঁদিতে লাগিল। রাজকিশোর বাবু বলিলেন, "খোকা ভাল হোক্, তারপর ব'লব। কেউ গুণতি ক'রে কিছু বলেনি। তুমি ভয় পে'য়োনা। সুখ দুঃখ উভয়ই অস্থায়ী। সংসার পরীক্ষার স্থান। তুমি সমস্ত অবস্থার জন্য প্রস্তুত থে'ক।"

এই কথায় শতদলের উদ্বেগ বাড়িল বই কমিল না। সে জোড় হাতে বলিল, "আমার যে বিপদই আসুক না কেন, আমি বড় ভয় পেয়েছি। দৈববিধান মাথা পেতে নিব। কিন্তু তুমি আমাকে এইরূপ দ্বিধার মধ্যে রেখে আর কষ্ট দিওনা। ভগবান্ বিপদে ফেলেন তার জন্য প্রস্তুত হ'তে চেষ্টা ক'র্‌ব। কিন্তু এই আশঙ্কার কষ্ট আর সইতে পাচ্ছিনা।"

রাজকিশোর বাবু বলিলেন, "খোকা ভাল হলে তারপর বল্‌ব। এখন আমি কিছুতেই এর বেশী আর বল্‌ব না।

(৮)

পিতাপুত্র দিনরাত একত্র, তাহাদের মধ্যে আর কেহ নাই। কোথায় নার্স—এমন কি মাও সেই সুখমিলনের গণ্ডীর বাহিরে। দিনরাত রাজকিশোর কি বলেন, কখনও খোকার ক্ষতবিক্ষত গণ্ডে চুমো খান, কখনও তার মাথাটা বুকে রাখিয়া চোখ বুজিয়া থাকেন। চোখ দিয়া অজস্র জল পড়িতে থাকে, পুঁজ রক্তে তাঁর বুক কলঙ্কিত হয়। কিন্তু গ্রাহ্য নাই। এইরূপ বিকৃত ছেলেটা তাঁর কাছে যেন কোহিনুর কৌস্তুভ হতেও মূল্যবান্। আর খোকার দুটি নিশ্চল চক্ষু হাস্যোদ্দীপ্ত; সুপ্রসন্ন উজ্জ্বল চোখ দুটি যেখানে পিতার মুখ, সেই দিকে ন্যস্ত থাকে। সে নার্সের হাতে খায় না, এমন কি মায়ের মাই খেতে খেতে রাজকিশোর বাবুকে দেখিলেই অমনই খাওয়া বন্ধ করিয়া হাত বাড়াইয়া দেয়, বাপের কোলে উঠিবার জন্য।

প্রায় একমাস পরে খোকা ভাল হইয়া উঠিল। লম্বা লম্বা চুল, ক্ষতগুলি মিলিয়া যাওয়ার পর রং যেন আরও রক্তগৌর হইয়াছে! কি সুন্দর ছেলে! বাপের আঙ্গুল ধরিয়া ধরিয়া রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়ায়, রাজকিশোর বাবুর সঙ্গে কলেজে পর্য্যন্ত যায়, বাড়ীর গাড়ীতে যায়, এবং আবার যখন বাবাকে আনিতে গাড়ী যায়, তখন চাকর ভুখন ও সইসের সঙ্গে গিয়া তাঁকে কলেজ হইতে লইয়া আসে। চন্দ্রকিরণ ও খুকী এবার বাবার কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ছোট খোকা পিতার একেবারে চোখের তারা হইয়া উঠিয়াছে।

(৯)

শতদলের মনে এখন আশঙ্কার ভাবটা কমিয়া গিয়াছে। এখন উভয়ে আর পৃথক থাকেন না। ছোট খোকাকে ছাড়িয়া রাজকিশোর বাবু দূরে থাকিতে প্রস্তুত নন। সুতরাং চুলে টান্ পড়িলে যেরূপ মাথাটা আপনি চলিয়া আসে, খোকার সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র পরিবারটি সমস্তই সেইরূপ রাজকিশোর বাবুর বড় ঘরটায় শয়ন করেন।

সেদিন বাসন্তী রজনী। টবের উপর একটা মল্লিকার চারা হইতে সুরভি লইয়া বায়ু ঘরে ঢুকিয়া সকলকে বিলাইতেছে। বড় সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি। এই রাত্রে স্বামীস্ত্রীর ফুলশয্যার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। শতদল স্বামীর গললগ্ন হইয়া বলিল, "তুমি যে ব'লেছিলে খোকা ভাল হ'লে আমাকে সব বল্‌বে।"

রাজকিশোর বাবু বলিলেন, "বোধ হয় তোমার না শোনাই ভাল ছিল। যা হোক্ তুমি যখন জেদ কচ্ছ, আমি বলব। তুমি আমার বাবাকে দেখ নাই। আমার বিয়ের দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি মারা যান।"

"তিনি ছিলেন বড় শান্ত। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান ছিলাম। এজন্য আমার উপর তাঁর অনুরাগ বড় বেশী ছিল। একবার আমি ঢাকায় পড়িতে গিয়াছিলাম। তথায় হঠাৎ পেটের অসুখ হয়। কি করিয়া বাবা সে খবর পান। সেদিন ভয়ানক ঝড়, বাবা ঝড়কে বড্ড ভয় করিতেন। কিন্তু আমার অসুখের কথা শোনামাত্র তিনি ঝড়বৃষ্টি তুফান অগ্রাহ্য ক'রে একখানি ডিঙ্গি নৌকায় সেই অন্ধকার রাত্রিতেই ঢাকা চলিয়া যান। কোন মাঝি ভয়ে যাইতে স্বীকার পায় নি। তাঁহার দুইটি প্রজাকে কাকুতি মিনতি ক'রে, অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে কবুল করিয়াছিলেন। সারারাত্রি ধলেশ্বরী বাহিয়া প্রাতে যে ভাবে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, সে ছবি আমার এখনও মনে আছে। পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা, চোখ দুটি আরক্ত, চুলগুলি এলোমেলো ঠিক পাগলের মত। কত অবস্থায় তাঁহার সেই অসীম স্নেহ আমি বুঝিয়াছি, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু আমি জীবনে তাঁহার কোন সেবাই করি নাই। আমি ছিলুম আদুরে গোপাল; তাঁর যখন সেবার দরকার পড়েছিল, তখন আমি তাঁর কাছ থেকে স'রে স'রে থাক্‌তুম। তিনি মৃত্যুশয্যায় আমাকে ডেকে বল্‌তেন "রাসু, আমাকে একটু হাওয়া কর।" কিন্তু তার অর্থ নয় যে তিনি আমার হাতে হাওয়া খেতে চান, আমি তাঁর কাছে একটু বসে থাকি এই একটা উপলক্ষ্যের সৃষ্টি ক'রে কাছে রাখ্‌তে চাইতেন। যদি বাতাস করতে আরম্ভ করেছি, তখন বল্‌তেন "না, থাক অত জোরে নয়; মাঝে মাঝে তুই একবার পাখাখানি নাড়্‌লেই আমার হাওয়া খাওয়া হবে।" এই ব'লে নিশ্চল চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তেন। সেই চাউনির ভিতর যে স্নেহের কি অমৃত নির্ঝর ছিল, তাহা আমি তখন বুঝি নাই এখন বুঝিতেছি। আমি এ-ছুতো, ও-ছুতো ক'রে তাঁর কাছ থেকে চলে যেতুম। আমার অল্প বয়সে মা ম'রেছিলেন। কিন্তু মার যা সেবা, বাবা তা আমাকে দিয়েছিলেন, আমি মার অভাব বুঝি নাই। আমি অতি দুর্ভাগ্য, তাঁর কোন সেবাই করি নাই। তিনি স্নেহের প্রশান্ত মহাসাগর ছিলেন। আমার এই সেবার ত্রুটি—এমন কি একটু কাছে বসিয়া না থাকার দরুণ তিনি যে কষ্ট পেতেন, তা কোনদিন তিনি মুখ ফুটিয়া বলেন নাই। এই অবস্থায় তিনি মারা যান।

"তারপর ধীরে ধীরে আমি অনুতপ্ত হইতে লাগিলাম।

"সেদিন খোকার একজিমার কথা ভেবে, কি ক'রে ব্যাসিলাইগুলি নির্ম্মূল করতে পারি, মনে মনে এই চিন্তা কচ্ছিলুম। তারপর ঘুমিয়ে পড়লুম। সেই ঘুমে স্পষ্ট আমি আমার

পিতাকে দেখ্‌তে পেলুম—তেমনই গরদপরা, শ্মশ্রু-গুম্ফ-মণ্ডিত প্রশান্ত সুগৌর মূর্ত্তি। তিনি আমায় ব’ল্লেন, "রাজু আমি যে তোকে ছেড়ে না থাকৃতে পেরে তোর ঘরে এসেছি। তুই আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকিস্ না। আমি কত কষ্ট পেয়ে এসেছি, তা’তুই জানিস্ না, সে কথা বল্‌বার নয়, দেহীর তা শোন্‌বার বিষয় নয়। তোকে না দেখে আর থাকৃতে পারিনি, তাই অল্পদিনের মেয়াদে তোর সঙ্গে একত্র থাকৃতে এসেছি, তোর মুখ দেখে আমার সাধ মিটে নাই, বহু কষ্ট সয়ে এসেছি। আমি যে তোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, তুই আর আমার কাছ থেকে চোখ দুটি সরিয়ে নিয়ে যাস্‌নে। আমরা আবার পাঁচবৎসর পরে একসঙ্গে চ’লে যাব। তোকে ছাড়া স্বর্গ আমার নরক এবং তোকে পেলে নরক আমার স্বর্গ।"

এই ঘটনার পাঁচবৎসর পরে পিতাপুত্র নৌকাডুবি হইয়া এক সঙ্গে ধলেশ্বরীর গর্ভে প্রাণত্যাগ করেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্মশান-পাবকে পূত—রে বিদায়-ব্যথাতুর প্রাণ,
দেহের সীমায় আর পাবি না সে ঋষির সন্ধান।
নাহি সেই আত্মবিৎ, সার-সত্যে-প্রবুদ্ধ-অন্তর,
ভারতীর পুরোহিত, তিরোহিত তাপস-প্রবর।
মিশেছেন দ্বিজোত্তম গৌরবের ভাস্বর প্রভাতে।

গুমরিছে মর্ম্ম-তলে, কোথা চলে’ গেছ যশোধন?
কেঁদে ওঠে তোমা-হারা তব প্রিয় ‘শান্তি-নিকেতন।’
বনের সে পশু-পক্ষী, হে ধ্যানী, মিলিত তব পাশ
অপার-সন্তোষে তুমি বিলাইয়া দিতে অন্ন-গ্রাস,
অসঙ্কোচে এসে তারা, দিত ধরা তব স্নেহ-ডোরে,
আজি তারা কেঁদে চায়, ফিরে যায় হাহাকার করে’।

মায়া জয় করি, আজি মুক্ত তব অপ্রমত্ত-হিয়া
আপোজ্যোতী-রসামৃতে অভিষিক্ত ধ্রুব-মধু পিয়া।
অতীন্দ্রিয় সেই লোকে নব রাগে বাজে তব বীণা,
নিয়াছেন পূজা তব বাগ্‌দেবী শ্বেত-পদ্মাসীনা
নমি তোমা জ্ঞান-বৃদ্ধ, মহর্ষির ধন্য বংশধর,
পরমা বিভূতি লাগি’ ছিলে জানি’ ভোলা-মহেশ্বর।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

সমালোচনা।

" সুদুর্ল্লভাঃ সর্ব্ব-মনোরমাঃ গিরঃ "

মাসিক সাহিত্য

ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৩২।

বিদ্যাপতি। শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্, এ, বি, সি, এস্; কবি বিদ্যাপতির কবিতা-কুসুমাঞ্জলির বিশদ ব্যাখ্যামুখে লেখক ঘটক মহাশয়ের কবিত্ব-বিশ্লেষণ।

জটিল ডিপুটিগিরির মধ্যেও যে ঘটকমহাশয় বাঙ্গালা ভাষার বিশেষতঃ বিদ্যাপতির অনুশীলনের সময় পাইয়াছেন এবং সময় দিতে পারিয়াছেন, এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তবে প্রবন্ধটীতে পড়িবার বা পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার কিছুই নাই। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বশতঃ ঘটক মহাশয় বিদ্যাপতির কবিতার নিগূঢ় সৌন্দর্য্যের স্থানে স্থানে উন্মেষ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সত্য, কিন্তু তাঁহার নূতন শব্দ আবিষ্কার করিবার প্রবৃত্তিতে সে সমস্তই ঢাকা পড়িয়াছে।

বিদ্যাপতির অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সংস্করণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই সংস্করণের টীকা, পাদটীকা, টিপ্পনী প্রভৃতির ছায়া প্রবন্ধের স্থানে স্থানে অনুভূত হইলেও লেখক কেন যে তাহার নামোল্লেখে নির্ব্বাক্ থাকিয়া স্বীয় "গবেষণা"র পরিচয়ে ব্যস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

প্রাচীন বঙ্গদর্শনে "৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাপতির "বাঙ্গালীত্ব" দেখাইয়াছেন" বলিয়া লেখক নিজের সম্মতিজ্ঞাপনের পূর্ব্বে প্রাচীন "প্রচারের" বিদ্যাপতি ও বঙ্গদেশ বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে একবার নয়নসংযোগ করিলে অনেকটা সামলাইতে পারিতেন।

লেখক কিছুদিন বাঙ্গালা লেখায় " সাগ্‌রেতি " করিয়া পরে যদি কলম ধরিতেন তাহা হইলে কিন্তু আজ আমরা "ইহাতে ভাষার চাকচিক্যের আবশ্যক হয় নাই, এখানে বেদনার ভাষা সরল-ভাবেই আত্মব্যক্ত।" প্রভৃতি উপাদেয় খিচুড়ি ভোগ উপভোগ করিতে পাইতাম না। লেখকের " অভিসার পন্থিনী শ্রীরাধিকা " " প্রেমের সাফল্যে শুভমন্যা " হইয়া "যদিও আজ দিব্যনেত্রে দেখিতেছেন যেন তাঁহার প্রিয়তমের অনুসরণে " বাসনার " অনুভূতিপন্থায় চিরন্তন তৃপ্তি নাই " কিন্তু অভাগ্য আমরা এবং ততোধিক যাঁহারা আমাদের চেয়েও গণ্ডমূর্খ তাঁহারা, কিছুই দেখিতে পাইলাম না বা পাইবেন না। মাসিক পত্রের পাঠকগণ ত আসামী শ্রেণীভুক্ত নন, যে, যত খামখেয়ালিই হাকিম করুন না কেন, তাঁহারা "গোপাল অতি সুবোধের" মত সমস্ত মাথা পাতিয়া মানিয়া লইবেন। "কবীর পন্থী" "নানক পন্থী" প্রভৃতি যখন হয় তখন "অভিসার পন্থিনী" "অনুভূতি-পন্থা" প্রভৃতিও যে মানিয়া লইতে হইবে, এতটা গর্ব্ব লেখকের পক্ষে শোভন হয় নাই। বহুদিন পূর্ব্বে—ভট্টিকাব্য, প্রবেশিকা, হিতোপদেশ প্রভৃতির "সুভগমন্য" "পণ্ডিতম্মন্য" প্রভৃতি শব্দ স্মৃতিনিবদ্ধন—লেখকের নবপ্রযুক্ত" শুভমন্যা পদাবলী বঙ্গভারতীর পক্ষে নিতান্ত অশুভ লক্ষণ,—বলিতেই হইবে। লেখককে দেখি নাই, তবে তদীয় লেখার ভিতর দিয়া তাঁহার যতটুকু পরিচয় পাইতেছি,

তাহাতে মনে হয়, তিনি একটু "চাম পাতলা আদ্‌মি"।। নতুবা চট্ করিয়া তাঁহার অত "অনুভূতি" হয় কেন? "পাথিব পন্থার অন্ধ অনুসরণ দ্বারা বাস্তবিক কাহারো যে কোনো "অনুভূতি" সম্পন্ন হইল" এবং "এই অনুভূতিতে শ্রীমতী বলিতেছেন "তাহার এক তিলেরও সার্থকতা পাথিব অনুভূতিপন্থাতে নাই!" বলিয়া লেখক গম্ভীরভাবে 'জজ্‌মেন্ট' দিলেন যে, "কল্পনার এই স্তরে ধন্যকবি বিদ্যাপতি তাঁহার পন্থা-নির্দেশক জয়দেব হইতেও কত উচ্চে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন!"—সত্যি? সাহস বটে! "পন্থা" ও "অনুভূতির" মধ্যে পড়িয়া লেখক এতই বিভোর হইয়াছেন যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষায় আর উদ্দমনীয়তা নাই! এবার শ্রীরাধিকার প্রেমের সাফল্য,—তাহাতে" তিনি যেমন "ধন্যা, শুভমন্যা, সংযতা।" লেখকও যদি তেমনি, ততটা নাহোক অন্ততঃ কতকটা "শুভমন্য" ও "সংযত" হইতেন, তবে আর তাঁহাকে এমন উদ্দামভাবে "উদ্দমনীয়তায়" স্খলিত হইতে হইত না। উদ্দাম অর্থে উদ্দমনীয়তা এই প্রথম "আত্মব্যক্ত।" হায় বঙ্গদর্শন, আজ তোমার সেই "সম্মার্জ্জনী" মনে পড়ে। এই সকল "অযোগ্য পৃষ্ট" কল্পনা করিয়াই তুমি তাহা অভিমানে ছাড়িয়া ফেলিয়াছ? বঙ্গভারতীর পবিত্র আসনে স্বৈরাচার-রূপ ব্যভিচার অপনোদন করিতে হইলে যতটা ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন, তাহার এক ভগ্নাংশও যদি "সুদর্শনের" থাকিত, তবে আজ ঘটক মহাশয়কে বিদ্যাপতি ছাড়িয়া আদালতের রেকর্ডরুমে প্রবেশ করিতে হইত। "সসীমের মধ্য দিয়া অসীমের দিকে ধাবমানা মানবাত্মার কি অনন্ত অনুভূতি!" বলিয়া ঘটকমহাশয়কে বিস্মিত হইতে হইত না। বলি লেখক-কুঞ্জর, আপনার এই "ধাবমানা" বস্তুটি কিং প্রকারং? একি "মানবাত্মার" কোনো নিকট কুটুম্বিনী, না, আপনার অতিপ্রিয় "অনুভূতির" অঙ্কলগ্না? আর এমনই আমরা মূর্খ যে, লাইনটার মানেটাও "বুঝিতে নারিনু;" "সসীমের মধ্য দিয়া অসীমের দিকে" কে দৌড়চ্ছে? "মানবাত্মা"? না—"অনন্ত অনুভূতি"? 'ভারতবর্ষে'র স্থাবীর্য্যে এবং প্রাবীণ্যে গম্ভীর-মুখর সম্পাদক দাদা কি প্রবন্ধটি ছাপিবার পূর্ব্বে একবার পড়িয়া দেখিবারও ফুরসুত্ পান নাই? এইভাবে এক অপরূপ পদ্ধতিতে প্রবন্ধের সমাপনপূর্ব্বক কতগুলি * * * এইরূপ চিহ্নদ্বারা পাঠকের "অনুভূতি" জাগাইতে চেষ্টা করিয়া, লেখক "ইহার পর আর বিদ্যাপতির আলোচনা চলে না!"—বলিয়া তাঁহার গবেষণার যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছেন। "গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ ব্যবহারে আনিবেন" "একটিন নেস্‌লির দুগ্ধ দশসের ভারত গাভীর সমান" "ইহা হস্তের দ্বারা স্পর্শিত নহে"—প্রভৃতি বঙ্গভাষার কদম্বকুসুম যদি উপভোগ করিতে চাও, তবে ঘটকমহাশয়ের এই "বিদ্যাপতি" পড়হ, কেননা, তাঁহার "মানবাত্মার এই অধ্যাত্মজাগরণ জগতের সাহিত্যে বিরল।"—(ভারতবর্ষ, মাঘ, পৃঃ ১৭০) এবং আমাদের মনে হয়, জগতের বাহিরের সাহিত্যেও বিরল। বি সি এস, ঘটকমহাশয়, কিছু মনে করিবেন না, সত্যের অনুরোধে বলি,—বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, মনোমোহন, দ্বিজেন্দ্রলাল, চন্দ্রশেখর এবং যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সিংহচিহ্নিত বঙ্গভাষারণ্যে বি সি এস, পরিচয়টা না দিলেই মানাইত ভালো। অন্ততঃ এই প্রবন্ধে।

মিলন পূর্ণিমা। (ক্রমশঃ) ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম এ, ডি এল,—নরেশ বাবুর "মিলন পূর্ণিমা" ক্রমেই জমিয়া উঠিতেছে। তবে তাঁহার "রেখার" "সেবা" এবং সৌরীনের জবাব পড়িতে পড়িতে—ভ্রমর-গোবিন্দলালের সেই পতনোন্মুখ সুখসৌধের ম্লানছায়া চোখে ভাসিয়া ওঠে। নরেশবাবু সূক্ষ্মদৃষ্টি এম এ, ডি এল; সাধ্যমত "ট্রেস্‌পাসিং" পরিহারের চেষ্টা করিয়াছেন স্বীকার করি; কিন্তু আজকাল বঙ্কিম বাবুর

যাহোক, আমরা ডাক্তার সেনগুপ্তের "মিলন পূর্ণিমায়"

মধুময় প্রভাতের জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। তবে বিদায়কালে একটি কথা বলি—নায়িকার দ্বারা নায়কের কার্য্য করাইলে বড় বেখাপ হয়। চোখে লাগে।

শরীর পালন বিধি। ডাক্তার নিবারণচন্দ্র মিত্র এম-বি। "বাঙ্গালা দেশের কতগুলি সাধারণ রোগ, এবং তাহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি কিভাবে সংক্রামিত হয়," "তাহার তালিকা—।"

বর্ত্তমান বঙ্গদেশের পক্ষে ইহা একটি অবশ্যপাঠ্য প্রবন্ধ। প্রথমতঃ রোগ, পরে তাহার শুশ্রূষা, দু'এক স্থলে ঔষধ এবং তারপর পথ্যাপথ্যের নির্দ্দেশ। প্রবন্ধটি এতই উপাদেয় যে, মনে হয়, পুস্তকাকারে ছাপাইয়া ইহা দুর্গত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিলি করা উচিত।

নির্ব্বাণ। (পদ্য)—শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি, এল। আধ্যাত্মিক ভাবের চতুর্দ্দশপদী কবিতা। ঘোষ মহাশয় পদ্য ছাড়িয়া, এই দুরূহ বিষয় গদ্যে লিখিলে হয় ত কতক ফুটিত। তবে পড়িতে পারিলে ইহাকে গদ্য বলিয়াও ধরা যায়। নমুনা :—

(ক) "অতৃপ্ত দুরন্ত বুভুক্ষা চিরতরে হোক্ সমাহিত,
লালসার এ দুর্দ্দম জ্বালা হুতাশনে হউক নির্ব্বাপিত।"
(খ) "বঞ্চিয়া নিত্য আপনারে চিত্তেরে করিয়াছি অপমান।
অনুতপ্ত সম্মুখে তোমার ;—সে ভ্রান্তির কর অবসান।"
(গ) "ডুবাইয়া দাও মোরে বিশ্বের এই সৌন্দর্য্য-সাগরে।" ইত্যাদি।

এই গদ্য কবিতা পড়িতে পড়িতে ঢাকার জন্মাষ্টমীর সং মনে পড়িল। সে বহুকালের কথা। মিছিল বাহির হইয়াছে। লোকে লোকারণ্য। তখনকার এক নূতন লেখককে কিঞ্চিৎ আক্কেল দিবার জন্য এক সং তৈরি হইয়াছে। গরুর গাড়ীর উপর একটা লোক কলম কাণে দাঁড়াইয়া নিজের কবিতায় নাচিয়া নাচিয়া তারস্বরে আবৃত্তি করিতেছে ; তার দু'টি লাইন এই :—

"আহ্লাদে বাচোস্ নারে প্রাণ।
তোর ভাইএর নামে আমার নাম॥"

ঘোষমহাশয়কে বলি—কবিতায় আধ্যাত্মিকতা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ছাড়িয়া দিন তাহাতে কাহারও কোনো ক্ষতি হইবে না। এরূপ কবিতা আভীর পল্লীতেই মানায়, সাহিত্যিক সমাজে নহে।

কম্‌লি-লতা। (কবিতা)—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। বাংলার প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম জলা বা বিলের ধারে হিজল গাছের সারির নিকটে—কম্‌লি-লতা। বড় সুন্দর, বড় নয়নরঞ্জন। তাকে লইয়া কবির এই অমৃতবর্ষিণী উক্তি বা গীতি। বড়ই ভালো লাগিয়াছে। পড়িতে পড়িতে যখন—

"খানিক দূরে মাঠের মাঝে নবীন ধানের শীষ
হরষ-ভরা দোলে যাহার মাতায় দশ দিশ্।—
সেই বিলেতে হেলেঞ্চারই সখী, প্রতিবেশী।
আগাছার ও গাছের যেথা নেইকো রেষারেষি।—
সেথায় আছে বাংলা দেশের কম্‌লি লতা সই,
দাঁড়াও কবি, তাহার সাথে আলাপ করে লই॥"

শুনিয়া কবির সাথে দাঁড়াইলাম এবং কবির কত সাধ্য সাধনাতেও দেখিলাম কমলি লতা তার সেই চিরপ্রিয় বিল ছাড়িয়া কবির উদ্যান বাটিকায় যাইবে না ;—

"কম্‌লি লতা নাড়লো মাথা বল্লো হাসি' হাসি'
"যাব না ভাই বাগান-বাড়ী বিলই ভালোবাসি।
হিজল দাদা, হেলেঞ্চা সই কচুরি আর পানা
মূর্খ হলেও, স্নেহ-সরল—এটুক আছে জানা।"

বলিয়া কম্‌লি লতা গর্ব্বভরে তার সেই বিলের শীত-স্নিগ্ধ-বক্ষের মধ্যে মিলিয়া রহিল,—দেখিলাম, কবির শত প্রলোভনেও কম্‌লি লতা টলিল না ; কবি আদর করিয়া যখন বলিলেন,—

"জল শুকালে বল্ না সখি, থাক্‌বে তুমি কোথা ?
আমার সাথে চল না লতা, গোলাপ যেথা ফোটে,
ভোম্‌রা আসি ফুলে ফুলে মধু যেথায় লুটে।
মাধবী আর কুঞ্জলতা যেথায় কুঞ্জমাঝে,
ফুলে এবং মঞ্জরীতে মধুমাসে সাজে,
সেইখানেতে সৌখিনতার সুখরুচির ধামে
চল না সখি, আমার সাথে রইবি আরামে।"

তখন সস্মিত মুখে ও সগর্ব্বে কম্‌লিলতা বলিল—

"জল শুকালে হেথায় আমি থাক্‌বো মাটীর তলে !
জাগ্‌ব আবার হর্ষভরে বর্ষাঘন জলে !! "

প্রভৃতি কবি ও লতার কথোপকথন—বড়ই উপভোগ্য হইয়াছে।

বিবাহ ও সমাজ প্রসঙ্গ।—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, বি, এ, এটর্ণী এট্ ল,। প্রবন্ধের নামের দ্বারাই লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এ সকল বিষয় ত নাটক নভেল নহে, যে, পড়ামাত্রেই চট্ করিয়া একটা ধারণা জন্মিবে। সে হিসাবে লেখক নিরপরাধ। কিন্তু লিখিবার দোষেই হউক বা বিষয়ের জটিলতার দোষেই হউক, অনেকস্থলই একান্ত অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। যথাঃ—"সকলের পক্ষে পরার্থপরতা আমাদের নিজেদের ও সমাজের পক্ষে কতদূর উপকারী, তাহা বুঝিবার শক্তি থাকা সম্ভবপর নয়।"

"পরার্থপরতায় ভালবাসা, সহানুভূতি, দয়া, মায়া, আত্মবলিদান, কর্ত্তব্যজ্ঞান, সহগুণ, সতর্কতা পরিণামদর্শিতার বিকাশ প্রকৃতির নিয়মে পুত্রকন্যাদের জন্ম হইতে আরম্ভ হয়।"—ইত্যাদি। তবে প্রবন্ধটিতে অনেক চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। স্যর ওয়াল্‌টার স্কটের "Tales of a grand father" নামক উপাদেয় গ্রন্থের "The Progress of civilization" শীর্ষক অধ্যায়টি যাঁহারা পড়েন নাই, তাঁহারা যে এই প্রবন্ধপাঠে অনেকটা আনন্দ পাইবেন, একথা বলা যাইতে পারে।

মোটরে কাশ্মীর যাত্রা।—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল, (ক্রমশঃ) ২য় প্রবন্ধ। হাজারিবাগ হইতে কাশী পর্য্যন্ত পরিক্রমণের পরিচয়। সৌরীন্দ্রনাথ গল্পলেখায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার এ পরিক্রমা-বিবরণ পড়িবার কালে তন্ময় হইয়া পড়িতে হয়। আমরা এই ভ্রমণ কাহিনীর শেষ দেখিবার জন্ম উৎসুক রহিলাম।

দক্ষিণাপথ।—(বাঙ্গালোর) রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর। এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের কিয়দংশের সুপরিচয় গতমাসের বঙ্গবাণীতে প্রদত্ত হইয়াছে। এবারেও প্রায় সেইরূপ। তবে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এবার আমরা রায় বাহাদুর দাদার নিজেরই বর্ণনায় তাঁহার গীতবিদ্যা বৈশারদ্যের কতকটা আভাস পাইয়াছি। দাদা গোদাবরীর জল প্রপাতের ন্যায় "গদ্ গদ নদ্" ভাষায় বলিতেছেন—"কোথায় আমার জন্মভূমি, আর কোথায় মহিসুর রাজ্যের বাঙ্গালোর!" (রেলে গেলেও প্রায় ২২ ঘণ্টা লাগে! তাই দাদার ভাবাবেগ এত উচ্ছলিত!) "আজ মহাষ্টমীর দিন আমরা সুদূর প্রবাসী বাঙ্গালী সত্য সত্যই প্রাণের আবেগে গান গাইলাম. শ্রীমান ভগবতী হারমোনিয়ামে সুর দিলেন। এমন শুভদিনে শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ কি নীবব থাকিতে পারেন"; (কখনই নয়) "তিনি তাঁহারই রচিত "জয় শঙ্কর, শিব ঈশ্বর" গানটি অতি ভক্তিভাবে গাইলেন। আমি মনে করলাম মধুরেণ সমাপয়েৎ হোলো। কিন্তু তা' আর হোলো না"—(কেন? যেহেতু) "মহারাজ আমাকে একটা গান গাইতে বলিলেন। এই বুড়া বয়েসে কি আর গান আসে?" (যৌবনে তা হোলে নিশ্চয়ই আসিত, না?) "না আগেকার মত গলায় জোর আছে?"—'তখন কি করি,—"ওরে দিনত গেল, সন্ধ্যা হোলো পার কর আমারে"— এই গানটি কোনো রকমে পান করিলাম" ভাগ্যি দাদা আমার "গানটি" আর কিছু করিলেন না, "গানটি" "গান" করিলেন"—"দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত" ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা অবশ্য ঐ "গানটি গান করায়" যতটা বাড়ুক না বাড়ুক, দাদার জীবন চরিতের ভাবী 'বসওয়েলে'র একটা সুখাদ্য উপকরণ যে সঞ্চিত রহিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কিছু পরেই দাদা—"আগামীতে মহিসুরের কথা বল্‌বার বাসনা রহিল।" বলিয়া কিছুদিনের জন্য গোপীযন্ত্র নামাইয়াছেন, আমরাও নীরব হইলাম। তবে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে বলি,—মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের প্রধান বাহাদুরি এই যে, তাঁহার শত সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও তিনি যে প্রাচীন রাজারাজ্‌ড়াদের রহস্যপ্রিয়তা বজায় রাখিতে পারিয়াছেন, ইহা যথার্থই দেখিবার বস্তু। কিছু দিন হইল—"গোপাল ভাঁড়" নামে একখানা বৃহৎ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, জলধর দাদা যদি না পড়িয়া থাকেন, তবে একবার, আর পড়িয়া থাকিলেও আর একবার, সেই বইখানি পড়িবেন, এই অনুরোধ। ফলে, হয়ত, তাঁহার এ-জাতীয় ভ্রমণ-কাহিনী লিখিবার লোভ কথঞ্চিৎ সংযত হইবে।

বারাণসী-বিদায়,—শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি-এল্। বারাণসী ছাড়িয়া দেশে ফিরিবার সময়ে লেখকের করুণ উক্তি। বহুদিন এমন কবিতা পড়ি নাই। সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের, সেই প্রসিদ্ধ "কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন কবিতার" পর,—এরূপ কবিতা, এমন মনোহর ঝঙ্কার আর শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। লেখক,—না, কবি প্রবোধ নারায়ণের গৈরিক নির্ঝরের মত—

"হৃদয়-ব্যথায়, পাগলের প্রায় ঘুরেছি কত না দেশ,
ল'য়ে ঝুলি-কাঁথা, ধূলি-মাখা মাথা ধরি' বৈরাগী-বেশ,
জননীর স্নেহ কোথাও ত কেহ দেয়নি অবনী-মাঝে,
হেথায় যে, হায়, ধূলিরও কণায় মায়ের মমতা রাজে।"
"জননি গো! জানি, অন্তর-গ্লানি মুছা'য়ে দিয়াছ মোর,
শ্রীকর পরশে ছিন্ন করেছ মায়া-বন্ধন-ডোর;
তবু কেন, হায়, বিদায়-বেলায় আঁখি ভরে' আসে জলে,
ছাড়িতে প্রবাস পড়ে নিঃশ্বাস, চলিতে চরণ টলে!"

কবিতা পাঠকালে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে হৃদয় আপ্লুত হয়।—সুকবি প্রবোধনারায়ণ সজল নয়নে যখন,—

"তুমি মা পুণ্য-ভূমি,
তাই বার বার লুটায়ে তোমার চরণের ধূলা চুমি!

বলিয়া উন্মাদিনী কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সারা কাশী ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার তখনকার অবস্থা দর্শনে পাষাণও বিগলিত হয়। কি করিয়া কবি এমন সোণার কাশী ছাড়িবেন, ভাবিয়া আকুল প্রাণে যখন গাহিলেন,—

"হেথা ব্রহ্মার দশাশ্বমেধ যজ্ঞের সমাধান;
হেথা উদ্গীত বেদ-বেদান্ত, বুদ্ধের নির্ব্বাণ;
হেথা শঙ্কর করেন ছিন্ন মায়াবাদে মায়া-ফাঁদ;
প্রকাশানন্দে করেন ধন্য নদীয়ার গোরাচাঁদ।
হেথা গৌরীর মণি-কুণ্ডল সহসা খসিয়া পড়ে,
মণি-কর্ণিকা হইল তীর্থ সে নিধি বক্ষে ধরে'!
বিশাল, বিরাট কতশত ঘাট পুণ্য-কাহিনী-ভরা,
মুনি-ঋষি আর কত দেবতার চরণ-চিহ্ন-ধরা,
"পঞ্চগঙ্গা," "প্রয়াগ," "নারদ," "হরিশ্চন্দ্র," "অসী,"
মাঝখানে তার উদার "কেদার" শোভিছে পূর্ণ-শশী!
রামানন্দের পাবন-মন্ত্র অভিরাম রাম-নাম;
অচিরে কবীর লভিল সিদ্ধি জপি' তাই অবিরাম।
ভক্ত-সুধীর সাধু তুলসীর শান্তি-মধুর মঠ,
নবীন জীবন লভিল হেথায় কত না কপট, শঠ!
আমি অভাগ্য, ছাড়িয়া চলেছি এমন সোণার কাশী,
আজি সন্ধ্যায় লইতে বিদায় তাই আঁখি-জলে ভাসি।"

তখন তাঁহার সঙ্গে পাঠকগণও "আঁখি-জলে" ভাসিলেন। আজ বিদায়ের দিনে মার সেই—

"কত উৎসব, কত গৌরব, কত বৈভবরাশি,
অন্নপূর্ণা-ভাণ্ডারে পশি' কাঙালেরো মুখে হাসি,
সত্রে-সত্রে দীন-দরিদ্রে অবাধে অন্নদান,
অনাথ-জননী রাণীভবানীর মূর্ত্ত মায়ের প্রাণ।

স্মরণ করিয়া কবির—

"লইতে বিদায় মন নাহি চায়, প্রাণ প্রতিপদে কাঁদে।"

কবির এ কান্নায় শুধু তাঁহাকে নহে, তাঁহার সঙ্গে বঙ্গ-ভাষাকেও অলঙ্কৃত করিয়াছে। তাঁহার এমন কান্নায় যেন আমরা বঞ্চিত না হই,—এই অনুরোধ।

মাসিক বসুমতী—পৌষ, ১৩৩২।

আকুলতা,—(কবিতা) শ্রীকালীপদ ঘোষ। বিরহীর বিয়োগ-বিধুর-হৃদয়ের করুণ উচ্ছ্বাস। সুন্দর কবিত্বঝঙ্কার। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া সকল বিরহীই ভাবেন—

"প্রবাস-যামিনী কবে—
জানি না বিগত হবে,
কবে হবে মধুর মিলন।
যুগল-হৃদয় মাঝে পুলক উঠিবে দুলে
সুধাময় হবে এ জীবন।"

লেখকের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে কালে ইনি একজন 'সুকবি হইবেন, কেননা—কবির পক্ষে একান্ত অপেক্ষিত অন্তর্দৃষ্টি ইঁহার—পর্য্যাপ্ত।

ক্রীতদাসী,—লেখকের নাম নাই। যেন (?) লেখকেরই প্রথমজীবনের এক অতি উপন্যাসময়ী ঘটনা। পাহাড়ে-মেয়ে সাবিত্রী কিশোরী। এক মেলা দেখিতে গিয়া জরিপ বিভাগের বড় বাবু পঞ্চাশ টাকায় তাহাকে একবছরের জন্য কিনিয়া আনিয়াছেন। উভয়ের একত্র বাস, নিশীথে জনহীন শয়ন কক্ষে সাবিত্রী শ্রমক্লান্ত বড় বাবুর পদসেবায় "সারা নিশি জাগিয়া"।—তবে এ পদ-সেবায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিষ্পাপ স্নেহ ছাড়া আর কিছুই নাই। ইহা মোহান্তদের সেবিকার, পদ-সেবা-কারিণী সেবা-দাসীর চিত্র নহে, অপাপবিদ্ধ পার্ব্বত্য বালিকার অকলুষ, ভোগলালসাহীন স্বর্গীয় ভালবাসা। ইহার তুলনা ইহাই। এরূপ গল্পের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল। আজকাল সস্তায় অতি সুলভে বিদেশী মালমসলার আমদানী হওয়ায় দেশী গল্প উপন্যাসগুলি পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। গাছে না উঠিতেই একেবারে এক কান্দি হাজির। বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে। এ হেন দুঃসময়ে এতাদৃশ গল্পের প্রচার দেখিলে নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচি। লেখকের লিখিবার কৌশলও বেশ। তিনি যে একজন অকপট পুরুষ (যদি হন ?) তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বলিষ্ঠ হৃদয়ের আমরা শতমুখে প্রসংশা করি।

মুক্তি ও ভক্তি,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। বঙ্গের অলঙ্কার মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ গত বিশবৎসর যাবৎ ভক্তিশাস্ত্রের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া বঙ্গে এবং বঙ্গের বাহিরে—নানাস্থানে তাঁহার সুললিত ব্যাখ্যান দান করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ সেই ভক্তি-শাস্ত্রানুশীলনেরই ফল। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক হইয়াও বালকের মত সরলভাবে এমন রসময়ী ভাববিন্যাসলহরী এক তাঁহার পক্ষেই সম্ভবপর। তর্কভূষণ মহাশয়ের এই প্রবন্ধের উপসংহার অংশটুকু পড়িয়া আমরা দুঃখিত। কেননা,—এই মধুর কঠিন রসতত্ত্বের আস্বাদ কেবল গ্রন্থ-পাঠে যদি হৃদয়ঙ্গম হইত তবে আর দুঃখ ছিল না, ইহাতে "গুরু গম্যতার" প্রয়োজন। তর্কভূষণ প্রবন্ধ বিস্তৃতির বৃথা শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাঁহার পাঠকদিগকে, ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, ভাগবতসন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখাইয়া না দিয়া যদি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিতেন, তবেই ভালো হইত। তিনমাস ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী যদি তিন বৎসর ধরিয়া চলিতে পারে, ১০ দিনের মান্দ্রাজ পর্য্যটন যদি শতাধিক অধ্যায়ে বিবৃত হইতে পারে, তবে তাঁহার এই অবশ্যজ্ঞাতব্য

মধুর বিষয় কি একটু সবিস্তার বর্ণিত হইলেই রামায়ণ অশুদ্ধ হইত? আমরা তাঁহাকে আবার কলম ধরিতে অনুরোধ করি।

প্রার্থনা,—(কবিতা) শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল। ২৪ লাইনে একটি ক্ষুদ্র কবিতা। ইহার শেষটুকু বড় ভালো লাগিল :—

—"আমারে মরিতে দিও হাসিতে হাসিতে
নীরবে ঝরিয়া পড়া ফুলের মতন,
ধূলি-কণা পূত করি নিঝুম নিশীথে
নীরবে মিশিতে দিও ধূলির মতন!"

চর্চা রাখিলে বিজয় এক সময়ে বিজয়ী হইতে পারিবেন।

বঙ্কিম-স্মৃতি,—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (আই-সি-এস্) সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জামাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্ক কতকটা "পুরুষানুক্রমিক," একথা লেখক নিজেই প্রবন্ধের মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং—বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক অবিজ্ঞেয়তথ্য ইঁহার মুখে জানিতে পারা যায়। প্রবন্ধটি সুপাঠ্য এবং ইহার ভাষাও প্রাঞ্জল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটু অকৃপণ হইলে বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।

গজুর ভজন—(৩) (ক্রমশঃ) শ্রীঅমৃতলাল বসু। নটরাজ অমৃতলালের লেখনীপ্রসূত অপূর্ব্ব গল্পের ধারাবাহিক প্রকাশ। নরচরিত্রের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর অংশের এমন সুপরিস্ফুট চিত্রণ আজকাল অতি কমই দৃষ্ট হয়। পড়িতে আরম্ভ করিলে চট্ করিয়া ফুরাইয়া যায়। গল্পের নায়ক গজুর তুলনা গজুই। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কলিকাতার হতভাগ্য বাবু জাতীয় ব্যক্তিদের বাড়ীর চাকর বামুনের পরিচয় একটু না তুলিয়া পারিলাম না।

"আজ সকালে রাঁধুনি চাকর-বাকর কাজ করা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। সকলেরই বাড়ী থেকে জরুরি চিঠি এসেছে; বেয়ারার বাপ মরে, দেখবার ইচ্ছে থাকে তো পত্রপাঠ যেন চলে আসে। ছোকরা চাকরটির দেশে বে'র সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে, যেতেই হবে; আর বামুন ঠাকুরের দেশে সব জমী সেটেলমেণ্ট হচ্ছে—সে-রাত্রিতেই না রওনা হ'লে দেড় বিঘের জমীদারীতে একটা ভয়ানক গোলমাল হ'য়ে যাবে।"—

চমৎকার! চাকরবাকর ডানা নাড়া মাত্র যাঁহারা বলিতে পারেন, "বিদায় হও", তাঁহাদের বাড়ীতে কিন্তু নিত্য এ উৎপাত হয় না। চাকররা সইদি থাকে। আর যাঁরা এক মিনিট 'চাকর ছাড়া রইতে নারি'—তাঁহাদেরই ঐ উৎপাত সহ্য করিতে হয়। উপায় কি? "এটিকেট" "এটিকেট" করিয়াই জাতটা গোল্লায় গেল।

রসরাজ অমৃতলালের রসময়ী লেখনীর প্রসাদে আমরা এই অপূর্ব্ব চিত্র দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার লেখা পড়িবার জন্য অনেকেই "শীষ পা" করিয়া থাকে। এরূপ গল্প বঙ্গসাহিত্যের শ্রী, অলঙ্কার; আর যে পত্রিকায় বাহির হয়, তাহারও গৌরব।

"বদির ঝি যেন ফুক্কোমুখী হ'য়ে বক্‌তে বক্‌তে ঘরের মধ্যে এসে বল্‌তে লাগলো;—আ মলো হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া সব, মর, মর,"—কলিকাতার (দিনের বেলায়) ঝির এমন নিখুঁত চিত্র গল্প-সাহিত্যের অঙ্গ হইতে কোনোদিন তিরোহিত হইবে না। "গজুর ভজন" একটি উপাদেয় পাঠ্য বস্তু।

ভারতবর্ষ,—(ফাল্গুন, ১৩৩২)

বঙ্কিমচন্দ্র—(কবিতা) শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, এম, এ, দ্বিজেন্দ্রলালের নৃত্য-মুখর ছন্দে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ চলন-সই কবিতা। লেখকের লিখিবার শক্তি আছে,—ইহা অস্বীকার করা চলে না। ইহার দুইটি লাইন বড় ভালো লাগিয়াছে, পাঠকদিগকে তাহা উপহার দেওয়ায় ক্ষতি কি ?—

"এস বঙ্কিম, উঠ দুর্দ্দিনে, জাগাও পুনঃ সে মোহন মন্ত্র ;
দুঃখ, দৈন্য দূর হ'য়ে যাক্ ; বাজাও বাঙ্গালী হৃদয়-যন্ত্র।"

মিলন-পূর্ণিমা—(ক্রমশঃ) ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম, এ, ডি-এল,। রেখা-সৌরীনের মিলন-পূর্ণিমার প্রভাতের জন্য আমরা "উদ্‌গ্রীব" ছিলাম,—একথা মাঘের ভারতবর্ষ সমালোচনায় বলিয়াছি। এই মধুর বসন্তে—ফাল্গুনের প্রারম্ভে সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রভাতের "প্রভাতী তারা" দেখা দিয়াছে। এক হিসাবে এই স্থানেই পূর্ণিমার শেষ হইলে ভালো হইত। নরেশ বাবু পাকা 'আর্টিষ্ট' হইলে তাহাই করিতেন, কিন্তু তিনি এমন মধুর প্রভাতের "মন্দমধুর হাওয়া" তাঁহার কল্পনার "অমল ধবল পালে" লাগাইয়া উপন্যাস-তরণীকে বাইতে চান, তাই এইখানে থামিতে পারেন নাই।—কেন শেষ করা উচিত ছিল, পরে বলিতেছি।

রেখা ও সৌরীন অন্যান্য অপরাহ্নের ন্যায় আজও ট্রামে পৃথক পৃথক স্থান হইতে চড়িয়া মিলিয়াছে। দু'জনেরই খুব স্ফূর্ত্তি। রেখা থাকে বেথুন কালেজের বোর্ডিং-এ, আর সৌরীন হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে, ক্রমে "যখন তাহারা শিবপুরের ফেরি ষ্টীমারের ফাষ্ট ক্লাশের কেবিনে গিয়া বসিল, তখন তাহারা সম্পূর্ণ নির্জ্জন অবসর পাইল।"

'সিমলা হইতে এক বন্ধু সৌরীনকে গোপনে চিঠি দিয়েছে যে, তার ফাইনান্স বিভাগে খুব ভালো চাকরী হইয়াছে' সেই চিঠি দেখাইয়া সৌরীন বলিল,—"আর দেরী নেই রেখা, চকোর চকোরীর মিলন-পূর্ণিমা এসে পৌঁছেছে। এ সংবাদে উৎকণ্ঠিত রেখার হৃদয় গলিয়া গেল। সে "কৃতার্থ-স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে সৌরীনের দিকে চাহিয়া তার কাঁধের উপর মাথাটা এলাইয়া দিল। সৌরীন তাহাকে বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া তার লজ্জিত ওষ্ঠাধরে গভীর চুম্বন করিল।"—কতটা "গভীর" ? চুম্বনের চুম্বকাকর্ষণে বোধ হয় "প্রগাঢ়" একদম "গভীর" হইয়া গিয়াছে ? রেখা খানিক পরে "কেবল বলিল,—তুমি বড় দুষ্ট," "অনেকক্ষণ পর লজ্জায় লাল হইয়া রেখা আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ সৌরীনের মুখের উপর দুইটি চুম্বন দিল। (সৌরীনের কাঁধের উপরে এলাইয়া পড়া রেখার মাথাটা না তুলিয়াই ?) সুতরাং মিলন-পূর্ণিমার প্রভাত হইল বলিতেই হইবে। মিলনের পূর্ণিমা ত লাগিয়াছিল অনেক পূর্ব্বে যত লম্বাই হোক্, প্রেমের পঞ্জিকাতেও ষাট্ দণ্ড এবং কয়েক পলের বেশী তাহা থাকিতেই পারে না। থাকিলে চাঁদের রাহুগ্রাস অনিবার্য্য তবে তাকে টানিয়া লম্বা করা কেন ? সুতরাং "ক্রমশঃ" ঠিক হয় নাই। কালিদাস হরপার্ব্বতীর মধুর মিলনের উপজীব্য করিয়া বই লিখিয়াছিলেন এবং তাহার নাম দিয়াছিলেন—"কুমারসম্ভব", কিন্তু যেই উমামহেশ্বরের বিবাহ হইল এবং তাঁহারা Honey moon করিতে দারজিলিং ডেরাদুন গিরিডিতে নহে, একদম গন্ধমাদন পর্ব্বতে গেলেন, অমনি কবিও কেতাব বন্ধ করিয়া কল্পনায় কক্ষদ্বার অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন। কবির কবি কালিদাস বুঝিলেন এবং বুঝাইলেন যে,—"কুমারের" "সম্ভব" অর্থাৎ সম্ভাবনার সুরু হইয়াছে, সুতরাং আর কেন ? শুধু আদালতের আইনে নহে, সামাজিক অর্থাৎ সকল সমাজের আইনেই ঐ পর্য্যন্তই যথেষ্ট। তবে আর কেন ? দেখা যাক্, ব্যবহারজীব প্রবর পরে আর কি করান, তখন অবশিষ্ট

বক্তব্য প্রকাশ করিব। কল্পনারূপিণী উদ্দাম অশ্বতরীকে রশ্মি-সংযমন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া রাখা অবশ্য অত্যন্ত কঠিন কার্য, স্বীকার করি, কিন্তু সেই টুকুই হইল লেখকের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক।

যাক্। এখন কাজের কথা বলি,—নরেশ বাবুর গল্পের প্রাণ আছে। তবে সেই প্রাণ স্থানে স্থানে একটু অতিরিক্তরূপে ক্ষিপ্র, ইহাতে আর কিছু না হোক, কল্পনার "ব্লাড প্রেসারে" মারা যাইবার ভয় আছে।

দ্বন্দ্ব।—(২১) শ্রীসরোজ কুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রী (মতী) সরোজ কুমারীর "দ্বন্দ্ব" চলিতেছে ভালো। তবে মাঝে মাঝে বড় একঘেয়ে বোধ হইতেছে। নির্ম্মলার চেয়েও মিঃ ঘোষের চরিত্র ফুটিতেছে ভালো। নির্ম্মলা বড় বেশী হিসেবী। তাই তার জীবনের অনাবিল ধারা পদে পদে আঘাত পাইতেছে। কখনো "খুট্ খুট্ করিয়া একটা মৃদু শব্দে" কখনো বা "খটাস্ খটাস্ করিয়া" একটা "জোরের শব্দে" তাহাকে উৎপীড়িত করিতেছে। "অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নির্ম্মলা ঘুমাইতে পারিতেছে না।" রোগার্ত্ত পিতার নিগূঢ় মনস্তাপের কারণ নির্ণয়ে উতলা হওয়া স্নেহার্ত্ত দুহিতার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অতটা ফেনাইয়া তোলা বড়ই বেমানান ঠেকিতেছে। যাহা হোক, এ "দ্বন্দ্ব" দেখিবার জিনিষ।

ফাল্গুনে—শ্রীগিরিজাকুমার বসু, (কবিতা)—ইহা শুধু "চমত্কার" বলিলে ঠিক বলা হয় না, একেবারে "মোচত্কার!" দুঃসাহসেরও একটা সীমা আছে। লেখক সে সীমাও ছাড়াইয়াছেন। ফাল্গুন বেচারা লেখকের হাতে পড়িয়া একেবারে মাঠে মারা গিয়াছে!

"মৃদুমুখী যূথিকার,
সীধুসুখী স্তুতিকার
হৃদি-খানি যায় ছুঁই?
এসো আলো মরমের—
বেসো ভালো; সরমের
নিধি আনি পায় থুই!"

মানে কি? "সীধু-সুখী" লেখক দন্ত্য-সকারের লোভে "সীধুর" সহিত "সুখীর"—জোড় গাঁথিয়াছেন, ভয় হয়, এর পর, তালব্য শ'কার ধরিয়া না বসেন। ধৃষ্টতার চূড়ান্ত। তার পর—

"ধু-ধূ-হিয়া আগুনের
সুধু প্রিয়া ফাগুনের
মধু, টোটে ধুম কার?"

বটে? এ-ত সোজা কথা।

দেখ, কল্পনার চোটে
লেখকের "ধুম" "টোটে"
কিংবা তাঁর কবিতার।

এইত solution হইল। লেখকের আজ আর অন্য কাজ নাই, আজ তার সোণায় সোহাগা—কেননা:—

"আজি ডালি কদরের
কাজ খালি অধরের
বঁধু ঠোঁটে চুম্বার।"

তা' তিনি করুন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষ মারা যায় যে! চড়ুই পাখি, এই বার বাঙ্গলা দেশ ছাড়ো, তোমার আসন বেদখল! তোমার জারিজুরি দফারফা!

বিফল বসন্ত—শ্রীনরেন্দ্র দেব (কবিতা)—মন্দ নহে। তবে বড্ড লম্বা। লেখার আকর্ষণী শক্তি আর একটুকু প্রবল থাকিলে সেটা হয়ত অনুভূত হইতনা। মধ্যে মধ্যে খুব ভালো লাগে—যথা :—

"দখিন-বাতাস উঠ্‌ল মাতাল হ'য়ে
নেশায় অবশ-আবেশ-চ'খের বিহ্বল, দৃষ্টি ল'য়ে
চায় সে ফিরে-ফিরে,
যৌবনের এই উদ্বেলিত জীবন, স্রোতের তীরে
তার নয়নের স্নিগ্ধ পরশ
চিত্ত করে মত্ত সরস,
কেবল কি সই তোমার হৃদয় এমনি লক্ষ্মী ছাড়া,
দেয়না কোনও সাড়া ?"

নরেন্দ্র দেব একজন খ্যাতনামা লেখক। হৃদয়ের কোন্ স্থান কখন্ দুর্ব্বল, তাহা তিনি বেশ ধরিতে এবং ধরিয়া দেখাইতে জানেন, তাই বসন্তের বিফল্যের বর্ণনে কবি গোটাকত অতি সত্য সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"আজ—
ভুলে যাওয়া সুখের স্মৃতি নূতন ক'রে জাগে,
ক্ষণে ক্ষণে অকারণে প্রাণে চমক্ লাগে,
ছিন্ন-বীণার সুরটি বেঁধে বুকের তারে তারে
ঘা দিয়ে যায় কোন্ অতীতের মধুর কল্পনা রে !
অধীর ক'রে মাতিয়ে তোলে পূর্ণিমার ওই আলো,
জগৎ আজি সুবারে চায় বাস্‌তে সখি ভালো !"

"এ যে গো সই ক্ষণিক খেলা
অস্থায়ী এই প্রাণের মেলা
পলক শেষে মিলিয়ে যাবে স্বপন সীমানায়,
তাই বলি আজ হৃদয় যারে বুকের ভিতর চায়,
ডাক দিয়ে নাও আদর ক'রে আপন ঘরে তারে
হয়ত' লগন্ উত্‌রে গেলে ফির্‌বে'না আর দ্বারে !"
"জ্যোৎস্না-রাতে হবে না আর দেখা
হয়ত সখি সারা জীবন জাগ্‌তে হবে একা !"

সুদর্শন।

পথের দাবী*

(৩০)

পরিত্যক্ত, পতনোন্মুখ, ঘন-বনাচ্ছন্ন যে জীর্ণ মঠের মধ্যে একদিন অপূর্ব্বর অপরাধের বিচার হইয়াছিল, আজ আবার সেই কক্ষেই পথের-দাবী আহূত হইয়াছে। সে দিনের সেই অবরুদ্ধ গৃহতলে যে দুর্জ্জয় ক্রোধ ও নির্ম্মম প্রতিহিংসার অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়াছিল, আজ তাহার স্ফুলিঙ্গমাত্র নাই। সে বাদী নাই, প্রতিবাদী নাই, কাহারো বিরুদ্ধে কাহারো নালিশ নাই, আজ শঙ্কা ও নৈরাশ্যের দুঃসহ বেদনায় সমস্ত সভা নিষ্প্রভ, বিষণ্ণ, ম্রিয়মাণ। ভারতীর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু,—সুমিত্রা অধোমুখে নীরব, স্থির। তলওয়ারকর ধরা পড়িয়াছে; রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত দেহে সে জেলের হাসপাতালে,—আজও তাহার ভাল করিয়া জ্ঞান হয় নাই। তাহার স্ত্রী শিশুকন্যা লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া অনেক দুঃখে কাল সন্ধ্যায় কে একজন মারহাট্টি ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে। সুমিত্রা সন্ধান লইয়া তাহার পিতৃগৃহে আজ তার করিয়াছে কিন্তু এখনও জবাব আসে নাই।

ভারতী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তলওয়ারকর বাবুর কি হবে দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, হাঁসপাতাল থেকে যদি বেঁচে ওঠে জেল খাট্‌বে।

ভারতী মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, বলিল, না বাঁচ্‌তেও ত পারেন?

ডাক্তার কহিলেন, অন্ততঃ, অসম্ভব নয়। তারপরে সুদীর্ঘ কারাবাস।

ভারতী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছোট্টমেয়ে,—তাদের কি হবে?

সুমিত্রা এ কথার জবাব দিয়া কহিল, হয়ত দেশ থেকে তাঁর বাপ এসে নিয়ে যাবেন।

ভারতী বলিল, হয়ত! ধরুন, যদি কেউ না আসেন? যদি কেউ না থাকে?

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে মানুষ অকস্মাৎ মারা গেলে তার নিরুপায় বিধবার যে দশা হয়, এদেরও তাই হবে। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আমরা গৃহী নই, আমাদের ধন-সম্পদ নেই, বিদেশীর আইনে নিজের জন্মভূমিতেও আমাদের মাথা রাখবার ঠাঁই নেই,—বন্য পশুর মত আমরা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াই,—সংসারীর দুঃখু মোচন করবার ত আমাদের শক্তি নেই ভারতী।

ভারতী ব্যথিত হইয়া কহিল, তোমাদের নেই, কিন্তু যাঁদের এসব আছে,—আমাদের এই দেশের লোকে কি এঁদের দুঃখ দূর করতে পারেনা দাদা?

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু করবে কেন দিদি? তারা ত এ কাজ করতে আমাদের বলে না। বরঞ্চ আমরা তাদের স্বস্তির বাধা, আরামের অন্তরায়,—আমাদের তারা সোনার চক্ষে দেখেনা। ইংরাজ যখন দম্ভভরে প্রচার করে ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা চায়না, পরাধীনতাই কামনা করে, তখন ত তারা নেহাৎ মিথ্যে বলেনা! আর যুগ-যুগান্তের অন্ধকারের মধ্যে বসে দুচোখের দৃষ্টি যাদের অন্ধ হয়ে গেছে তাদের বিরুদ্ধেই বা হা হুতাশ করবার কি আছে ভারতী!

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, বিদেশী রাজার জেলের মধ্যে যদি আজ তলওয়ারকরকে মরতেই হয়, পরলোকে দাঁড়িয়ে স্ত্রী-কন্যাকে পথে পথে ভিক্ষে করতে দেখে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়বে, কিন্তু নিশ্চয় জেনো, দেশের লোকের বিরুদ্ধে সে ভগবানের কাছেও কখনো একটা নালিশ জানাবেনা। আমি তাকে চিনি,—লজ্জায় তার মুখ ফুট্‌বেনা।

ভারতী অস্ফুটে কহিল, উঃ!

কৃষ্ণ আইয়ার বাঙ্‌লা বলিতে পারিতনা, কিন্তু, মাঝে মাঝে বুঝিত; সে ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, ইয়েস্, ট্রু!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ, এইত সত্য! এইত বিপ্লবীর চরম শিক্ষা! কান্না কার তরে? নালিশ কার কাছে? দাদার যদি ফাঁসি হয়েছে শোনো, জেনো, বিদেশীর হুকুমে সে ফাঁসি তার দেশের লোকেই তার গলায় বেঁধে দিয়েছে! দেবেই ত! কসাই-খানা থেকে গরুর মাংস গরুতেই ত বয়ে নিয়ে আসে। তার আবার নালিশ কিসের বোন্?

ভারতী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, দাদা, এই ত তোমাদের পরিণাম!

ডাক্তারের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কহিলেন, একি তুচ্ছ পরিণাম ভারতী? জানি, দেশের লোকে এর দাম বুঝবে না, হয়ত উপহাসও করবে, কিন্তু যাকে এই ঋণ একদিন কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে, হাসি তার মুখে কিন্তু সহজে যোগাবে না। এই বলিয়া সহসা নিজেই হাসিয়া কহিলেন, ভারতী, নিজে ক্রীশ্চান হয়ে তুমি তোমার ধর্ম্মের গোড়ার কথাটাই ভুলে গেলে? যিশুখৃষ্টের রক্তপাত কি সংসারে ব্যর্থই হয়েছে ভাবো?

সকলেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, ডাক্তার পুনশ্চ কহিলেন, তোমরাত জানো বৃথা নরহত্যার আমি কোনদিন পক্ষপাতী নই, ও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। নিজের হাতে আমি একটা পিঁপ্‌ড়ে মার্‌তেও পারিনে। কিন্তু প্রয়োজন হলে,—কি বল সুমিত্রা?

সুমিত্রা সায় দিয়া বলিল, সে আমি জানি, নিজের চোখেইত আমি বার দুই দেখেচি।

ডাক্তার কহিলেন, দূর থেকে এসে যারা জন্মভূমি আমার অধিকার করেছে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্য্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল,—সমস্ত যে কেড়ে নিলে তারই

রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার? এ ধর্ম্মবুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে ভারতী? ছি!

কিন্তু আজ ভারতী অভিভূত হইলনা, সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, না দাদা আজকে আমাকে তুমি কিছুতে লজ্জা দিতে পারবেনা। এসব পুরানো কথা,—হিংসার পথে যারাই প্রবৃত্তি দেয়, তারাই এম্‌নি করে বলে। এই শেষ কথা নয়, জগতে এর চেয়েও বড়, ঢের বড় কথা আছে।

ডাক্তার কহিলেন, কি আছে বল শুনি?

ভারতী উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিল, আমি জানিনে, কিন্তু তুমি জানো। যে বিদ্বেষ তোমার সত্যবুদ্ধিকে এমন একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, একবার তাকে ত্যাগ করে শান্তির পথে ফিরে এসো, তোমার জ্ঞান, তোমার প্রতিভার কাছে পরাস্ত মান্‌বেনা এমন সমস্যা পৃথিবীতে নাই। জোরের বিরুদ্ধে জোর, হিংসার বদলে হিংসা, অত্যাচারের পরিবর্ত্তে অত্যাচার এতো বর্ব্বরতার দিন থেকেই চলে আস্‌চে। এর চেয়ে মহৎ কিছু কি বলা যায় না?

কে বল্‌বে?

ভারতী অকুণ্ঠিতস্বরে কহিল, তুমি।

ঐটি আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। সাহেবের বুটের তলায় চিত্‌ হয়ে শুয়ে শান্তির বাণী আমার মুখ দিয়ে ঠিক বার হবে না,—হয়ত আট্‌কাবে। বরঞ্চ ও-ভার শশীকে দাও, তোমার খাতিরে ও পারবে। এই বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন।

ভারতী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি ঠাট্টা করলে বটে, কিন্তু যাঁদের পরে তোমার এত বিদ্বেষ, সেই ইংরেজ মিশনরিদেরই অনেকের কাছে বলে দেখেচি তাঁরা সত্যই আনন্দলাভ করেন।

ডাক্তার স্বীকার করিয়া কহিলেন, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভারতী। সুন্দরবনের মধ্যে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে শান্তির বাণী প্রচার করলে বাঘ-ভালুকের খুসী হবারই কথা। তাঁরা সাধু ব্যক্তি।

ভারতী এই বিদ্রূপে কান দিল না, কহিতে লাগিল, আজ ভারতের যত দুর্ভাগ্যই আসুক, চিরদিন এমন ছিল না। একদিন ভারতবাসী সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। সেদিন হিংসা বিদ্বেষ নয়, ধর্ম্ম এবং শান্তিমন্ত্রই এই ভারতবর্ষ থেকে দিকে দিকে প্রচারিত হ'য়েছিল। আমার বিশ্বাস সেদিন আবার আমাদের ফিরে আস্‌বে।

বহুক্ষণ হইতেই ভারতীর বাক্যে শশীর কবি-চিত্ত শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে বিগলিত হইয়া আসিতেছিল, সে গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ভারতীকে আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি ডাক্তার। আমারও বিশ্বাস সে সভ্যতা ভারতের ফিরে আস্‌বেই আস্‌বে।

ডাক্তার উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তোমরা ভারতের কোন্ যুগের সভ্যতার ইঙ্গিত কোরচ আমি জানিনে, কিন্তু সভ্যতার একটা সীমা আছে। ধর্ম্ম, অহিংসা এবং শান্তির নেশায় তাকে অতিক্রম করে গেলে মরণ আসে। কোন দেবতাই তাকে রক্ষা করতে পারে না। ভারতবর্ষ হূনদের কাছে কবে পরাজয় স্বীকার করেছিল জানো? যখন তারা ভারতবাসী শিশুদের মশালের মত করে জ্বালাতে আরম্ভ করেছিল, নারীর পিঠের চামড়া দিয়ে লড়াইয়ের বাজনা তৈরি করতে সুরু করেছিল। সে অভাবিত নৃশংসতার জবাব ভারতবাসী দিতে শেখেনি। তার ফল কি হল? দেশ গেল, রাজ্য গেল, দেবমন্দির ধ্বংস বিধ্বস্ত হয়ে গেল,—সে অক্ষমতার শাস্তি আজও আমাদের ফুরোয়নি।

ভারতীকে লক্ষ করিয়া কহিলেন, তুমি কবির শ্লোক প্রায় আবৃত্তি করে বল, গিয়াছে দেশ দুঃখ কি, আবার তোরা মানুষ হ। কিন্তু দেশ ফিরে পাবার মত মানুষ হওয়া কাকে বলে শুনি? ভেবেচ, মানুষ হবার পথ তোমার অবারিত? মুক্ত? ভেবেচ, দেশের দরিদ্র-নারায়ণের সেবা আর ম্যালেরিয়ার কুইনিন্ যুগিয়ে বেড়ানোকেই মানুষ হওয়া বলে? বলে না। মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্য্যাদা বোধকেই মানুষ হওয়া বলে। মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তোমার বিশেষ অপরাধ নেই ভারতী। ওদের আব-হাওয়ার মধ্যেই তুমি প্রতিপালিত, তাই তোমার মনে হয় ইউরোপের ক্রীশ্চান সভ্যতার চেয়ে বড় সভ্যতা আর নেই। অথচ, এতবড় মিছে কথাও আর নেই। সভ্যতার অর্থ কি শুধু মানুষ-মারার কল তৈরি করা? দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না,—অতএব আত্ম-রক্ষার ছলে এর নিত্য নূতন সৃষ্টিরও আর বিরাম নেই। কিন্তু সভ্যতার যদি কোন তাৎপর্য্য থাকে ত সে এই, যে অক্ষম ও দুর্ব্বলের ন্যায্য অধিকার যেন প্রবলের গায়ের জোরে পরাভূত না হয়। কোথাও দেখেচ এদের এই নীতি, এই ন্যায়ের গৌরব দিতে? একদিন তোমাকে বলেছিলাম পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখতে। স্মরণ আছে সে কথা? মনে আছে আমার মুখে চীনদেশের বক্সার বিদ্রোহের গল্প? সুসভ্য ইউরোপিয়ান পাওয়ারের দল ঘর-চড়াও হয়ে তাদের যে প্রতিহিংসা দিলে কোথায় লাগে তাঁর কাছে চেঙ্গিস্ খাঁ ও নাদির শার বীভৎসতার কাহিনী। সূর্য্যের কাছে দীপের মত সে অকিঞ্চিৎকর। হেতু যত তুচ্ছ এবং যত অন্যায়ই হোক, লড়াইয়ের ছুতো পেলে এদের আর কিছুই বাধে না। বৃদ্ধ, শিশু, নারী, সঙ্কোচ নেই, দ্বিধা নেই—যে পাপের সীমা হয় না, ভারতী, সেই বিষাক্ত বাষ্পের নরহত্যাতেও নৈতিক বুদ্ধি এদের বাধা দেয় না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে যে-কোন উপায়, যে-কিছু পথই এদের সুপবিত্র। কেবল শুধ নির্ব্বাসিত পদদলিত আমারই বেলায়?

ভারতী নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। এই সকল অভিযোগের প্রতিবাদের সে কি জানে? যে নির্ম্মম, একান্ত দৃঢ়-চিত্ত, শঙ্কাহীন, ক্ষমাহীন বিপ্লবী, জ্ঞান, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের যাহার অন্ত নাই, পরাধীনতার অনির্ব্বাণ অগ্নিতে যাহার সমস্ত দেহ মন অহর্নিশি শিখার মত জ্বলিতেছে, যুক্তি দিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবার সে কোথায় কি খুঁজিয়া পাইবে? জবাব নাই, ভাষা তাহার মূক হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার কলুষ-হীন নারী-হৃদয় অন্ধ করুণায় নিঃশব্দে মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুমিত্রা অনেকদিন হইতেই এই সকল বাদ-প্রতিবাদে যোগ দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল, আজিও সে অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল, শুধু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল কৃষ্ণ আইয়ার। আলোচনার বহু অংশই সে বুঝিতে পারিতেছিল না, এই নিরবতার মাঝখানে সে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের সভার কাজ আরম্ভ হবার আর বিলম্ব কত?

ডাক্তার কহিলেন, কোন বিলম্বই নেই। সুমিত্রা, তোমার জাভায় ফিরে যাওয়াই স্থির?

হাঁ।

কবে?

বোধহয় এই বুধবারে। গত শনিবারে পারিনি।

পথের-দাবীর সংস্পর্শ তুমি ত্যাগ করলে?

সুমিত্রা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন। তারপরে পকেট হইতে কয়েকখানা টেলিগ্রামের কাগজ বাহির করিয়া সুমিত্রার হাতে দিয়া বলিলেন, পড়ে দেখ। হীরা সিংহ কাল রাতে দিয়ে গেছে।

আইয়ার ঝুঁকিয়া পড়িল, ভারতী প্রজ্জ্বলিত মোমবাতিটা তুলিয়া ধরিল। সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম, ভাষা ইংরাজি, অর্থও স্পষ্ট, কিন্তু সুমিত্রার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। মিনিট দুই তিন পরে সে মুখ তুলিয়া কহিল, কোডের সমস্ত কথা আমার মনে নেই। আমাদের সাংহাইয়ের জ্যামেকা ক্লব এবং ক্রূগার তার পাঠিয়েছে, এছাড়া আর কিছুই বুঝ্‌তে পারলাম না।

ডাক্তার বলিলেন, ক্রূগার ওয়্যার করেছে ক্যান্টন থেকে। সাংহাইয়ের জ্যামেকা ক্লব ভোর রাত্রে পুলিশে ঘেরাও করে,—তিনজন পুলিশ আর আমাদের বিনোদ মারা গেছে। দুই ভাই মহতপ ও সূর্য্যসিংহ এক সঙ্গে ধরা পড়েছে। অযোধ্যা হংকঙে, দুর্গা, সুরেশ পেনাঙে, সিঙ্গাপুরের জ্যামেকা ক্লবের জন্যে পুলিশ সমস্ত সহর তোলপাড় করে বেড়াচ্চে। মোট সুসম্বাদটা এই!

খবর শুনিয়া কৃষ্ণ আইয়ার পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, ড্যাম্!

ডাক্তার কহিলেন, ওরা দুভাই যে রেজিমেণ্ট ছেড়ে কবে, এবং কেন সাংহাইয়ে এলো জানিনে। সুমিত্রা, ব্রজেন্দ্র বাস্তবিক কোথায় জানো কি?

প্রশ্ন শুনিয়া সুমিত্রা পাথর হইয়া গেল।

জানো?

প্রথমে তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর ফুটিল না, তাহার পরে ঘাড় নাড়িয়া কেবল বলিল, না।

কৃষ্ণ আইয়ার কহিল, সে একাজ করতে পারে আমার বিশ্বাস হয় না।

ডাক্তার হাঁ, না কিছুই বলিলেন না,—নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শশী কহিল, ব্রজেন্দ্র জানে আপনি হাঁটা-পথে বর্ম্মা থেকে বেরিয়ে গেছেন।

ডাক্তার এ কথারও উত্তর দিলেন না, তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

মুখে শব্দ নাই: বাক্য নাই, মূর্ত্তির মত সকলে নিঃশব্দে বসিয়া। সম্মুখে টেলিগ্রাফের সেই কাগজগুলা পড়িয়া। বাতি পুড়িয়া নিঃশেষ হইতেছিল শশী আর একটা জ্বালিয়া মেঝের উপর বসাইয়া দিল। মিনিট দশেক এই ভাবে কাটিবার পরে, প্রথম চেতনার লক্ষণ দেখা দিল আইয়ারের দেহে। সে পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া বাতির আগুনে ধরাইয়া লইয়া ধুঁয়ার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, নাউ ফিনিশ্‌ড।

ডাক্তার তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন। প্রত্যুত্তরে সে সিগারেটে পুনশ্চ একটা বড় টান্ দিয়া শুধু ধূম উদ্গীর্ণ করিল। শশী মদ খাইত, কিন্তু তামাকের ধুঁয়া সহ্য করিতে পারিত না। এখন সে খামোকা একটা চুরুট ধরাইয়া ঘন ঘন টানিয়া ঘর অন্ধকার করিয়া তুলিল।

আইয়ার কহিল, ওয়ার্ষ্ট ল্যক্! উই মস্ট ষ্টপ্!

শশী কহিল, আমি আগেই জান্তাম। কিছুই হবেনা শুধু—

ডাক্তার সহসা প্রশ্ন করিলেন, তুমি কবে যাবে বল্লে? বুধবারে?

সুমিত্রা মুখ তুলিয়া চাহিল না, মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

শশী পুনরায় বলিল, এতবড় পৃথিবী-জোড়া শক্তিমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবের চেষ্টা করা শুধু নিষ্ফল নয়, পাগ্‌লামি। আমি ত বরাবরই বলে এসেছি ডাক্তার, শেষ পর্য্যন্ত কেউ থাক্‌বে না।

আইয়ার কি বুঝিল সেই জানে, মুখ দিয়া অপর্য্যাপ্ত ধূম নিষ্কাশন করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, ট্রু।

ডাক্তার সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজকের মত সভা আমাদের শেষ হল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল, সকলেই অভিমত ব্যক্ত করিল, করিল না শুধু

ভারতী। সে নীরবে ডাক্তারের পাশে আসিয়া তাঁহার ডান হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, দাদা, আমাকে না বলে কোথাও চলে যাবে না বল।

ডাক্তার মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু তাঁহার বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে যে ক্ষুদ্র কোমল হাতখানি ধরা ছিল তাহাতে একটুখানি চাপ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চর্য্যাপদ ও দোঁহা রচনার সময়

আগেকার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, পদকর্ত্তাদের নাম ধরিয়া রচনার সময় ঠিক করা চলে না, কেননা দুই-তিনটি নাম ছাড়া অবধূতদের সকল নামই তাহাদের সাধন-পন্থাসূচক নাম, আর ঐ নাম নানা সময়ে নানা লোকে পাইয়াছিল, ও একই সাধনার কথা নানা সময়ে নানা জনে লিখিয়াছিল। ছাপা বইখানির টীকায় ও সহজিয়াদের অন্য সাহিত্যে এবিষয়টি অতি স্পষ্ট থাকিলেও পণ্ডিত হরপ্রসাদ উহা ধরিতে বা বুঝিতে পারেন নাই; তাই তিনি পাখী-শিকারের সঙ্কেতে পরিচিত সাধনার সাধককে বা শিকারীকে বা লুব্ধক বা লুবই বা লুইকে এক সময়ের একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ঠাওরাইয়া তাঁহার সুরচিত "বেনের মেয়ে" গল্পটিতে চর্য্যাপদের লুইকে মুসলমান যুগের আগে সাতগাঁএর পুকুরের মাছ খাওয়াইয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় সরহের দোঁহাকোষের টীকায় শিকারী ও জেলেদের বিবাদের যে উপন্যাস আছে,— অর্থাৎ যেখানে "লুবইকৈবর্ত্তাদীনাং বিসংবাদ" উল্লিখিত আছে, তাহা যদি মনোযোগ করিয়া পড়িতেন, তবে অনায়াসে লুই নামের অর্থ ধরিতে পারিতেন।

যে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের নানা সময়ের রচনা একসঙ্গে সংগ্রহ করিয়া চর্য্যার বইখানি করা হইয়াছিল, তখন লুইএর দুইটি রচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল; চর্য্যার প্রথম ভাগের প্রথম গান ও দ্বিতীয় ভাগের প্রথম গান বা ২৯ নম্বরের গানটি লুই রচিত। এই দুইটি গানেরই সুর বা রাগিণীর নাম পটমঞ্জরী। গানের রাগিণীর এই নামটী যে প্রাচীন রাগ রাগিণীর নামে নয়, তাহা বলিতে হইবে না; তবে কবে পটমঞ্জরীর সৃষ্টি হইল, ও চর্য্যাপদের গানের অন্য দুই-একটা সুরের জন্ম হইল, তাহার অনুসন্ধান করিতেছি। রাগিণী গবড়া, মল্লারী ও পটমঞ্জরী, এই তিনটি রাগিণীর সময় সম্বন্ধে বিচার করিলেই যথেষ্ট হইবে।

গৌড় রাগ বা রাগিণী খুব প্রাচীন না হইলেও আমাদের এই গানগুলির বিচারের হিসাবে প্রাচীন বলিতে হইবে; এই গৌড় রাগকে গউড় বা গউড়া নামে কয়েকটি চর্য্যার সুরে পাই। গৌড়, গউড় ও গউড়া হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি গানের

২ ও ৩) সুর গবড়া বলিয়া লিখিত আছে। মুসলমানদের সময়ে গানের কয়েকটী শ্রেণী ভাগ করা হইয়াছিল, আর এক-একটি শ্রেণী এক-একটি বাণী নামে পরিচিত হইয়াছিল; ওড়িষার কবিতার গানের সুরে এই বাণী নাম যথেষ্ট পাওয়া যায়। পাঠানদের আমলে অর্থাৎ মুসলমান যুগে ফিরোজ খাঁ প্রবর্ত্তিত একটি বাণী তাঁহার শিষ্যদের হাতে কান্দাহার বা খাণ্ডার বাণী নাম পাইয়াছিল। ঐরূপ আবার মোগলদের সময়ে তানসেন জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও ব্যসদ খাঁ প্রভৃতি গুণীদের একটি বাণী গৌড়ীয় বাণীর অর্থে গওরহার নাম পাইয়াছিল। এই সুর গৌড় নামে পরিচিত সুর হইতে অনেকটা ভিন্ন, আর এই গওরহার বাণীর সাধারণ নাম হইয়াছিল গবড়া। চর্য্যাপদেও দেখিতেছি গবড়া ও গউড়া আলাদা আলাদা সুর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কেহ দেখাইতে পারিবেন না মুসলমাদের সময়ের আগে গবড়া নাম প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যক চর্য্যা গানের সময় কিছুতেই মুসলমান যুগের আগের হইতে পারে না। পাঠকেরা যে কোন কলাবৎ (আমাদের উচ্চারণে কালোয়াৎ) আচার্য্যের কাছে এই ইতিহাস অনায়াসে পাইতে পারিবেন।

এবারে মল্লারের কথা বলিব। আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত-সাহিত্যে যে ছয়টি রাগের নাম আছে; তাহা প্রাচীনতম ভারতের গ্রন্থে এইরূপভাবে আছে, যথাঃ—

ভৈরবঃ কৌশিকশ্চৈব হিন্দোলো দীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ রাগাঃ ষড়িতি কীর্ত্তিতাঃ॥

ঋতুর পর্য্যায় অনুসারে এই রাগগুলি ভাগ করা হইয়াছে, এইরূপ পড়িতে পাই। ঐ ছয়টি রাগের মধ্যে মেঘ রাগটির সুরের সঙ্গে কিয়দংশে মেলে, এমন একটি সুরের সৃষ্টি হইয়াছিল মোগলদের সময়ে ও সেই সুরটি মল্লার নামে পরিচিত হইয়াছিল বলিয়া যে ইতিহাস আছে, তাহা অবিশ্বাস করা শক্ত; কেন না ছত্রিশটি রাগিণীর প্রামাণ্য তালিকায় মল্লার নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে তালিকায় মল্লার নাম আছে, সে তালিকা মুসলমানদের আমলে রচিত। প্রথম উদ্ভাবিত মল্লারটি সুরের স্রষ্টার নামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া নাম পাইয়াছিল মিঞামল্লার। তাহার পর ঐ সুর নানা সুরের সঙ্গে যখন জোড়া হইয়াছিল, তখন মেঘমল্লার, সুরটমল্লার প্রভৃতি নাম পাইয়াছিল। এই ইতিহাস সত্য কিনা, তাহার পরীক্ষা হইতে পারে; যদি কেহ দেখাইতে পারেন যে, যে সাহিত্য নিশ্চিত মুসলমান সময়ের পূর্ব্বে রচিত তাহাতে মল্লার নামের উল্লেখ আছে, তবে অনায়াসে আমার উদ্ধৃত ইতিহাসটুকু অগ্রাহ্য হইতে পারে। তাহা না হইলে চর্য্যাপদের পুরা পাঁচটি গান মুসলমান যুগে রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ইহার পর পটমঞ্জরীর পালা। পটমঞ্জরী নামে কোন রাগিণী এদেশে ছত্রিশ রাগিণীর মধ্যে উল্লিখিত নাই, ও ভারতের কলাবতেরা কেহই এ রাগিণীকে চেনেন না। ওড়িষার যে

সাহিত্য মুসলমানদের আমলে রচিত হইয়াছে, তাহাতে এই পট-মঞ্জরী নাম যথেষ্ট পাই। ওড়িয়া পটমঞ্জরী সুরের সঙ্গে আমি পরিচিত; ঐ সুরের সঙ্গে চর্য্যার পটমঞ্জরীর সুর কিছুতেই মেলেনা বলিতে পারি, কেননা উভয় পটমঞ্জরীর ছন্দের ধাক্কায় আদবে মিল নাই। মুসলমানদের আমলের আদি যুগে যে নূতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভারতের নানা প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, সেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সুর ছাড়া অন্যত্র পটমঞ্জরীর নাম নাই। বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক বিশেষত্ব ও নূতনত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গানের সুর হইতে ব্যাকরণ পর্য্যন্ত অনেক বিষয়েই নূতন নাম চালাইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি। এই পটমঞ্জরী নামটি নূতন শ্রেণীর বৈষ্ণবদের দেওয়া নামের মত লাগে। এই সুর প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিবে মনে হয় না। পটমঞ্জরীটি এই নির্দ্দেশ মতে আধুনিক হইলে চর্য্যার অনেকগুলি গানই একেবারে আধুনিক হইয়া পড়ে।

গান গুলি যদি এত আধুনিক সময়েরই হয়, তবে উহাদের ভাষা সম্পূর্ণ আধুনিক সময়ের ভাষা নয় কেন,—ঐ ভাষার কাঠাম পূর্ব্বাঞ্চলের মাগধী ভাষায় গড়া হইল কিরূপে, তাহা পরবর্ত্তী প্রবন্ধেই পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিব। তখন দেখাইব যে কি কারণে একটি প্রাচীন ভাষার সঙ্গে একেবারে নিতান্ত হালের বাঙ্গলা, হিন্দী, ও ওড়িয়া ভাষা মিশিয়া যাইতে পারিয়াছে।

গানের সুরের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। আগেকার দুইটি প্রবন্ধে অতি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছি যে, চর্য্যাপদের গানগুলি চৌপদী বা চৌপাই ছন্দের কাঠামে গড়া; একথা কিছুতেই অস্বীকার করার জো নাই। এই চৌপাই যে বাঙ্গলার সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও হিন্দী সাহিত্যে অত্যন্ত অধিক পরিচিত, তাহাও অস্বীকার করা অসম্ভব। গানের সুর যেভাবে দেওয়া আছে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচার চৌপাই যে চমৎকার হিন্দুস্থানী ধরণে পড়া যায়, তাহা লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। পণ্ডিত হরপ্রসাদ বলেন যে, ঐ গানগুলি নাকি বাঙ্গলা দেশের কীর্ত্তনের সুরে বাঁধা। ইহার কি জবাব দিব? আমাদের ছেলেবেলার সঙ্গীরা Longfellow রচিত Psalm of Lifeটি চমৎকার কীর্ত্তনের সুরে গাইতেন; এখনও Tell me not বলিলেই সেই সুর মনে পড়ে। এ অবস্থায় চর্য্যাপদের চৌপাই কীর্ত্তনে উৎরাইয়া দেওয়া অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু ওগুলি বাঙ্গলার কীর্ত্তনের সুরে রচা নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি যে শুষ্ক Logic-এর অতি বড় শুষ্ক Barbara Celarent প্রভৃতি খাসা পিলু রাগিণীর সুরে সেকালে মুখস্থ করার উপায় ছিল।

গানে ব্যবহৃত গোটা কতক শব্দের বিচারে রচনার সময়ের অনুসন্ধান করিব। প্রথম কুড়ি সংখ্যার গানের জাণ জোবণ কথাটির আলোচনা করিতেছি। ছত্রটিতে আছে—জাণ জোবণ মোর ভইলেসি পূরা। আমাদের অর্থাৎ ভারতের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের

(Idiomatic usage) জীবন-যৌবন একসঙ্গে বলা চলে ; জাণ শব্দটিকে জৌবণের বিশেষণ করিয়া উহাকে "নব"যৌবন করা চলে কিনা, তাহা বিচার্য্য। কোন সংস্কৃত বা অপভ্রংশ শব্দ হইতে এমন কোন জাণ শব্দ পাওয়া যায় না, যাহার অর্থ "নব"; যান শব্দটি অন্যান্য গানে জাণরূপে যেখানে পাই সেখানে টীকাকার ঐ জাণ অর্থই দিয়াছেন, কিন্তু এখানে যে জাণ শব্দটি "নব" অর্থ প্রকাশ করিতে পারে তাহা কোন শব্দ দিয়া টীকাকার দেখান নাই ; জীবন-যৌবন অর্থ করিলে যে পদের অর্থ ভালই হয় ও টীকাকারের ব্যখ্যার সঙ্গে বিরোধ ঘটে না, তাহা সুস্পষ্ট ; কাজেই এ জাণ মুসলমানী জান। গানের সুরে যে সময়ের সঙ্কেত পাইতেছি, তাহাতে এই মুসলমানী শব্দের ব্যবহার খাপ যাইতেছে। ছাপা বইএ ৮৬ পৃষ্ঠায় সরহের দোঁহায় জীবন অর্থে জাণ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে মনে হয়। সে দোঁহার ভাবার্থ এই যে যাহারা সাধনার জন্য গায়ের লোমা উপড়ায় বা মোক্ষের জন্য অন্য কষ্টসাধ্য কাজ করে ও শরীরকে "বিড়ম্বিত" করে, তাহারা ভ্রান্ত। এক অর্থের একজোড়া দোহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

দীক্ষণখজ্জে মলিনেঁ বেসে ; ণগ্গল
হোইঅ উপাট্টিঅ কেসে। খবণেহি
"জান"বিড়ম্বিয় বেসেঁ ; অপ্পণু
বাহিঅ মোক্‌খ উএসে।

এখানে টীকাকার যান অর্থ খাটাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যাহা বিড়ম্বিত হইল তাহা "জীবন" অর্থে না লইলে অসঙ্গতি ঘটে।

ইহার পর ৩৪ নম্বর গানে উহার রচয়িতা বাঙ্গালী অবধূত দারিক যেভাবে বারটি ভুবনের রাজার উল্লেখে "বার ভুঁইআর" রাজত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা ঐ গানটির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সময় দেখাইব। বার ভুঁইআর সময়ের উল্লেখ যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া সম্ভব নয়, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

তৃতীয়ে, রসরসাল প্রভৃতির উল্লেখের কথা আলোচনা করিতেছি। জয়নন্দীর ৪৬ নম্বর গানের শেষে মানুষের "ধাতু"কে "স্ফুটণে" শোধন করিবার ইঙ্গিত আছে ; টীকাকার এখানে মহারসে (অর্থাৎ পারদে) স্ফুটন করাইয়া শোধন করার কথা লিখিয়াছেন। শোধনের প্রাচীন পদ্ধতি উঠিয়া গিয়া aqua regia বা মহারস দিয়া কাজ করিবার উপায় আরব জাতীয়দের নিকট হইতে এদেশে শেখা, ও এই পদ্ধতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই। স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের রসায়নের ইতিহাস দ্রষ্টব্য। ২২ নম্বর গানে রস রসায়নের যে কঙ্খা বা আকাঙ্ক্ষার কথা আছে, তাহা এইরূপ :—

জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা
সো করউ রস রসানের কঙ্ক্ষা।

রসেশ্বর দর্শনের যোগীদের মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই সাধনার পরীক্ষা হইতেছিল যে, পারদ ব্যবহার করিয়া অর্থাৎ রসরসান করিয়া অজরামর হইতে পারা যায় কিনা; এখানে সেই সাধনার কথা লক্ষ্য করা হইয়াছে।

আরও যে সকল আভ্যন্তরিক প্রমাণে চর্য্যা প্রভৃতির রচনার সময়ের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাহা এবারে বলিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

শোক সংবাদ

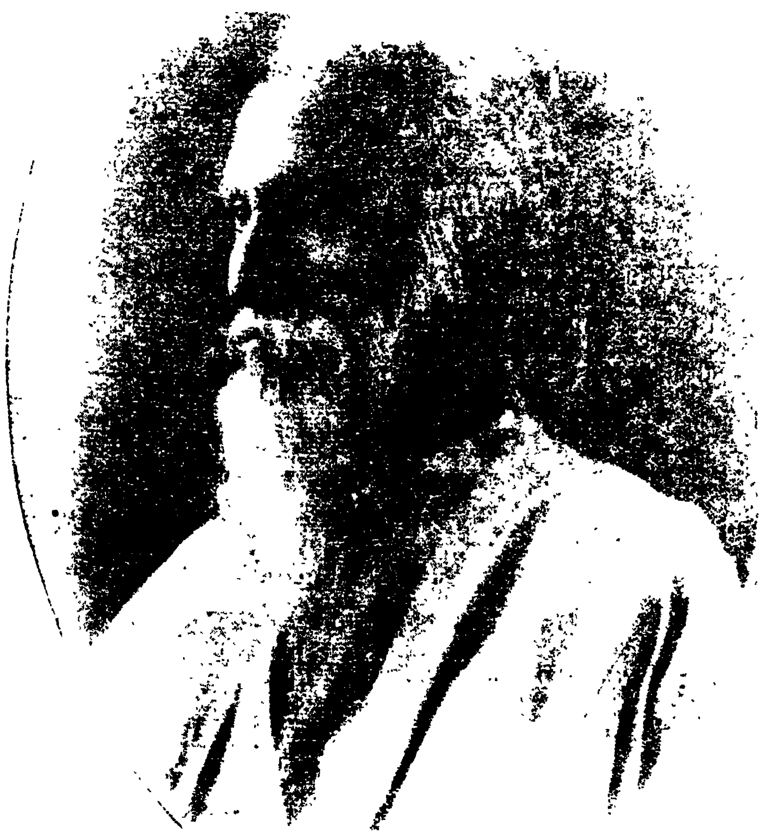
স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"স্বপ্নপ্রয়াণে"র কবি জ্ঞানবৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ গত ৪ঠা মাঘ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। গত ১৮৩৯ সালে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একাধারে কবি, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ এবং ভারতবর্ষ বিষয়ে একজন চিন্তাশীল বক্তি ছিলেন। শিশুকাল হইতেই তাঁহার বাঙ্গালা গদ্য এবং পদ্য লিখিবার অভ্যাস জন্মে। রামায়ণ এবং মহাভারত তাঁহার বিশেষ আদরের বস্তু ছিল। তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা "স্বপ্নপ্রয়াণ" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—'স্বপ্নপ্রয়াণ' যেন একটা রূপকের রাজপ্রসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্ত্তি ও কারুনৈপুণ্য! তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগান বাড়ীতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে।" "স্বপ্নপ্রয়াণ" ছাড়াও তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে "তত্ত্ববিদ্যা" ও "মেঘদূতে"র বাঙ্গালা অনুবাদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হাস্যরসে তাঁহার প্রাণ ছিল পরিপূর্ণ। বহু হাস্যরসাত্মক কবিতা তিনি মৃত্যুর কয়েকবৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষের এই পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ হইয়া তাঁহার মন সর্ব্বদা ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্‌ করিত। অন্যায় ও অবিচারকে তিনি কোন দিনই নীরবে হজম করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত অহিংস অসহযোগের উপর তাঁহার প্রগাঢ়

বিশ্বাস ছিল, এবং সেই জন্যই তিনি মহাত্মার একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। মহাত্মাজীও তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং "বড়দাদা" বলিয়া ডাকিতেন। এই "বড়দাদা" নামেই প্রায় সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে মহাত্মা তাঁহার ইয়ং



ইণ্ডিয়া পত্রে লিখিয়াছেন,—"দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর ইহ জগতে নাই, একথা বিশ্বাস করাও শক্ত। শান্তিনিকেতন হইতে একখানি টেলিগ্রাম পাইয়া জানিতে পারিলাম যে

"বড়দাদা" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরতরে বিশ্রামলাভ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় নব্বই বৎসর হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার সদাহাস্যময় মুখ দেখিয়া বোঝা যাইত না যে, তাঁহার পার্থিব অস্তিত্বের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। 'বড়দাদা' বিখ্যাত মনীষী, পরিবারের কৃতী সন্তান ছিলেন। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন—ইংরাজী যেমন জানিতেন, সংস্কৃত ভাষাতেও তেমনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি উপনিষদের উপদেশ আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম হইতে তিনি উপদেশ গ্রহণ করিতে সতত প্রস্তুত ছিলেন। ভক্তের ঐকান্তিক নিষ্ঠা লইয়া তিনি দেশকে ভালবাসিতেন। তাঁহার দেশপ্রীতি হিংসা-মূলক নহে। অহিংস অসহযোগের আধ্যাত্মিক মাধুর্য্য তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাজনীতিতে ইহার সার্থকতা তিনি কখনও অস্বীকার করিতেন না। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে চরকায় বিশ্বাস করিতেন এবং বৃদ্ধ বয়সেও খদ্দর ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি যৌবনের উৎসাহ লইয়া সাময়িক ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের ধনজন পুত্রপৌত্রাদি বর্ত্তমান সত্ত্বেও তিনি অনাসক্ত গৃহীর ন্যায় শান্তি-নিকেতনের এক কুঞ্জ-কুটীরে বাস করিতেন। সেখানে ঈশ্বর চিন্তা এবং সদ্‌গ্রন্থ পাঠেই তাঁহার অধিকাংশ সময় যাপিত হইত। আজ দ্বিজেন্দ্রনাথের তিরোধানে বঙ্গদেশ সত্যই প্রাচীনতম তপস্বীর জীবন্ত আদর্শকে হারাইল।

আমরা কবি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

দাক্ষায়ণী দেবী—চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ধান্যকুঁড়িয়া গ্রামের স্বনামধন্য দানবীর স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়ের পত্নী দাক্ষায়ণীদেবী গত ১০ই মাঘ পরলোক গমন করিয়াছেন। দয়া দাক্ষিণ্যগুণে ইনিও স্বামীর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ১৩০৩ ও ১৩০৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ইঁহারই উৎসাহে শ্যামাচরণ বাবু ধান্যকুঁড়িয়াতে অন্নসত্র খুলিয়া প্রত্যহ তিন চারি সহস্র লোককে অন্যূন দেড় বৎসর কাল অন্নদান করিয়াছিলেন।

ছিটে-ফোঁটা

বিরূপাক্ষ

(১)

গ্রামের নাম বিরূপাক্ষ। নাম যেমনি হউক, গ্রামটী ছিল বড় সুন্দর। দেখিলে মনে হইত স্বর্গের একখণ্ড খসিয়া পড়িয়াছে, পৃথিবীর উপর। স্বর্গরূপ বিমল cut glass jar এর এক খণ্ড,—খরধার।

গ্রামের বাসিন্দাদেরও খুব ধার ছিল,—কলাবিদ্যার চৌষট্টিতে না হউক, একটায়,—সঙ্গীতে। বিশেষতঃ যন্ত্র-সঙ্গীতে। তবে তাঁদের যন্ত্র ছিল একটী মাত্র—করতাল। করতাল বাজাতেন তাঁদের আবালবৃদ্ধ, দিনে, রাত্রে, যখন-তখন, যেমন-তেমন করিয়া।

কারণ তাল লইয়া মাথা ঘামান তাঁহাদের অভ্যাস ছিল না। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল কলা। তাঁদের এই এক কলাই ছিল এক কাঁদি।

(২)

কাঁদিটী কিন্তু অখণ্ড নহে। কারণ বিরূপাক্ষে একজন লোক ছিলেন,—তালগাছের জটের মত অসঙ্গত, অশোভন ও অনাবশ্যক,—নাম সদানন্দ। করতালে তাহার হাত উঠিল না। সে বাজাইত বাঁশী। এই বেখাপ্পা লোকটীর উপর সকলে খাপ্পা হইলেন। হইবারই কথা। কারণ, ইহাঁরা ছিলেন রৌদ্ররসের উপাসক। ইহাঁদের রন্ধনশালে লঙ্কামরিচ ও রঙ্গালয়ে জনা, ক্ষত্রবীরের ছড়াছড়ি। বাঁশীর সুর ইহাঁদের কানে বড় প্যান্ প্যানে শুনাইত। কিন্তু –

(৩)

হঠাৎ শুনা গেল, তিলকপুরের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র না কি সদানন্দের বাঁশীর তারিফ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, নিজের হাতে এক গুচ্ছ করবী লইয়া তিনি সদানন্দের কবরীতে —অর্থাৎ কিনা,—মাথায় (মগজে নহে, আরও একটু উপরে,—কেশকলাপে) গুঁজিয়া দিয়াছেন। শুনিয়া করতালের বাজনদারগণ স্তম্ভিত হইলেন, রাগ করিলেন, এবং শেষে ভক্তিতে গদ গদ হইয়া পড়িলেন।

জাতটী বড় ভক্তিপ্রবণ। এই দেখ না, ইহাঁদের ঘরে ঘরে গীতা ও চণ্ডীর পূজা হয়। সিঁদুর ও চন্দনে এমনি করিয়া পূজা হয় যে এক অক্ষর পড়িবার উপায় থাকে না। গীতা পড়িয়া মরে অন্য লোকে। আর, ইহারা করেন পূজা,—নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

(৪)

আপনার ঘরে বসিয়া সদানন্দ বাঁশী বাজাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে দলে দলে লোক আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সমস্বরে সদানন্দের অভ্যর্থনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন "আপনি ধন্য। আপনি অঙ্কশায়ী হইয়া দেশমাতার কলঙ্ক ক্ষালন করিয়াছেন। আপনি বিরূপাক্ষের কমলাক্ষে চার্ব্বঞ্জন লিপ্ত করিয়াছেন। আজ জগৎ দেখুক যে সমুদ্র গর্ভেও Sea anemone ফুটিতে পারে, আমাদের মধ্যেও মানুষ আছে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাঁরা সকলেই বিরূপাক্ষের লোক,—করতাল বাজাইয়া বাজাইয়া ইহাদের Biceps বেশ বড়, এবং Pectoralis খুব পুরু। সদানন্দ বিচলিত হইয়া উঠিল। বলিল "আসুন, আসুন, বসুন, বসুন।" তারপর আরও লোক আসিতে লাগিল। তারপর আরও আসিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এমনি করিয়া দলে দলে লোক আসিতে লাগিল, আর সদানন্দ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল বলিতে লাগিল "আসুন, আসুন, বসুন, বসুন। পান খাবেন? চা খাবেন? তামাক খাবেন?"

(৫)

এমনি করিয়া ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গেল। সদানন্দের হাতের বাঁশী হাতেই রহিয়া গেল, বাজাইবার অবসর হইল না। "আসুন, বসুন" বলিতে বলিতে তাহার মুখে গাঁজা উঠিল, জিহ্বা তালুতে গিয়া আট্‌কাইয়া রহিল, এবং দৃষ্টি শূন্যমার্গে বিহার করিতে লাগিল। তখন রাজবৈদ্য ছুটিয়া আসিয়া নাড়ী দেখিলেন। বলিলেন "সর্ব্বনাশ! হাত পা যে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে! তাড়াতাড়ি খানিকটা কাল ভেড়ার লোম পুড়াইয়া ইহার নাকের মধ্যে ঠাসিয়া দাও, এবং ধাঁ করিয়া খানিকটা কলাই ডাল প্রস্তুত কর। কিছু পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইতে না পারিলে ইহাকে আর বাঁচান যাইবে না।" দেখিতে দেখিতে একবাটী কলাই ডাল আসিয়া উপস্থিত হইল। আহা! এ ত ডাল নয়। এযে বসুধার অমৃতনিস্যন্দী পীনপয়োধরের মসৃণ, চিক্কণ চুচুক,—কৃষ্ণকান্তি, কদাকার। ডালের দিকে চাহিয়া সদানন্দ বলিল "আমার ক্ষুধা নাই।" অমনি লক্ষ কণ্ঠে চীৎকার উঠিল "হাঁ হাঁ তা কি হয়? না খাইলে চলিবে কেন? একটু nutritious, nitrogenons, vitaminous food খাইতে হইবে বৈ কি।" সদানন্দ বলিল "না।" আমার একটী অনুরোধ আপনারা রক্ষা করুন। আমাকে একবার বাঁশী বাজাইতে দিন।" সকলে বলিলেন, "বেশত, বাজাও না।" বলিলে কি হয়? ইহাঁরা ত বাহিরের লোক। ঘরের লোক যাঁরা ছিলেন,—সদানন্দর মাসী, জ্যাঠা, খুড়শ্বশুর, নাতজামাই, তাঁহারা আসিয়া সদানন্দর হাত চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন "বাঃ! তোমার বাঁশীর এত নাম! আর তুমি বিনা পয়সায় বাঁশী বাজাইবে? তা হইবে না। পয়সা চাই।" পয়সার অন্বেষণকল্পে দলে দলে লোক বাহিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। বাঁশী আর বাজিল না।

(৬)

গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত ভক্তবৃন্দ শুনিতে পাইলেন সদানন্দের ঘরের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়া গিয়াছে। রাজবৈদ্য বলিতেছেন "আমাকে মোটে একটাকা সাত আনা এক পয়সা দিয়াছ। Fees এর বাকী ছ' পয়সা কে দিবে? সদানন্দের মাসী চলিত ভাষায় চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "ভো মনুষ্য, তুমি যে সাতগোছ পান এক প্রকার অলৌকিক শব্দ করতঃ চর্ব্বণ করিলে তাহার দাম কে দিবে?" বৈদ্য তদুত্তরে গুণ্ডা ডাকিয়া আনিবেন বলিয়া শাসাইতেছেন। এখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে সদানন্দ মরিয়াছে।

(৭)

সদানন্দ ত মরিল। তারপর দেশে যে কাণ্ডটী হইল তাহা বর্ণনাতীত। একদল লোক বনভূমিকে বিবস্ত্র করিয়া ফুল, লতা, পাতা ছিঁড়িয়া আনিয়া সদানন্দকে মুড়িয়া ফেলিল। ত্রিশজন লোক গগনভেদী সিংহনাদের সহিত মৃতদেহ বহন করিয়া বাহির হইল। ইঁহাদের ঘেরিয়া নয় হাজার তিনশ পঁচানব্বই জন কবি, মুখে মুখে ডি এল্ রায়ী সুরে গান রচনা করিয়া কবির লড়াই বাঁধাইয়া দিল। আর বাকী দুইলক্ষ পঁচাশী হাজার সাত শ তিন জন প্রাণপণে করতাল বাজাইতে লাগিল। করতালের ঝন্ঝনায় দিগ্বধূগণ দিগ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, উত্তরের সপ্তর্ষিমণ্ডল পশ্চিমদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল, অষ্টমীর চাঁদ মধ্য পথে আত্মহত্যা করিলেন এবং নিশীথিনী স্রস্ত নীলাম্বরে বনান্তরালে অন্তর্ধান করিলেন।

(৮)

ইহার পরের যে দৃশ্য সে আরও হৃদয়বিদারক। শ্মশান ঘাটে সে কী লোকের ভিড়! সেই ভিড়ের মধ্যে আমাদের রাজীববাবু, হরিসাধন পাল, হাড়ভাঙার সবরেজিষ্টর শ্রীমন্মথ মাইতি, আর—(আচ্ছা ইহাদের নাম পরের সংখ্যায় ছাপাইয়া দিব)। এক বিন্দু অশ্রু মন্মথবাবুর গোঁপের উপর পড়িয়া জ্বল জ্বল করিতেছিল অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন,— গোঁপের বাঁ দিকে। তারপর, পাঠক, তারপর? হাঁ তারপর,—তারপর ভ্যাম্‌শো কাঠের চিতায় শোয়াইয়া সদানন্দর নির্গলিতাত্ম দেহের দাহকার্য্য সম্পন্ন হয়।—ভ্যাম্‌শো কাঠ হয়ত আপনারা কখনও দেখেন নাই। এই কাঠের মত কাঠ আর নাই। ইহা দেখিতে সেগুনের মত। কিন্তু কাটিলে দেখা যায় যে ইহার ভিতরের রং গাঢ় নীল।

ভ্যাম্‌শো কাঠের চিতায় যে কি আনন্দ তাহা যিনি সে চিতায় না শুইয়াছেন তাঁহাকে বোঝান যায় না।

বসন্ত

'আজি এ নব ফাল্গুনে,—'

এইবার বিপদে পড়িলাম। ফাল্গুনমাসে একটা কিছু হয় আমাকে বলিতে হইবে। কি যে হয় তাহা নির্ভর করিতেছে একটি ছোট কথার উপর। "ফাল্গুনে"র সহিত মিলিয়া যায় এমন একটী কথা জোগাইয়া দিতে পার?—হইয়াছে—

আজি এ নব ফাল্গুনে,
কণ্ঠে মধু মশকবধূ গাহিছে শুধু তালগুণে।

মশিকাগণ উচ্চঅঙ্গের সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন, ইতি তাৎপর্য্য।

শুনিয়াছি, মনের একটা আবেগ, আকুলতা, ভাবাবেশ, বা ঐরকম একটা কিছুর spontaneous বা সহজ প্রকাশের উপায় পদ্য। দুই লাইনে ভাবের সহজ প্রকাশ করা হইল। এইবার আমার যাহা বক্তব্য ছিল বলি—বসন্ত আসিয়াছে।

ফুল? ফুলের অভাব কি ভাই? কুমুদ-কহ্লার-কমল-কর্ণিকারে কলিকাতার কার্পণ্য আছে স্বীকার করি, বক-বকুল-বেলারও বড় বাহুল্য দেখি না, গন্ধরাজ-রজনীগন্ধার অভাব পূরণ করিতে গন্ধভাদুলির শরণ লইতে হয় সত্য। কিন্তু ফুলকপি আছে। বাজারে না পাও, হোটেলে পাইবে, হোটেলে না পাও, দার্জিলিঙ্ যাও। আর, নবকিসলয়?—ঐ যে জিনিসটা "নখক্ষতানীব বনস্থলীনাং"? উহার ত দেখা পাইবে না। এ সভ্যতার দিনে ওটার আর তত রেওয়াজ নাই। তবে Psychology আরও popular হইলে কি হয় বলা যায় না। নাঃ!—বসন্তের খোঁজে গাছের ডগায় তাকাইয়া লাভ নাই। গাছের ত বসন্ত হয় না। বসন্ত হয় মানুষের —আর গরুর। এই গোবসন্তের বীজ হইতে টীকা লইয়া আমরা দুর্ব্বিসহ বসন্ত বিভীষিকার করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই। আহা! এই গরু, এই গোমাতা,— আমরা যাঁহার দুগ্ধ হইতে প্রাণ, মূত্র হইতে স্বাস্থ্য, চর্ম্ম হইতে পাদুকা, ও বীজ হইতে— বাক্য সম্পূর্ণ হইল না। হইবে কি করিয়া? গরুর কথা বলিতে বলিতে আমরা যে তন্ময় হইয়া পড়ি, আমাদের সমস্ত মস্তিষ্ক গোময় হইয়া উঠে। তাই বলিতেছি টীকা লওয়া অনাবশ্যক। টীকা দেওয়ার হাঙ্গামা না করিয়া, যদি সকলে ঘরে ঘরে শীতলার পূজা করেন, (ঘরে ঘরে শীতলাকে বহন করিবার লোকের অভাব এদেশে কখনও হইবে না) যদি ঘরে ঘরে শীতলার পূজা হয়, তাহা হইলে—তুমি জানিতে চাও তাহা হইলে কি হইবে? কি আবার হইবে? ঘরে ঘরে বসন্ত হইবে।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

ফাল্গুনে

এস তুমি নিত্য নূতন ! প্রাচীন তোমায় দেখেনি কেউ।
ঋতুর পরে ঋতুর খেলা, ঢেউএর পরে চলেছে ঢেউ।

বঙ্গবাণীর নববর্ষ—এই ফাল্গুনে বঙ্গবাণীর পঞ্চম বর্ষ আরব্ধ হইল। এদেশে যাঁহারা এই সাহিত্যমুকুরখানিকে আদর করেন, তাঁহাদের কাছে আনন্দের কথা জ্ঞাপন করিতেছি, যেসকল ইউরোপীয়েরা বঙ্গের সাহিত্যকে সম্মান করেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গবাণীর আদর বাড়িয়াছে ; এই পত্রিকার কয়েকটি রচনা সম্প্রতি জর্ম্মাণ ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া সেদেশে প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইলে পাঠকদিগকে সকল বিবরণ দিব। আশায় ও উৎসাহে আমাদের পাঠকদিগকে সাদর অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

* * * *

কাজের আহ্বান—আমরা এযুগে পড়িয়াছি নানা আন্দোলনের ঘূর্ণিপাকে ; খাইতেছি স্রোতের টানে হাবুডুবু, আর হাত-পা নাড়িয়া ভাবিতেছি, স্রোত ঠেলিয়া উজান ছুটিতেছি। কথাটি অপ্রিয়, কিন্তু সত্য ; স্থিরপ্রাণতায় অপ্রিয় সত্য বুঝিতে না পারিলে উন্নতির সম্ভাবনা হয় না। আমরা যে বেশির ভাগ কোলাহলে মাতিয়াছি, কাজের কাজে ভিড়ি নাই, তাহা অল্প একটু আলোচনা করিয়া দেখাইব।

দেশের উন্নতি-বিধানের সঙ্কল্পে বিভিন্ন মতবাদীদের নানা সঙ্ঘের বা দলের সৃষ্টি হইয়াছে, আর সকল দলের লোকেরাই তাঁহাদের অধিকাংশ সময় ও শক্তি কেবল গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি প্রস্তাবের ও বাঁধা নিয়মের সমালোচনায় ক্ষয় করিতেছেন। রাষ্ট্রীয় সংস্কারের যে কোন দিকের কথাতেই হউক, প্রস্তাবের খস্‌ড়া তৈরি হয় প্রথমে গবর্ণমেণ্টের হাতে, আর আমরা উহার সমালোচক হইয়া নানা ভুল-চুক ধরিয়া আন্দোলন তুলি। একাজে আমাদের তর্ক করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু উদ্ভাবন করিবার শক্তির ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় মেলে না। বিভিন্ন বিষয়ে দেশের অবস্থা কি, তাহার খাঁটি বিবরণ আমরা সংগ্রহ করি নাই, ও সেই বিবরণ মুদ্রিত করিয়া অন্য দশজনকে সে বিষয়ে ভাবিতে ও অধিকতর অনুসন্ধান করিতে উদ্যোগী করি নাই। আমরা যে দেশের ছোট বড় সকল অবস্থা সম্পূর্ণ জানি, তাহা আমাদের কোন মুদ্রিত গ্রন্থে নাই। হয় Morley না হয় Montague, না হয় আর কেহ আমাদের অবস্থা ও যোগ্যতার কথা লিখিলেন, আর সে যোগ্যতায় কি অধিকার পাইতে পারি লিখিলেন ; আমরা কেবল তর্ক ও আন্দোলন তুলিয়া বলিলাম যে প্রস্তাবগুলি আমাদের মনের মত হয় নাই। নিজেরা কোনস্থলে আগে আমাদের অবস্থা ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া, ও আমাদের সঙ্গে ইংরেজের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের কিরূপস্থলে বিরোধ হয়না; তাহা বুঝাইয়া কোন গ্রন্থ লিখি নাই। হইতে পারে যে সেরূপভাবে খাঁটি ঘটনার বিবরণ লিখিলেও ইংরেজেরা তাহা অগ্রাহ্য করিতেন ও ধীরভাবে খাঁটি ঘটনা লিখিলে সর্ব্বত্র যে ফল হয় তাহা হইত না, কিন্তু তাহা যে আমরা লিখিতে পারি, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই ; তাহা ছাড়া আমরা দেশের খাঁটি অবস্থা জানিয়া তাহার বিবরণ লিখিলে যে দেশের দশজনে জ্ঞানে পুষ্ট হয়, ও ইংরেজের প্রস্তাবের সমালোচনার সময় কেবল উপেক্ষায় ও ঠাট্টা-তামাসায় আমাদের বক্তৃতা শেষ হয় না, তাহা ত অস্বীকার করা যায় না।

বিস্ সাহেব দেশের নিম্নস্তরের লোকদের শিক্ষা-পদ্ধতি গড়িয়া রিপোর্ট লিখিয়াছেন; সে রিপোর্ট যে যথার্থই অসার ও অহিতকর, তাহাতে আমাদের এক তিল সন্দেহ নাই। তবে কথা এই, আমাদের হিতৈষীরা দেশের ও লোকের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া পূর্ণভাবে সেই খাঁটি অবস্থার বিবরণ দিয়া দশের জ্ঞানের জন্য কিছু লিখিতে পারিলেন না, ও আমরা একটি হিতকর শিক্ষা-পদ্ধতি রচনা করিয়া নিদানপক্ষে আমাদের দশজনের আলোচনার জন্য উপস্থিত করিতে পারিলাম না। আমাদের অনুসন্ধানের রিপোর্টে সরকার বাহাদুর কিছু না করিতে পারেন, কিন্তু দেশের জ্ঞানে পুষ্ট হইতে পারিলে আমাদের যে অক্ষয় উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়, তাহা ত অস্বীকার করিবার জো নাই। সরকার যদি কিছু নাই করেন, তবে আমরা নিজেদের ভাত মাটিতে খাইয়া সুখী হইব না; যাহা আমাদের উন্নতির মূলে, তাহা আমরা যতটুকু সুসম্বদ্ধভাবে নিজেরা করিতে পারি, তাহাও করিতে পারিতাম। অমুক ব্যক্তি অমুক গ্রামে স্কুল খুলিলেন অথবা নিজের মনে শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করিলেন; তাহাতে কিছুই হইবে না। একটা সুসম্বদ্ধ পদ্ধতি গড়িয়া সকল দলের লোকের আলোচনার অধীনে আনিতে হইবে; নহিলে এখানে সেখানে খাপ্‌ছাড়া রকমে কিছু করিলে নেতারাও সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালনে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন না।

এদেশের চাষের কাজের ও চাষাদের অবস্থার অনুসন্ধানের জন্য বিলাতী কমিশন বসিবার কথা স্থির হইয়াছে। আমরা যদি এখন কেবল ঠাট্টা তামাসায় উহাকে উপেক্ষা করিয়া বলি, যে অমন কমিশন অনেক হইয়াছে, আর উহাতে কোন ফল নাই, তাহাতে কিন্তু কমিশনটি বসার পক্ষে বা কমিশনের কাজ চলার পক্ষে বাধা ঘটিবে না। কমিশন যখন বসিবেই, আর সেই কমিশনে যখন উপেক্ষাকারীদের অনেককে সাক্ষী দিতেই হইবে, তখন ঐ উপলক্ষে এখন হইতে আমাদের কি কিছু করিবার নাই? যাহা হাসিয়াই উড়াইতে পারিব না, তাহার প্রসঙ্গে কেবল ঠাট্টা-তামাসা চালাইলে কেবল প্রমাণিত হইবে যে, আমরা কর্ম্মে অপটু ও লঘুচেতা। কমিশন আমাদের কথা শুনিতে হয় শুনিবে, না হয় না শুনিবে, কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থার কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া উহার বিবরণী আগে হইতে লিখিয়া ফেলিতে পারিলে আমাদের যে কত উপকার হইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহারা আমাদের দেশ শাসন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা এমন আহাম্মক ন'ন যে, আমরা আমাদের অবস্থা খাঁটি ঘটনায় লিখিতে পারিলে তাহা তাঁহারা মনোযোগ করিয়া পড়িবেন না।

আসল কথা এই, এরূপভাবে অনুসন্ধান করিবার ও বিবরণী লিখিবার লোক আমাদের নাই বা অতি অল্প আছেন। অথবা হয়ত গবর্ণমেণ্টের কতগুলি প্রস্তাব ও আইন লইয়া ঝগড়া করিবার ও আন্দোলন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি এত অধিক যে, যাহা কাজের কাজ তাহা করিবার দিকে হিতৈষীদের অবসর নাই। ইহাই কি কেবল প্রমাণিত হইবে যে আমরা ঘোঁট করিতে পারি, দলাদলি করিতে পারি, তীক্ষ্ণ তর্ক করিতে পারি, হাসি তামাসা করিতে পারি, কিন্তু ধীর ও নিপুণ ভাবে কাজের কাজ করিতে পারি না? অনেকে অনেক কাজ করিয়া থাকেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, আর হয়ত তাহা সত্য; কিন্তু আমরা দেশের ও দশের উপকারের জন্য হাতে কলমে তাহার পরিচয় চাই,—দেশের সকল অবস্থার বর্ণনাপূর্ণ উন্নতি বিধানের পদ্ধতি-সম্বলিত সুবিচারিত গ্রন্থ চাই। ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকেরা যেখানে ভিন্ন মত পোষণ করিতে পারেন, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ ও পদ্ধতির প্রস্তাব চাই। কেবল

গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে রেষারেষি করিয়া আন্দোলনের ঝড় তুলিয়া সেই ঝড়ের আবর্ত্তে নিজেরা ঘুরপাক্ খাইলে কাহারও উপকার হইবে না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বড় কথার উল্লেখ করিব। রাইট্ অন্‌বল্ ফিশারের সম্পাদকতায় Modern World Seriesএ সকল দেশের হালের যুগের ইতিহাস রচিত হইতেছে ও সেই গ্রন্থগুলির প্রথম গ্রন্থ হইয়াছে ভারতের একালের ইতিহাস। ইহার লেখক সেই Sir Valentine Chirol—যিনি ভারতগৌরব Sir Sankaran Nayar এর নামে বিলাতে মানহানির মকদ্দমা করিয়াছিলেন। এই ইতিহাসগুলি ইউরোপীয়দের কাছে প্রামাণ্য বই হইবে, ও যাঁহারা ভারতের বন্ধু তাঁহারাও ভারতের অবস্থার কথা এই নূতন প্রকাশিত গ্রন্থে পড়িবেন।

এই খুব বড় আয়তনের বইখানিতে ভারতের সকল অবস্থার বর্ণনা আছে ও যতশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন উঠিয়াছে তাহার মূল, প্রকৃতি ও ফলের বিষয় লিখিত হইয়াছে। আমরা যদি এখন ধীরভাবে অপক্ষপাতে দেশের সকল অবস্থার সমালোচনা করিয়া অধিকতর প্রামাণ্য গ্রন্থ না লিখিতে পারি, তবে ফল হইবে বড় বিষময়। এ সকল দিকের কোন কথাই তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষায় উড়াইবার নয়। যাহা কাজের কাজ তাহার জন্য কৃতী হিতৈষীদিগকে আহ্বান করিতেছি।

* * * *

বেঙ্গল কৌন্সিলের সভাপতি—শ্রীযুক্ত অন্‌বল্ কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় বেঙ্গল কৌন্সিলের সদস্যদের নির্ব্বাচনে নিযুক্ত সভাপতি। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছায় সভাপতি নিযুক্ত না হইয়া সদস্যদের নির্ব্বাচনে নিযুক্ত হইলে আমাদের স্বরাজ একধাপ উঁচুতে ওঠে কিনা সম্প্রতি তাহার একটা পরীক্ষা হইয়া গেল। গবর্ণমেণ্টের হাতে নিযুক্ত কটন্ সাহেব যখন সভাপতি ছিলেন, তখন কৌন্সিলে অনেক কোলাহল ও বাদ-বিসম্বাদ হইয়াছিল, কিন্তু কটন সাহেব কখনও আইনের বিশেষ ধারা খুঁজিয়া কোন সদস্যকে লাঞ্ছিত করিতে চেষ্টা করেন নাই অথবা নিজের প্রভুতা দেখাইবার প্রয়াস পান নাই; কিন্তু নির্ব্বাচিত সভাপতির আমলে যাহা আগে হয় নাই, তাহা ঘটিল। যথাসময়ে বিজ্ঞাপন না দিয়া কেহ কৌন্সিলে কোন নূতন প্রস্তাব অথবা বিজ্ঞাপিত প্রস্তাবের পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন না, ইহাই হইল সাধারণ আইন। শ্রীযুক্ত স্যর আবদুর রহিম এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যখন একটি প্রস্তাবের পরিবর্ত্তন-মূলক নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন সদস্যেরা উক্ত আইন ধরিয়া ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারেনা বলিয়া আপত্তি করেন। সভাপতি প্রথমে নিজেই বলিয়াছিলেন যে সদস্যদের যখন আপত্তি আছে তখন তিনি আইনের একটি বিশেষ ধারা অনুসারে ক্ষমতা চালাইয়া নূতন প্রস্তাবটি বিচারিত হইতে দিবেন না; কিন্তু তাহার পরেই স্যর আবদুর রহিমের মোহমন্ত্রে ভুলিয়া মত পরিবর্ত্তন করেন; এইরূপই সংবাদপত্রের রিপোর্টে জানা যায়। Forward পত্রের মুদ্রিত বিবরণে জানিতে পাই যে যখন সভাপতি নিজের প্রভুতার জোরে নূতন প্রস্তাবটি বিচারিত হইতে দিলেন, তখন অর্দ্ধ উচ্চারিত স্বরে শ্রীযুক্ত নুরুল হক্ চৌধুরী উহাকে গায়ের জোরের ব্যবস্থা বলিয়াছিলেন। সভাপতি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চৌধুরী মহাশয়কে তাঁহার উক্তিটিকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতে বার বার অনুরোধ করায় চৌধুরী মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন। ইহাতে মনে হয়, সভাপতি

অযথা ঝগড়া তুলিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যাহা খোঁচাইয়া না তুলিলে চলিত, তাহার প্রতি ঝোঁক দেওয়া সভাপতির পক্ষে বিজ্ঞতার কাজ হয় নাই। উক্ত সংবাদ পত্রের রিপোর্টে ইহাও পাই যে সভাপতি যখন চৌধুরী মহাশয়কে তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করিবার জন্য আদেশ করেন, তখন ক্রোধে তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল ও কণ্ঠের স্বর বিকৃত ও তীব্র হইয়াছিল। চৌধুরীজী তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করিলেন না আর সভাপতি তাঁহাকে একদিনের জন্য সভা হইতে বরখাস্ত করিলেন। এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া চারি পাঁচজন গণ্যমান্য সদস্য সভাপতির ব্যবহারকে অসঙ্গত ও বালকোচিত ব্যবহার বলেন। এ অপরাধে আবার ঐ সদস্যদিগকেও একদিনের জন্য বরখাস্ত করা হয়। ইহার ফলে নির্ব্বাচিত সভ্যদের অধিকাংশ লোক দলে দলে সভাগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যান।

স্যর আবদুর রহিমের বিরোধীরা সভার কাজ হইতে অপসৃত হওয়ায় রহিম সাহেবের প্রস্তাব সমর্থিত হইবার সুবিধা হইয়াছিল। ঐ প্রস্তাবের ফল যাহাই হউক, সভাপতির পক্ষে কাউন্সিলের গৌরব রক্ষার জন্য বহু সদস্যকে বরখাস্ত করা সুবিবেচিত পদ্ধতি কি না, তাহা সভাপতি ভাবিয়া দেখিবেন। পদের গৌরব রক্ষিত হয় আত্ম-সংযমে, প্রভুতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নয়। সভাপতিকে পদচ্যুত করিবার জন্য স্বরাজ্য দলের সদস্যেরা যে প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন, কাউন্সিলে তাহা পাস হইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু সদস্যদের মধ্যে ৫৭ জন যে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে সভাপতি আপনার গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। সভাপতির ইহাও মনে করা উচিত যে যাঁহারা তাঁহার পদচ্যুতির বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন, তাঁহারা কোনপ্রকারে কাউন্সিলের গৌরবরক্ষার জন্যই তাহা করিয়াছিলেন,—সম্পূর্ণরূপে সভাপতির পদ্ধতিকে সমর্থন করিবার জন্য হয়ত করেন নাই।

* * * *

গভর্ণর বাহাদুরের ছুটি—শ্রীযুক্ত লর্ড লিটন বাহাদুর আগামী ১০ই জুন হইতে ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সময়ের জন্য ছুটি লইয়া বিলাত যাইবেন ও তাঁহার এই অবসর সময়ে শ্রীযুক্ত স্যার হিউ ষ্টিফেন্সন্ গবর্ণরের কাজ করিবেন। বঙ্গশাসনের ব্যবস্থায় যে সকল কাজ করিবার আছে, তাহা এপ্রিলের মধ্যেই সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে; কাজেই অস্থায়ী গভর্ণরকে বিশেষ কোন নূতন কাজে হাত দিতে হইবে না।

সংযোজন

"ভাগীরথী তীরে ফরাসী কোম্পানীর উপনিবেশ স্থাপন।" প্রবন্ধের ৫৯ পৃষ্ঠায় আছে—

শেভালিয়ে প্রথমে স্থানটিকে মাটির প্রাচীর বেষ্টিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হয় নাই।

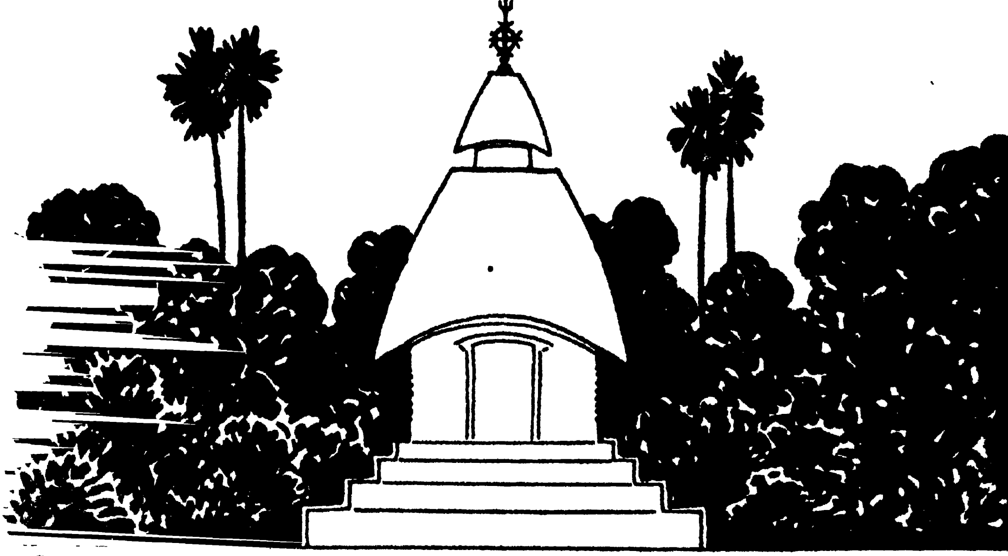
ইহার পর বসিবে,—

ডুপ্লের পর শেভালিয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গভর্ণর ছিলেন। চন্দননগর পতনের পর, একমাত্র তিনিই ইহার প্রণষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য আর একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি ফ্রান্সে মিনিষ্টারের নিকট কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ অবরোধ দ্বারা বাঙ্গলা আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।*

* Le Nabab Rene Madec.

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.

বঙ্গবাণী



—৭৭নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড



বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৫ম বর্ষ
১৩৩২-'৩৩

চৈত্র

প্রথমার্দ্ধ
২য় সংখ্যা

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এখনও বহু পরিমাণে মাতা বসুন্ধরার গর্ভে। বেহার ও উত্তর পশ্চিমে, পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ যতটা যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন বাঙ্গলায় তাহা করেন নাই। বাঙ্গলা নদী-বহুল প্রদেশ, খুঁড়িবার স্থান খুব বেশী নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহাও প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের উপযুক্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমারের চেষ্টায় ও অর্থে পাহাড়পুরে খননকার্য্য চলিতেছিল, নানা গোলযোগে তাহা শেষ হয় নাই। সেখানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি পড়িয়াছে, আর পড়িয়াছে বিক্রমপুর রামপালে। দুই স্থানই খননের যোগ্য কিন্তু পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের দাবি বোধ হয় সকলের আগে। বাঙ্গলায় যে সকল প্রসিদ্ধ রাজধানীর নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়, পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান লইয়া বহুদিন মতভেদ চলিতেছিল। এখন আর সে মতভেদ দেখা যায় না। বগুড়ার ৭।৮ মাইল উত্তরস্থিত প্রাচীন মহাস্থান গড়ই যে সেকালকার পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে। মালদহ জেলাভুক্ত পাণ্ডুয়ার পূর্ব্বনাম পাণ্ডুনগর, ইহার দাবি অগ্রাহ্য হইয়াছে। পাবনা ও রংপুরের দাবি আরও দুর্ব্বল। কানিংহাম সাহেব

পাবনার পক্ষে মত দিয়া পরে নিজেই সে মত প্রত্যাহার করিয়াছেন।* রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মালদহ জেলার 'পাঁড়োয়ার' পক্ষে যে যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছেন।†

গত অগ্রহায়ণ মাসে আমি এই মহাস্থানগড় দেখিতে যাই। সময় অল্প ছিল, কিন্তু যাহা দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে। মহাস্থান গড় এখনও সমতল হইতে অনেকটা উচ্চ একটী আয়তভূমি, কোন কোন কোণে উচ্চতা ৪০।৫০ ফিট, পরিধি প্রায় ৩ মাইল। উপরে উঠিবার জন্য দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে সিঁড়ি, তাহাতে প্রায় ৩০।৩৫ টী ধাপ। স্থানটী ভগবৎসৃষ্ট টিলা নহে, সাবেক রাজারা মাটী তুলিয়া এই প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মাণ করতঃ তাহার উপর কেল্লা ও বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বদিকে সেকালে ছিল প্রকাণ্ড করতোয়া নদী, এখনও তাহার দেহাবশেষ লুপ্ত হয় নাই—আর তিনদিকে ছিল প্রকাণ্ড জলাশয় ও তৎসংলগ্ন পরিখা। এই জলাশয়ের একটীর নাম 'কালীদহ', একটীর নাম "বারাণসী সাগর"। এই সকল স্থানের মাটিই যে মহাস্থানকে উচ্চ মালভূমিতে পরিণত করিয়াছে তাহা দেখিলেই অনুমান করা যায়। রাজধানী বা নগর গড়টীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। গড়ের বাহিরে স্থানে স্থানে যেমন উচ্চ স্তূপ ও প্রাচীন ইষ্টকাদি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে সহজেই মনে হয় অনেক নাগরিকের বাসস্থান ছিল নিম্নস্থ সমতল ভূমির উপর। পরবর্ত্তী কালে "ভীমের জাঙ্গাল" নামে একটী প্রাকার বা রাস্তা নগরের বহির্ভাগে অনেকটা রক্ষাকার্য্যের সহায়তা করিত।

পশ্চিমদিকে ৪।৫ মাইল দূরে বিহার ও ভাসুবিহার গ্রাম। এতটা পর্য্যন্ত যাওয়ার আমার সুযোগ ঘটে নাই। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন এই ভাসুবিহার নামই পরিব্রাজক ইউয়ানচোয়াং এর পো- সি—পো বা বাস্পো। গড়ের উত্তরপূর্ব্বদিকে করতোয়াতীরে "দ্বীপের কাণি" নামে একটী স্তূপ—একরূপ স্থির হইয়াছে যে সুপ্রাচীন গোবিন্দদেবের মন্দির এইখানে ছিল। দক্ষিণপশ্চিম দিকে খানিকটা দূরে বর্ত্তমান গোকুল গ্রামে তিনটী স্তূপ—মধ্যমটীর বর্ত্তমান নাম নেতা ধোপানীর ধাপ আর বড়টীর নাম বালা লখিন্দরের মেড়। দক্ষিণপূর্ব্বদিকে প্রায় দুই মাইল দূরে বালোপাড়া গ্রামে একটী স্তূপ প্রাচীন স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয়ের মন্দিরের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহার উপরিভাগে এখন বাঁশবনেরই প্রাধান্য। গড় হইতে পশ্চিম দিকে বিহার যাওয়ার রাস্তা এখনও বর্ত্তমান, দুইদিকে সুবিস্তীর্ণ জলাশয়।

ইউয়ান চোয়াং এর বর্ণনা হইতে বেশ বোঝা যায় তাঁহার সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বৌদ্ধপ্রধান স্থান ছিল। মহাস্থান গড়ের উপর এখন স্থানে স্থানে কৃষিকার্য্য চলিতেছে, আর স্থানে স্থানে

* Archaeological Survey of India, vol xv

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড ১১৯ পৃঃ

প্রাচীন ইষ্টক-স্তূপ অতীতের গৌরব-চিহ্নস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। বাঙ্গালী তাঁহার গৌরব-ভূমির কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া রাখে নাই, বৈদেশিকদিগের বিবরণ হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া একটু আধটু যাহা বাহির করা যায় তাহাই এখন পর্য্যন্ত প্রধানতঃ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাস। স্থানীয় কিংবদন্তী নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিকে চাঁদসদাগর ও মনসাদেবীর স্মৃতির সহিত জড়াইয়া রাখিয়াছে। 'বালা লখিন্দরের' মেড় ও 'নেতা ধোপানীর' ধাপের বিষয় বলিয়াছি। কালীদহের মধ্যস্থলে সলিল-বেষ্টিত ভূখণ্ডে পদ্মার মন্দির। গোকুলের প্রান্তে ওঝা ধন্বন্তরির বাড়ীর স্মৃতি বর্ত্তমান; আবার উজানী নামে একটী গ্রাম এখান হইতে ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী। বগুড়ার প্রায় ১২ মাইল উত্তরবর্ত্তী চাঁদমুরা গ্রাম প্রাচীন চম্পাাই নগরের ধ্বংসাবশেষ বহন করিতেছে বলিয়া প্রবাদ। চাঁদসদাগরের ও বেহুলার বাড়ী ঘর বাঙ্গলার এত জায়গায় লোকে দেখায় যে তাহা হইতে সত্যের উদ্ধার ঐতিহাসিকের পক্ষে অসম্ভব কিন্তু এখানে যেন ষোলকলা পূর্ণ।

মহাস্থান হইতে সময় সময় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দেবমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত যখন বগুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট তখন সেখানকার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার এক জায়গা খুঁড়িয়া বৌদ্ধমূর্ত্তি বাহির করিয়াছিলেন আর বাহির করিয়াছিলেন এক প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বারের কতকাংশ, লোকে ইহাকে খোদার পাথর বলে।

বৌদ্ধযুগে একটী বিখ্যাত, সমৃদ্ধ সহর হইলেও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের গৌরব কেবল বৌদ্ধদিগের কৃপায় নহে। পুণ্ড্রদেশ বহু পূর্ব্বকাল হইতেই একটী বিখ্যাত রাজ্য। মহাভারতের মতে ইহা বলিরাজার পুত্র পুণ্ড্রের নামে প্রসিদ্ধ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে পুণ্ড্রজাতি বিশ্বামিত্রের শাপজ অন্ত্যজ জাতির মধ্যে গণ্য কিন্তু তাঁহারই সন্তান; এটী যে কোন পুণ্ড্রজাতি তাহা নির্ণয় করা কিন্তু সহজ নহে। রামায়ণে দেখিতে পাই সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের জন্য পূর্ব্বদিকে বিনত নামক বানরকে প্রেরণ করিবার সময় পুণ্ড্রদেশের নামোল্লেখ করিতেছেন। মহাভারতে নানা স্থানে নানা ভাবে পুণ্ড্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। শান্তিপর্ব্বে পৌণ্ড্রদিগকে দস্যুজীবী বলা হইয়াছে। অনুশাসনপর্ব্বে ও মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রেরা বৃষলত্ব-প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় কিন্তু এই সকল পৌণ্ড্রদিগের সহিত অন্য যে সকল জাতির উল্লেখ আছে তাহাতে উত্তর বা পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথাটা বলা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সভাপর্ব্বে ভীমসেনের পূর্ব্বদেশে দিগ্বিজয় উপলক্ষে পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছের রাজা মনৌজার পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে। আরও স্থানে স্থানে পৌণ্ড্রিক, সুপুণ্ড্রক প্রভৃতি জাতি সমূহের উল্লেখ আছে। আমাদের মনে হয় কৌশিকীকচ্ছের মনৌজা রাজার সহিত যে পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবের উল্লেখ আছে তিনিই সেকালে উত্তরবঙ্গ বা তাহার বেশীর ভাগ শাসন করিতেন। সভাপর্ব্বে জরাসন্ধবধের প্রস্তাবকালে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে জানা যায়, এই বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতদেশের বলশালী রাজা

চেদিদেশে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, নিজেকে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং মোহবশতঃ সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিহ্ন ধারণ করিতেন।* প্রাচীন করতোয়া এক সময়ে কামরূপ ও পুণ্ড্রভূমির সীমা ছিল। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের রাজ্য করতোয়ার পূর্ব্ব দিকেও বিস্তৃত ছিল কি পুণ্ড্রদেশের উত্তরস্থ কোন স্থানের লোককে কিরাত বলা হইয়াছে তাহা স্থির করা কঠিন। এক সময়ে পশ্চিম বঙ্গের কতকাংশও পুণ্ড্রভূমি ছিল। নানা স্থানে পুণ্ড্রনামধারী জাতির উল্লেখ থাকিলেও উত্তরবঙ্গস্থ (এবং সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গস্থ) পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রজাতির কর্ত্তা ছিলেন এই বাসুদেব। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে ও ইঁহার উল্লেখ আছে। ইঁহার রাজধানী কোথায় ছিল তাহা জানা যায় না, তবে উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বিখ্যাত রাজধানীরও পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

সুপ্রাচীন জৈনগ্রন্থ কল্পসূত্রে স্থানে স্থানে "পুণ্ডরীয়" শব্দের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ জৈন সাধু ভদ্রবাহুর রচিত বলিয়া পরিচিত। তাঁহার সময় খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী অনুমিত হইয়াছে।† প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ দিব্যাবদানে দুইস্থানে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোক এখানকার উলঙ্গ সাধুদিগের ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া নাকি তাহাদিগকে নির্ম্মূল করার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

"দৃষ্ট্বা চ রাজ্ঞা রুষিতেনাভিহিতম্ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে
সর্ব্বে আজীবিকাঃ প্রঘাতয়িব্যাঃ"।

আজীবিকদিগের উপর যে রকম রোষের উল্লেখ আছে তাহাতে বোঝা যায় সে সময়ে এই সাধুদিগের এখানে একটী বড় রকমের আড্ডা ছিল। তাহারা কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ-রাজার ক্রোধে মরিয়াও মরে নাই। ইউয়ানচোয়াং যখন খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে এখানে আসেন, তখন তাহারা প্রচুর পরিমাণে জীবিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। পুণ্ড্ররাজ্য তখন বড় না হইলেও রাজধানী খুব সমৃদ্ধ। ইউয়ান চোয়াংএর বিবরণ হইতেই মহাস্থানের সহিত পুণ্ড্র-বর্দ্ধনের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি রাজ্যের পরিধি ৪০০০লি. রাজধানীর পরিধি ৩০লির বেশী দেখিয়া গিয়াছিলেন। রাজ্য পুষ্পোদ্যান-তড়াগাদি-শোভিত, শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ, জনপূর্ণ ছিল। কাঁঠাল অপর্য্যাপ্ত জন্মিত (এ জিনিষটা এখনও এ অঞ্চলে প্রচুর)। ২০টী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও তাহাতে ৩০০০এর উপর বৌদ্ধ ভ্রাতা মহাযান ও হীনযান মত অনুসরণ করিতেন, দেবমন্দিরের সংখ্যা ছিল একশত। বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোক পাশাপাশি বাস করিত; আর দিগম্বর নির্গ্রন্থের সংখ্যা ছিল খুব বেশী। রাজধানীর ২০লি পশ্চিমে তিনি প্রকাণ্ড বৌদ্ধ বিহার দেখিয়া গিয়াছিলেন, সেখানে সাত শত মহাযানসম্প্রদায়ভুক্ত

* মহাভারত সভাপর্ব্ব ১৪।১৮—২০

† Vide Cambridge History of India P 154.

বৌদ্ধভ্রাতা এবং পূর্ব্বভারতের বিখ্যাত ভিক্ষু বাস করিতেন। ইহার নিকট একটী অশোক স্তূপ ছিল, আর ছিল একটী অবলোকিতেশ্বরের মন্দির। কানিংহাম বর্ত্তমান বিহার গ্রামের প্রকাণ্ড স্তূপকে ঐ বৌদ্ধ বিহারের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উচ্চ স্তূপের পরিমাণ ৭০০×৬০০ ফিট কিন্তু যাহা কিছু পরীক্ষা করিবার তাহা মাটীর নীচে। ভাসুবিহারের ইষ্টকস্তূপ তাঁহার মতে ঐ প্রাচীন অশোকস্তূপ। ইহার উত্তরস্থ ভগ্ন মন্দিরকে তিনি প্রাচীন অবলোকিতেশ্বরের মন্দির মনে করেন। কাহারও কাহারও মতে গোকুল গ্রামের বালা লখিন্দরের মেড়ই অশোকস্তূপ। এই সকল স্থান যে অচিরে খুঁড়িয়া ফেলা উচিত তাহাতে দ্বিমত থাকিতে পাবে না। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কোদালির বিলম্ব অমার্জ্জনীয়।

ইউয়ানচোয়াং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের এত কথা লিখিয়া গিয়াছেন কিন্তু রাজার নাম লেখেন নাই। বোধহয় তখন এ অঞ্চল তখনকার প্রবল সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের পদানত ছিল এবং তাঁহারই অনুগত কাহারও দ্বারা শাসিত হইত। উত্তরবঙ্গ যে বহুকাল গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। বোধহয় ইহা সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে গুপ্তাধিকারে আসে। ৪৩২—৩৩ খৃষ্টাব্দে কোটিবর্ষ বিষয়ে ভূমিদানের সময় সম্রাট্ কুমার গুপ্তের নাম পাওয়া যায়। আবার কিছুদিন পূর্ব্বে দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর গ্রামে যে কয়েকখানি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয় তাহা হইতে দীর্ঘকাল গুপ্তাধিকারের পরিচয় পাই। ইহাতে ১২৪ গুপ্তাব্দ হইতে ২১৪ গুপ্তাব্দ (৪৪৩—৫৩৩ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ৯০ বৎসরের ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। এসময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের অধীন ছিল। ভুক্তির শাসনকর্ত্তারূপে ক্রমে উপরিক চিরাতদত্ত, উপরিক মহারাজ ব্রহ্মদত্ত, উপরিক মহারাজ জয়দত্ত ও উপরিক মহারাজ রাজপুত্রদেব-ভট্টারকের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইউয়ানচেয়াংএর সময়েও সম্ভবতঃ এইরূপ কোন উপরিক মহাস্থানে থাকিয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি শাসন করিতেন।

ইউয়ানচেয়াংএর প্রায় এক শতাব্দী পরে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ছদ্মবেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিত হন। তখনও এখানে সমৃদ্ধিযুক্ত রাজধানী। রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনায় কার্ত্তিকেয় মন্দিরের নর্ত্তকী কমলার ঐশ্বর্য্য মৃচ্ছকটিক নাটকের বসন্তসেনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কথিত আছে জয়াপীড় রাত্রিতে এক আঘাতে এক সিংহ বধ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্তের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং রাজপুত্রী কল্যাণীর পাণিগ্রহণ করতঃ শ্বশুরকে নিজের বাহুবলে পঞ্চগৌড়েশ্বর করিয়া দেন। ফিরিবার সময়ে অসময়ের বন্ধু কমলাকেও রাণী করিয়া লইয়া যান। রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনায় স্থানে স্থানে অস্বাভাবিকতার আবরণ থাকিলেও মোটের উপর জয়াপীড়ের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমনের বিবরণ সত্যমূলক বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ জয়ন্তকে রাজা আদিশূর প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই চেষ্টার মধ্যে প্রমাণ অপেক্ষা কল্পনাই বেশী। পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ যে কোথায় আসিয়া-

ছিলেন তাহা এখনও সন্তোষজনকরূপে নির্ণীত হয় নাই। কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সময় ৭৭৯—৮১৩ খৃষ্টাব্দ বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রায় এই সময়েই উত্তর বঙ্গে পালবংশের আবির্ভাব। তাঁহাদের শাসন সময়ে কোন কালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানী ছিল কিনা তাহা এখনও গবেষণার বিষয়। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন লিখিত রংপুর সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বগুড়ার ইতিহাসের মতে পালরাজ কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকৃত হইলে এখানে ভোজগৌড়বংশীয় রাজারা সামন্তরূপে কর্ত্তৃত্ব করেন এবং পরশুরাম সেই বংশেরই শেষ রাজা। কিন্তু এমতও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে এক নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাচীন পুষ্করিণী খননকালে একটী শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। তাহাতে এক নন্দি-বংশের বিষয় লিখিত আছে কিন্তু ইহা কোন্ নন্দিবংশ এবং কিরূপে মহাস্থানের সহিত সংসৃষ্ট, 'রামচরিত' প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধযুক্ত কিনা তাহা এখনও স্থির হয় নাই। শিলালিপিটী খৃঃ নবম দশম শতকের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

স্থানীয় কিংবদন্তী বলে নল নীল এই গড়ের নির্ম্মাণকর্ত্তা, তারপরে রাজা ছিল থান সিং মান সিং, তারপরে বলরাম সিং, তারপরে পরশুরাম, পরশুরামের সময় শাহ সুলতান বল্হকী নামক মুসলমান দরবেশ এখানে আসেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধেই পরশুরামের পতন এবং সেই সময় হইতেই এখানে মুসলমানের অধিকার। শাহ সুলতানের দরগা এখন গড়ের উপর দক্ষিণপূর্ব্বদিকে বিরাজ করিতেছে। গড়ের পূর্ব্বদিকে শিলাদেবীর ঘাট। এখানে করতোয়া স্নানের সময় বহুলোকের সমাগম হয়। নিকটবর্ত্তী অধিবাসীরা এখন মুসলমান কৃষক। তাহাদিগের মতে শিলাদেবী পরশুরামের ভগিনী ছিলেন, কোন কোন মতে তিনি পরশুরামের কন্যা। তাঁহার সতীত্বের তেজ নাকি এত বড় ছিল যে শাহ সুলতানের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য দরবেশকে কঙ্কণের আঘাত করিলে দরবেশের মাথাটা ছিঁড়িয়া একেবারে মক্কায় গিয়া পড়ে, মহাস্থান গড়ে কেবল ধড়্টা পুতিয়া রাখা হইয়াছে। আর পরশুরামের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছিল? এক মুসলমান কৃষক বলিল তিনি যুদ্ধে মারা যান, আর এক মুসলমান কৃষক তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিল তাহাও কি হইতে পারে? তিনি যে ছিলেন দেবতা, দেবতা কি মরে? কোথাও লুকাইয়া গেলেন। ইহাদের মতে, দরবেশের মাথাটা ছিঁড়িয়া গেলে শিলাদেবীর যে আত্মগ্লানি হয় তাহাতেই তিনি করতোয়াতে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তখন হইতে তিনিও আত্মগোপন করিয়া আছেন। এই সকল গল্পের অসারতা যাহাই থাকুক ইহার মধ্যে একত্র বাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের কুসংস্কার ও ধর্ম্মভাব যে কতটা আয়ত্ত করিয়া নিয়াছে তাহার একটী জ্বলন্ত চিত্র পাওয়া যায়। কেহ২ মনে করেন স্থানটীর নাম শীলদ্বীপ বা শীলাদ্বীপ ছিল, তাহা হইতেই

শীলাদেবীর ঘাট নাম হইয়াছে, কোন রাজকন্যার নামে নহে। শাহ সুলতান সাহেবের যে দরগার কথা বলা হইল উহার দরজায় হিন্দু আমলের যে পাথরখানি আছে, তাহাতে দুই দিকেই প্রাচীন অক্ষরে "শ্রীনরসিংহ দাসস্য" লেখা। হিন্দুর মালমসলার যে বিজয়ী মুসলমান কিরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন ইহা তাহারই প্রমাণ। দরগার বাহিরে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড গৌরীপাট (লিঙ্গব্যতীত) পড়িয়া আছে। আরও কিছু দূরে পশ্চিমদিকে এক সাবেক আমলের দরজা এখনও বর্ত্তমান। সমস্তটী দেখিয়া মনে হয় কোনও হিন্দুমন্দিরকে দরগায় পরিণত করা হইয়াছে। গড়ের উপর স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে পরশুরামের বাড়ী ভগ্নাবস্থায় আছে। নিকটেই জিয়ৎকুণ্ড; এই কূপের জলে নাকি মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠিত, মুসলমানেরা কৌশল করিয়া গোমাংস নিক্ষেপ করায় কূপের সে শক্তি নষ্ট হয়। এ গল্পটী যে কত স্থানের কত জিয়ৎকুণ্ডের সম্বন্ধে করা হয় তাহার অন্ত নাই। নরসিংহ দাসের বাসস্থানের কোনও প্রবাদ পাইলাম না। মন্দিরের দ্বারে নাম লেখা থাকিলেই যে তাহা রাজার নাম হইবে এমন কোন কথা নাই। কোন ধনী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নিজের নাম লেখাইতে পারেন অথবা শিল্পীও নিজের নাম লিখিয়া রাখিতে পারে। বগুড়ার ইতিহাসে শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে নরসিংহ পরশুরামের নামান্তর মাত্র। এ মতের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। প্রভাস বাবু নিজেই মতটা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এখন মনে করেন পরশুরাম আর কেহ নহেন, বরেন্দ্র ভূমের বিখ্যাত রাজা রামপাল এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনই রামচরিতে উক্ত "জলকভূ", নিকটে যে ভীমের জাঙ্গাল আছে তাহা কৈবর্ত্তরাজ ভীমের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন সুরক্ষিত করার চেষ্টা। তাহা হইলে শাহ সুলতানের হস্তে পরশুরামের পরাজয়ের বৃত্তান্ত একেবারে ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ডে পূর্ব্বেই এই মত প্রচার করিয়াছেন এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের নানা প্রাচীন কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া অদূরে রামপাল-স্থাপিত রামাবতী নগরীর ধ্বংসাবশেষ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মহাস্থানগড়ের পশ্চিমদিকে যে বিহারগ্রাম আছে তাহা জগদ্দল বিহারের স্মৃতি-জ্ঞাপক। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "রামাবতীর" এই স্থানে অবস্থান স্বীকার করেন না, কিন্তু না করারও উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করেন নাই।* আমরা প্রভাস বাবুর বগুড়ার ইতিহাসের প্রস্তাবিত অভিনব সংস্করণে তাঁহার সংগৃহীত প্রমাণ ও মতামত দেখিবার অপেক্ষায় রহিলাম। বালা লখিন্দরের মেড়ের নিকট রামসহর নামে একটী গ্রাম আছে।

শাহ সুলতানের দুর্গের নিকট সম্রাট্ ফেরোকসেরের আমলের একটী মস্‌জিদ্ আছে, ইহার উপর পার্শি অক্ষরে লিপি, নিকটে একটী আধুনিক মোক্তাব।

* বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম ভাগ।

খোদার পাথরের অদূরে একটী স্তূপ ও তাহার নিকট একটী শুষ্ক জলাশয় বর্ত্তমান। এখানে পূর্ব্বে কোন মন্দির ছিল বলিয়া মনে হয়। কানিংহাম সাহেব এখানে অনেক খোদিত ইষ্টক, দেবমূর্ত্তি, গোলাকার পদ্ম, উপবিষ্ট সিংহের মূর্ত্তি প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। গড়ের পশ্চিমদিকে খানিকটা ইষ্টকে গাঁথা উচ্চস্থান পরশুরামের সভাবাটী বলিয়া পরিচিত।

পুরাণে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন স্কন্দ ও গোবিন্দের মন্দিরের মধ্যে (স্কন্দগোবিন্দয়োর্ম্মধ্যে) বলিয়া কথিত আছে। গড়ের উত্তরপূর্ব্বদিকে দ্বীপের কাণি বলিয়া যে একটী উচ্চ ঢিপি আছে সেই স্থানেই গোবিন্দের মন্দির ছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত বগুড়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট থাকার সময়ে এই স্থান পরীক্ষিত ও খনিত হইয়াছিল। তাহাতে ঘাটের ও মন্দিরের চিহ্ন বাহির হইয়া পড়ে। গুপ্ত সাহেব মনে করেন এখানে প্রথমে বৌদ্ধমন্দির ছিল, পরে তাহা হিন্দুমন্দিরে পরিণত হয়, পরে মুসলমানেরা গড়ে অধিষ্ঠিত হইলে এই হিন্দুমন্দিরের মালমসলা আবার তাঁহাদের ব্যবহারে আসে। তিনি তাঁহার ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে আরও লিখিয়াছেন যে শাহ সুলতানের দরগার উত্তরদিকে রাস্তার নিকটে যে একটী অর্দ্ধভগ্ন মনুষ্যমূর্ত্তি ও তাহার মাথার উপর একটী পা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অর্থ হিন্দু কর্ত্তৃক বৌদ্ধের পরাভব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কার্ত্তিকেয়ের মন্দির (যেখানে কাশ্মীর রাজ জয়াপীড় কমলার নৃত্য দেখিয়াছিলেন) মহাস্থানগড়ের প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বদক্ষিণ বালোপাড়া গ্রামে ছিল। ভগ্নমন্দিরের স্তূপ এখনও প্রবাদের বিষয়ীভূত হইয়া আছে। স্থানীয় একটী মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল, কন্দ গোবিন্দের ধাপ। পুণ্ড্রদেশে যে পাটলতীর্থ ও মন্দার মহাদেব ছিলেন তাহা কোথায় জানি না।

একসময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে বিলক্ষণ বিদ্যা-চর্চ্চা হইত তাহা নিশ্চয়। ইউয়ান চোয়াং তাহার সাক্ষী, রামচরিত তাহার আলামত আর সুদূর রাষ্ট্রকূট রাজ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন-পণ্ডিত কেশব দীক্ষিতকে ভূমিদান তাহার অকাট্য প্রমাণ।

মহাস্থানে গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের ও মুসলমান রাজাদের মুদ্রা বাহির হইয়াছে কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। এক জায়গার মুদ্রা অনেক জায়গায়ই চলিয়া যায়—আদত আবশ্যক কোদালি।

রাজধানীর নাম হইতে দেশটীর নামই পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি হইয়া দাঁড়ায়। গুপ্তসম্রাট্‌গণের সময় হইতে বঙ্গাধিপ কেশব সেনের সময় পর্য্যন্ত অনেক তাম্রশাসনেই আমরা এই ভুক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গকেও এই ভুক্তির অন্তর্গত ধরা হইত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

আবার ভ্রাম্যমাণ

আজমীঢ়। পাহাড়ের আবেষ্টনী সহরটিকে বড় রমণীয় ক'রেছে। রাজপুতানায় এমন সুন্দর সহর অতি বিরল– বোধ হয় নেই বল্‌লেও হয়। ভোর বেলা যখন আজমীঢ়ে পৌঁছুলাম তখন অদূরে পাহাড়ের হাতছানির মধ্যে টঙ্গা ক'রে বেড়াতে ভারি ভাল লাগ্‌ছিল।

এখানে এক পীরের কবর আছে সেখানে নাকি খুব উৎসব হয় প্রতি বৎসরে। সকলে বল্‌ল দেখা উচিত। কিন্তু সে পীরের কবর দেখার মধ্যে যে কি চিত্তাকর্ষী আবেদন থাকতে পারে তা ভেবে না পেয়ে গেলাম না। সহরে অনুরূপ নীরস অবশ্য-দ্রষ্টব্য স্থান আরও দু-একটি আছে যেগুলি দেখ্‌তে যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি। কারণ সৌভাগ্যবশতঃ হাতে সময় কম ছিল।

একটি প্রকাণ্ড হ্রদ আছে যার ধারে নাকি সাজাহান একসময়ে বস্‌তেন। হ্রদতীরে শ্বেত মর্ম্মরের একটি বেদী আছে, মোগল স্থাপত্যের ঢঙে রচিত। বড় সুন্দর স্থান। নাম দৌলতবাগ—না অমনি একটা কি। বাগানটির মধ্যে হ্রদ ও হ্রদের অপর পারে পাহাড়। সূর্য্যাস্তের সময় পাহাড়টির শীর্ষে ক্লান্ত সূর্য্যদেবের নানাবর্ণের স্বর্ণরক্ত গোলাপী আভা প্রায়ই এক মনোমদ বর্ণের জাল বুনে দেয়। পাদমূলে হ্রদ ও হ্রদে বিস্তর হংসবলাকা। ভারি ভাল লাগ্‌ল। ঐতিহাসিক স্থান ব'লে নয়, রমণীয় স্থান ব'লে। A thing of beauty is a joy for ever.

আজমীঢ়ে এলে পুষ্করতীর্থে যাওয়া হচ্ছে প্রতি পর্য্যটকের একান্ত কর্ত্তব্য। শুন্‌লাম রাস্তাটি নাকি ভারি সুন্দর। একটা টঙ্গা ক'রে যাত্রা করলাম। সাতমাইল পথ। পথটি শেষের দিকে একটি পাহাড়কে অতিক্রম ক'রে নেমে গিয়ে পুষ্করে মিলেছে। শেষের দিক্‌টির শোভা অপরূপ। পার্ব্বত্য শোভা অবশ্য, কিন্তু পার্ব্বত্য পথ রেল মোটরে যাওয়ায় একরকম তৃপ্তি মেলে ও টঙ্গা ক'রে যাওয়ায় অন্য একরকম তৃপ্তি মেলে। টঙ্গা যায় আস্তে আস্তে। মাঝে মাঝে নেমে পদব্রজে যাওয়া– ভারি উপভোগ্য। পার্ব্বত্য বালুময় পথ। পায়ে লাগে না—এমন কি খালি পায়ে হাঁটলে আরামই বোধ হয়। তাছাড়া নগ্নপদে ধীর মন্থরগতিতে চল্‌তে চল্‌তে দুধারে পাহাড়ের রুক্ষ সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে মনে হচ্ছিল যে এ রকম ভাবে পদব্রজে যাওয়ার মধ্যে এমন একটা নিকট-উপভোগের সুখ আছে যেটা রেল-মোটরে ভ্রমণে তেমনভাবে পাওয়া যায় না।

পুষ্কর তীর্থটির মধ্যে সবুজ রঙের হ্রদটি বেশ লাগ্‌ল। বিশেষতঃ হ্রদটির অপর পাশে পাহাড় বিরাজ করার জন্যে। হ্রদটির জল কিন্তু বড় মলিন—অগণ্য তীর্থযাত্রীর স্নান করার

জন্যই বোধ হয়। তীর্থটিতে মাছিরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। কারণ বোধ হয় এই যে এরূপ নোংরা তীর্থ জগতে দুর্লভ। পুণ্য স্থানগুলির পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শুচিতাপ্রিয় হিন্দু এত উদাসীন কেন ঠাহর করা যায় না।

আজমীঢ়ে রাজন্যবর্গের একটি কলেজ আছে। ইংরাজরাজ যে কত যত্নে আমাদের নাবালক রাজন্যদের শিক্ষা দেন সেটা স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যায় না। কিরকম ক'রে সাহেবদের ডিনার দিতে হয়; কিরকম ক'রে মধুর হেসে সভ্যা মানবীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হয়; কি রকম ক'রে ইংরাজ রাজপুরুষদের সম্মান প্রদর্শন করতে হয়; কি রকম ক'রে পোলো খেলে বীরত্বগৌরবের শিখরে অধিরূঢ় হ'তে হয়, ইত্যাদি অত্যাবশ্যক শিক্ষা ইংরাজরাজ আমাদের 'নেটিভ চীফ' ও সরদার-সম্প্রদায়ের পুত্র ও উত্তরাধিকারিগণকে অতি রোমাঞ্চকর অধ্যবসায়ের সঙ্গে দিয়ে থাকেন। এজন্য তাঁরা ইন্দোর, লক্ষ্ণৌ, আজমীঢ় প্রভৃতি সহরে চার পাঁচটি কেন্দ্র স্থাপন করেছেন ও এসব কেন্দ্রে ভারতবর্ষের ভবিষ্য মুখোজ্জ্বলকারী রাজন্যকুলতিলকগণ ইতিমধ্যে আশাতীত সাফল্য দর্শিয়েছেন। স্বচক্ষে না দেখ্‌লে বোঝা যায় না যে ইংরাজরাজ এসব বিষয়ে কতটা যত্নশীল, অধ্যবসায়ী ও উদ্ভাবনী শক্তিতে ওতপ্রোত। এক একটি রাজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ প্রাসাদ বাগান প্রভৃতি নির্ম্মাণার্থে তাঁরা রাজন্যদের অর্থের অতি চমৎকার সদ্ব্যবহার ক'রে থাকেন। মুষ্টিমেয় কয়েকটি অভিজাত পুঙ্গবকে মানুষ করার জন্যে এসব বিদ্যাপীঠে যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়িত হয় তা বস্তুতঃই লোমহর্ষক। আজমীঢ়ের প্রস্তর নির্ম্মিত Mayo Collegeটির মতন সুন্দর কলেজ বোধ হয় ভারতবর্ষে নেই, এমন সুন্দর তার স্থাপত্য! তবু আমরা বলি যে বিদেশী শাসনে আমাদের শিক্ষালাভ যথোচিত হয় নি। যে-সব ধনুর্দ্ধরগণ অর্দ্ধেক ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা তাঁরাই যখন বাল্যকাল হ'তে এই আদর্শ শিক্ষা পাচ্ছেন তখন অন্যে পরে কা কথা!

ভূপাল। সহরটি মনোরম। অন্ততঃ যেদিকে রাজপুরুষ ও অতিথিগণ থাকেন সেদিকের রাস্তাঘাট বেশ মসৃণ রক্তিম ও মাঝে মাঝে রমণীয়ভাবে উঁচু নীচু, যদিও পাহাড়ে-রাস্তার মতন অতটা নয়। হর্ম্ম্যরাজিও সুদৃশ্য। বোধ হয় সহরের এ অঞ্চলটা বেগম সাহেবের নির্ম্মিত—সভ্য লোকদের থাক্‌বার জন্যে। অবশ্য একথা বলাই বেশি যে সহরের আদিম অসভ্য অধিবাসীদের বাসস্থান অঞ্চল অতি নোংরা, রাস্তাঘাট সঙ্কীর্ণ, রাত্রে অন্ধকার, এককথায় মিউনিসিপ্যালিটির সম্পর্কবর্জ্জিত। ভারতবর্ষের প্রায় সব Native State গুলির সম্বন্ধেই একথা খাটে। অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্রের বাসস্থানের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তফাৎ—আকাশ পাতাল। সহরের সব সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য কেবল অভিজাত-কোয়ার্টারের জন্য রিজার্ভ। বাকী বাসিন্দারা চ'রে খাক্—এইভাব আর কি, যেমন আগে ছিল। সভ্যতার বিস্তারে যে সাধারণ মানুষেরও একটু মানুষের মতন বাস করার অধিকার অন্যান্য সভ্যজগতে ক্রমশঃ স্বীকৃত

হ'য়ে আস্‌ছে—এ সত্যটি সম্বন্ধে আর যিনিই সচেতন হোন না কেন, আমাদের নেটিভ ষ্টেটগুলির রামচন্দ্র নিচয় যে সচেতন নন এটা ধ্রুব। ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষে এ পার্থক্য এতটা পীড়াদায়ক নয়। রবীন্দ্রনাথ সত্যই ব'লেছেন "সর্ব্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি ব'লেই রসের নিমন্ত্রণ-সভায় আমরা বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে চিঁড়ে দইয়ের ব্যবস্থা করি—সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি যাদের বড়লোক বলি তাদের জন্যেই।"

ভূপালে একটি সুন্দর হ্রদ আছে। হ্রদটির ধার দিয়ে বেড়াতে বেশ লাগ্‌ল। জলস্থলের সংমিশ্রণের মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য থাকেই থাকে—অবশ্য যদি জলটি নিতান্তই পানা পুকুরের পর্য্যায়ে না প'ড়ে যায়। ভূপালের মনোরম হ্রদটির ওপাশে একটি ছোট পাহাড়শ্রেণী নিজেকে যেভাবে এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকেন তাতে মনে হয় যেন তিনিও অলস নয়নে চেয়ে-থাকার আরামটা শিখে নিয়েছেন। বোধহয় তাই ফাল্গুনের অরুণোজ্জ্বল প্রভাতের শীকর-সম্পৃক্ত বায়ুও তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি।

ভূপালে গিয়েছিলাম—মহম্মদ খাঁর গান শুন্‌তে। ইনি নামী গায়ক—যাকে ওস্তাদেরা বলেন খানদানী। যেহেতু ইনি হদ্দুখাঁ নথুখাঁর ঘরোয়ানা। এ কেমন? না, যেমন কুলীন ব্রাহ্মণ; ভাণ্ডে সাক্ষাৎ মাতা ভবানীর প্রাদুর্ভাব হ'লেও তাঁর কৌলীন্য মারে কে? মহম্মদ খাঁ-ও বোধহয় গাইতে গাইতে মাঝে মাঝেই তাঁর নিরীহ তবলচি বন্ধুটির নাকের ডগা ও পদাঙ্গুষ্ঠের প্রতি লক্ষ্য ক'রে উন্মত্তবৎ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ সহকারে তান দিচ্ছিলেন—শুধু নিজের এই অবিনশ্বর খানদানিত্বটিকেই চোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে। তাছাড়া গাইতে গাইতে প্রায়ই তিনি নিজের তানের বাহবাতে নিজেই ভরপুর হ'য়ে উঠে সোৎসাহে সে সব তানের অকাট্য মৌলিকতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য মনে করছিলেন (খানদানী কিনা!)। তাঁর এই শিক্ষাপ্রদ ব্যাখ্যাতৎপরতায় আমার মনে হচ্ছিল বার্লিনে আমার সেই অভিজাতবংশোদ্ভবা গৃহকর্ত্রীর কথা—যিনি আমাকে প্রত্যহ তাঁর রান্না কেমন হ'য়েছে জিজ্ঞাসা ক'রেই উত্তরের অপেক্ষা না রেখে আগেই নিজের মশ্‌লা-নৈপুণ্যের গুণগ্রাহিতায় মশ্‌গুল হয়ে যেতেন। (এ সত্য কথা, অতিরঞ্জিত নয়)।

মহম্মদ খাঁর মিড় ভাল, সুরদোলানোর ভঙ্গীও সুষ্ঠু তানও মাঝে মাঝে উপভোগ্য। গলাও মন্দ নয়;—অন্ততঃ এককালে যে ভাল ছিল সেটা বেশ বোঝা যায়। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কজেই কণ্ঠস্বর তাঁর এখনও নষ্ট হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যটিকে বাড়ানোর চেষ্টা করা দূরে থাকুক—বিধাতা যেটুকু মাধুর্য্য দিয়েছিলেন সেটুকুও তিনি বজায় রাখ্‌তে পারেন নি। কারণ তিনি গানে কণ্ঠস্বরের মূল্য সম্বন্ধে সাধারণ ওস্তাদদেরই মতাবলম্বী। অর্থাৎ তাঁর মত এই যে গানে দরকার—মূলতঃ গলাবাজি ও অত্যধিক উচ্চস্বরে আর্ত্তনাদ করা। ফলে তাঁর গলাটি বেশ জখম হ'য়ে এসেছে। ওস্তাদদের

এই আক্ষেপজনক প্রবণতাটি সম্বন্ধে আমি একাধিকবার লিখেছি। কণ্ঠস্বর হচ্ছে গানের নিহিত ভাবটি ফুটিয়ে তোলার একটা শ্রেষ্ঠ উপাদান। যেমন তোত্‌লার পক্ষে ভাবগভীরতা সত্ত্বেও অভিনয়-কলায় সাফল্যলাভ করা মুস্কিল, তেম্‌নি কর্কশকণ্ঠ গায়কের পক্ষে শিক্ষা ও শুদ্ধ-তান-লয় সত্ত্বেও গানের-আর্টে সফলকাম হওয়া কঠিন। অথচ আমাদের দেশে ওস্তাদ ও ওস্তাদিপন্থীদের গান সম্বন্ধে out look আজ এতই অদ্ভুত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে এই সাদা কথাটিও তাঁদের বার বার বল্‌বার দরকার হয়। মহম্মদ খাঁর এই আক্ষেপজনক প্রবণতাটি সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া গেল যখন তিনি তাঁর একটি তের চৌদ্দবৎসরের ছাত্রীকে দিয়ে একটি জৌনপুরী ও একটি ভৈরবী গাওয়ালেন। মেয়েটির গলাটি মন্দ ছিল না। তাছাড়া নারী ব'লে নারীসুলভ কমনীয়তাও তার গানের মধ্যে তার অজ্ঞাতসারেই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু মহম্মদ খাঁ কোথায় তাঁর ছাত্রীর এই নারীসুলভ কমনীয়তাটি তাঁর শিক্ষাগুণে আরও ফুটিয়ে তুল্‌বেন, তা না ক'রে তিনি তাকে কুশ্রী তান, অসম্ভব চড়া পর্দ্দায় গাওয়া ও গানের মধ্যে বার বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করতেই শিখিয়েছেন। কিন্তু বোধহয় আমাদের ওস্তাদদের গানের এসব কদশ্রী আনুষঙ্গিকের জন্য আক্ষেপ করা নিষ্ফল ও বাহুল্য। অন্ততঃ তাতে তাঁদের সংশোধন করা যাবে না। কারণ সৌকুমার্য্য যে সম্প্রদায়ের মনে কখনও তার অপরূপ সুষমার স্নিগ্ধ বর্ণপাত করে নি, তাদের সৃষ্টিতে কেমন ক'রে সে বস্তুটির ছায়াপাতও আমরা আশা কর্‌তে পারি? যে দু চার জনের গুণপনায় আমরা হঠাৎ এ সৌকুমার্য্যের আমেজ একটু পেয়ে যাই তাঁদের কাছে থেকে বরং এ অপ্রত্যাশিত দানের জন্য আমাদের বেশি ক'রেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাঁদের বরং আমাদের ব্যতিক্রমের কোঠায়ই ফেলা উচিত। অধিকাংশ ওস্তাদদের স্থূল ও অসুন্দর গানের আবহাওয়ার জন্য তাঁদের নিন্দা করায় বস্তুতঃ তাঁদের প্রতি অবিচারই করা হয়—যদি এ নিন্দার অন্য কোনও উদ্দেশ্য না থাকে। এককথায় ওস্তাদসম্প্রদায়ের কাছ থেকে আমাদের সঙ্গীতের নবজন্ম আশা করা আর বালিকা-বধূর কাছ থেকে উচ্চাঙ্গের আদর্শবাদে পূর্ণ সহানুভূতি লাভের কামনা করা—এ দুইই একশ্রেণীর আকাশকুসুম।

সাঁচি। কতবার মনে করা গিয়েছিল ভূপালের পথে একবার ঝুপ ক'রে নেমে সাঁচির বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ, মন্দির, মঠ প্রভৃতি দেখে চোখদুটো সার্থক ক'রে নেব। বুদ্ধগয়া ও সারনাথ দেখ্‌লে বোধ হয় ভারতবর্ষের এই তৃতীয় বৌদ্ধ তীর্থটির কথা বেশি ক'রে মনে না হ'য়েই পারে না। তাই যখন হঠাৎ সাঁচিতে নেমে পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম তখন মনটা যে এক বিচিত্র সার্থকতা রসে ভ'রে উঠেছিল একথা সহজেই অনুমেয়।

সব কীর্ত্তিমন্দির স্তম্ভাদিরই একটা তীর্থমাহাত্ম্য আছে। অবশ্য প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকেরা এ কথাটিতে হেসে উঠ্‌বেন জানি—বিশেষতঃ যখন তীর্থ কথাটি নিতান্তই সেকেলে মনোভাবের

পরিচায়ক। কাজেই সেটা যে কুসংস্কারের একটা মস্ত প্রতীক সে বিষয়ে তিলার্দ্ধ সংশয় প্রকাশ করার পথ ত থাকৃতেই পারে না। কিন্তু তবু—অর্থাৎ তাঁদের এ ভূবিদীর্ণকারী অবজ্ঞার হাসি সত্বেও—অন্‌-প্র্যাকৃটিক্যালের চোখে প্রতি পূত স্থানের গৌরবসম্পদ আজও কথার কথা হ'য়ে ওঠে নি। অথচ মুস্কিল এই যে অবজ্ঞাত অন্‌-প্র্যাকৃটিক্যালদের মনের এ অকেজো অনুরাগ যে একটা সৌখীন ভঙ্গুর ভাববিলাসিতা মাত্র নয়, সেটা পূর্ব্বোক্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি কাজের-লোকদের বোঝাবার কোনও অস্ত্রই বিধাতা আমাদের দেন নি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "পঞ্চভূতে" একটা বড় খাঁটি কথা বলেছেন: "একটা তর্কের কথায় সহসা বিরুদ্ধ মত শুনিলে মানুষ তেমন অসহায় হইয়া পড়ে না, কিন্তু ভাবের কথায় কেহ মাঝখানে ব্যাঘাত করিলে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হয়। কারণ, ভাবের কথায় শ্রোতার সহানুভূতির প্রতিই একমাত্র নির্ভর। শ্রোতা যদি বলিয়া উঠে, কি পাগ্‌লামি করিতেছ, তবে কোনো যুক্তিশাস্ত্রে তাহার কোনো উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" তবু আমরা বলি বিধাতা প্রতি জীবকেই আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র দিয়েছেন। ইংরাজীতে একটা কথা আছে : To live is to learn.

যাক্। যে কথা বল্‌ছিলাম। আমেরিকান টুরিষ্টদের মতন খাতা হাতে ক'রে "প্রতিহিংসার সহিত দৃশ্যাদিদর্শন" করার মোক্ষফলদতার সম্বন্ধে অলস মন্থরপন্থী প্রাচ্যজাতি বোধ হয় সহজে তেমন মনে প্রাণে সাড়া দিতে পারে না। তাই সাঁচি পৌঁছিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানকার স্তূপ, মন্দির, চৈত্যকক্ষ, যাদুঘর, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি দেখবার আগেই মনটা বেশ ভরপূর হ'য়ে উঠ্‌ল। কর্ত্তব্যদর্শনকার্য্যটা যেন তেন প্রকারেণ সেরে নিতে মনটা মোটেই ব্যগ্র হ'য়ে উঠ্‌ল বলে মনে হ'ল না। প্র্যাকৃটিক্যাল মার্কিন-আত্মীয় বল্‌বেন : "বেশ, তাহ'লে তোমরা ভরপূর হ'য়ে স্বপ্নই দেখ, আমরা ততক্ষণ দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দেখে নিই। যেহেতু জীবন স্বল্পপরিসর। তাছাড়া দিবাস্বপ্নই যদি দেখ্‌তে হয় তবে সেজন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে সাঁচি আস্‌বার কি দরকার ছিল?" হায় এ দরকার জিজ্ঞাসার কি উত্তর দেব তাঁদের? ব'লেছিই ত যে প্র্যাকৃটিক্যাল জাতীয় মানবহিতৈষীদের কাছে আমাদের জাতীয় লোক নিতান্তই নাচার ও বেচারী গোছের জীব হ'য়ে পড়ে। আমাদের অমোঘ যুক্তিবাণও তাঁদের প্র্যাক্‌টিক্যালিটিরূপ দুর্ভেদ্য বর্ম্মে প্রতিহত হ'তে না হ'তে নম্রশীর্ষ হ'য়ে মাটিতে লোটায়—তাঁদের অঙ্গস্পর্শও কর্‌তে পারে না, মর্ম্মভেদ করা ত দূরের কথা। সুতরাং তাঁদের বল্‌তে ইচ্ছা হ'লেও বলা নিষ্ফল যে মানুষের সত্য শিক্ষার একটা মস্ত স্বীকৃত পন্থা হচ্ছে—তার কল্পনার পরিধিকে উত্তরোত্তর বিস্তৃত করা। নইলে মানুষ আজও সেই আদিম গুহাবাসী জড়ের অবস্থাতেই থাকৃত যখন প্রকৃতির মধ্যে সে কোনও বিরাট প্রাণস্পন্দনই কল্পনা কর্‌তে পারত না। তাঁদের বলা মূঢ়তা মাত্র যে কালিদাসের কবিত্বের

বিকাশও সম্ভবপর হয়েছিল তাঁর কল্পনার সেই বিস্তারে যার ফলে পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ তাঁর চোখে ধূমজ্যোতিঃসলিল মরুতের সন্নিপাতে সৃষ্ট জড়পদার্থমাত্র না হ'য়ে প্রেমাস্পদের দূতী ব'লেই প্রতীয়মান হ'য়েছিল। কাজেই হে প্র্যাক্‌টিক্যাল দেশোদ্ধারকারিগণ! তীর্থ মাহাত্ম্য ও স্থানবৈশিষ্ট্যে অন্‌-প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকে বিশ্বাস করবেই তার মধ্যে দ্রষ্টব্য বস্তুর বিস্ময় শিহরণের উপাদান অকাট্যরূপে না থাক্‌লেও। কারণ তারা যে তোমাদের পরামর্শ নেবার আগেই এই অনাবশ্যক কল্পনাবিলাসে বিশ্বাস ক'রে ফেলে তাকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় চড়িয়ে ব'সেছে।

বস্তুতঃ সেই সব স্থান দেখেই মানুষ যথার্থ লাভ করতে পারে যে-সব স্থানের মাহাত্ম্যে সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। নইলে জীবনের খাতায় কেবল লাভ হ'তে পারে সংখ্যাতীত রোমাঞ্চ-করা-উচিত-এমন দ্রষ্টব্য বস্তুর তালিকা-সন্নিবেশ, কিন্তু তাতে ক'রে জীবনের রস-স্ফূর্ত্তির কোনও সহায়তা হয় না।

এই ভেবে য়ুরোপে বা অন্য অনেক স্থানে অনেক সমতুল্য লোমহর্ষক স্মৃতিস্তম্ভই দেখ্‌তে যেতে মনকে রাজি করাতে পারিনি। কেননা বন্ধুবান্ধবকে 'দেখেছি' বল্‌বার প্রলোভনটা দুর্জ্জেয় থাকে বোধ হয় কেবল মনের বাল্যাবস্থায়ই। অন্ততঃ প্রাচ্য মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রলোভনের কার্য্যকারিতা যে ক্রমশঃ মন্থরগমনের ধ্রুব বিলাসের প্রলোভনকে জয় করতে অক্ষম হ য়ে ওঠে একথা ত অস্বীকার করা চলেই না।

পাঠক হয়ত অধীর হয়ে বল্‌বেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝ্‌লাম বাপু বুঝলাম। কিন্তু এইবার বলত শুনি কি দেখ্‌লে? ভণিতাটা এখন ছাড়ো ত একবার।" কিন্তু এইখানেই ত যত গোল! আমি যে শুধু বৌদ্ধস্তূপের গঠনপ্রকৃতি বা শিলালিপির ইতিবৃত্তের খবর নিতেই সাঁচি যাই নি। সে কাজ প্রত্নতাত্ত্বিকেরই একচেটে থাকুক। তাঁর সঙ্গে আমার বিবাদ নেই যেহেতু ভিন্নরুচির্হি লোকঃ আমি সাঁচি গিয়েছিলাম—সেখানকার বৌদ্ধমঠের পূত উদাসকরা সৌরভের একটুখানি মাত্র সে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খুঁজে পেতে। সেখানে দ্রষ্টব্য যা যা আছে তা দেখে যে তৃপ্তি পাই নি এমন কথা বল্‌লে অবশ্য সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু একথা বল্‌লে একটুও বেশি বলা হবে না যে তার চেয়ে ঢের বেশি তৃপ্তি পেয়েছিলাম—সাঁচির ছোট্ট পাহাড়ে অস্তগামী সূর্য্যালোকে স্তূপমন্দিরের আশেপাশে নিতান্ত অকেজোর মতনই ঘুরে বেড়াতে। ঢের বেশি ভাল লাগছিল সাঁচির পূত ধ্বংসাবশেষের আবহাওয়ার মধ্যে তার লুপ্ত গৌরবের কথা ভাব্‌তে। মনে হচ্ছিল এইখানেই না এক সময়ে কত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু দেশদেশান্তর থেকে এসে তাদের আরাধ্যকে নৈবেদ্য দিতে একত্র হ'ত! মনে হচ্ছিল—হয়ত এইসব মন্দির মঠ প্রভৃতির চারদিকে তারা একদিন এমনিই অস্তস্বর্ণাভ রবিকরে স্তোত্রপাঠ কর্‌তে কর্‌তে পরিক্রমণ করত। ··· কিন্তু কোথায়

সেযুগের বাঞ্ছিতের জন্য সে প্রাণশক্তিকেও ত্যাগ করার নিষ্ঠা, আর কোথায় বর্ত্তমান যুগের প্রাণচঞ্চলতার অফুরন্ত কর্ম্মিষ্ঠতার বাণী! মনে হচ্ছিল--এইসব জাতকচিত্র, বৌদ্ধভাস্কর্য্যগাথা হ'তে তারা একদিন না জানি কি অপূর্ব্ব রসেরই অফুরন্ত খোরাক সংগ্রহ কর্‌ত, যাতে আমরা আজ শত চেষ্টায়ও ঠিক তেমনভাবে সাড়া দিতে পারি না। ... সঙ্গে সঙ্গে মন আকুল হ'য়ে উঠ্‌ল সেই উদাত্ত শঙ্খঘণ্টাধ্বনির একটি রেশও কান পেতে শোন্‌বার জন্যে; হৃদয় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল চৈত্যকক্ষে তাদের ধূপদীপের সেই অর্থপূর্ণ সৌরভের একটুখানি পরশও বাতাসের মধ্যে পাবার জন্যে; প্রাণ কালের ব্যবধানের দুস্তর সেতু অতিক্রম করে উধাও হয়ে ভেসে যেতে চাইল—সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের শান্তোজ্জ্বল কমনীয় মুখচ্ছবির একটি মাত্রও পলাতক আভাষচ্ছটা পাবার জন্যে।...কিন্তু হায়, সংসারে যত বিয়োগগাথা আছে তার মধ্যে মহিমোজ্জ্বল অতীতের লুপ্তবৈভবের চিরকালই অস্তমিত থেকে যাওয়ার অবশ্যম্ভাবিত্ব বোধহয় কারুণ্যে কোনও বিষাদ কাহিনীর চেয়েই কম নয়।

কিন্তু...না না ..তবু অতীত ত সম্পূর্ণ অস্তগতও নয়। অতীত যে বর্ত্তমানের প্রতিমুহূর্ত্তে তার বিগত গৌরবকে জাগিয়ে তোলে—এক অভিনব উপায়ে! এইখানে বিধাতার বিধানের একটা পরম মঙ্গলস্পর্শ মেলেনা কি? কারণ ভূত গরিমাকে কি আমরা কল্পনার স্ফটিকচ্ছটায় এমন এক ঔজ্জ্বল্য ও রক্তিমায় স্নাত ক'রে দেখ্‌বার ক্ষমতা ধরি না—ঠিক্ যেমনতর লালিমা হয়ত বস্তুতঃ অতীতের ছিল না? হয়ত কেন—নিশ্চয়ই ছিল না। সাজাহান মনেপ্রাণে যত বড় কবিই হোন না কেন ও মমতাজমহলকে যে ভাবেই গরীয়সী ক'রে তুল্‌বার চেষ্টা পেয়ে থাকুন না কেন, কোন্ কবি জোর ক'রে বল্‌তে পারেন যে তিনি তাঁর মনের সে অরুণিমার যথার্থ রঙটি ধরতে পেরেছেন? কোনও কবিই তাজমহলের মধ্যে সাজাহানের সে হৃদয়টির চির প্রতিচ্ছবি দেখ্‌তে পেতেই পারেন না—তা তিনি যতই কেন না কল্পনাকুশল হোন্;—তিনি তাজমহলকে নিজের বিশিষ্ট কল্পনার দ্যোতনায়ই বিশেষভাবে রঞ্জিত ক'রে দেখ্‌বেন। রবীন্দ্রনাথ অনুমান করেছেন যে সম্রাট কবির শঙ্কিত হৃদয়..."চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়-হরা সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সম্রাট কবি আজ এ অনুপম কবিতাটি পড়লে কি নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বল্‌তে পারতেন যে তাজমহল ফর্ম্মাসের সময়ে তাঁর হৃদয়ের রক্তরাগের বর্ণসম্পাত ও আলোছায়া ঠিক্ তাঁর গুণগ্রাহী কবিভক্তটির অনুমান-মাফিক হ'য়েছিল?

কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কেন না শিল্পী ঠিক কি ভেবে তাঁর সৃষ্টিকাজে রত হয়েছিলেন সেটা নির্ণয় করতে পারা-না-পারার উপর তার রসগ্রহণ করা-না-করা নির্ভর করে না। কারণ সৌন্দর্য্য যে তার স্রষ্টার চেয়ে অনেক বড়। অনেক সময়ে শিল্পী যে নিজেই খবর রাখেন না তিনি অজ্ঞাতসারে তাঁর সৃজিত কলাকারুর মধ্য দিয়ে কি এর্ক

বিশ্বজনীন তারে চিরন্তন অনুরণন তুলে থাকেন। অথচ এ অনুরণনের শ্রেষ্ঠ গরিমাই এই যে তা যুগে, যুগে শিল্পের পূজারীর হৃদয়ের নব নব রুদ্ধ সৌন্দর্য্যানুভূতির দুয়ার উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেয়। দরিদ্র অশ্বরক্ষক শেক্ষপীয়র যখন গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থানের জন্য নাটক লিখ্‌তেন তখন কি তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎ বাণীদেবী কি এক সমাপ্তিহীন সঙ্গীতকে মূর্ত্ত ক'রে তুলে ধ'রেছিলেন? প্রতি অবিনশ্বর শিল্পপ্রতিমা যুগে যুগে নব নব অনুভূতির আলোকসম্পাতে নব নব দীপ্তি, রঙিমা ও ভঙ্গীতে গরীয়সী হয়ে ওঠে। তার মধ্যে কোন্ ভঙ্গিমাটি যে তার নির্ম্মতার উদ্দিষ্ট ছিল কেই বা তা বল্‌বে আর তার আবশ্যকতাই বা কি? অতীতের যে-গৌরব দৃশ্যতঃ অতীত, মানুষের অভিজ্ঞতা-জগৎ হ'তে তার নিষ্ক্রামণের ক্ষতিপূরণস্বরূপই কি বিধাতা ক্ষণবিধ্বংসী মানুষকে মৃত্যুহীন নবনবোন্মেষিণী কল্পনা দেন নি?

শ্রীদিলীপকুমার রায়

রাজেন্দ্রাণী

বন্দি তোমারে জগদ্বন্দ্যা তাপসী রাজেন্দ্রাণী।
ঊর্দ্ধে অনির্ব্বচনীয় নীল, নিম্নে অরণ্যানী।
যুগ-যুগান্ত চির-নিতন্দ্র শৈল জাগিছে শিরে,
অতল সিন্ধু আকুল নিত্য রাতুল্ চরণ ঘিরে।
প্রভাত পরায় রক্ত চেলীর মঞ্জু বসন নব,
সন্ধ্যা মাখায় স্বর্ণ-পরাগ শ্যাম শ্রীঅঙ্গে তব।
বর্ণিতে রূপ হল পরাস্ত নিখিল কবির বাণী;
বিশ্বভুবন প্রণাম তোমারে পাঠা'ল রাজেন্দ্রাণী।

পঞ্চনদীর পাঁচনরী—তব কণ্ঠ বেড়িয়া সাজে,
ভালে তুষারের কিরীট-কনকে কোটি কোহিনুর রাজে।
বসিলে সিংহ-আসনে, বালিকা বঙ্গলক্ষ্মী কোলে,
স্নেহোচ্ছ্বাসিত ব্যাকুল বক্ষে গঙ্গা-যমুনা দোলে;
নর্ম্মদা কলহাস্য-প্রপাতে চপল নৃত্যে নাচে,
কাঁদে গোদাবরী, কৃষ্ণাকাবেরী আঁচল আঁকড়ি আছে।
জগতে জননী তোমারেই শুধু শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি',
রাজভেট পদে পাঠা'ল সকলে, হে রাজ-রাজেন্দ্রাণী।

কম-করে রবি কানে নয়নের শ্রাবণের ধারা মোছে,
নীলে-ও শ্যামলে সোনালী মিলিয়া ময়ূরকণ্ঠী রচে।
দূর প্রসারিত শস্যক্ষেত্রে স্বর্ণাঞ্চল বুলে,
দিগন্তরালে সঞ্চলিত বা মেঘের পতাকা দুলে।
দেবতা দৈত্য হেরি সে দৃশ্য বিস্ময়ে মূক রহে,
অমরাবতীর অপরূপ শোভা তুলনা তাহার নহে।
যাহার যা কিছু শ্রেষ্ঠ আছিল, উপহার দিল আনি,
তা-ই দিয়া একি চিত্র রাজ্য রচিলে রাজেন্দ্রাণী ?

শারদ আলোর সুরের পরশে খুলিল পুরের দ্বার ;
পশিলাম দেবী, তব রহস্য-ভুবনে পুনর্ব্বার !
পুঞ্জপুষ্পগন্ধমদির মায়া-অরণ্য মাঝে
বিহঙ্গকলকূজিত কুঞ্জে মোহন মন্ত্র বাজে ;
রৌদ্র-ছায়ার লীলায় উতল কাঁপিছে কাননভূমি,
বন তরুতল রচিল বীথিকা, সেথায় নেহারি—তুমি !
সে মনোমোহিনী মূর্ত্তি হেরিয়া সকলে লইল মানি,
এই অনন্ত রূপের রাজ্যে তুমিই রাজেন্দ্রাণী।

হিমের অন্তে কিসের না লাগি সাজিলে তপস্বিনী,
রিক্তভূষণে সুন্দর শিবে লইবে, গৌরী, জিনি ?
নব বসন্তে, ওগো বাসন্তী, কোন্ বিচিত্রভাবে,
ওই শাশ্বত পাগল আবার তোমারে ফিরিয়া পাবে ?
চন্দ্রালোকের মন্দাকিনীতে উথলি উঠিবে নিতি,
সেই অনন্ত-বিনির্ঝরিত সৌন্দর্য্যের গীতি।
—তুমি ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিশ্বরাণী,
বন্দি তোমারে জগদ্বন্দ্যা তাপসী রাজেন্দ্রাণী !

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

"শেষ-মুহূর্ত্তে"

(১)

নারায়ণপুরের জমীদার বাবুদের খুব নামডাক ছিল। সে অঞ্চলের বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের কথা জন-প্রবাদে পরিণত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইদানীং, আধুনিক বাবুদিগের নামও কলিকাতা অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়াছে। কলিকাতায় তাঁহাদিগের প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বৈদ্যুতিক আলোক, পাখা, গাড়ী, জুড়ী, মোটর—কিছুরই অভাব ছিলনা। সভা সমিতিতে মিশিয়া চাঁদার খাতায় মোটা মোটা চাঁদা সহি করিয়া তাঁহারা দেশ বিখ্যাতও হইয়াছিলেন, কাজেই এখন পল্লীপ্রান্ত হইতে সহরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বাবুদের নামধাম লোকের মুখে মুখে ফিরিয়া বেড়ায়।

আষাঢ়ের প্রথম। জমীদার বাড়ীর বড় বাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে দেশে বিপুল উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধবে গৃহ পরিপূর্ণ। অন্নপ্রাশনের দিন সকাল হইতেই টিপটিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। কলিকাতা হইতে একজন প্রসিদ্ধ বাইজি আসিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় গানের আসর বড় চকমিলান উঠানে সাজান হইয়াছিল; কিন্তু ঘনায়মান দুর্য্যোগ দেখিয়া সকলের মতানুযায়ী বড় হল ঘরে আবার আসর নূতন করিয়া বসিল।

বাইজির গান খুব জমিয়া উঠিয়াছে। প্রশংসার জয়ধ্বনি সকলের কণ্ঠ হইতে অনুরণিত হইয়া বাইজিকে উল্লসিত করিয়া তুলিতেছিল। বাইরেও বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের দম্‌কা হাওয়া যেন বাইজির গানে মুগ্ধ হইয়া রুদ্ধ জানালা, সার্শি ঠেলাঠেলি করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রকৃতির দুর্য্যোগ দেখিয়া সকলে একটু চকিত হইয়া উঠিলেন। তাইত! ঝড়টা যে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল! বড় বাবু নরেন্দ্র রায় চঞ্চলভাবে বলিলেন, "তড়িৎ এখনও এসে পৌঁছিল না যখন, তখন সে নিশ্চয়ই বিকেলের ট্রেণে রওনা হয়নি, সন্ধ্যার ট্রেণেই আস্‌ছে, তা'হ'লে এই ঝড়ের মধ্যেই তার নৌকা প'ড়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন কোন বিপদ না হ'লেই বাঁচি।" নরেন্দ্র বাবুর কথা শেষ না হইতেই সম্মুখের দরজা খুলিয়া একজন বলিষ্ঠ, প্রিয়দর্শন যুবা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। নরেন বাবু এবং আর কয়েকজন সমস্বরে সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে তড়িৎ, তোমার জন্য আমাদের যে কি ভাবনাটাই হ'য়েছিল, তা আর কি ব'ল্‌ব? যাক্, কোন কষ্ট হয়নি ত?"

"না, এমন কোন বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি। নরেন্ বাবু, আপনি একজন ডাক্তার ডাকবার কথা ব'লে দিন্"। নরেন্ বাবু বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে বলিলেন, "ডাক্তার! কেন?"

"সমস্ত পরে জান্‌তে পারবেন। ডাক্তার এখনই চাই। আমি বাড়ীর মধ্যে গেলুম।"

"ডাক্তার ডাক্‌তে ত আর আজ কোথাও যেতে হবেনা; এখানেই ডাক্তার বাবুরা উপস্থিত আছেন। সঙ্গে ক'রেই নিয়ে যাও; আর তুমি একটু শীগ্‌গির ক'রে জামা কাপড় ছেড়ে এস, তোমার কথা শোনবার জন্যে সকলে খুব উৎসুক হ'য়ে আছেন।"

তড়িৎ নরেন্ বাবুর শ্যালক—বিলাত-প্রত্যাগত নব্য ব্যারিষ্টার। অবস্থাও বেশ ভাল। নরেন্ বাবুদের মত অত বড় জমিদারী না থাকিলেও তড়িৎ তাহার গ্রামে জমিদার বলিয়া সম্মান পায়। নারায়ণপুরের কাছেই নয়নগঞ্জে তড়িতের পৈতৃক আবাস; কিন্তু কলিকাতায় বালিগঞ্জে অনেকদিন হইতেই সকলে স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছেন। কখনও যদি ইচ্ছা হয়, পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে তবেই দেশে পদার্পণ করেন, নতুবা নয়। মোট কথা,—তড়িৎ এখন একরকম কলিকাতারই লোক। সে দুইজন ডাক্তার সঙ্গে লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহার দিদিকে ডাকিল।

নরেন্ বাবুর স্ত্রী সুজাতা একটী ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "এই ঘরে এস, তাকে এখানেই শোয়ান হয়েছে।" তড়িৎ ডাক্তার বাবুদের লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

শুভ্র শয্যার উপর একজন যুবতী শায়িতা। বাহিরে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য, ঘরের মধ্যে বিরাট নিস্তব্ধতা।

নিঃশব্দে ডাক্তারদ্বয় যুবতীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া মৃদুস্বরে তড়িৎকে বলিলেন, "না, জীবনের কোন শঙ্কা নেই। তবে আঘাতটী বড় গুরুতর ব'লে বোধ হ'চ্ছে। জ্বর যদি হয়, তবেই ভয়ের কারণ; কেননা এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে জলে ডুবে কতখানি ঠাণ্ডা যে লেগেছে, তাত সহজেই অনুমান ক'র্‌ছেন। তবে এই ঝড়ে যে বেঁচে গেছেন এই আশ্চর্য্য।"

তড়িৎ একটু কাতরভাবে বলিল, "কিন্তু এই নৌকায় এঁর যে সঙ্গী একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁকে কিছুতেই রক্ষা ক'রতে পারলুম না।"

ডাক্তার বাবুরা তখন আর কোন কথা না বলিয়া যুবতীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। বাহিরের গোল মিটাইয়া নরেনবাবু যখন বাড়ীর মধ্যে আসিলেন তখন রাত্রি তিনটে বাজিয়া গিয়াছে। যে ঘরে যুবতীকে লইয়া সকলে ব্যস্ত ছিলেন, নরেনবাবু বরাবর সেই ঘরেই আসিলেন। একজন ডাক্তার, তড়িৎ এবং নরেনবাবুর মেজ ভাই ধীরেন—সে ঘরে ঝি-চাকর থাকা সত্ত্বেও নিজেরাই যুবতীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন। নরেনবাবু জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, অবস্থা এখন অনেক ভাল, ক্রমেই জ্ঞানের সঞ্চার হইতেছে। বোধ হয় আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান হইবে। তখন তিনি তড়িতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাক্, তড়িৎ আমাদের ম্যাজিকে ওস্তাদ, কুস্তিতেও বেশ 'ওস্তাদ' নাম কিনেছে। এখন এই সাঁতারের বাহাদুরিটা কাগজে বেরুলে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে তড়িতের কাছে কিছু খাই।"

তড়িৎ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনার এ আশা যেন ঈশ্বর পূরণ করেন।"

(২)

বর্ষার আকাশে খণ্ড মেঘের আবছায়া—চাঁদের মৃদু জ্যোৎস্নালোকে সুজাতা ছাদের উপর বসিয়া সেই ঝড়ের রাত্রির যুবতীর সহিত গল্প করিতেছিলেন। আজ তিন চার দিন যুবতী বেশ সুস্থ হইয়াছে।

"তারপর ?"

"ছেলেবেলায় মা মারা গিয়েছেন, বাবা আর বিয়ে করেন নি। বাবা একটী আপিসের "মুচ্ছুদ্দি" ছিলেন। আমাদের অবস্থা তখন বেশ স্বচ্ছলই ছিল।" এই বলিয়া উমা একটি ঢোক্ গিলিল। তারপর আবার বলিল, "হঠাৎ বাবা পক্ষাঘাত অসুখ হ'য়ে শয্যাশায়ী হন। অনেক চিকিৎসার পর বাবা আবার উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু পূর্ব্ব স্বাস্থ্য আর ফিরে পেলেন না। দুদিন ভাল থাকেন, আবার অসুখ হয়। এই রকমে এক বৎসর ভুগে বাবা আমার স্বর্গে গেলেন।" চোখের জলের বন্যায় উমার বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

সুজাতা তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "বাবা তোমার স্বর্গে। এমনভাবে কেঁদে তাঁকে কষ্ট দেওয়া ত উচিত নয়। চুপ কর উমা, তোমার কান্না যে আমিও সইতে পাচ্ছি না।" তাহার পর একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় বলিলেন "তোমার বাড়ীর ঠিকেনাটা আমায় বল, দু একদিনের মধ্যে তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিই।"

উমার মুখে তখনও বিপদের মেঘ ঘনীভূত রহিয়াছে দেখিয়া তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য সুজাতা স্নিগ্ধকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, "তোমার স্বামীকে পেয়ে আমায় ভুলবেনা ত? আমি যে একজন তোমার বোন হয়েছি, এটা তোমার মনে থাকবে ত ?"

উমা আপনাকে সংবরণ করিল ; কিন্তু তাহার বিবর্ণ মুখ আরও ম্লান হইয়া গেল।

সুজাতা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন। উমার বাঁ হাতখানির দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহার করপ্রকোষ্ঠে সধবার চিহ্ন লোহা ঠিকই আছে। তবে ? সুজাতার কাণে একটা প্রশ্ন উদিত হইল, কিন্তু তিনি তখনই সেই বিসদৃশ প্রশ্নটাকে অব্যবহার্য্য জিনিষের মত মন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, "না' এ হতে পারেনা। হয়ত, এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতা তরুণী স্বামীর প্রেম হইতে বঞ্চিত, হয়ত তাহার খেয়ালী স্বামী চরিত্রবান্ নহে। এমন ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার স্বল্প অভিজ্ঞতার ফলে এমন অনেক পরিবারের কথা তিনি নিজেইত জানেন।

উমা প্রাণহীন নিশ্চল প্রতিমার মত বসিয়া পরপারের মসীরেখার দিকে চাহিয়াছিল। সুজাতাও চিন্তাযুক্ত মনে সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

উমা কিছুক্ষণ পরে সহসা সুজাতার দিকে ফিরিয়া সহজভাবে বলিল, "দিদি,

আজ আর আমি কিছু বল্‌তে পারব না, তবে যাবার আগে আপনাকে আমার সব কথাই বলে যাব।" সুজাতা উমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "উমা, স্বামী যদি মন্দ হয়, তবে তোমার চলে কি করে ? আর থাকই বা কোথায় ?"

উমা অতি মৃদুকণ্ঠে ধীরে-ধীরে বলিল "বাবা সবে এই এক বছর মারা গেছেন ; আমার আপন বলতে আর কেউ নেই। বাবার একজন আত্মীয় বুড়া কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁকেও সেদিন ঝড়ে নদীতে হারিয়েছি। বাবার যে গুরুদেব আছেন, অবশ্য তিনি এখন আমারও গুরুদেব, তাঁর কাছেই আমি আছি। মেয়ের মত যত্নে তাঁরা আমায় পালন করছেন। বাবা আমায় তাঁর সঞ্চিত যে টাকা দিয়ে গেছেন, তাতে আমার মত দশটা লোক অনায়াসেই প্রতিপালিত হতে পারে।"

"তোমার কোথায় বিয়ে হয়েছিল, উমা ?"

উমা একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আমার অদৃষ্টের কথা আমি কাকেও বলি না ; তবে আপনার কাছে একদিন নিশ্চয়ই বলব, কিন্তু এখন নয়।"

"না, যদি তোমার এতে কষ্ট হয় উমা, তবে আমি শুন্‌তে চাইনা। কিন্তু আমাদের দেশে তুমি নৌকা করে আস্‌ছিলে কেন, বোন ?"

উমা নতদৃষ্টিতে আবার চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বিষাদখিন্নস্বরে বলিল, "আমার পোড়া অদৃষ্টের কাহিনী আপনাকে আমি একদিন শোনাব, আজ মাপ করুন, দিদি !"

সুজাতা স্নেহভরে উমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল, নীচে যাই। কিন্তু বোন, মনে রেখ, আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিনী দিদি।"

(৩)

উমা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সুজাতার কাছে সে তাহার অদৃষ্টের রহস্যময়ী কাহিনী প্রকাশ করে নাই। সুজাতাও জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই। কলিকাতায় গিয়া উমা সুজাতার সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছে, উত্তরও পাইয়াছে। কিছুকাল পরে উমা সুজাতাকে লিখিল যে, সে অনেকদিন তাঁহাকে দেখে নাই, সেজন্য তাহার মন তাঁহার দর্শন লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। অল্প পরিচয়েও উভয়ের মধ্যে এমন একটা নিবিড় প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইয়াছিল যে পরস্পর পরস্পরকে দেখিবার জন্য সত্যই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। সুজাতা উত্তরে জানাইলেন, যে, পূজা পর্য্যন্ত তিনি দেশেই থাকিবেন। তাহার পর কলিকাতায় যাইবেন।

কিন্তু শ্রাবণের মাঝামাঝি একদিন হঠাৎ কলিকাতার যাইবার জন্য একখানি জরুরী 'তার' আসিল। তড়িৎ জানাইয়াছে যে সে পীড়িত—অবিলম্বে দিদির আসা চাই। বাড়ীতে

বাবুরা কেহ ছিলেন না। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহারা সকলেই তখন কলিকাতায়। বুড়ো সরকারকে ডাকাইয়া বেলা ২টার ট্রেণে সুজাতা যাত্রা করিলেন।

রাত্রি বারটায় বালিগঞ্জে পৌঁছিয়া সুজাতা দেখিলেন, তড়িতের পীড়া সামান্য নহে; জ্বরের উপর জ্বর আসিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপও আছে। সংসারে তড়িতের আপন বলিতে স্ত্রী ও ভগিনী। স্ত্রী নীলিমা মাকে অনেক দিন দেখে নাই বলিয়া সম্প্রতি বোম্বাই গিয়াছিল। সেখানে তাহার পিতা ডাক্তারী ব্যবসায় করিতেন। গত্যন্তর না দেখিয়া তড়িৎ তাই দিদিকে আসিবার জন্য 'তার' করিয়া দিয়াছিল। অসুখের সময় শুধু পরিচারকদের উপর নির্ভর করিয়া কি থাকা যায়?

শ্রাবণের অবিরাম বারিধারা সেদিন প্রবলবেগে পৃথিবীর উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল। তড়িৎ দুর্ব্বল শরীরে বিছানার উপর বসিয়া বালিশে ঠেস্ দিয়ে বাহিরে বৃষ্টির দিকে চাহিয়া ছিল। সুজাতা একবাটী গরম দুধ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "চারটে বেজে গেছে তড়িৎ! এই দুধটুকু খেয়ে ফেল।"

তড়িৎ বলিল, "দাও।"

সুজাতা বলিলেন "জগুয়া, বাটীটা নিয়ে যা'। উঃ! কি ভয়ানক বৃষ্টি হ'চ্ছে। এই বৃষ্টির মধ্যে উনি আজ নারাণপুর কেমন ক'রে যে রওনা হবেন, তা জানিনে।"

"খুব কি বিশেষ দরকার, দিদি?"

সুজাতা বলিলেন, "হ্যাঁ। খুব বিশেষ দরকার ত ব'ললেন।" তাঁহার কথা শেষ হইয়াছে এমন সময় তড়িতের প্রকাণ্ড মোটরখানা হর্ণ বাজাইয়া গেটের ভিতর প্রবেশ করিল। সুজাতা একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এত শীগ্‌গির্ মোটর ফিরে এল যে, তবে বোধ হয় বৃষ্টির জন্যে এল না।"

তড়িৎ বিস্মিতভাবে বলিল, "কে আস্‌বে দিদি?"

সুজাতা বলিলেন, "উমা তোর অসুখের কথা আমার চিঠিতে জেনেছে। একদিন তোকে দেখতে আস্‌বার জন্য সে প্রায়ই খবর দিচ্ছিল, তা' এ পর্য্যন্ত তাকে আনা হয়নি। তাই আজ আন্‌তে পাঠিয়েছিলুম। যে বৃষ্টি, কি করে আর আস্‌বে!" এমন সময় জগুয়া আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, যাঁকে আন্‌তে পাঠিয়েছিলেন, তিনি এসেছেন।"

"এসেছেন? আমিত ভেবেছিলুম, বৃষ্টির জন্য আনতে পার্‌বে না।" বলিতে বলিতে সুজাতা ত্রস্তে ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন।

তড়িৎ একখানা মাসিক পত্র লইয়া পাতা উল্‌টাইয়া কোন খান্‌টায় পড়িবে, তাহাই বাছিতে লাগিল। কিন্তু পড়ার দিকে কি তাহার মন ছিল? উমা আসিয়াছে শুনিয়া তাহার অন্তরতলে যে স্পন্দন তরঙ্গ উঠিতেছিল তাহা কি আনন্দের দ্যোতক? সে তাহার কে?

সে আসিয়াছে শুনিয়া তাহার মন এমন হইয়া গেল কেন ? নারায়ণপুর হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় একটী দিনের কথা অকস্মাৎ তড়িতের মানস নয়নে ভাসিয়া উঠিল। দাসদাসী সঙ্গে দিয়া সুজাতা উমাকে তড়িতের সহিত কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তখন রাত্রির শেষ জ্যোৎস্না নদীর উপর ঢালিয়া দিয়া চাঁদ বিদায় লইতেছিল, শুকতারা তখন খুব জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছিল। ভরানদীর মধ্য দিয়া বজরা চলিতেছে, জানালার ধারে উমা তন্ময় হইয়া আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল, আর কক্ষান্তরে বসিয়া গোপনে তড়িৎ উমার মুখখানার প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়াছিল। স্তিমিত জ্যোৎস্না লেখার সহিত এই তরুণীর ম্লান আননের সাদৃশ্য তাহাকে কি বিচলিত করিয়াছিল ? উমা উদাস নয়ন আকাশের দিক হইতে ফিরাইতেই তড়িতের মোহ যেন ভাঙ্গিয়া গেল। সে নিজের কাছে নিজেই যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল। ছিঃ! একি ? আজ তাহার একি প্রবৃত্তি! চিরদিন যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার গর্ব্ব তাহার মনকে সকল প্রকার দুর্ব্বল চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিয়াছিল আজ অকস্মাৎ তাহা কোথায় গেল ? অন্য নারীর প্রতি গোপনে দৃষ্টি করিবার দুর্ব্বলতা তাহার মনে কোথা হইতে আসিল ? এ অবৈধ প্রবৃত্তি কেন ? তড়িৎ মনকে অনেক ধিক্কার দিল; কিন্তু কিছুতেই উমার মুখের স্মৃতি তাহার মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিল না।

কলিকাতায় আসিবার পর নির্জ্জন অবকাশে উমার সেই সুগৌর মুখের স্মৃতি শতবার তাহার হৃদয়ের মাঝে ভাসিয়া উঠিয়াছে। আজও বোধ হয় সেই স্মৃতি অকস্মাৎ তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া দিল। মাসিক পত্রখানার মধ্যে একটা জায়গাও কি তাহার পড়িবার মত বলিয়া বোধ হইল না! একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে মাসিক পত্রখানা বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া সে বৃষ্টিধারার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন সন্ধ্যার বিলম্ব থাকিলেও বাদল মেঘে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

জগুয়া ইলেক্‌ট্রিক সুইজ টিপিয়া ঘরটী আলোকিত করিয়া ফেলিল। তড়িৎ একটু বিরক্তভাবে বলিল, "আলো জ্বালিস্‌নি জগু ?"

"দিদিমণিরা এসেছেন যে!"

তড়িৎ মুক্ত দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল সুজাতা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পশ্চাতে ওকে ? —তড়িৎ শয্যার উপর একটু চঞ্চলভাবে নড়িয়া বসিল।

উমার মাথায় অবগুণ্ঠন সত্ত্বেও তাহার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সে মাটীতে মাথা নত করিয়া তড়িতের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুজাতা তড়িতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন আছিস্ উমা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছে।"

তড়িৎ একটু হাসিয়া সুজাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "অসুখ ত সেরে গেছে, এখন বল পেলেই হয়।"

কক্ষ নিস্তব্ধ—কয়েক মুহূর্ত্ত কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সহসা তড়িৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "ওঁকে নিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে গল্প করগে, দিদি। কেন লজ্জার মধ্যে আড়ষ্ট ক'রে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছ ?"

"তা' সত্যি তড়িৎ। উমা আড়ষ্ট হ'য়ে র'য়েছেই বটে। তুই তবে একখানা বই পড়" বলিয়াই সুজাতা উমার হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন।

উমা সুজাতার একান্ত অনুরোধে কয়দিন তড়িতের বাড়ীতেই আছে। প্রথম দুইদিন উমা বেশ আনন্দের সহিত সুজাতার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ আজ সকাল হইতেই উমার মুখখানা কেমন বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর উমা সুজাতাকে বলিল, "দিদি আজ আমায় পাঠিয়ে দাও।"

সুজাতা সবিস্ময়ে বলিলেন "সে কি উমা! আমি ত আর বেশীদিন এখানে নেই; আর দশ বারদিন মোটে আছি বইত নয়! এ ক'টা দিন ত তোকে থাক্‌তেই হবে; গুরুদেবও মত দিয়েছেন। তবে আর কি বাধা আছে ?"

উমা বলিল, "না দিদি, তোমাদের এ যত্ন ভালবাসার ঋণ আর আমি বাড়াতে পারবনা। অনেক দেনাই যে ক'রে ফেল্‌লুম! আমার এ জীবন দিয়েও তা শোধ ক'র্‌তে পারব না। দিদি! হতভাগিনী আমি আমার এ পোড়া অদৃষ্টের সঙ্গে কারও সংস্রব না থাকাই ভাল। আমার হাওয়া তোমাদের গায়ে না লাগাই মঙ্গল।" উমার আয়ত নয়নযুগল হইতে শ্রাবণের ধারা নামিয়া আসিল।

সুজাতা এই তরুণীর কথা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ব্যথিতস্বরে বলিলেন, "উমা তোকে বড় আপনার বলে মনে হয়, তাই তোর সঙ্গ আমার এত ভাল লাগে। দেনা পাওনা কি ভাই! তুই যে আমার বো'নের অভাব পূরণ ক'রেছিস্। আমি ত মনে করি আমিই তোর কাছে ঋণী। আপন ব'লে মনে করিস্‌নে, তাই এসব কথা ব'ল্‌ছিস। তোর যে কি দুঃখ, তাত বুঝতেই পারলুম না যে একটু সহানুভূতিও ক'রে নিজে শান্তি পাই।"

উমা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দিদি, তুমি যে আমার বড় আপনার। কিন্তু—কিন্তু এ পোড়া অদৃষ্টের কোন কথাই আমি এখন ব'ল্‌তে পারব না। দিদি তোমাদের কাছে আমি থাকৃতে পারব না, না—না, সে হতেই পারে না! আমাকে যেতেই হবে।"

উমা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করিলেন। তাহার বক্ষোদেশ ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল।

সুজাতা এই বিচিত্রা নারীর অন্তরের গোপন ব্যথার কোনও হেতু বুঝিতে পারিলেন না বলিয়া উত্তরোত্তর বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু সে যখন তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগে দৃঢ়-

প্রতিভা তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে তাহার গুরুদেবের গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য মোটর ডাকিয়া দিতে বলিলেন।

শ্রাবণের মেঘমেদুর আকাশ সেদিন বেশ পরিষ্কার ছিল। অস্তগামী সূর্য্যের সোনালি আভায় তড়িতের ঘরখানা যেন হাসিতেছিল। তড়িৎ একটা ইজি চেয়ারে চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল।

"তড়িৎ!"

হঠাৎ সুজাতার ডাকে তড়িৎ নিজেকে যেন মহাসুপ্তিঘোর হইতে টানিয়া তুলিয়া বলিল, "কেন দিদি?"

"উমা চলে যাচ্ছে; সে দেখা ক'রতে এসেছে।"

তড়িৎ বিস্ময়ধ্বনিতে বলিয়া উঠিল, "চ'লে যাচ্ছেন!—কেন?" সঙ্গে সঙ্গে তাহার কৌতূহলী নেত্র সম্মুখের দ্বারের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল!

ঈষৎ নমিত ঘোমটার ভিতর সূর্য্যের সোনার আলো উমার সুন্দর মুখে লুণ্ঠিত হইতেছিল। সে মুগ্ধভাবে আলোকছায়া চিত্রিত আনত আননে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়াই নয়ন যুগল ফিরাইয়া লইল।

সুজাতা মৃদুহাস্যে বলিলেন, "কেন আবার কি? ওকি তোর বাড়ীতে থাক্‌তে এসেছে, না, ওর ওপর আমাদের কোন জোর আছে যে তাই দিয়ে আট্‌কে রাখ্‌ব?"

তড়িৎ খোলা জানালার দিকে চাহিয়া বলিল, "এই যে আর দিনকতক থাকবেন ব'লেছিলেন?"

"হ্যাঁ, ব'লেছিল। কিন্তু ওর মন খারাপ হ'য়েছে, তাই চলে যাচ্ছে।"

তড়িৎ আর কোন কথা বলিল না। উমা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

(৪)

উমা চলিয়া যাওয়ার মাস তিনেক পরে দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে সুজাতা একদিন কালী-ঘাটে কালী দর্শন করিতে গিয়া নকুলেশ্বরের গলির মধ্যে উমার গুরুদেবের বাড়ীর সম্মুখে মোটর দাঁড় করাইয়া দাসীকে উমার সন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। একটু পরে 'শ্যামার মা' ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, তাঁহারা এবাড়ী হইতে উঠিয়া গিয়াছেন।

সুজাতা সেদিন ফিরিয়া গেলেন। উমার গুরুদেব কোথায় বাসা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন সে সংবাদ জানিবার জন্য পরে তিনি অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাহাদের কোন সংবাদ মিলিল না। সুজাতা পল্লীগৃহে ফিরিয়া গেলেন।

গৃহস্থালীর সহস্র কর্ম্মের অবকাশে উমার চিন্তা সুজাতার চিত্তকে অধিকার করিয়া

রহিল। দুই মাসের মধ্যে উমা তাঁহাকে আর চিঠি লিখিলনা কেন? তাহার আকস্মিক আত্মগোপনের অর্থ কি? উমার মনের দুঃখ কি? কেন সে তাঁহাদিগকে এড়াইয়া চলিয়াছে? সুজাতার কাছে উমা সত্যই যেন একটা প্রহেলিকার মত। উমা কেন তাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নয়? তবে,—তবে কি সে—? সুজাতার মনে বহুদিনের পুরাতন একটা স্মৃতি মনে পড়িল। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস সেই মমতাময়ী নারীর হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া বাহির হইল।

সেদিন অপরাহ্নে, গৃহকর্ম্মের অবকাশে সুজাতা জানালার ধারে একা বসিয়াছিলেন; অস্তগামী সূর্য্যালোক, নদীর বুকে খেলা করিতেছিল। আনমনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে উমার কথা সুজাতার আজ কেবলই মনে প'ড়িতে লাগিল,—তাহার সেই করুণ ছল ছল নেত্র,—মধুর সলজ্জ ব্যবহার;—উমাকে দেখিলেই যেন তাহাকে কোলে টানিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাস্তবিক কি অজ্ঞাত দুঃখের আবর্ত্তে পড়িয়া তাহার জীবন-তরণী বিপন্ন, তাহাত জানিবার উপায় নাই! স্বামি-সৌভাগ্য হইতে এই তরুণী বঞ্চিতা, তাহা সুজাতা আভাসে বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার হেতু কি, তাহা ত উমা প্রকাশ করে নাই। সহৃদয়া নারীর হৃদয় উমার অবস্থা কল্পনা করিয়া ব্যথায় ভারী হইয়া উঠিল। নয়নযুগল বাষ্পভারে আচ্ছন্ন হইল।

"মা"

সুজাতা এতক্ষণ আপনা-বিস্মৃত-ভাবেই ছিলেন। ছেলের আহ্বানে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন সতু?"

"খাবার খাব।"

ছেলেকে কোলে লইয়া তাহার গোলাপী গণ্ডে গভীর আবেগে একটী চুম্বন করিয়া তিনি বলিলেন, "চল।"

(৫)

দুইবৎসর পরে শীতের সকাল। এমন প্রবল শীত যে সকালে উঠা দায়। উমার গুরুদেবের গৃহিণী প্রভাতে উঠিয়া বকিতে বকিতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন। পুত্র সুধীর তখন প্রাতর্ভ্রমণের জন্য বাহিরে যাইতেছিল; মা'র বকুনিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত সকালে রান্নাঘরে কেন মা?"

"কর্ত্তার হুকুম।"

"কর্ত্তার হুকুম ত বুঝলুম, কিন্তু কেন?"

"যত সব পরের ভেজাল, মরতে ত হবে আমাকেই —"

সুধীর বাধাদিয়া একটু বিরক্তভাবে বলিল, "কি, শুনিই না সকালবেলা অনর্থক বকাবকি কচ্ছ কেন?"

"কি হবে তা' শুনে?"

সুধীর তাহার মাকে চিনিত। সে স্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া নরম সুরে বলিল, "বল না মা!"

মাতা ছেলের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এত বড় কাণ্ড হবে, তুই জানিস্‌নি? এ রান্না আজ শুধু আমি একা রাঁধলে হবেনা। ঠাকুরঝি, তোর খুড়িমা সবই মিলে আজ রান্নাঘরে উদয় অস্ত কাটাব যে। একি সামান্যি লোক খাবে যে আমি একা পারব? এক শ জনের ওপর সব খাবে শুন্‌ছি।"

সুধীর বিস্মিত হইল। আজ গৃহে এমন কি উৎসব যে এরূপ বিপুল আয়োজন?

সে জিজ্ঞাসা করিল, "এত লোক কিসের জন্য খাবে মা?"

"উমা যে আজ সন্ন্যাস নিচ্ছে। তাই কর্ত্তার যত সব গুরু-ভাইরা খাবে। তারপরে হাতজোড় করিয়া গুরুদেবের উদ্দেশ্যে একটী প্রণাম করিয়া বলিলেন, "গুরুদেবও খাবেন।"

সুধীর একটু আশ্চর্য্যের সঙ্গে বলিল, "উমা সন্ন্যাস নিচ্ছে কেন?

"তার একান্ত ইচ্ছা হ'য়েছে সন্ন্যাস নেবার, তা আমরা বাধা দেব কেন বাপু? এ ত ভাল কাজ।"

সুধীর একটা "হু" বলিয়া অন্যমনস্কভাবে বাহিরে গেল।

উমা আজ স্বেচ্ছায় যৌবনে যোগিনী সাজিয়াও মনে তৃপ্তি পাইতেছিল না। হৃদয়ের কোথায় যেন একটা ব্যথা রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতাকে সে তখনই জোর করিয়া মন হইতে সরাইয়া দিল। গুরুদেব যখন তাহাকে সন্ন্যাসে অভিষেক করিতেছিলেন, তখন উমা নীরবে সমস্ত মন প্রাণ দিয়া ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া সে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় জীবন ঢালিয়া দিবে, কেমন করিয়া ব্যথিতের ব্যথা দূর করিবার জন্য সে আত্মোৎসর্গ করিবে; কেমন করিয়া নিজের সকল স্মৃতি ভুলিয়া সৎসঙ্গে থাকিয়া নিজকে নূতন জীবনে গড়িয়া তুলিবে। তাহার এ তুচ্ছ নারী-জীবনে কি সে কিছুই করিতে পারিবে না?

উমার গুরুদেবের গুরু বৃদ্ধ বিশ্বানন্দ স্নেহ-পরিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "মা! মনের সব মালিন্য আজ এই হোমের আগুনে আহুতি দাও। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, এই পরম শুদ্ধ পাবকের মত তুমি শুদ্ধ তেজস্বিনী হও।" তারপর তাঁহাদের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, "ওঁ ব্রহ্মং সত্যং।" উপস্থিত সকলেরই মুখে সেই "ওঁ ব্রহ্মং সত্যং" ধ্বনিত হইতে লাগিল। উমার মনে হইল, হোমের শিখাও যেন দুলিয়া দুলিয়া বলিতেছে "ওঁ ব্রহ্মং

সত্যং।” উমার মুখ হইতেও উচ্চারিত হইল, “ওঁ ব্রহ্মং সত্যং।” আর সেই সঙ্গে শান্তির অনাবিল প্রবাহ ধারা যেন তাহার হৃদয়ের দুই কূল প্লাবিত করিয়া দিল।

তিনদিন পরে উমা বিশ্বানন্দের সঙ্গে তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করিল। যাইবার সময় গুরুমার চরণে প্রণাম করিয়া বলিল, “মা আমি যে কাজ নিয়েছি, তা যেন সফল ক’রে তুল্‌তে পারি।”

গুরুমা তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, “লক্ষ্মী মেয়ে তুমি মা। তোমার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হবে।”

উমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি সে অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত বলিল, “আমার মাকে আমার মনে নেই, আপনিই আমার মা। যদি সফল হয়, সে আপনারই আশীর্ব্বাদে হবে মা।” পুনরায় গুরুমার পদধূলি সে মাথায় তুলিয়া লইল।

গুরুমার নয়নও শুষ্ক রহিল না। উমা চলিয়া গেলে, তিনি আপন মনেই বকিতে লাগিলেন, “আহা, মেয়েটা বড় ভাল, কিন্তু কপালটা একেবারে ছাইপোড়া, তা হবে কি। আহা বাছা এই বয়সে সন্ন্যাসিনী হ’লো সে কি আর সাধ ক’রে? পির্‌তিমের মত রূপ বৃথাই ওর! সোয়ামী একবার চোকেও দেখ্‌লে না। কিন্তু যাই বল, ও মেয়ে বটে! এই ঘর ছেড়ে কখনও গঙ্গা নাইতে পর্য্যন্ত যায়নি, পাছে কেউ কোন কথা বলে। বড় ভাল, বড় ভাল।” বলিতে বলিতে গৃহিণী বসনাঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া কার্য্যান্তরে গেলেন।

(৬)

“বাবা, তোমার সঙ্গে আমি বেড়াতে যাব।”

তড়িৎ ছেলের কথায় উত্তর দিয়া বলিল, “আমার সঙ্গে তুমি কোথায় বেড়াতে যাবে?”

“তুমি যেখানে বেড়াতে যাবে, সেই পাহাড়ের দেশে।”

“তুমি আমার সঙ্গে একা যেতে পার্‌বে?”

“কেন? মা, খুকু, আমি, তুমি।”

তড়িৎ সহাস্যে ছেলের গাল দুইটি টিপিয়া দিল।

নীলিমা একখানি খাবারের ডিস্ লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে একজন পরিচারক চায়ের ট্রে লইয়া আসিল। তড়িৎ নীলিমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, “মণ্টু কি ব’ল্‌ছে শুনেছ?”

“কি?” নীলিমা স্বামীর দিকে চাহিল।

“ও আমার সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে যাবে।”

“অন্যায় আর কি ব’লেছে?”

“একা নয়, ওর যতগুলি আপন আছে সব শুদ্ধ।”

"এটা অন্যায় বটে। তোমার মত একা বেড়ানই যে উচিত, সেটা কেন ও বোঝেনি?"

তড়িৎ এবার জোরে হাস্য করিয়া বলিল, "এ কথা তোমার বলা উচিত হ'লো না, কিন্তু।"

"আচ্ছা চা টা খেয়ে ফেল, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। তারপর কি উচিত, কি অনুচিত বিচার ক'র্‌বো।"

"নীলিমা, এত বড় অপবাদটা আমায় তুমি কিছুতেই দিতে পার না। কোন্ দেশটা তুমি দেখনি বলত?"

"আমি কি তাই বল্‌ছি। দেশ আমি অনেকই দেখেছি। কিন্তু মন্টু হওয়ার পর তোমার সঙ্গে কি আমায় আর নিয়ে গিয়েছ?" অভিমানের একটা নিশ্বাস ফোঁস্ করিয়া বাহির হইয়া তাহার দুঃখটা প্রকাশ করিল।

"নীলু, এরাগ তোমার করা উচিত নয়। ছেলে মানুষদের নিয়ে যেখানে-সেখানে ত সব সময় ঘুরে বেড়ান যায় না, তাই এই দুবার ত মোটে তোমায় নিয়ে যাইনি। আর এবারও অতটুকু ছোট খুকুকে নিয়ে কেমন ক'রে যাওয়া যায় বল দেখি?"

অভিমানের স্বরে নীলিমা বলিল, "এ ছুটীটা নয় এখানেই রইলে। এমনি ত তোমার মক্কেলের চোটে দেখা পাওয়া ভার। সময় হয় না যে, দুটো কথা কি গল্প তোমার সঙ্গে ব'সে করি। এবার নয় আমার কাছেই তোমার ছুটীটা শেষ হ'ক্।"

"নীলু, রাগ ক'রো না। দিদি আমার সঙ্গে শিমলা যাবেন বলে ঠিক ক'রেছেন যে।"

"তবে আর কি বলব?"

"না, না। তুমি বুঝে দেখ এখন কি ব'লে আমি যাব না বলি।"

"এর উপর ত আমার আর কথা চলে না।"

"ছেলে মানুষের মত ক'র্‌লে ত তোমার সাজে না নীলা।"

"না, সত্যি আমি রাগ ক'রে বল্‌ছিনা, দিদির কথা আমার মনে ছিলনা।"

স্ত্রীর মুখের দিকে আবেগভরে চাহিয়া আবেগভরা কণ্ঠে তড়িৎ বলিল, "সত্যি তোমার মনে কোন কষ্ট লাগেনি? বল।"

"ওগো, না গো না। তুমি যে দেখি ছেলেমানুষেরও বাড়া।"

"না নীলা, তুমি মনে কষ্ট পাবে, তা যে আমি সইতে পারি না।"

"নাও, খাবারগুলো খাও দেখি।" বলিয়া নীলিমা হাঁসের ডিমের কচুরীটা স্বামীর হাতে তুলিয়া দিল।

এমন সময় একখানা মোটর হর্ণ দিয়া গাড়ী-বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। নীলিমা "কার মোটর" বলিয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। একটু পরেই সুজাতা ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিলেন, "বেশ লোক তুই তড়িৎ। যাবি কিনা একটা খবর আমায় এই পাঁচ

দিনের মধ্যে দিলিনি। সোমবারে যাওয়া ঠিক ক'রে এলি, অথচ আজ রবিবার চ'লে যায়, তবুও কোন খবর না পেয়ে আমাকে তোর কাছে জান্‌বার জন্যে ছুটে আস্‌তে হ'ল যে ঠিক যাওয়া হবে কি না।"

তড়িৎ একটু লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিল, "খবর যে তোমায় দিতে হবে তাত আমার মোটেই মনে হয়নি দিদি; কেননা, সেই দিনই ত সব ঠিক্ ক'রে এসেছি যে, যাওয়া নিশ্চিতই।"

"বেশ এই রকম না মনে হওয়াই খুব ভাল। একি আর তোরা যাবি যে, অমনি শুধু হাত পায়ে গিয়ে উঠলেই হ'লো! আমার সতুকে তার পিসির কাছে পাঠাতে হবে, তারপর সংসারের সব গুছিয়ে দিয়ে যেতে হবে। তবে ত? যাক্, তুই কি আমার ওখানে গিয়ে আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবি? না, একেবারে ষ্টেশনে যাবি?"

"একেবারে ষ্টেশনে যাব।"

"তা হ'লে এই ঠিক্ রইল, আমি এখনই চল্‌লুম।"

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীআভাময়ী রায় চৌধুরাণী

রম্ভা

[চিল্কাতটে]

(১)

এই কি সে অফুরন্ত বসন্ত যৌবনা
নন্দন-নাগরী রম্ভা রুচির-নর্ত্তনা
শ্রান্ত নেত্রে ইন্দ্রপুরী করি পরিহার
বিরলে বিরাম লাগি আমি একাকিনী
বসিল চিল্কার তটে খুলি কেশভার
আনমনে? কি ভাবিয়া বুঝি সে ভামিনী
ক্ষুদ্র দুটি পদ-পুট অমর-বাঞ্ছিত
নিমজ্জিল নীল নীরে। সে চরণ ঘিরি
নাচিতে লাগিল উর্ম্মি পরশন-স্ফীত
অনুকরি লাস্য তার। ফোটে ধীরি ধীরি
সে রক্তিম গণ্ডরুচি উষার কপোলে;
বিরলে অলস বায়ু অজ্ঞাতে বালার
উড়ায় উরস-বাস; স্বচ্ছ চিল্কা জলে
বিম্বিত হইল তুঙ্গ পয়োধর তার।

(২)

একদা গগন-পথে বিকচ যৌবনা
মন্দার-মালিকা গলে মদির ঈক্ষণা
চলিয়াছে অভিসারে অপ্সর-অঙ্গনা
চারু রম্ভা। তনু-গন্ধ বহিয়া পবন
মাতোয়ারা; পদে পদে স্খলিছে চরণ
কণ্টকী তারকাদামে, কুন্তল ভূষণ
গতি-ভরে খসি পড়ে; উড়ে বক্ষ-বাস
নগন মাধুরী তার করি পরকাশ,
ভাব ভরে আলু থালু কাঁপে বেশবাস
শূন্য-পথে। পদ-নিম্নে সুনীল-বসনা
বিরলে বহিতেছিল শৈল-সুশোভনা
স্বচ্ছ-কায় চিল্কা-বাপী মন্থর-চরণা;
প্রতিবিম্ব পড়ি বুকে অভিসারিকার
চিল্কারে করিল হেন মাধুরী-সম্ভার।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

তিলক চরিত

চতুর্থ অধ্যায়

New English School স্থাপন।

তিলক কখন ঠিক করেন যে মুন্সেফি কিম্বা ওকালতি করিবেন না তাহা বলা কঠিন। বোধ হয় এল, এল, বি পড়িবার সময়ই তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে আইন ব্যবসায়ের সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন করিবেন না। এখন মহাত্মা গান্ধি যে-কারণে বিচারালয় বয়কট করিয়াছেন, এতদিন পূর্ব্বে তিলক নিশ্চয়ই সেই কারণে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন নাই। এক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে আদালতে মামলা করিয়াই তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়াছে; সে মামলা নিজের হউক বা পরেরই হউক। শালিসি সভা যে তিনি না মানিতেন তাহা নহে। যেখানে সম্ভব তিনি শালিসের দ্বারা বিবাদ মিটাইতে প্রস্তুত ছিলেন এবং অপরকেও সেইরূপ পরামর্শ দিতেন। কিন্তু যেখানে অন্য পক্ষ শালিসি মানিবে না সেখানে ন্যায্য দাবী পরিত্যাগ করিয়া নাহক লোকসান ভোগ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু মামলা মোকদ্দমায় আইনের বিদ্যা বিক্রয় করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করা তিনি বড় ছোট কাজ মনে করিতেন। এই জন্যই এল, এল, বি, পাশ করিয়াও তিনি কোন দিন ওকালতি করেন নাই। ব্যবহার শাস্ত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি কিন্তু চিরকালই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। কেহ সংবাদপত্রের ব্যবসায় করিয়া রাজনীতি চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে চাহিলে, তিনি তাহাকে পরামর্শ দিতেন এম, এ অপেক্ষাও এল, এল, বি পড়া তোমার বেশী দরকার। তিলকের পূর্ব্বে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী ছাত্রও এল, এল, বি পাশ করিয়া স্কুল মাষ্টারের কাজ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। প্রথম হইতেই তিলকের মত ছিল যে সুশিক্ষিত লোকদের বিশেষ করিয়া সমাজ সেবা করা উচিত। আর তিনি যদি মনে করিয়া থাকেন যে ওকালতি অপেক্ষা শিক্ষকের কার্য্য সমাজ-সেবার অধিক উপযোগী তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। দুইটী উপায়ে সমাজ সেবা করা যায়। ১। বৃদ্ধদিগকে উপদেশ দিয়া। ২। বালক দিগকে শিক্ষা দিয়া। বৃদ্ধদিগকে উপদেশ দিবার চেষ্টা নিষ্ফল, কারণ নূতন পথে চলিবার শক্তি তাহাদের থাকে না। এই জন্যই যাহারা নবযুগের প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন তাহারা নির্ভর করেন তরুণ বালকদিগের উপর। পৃথিবীর প্রায় সকল নবধর্ম্ম-সংস্থাপকই তরুণদিগের দ্বারা আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। আবার সুশিক্ষিত তরুণেরা নিজ নিজ স্কুল কলেজগুলিকে যেমন ভালবাসে অন্য কোন অনুষ্ঠানের প্রতি তাহারা সেরূপ আকৃষ্ট হয় না। আগেই বা কি, আর এখনই বা কি, সুশিক্ষিত সমাজে উকিল অপেক্ষা প্রফেসরের সম্মান বেশী। এই জন্যই বোধ হয় তিলক স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি একটী শিক্ষা-পরিষদ স্থাপন করিয়া লোকসেবায় প্রবৃত্ত হইবেন।

বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বে সেকালের শিক্ষকদিগের সম্বন্ধে তিলকের কি ধারণা ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু যাহার নিকট তিলক অংশত উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন এবং বিদ্যালয় স্থাপন ব্যাপারে যে মহামান্য ব্যক্তি তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন সেই বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপ্লুনকার পালা পত্র নামক মাসিক পত্রিকায় ১৮৭২ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় লিখিয়াছেন—লোকের ধারণা যে এখন বিদ্যার প্রসার হইয়াছে, বিদ্যাভিরুচি বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহা ভুল। এখন লোকে পড়াশুনা করে কেবল সরকারি চাকুরির লোভে। বিদ্যাব্যসন ত দূরের কথা সাধারণ বিদ্যানুরাগও তাহাদের নাই, Universityর গাউন খুলিয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা স্বদেশ-প্রেম, বিদ্যাভিরুচি, দুর্জ্জন তিরস্কার প্রভৃতি মানসিক অলঙ্কারগুলিও একেবারে খুলিয়া ফেলে। শিক্ষকেরা নিজেরাই যখন আপনাদিগের ব্যবসায়ের মহত্ব বুঝিতে পারেন না তখন অন্যে তাহা কিরূপে বুঝিবে, গত্যন্তর নাই বলিয়াই ইহারা শিক্ষা ব্যবসা অবলম্বন করেন। আগে শিষ্যের মনে যে গুরুভক্তি ছিল এখন আর তাহা নাই। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কেবল স্বার্থের। শিক্ষার বিষয়ও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সরকারি ব্যবস্থায় ধর্ম্ম বা নীতির সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু এ অবস্থায়ও যদি ছাত্রের মনে শিক্ষক বিদ্যানুরাগ জন্মাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে সে শিক্ষা দুর্ব্বল ও ক্ষণভঙ্গুর না হইয়া তরবারির লোহার মতই কঠিন ও সুতীক্ষ্ণ হইবে, এবং এতকাল যে অনিষ্টরূপী রাক্ষস এই দেশ জয় করিয়াছে তাহার লাঞ্ছনা করিবে, এবং সুশিক্ষিত লোক এবং তাহাদের শিক্ষকদের বিদ্যার যশ সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে পেরিক্লিস্, এলকিবাইডিস্, সেকেন্দর প্রভৃতি মহাপুরুষেরা যে অমন করিয়া দেশসেবা করিতে পারিয়াছিলেন কেবল গুরু-দত্ত শিক্ষার জন্য। তাহার বিশ্বাস ছিল যে মহারাষ্ট্রের ভাবী বংশধরদিগকে ঐরূপ দেশসেবায় তৎপর করিতে হইলে উত্তম শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে।

বিষ্ণু শাস্ত্রী ও তিলকের বিচার প্রণালী যদি অভিন্ন হয় তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। কারণ এই দুই জনের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে প্রকৃতিগত প্রভেদ থাকিলেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁহাদের বিচার প্রণালীর ঐক্য দেখা যায়। নিবন্ধ মালার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের তখন খুব নাম হইয়াছিল এবং তরুণ ছাত্রদিগের মধ্যে তাঁহার বিশেষ আদর হইয়াছিল। পুণার লোকেরা শুনিয়াছিল যে তিনি সরকারি চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া স্কুল চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু একটিমাত্র লোক একটা স্কুল চালাইতে পারেনা। হয় তাহাকে কোন পুরাতন স্কুলে যোগদান করিতে হয়, নতুবা নতুন স্কুল চালাইবার যোগ্য সহকারী সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। প্রথম কাজটী অবশ্য সহজ; পুণায় বেসরকারী স্কুলের কখনও অভাব ছিলনা। শাস্ত্রী মহাশয় পুণায় আসিবার পূর্ব্বে সেখানে ২টী বেসরকারি ইংরেজী স্কুল চলিতেছিল। ইহার মধ্যে একটী সুপ্রসিদ্ধ বাবা গোখ্‌লে স্কুল। এই ভদ্রলোক উকিল হইবার পূর্ব্বে স্কুল মাষ্টার ছিলেন এবং ভাল ইংরেজী জানেন

বলিয়া তাহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। সেকালে মিশনারিস্কুলের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলিয়া বাবা গোখেলের বেশ নাম ছিল। বিষ্ণু শাস্ত্রী সেখানে কিছুদিন শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ওকালতি ব্যবসায় উন্নতি হওয়াতে ১৮৭৬ সালে বাবা গোখলে তাঁহার স্কুলটী বন্ধ করিয়া দেন। এই স্কুলটী পুনরুজ্জীবিত করিলে শাস্ত্রী মহাশয় একটী পুরাতন বিদ্যালয় চালাইবার যশোলাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু এ বিষয় চিন্তা করিবার পূর্ব্বে অপর একটী বেসরকারি স্কুলের পরিচালক শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আপনার স্কুলে যোগদান করিতে অনুরোধ করিলেন। এই স্কুলের নাম The Poona Native Institution। ইহার পরিচালক বামন প্রভাকর ভাবে—তেমন ভাল শিক্ষক ছিলেন না। কিন্তু নেটীব, ইয়োরোপীয়ান, মিশনারি, সেনা নায়ক বা কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি তাহাদিগকে স্কুল দেখিতে অনুরোধ করিতেন এবং তাহাদের অনুনয় বিনয় করিয়া স্কুল সম্বন্ধে ভাল মন্তব্য লিখাইয়া লইতেন। এইরূপ লোকের সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের মত স্বাধীন প্রকৃতির লোকের একত্র কাজ করা অসম্ভব ছিল।

শাস্ত্রী মহাশয় সরকারি চাকুরি ছাড়িয়া পুণায় আসিবার পূর্ব্বেই তিলক ও আগরকার দেশের কাজে—বিশেষতঃ শিক্ষা কার্য্যে—আত্মনিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় নতুন ইংরেজী স্কুল খুলিবেন এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্রই তাঁহারা দুইজনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাদের ইচ্ছা জানাইলেন। তিলক ও আগরকারের সহিত ভাগবত ও করণদিকর নামক আরও দুইজন তরুণ বিদ্যার্থী এই শুভসঙ্কল্পে যোগদান করিয়াছিলেন, বালাজী আবাজী ভাগবত পরে হাইকোর্টের উকিল হইয়াছিলেন এবং বহুদিন ইন্দোর রাজ্যে বিচার বিভাগে কাজ করিয়া এখন পেন্সন ভোগ করিতেছেন, কলেজে তাঁহার অন্যতম অধিতব্য বিষয় ছিল ইতিহাস। ব্যাঙ্কটেস্ বালাজী করন্দিকর বি-এ পাশ করিয়া গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন, পরে এল, এম, এস্ পাশ করিয়া সরকারী চিকিৎসা বিভাগে এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এক রাত্রিতে যখন তিলক ও আগরকার শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত তাঁহার নারায়ণ-পেঠের বাড়ীতে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন—এবং তাঁহাকে আপনাদের সঙ্কল্প জানাইলেন তখন তিনি স্বভাবতঃই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। কারণ নতুন শিক্ষক লইয়া নতুন স্কুল খোলাই তিনি অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ রাওকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার সে সুখবর জানাইয়াছিলেন। "The memorable 1st of October is approaching.. I shall enjoy the pleasure of kicking off my change that day. Mr. Agarkar (going for M. A.), Mr. Tilak, (going for L. L. B), Mr. Bhagabat and Karndikar (appearing for B. A.) have tendered proposals for joining

me in the enterprise. This they have done of their own accord. We have settled 1st of January for hoisting of the standard. Such a battery must carry the High School instantaneously before it.

স্কুল খুলিবার কথা ছিল ১লা জানুয়ারী কিন্তু কার্য্যতঃ খোলা হইয়াছিল ২রা তারিখে, সে দিন উপরিলিখিত গোলন্দাজদিগের মধ্যে মাত্র দুইজন উপস্থিত ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় ও তিলকের উপর পড়িল তোপ দাগিবার ভার। কারণ আগরকার এম, এ পরীক্ষায় ফেল হইয়াছিলেন, এক বৎসরের জন্য উপাধি না লইয়া স্কুলে যোগদান করিলে আগরকার অপেক্ষা স্কুলের লোকসানই বেশী। সুতরাং তাহাকে এক বৎসর অপেক্ষা করিবার পরামর্শ দেওয়া হইল। কারন্দিকর ও ভাগবতের উৎসাহ অন্য কেহ নষ্ট করিয়াই থাকুক কিম্বা তাহাদের নিজেদের মত হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াই থাকুক কাজের সময় তাহাদের আর পাওয়া গেল না। কিন্তু তাহাদের জন্য স্কুলের কাজ পড়িয়া থাকে নাই, বরং শীঘ্রই তাহাদের অপেক্ষাও যোগ্যতর লোক স্কুলে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেই যে তোপের গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা পরে আর বন্ধ হয় নাই। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের ইচ্ছানুরূপ সরকারি হাইস্কুলের কেল্লা ভূমিসাৎ হয় নাই। দুই কারণে হাই স্কুলের উপর শাস্ত্রী মহাশয়ের রাগ ছিল। প্রথম কারণ যে তাহা সরকারি বিদ্যালয়। দ্বিতীয় কারণ সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মাধব রাও কুণ্টে। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় যতই গুলি বর্ষণ করুন না কেন, হাইস্কুলের প্রাকারের পশ্চাতে ছিল সরকারি কোষাগারের টাকা, আর সরকারি কৃপাকটাক্ষপ্রার্থী অভিভাবকের দল সেই প্রাকার রক্ষার জন্য বালক সিপাহির শ্রেণী দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল, সুতরাং কেল্লা স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গেলেও, কেল্লার উপরের নিশান পড়িয়া গেলেও, তাহার মূল দরজার বুরুচ খাড়া রহিয়া গেল। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের নূতন স্কুলের অল্পদিনের মধ্যেই এমন সুনাম হইল যে সরকারি হাই-স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা অনেক কমিয়া গেল। রেভারেণ্ড ম্যাকিনন্ লিখিয়াছিলেন যে পুণার এই বিদ্যালয়টী যখন কোন প্রকারের সরকারি সাহায্য না লইয়াই উচ্চ শিক্ষার কাষ এরূপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছে তখন প্রতি বৎসর ১১।১২ হাজার টাকা খরচ করিয়া সরকারি হাই-স্কুল রাখিবার কি প্রয়োজন? কিন্তু সরকারি হাই-স্কুলের খরচ কমা দূরে থাকুক—খরচ ক্রমেই বাড়িয়াই চলিল। ১৮৯০ সালে সরকার বাহাদুর ঠিক করিলেন যে এই স্কুলের জন্য ইয়োরোপীয়ান হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও যখন কোনও সুফল হইল না তখন ১৯১২ সালে স্থির করা হইল যে স্কুলটী সহরের বাহিরে স্থানান্তরিত করিয়া বিলাতের পাবলিক স্কুলের ধরণে অর্থাৎ কেবল বড় মানুষের ছেলেদের জন্য এবং বড় মানুষি চালে চালাইতে হইবে। ইহার জন্য ১০।১৫ লাখ টাকা মঞ্জুরও হইয়াছিল। কিন্তু যায়গার অভাবে, বিগত মহাযুদ্ধজনিত অর্থের অভাবে এবং পরিশেষে শিক্ষা বিভাগের কর্তৃত্ব জনসাধারণের নির্ব্বাচিত মন্ত্রীর হাতে যাওয়াতে ১৯২২ সালের পয়লা মার্চ্চ সরকারি হাই-স্কুল একেবারে উঠিয়া গেল। বিষ্ণু শাস্ত্রীর কামানের গোলা ৪২ বৎসর

পরে রাজনৈতিক আবহাওয়ার উত্তাপে ফাটিয়াছিল। দেখা যাইতেছে গোলন্দাজ অপেক্ষা গোলার আয়ুই বেশী।

স্কুল খুলিয়াছিলেন শাস্ত্রী মহাশয় ও তিলক। কিন্তু তাঁহাদের সহকারী ছিলেন কয়েকজন উদীয়মান তরুণ যুবক। ইঁহাদের নাম, মাধবরাও নামযোশী, বাসুদেব শাস্ত্রী খড়ে, নন্দর্গীকর শাস্ত্রী, হরিকৃষ্ণ দামলে, কৃষ্ণরাও মাণ্ডে ও মুলে। নামযোশী বিশেষ কোনও পরীক্ষা প্রভৃতি পাশ না করিলেও স্বাবলম্বী সম্পাদক ব্যবহারচতুর এবং উদ্যোগী বলিয়া পুণার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত তাহার ধীরে ধীরে পরিচয় হইতেছিল, এবং সকলেই জানেন যে পরে ৫।৬ বৎসরের মধ্যে তিনি জন সমাজে ও সরকার দরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বাসুদেব শাস্ত্রী খড়ে এই সময় কাশীনাথ নারায়ণ সানে ও জনার্দ্দন বালাজী মোডকের সহিত কাব্যেতিহাস সংগ্রহ সম্পাদন করিতেছিলেন, এই সুবিখ্যাত মাসিক পুস্তকের সংস্কৃত ভাগের সম্পাদন-ভার বিশেষভাবে তাঁহার হাতে দেওয়া হইয়াছিল, খড়ে শাস্ত্রী পরে কবি, নাট্যকার ও ঐতিহাসিক বলিয়া মহারাষ্ট্রে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। নন্দর্গীকার শাস্ত্রী বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এই স্কুলে সংস্কৃতের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। কেতাবখানার বন্দোবস্তের ভার লইয়া হরিকৃষ্ণ দামলে স্কুল ছাড়িয়া দেন। তাহার ব্যবস্থায় কেতাবখানার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি কয়েকখানা স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এবং কৃষ্ণ শাস্ত্রী চিপ্লুন কর্ত্তৃক আরব্ধ আরব্য উপন্যাসের মারাঠি অনুবাদ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। রাণডে ১৮৮০ সালের পূর্ব্ব হইতেই শ্রীশিবাজী ছাপাখানা ও ঐ নামের একখানা সংবাদপত্র চালাইতেছিলেন। তাঁহার সংবাদপত্র বা ছাপাখানা একটাও কখনও উন্নতি করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি জনসাধারণের কার্য্যে যথাশক্তি যোগদান করিতেন। নূতন স্কুলের প্রথম শিক্ষকদলের মধ্যে এইরূপ লোকই ছিলেন যাঁহারা জনসাধারণের কায করিতে ভাল বাসিতেন। তিন মাসের মধ্যেই এই স্কুলে ছাত্র সংখ্যা পাঁচ শত হইয়াছিল। সে বৎসর মে মাসে স্কুল ছুটী হইবার সময় শাস্ত্রী মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, আমাদের স্কুলে শিক্ষকদিগের মত ছাত্রদিগকেও পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এখানে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় ছড়ি হাতে করিয়া প্রত্যেক ঘণ্টায় ক্লাস পরিদর্শনে বাহির হন না, সরকারি ইনস্পেক্টর-রূপী জুজু বুড়ির অতর্কিত আগমনের ভয়ে এখানকার শিক্ষকেরা সন্ত্রস্ত হন না। ঘড়ি ও রুটিনের যন্ত্রের চাপে সরকারি স্কুলের শিক্ষকেরা কলের পুতুলে পরিণত হন এবং পেটের দায়ে দানভাবে উপারওয়ালার হুকুম মানিয়া স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করেন। আমাদের বিদ্যালয়ে অনাদিসিদ্ধ বেতের ছড়ি দেখা যাইবে না কিন্তু কোন ছাত্র শৃঙ্খলা অতিক্রম করিলেও তাহাকে ক্ষমা করা হইবে না।

নিউ স্কুল স্থাপনের পর পঞ্চম বৎসরে ডেকান এডুকেশন সোসাইটীর ফর্গুসন কলেজ খোলা হয়। তখন হইতে কলেজের নামই জনসাধারণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুতরাং স্কুলের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য ছিল মোটে এই পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসরে ছাত্র সংখ্যা বিশেষ

বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্কুল খুলিবার দিন মোটে ১৯টী ছাত্র উপস্থিত ছিল, আর ১৮৮৪ সালে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হইয়াছিল এক হাজার নয়। বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও বেশ ভাল ফল হইতেছিল। ১৮৮৪ সালে এই স্কুল হইতে ৮৯ জন পাশ হইয়াছিল; এবং এই জন্য লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি আনন্দ প্রকাশ করিয়া স্কুলের কর্তৃপক্ষগণের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলেন। স্কুলের এমন সুনাম হইয়াছিল যে পুণার ত কথাই নাই, মফস্বল হইতেও অনেক বুদ্ধিমান ছাত্র এই স্কুলে আসিতে লাগিল। একে ভাল ছাত্র তাহাতে আবার বামন রাও আপটের মত পরিশ্রমী শিক্ষক, সুতরাং প্রথম পাঁচবৎসরের মধ্যেই নিউ ইংলিশ স্কুল যেন জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ স্কলার সিপের মৌরসি পাট্টা লইয়া বসিল।

ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়াতে স্কুলের প্রথম যায়গা ছাড়িয়া দিতে হইল। ১৮৮৩ সালের পূর্ব্বেই বিদ্যালয়টী মোরবা দাদার বাড়ী হইতে গদ্রের বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল এবং সেই বাড়ী ক্রয় করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে একখানি বাড়ীতে কুলাইবে না। ভাগ্যক্রমে গদেরের বাড়ীর পাশেই হোলকার সরকারের যে বাড়ীখানি আছে, তাহা স্কুলের কর্তৃপক্ষকে দিবার হুকুম মিলিয়া গেল। দুই বাড়ীতে প্রায় ১৩০০ ছাত্রের স্থান ছিল বলিয়া বিদ্যালয়কে আর দুইটী শাখায় বিভক্ত করিতে হইল না।

বিদ্যালয়ের এই প্রকার সুবিধা লাভের প্রকৃত কারণ পরিচালকগণের কীর্ত্তি। চিপ্লুনকর, আগরকর ও নামযোশী প্রভৃতি অসাধারণ স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাদের সহকারী শিক্ষকগণও ছিলেন যোগ্যতার জন্য বিখ্যাত, ইহাদের মধ্যে নামযোশী, মাধব রাও গোরে, বাসুদেব রাও কেলকর, নারায়ণ রাও ধারপ, যশবন্ত দাগেশ রাণাডে, গোপাল রাও নন্দগাঁকর, নাগপন্ত বাপট, রামভাউ যোশী, হরিভাউ আপ্তেকর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে গোরে, কেলকর, ধারক ও নামযোশী পরে সমিতির আজীবন সভ্য হইয়াছিলেন, এবং নন্দেগাঁকের, বাপ্ট যোশী প্রভৃতি স্থায়ীভাবে শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। শিক্ষকদিগের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু স্বার্থত্যাগের গৌরব কেবল তিলক, আপথে, আগরকর, গোরে ও কেলকর এই পাঁচজনের প্রাপ্য। ইঁহাদের মধ্যেও আবার তিলক ও আগরকরের মত ক্ষতি কেহ স্বীকার করেন নাই। হাইকোর্টের সনদ লাভ করিয়াও তিলক শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের মত প্রথম বৎসর একেবারে বিনা বেতনে বিদ্যালয়ের সেবা করেন। আগরকরও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাওয়ার পরই তাঁহার মাতাকে লিখিয়াছিলেন—"মা হয়ত তুমি আশা করিতেছ তোমার ছেলে বড় বড় পরীক্ষা পাশ করিয়াছে এখন মোটা মাহিনার চাকুরি পাইবে কিন্তু আমি তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি যে ধন সম্পত্তির ও সুখের আশা না করিয়া আমি কেবল পেট চালাইবার মত পয়সায় সন্তুষ্ট হইয়া পরহিতার্থে জীবন নিয়োগ করিব।" আপ্টের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তিনি বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন কতকটা

ভেদে, মনোমত প্রফেসরি কিম্বা এসিষ্ট্যাণ্ট প্রফেসরি পাইলে তিনি সরকারি শিক্ষা বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করিতেন। এম, এ পরীক্ষা পাশ করিয়াই তিনি একটী মিশনারী স্কুলে মাষ্টারি লইয়াছিলেন এবং সরকারী চাকুরির জন্য দস্তুর মত দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তখনকার ডিরেক্টর চ্যাটফিল্ড সাহেব তাহাকে দিলেন কল্যাণে এঙ্গলো ভার্নাকুলের স্কুলে ৭০৲ টাকা মাহিনার এক চাকুরি। আপ্‌টে ইহাতে নিরতিশয় অপমান বোধ করিলেন, তিলক ও নামযোশী তখন তাঁহাকে আপনাদের বিদ্যালয়ে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছিলেন এবং আপ্‌টের মনও স্বার্থ ত্যাগের জন্য অনেকটা প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল। এই সময় তাঁহার শ্বশুর গণেশ বাসুদেব যোশী ওরফে সার্ব্বজনিক কাকা পরলোক গমন করেন; এবং পুণায় থাকা অধিক সুবিধাজনক বিবেচনা করিয়া আপ্‌টে বিদ্যালয়ে যোগদান করিলেন।

নিউ স্কুলের নাম হইবার তৃতীয় কারণ তিলক ও আগরকরের বিরুদ্ধে কেল্‌হাপুরের মামলা এবং চতুর্থ কারণ কেশরী ও মারাঠা সংবাদপত্র। ১৮৭২ সালে মাননীয় রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি তিলকের পিতৃবন্ধু এবং মহারাষ্ট্রীয়, সুতরাং তাহার প্রশংসার মূল্য হয়ত কেহ স্বীকার নাও করিতে পারেন। কিন্তু প্রফেসর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এ দেশের লোক নহেন। প্রথম দুই বৎসরেই বিদ্যালয়টী তাঁহার নিকট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এডুকেশন কমিশনের সভাপতি ডাক্তার হাণ্টার এই স্কুল সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে এরকম বিদ্যালয় সমস্ত হিন্দুস্থানে তিনি আর একটীও দেখেন নাই।

বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপ্লুনকার নিউ স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তথায় অল্প দিনই শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। কেতাব-খানা, চিত্রশালা, কেশরী, ও মারাঠা এবং আর্য্যভূষণ ছাপাখানার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি দিতে হইত। সুতরাং তিনি শেষে স্কুলের দিকে আর আগের মত মনোযোগ করিতে পারিতেন না। নিউ স্কুলের স্থাপনের ২½ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তিলক ছাত্রদিগের সহিত কখনও কোন প্রকারের পরিহাস করিতেন না। নির্দ্দিষ্ট বিষয় ছাড়িয়া তিনি অবান্তর প্রসঙ্গের কখনও অবতারণা করিতেন না। কিন্তু বামন রাও আপ্‌টের মত অধ্যাপনা বিষয়ে তিনি অত যত্ন লইতেন না বলিয়া শুনা যায়। পরীক্ষার কাগজ দেখিতে তিনি মোটেই ভাল বাসিতেন না। গণিত পড়াইবার সময়ও বোর্ডের কাছে না যাইয়া কেবল স্মরণশক্তির বলে মুখে মুখে বড় বড় অঙ্ক বলিয়া যাইতেন। আগরকারের শিক্ষাপ্রণালী ছিল অন্যরূপ। তিনি হাস্য পরিহাসে তাঁহার শিক্ষণীয় বিষয়টীকে সরস করিয়া তুলিতেন। আপ্‌টে ভাল ভাল ছাত্র বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকে বিশেষ পরিশ্রমের সহিত পরীক্ষার জন্য পড়াইতেন। এই জন্যই নিউ স্কুলের ছাত্রেরা একাদিক্রমে অনেক বৎসর শঙ্কর শেঠ স্কলারসিপ্‌ লাভ করিয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

আর্য্য ও অনার্য্য শিল্প

ভারত শিল্পের ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব, ছবি, মূর্ত্তি, মন্দির, মঠ ইত্যাদির সঠিক ছাপ ও ফটোগ্রাফ দিয়ে হাজার হাজার বই ছাপা হল। চোখ এবং মন দুই নিয়ে এই বিরাট সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করে একটা কথা বার বার আমার মন বল্লে— কই এতো সম্পূর্ণ ইতিহাস পেলেম না, এ যেন একখানা পুঁথির শেষ গোটাকতক অধ্যায় মাত্র পেলেম, পূর্ব্বের অধ্যায়গুলো হারিয়ে গেছে! চোখ চলতে চলতে বৈদিক যুগের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলে সামনে হিমালয়-প্রমাণ কুয়াসার প্রাচীর তার ওপারে ভারত শিল্পের ধারা শব্দ দিয়ে ঝরছে কিন্তু দেখা নেই সে ধারার! ভারত শিল্পিদের রচনা সমস্ত ধারাবাহিক ভাবে যেমন যেমন প্রকাশ পেয়েছিল তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন তো আমাদের চোখের সামনে ধরা নেই আজ— এখানে গোটাকতক টুকরো, ওখানে খানিক, মাঝে মাঝে মস্ত মস্ত ফাঁক,— এইভাবে দেখা দিচ্ছে সব। সুতরাং খানিকটা কল্পনার সাহায্য দরকার হয়ে পড়ে বিষয়টা চর্চ্চার বেলায়। চোখের দেখা গাছের শাখা পত্র পুষ্পের মতো ভারত শিল্পকলার তিন চার যুগব্যাপী এলোমেলো ভাবে ছড়ানো প্রত্যক্ষ নিদর্শন কেবলি যদি দেখে চলা যায় অপ্রত্যক্ষ্য মূলের রহস্য বাদ দিয়ে, তাতে কার তার আগা গোড়া জানা হল বা দেখা হল বলা তো যায় না! চোখ এবং মনকে পাঠাতে হবে সেখানে মহাকালের মধ্যে যেখানে ইতিহাসের অখ্যাত যুগের ভারতবাসী তাঁরা, আরণ্যক ঋষিরা যাঁদের নাম দিলেন অনুব্রত তাঁরা, কায করেছেন!

তত্ত্ব অনুসন্ধানের জায়গায় কল্পনার প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু শুধু চোখে দেখা যাচ্ছে যা, তা তো বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারে না আমাদের! ধর, পুষ্পক রথের কথা পড়ে যদি সত্যিই কল্পনা করি আর্য্যদের পূর্ব্বপুরুষ তাঁরা আকাশে উড়তেন, তবে ভুল কল্পনা করা হয়, কিন্তু আজকের দিনে প্রত্যক্ষ হচ্ছে যে-সব মন্দির মঠ তা থেকে আর্য্যপূর্ব্ব জাতি কাঠ ও বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে ঘর বাঁধতেন এটা কল্পনা করা অন্যায় হয় না, কাযেই যুক্তিসঙ্গত কল্পনার স্থান আছে তত্ত্বানুসন্ধানের বেলায়। কি শিল্পের দিক দিয়ে, কি ধর্ম্মের কর্ম্মের দিক দিয়ে আমাদের সব চিন্তা যেখানে গিয়ে ঠেকে, সেই বৈদিক যুগে গিয়ে উপস্থিত হওয়া যাক্—সেখানে গিয়ে দাঁড়াই, যেখানে আরণ্যক ঋষিরা যজ্ঞক্রিয়া করছেন—এই হল আর্য্য সভ্যতার জ্ঞাত যা কিছু—তার প্রাচীনতম সীমানা, এর পরেই আবছায়া সমস্ত অন্যব্রত এবং অকর্ম্মা বলা যায় যাঁদের, তাঁরা কল্পনা ধরে মনের সামনে আসা যাওয়া করেন।

যাঁদের আমরা আর্য্য বলছি, তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ড কেমন ছিল, তাঁদের মধ্যে কি কি শিল্প প্রচলিত ছিল, কি ভাবতেন তাঁরা, এবং কি ভাবে চলতেন তাঁরা, তার ছবি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে আজকের কালে, জানবার বিষয় অল্পই আছে বল্লেও হয় এই আর্য্যগণের সম্বন্ধে কিন্তু

এই সব অন্যব্রত ও অকর্ম্মা যাঁদের উদ্দেশ করে ঋষিগণ বারবার নানা মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, তাঁরা ঋষিদের মিত্র ছিলেন না, এটা ঠিক। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন আদিতম যুগ থেকে এই সব যে অন্যব্রত এবং অকর্ম্মা, এঁরা আরণ্যক ঋষিদের আশে পাশে কেউ ঋষিদের অনুষ্ঠিত ব্রত থেকে স্বতন্ত্র ব্রত নিয়ে, কেউ একেবারে ক্রিয়া-কর্ম্ম-যাগ-যজ্ঞহীন অবস্থায় রয়েছেন, এঁরা ভারতশিল্প চর্চ্চার বেলায় কোন স্থান অধিকার করেন এসে সেটা দেখার বিষয়।

নিজেদের সঙ্গে সকল বিষয়ে ধর্ম্মে কর্ম্মে পৃথক যারা, তাঁদের বলেছেন ঋষিরা অন্যব্রত। অকর্ম্মা বলা হল তাঁদের যাঁরা ক্রিয়াকাণ্ড-হীন জীবনযাত্রা ধরে রয়েছেন। অন্যব্রত—তাঁরা ব্রতধারী, কিন্তু আর্য্যদের সমান ব্রত পালন করছেন না - যেমন আজকের হিন্দু এবং ক্রীশ্চান দুজনেই একই আর্য্যজাতি, কিন্তু ব্রতের দিক দিয়ে উভয়ে উভয়ের কাছে স্বতন্ত্র ও অন্যব্রত বলে পরিচিত হচ্ছে।

ঋষিরা যাদের বলছেন অকর্ম্মা, নিশ্চয়ই তাদের জীবলীলার কোন চিহ্ন ধরা নেই কোথাও -তারা খেয়েছে, বেড়েছে, মার খেয়েছে ও মরেছে, তাদের ভাবনা চিন্তা ছিল নিশ্চয়, কিন্তু সেগুলো পাথরে, মন্দিরে, সাজে, সজ্জায়, নাচে, গানে নিরূপিত হতে পেলে না। মানুষের ক্রিয়াবান অবস্থারই প্রকাশ হল শিল্পকলা, অকর্ম্মা -তারা অশিল্পি শুধু তারা বর্ব্বরের মতো অন্যের ক্রিয়া পণ্ড করেছে! নিষ্ক্রিয় এরা সব ছায়ামূর্ত্তির মতো কেবলি বাস করেছে ভারতবর্ষে, কিন্তু ভূভারতের ইতিহাস গঠনের মধ্যে এদের স্থান হয়নি, জীবনব্রত ক্রিয়ার মধ্যেও এদের আসন পড়েনি, মরার পরে এদের হাড়মাংস ভারতের মাটিকে খানিক রসিয়ে দিয়ে গেছে মাত্র। এই সমস্ত নিষ্ক্রিয় মানুষ ক্রিয়াবান অন্যব্রত এবং যাজ্ঞিক আর্য্যদের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা এবং হয়তো আরণ্যক ঋষিদেরই পূর্ব্বতন যুগের বর্ব্বরাবস্থার কথা জানাচ্ছে। জন্মায় না মানুষ একেবারেই ঋষি হয়ে, আগে বর্ব্বর তারপর অনেকগুলো অবস্থা অতিক্রম করে তো তবে আর্য্যাবস্থা। একই মানুষ যেমন জাগার আগে ঘুমিয়ে থাকে, আজকের ক্রিয়াকর্ম্মে পটু ছেলে একদিনের অকর্ম্মণ্য শিশু অবস্থায় যেমন পড়ে আছে দেখছি, তেমনি এই সমস্ত অকর্ম্মা—তারা যে কর্ম্মঠ ব্রতক্রিয়াশীল অন্যব্রত এবং আর্য্যদের একটা আদিম অবস্থার কথা জানায় না, তাই বা কে বলবে! ঘুমন্ত, অর্দ্ধজাগরিত এবং জাগ্রত এই তিন অবস্থা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট অপেক্ষাকৃত ক্রিয়াশীল এবং পরিপূর্ণ ক্রিয়াবান—এই নিয়মে সব দেশের সব মানুষই উন্নতির পথে এগিয়েছে, ভারতবর্ষের আর্য্যগণের বেলাতেও যে এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি সেটা ধরে নিতে পারি। ছেলেটা অকৃতকর্ম্মা, পড়লে না, শুনলে না, সংসার পাতলেনা—আর এক ভাই সংসার পাতলে, আফিসে গেল, রোজগারী হল এবং আর এক ভাই সে প্রকাণ্ড চিন্তাশীল মহাপুরুষ ঋষি হয়ে বসলো। একটি পরিবারের মধ্যে সহোদরে সহোদরে এই পার্থক্য

যখন স্বভাবের নিয়মে ঘটছে দেখি, তখন একই জাতি, কেউ পেলে আর্য্য আখ্যা, কেউ পেলে অন্যব্রত, কেউবা অকর্ম্মা দস্যু ইত্যাদি বদনাম এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে!

জীবতত্ত্ববিদ্ যাঁরা, তাঁরা মানুষের জাতি-বিভাগ করেছেন মুখাকৃতি ও দৈহিক মাপজোপ দিয়ে, তাঁরা কাউকে বলছেন আর্য্য, কাউকে অনার্য্য, সেদিক দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে যে আর্য জাতি এসে ভারতবর্ষে অনার্য্যদের মধ্যে বসতি করলেন এবং অনার্য্যদের ক্রমে সকল দিক দিয়ে জয় করে আর্য্যাবর্ত্ত বলে প্রকাণ্ড একটা রাজত্ব স্থাপন করলেন! এ ঘটনার অনুরূপ ঘটনা আজও ঘটছে দেখবো,—আজকের মিশানারি তারা এইভাবে আফ্রিকা, ফিজি প্রভৃতি জায়গায় ধর্ম্মবল এবং বাহুবল নিয়ে ক্রিয়া করে চলেছে অকর্ম্মা ও অন্যকর্ম্মাদের মধ্যে, শুধু এই নয়, অপেক্ষাকৃত সুসভ্য কিন্তু অন্যব্রত অথচ একই আর্য্যজাতি তাদের মধ্যেও পশ্চিমের আর্য্য সভ্যতার দূত সমস্ত নানাভাবে নানা ক্রিয়া করে চলেছে আজকের ভারতবর্ষে। এ ছাড়া আকৃতির হিসেবে দেখছি আর্য্য ছাঁদের মানুষ, কিন্তু বৃত্তির হিসেবে দেখছি রাক্ষস বা দস্যু ও বুদ্ধির হিসেবে একেবারে বর্ব্বর এরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পৃথিবীজোড়া আর্য্যদের মধ্যে আজও ছড়ানো দেখতে পাই। সুতরাং যদি বলি ভারতের মধ্যে একটা জাত আর্য্যব্রত, অন্যব্রত এবং অকর্ম্মা এই তিন থাকে বিভক্ত ছিল ভারতশিল্পের উৎকর্ষের শৈশবাবস্থায়, তবে একেবারে যে অসঙ্গত কল্পনা করা হল তা নয়।

আর্য্য যাঁরা ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে বাস করছেন, তাঁদের মধ্যেই আমরা নানা শ্রেণীর নানা থাকে বিভক্ত মানুষ দেখি—একদল আরণ্যক, তাঁরা বনে বাস করছেন, একদল বণিক, একদল যোদ্ধা, একদল চিকিৎসক ও যাদুকর, এরা সবাই একটা জাতিরই ভিন্ন ভিন্ন থাক— এদের মধ্যে কারিগরদেরও নাম পাই যারা স্পষ্টভাবে অন্যব্রত।

হঠাৎ একদল মানুষ সিঁড়ি না ভেঙ্গে তেতালায় উঠে এল, উড়োকল সৃষ্টি না করে উড়ে পড়লো আকাশে—এ অসম্ভব কল্পনা আর্টিষ্ট হয়েও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে বলা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। আর্য্যেরা পেয়ে গেলেন এবং নিয়ে এলেন এদেশে সকল সভ্যতা, সকল বিদ্যা—হঠাৎ এ বল্লে অনেক আপদ এড়িয়ে যাওয়া চলে কিন্তু নিজের মনের কাছ থেকে খোঁচার শেষ হয় না।

আর্য্যজাতি বলতে মস্ত একটা দল যা পৃথিবীর অনেকখানি জুড়ে বসবাস করছিল, তাদের উপরে পণ্ডিতেরা নানাদিক থেকে আলো ফেলে আমাদের দেখিয়েছেন যে, যেমন এদের চেহারায় মিল, তেমনি ভাষাতেও মিল—এই মিলটা ক্রিয়াবান এবং ক্রিয়াহীনে একেবারেই লক্ষ্য করা যায় না। এ-দল ব্রত করে যজ্ঞ করে, ও-দল ব্রতভঙ্গ করে যজ্ঞনাশ করে, এ দল গড়ে— ভাষা দিয়ে গড়ে, সুর দিয়ে গড়ে, হাত দিয়ে গড়ে, মন দিয়ে গড়ে, বুদ্ধি দিয়ে গড়ে; আর ও দল—তারা গড়তে পারে না—ছেলেরা যেমন তেমনি—কেবলি গড়া জিনিষ পেলেই ভাঙ্গে, এরা কালো ওরা সাদা, এই শেষের দলকে অকর্ম্মা বলে ধরা চল্লো, কিন্তু এই আর্য্য এবং অন্যব্রত

এদের ছুটো জাত বলে না ধরে যদি একই জাতির ছুটো থাক বলে ধরা যায়, তা হলে আর্য্য শিল্প সাহিত্য ভাষা ইত্যাদির ক্রম-বিকাশ পরিষ্কার ভাবে ধরার পক্ষে অনেকখানি সুবিধা পাওয়া যায় বলে মনে হয়।

অকর্ম্মা যারা ছিল তারা সাদাই থাক বা কালোই থাক কোন চিহ্ন ধরেনি নিজ নিজ কর্ম্মের, শুধু এরা অন্যের ক্রিয়া পণ্ড করেছে—এইটুকু ঋষিদের কথা থেকে পাচ্ছি, সুতরাং এদের আর্য্য ও অন্যব্রতদের থেকে সম্পূর্ণ অন্য বলে ধরলে বিশেষ কায আটকায় না। কিন্তু অন্যব্রত অবস্থার মানুষের আচার ব্যবহার ক্রিয়াকাণ্ড সমস্তের হিসাব যা আজকের ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সন্ধান করে বার করছেন, তার সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ আর্য্যজাতির ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে মিল দেখা যাচ্ছে এবং সেই রাস্তা ধরে ইউরোপে যে সকল আর্য্যগণ বসতি করছেন তাঁদের শিল্প ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই নতুন পন্থায় চর্চ্চা হচ্ছে, ভারত শিল্পের বেলায় এর ব্যতিক্রম করা ঠিক নয়।

আর্য্য বলতে একটা পদবী বোঝায়, কিন্তু এই পদবীতে উপনীত হবার আগের ধাপ যে আর্য্যেরা অতিক্রম করেন নি, এমনতো নয়। এক সভ্যতার এক ভাবের পরিক্রম ও আন্দোলন বহু দেশ, বহু জাতি, বহু যুগ ধরে, আর্য্যাবর্ত্তের ঠিক রূপটি কি এই না বলব অনেকখানি বিস্তার নিয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চক্রে যা রয়েছে তার পরিনতি হল একে ? একটা আবর্ত্তের ছুটো গতি আছে, সে ছুটি হচ্ছে বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী, তলিয়ে রয়েছে যেটুকু তা বিস্তার পেতে চাচ্ছে, উঠে আসতে চাচ্ছে, ছড়িয়ে রয়েছে যতখানি তা ঘূর্ণিপথে তলিয়ে চলেছে একটি দিকে। যাগ যজ্ঞে ব্রতী হল যারা, সেই সব আরণ্যক মানুষ এবং তাদের থেকে বাইরে বাইরে নানা ব্রতধারী মানুষ এরা হয়তো ভিন্ন জাতীয়, হয়তো নয়, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের আগাগোড়া গঠন এরা ছু'য়ে মিলে দিলে, তলার জল এবং উপরের জল যেভাবে রচনা করে আবর্ত্ত, সেইভাবে কায করলে আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যশিল্প, আর্য্যভাব—এক কথায়, আদ্যন্ত মহাভারতের সবটা যেন স্পষ্ট দেখি।

যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিরত একটি মণ্ডলী, এরি বাইরে যারা তাদের সম্বন্ধে ঋষিরা বলছেন—"আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যুজাতি আছে, তাহারা যজ্ঞ করেনা, তাহারা কিছু মানেনা, তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়, তাহাদের ক্রিয়া ভিন্ন রকমের। হে ইন্দ্র, তুমি তাহাদিগকে বিনাশ কর।" এই সমস্ত যারা মানতে চায়না আরণ্যক ঋষিদের ক্রিয়াকাণ্ড, হঠাৎ মনে হয় তারা সত্যিই কেউ ছিলনা আর্য্যদের—না হলে এমন করে অভিসম্পাত ? গোঁড়ার দল,—তারা বৈদিক যুগেও ছিল এখনো আছে, জ্ঞাতিবিবাদ তখনো ছিল এখনো আছে, এ-দল শাপ দেয় ও-দলকে, অথচ জাতে এক তারা এও দেখি জগতে! এমন কোনো সভ্যতা কোন ধর্ম্ম নেই যেখানে এক ও অন্যে বিবাদ ও মনান্তর নেই ;—পণ্ডিতদের মতে আমরা আর্য্য, ইউরোপীয়রাও আর্য্য, কিন্তু ব্রত নিয়ে মারামারিতো ঠেকেনি এতে করে, হিন্দু ব্রাহ্ম ছুই দলই আর্য্যজাতি অথচ ব্রত

এক নয় ; সুতরাং আর্য্য ও অন্ত্যব্রত দুটো জাতি না বলে একই জাতির দুটো থাক বলে কল্পনা করলে একেবারে ভুল যে হয় তা নয়— ক্রিয়ার দিক দিয়ে ভিন্ন চিন্তার দিক দিয়ে উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীতে বদ্ধ এ বল্লেও বলা চলে। চেহারায় চেহারায় ভিন্নতা, বর্ণে বর্ণে ভিন্নতা, ভাষায় ভাষায় ভিন্নতা প্রকৃতির নিয়মে ঘটছে দেখি, তাই দেখে জাতি বিভাগ স্থির করি মানুষে মানুষে ; এক দেশের শিল্পে অন্য দেশের শিল্পে যে ভিন্নতা—তাও এইভাবে স্থির করতে যাই আমরা, কিন্তু এই বাহিরে বাহিরে ভিন্নতা এটা কি মানবতত্ত্বের কি মানবের শিল্পতত্ত্বের চরম কথা নয়—তাবৎ মানুষ যা নিয়ে এক, তাবৎ শিল্প আর্য্য অনার্য্য নির্ব্বিশেষে যা নিয়ে এক, তাও চোখের এবং মনের সামনে এসে পড়ে।

আমের মঞ্জরী সকালের কুয়াশার মধ্যে রয়েছে, আম রোদের দিনে পেকে টুস্‌টুস্ করছে,— কি রসের দিক দিয়ে কি আকারপ্রকার ভাবভঙ্গী সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এরা দুটি। গুটি পোকাতে আর প্রজাপতিতে এক জাতির বলে কিছুতে ধরা যায় না—এ চলে মাটি আঁকড়ে, ও চলে বাতাসে আলোতে গা ভাসিয়ে, খেচরে ভূচরে যতটা তফাৎ ততটা তফাৎ এই একই জীবের দুই অবস্থায়! একই মানব এবং সেই মানব জাতির মধ্যে একমাত্র আর্য্যগণকে নিয়ে প্রকৃতিদেবী যে ওলটপালট খেলেন নি এইভাবে তা কে বলবে? মাটি হল সোনা, জল হল মেঘ, কাচ হল হীরক, কালো হল সাদা, যুগযুগান্তর বহে এই খেলার স্রোত চলে আসছে—এটাতো অস্বীকার করা যায় না। আজকের সৌরজগৎ একদিন একটুকরো নিহারিকার বাষ্প ছিল— এ কথা যদি মানতে পারি, তবে আর্য্যশিল্পের গোড়া পত্তন আর্য্যেতর শিল্পে একথা মানতে দ্বিধা হবে কেন?

নিকৃষ্ট অবস্থা, উৎকৃষ্ট অবস্থা, আর্য্য অবস্থা, অনার্য্য অবস্থা এ বল্লে কোন গোল নেই। ছোটয় ভাষা নেই, বড়য় ভাষা আছে, ছোটয় ঢেলা-খেলা, বড়য় পাথরের মূর্ত্তি কেটে লীলা, ছোটয় চলি চলি পা, বড়য় নটরাজের লাস্য ও তাণ্ডব, ছোটয় মা মা, বড়য় সা রি গা মা—এই দাঁড়ায় ব্যাপারটা। গাছের শিকড় নরম, গাছের ডাল শক্ত, তাই বলে দু'টো দুটো থেকে বিভিন্ন এতো বলা চলে না! শিকড় মাটি থেকে জল টানে ডাল সেই রসে বাড়ে, পাতা গজায়, ফল ফলায়, ফুল ফোটায়—এমনি ঘনিষ্ঠতা আর্য্যে অনার্য্যে। কেবলি আর্য্য-গণের সম্বন্ধে নয়, আর্য্যেতর যাঁরা তাঁদেরও সঙ্গে আর্য্যগণ কিরূপ সম্বন্ধে বদ্ধ তারও সাক্ষ্য দিচ্ছে চতুর্ব্বেদ। আর্য্যশিল্প সাক্ষ্য দিচ্ছে আর্য্যেতর অবস্থার শিল্পের, আর্য্যচিন্তার প্রবাহ বহন করছে আর্য্যেতর অবস্থার চিন্তার ধারা। বেদ যদি আর্য্য বলে একটিমাত্র দলের হতো তো একটা বেদই হ'তো, চারখানা মিলে একটা হ'তোনা। যেমন চতুর্ব্বেদ, তেমনি চারিদিকের সভ্যতা, শিল্পকলা এসব নিয়ে এক আর্য্যশিল্প। অতীতকালের আর্য্যেতর অবস্থাকে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল আর্য্যদের পক্ষে, কেননা তাঁরা সেই মানব সভ্যতার

উৎকর্ষের প্রাতঃসন্ধ্যায় বর্ত্তমান ছিলেন যখন নতুন আলোয় পূর্ব্বরাত্রির অন্ধকারকে জড়িয়ে রয়েছে, দিনের গায়ে জড়িয়ে রয়েছে রাতের কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম। সব দিক দিয়ে ভাষায়, শিল্পে, গীতে, নাট্যে, সাহিত্যে তপস্যার সূত্রপাত হচ্ছে তখন, মানবাত্মা নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে প্রজাপতির মতন অজ্ঞতার আবরণ কেটে। এই সন্ধিক্ষণে, যখন আর্য্যেরা তাঁহাদের অনার্য্য অবস্থা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি সেই সময়ে আলোর সঙ্গে অন্ধকারকে নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে অতীতকেও স্বীকার করতে বাধ্য তাঁদের সমস্ত শিল্পরচনা—উষাদেবীর মূর্ত্তি পাথরে বা কাঠে তাঁরা কেমনতরো করে কেটেছিলেন তার উদ্দেশ এখন পাওয়াতো যাবে না, নিশ্চয়ই মূর্ত্তিশিল্প খুব বেশি দূর এগোয়নি তখন আজকের আফ্রিকানদের শাল-ভঞ্জিকার চেয়ে—কিন্তু ভাষা দিয়ে যে মূর্ত্তি তাঁরা উষাদেবীকে দিলেন তা আলো অন্ধকারের ছন্দে তাঁদের অতীত এবং বর্ত্তমানকে চমৎকার রূপ দিয়ে ধরলে আমাদের কাছে।

"কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার হইতে পূজনীয়া, বিচিত্র গতিমতী ও মনুষ্য আবাসের রোগনাশিনী উষা উদয় হইলেন—বিচিত্র রূপবতী অহোরাত্র দেবতাদ্বয় ব্যবধানরহিতভাবে চলিতেছেন। একজন গমন করেন আর একজন আইসেন। পর্য্যায়গামিনী দেবতাদ্বয়ের মধ্যে একজন পদার্থসমূহ গোপন করেন (অন্যজন) উষা অত্যন্ত দীপ্তিমান রথদ্বারা তাহা প্রকাশিত করেন ......উষা দিনের প্রথম অংশের আগমনের সময় জানেন। তিনি স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ হইতে তাঁহার উদ্ভব..." অথবা যেমন বলা হল—"স্বসা (রাত্রি) জ্যেষ্ঠস্বসাকে (উষাকে) উৎপত্তিস্থান (অপর রাত্ররূপ) প্রদান করিয়াছেন এবং উষাকে জানাইয়া স্বয়ং চলিয়া যাইতেছেন, উষা সূর্য্যকিরণ দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত করিয়া বিদ্যুৎরাশির ন্যায় জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল স্বস্বভাবাপন্ন পুরাতনী উষাগণের মধ্যে প্রথমা অপরার পশ্চাৎ প্রত্যহ গমন করেন। নবীয়সী উষা পুরাতনী উষা সমূহের ন্যায় সুদিন আনয়ন করতঃ আমাদিগকে বহুধনবিশিষ্ট করিয়া প্রকাশ করুন।" (রমেশচন্দ্র দত্ত—ঋগ্বেদসংহিতা)

অতীতের আর বর্ত্তমানের মধ্যে, একজন কালো, একজন সাদা, এ ওর ভগ্নী, শুধু রং ভিন্ন ভিন্ন, এ একেবারে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে আর্য্য অনার্য্য অবস্থার কথা। সঙ্গীত শাস্ত্রের দিক দিয়ে এই মূর্ত্তির তুলনা পাই দিনের বেহাগ আর রাতের বেহাগে, মূর্ত্তি শিল্পের দিক দিয়ে এই সাদা কালোর রূপক রূপ পেলে হরিহর, শিবশক্তি, কৃষ্ণরাধা এমনি অসংখ্য জায়গার চিত্রকলায় আজ আমরা যাকে বলছি Light and Shade আলো ছায়া ইত্যাদি তা এই পুরাতনী ও নবীয়সী উষার প্রকাশ—"দেবতাদ্বয়ের মধ্যে একজন পদার্থসমূহ গোপন করেন (অন্যজন) উষা অত্যন্ত দীপ্তিমান রথদ্বারা তাহা প্রকাশিত করেন।" অজন্তা গুহার ছাদের চন্দ্রাতপ তার মাঝখানে যে মস্ত পদ্ম আঁকা হল তারি কোনে কোনে এই সাদা আর

কালো ছুই উষা দেবতার রূপ লিখে গেল শিল্পিরা। যুগযুগান্তের কল্পনা এইভাবে যুগ যুগ ধরে আর্য্য শিল্পের নানা কৌশলে ধরা রইলো।

মানব মনের, তার ভাষা, তার শিল্পকলার, উন্মেষ কত যুগ যুগ ধরে হচ্ছিল আলো ছায়ার নিবীড় উষার মধ্যে দিয়ে—তার ঠিক ঠিকানা নাই। আর্য্য অবস্থায় পৌঁছতে একটা আর্য্যেতর অবস্থা কল্পনা করে নেওয়াতে ভুল নেই, ভুল করি তখন যখন কল্পনা করি যে পথ না চলেই আর্য্যেরা পথের শেষে উপস্থিত অতৈলপুর আশ্চর্য্য প্রদীপ হাতে।

উষাদেবতার মূর্ত্তি ঋষিরা ভাষায় ফোটালেন এবং তার পরে কালে কালে কি ভাবে সেই একই উষার কল্পনা পাটায় পটে ইটে কাঠে পাথরে সাহিত্যে সঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত হল তা দেখলেম, কিন্তু ঐ উষা ও স্বসা এবং ঐ যে কৃষ্ণবর্ণোদ্ভবা শ্বেতবর্ণা এদের প্রতীক আর্য্যেতর এবং অন্যব্রতদের দেওয়া নয় এটা ভাবাই ভুল।

রেড-ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান হিসেবে যে আর্য্যগণের জ্ঞাতি ভ্রাতা—তা ঠিক করে এখনো বলা চলেনা—কিন্তু এটা অভ্রান্তভাবে স্থির হয়ে গেছে, এই রেড ইণ্ডিয়ান তারা খুব প্রাচীনকাল থেকেই নানা রং দিয়ে ব্যক্ত করেছে সকাল সন্ধ্যে, জল হাওয়া, আকাশ বাতাস এবং নানা ঋতুপর্য্যায় এবং জীবন মৃত্যুও। ঐ রেড-ইণ্ডিয়ান তাদের কাছে শ্বেতবর্ণ মানে বোঝাচ্ছে white-innocence, awakening, disclosing the first glimpse – উষা ছাড়া আর কিছু নয়।

রাত্রিকে কৃষ্ণবর্ণা উষার স্বসা বলেছেন আর্য্য ঋষিরা। রেড-ইণ্ডিয়ানরা সায়ংসন্ধ্যা বোঝাতে এবং বৃষ্টি বোঝাতে ব্যবহার করছে পীত ও কৃষ্ণবর্ণ –yellow streak crossed with black lines symbolise rain and the evening sky, rain is commonly represented by eight vertical lines painted black. ঋষিরা বলছেন – বিচিত্র রূপবতী অহোরাত্র দেবতাদ্বয় এই পর্য্যায়গামিনী দেবতাদ্বয়ের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণা যিনি তিনি পদার্থসমূহ গোপন করেন, অন্যজন তাহা প্রকাশিত করেন। এই কালো রং সম্বন্ধে রেড-ইণ্ডিয়ানদের ধারণা হল—Black covers and hides, কালো গোপন করেন, আবরণ করেন, it is a line seldom seen in nature, for her days and years are full of promise. ভারতের আর্য্যগণ এবং আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ান এ দুয়ের জাতিগত ঐক্য প্রমাণ হল না হল তাতে বড় আসে যায় না, এক চিন্তা আর্য্যে অনার্য্যে, এক শিল্প আর্য্যে অনার্য্যে, এর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হতে পারে না আর্য্য সভ্যতারই ইতিহাস চর্চ্চার বেলায়।

আমাদের দেশেই আর্য্যেতর জাতি এখনো বিদ্যমান যারা অন্যব্রত পালন করছে। গারো এবং খাসিয়া পাহাড়ের এই আর্য্যেতর জাতির এক কবি, তার সামনে নবীয়সী উষার মতো যখন প্রেয়সী এসে উপস্থিত হল তখন ঋষিদেরই মতো সেও বর্ণন করলে ছন্দে—

মরি মরি রাতের দেওা
রাতারাতি গড়তেছিল
　　এই পুতলি!
আসতে দিবা—আদুল গায়ে
জড়িয়ে দিল তাড়াতাড়ি
　　নীলাম্বরী!
ঘুমঘোরে বা ভুল করে বা
রং ধরালো এমন নীলি
রাতের নীলি কাজল নীলি
　　উজল নীলি!

"Before the sun shouldst thou have been created
Thou art as the blue of the new drawn indigo"

(The Garos.—Major Playfair)

এখানেও সেই ঋষি বর্ণিত অহোরাত্র দুই দেবতায় মিলে গড়া সুন্দরী—কালো এবং আলো করা রূপ মিলে এক প্রতিমা।

আর্য্যেরা এবং আর্য্যেতর তারাও বহু দেবতার উপাসনা করতেন - সূর্য্য, অগ্নি, জল, মেঘ, নদ নদী, বনস্পতি কত কি যে দেবতা তার ঠিকঠিকানা নেই। এই তেত্রিশ কোটি দেবতাকে উত্তরাধিকারী সূত্রে আর্য্যেরা যে পেয়েছিলেন তাতে ভুল নেই। ভাষার দিক দিয়ে দেখতে গেলে আর্য্যে এবং আর্য্যেতরে বড় একটা মেলেনা, কিন্তু দেবতার নামে নামে এবং সেই সেই দেবতার কাযে কাযেও ভারি একটা মিল দেখি।

নিউজিলাণ্ডের মাওরীজাতি তাদের একজন বজ্র দেবতা আছেন; তাঁকে বলে তারা Waitari বা দৈত্যারি! দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের পূজার উপচার ও বিধি আর্য্যগণ যে পাননি আর্য্যেতরগণের কাছে থেকে তাই বা কে বলবে। বেদী নির্ম্মাণ অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে যথাযথ স্থানে বসে গান ও সোমপান যূপকাষ্ঠের পূজা পশুবলি সমস্তই প্রমাণ করছে আর্য্য এবং আর্য্যেতরে সকল দিক দিয়ে নিকট সম্বন্ধ।

ঋষিরা বাচ্যরূপে ধরে গেছেন আমাদের কাছে তাঁদের কল্পিত নানা দেবদেবী মূর্ত্তি। এক এক রকম যজ্ঞক্রিয়ার জন্যে নানা কোন্ কাটা বেদী এবং যজ্ঞের ব্যবহার্য্য নানা উপকরণ থেকে তাঁরা কি ভাবে কেমন করে নানা সামগ্রী গড়তেন তার আভাস পাই। কল্পিত দেবতাকে পাথরে কি কাঠে অথবা মাটিতে কিম্বা চিত্রে তাঁরা ফুটিয়েছিলেন কিনা তা জানার উপায় নেই। কিন্তু ইন্দ্রধ্বজ আর যূপ এই দুটির গড়ন এখনো আমাদের চোখের সামনে রয়েছে

যা থেকে আর্য্যেতর জাতিগণের শিল্পকলার সঙ্গে আর্য্যদের শিল্পকলার সাদৃশ্য অনেকখানি ধরা পড়ে।

বৈদিক যুগের আর্য্যগণ শিল্পি হিসাবে তৎকালীন আর্য্যেতর জাতিগণের চেয়ে খুব যে বড় ছিলেন না তার প্রমাণের অভাব নেই, তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র যানবাহন সবই আর্য্যেতরগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ থেকে যায়। সেই বৈদিক যুগে ঋষিগণের চিন্তা এবং কল্পনা এবং ভাষা উৎকৃষ্টতর একথাও জোর করে বলা যায় না। সবেমাত্র সবদিক দিয়ে উন্মেষের অবস্থা তখন ফুটতে চাচ্ছে, কিন্তু ফোটেনি তখনো সবই। একেশ্বরের উপমা খুঁজতে গিয়ে তখনো আরণ্যক ঋষিদের মনে অরণ্য দেবতার প্রাচীন বনস্পতি মূর্ত্তিটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, তাঁরা বলছেন,—"বৃক্ষেব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" অনার্য্য অবস্থার সেই বনস্পতি দেবতার কথা! বৈদিক যুগ চলে গেল, নতুন নতুন চিন্তা কল্পনা করে চল্লো মানুষ, কিন্তু সেখানেও এল সেই অতি পুরাতন কল্পবৃক্ষ—নন্দনের পারিজাত যার ছায়ায় তেত্রিশ কোটি দেবতার লীলা চল্লো। বৌদ্ধযুগ প্রকাণ্ড এক ওলট পালট আনলে চিন্তায়, কর্ম্মে ধর্ম্মে, কিন্তু সেখানেও প্রথমে পাথরে অটুট করে ধরা গেল অক্ষয়বটের স্মৃতি! খুবই আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম সেখানেও গাছ পূজা পেলে—গহনবনের তুলসী গাছ। সেই আর্য্যেতর অবস্থার অরণ্য দেবতা—সে বারে বারে জানিয়ে দিলে আর্য্যগণ কোন দূর আরণ্যক অবস্থার স্মৃতি বহন করে চলেছে, উত্তরের নদী যেমন তুহিনকণা বহন করে চলে দক্ষিণ সমুদ্রে।

সৃষ্টির কথা স্রষ্টার কথা বলতে আর্য্যেরা বল্লেন—ইদম্ বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিৎ আসীৎ ইত্যাদি। নিউজিলাণ্ডের অনার্য্য তারাও এই সৃষ্টি রহস্য কিভাবে বর্ণন করলে দেখ—

"Io dwelt within the breathing space of Immensity.
The Universe was in darkness, with water everywhere
There was no glimmer of dawn, no clearness, no Light
And he began by saying these words,—That he
Might 'cese remaining inactive:
'Darknees! Become a light possessing darkness'
And at once light appeared.

* * * * *

'Heaven be formed' then the Sky became suspended
'Bring forth thou, Tupua-horo-nuku
And at once the moving earth lay stretched abroad."

(Page 13. Mythology of all races.—Dixon, vol, ix.)

ভারতবর্ষের আর্য্য ঋষিগণের চিন্তা কল্পনা ক্রিয়াকর্ম্ম সবেতেই তাঁদের পূর্ব্বতন আর্য্যেতর অবস্থার ছাপ কি সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান তা দেখছি—সুতরাং ভারত শিল্পের ইতিহাস শুধু বৈদিক যুগ পর্য্যন্ত নয় তারও এবং আরো পূর্ব্বে থেকে তার ধারা চলে আসছে—এইটেই বলতে হ'ল। আত্মা এবং পরমাত্মা দুটি কেমন যেমনি দেখাতে হল অমনি ঋষিরা তাঁদের সেই পূর্ব্বতন অবস্থার দুটি পাখীর উপাখ্যান দিয়ে ছবি দিলেন "দ্বা সুপর্ণা"—একটি পাখী জেগে থাকে একটি পাখী ঘুমিয়ে থাকে! কোন্ অখ্যাত যুগের রূপকথার পাখী – যখন আর্য্যদের পূর্ব্ব-পুরুষরা সবেমাত্র কথা বলতে, আগুন পোহাতে শিখেছেন – তারি স্মৃতিছন্দের দ্বারায় নিরূপিত হল, ঋষিদের গভীর তত্ত্বজ্ঞান তাকে তলিয়ে দিতে পারলে না। তারপর থেকে পাথরে ধাতুতে কবিতায় গানে রূপকথায় আর্য্য সভ্যতা কতবার কতভাবে এই দুটি পাখী বেঙ্গমা-বেঙ্গমী এবং শুক শারীর আকারে ধরে গেল তার ঠিক নেই—

"সাই সুয়া দুড পাখী গহিন নদী চরে
স্যাও গহিন শুকায়া গেলে শুখি উড়াল ছাড়ে
ধবল বরণ কবুতর চিরল বরণ আখি—"

এমনি সব কথা এ আর্য্য অনার্য্য দুইয়ের আত্মীয়তার কথা না জানিয়ে থাকতে পারছে না। কাযেই বলতে হয় আর্য্যশিল্পের ভিত্তি অনার্য্য যুগের উপরে।

পাকা ফলের বুকের মাঝে যেমন শক্ত কষি, তেমনি আর্য্যশিল্পের অন্তরে অন্তরে অনার্য্য-শিল্পের প্রাণ বীজের মতো লুকিয়ে রয়েছে—তাকে ফেলে হয় তো রস পেতে পারি, কিন্তু সে যদি বাদ যেতো আরম্ভেই একেবারে তবে নিষ্ফলা হতো আর্য্য সভ্যতা এটা নিশ্চয়।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যা

অর্থ দানে বিদ্যা যদি অসমর্থ হয়
তথাপি এ-শক্তি আছে বিদ্যার নিশ্চয়,—
প্রাপ্ত-ধনে করিবারে সুষ্ঠু ব্যবহার,
ধনাভাবে সুস্থ রাখা চিত্ত আপনার।

শ্রীশিবরতন মিত্র

খেয়ালী

(১৬)

সেদিন আকাশ মেঘে সম্পূর্ণ ঢাকা ছিল। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বাতাসও বহিতেছিল। অজিত ঘরের বাহির হইতে না পারিয়া বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সে তাহার বসিবার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় পাইচারি করিতে করিতে মাঝে মাঝে সম্মুখের পথে উৎসুক দৃষ্টিপাত করিতেছিল। দৈবাৎ যদি কোন বন্ধুর দেখা পায়, তবে তাহাকে ডাকিয়া কিছু সময় গল্পও তো চলিবে। সম্প্রতি তাহার জ্বর হইয়া গিয়াছে, তাই শৈলজা আজ তাহাকে বাহিরে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া দিয়াছে। নহিলে সে কি এতক্ষণ ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী হইয়া থাকিতে পারে ?

অচিরে অজিতের আশা পূর্ণ হইল; রামু আসিয়া হাজির হইল। রামু বসিল; গল্পও কিছুক্ষণ চলিল। সে উঠিতে চাহিলে অজিত যখন তাহাকে বাধা দিল, তখন সে বলিল, "না ভাই, বেশী সময় আজ থাক্‌তে পারব না। বাড়ীতে মা'র অসুখ, বাড়ীর পাশে নবীন গোয়ালার ছেলেটার অসুখও আজ খুব বেড়ে গেছে। তাকে একবার দেখতে হবে। তার মা নেই, বিধবা বোনটা তো চুল বেঁধে টিপ পরে ঘুরে বেড়ায়, রোগা ভাইটির পানে ফিরেও তাকায় না। এমন লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা। নবীন বেচারী ভারি বিপদে পড়েছে অজিত।"

অজিত আর্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি ছেলেটার সেবা চলে না? চিকিৎসার ভাল বন্দোবস্ত আছে তো ?"

"কেমন করে থাকবে ভাই ? ডাক্তারকে দেবার মত পয়সা কি তার আছে ? ছেলেটা বিনা চিকিৎসায়, বিনা সেবায় মারা যাবে।"

"আহা! বড় দুঃখের কথা তো। চল, আমিও তোমার সঙ্গে ছেলেটাকে একবার দেখে আসিগে।"

"সন্ধ্যা হয়েছে, আর দেরী করা নয়, চল।"

অজিত রামুর সঙ্গে পথে বাহির হইয়া পড়িল। শৈলজার নিষেধের কথা তখন তাহার মনে হইল না। পরিচিত নবীন গোয়ালার দুরবস্থা ও দুঃখের কথাই তাহার সিক্ত চিত্তে জাগিতে লাগিল।

রামু ও অজিত যখন নবীনের গৃহে পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। একটা ম্লান ছিন্ন শয্যার উপরে রোগার্ত্ত ছেলেটি ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। তাহার ধারে বসিয়া অসহায় নিরুপায় পিতা ব্যাকুলভাবে শুধু মমতা দিয়াই ছেলের রোগ যন্ত্রণা হ্রাস করিবার ব্যর্থ

চেষ্টা করিতেছিল। সে না পারিয়াছে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে, না জানে সেবা করিতে। ক্ষীণ দীপালোক ঘরের অন্ধকারই বাড়াইতেছিল। অবস্থাটা দেখিয়া অজিতের হৃদয় ব্যথাতুর হইয়া উঠিল।

অজিতকে দেখিয়া নবীন বিস্ময় অনুভব করিল না। কারণ, মাঝে মাঝে নবীনের মত বহু দরিদ্রের কুটীরেই তাহাকে দেখা যাইত। সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া অজিতকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "কি দেখতে এসেছেন বাবু, ওকে বোধ হয় আর বাঁচাতে পারব না।" তাহার চোখে অশ্রু টল্ টল্ করিতে লাগিল। রোগীর সেবা করিতে করিতে রোগ সম্বন্ধে অজিতের কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সে ছেলেটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "অত ভয় পেওনা, ভাল ওষুধ পথ্য পেলেই ছেলে ভাল হয়ে যাবে। তুমি আমাদের বাড়ী যেয়ে আমার নাম করে তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে এস।"

নবীন তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল এবং অল্প সময় পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, ডাক্তার গ্রামান্তরে 'কলে' গিয়াছেন, আজ আর ফিরিবেন না। অজিত ভাবিতে লাগিল। গ্রামে আর সুশিক্ষিত ডাক্তার ছিল না। সহর তিন মাইলের পথ। সেখান হইতে ডাক্তার ডাকিয়া আনা যায় বটে, কিন্তু কে ডাকিতে যাইবে? রামুর মা'র অসুখ, অতুল মামা বাড়ী গিয়াছে। বাড়ী যাইয়া কোন চাকর পাঠান যায়, কিন্তু তাহা হরপ্রসাদের অজ্ঞাত থাকিবে না। 'ছোট লোকের' সঙ্গে মেলামেশা তিনি কত অপছন্দ করেন, তাহা তো অজিতের অজানা নাই। নবীন যাইয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তিন চার ঘণ্টা নবীনের মেয়ে বিনোদিনীর সঙ্গে থাকিতে হইবে। সতেরো আঠারো বছরের মেয়েটা ঘরের কোণে বসিয়া অই যে কি করিতেছে, ভাইটির কাছেও একটিবার আসিতেছে না। অমন হৃদয়হীনার সঙ্গে কি অতটা সময় থাকা যায়? রামুও তো চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাই হোক্ না কেন, ছেলেটির চিকিৎসার বন্দোবস্ত এই রাত্রেই করা চাই, নহিলে সে বাঁচিবে না।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আমি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি, ফিরতে ঘণ্টা তিনেক দেরী হবে।"

নবীন কথা কহিতে পারিল না। গভীর কৃতজ্ঞতায় তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অজিত আর দাঁড়াইল না।

অজিত বাহির হইয়া দ্রুত পদেই পথ চলিতে লাগিল। যখন সহরের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন বৃষ্টি ও বাতাস এক সঙ্গে এমন রুদ্র তাণ্ডব হইয়া উঠিয়াছে যে, আর এক পদ অগ্রসর হওয়াও তাহার অসাধ্য হইয়া উঠিল। রাস্তার ধারে একটা ভগ্ন জনশূন্য গৃহে সে প্রবেশ করিয়া ঝড়ের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিল বটে, কিন্তু সিক্ত বস্ত্রে

সমস্ত রাত্রি বসিয়াই কাটাইতে হইল এবং ঝঞ্ঝার রুদ্র তালের মধ্যেও সে নবীনের রোদনের করুণ সুর শুনিতে লাগিল।

শেষ রাত্রে প্রকৃতি শান্ত হইল। মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্বিকাশ, ঝটিকার উন্মাদ নর্ত্তন, মেঘের কড় কড় নাদ বা বৃষ্টি ধারা পতন তখন আর ছিল না। খণ্ড খণ্ড মেঘ আকাশে ভাসিতেছিল, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে স্বর্ণ পুষ্পের মত উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি জ্বল জ্বল করিতেছিল। প্রভাত পর্য্যন্ত অজিতকে সেই ভগ্ন গৃহেই অবস্থান করিতে হইল। সে ধনীর দুলাল হইলেও তাহার অদম্য খেয়াল তাহাকে কষ্টসহিষ্ণুও করিয়া তুলিয়াছিল। রাত্রের কষ্ট তাহার একেবারে অসহনীয় হয় নাই।

সূর্য্যোদয় হইলে অজিত ডাক্তার লইয়া গাড়ী করিয়া গ্রামে ফিরিয়া চলিল। গাড়ী গ্রামে প্রবেশ করিলে সে রামুকে পথে দেখিতে পাইয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "তুমি ডাক্তার বাবুকে নিয়ে নবীনের বাড়ী যাও। আমি বাড়ী চললাম, কাল বৃষ্টিতে ভিজে শরীর বড্ড অসুস্থ হয়েছে। আমি বাড়ী যেয়েই টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি যা হয় তুমিই ক'রো, ছেলেটা যেন মারা যায় না।" বলিয়াই অজিত গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

প্রাঙ্গণ পার হইয়া দ্বিতলে উঠিতেই পিতার সহিত অজিতের দেখা হইল। হরপ্রসাদ প্রলয়গম্ভীর মূর্ত্তি লইয়া একান্ত অধীর ভাবে পাদচারণ করিতেছিলেন। অজিতের দর্শন-মাত্রই সেই অগ্নিগর্ভ পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি জ্বলন্ত রক্তনেত্র অজিতের ক্লিষ্ট শুষ্ক ম্লান মুখে স্থাপন করিয়া বজ্রনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবীনের মেয়ে বিনোদিনী কোথায়? তাকে কোথায় রেখে এসেছিস?"

একি কথা! অজিত বিহ্বল দৃষ্টি তুলিয়া পিতার পানে চাহিল। তাহার মুখে কোন শব্দ ফুটিল না। হরপ্রসাদ আবার তেমনি কণ্ঠে বলিলেন, "সেবার—দয়ার ছল করে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ! এমন মহাপাপিষ্ঠ তুই! তুই আমার বংশ মহাপাপে ডুবালি। আরতো কাউকে মুখ দেখাতে পারব না। আয়, তোকে নিজের হাতে খুন করে সব জ্বালার—সব পাপের শেষ ক'রে দি" বলিয়াই হরপ্রসাদ দ্রুত অগ্রসর হইয়া আবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "না, না, তোর গায় হাত দিয়ে হাত অপবিত্র করব না। জেলখানাই তোর যোগ্য স্থান। ভেবেছিলি হয়তো, মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখে, ভোরে বাড়ী এসে অন্যত্র রাত্রিবাসের একটা রচা কথা বললেই তোর পাপ কেউ জানতে পারবে না। ঈশ্বর আছেন তো, সবই জানতে পারা গেছে। যা, যা, দূর হয়ে যা, তোর মুখ যেন আমাকে আর দেখতে না হয়। আজই যেন তোর মৃত্যু সংবাদ শুনতে পাই।"

স্তম্ভিত নির্ব্বাক অজিতের পদতলে পৃথিবী কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। প্রভাতের

প্রসন্ন আলোক তাহার দৃষ্টির সম্মুখে একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রলয়োচ্ছ্বাস চলিতে লাগিল। সে পিতার কথায় এইটুকু বুঝিল, বিনোদিনী গতরাত্রে কাহারও সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু অজিত যে এই হীন কর্ম্মের এই অচিন্তনীয় পশুত্বের নায়ক, একথা যদিও কেহ পিতাকে বলিয়া থাকে, তবে কেমন করিয়া তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন? এই পিতা! জনক হইয়াও পুত্রকে চিনিতে পারেন নাই! মুহূর্ত্তের জন্য অজিতের ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। সে সবলে ঠোঁট দাঁতে চাপিয়া রাখিল।

"এখনো দাঁড়িয়ে আছিস! এই মুহূর্ত্ত থেকে এ বাড়ীর সঙ্গে তোর কোন সম্পর্ক আর নেই, জেনে রাখিস" বলিয়াই হরপ্রসাদ উল্কার মত বেগে পলকে অন্তর্হিত হইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

মিনার্ভা থিয়েটারে মহাসমারোহে "মেবার-পতন" অভিনীত হইতেছিল। সে-দিন দর্শকের ভয়ানক ভিড়। দর্শকের সংখ্যাধিক্য এবং আগ্রহ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে অত্যন্ত উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। কলার চরম নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য তাহাদের ও কম আগ্রহ দেখা যাইতেছিল না। মহিলাদের বসিবার স্থানটিও কাণায় কাণায় পূর্ণ। তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকা—কোন শ্রেণীরই অভাব ছিল না। তাহাদের বসন ভূষণও একটা দেখিবার মত জিনিস বটে।

নারী দর্শকের মধ্যে এক তরুণী জননী তাহার ছ'মাসের খোকাটিকে লইয়া বড় বিব্রত ও লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। ছেলেটি মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠিয়া মহিলাদের নীরব ও সরব বিরক্তি উৎপাদন করিতেছিল। মা কিছুতেই ছেলেকে স্থির করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার পাশে এক স্থূলাঙ্গী রমণী বসিয়াছিল। তাহার এক হস্তে থিয়েটারের প্রোগ্রাম, অন্য হস্তে পুস্তকাকার তাম্বুলাধার। শিশুটির কান্নায় সে খুব বিরক্ত হইয়াই উঠিতেছিল। স্বামীর প্রতিকৃতি সম্মুখে রাখিয়া কল্যাণী যখন আবেগ-কম্পিত শিঞ্জিত সুমিষ্ট কণ্ঠে তাহার হৃদয়োচ্ছ্বাস নিবেদন করিয়া দর্শকের দেহে রোমাঞ্চ তুলিতেছিল, হতভাগা ছেলেটা তখন আবার কাঁদিয়া উঠিল। রমণী আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, ষ্টেজের দিকে চক্ষু রাখিয়াই অসন্তুষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল, "এমন কাঁদুনে ছেলে নিয়ে আবার থিয়েটার দেখতে আসা! কিছু শুনতে দিলে না গা!"

লজ্জায় তরুণীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ছেলে কোলে লইয়া উঠিতে উদ্যত হইলে তাহার পশ্চাৎ হইতে একটি কোমল মিষ্টি গলা শুনা গেল, "তোমার খোকাটিকে আমাদের

ঝির কোলে দাও না ভাই, ও-তো বসে বসে শুধু ঢুলছে। খোকাকে কোলে করে অই ধারে যেয়ে বসবে এখন।”

তরুণী কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া চকিতে পিছন ফিরিতেই এক তরুণীর সঙ্গে তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। সে সহর্ষ বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “সীতা!”

নিমেষে সীতা তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া উৎফুল্ল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “ধীরা, তুই কবে এলি ভাই কলকাতায়?”

“মাস তুই হবে। উনিতো এখন এইখানেই কায করেন।”

“চল ভাই, আমরা ও-ধারে গিয়ে বসি। আজ আর থিয়েটার দেখে কায নেই।”

তিন বৎসর পরে দেখা! সীতাকে ছাড়িয়া অভিনয় দেখিবার ইচ্ছা ধীরার এক তিলও ছিল না। তুই সখী সানন্দে উঠিয়া গিয়া একপাশে বসিয়া কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিল।

সীতা ধীরার ছেলেকে কোলে লইয়া অজস্র আদরে তাহাকে অভিভূত করিয়া দোলাইয়া দোলাইয়া কোলেই ঘুম পাড়াইয়া রাখিল। সহাস্য পরিহাসে ধীরাকে বলিল,, “মণিবাবুকে পেয়ে বিশ্বসংসার ভুলে গেছিস, ছেলে হওয়ার খবরও দিসনি।”

লজ্জিত মৃদু হাসির সহিত ধীরা বলিল, “আমার যে চিঠি লেখার অভ্যাস নেই, সেতো তুই জানিস ভাই। আর তুই বা আমাকে ক'খানা চিঠি লিখিছিস?”

সীতার হাসি মুখ মলিন হইয়া গেল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, “যে ঝড় ঝটকা গেছে ভাই, চিঠি আর কি লিখব? সেই তোর প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার তু'তিন দিন পরেই কাকার তার পেয়ে পিসিমা আর আমি কলকাতায় চলে আসি। কাকিমার শক্ত অসুখ হওয়ায় কাকা চিকিৎসার জন্যে তাঁকে এখানে নিয়ে এসে বাড়ীতে তার করেন। এখানে আসার পনেরো ষোল দিন পরেই কাকিমা মারা গেলেন। তারপর ছ'মাস যেতে না যেতেই তাঁর কোলের ছেলেটি মারা গেল।”

“বীরেশকাকা এখন এখানেই থাকেন নাকি?”

“হাঁ। পিসিমা রেঙ্গুনে যেতে রাজি হলেন না। কাকাও আমাকে আর তাঁর কাছ-ছাড়া করতে রাজি হলেন না। রেঙ্গুনের চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখানে চাকরী করছেন। তিন বছর আর বাড়ী যাইনি, কাকার কাছেই আছি।”

“কাকা তোকে আর কতকাল আইবুড়ো করে রাখবেন?”

“আমি যে এখনো আইবুড়ো আছি, কে তোকে বললে?”

“বাঃ! তা আবার বলতে হয় নাকি? এত সাজসজ্জা, সিঁতিতে সিঁদুর নেই।”

“বিধবারাও তো সিঁদুর পরে না।”

"পোড়া মুখ তোমার! কোন কথা আর মুখে আটকায় না। ইরা কেমন আছে? তাঁরও তো বিয়ে হয়নি নিশ্চয়।"

"না, তার বিয়ে হয়েছে। সে তার স্বামীর সঙ্গে মেদিনীপুরে আছে। ভালই আছে।"

"সে তোর এক বছরের ছোট, তার বিয়ে হয়েছে, তোর হয়নি!"

"সে এক মজার কথা ভাই। একদিনই আমার আর ইরার বিয়ে হবার কথা ছিল। কিন্তু বিয়ের তিন চার দিন আগে হঠাৎ আমার অসুখ হয়ে পড়ল। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে ইরার বিয়ে হয়ে গেল, আমি বিছানায় পড়ে পড়ে ক'এক মাস অসুখে ভুগলাম। ভদ্রলোকের আর তর সইল না, অন্য জায়গায় বিয়ে করে ফেললেন। অমন জায়গায় যে আমার বিয়ে হয়নি,—ভালই হয়েছে। আমার অসুখে যাঁর তর সইল না, তাঁর অসুখের সময়ে আমার কি করে তর সইত ভাই।"

"কত বড় হয়ে গেছিস, এখনো একটু লজ্জা হলোনা তোর!"

"লজ্জার ভার আমি বইতে পারিনে, তাই ওটা তোকে দিয়েছি।"

"খুব করেছিস। কাকা তোর বিয়ের আর চেষ্টা করেন নি?"

"করেছেন বৈকি। আমি কিন্তু স্পষ্ট বলেছি, তাঁকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না।"

"তাঁকে বলতে পারলি?"

"তাঁকেও বলতে পারতাম; কিন্তু বলেছি ইরাকে। তাই বলে তিনি নিশ্চিন্ত নন্। কত চেষ্টা করছেন, বর যে আমার পছন্দ হচ্ছে না।"

"অবাক করলি তুই রাণী!"

রাণী! এই স্বল্পাক্ষর-বিশিষ্ট শব্দটি সম্বোধিতা এবং সম্বোধনকারিণী উভয়কেই নিস্তব্ধ করিয়া দিল। অজিতের অনুকরণে ধীরাও মাঝে মাঝে সীতাকে 'রাণী' বলিত। আজ 'রাণী' সম্বোধনটা ধীরার মনের অজ্ঞাতে নিতান্ত অতর্কিতভাবে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ একটি শব্দের সঙ্গে অতীতের সহস্র স্মৃতি বিজড়িত হইয়াছিল এবং তাহাই হয়তো দুইটি মূক তরুণীর বক্ষতল প্রবল বেগে মন্থন করিতেছিল। সীতা দেখিল, ধীরার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি নিজের চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

ধীরা রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "রাণী, দাদার কথাতো কিছুই জিজ্ঞেস করলিনে?"

সীতা ধীরার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। অন্যদিকে মুখ রাখিয়াই অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি তো সবই জানি ধীরা।"

"তিন চার বছর ধরে কত খোঁজা খুঁজি হচ্ছে, দাদার কোন খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। তোর কি মনে হয়, দাদা বেঁচে—" ধীরা কথা শেষ করিতে পারিল না, বালিকার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সীতা চাপা গলায় বলিল, "চুপ, চুপ, কেউ শুনতে পাবে, ছি!"

ধীরা কিছুকাল নিঃশব্দে কাঁদিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিল, 'বাবা কি জন্যে দাদাকে দূর হয়ে যেতে বলেছিলেন, আর দাদা যে সেই দিন থেকে নিরুদ্দেশ হ'ল, তাতো জান। তা ছাড়া আর কিছু জান?"

"জানি যে, আজ পর্য্যন্ত অজিতদা'র উদ্দেশ পাওয়া যায়নি।"

"বিনোদিনীর খবর কিছু জান না?"

"না। কিন্তু সে যে আর দেশে ফেরেনি, তা শুনেছি।"

"দাদা দোষী বলেই তোর বিশ্বাস?"

সীতার চক্ষু উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সে ধীরার মুখে পূর্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না ধীরা।"

সীতার কথা শুনিয়া এই ক্লেশকর আলোচনার মধ্যেও ধীরা অতিশয় আনন্দিত হইল। ভাইবোনের শৈশব ও কৈশোরের সঙ্গিনী সীতা অজিতকে তাহার মত নির্দ্দোষ বলিয়াই জানে।

সীতা বলিল, "তোমার বাবাকে কে এমন জঘন্য মিথ্যা কথা বিশ্বাস করিয়েছিল, সেইটে আমি জানতে পারিনি ভাই।"

"রামতারণের ছেলে নাকি তাদের গোমস্তার সাহায্যে বিনোদিনীকে বের করে নিয়ে যায়। সেই গোমস্তাটাকে দাদা নাকি একদিন খুব অপমান করেছিলেন। নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্যেও বটে, আর দাদার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেও বটে, সেই গোমস্তাই নাকি আমাদের একজন চাকরকে বাধ্য করে' তার দ্বারাই বাবার কাণে কথাটা তোলায়। অবশ্য দাদার পালিয়ে যাওয়ার দশ বারো দিন পরে আসল কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে।"

"এমন কথাটা তোমার বাবা অমনি বিশ্বাস করলেন?"

"দাদার ওপর বাবার কোন দিনই বোধ হয় ভাল ধারণা ছিল না। তবু বোধ হয় এতটা মন্দ তিনি ভাবতে পারেন নি। বাবার মুহূর্ত্তের ভুলের জন্যেই তো সর্ব্বনাশটা হলো। দাদা চিরকালই বাবার মতের বিরুদ্ধে চলতেন। কথাটা শুনেই বাবা রাগে, লজ্জায়, দুঃখে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। এখন সেই সাংঘাতিক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। তাঁর এমন চেহারা হয়েছে, দেখলে চেনা কষ্ট। মা'র অবস্থা বাবার চেয়েও খারাপ। ওঁরা আর বেশী দিন বাঁচবেন না।"

"তোমার মাও কি সেই চাকরটার মুখে সব শুনতে পান?"

"না। দাদার চলে যাওয়ার পরে বাবার মুখে তিনি সব শুনেছিলেন। শুনে তো তিনি এক বর্ণও বিশ্বাস করতে পারেন নি। মা যদি আগে জানতে পারতেন, তা হ'লে কি এমন সর্ব্বনাশ হয়?" বলিয়া ধীরা চক্ষু মুছিল।

দুইজনেই নীরব হইয়া রহিল। অভিনয় চলিতেছিল। দু'জনে ষ্টেজের প্রতিও চাহিতে ছিল, কিন্তু অভিনীত বিষয়টা তাহাদের মন আর স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। হয়তো অতীত স্মৃতির সহস্র দৃশ্য তাহাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়মধ্যে অভিনীত হইয়া যাইতেছিল।

অভিনয় শেষ হইয়া গেল। দর্শকদিগের প্রত্যাগমন জন্য একটা ভয়ানক কোলাহল পড়িয়া গেল। মেয়েরাও কেহ বা ছেলে কোলে লইয়া, কেহ বা তাম্বুলাধার হাতে লইয়া গাড়ীতে উঠিতে লাগিল। গাড়ীতে উঠিয়াও তাহারা থিয়েটারের আলোচনাই আরম্ভ করিল। এতক্ষণ অভিনীত দৃশ্যগুলা তাহাদের মনের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল, অভিনয় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার একটা অবসাদ আসিয়া তাহা ধ্বংস করিয়া দিতেছিল; তাই বোধ হয় তাহারা থিয়েটারের আলোচনা করিয়া মনটাকে তাজা করিয়া তুলিতে ইচ্ছুক হইল।

ধীরা এবং সীতাও উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, আর দেরী করা চলে না। বিদায় গ্রহণ কালে সীতা ধীরার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "রবিবার কিন্তু আমাদের ওখানে যেও।"

ধীরা অন্ধকার গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আছে দেখিয়া মণিভূষণ বলিল, "থিয়েটার দেখে এমনি মুগ্ধ হয়ে গেছ যে, মুখে কথাও ফুটছে না।" ধীরা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সীতার সঙ্গে আজ দেখা হলো। আমি ভেবেছিলাম, কাকার সঙ্গে ও রেঙ্গুনে আছে।"

ধীরার স্তব্ধভাব এবং ক্লিষ্টকণ্ঠে মণিভূষণের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এতক্ষণ ধীরা সীতার সঙ্গে অজিতের আলোচনাই করিয়াছে, থিয়েটার দেখে নাই। তিন বৎসর পর্য্যন্ত যে নিগূঢ় ব্যথা ধীরা অজিতের জন্য বহন করিয়া আসিতেছে, তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। ধীরার সম্মুখে অজিতের প্রসঙ্গ উত্থাপন তো দূরের কথা, সে অজিতের নামও উচ্চারণ করিত না। আজও মণিভূষণ সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে স্ত্রীর মাথাটি বুকের কাছে আনিয়া বলিল, "সীতা তার স্বামীর সঙ্গে এখানেই থাকে বুঝি? বেশ হলো, দুই বন্ধু আবার এক ঠাঁই হলে।"

"সীতা কাকার সঙ্গে এখানে আছে। তার তো এখনো বিয়ে হয়নি।"

"তোমার সখীটিকে নিমন্ত্রণ করেছ তো?"

"করেছি, কিন্তু তাদের বাড়ীই আমাদের আগে যেতে হবে, সে বলেছে।"

"বেশ তো, তাই যাওয়া যাবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় মণিভূষণ স্ত্রীর মনটি প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইল।

ক্রমশঃ

৺সরোজবাসিনী গুপ্তা

আশাতীত

তোমায় আমায় হয় না মিলন
মধুরাতে,
ঘুম ভেঙ্গে মুখ দেখিনা তোমার
কোন প্রাতে।
কাটে না রজনী তোমার বাহুতে
বাহু বেঁধে,
ব্যর্থ দিবস তোমার বিরহে
মরি কেঁদে।
নাই আমাদের ছল করে করে
ফিরে চাওয়া,
নাই আমাদের প্রেমের তুফানে
দোল খাওয়া।
তোমায় আমায় হাসি-চাহনিতে
নাই ভাষা,
আমার কথাটি বাঁধে না তোমার
প্রাণে বাসা।
কাছে নাই তুমি, কাছে আসিলেও
কত দূর!
আমার কণ্ঠে তোমার গানের
নাই সুর।
স্তব্ধ নীরব চিত্ত তোমার
কোন্ ধ্যানে!
উদাস নয়ন ফেরাও না তাই
মোর পানে।
আকাশের রবি, নলিনীরে শুধু
বাস ভালো?
মাটিতে মিলায় বনফুল,—সেও
চায় আলো!
বর্ষার মেঘ, চাতকের শুধু
মিটাও আশ?
বোঝ না মরুর বুকভরা কেন
তপ্তশ্বাস?

বোঝ না কিছুই বোঝাতেও তাই
নারি কিছু,
তুমি চলে যাও সম্মুখে, আমি
থাকি পিছু।
প্রেম-নিবেদন গাথাটি কেবল
গাঁথি গানে,
গোপন-বাসনা চাই না শোনাতে
তব কাণে।
পদরেণু যদি মোছাতে না পারি
এই কেশে,
তোমার পথের ধূলা মেখে লব
সারা বেশে।
পাইনি তোমায় পাব না কখনও
জানি আমি।
চাইনিও বেশি, শুধু দেখা চাই
দিন যামী।
তাও যদি নাহি থাকে পোড়া ভালে
জনম ভোর,
থাকে যেন হয়ে এ জীবনভরে
স্বপন-ঘোর।
স্বপনে তোমায় বুকে নিয়ে যেন
চলি পথ,
তাতেই পুরিবে এই জনমের
মনোরথ।

* * * * *

অশ্রুসাগর বহে সীমাহীন
তীরে আমি,
কালো নিশীথিনী চোখের উপর
আসে নামি।
কই তুমি প্রিয়! কোথাও না পাই
কোন দিশা!
চিরদিন তরে রয়ে গেল বুক-
ভরা তৃষা!

শ্রীসুনীতি দেবী

সামাজিক ব্যাধি ও তাহার বিষময় ফল

বর্ত্তমানে আমাদের দেশ স্বরাজ লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব—স্বরাজই আজ জাতির কামনা,—স্বরাজই সাধনা, এই স্বরাজ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে কোন্ পথে চলিতে হইবে, কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, এবিষয় লইয়া দেশের নেতা ও মনীষিগণ মাথা ঘামাইতেছেন। স্থূলতঃ, একটা জাতিকে উঠিতে হইলে সর্ব্ববিষয়ে সকল প্রকার সংস্কার সাধন আবশ্যক। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির পরিবর্ত্তন ও সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধী হওয়া কাহারও উচিত নহে, কারণ একটী জাতির মঙ্গলের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনও বিশেষ দরকার। বস্তুতঃ, রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টার চেয়ে কোন অংশে ছোট নয়। আশাকরি, যাঁহারা এই প্রবন্ধ লেখকের গতিবিধি ও কার্য্যপ্রণালী বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সহসা অনুযোগ করিবেন না যে একজন বিজ্ঞানসেবীর পক্ষে এটা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। শতবৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন সে পথ ভুলিয়া আজ আমরা বিপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছি। রাজর্ষি রামমোহন বলিয়াছিলেন যে জাতীয় উন্নতির সহায়তা ক'রে রাজনৈতিক আন্দোলন ও হিন্দু সমাজ সংস্কার আজ কম্পাস হারাইয়া গিয়াছে, তাই আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যে কত আবর্জ্জনা দুর্নীতি ও ব্যাধি পুঞ্জীকৃত হইয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে ও হতাশে অভিভূত হইতে হয়। কত কপটাচার, কত দারুণ অনাচার যে আমাদের সমাজকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কোকনদ সামাজিক অধিবেশনে (Social Conference) মান্দ্রাজ হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারক স্যার সদাশিব আয়ার বলিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিষময় ফলই আজ আমাদের সামাজিক দুরবস্থার কারণ। এই প্রবন্ধ লেখক অ-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভুক্ত, সুতরাং বিদ্বেষবশতঃ ব্রাহ্মণদের নিন্দা করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক না হইলেও সম্ভবপর, কিন্তু স্যার সদাশিব আয়ার একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তিনি যখন নিজের সম্প্রদায়ের প্রতিকূলে কোন কথা বলেন তখন তাহার নিশ্চয়ই মূল্য আছে।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে পাটনার জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক এই প্রবন্ধ লেখককে বলিয়াছিলেন যে বিহার প্রদেশে ব্রাহ্মণদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। মান্দ্রাজে নিম্ন জাতির অবস্থা যেরূপ, বিহারে উচ্চবর্ণভুক্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা তাহা অপেক্ষা শোচনীয়। বিহারে ব্রাহ্মণেরা—পৈতাধারী দোবে চোবে প্রভৃতি—হালচাষ করে, গরুর গাড়ী চালায়, না হয় বড় জোর বাংলাদেশে আসিয়া দরওয়ানগিরী গ্রহণ করে। বিহারে লালা সমাজই প্রবল;

সেইজন্যই আশা হয় আর কয়েক বৎসরের মধ্যে বিহারে উচ্চ নীচ বর্ণ-সমস্যার সমাধান হইবে।

আপনারা সকলেই জানেন মান্দ্রাজে বর্ণসমস্যা বড়ই প্রবল। সেখানে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ৩৩০ লক্ষ এবং ইহার মধ্যে মাত্র ১৫ লক্ষ ব্রাহ্মণ। আয়ার আয়াঙ্গারগণও এই ১৫ লক্ষের মধ্যে। শুধু মান্দ্রাজে নয়, সবদেশের অবস্থা একই প্রকার। প্রত্যেক দেশেই সমগ্র হিন্দু অধিবাসীর তুলনায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের সংখ্যা খুবই কম, তারপর এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই আবার নামে মাত্র ব্রাহ্মণ, ব্যবসায় হিসাবে কেউ বানিয়া, কেউ কুশীদজীবী, কেউ বা কৃষক। বাংলাদেশের মোট লোক সংখ্যা প্রায় ৪৭৫ লক্ষ, ইহার মধ্যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ২৫ লক্ষের কিছু উপর এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। ব্রাহ্মণ বলিলে শুধু চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী লোকগুলিকে বুঝায় না। তাঁহারা ছাড়া আরও অনেকরকম ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে আছে। 'পূজারী ব্রাহ্মণ,' 'অগ্রদানী ব্রাহ্মণ' 'ভিখারী ব্রাহ্মণ' এমন কি 'বামুন ঠাকুর' পর্য্যন্ত আজকাল বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পর্য্যায়-ভুক্ত। পূজারী ব্রাহ্মণ বলিতে কি বুঝায় তাহা অনেকেই জানেন। ইঁহারা ৺লক্ষ্মীপূজা করেন, দক্ষিণা দুই পয়সা, অবশ্য আতপ চাউল ও কাঁচকলা কিছু পাইয়াই থাকেন। একই দিনে কুড়ি বাড়ী ঘুরিয়া কোন প্রকারে তেল নুনের পয়সার সংস্থান করেন। আর বামুন ঠাকুর বলিতে যে কোন্ শ্রেণীর জীব বুঝায়, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, এ জীবনে বামুন ঠাকুরের স্পৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন খাইবার প্রবৃত্তি আমার হইল না এবং এই মহাপুরুষদের গুণাবলীর পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে একপ্রকার অনধিকার চর্চ্চা বলিলেও চলে।

ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের এই দুর্দ্দশার কারণ কি? অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বংশগত প্রাধান্যই এই দুর্দ্দশার প্রধান কারণ, যতদিন কৌলিন্য প্রথা জন্মগত ছিল, ততদিন গুণানুশীলন ছিল, নিজেকে কুলীন প্রমাণ করিতে হইলে আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় দিতে হইত। যে সময় হইতে কৌলীন্য বংশগত হইয়া পড়িল তখন হইতেই সমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণের সন্তান মূর্খ হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল—সমাজের নেতারাও প্রতিবাদ করিলেন না। সেই সময় হইতেই এই দুর্দ্দশার আরম্ভ—আজও আমরা ঐ শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আছি। কিন্তু ইংলণ্ড বা ফ্রান্সে এরূপ কোনো নিয়ম নাই। নিজের গুণাবলীর পরিচয় না দিতে পারিলে সেখানে কেহই বড় হইতে পারে না। ইউরোপে ও আমেরিকায় সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা নিজেদের উৎসাহ, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে বড় হইয়া থাকেন। Hergreave ও Arkwright-এর নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন।

Hergreave তন্তুবায়ের ছেলে আর Arkwright নিজে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা যে-সব নূতন আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আজ তাঁহারা জগতের বিখ্যাত আবিষ্কর্ত্তাদের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অধ্যবসায়ের ফলে মাঞ্চেষ্টারের সূতার ও কাপড়ের কলের যে আজ কত শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা সকলেই জানেন বোধহয়। Faradayর পিতা কর্ম্মকার ছিলেন আর তিনি নিজে ছেলেবেলায় দপ্তরীর তাঁবেদার ছিলেন। নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি বিজ্ঞান সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি তড়িৎ-সংক্রান্ত এত গবেষণা ও উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন যে, একটা প্রবাদ হইয়াছে 'Faraday is Electricity, or Electricity is Faraday'.

সকলেই জানেন বিলাতের শ্রমিকদলের নেতা রামসে ম্যাকডোনাল্ড খুব গরীবের ছেলে। গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেট মিনিষ্টারদের মধ্যে অনেকে কয়লার খাদে পর্য্যন্ত কাজ করিতেন। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত উচ্চশিক্ষালাভে সমর্থ না হইলেও, সম্মানে মর্য্যাদায় ও আভিজাত্যে আজ তাঁহারা কত উচ্চে সমাসীন, নীচবংশে জাত বলিয়া কেউ তাঁহাদের পায়ের নীচে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের দেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। এখানে সম্মান পায় উচ্চবর্ণের লোক সকল, অভিজাত্যের গর্ব্ব করেন উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত জমিদারগণ, নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্তের সম্মান লাভ করিবার বংশগত অধিকার এখানে নাই। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া সমাজে অপর জাতির মধ্যেও অনেক মনীষী আছেন, অনেক মহাপ্রাণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহারা যে কোন জাতির মধ্যে সম্মানের আসন পাইতে পারেন,—মহেন্দ্রলাল সরকার, কৃষ্ণদাস পাল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি বাংলা দেশের গৌরবের বস্তু। মেঘনাদের মত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ভারতবর্ষে অতি অল্প লোকেরই আছে। অদূর ভবিষ্যতে তিনি নোবেল পুরষ্কার পাইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, কিন্তু হইলে কি হয়। আমার বিশ্বাস, কোন কায়স্থ ব্রাহ্মণ ইঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে রাজী হইবেন না। কিন্তু বিলাতে সদ্‌গুণেই মানুষ বড় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যে কোন সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তি নিজের কৃতিত্ব বলে আভিজাত্য লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ভারতে 'অন্ত্যজ' হইলে আর রক্ষা নাই, সব রসাতলে যায়। 'Once a Shaha, always a Shaha' এ কি অন্যায় অবিচার।

মেদিনীপুর জিলায় কায়স্থ ব্রাহ্মণের সংখ্যা খুব কম,—শতকরা ৮০ জন মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। এই মাহিষ্য সম্প্রদায়ের ভিতর অনেক মনীষী আছেন, উপেন্দ্রনাথ মাইতি, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শরৎচন্দ্র জানা প্রভৃতি অতি শিক্ষিত উচ্চদরের লোক, কিন্তু সমাজে ইঁহাদের অন্য কোন গতি নাই, নিজে যতই শিক্ষিত হউন না কেন, বিবাহ করিতে হইবে ঐ মাহিষ্য সম্প্রদায়ের কোন অশিক্ষিত মেয়েকে। হিন্দু সমাজের ইহাই বিধি। কিন্তু ইহাতে যে

সমাজের কতদূর অনিষ্ট হইতেছে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি! জাতিভেদের এই কঠোর নিগড়ের চাপে জাতীয় উন্নতির পথে আমরা যে দিন দিন পিছাইয়া পড়িতেছি, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন? সমগ্র বাংলা দেশে মাত্র শতকরা ১০ জন শিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত, আর এই শিক্ষিতের সংখ্যা ঐ ২৫ লক্ষ ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে আবদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহা হইলে দেখুন সমস্ত বাংলা দেশের প্রতিভা শুধু এই কয়েক সহস্র লোকের মধ্যে আবদ্ধ। জাতিভেদের কঠোরতাই এই দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ।

মুসলমান ভাইদের মধ্যে এ আপদ নাই, তাঁহাদের মধ্যে ছুঁৎমার্গও নাই, জাতিভেদের অনাচারও নাই। ব্যবসায়ক্ষেত্রে যেমন ভাটিয়া, মারোয়ারী ও দিল্লীওয়ালা বাঙালীদের অপসারিত করিতেছে কি করিয়াছে, সেইরূপ কতগুলি চাকুরী মুসলমানদের একচেটিয়া; খানসামা বাবুর্চ্চি চামড়ার ব্যবসায় দপ্তরিগিরি প্রভৃতি মুসলমানদের একচেটিয়া,—এ সমস্ত ব্যবসায়ে হিন্দু নাই। তাহার কারণ মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, হিন্দুদের মধ্যে আছে, বাংলা দেশে কয়েক লক্ষ সারেং আছে তাহাদের মধ্যে একজনও হিন্দু নয়। বিজ্ঞান কলেজের জনৈক সহাধ্যাপক বলেন যে চট্টগ্রাম জিলার কোন কোন গ্রামে প্রতিমাসে মণিঅর্ডার যোগে বিদেশ হইতে প্রায় ৪০,০০০ টাকা আসে। ঐ গ্রামে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৯৫ জন। কোন হিন্দুপ্রধান গ্রামে এরূপ দেখি নাই বা শুনি নাই।

সে দিন দেখিলাম পদ্মার চরে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে কত শত লোক বাস করিতেছে। যখন পদ্মায় চর পড়িয়া নূতন জমির আবির্ভাব হয়, তখন ঐ জমির দখলী স্বত্ব লইবার জন্য নিকটবর্ত্তী মুসলমানেরা চরের উপর ঘর বান্ধিয়া বাস করে এবং ঐ পলিজমির উর্ব্বরাশক্তি খুব বেশী বলিয়া দখল করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। তাহারা যেমন কষ্টসহিষ্ণু তেমনই সবল ও হৃষ্টপুষ্ট, তাহাদের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আছে!

আবার আশ্বিন মাসে দলে দলে মুসলমান যাইয়া আসামে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। আসামের স্থানীয় লোকেরা আলস্যপরায়ণ, পরিশ্রম করিতে নারাজ, সেইজন্য মৈমনসিংহের মুসলমানেরা দিন দিন চাষ আবাদ কার্য্যে আসামীদিগকে অপসারিত করিতেছে। আর স্থানীয় কৃষকেরা ১ বিঘা পৈতৃক জমি লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, বিবাদ-বিসম্বাদ মামলা-মকদ্দমা করিয়া উৎসন্নে যাইতেছে।

শিক্ষিত হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সরকারের চাকুরী করিবার নেশা প্রায় শতকরা ৯৯ জনের আছে। কিন্তু এই চাকুরীজীবীর সংখ্যা কত কম তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। পাঁচ কোটী বাঙালীর মধ্যে মাত্র ৩ লক্ষ ২১ হাজার সরকারের বেতনভোগী। সরকারের বেতন ভোগী বলিতে গ্রামের চৌকিদার হইতে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সকলকেই বুঝায়। তাহা হইলে দেখুন প্রায় প্রতি ১৬০ জনের মধ্যে একজন গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী। তবুও এই চাকুরীর

প্রায় ২৫০—৩০০ বৎসর পূর্ব্বে, মুসলমান রাজত্বের সময়, হিন্দুসমাজের সংরক্ষণের নিমিত্ত নবদ্বীপে বসিয়া রঘুনন্দন সমাজের দেহে কঠোর আচার (?) ব্যবহারের গুরুভার তুলিয়া দিলেন। ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত গণ্ডীর সৃষ্টি করিয়া হিন্দুসমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও বিশিষ্টতা বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু কঠোর আচার ব্যবহার ও ছুঁৎমার্গের সু-উচ্চ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কোন সমাজ বেশী দিন বাঁচিতে পারে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া না চলিলে যে সমাজ ও জাতির পক্ষে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই বেশী হয়, একথা কেহই স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিলেন না। ফলে, মুসলমান ধর্ম্মের উদারতা ও সার্ব্বজনীনতার প্রভাবে দেশের তথাকথিত নিম্নজাতিভুক্ত অনেকেই ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে বলিয়া থাকেন যে হিন্দুসমাজের কঠোরতা ও ইসলাম সমাজের উদারতাই ইহার কারণ নহে; ইহা রাজশক্তির প্রভাব মাত্র। কিন্তু তাহা ভুল, দেখা গিয়াছে দিল্লী বা মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে যত লোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, রাজধানীর দূরবর্ত্তী স্থানে ধর্ম্মান্তর গৃহীতার সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক বেশী। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের প্রধান কারণ ঐ ধর্ম্মের সাম্যবাদিতা। বাদশাই হৌক আর ফকিরই হৌক সবাই এক সঙ্গে নামাজ পড়ে, এক সঙ্গে আহারাদি করে। ধর্ম্ম হিসাবে একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের সহিত মোটেই পৃথক নয়, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে তেমন কোন নিয়ম নাই। বাংলার মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৫৫ জন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই জাতির হিসাবে হিন্দু—তাহাদের অনেকের ধমনীতেই হিন্দুরক্ত প্রবাহিত।

সকলেই বলিয়া থাকেন যে স্বরাজ লাভের পথে জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক একতার প্রয়োজন খুব বেশী, আজ হিন্দু মুসলমান একতার জন্য অনেকে অনেক চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু একই ধর্ম্মের মধ্যে উন্নত ও অবনত সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ও সাম্যভাব স্থাপনের চেষ্টা করা কি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন নয়? হিন্দুধর্ম্মের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামাজিক বিভিন্নতা ও অন্যান্য ভেদ নীতি আছে তাহা দূর না করিলে কি জাতীয় উন্নতি কোন দিন সম্ভব হইবে? ফরিদপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় তথাকথিত উচ্চ সম্প্রদায়ের উপর কিরূপ খড়্গহস্ত তাহা সকলেই জানেন, মান্দ্রাজে অব্রাহ্মণদের অবস্থা কতদূর শোচনীয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নড়াইলের ঘটনা বোধ হয় অনেকের স্মরণ আছে। একজন নমঃশূদ্র উকিলকে Bar Libraryতে কি জঘন্য অবিচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইনিই যদি উকিল না হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেন তবে সকলেই 'হুজুর হুজুর' করিতেন। মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণেরা প্যারিয়ার ছায়া স্পর্শ করেন না, কিন্তু ঐ প্যারিয়া যদি হ্যাটকোটধারী খৃষ্টিয়ান হয়েন তবে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরাই তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে চেয়ারে বসাইতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। এইরূপ অবিচার ও সহানুভূতির অভাবে বৎসর বৎসর শত সহস্র নিম্ন-

সম্প্রদায় ভুক্ত লোক ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়।'

মুকুন্দ দাসের নাম সকলেই জানেন। তিনি একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক। যাত্রাগান করিয়া তাহার উদ্বৃত্ত অর্থ তিনি নানা প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকেন। শুধু তাই নয়, তাঁহার গানের ভিতর দিয়া সমাজের অনাচার ও দুর্নীতির যে ছবি তিনি সাধারণের সম্মুখে ধরিয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিকই অতীব শিক্ষাপ্রদ ও প্রশংসনীয়, তাঁহার দল একবার মেদিনীপুরে গিয়াছিল, আমি তখন মেদিনীপুরে ছিলাম, মুকুন্দবাবুর দলের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ ও ২।৩ জন নিম্নশ্রেণীর লোক আছেন। দেখিলাম একই আচ্ছাদনের নিম্নে প্রায় ২০ হাত তফাতে ইহাদের আহারের আসন করা হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ ছেলেটী খাইতে আপত্তি করিল, পরে অন্য স্থানে তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। আমি মুকুন্দবাবুকে বলিলাম, "আপনি এ কি করিতেছেন? আপনি শিক্ষা দেন এক রকম আর আচরণ করেন তার বিপরীত। ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেটীকে এখনই পেন্সন দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিন্।"

পল্টনে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে—ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ও আছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে এত বেশী গোঁড়ামি নাই, অন্ততঃ আহার হিসাবে, প্রত্যেকে নিজের গণ্ডীর ভিতর রন্ধন ও আহারাদি করে—আচ্ছাদন-দোষ তাহাদের মধ্যে নাই। এই যে সব অনাচার হিন্দু সমাজ আশ্রয় করিয়া আছে—ইহাতে আমাদের দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে।

হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহানুভূতির অভাব খুব বেশী, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রায়ই সাম্প্রদায়িক বিরোধ ভীষণ আকার ধারণ করে। মুসলমানদের সহিত বানিয়াদের ঝগড়া বা মারামারি হইলে ছত্রীরা চুপ করিয়া থাকে। হিন্দুসমাজের কোন সম্প্রদায় বিপদে পড়িলে অন্য সম্প্রদায় তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ইহার বিপরীত ভাবই দেখা যায়। একজন মুসলমান বিপদে পড়িলে তৎক্ষণাৎ শত শত মুসলমান আসিয়া সাহায্যার্থ তাহার পিছনে দাঁড়ায়।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আলুর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আয়ারল্যাণ্ড হইতে দলে দলে লোক যাইয়া আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ইউরোপ হইতেও বহুলোক আমেরিকায় বসবাস করিয়াছে বা করিতেছে, যদিও তাহারা বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় ভুক্ত তথাপি তাহাদের মধ্যে অনায়াসে সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—হিন্দু সমাজের মত তাহাদের ভিতর বাঁধাধরা নিয়ম নাই। হাঙ্গেরীতেও ম্যাগেয়ার শ্লোভাক জোকো শ্লোভাক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় আছে কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও সামাজিক গণ্ডী নাই; সেইজন্য জাতীয় উন্নতি বা একতার পক্ষে সমাজ কোন বিরোধের সৃষ্টি করে না। আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক বিভিন্নতাই জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়। এক ব্রাহ্মণ

সমাজের ভিতর কত শাখা-প্রশাখা। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের ভিতর ছোট-খাট এত বেশী সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা ও অমিল রহিয়াছে যে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এই সব কৃত্রিম বাধা বিপত্তির কিছুতেই ধ্বংস হইতেছে না, লেখাপড়া শিখিয়াও, বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াও একজন বারেন্দ্র একজন রাঢ়ীশ্রেণীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন না। যাহারা স্বরাজের জন্য এত ব্যস্ত তাহাদের মধ্যেও অনেকে কৌলিন্য প্রথা ভাঙ্গিয়া দিতে ভয় পাইবেন। যাহা ভাল, যাহা সমাজের পক্ষে, দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক সে কাজ করিবার সৎসাহস শতকরা একটী লোকেরও নাই। বক্তৃতামঞ্চে বা সভার ভিতর মনের ভাব যাহাই থাকুক না কেন কাজের সময় সব সাহস, উৎসাহ, গ্রীষ্মকালে ঈথরের মত উপিয়া যায়।

আজ যদি ৫ কোটী বাঙালীর এক° শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিবার সমান সুবিধা থাকিত, তবে কত উন্নতি হইত। শিক্ষিতের সংখ্যাও বাঙালার তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীদের মধ্যেই আবদ্ধ। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে অনুন্নতদের শিক্ষা বিধানের চেষ্টা হইতেছে। নীরব ও অক্লান্ত-কর্ম্মী শ্রদ্ধেয় রাজমোহন বাবু সমস্ত বাংলাদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রায় ১১০০০ বালক ও ৪০০০ বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। যশোহরের নিকট নমঃশূদ্রদের একটী ইংরাজী স্কুল আছে। স্থানীয় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা রাত্রে খাটিয়া নিজেরা ঐ স্কুল স্থাপন করিয়াছে। তাঁহাদের স্বাবলম্বন অতীব প্রশংসনীয়। কিন্তু শিক্ষিত ও বর্দ্ধিষ্ঠ লোকসমূহের মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধানে সহায়তার দৃষ্টান্ত খুবই কম। কোন জমিদার আমাকে বলিয়াছিলেন, "চাষারা বা নিম্নশ্রেণীর প্রজারা চেক দাখিলা পড়তে শিখলে বড্ড অসুবিধা হ'বে—সেই জন্যই অনেক জমিদার প্রজাদের শিক্ষাবিধানে সচেষ্ট হয়েন না।"

নিম্ন বর্ণের লোকসমূহের মধ্যে তথাকথিত উচ্চবর্ণের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিবার ইচ্ছা বরাবরই আছে। কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর অনেকে পৈতা গ্রহণ করিতে সুরু করিয়াছে। আমরা অনেক সময় ব্রাহ্মণদের নিন্দা করি। কিন্তু আমরা 'দ্বিজ' হইয়া ব্রাহ্মণ আধিপত্য আরও প্রবল ও সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছি। পূর্ব্বে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহারা বন্য বরাহ ভক্ষণ করিত। এখন উচ্চশ্রেণীর অনুকরণে এইসকল প্রথা লোপ পাইতেছে। আমরা কেবল প্রথাই অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে শিখিয়াছি—চরিত্র ও সৎস্বভাব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা আমাদের মধ্যে খুবই কম।

আজকাল হিন্দুমুসলমান সমস্যা একটু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এতে মুসলমান ভাইদের চঞ্চল হইবার কোন কারণ নেই। ৫০ বৎসর পরে সবই নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। যে অনুপাতে বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা লোপ পাইতেছে এবং বাঙালী মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে মনে হয় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে শতকরা নব্বই জন মুসলমান হইয়া

যাইবে। তাহা হইলে বাংলাদেশে মুসলমানদের আক্ষেপ বা আপত্তির আর কিছুই থাকিবে না। হিন্দু সংগঠন ও শুদ্ধি আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু যতদিন হিন্দুসমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা ও ছুঁৎমার্গ দূর না হইবে ততদিন একশত স্বামী শ্রদ্ধানন্দেরও বিরাট চেষ্টা উষর ভূমিতে বীজ বপনের মত বিফল হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

হে ফাল্গুন

আবার আমার দ্বারে এলে তুমি হে নিত্য নূতন
হে ফাল্গুন
ল'য়ে তব সুষমা-সম্ভার,
বারম্বার
নমস্কার তোমা' নমস্কার॥
বর্ষে বর্ষে আস নেমে ধরার ধূলায়
সাজাইয়া দিতে তারে পুষ্পমাল্যে সুশ্যামল তৃণে
ভরে দিতে দিনে দিনে
নিভৃতে নীরবে
গীত রবে
পাখীর কুলায়;
তাই দেখি পত্রহীন পুষ্পহীন শাখে
তব ডাকে
মর্ম্মরিয়া ওঠে শত নব কিসলয়
কুসুম-নিচয়;
অকস্মাৎ মূককণ্ঠে হয় শুনি ভাষার সঞ্চার
দিগ্‌বিদিক্ উদ্ভাসিয়া ওঠে গানে গানে
পিক পাপিয়ার।
তুমি যে ধরার বক্ষে দিয়ে যাও প্রাণের স্পন্দন,
সঞ্জীবনী সুধা-স্নানে করে দাও তারে সযৌবন।
চঞ্চল রক্তের ধারা ধরা ধমনীতে
নিত্য দুলে দুলে ওঠে যৌবনের গীতে;
বিনিদ্র রজনী তার কেটে যায় হায়
কার প্রতীক্ষায়?
তার দীর্ঘশ্বাস
ভরে দেয় দক্ষিণের দক্ষিণা-বাতাস।
তোমার মদির স্পর্শে ওঠে ভরে
এ বিশ্বভুবনে
রঙিন্ স্বপনে;
তারি তরে
অস্ত রবি
—সন্ধ্যা কবি—
আনমনে করিছে বপন
সোণার স্বপন;
তারি তরে,
মলয়বিহ্বল রাতে
জ্যোছনার স্বপ্ন জাগে নীলিমার নীল-আঁখিপাতে।
অজানা লগনে কোন্ যৌবনের জয়মাল্য লয়ে
মরমের নিরালা নিলয়ে
নিঃশব্দে পশিয়া কবে গিয়াছে বরিয়া
অজানা সে প্রিয়া;
সে মালার পরশনে
ক্ষণে ক্ষণে
ভরে ওঠে হিয়া,
যতন করিয়া রাখি যাহা পাই তাই
কার তরে নাহি আমি জানি;
আজি মানি
ব্যর্থ হল সব। সঞ্চয়ের কারাগারে
বারে বারে
বদ্ধ প্রাণ বেদনা ব্যাকুল
সব ভুল সব হল ভুল।
রিক্ততার আনন্দেতে মেতে, তুমি দাও তুমি শুধু দাও
তাই না হারাও
সে অমৃত ধন
চিত্ত ভার নিত্য তব প্রাণের স্পন্দন।
জমাইয়া রাখি আমি তাই
যাহা পাই সকলই হারাই।
নাহি মোর অবকাশ বিলাইতে সঞ্চয়ের ধন
হিয়া ভরে তাই শুধু ওঠে বেজে
অনিত্যের শাশ্বত ক্রন্দন॥

শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়চৌধুরী।

কীর্ত্তন ও উচ্চ সঙ্গীত

(সমালোচনার প্রত্যুত্তর)

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, আমার 'কীর্ত্তন ও উচ্চ-সঙ্গীত' প্রবন্ধটীর সমালোচনা করেছেন দেখে আনন্দ যে হয়েছে, এ কথা না বল্লে মিথ্যা বলা হবে। কেননা আমার মত ক্ষুদ্র শ্রেণীর লেখিকার প্রবন্ধের মূল্য তখনই আমি পাই যখন কোন বড় বা গণ্যমান্য লেখক তার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। কাজেই গর্ব্ব আমার না হয়েই পারে না। এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে যে অসম সাহসের পরিচয় দিতে হবে, তার জন্য হয়ত হাস্যাস্পদ আমায় হতে হবে ; তবে, সেজন্য লজ্জিত আমি নই, যেহেতু, মানুষ মাত্রেরই তার মতামত বা মনের ধারণা লিপিবদ্ধ করবার অধিকার আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার 'কীর্ত্তন' প্রবন্ধটি পাঠ করে কীর্ত্তনের উচ্চতা সম্বন্ধে আমার ধারণা বা মতামত এখন সুধী পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন। কাজেই সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে পুনরুল্লেখ না করে, উচ্চ সঙ্গীতের সঙ্গে কীর্ত্তনের সুরের দিক্ দিয়ে দীনতার বিষয়, অর্থাৎ সঙ্গীতের যে দিক্ দিয়ে আমি কীর্ত্তনকে খর্ব্ব করেছি, সেই দিক্ দিয়েই আলোচনা করা এখন আমার অভিপ্রেত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের, 'সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ যে সুর' এবিষয়ে আমার সহিত মতভেদ নেই (বঙ্গবাণী অগ্রহায়ণ ৪৯৮ পৃষ্ঠা)। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। সমালোচনার প্রথমেই তিনি জানিয়েছেন, উচ্চসঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ। যদি একথা সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে উচ্চসঙ্গীত কেন শ্রেষ্ঠ, উচ্চসঙ্গীত বল্‌তে কেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকেই বিশেষভাবে বলা হয়, এসম্বন্ধে তাঁকে যুক্তিদ্বারা বোঝানো, কি বোঝাবার বিফল চেষ্টাকে ব্যর্থতায় পরিণত করা হয় না ? তবে যদি অজ্ঞতা স্বীকার অর্থে বিনয় মেনে নেওয়া হয়, তাহলেই আমার বক্তব্য আমি যুক্তিদ্বারা বোঝাবার চেষ্টাকে সফল বা সার্থক করে তুলতে অন্ততঃ চেষ্টা করতে পারি।

শ্রদ্ধেয় মিত্রমহাশয় লিখেছেন আমি যে 'উচ্চসঙ্গীত বা High class music' বল্‌তে শুধু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতই বুঝি এর কোনও অভিধানিক তত্ত্ব নির্ণয় করতে তিনি অক্ষম। বড়ই দুঃখ হয়, যখন তাঁর মত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিকে 'অভিধানিক' তত্ত্বের মধ্যে সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব খুঁজবার ব্যর্থ প্রয়াসে নিযুক্ত হতে দেখি। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, অনুভূতির বা realisation এর জিনিষ বুঝতে হ'লে কি "অভিধানিক তত্ত্ব নির্ণয়" এর দরকার করে ? যুক্তি বা তর্কের দ্বারা মানুষ কি অনুভূতি এনে দিতে পারে ? সঙ্গীত আমি অনুভূতির জিনিষ বলেই জানি, অন্ততঃ আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় আমি তাই জেনেছি। সমস্ত সঙ্গীতের ভিতর (আমাদের ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতই না হয় ধরে নেওয়া হোক) সুরের দিক দিয়ে তার চরম বিকাশ। একমাত্র হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেই দেখতে পাওয়া গিয়েছে, এবং তাকে হৃদয়ঙ্গম ক'রে বড় আবেদন বা অনুভূতি পাওয়া গিয়েছে বলেই তাকে উচ্চ সঙ্গীত বা সঙ্গীতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। সঙ্গীত অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই বোধ করি এসম্বন্ধে আমার সহিত এক মতই হবেন। যে সুর কথার এলাকার ভিতর গিয়ে পড়ে, তার গতি সীমার গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ না হয়ে পারে কি ? কথা বাদ দিয়ে যে কীর্ত্তন হয়না একথা সবাই স্বীকার কর্ব্বেন।

তাহলেই কি দেখা যায় না, সুরের অবাধ গতিকে, কথার বেড়ায় আটকে দেওয়া হচ্ছে? তাহলে কি বোঝা যায় না, তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে পরের উপর—স্বাধীন সে নয়? স্বাধীনতার হীনতায়, পূর্ণরূপ বা পূর্ণভাব কি বিকাশের সম্পূর্ণতা লাভ করে? কথার শাসনের জন্য কি তার নিজেকে অনেকটা আড়ালে রাখতে হয় না? তবে এ আড়াল, বা কথার সঙ্গে এই সংমিশ্রণে, কোনও বড় আবেদন বা অনুভূতি নেই, একথা বলছি ভাবলে আমায় ভুল বোঝা হবে। আমি কেবল সুর নিয়েই বিচার করছি, সেজন্য সঙ্গীত হিসাবে তাকে শ্রেষ্ঠ না বল্লেও আর সংমিশ্রণের আবেদন যে কত বড়, সে আমি আমার গত প্রবন্ধে একাধিকবার বলেছি। তবে সে আবেদন অন্য ভাবের, বিশুদ্ধ সঙ্গীতের কি? বিশুদ্ধ সঙ্গীতানন্দ বলতে আমি এই বলতে চাই, যে আনন্দ বা আবেদন কেবলমাত্র সুর থেকে পাই। সুরের মধ্যে যে প্রাণ (soul) আছে, সুরের মধ্যেও যে বিশিষ্ট রূপ আছে, তারও নিজস্ব যে একটা গতি আছে এবং ভাব আছে, এটা কথাহীন কণ্ঠ-সঙ্গীত অথবা 'আলাপ' যিনিই শুনেছেন, তিনিই জানেন। অতি প্রত্যুষে, যিনি ভৈরোঁ, ভৈরবী, আশাবরী, রামকেলী, ললিত, টোড়ী, ইত্যাদি সুর, এবং প্রদোষে পূরবী, পুরিয়া, বেহাগ, ইমন, ছায়ানট (কত নাম করব) প্রভৃতি সুরের আলাপ শ্রবণে তন্ময় বা মুগ্ধ হয়েছেন, তিনিই সুরের অসীমত্বের পরিচয় পেয়েছেন। আবারও বলছি, বিশুদ্ধ সঙ্গীতানন্দ তাকেই বলি, যখন কেবল সুরেই প্রাণ মাতিয়ে দেয়, হৃদয় হরণ করে নেয়, আপনাকে ভুলিয়ে দেয়,—কথার অর্থ বা গভীরতার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় না, মন উৎসুক হয় না। সুর তখন একাই একেশ্বর, সুর তখন একাই সঙ্গীতের দেবতা, সঙ্গীতের উপাস্য—অন্তর তখন তারই পূজারী! এযে অন্তর দিয়ে বুঝতে হয়, যুক্তির দ্বারা বোঝাব কেমন করে! আমি শ্রদ্ধেয় মিত্র মহোদয়কে সশ্রদ্ধ অনুরোধ করে, শ্রদ্ধেয় রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুরের (অতি উচ্চশিক্ষিত আমাদেরই বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানীও নন বা পেশাদার গাইয়েও নন) কণ্ঠে ভৈরবীতে বা সিন্ধুতে আলাপ বা হিন্দুস্থানী কোনও গান তিনি একবার শ্রবণ করুন, যদি সে সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণের সৌভাগ্য তাঁর না হয়ে থাকে। আর যদি সে সৌভাগ্য থেকে তিনি বঞ্চিত না হয়ে থাকেন, তবে তাঁর মতো উচ্চ শিক্ষিত ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি যখন সেই মনোমুগ্ধকারিণী সুরের অসীম শক্তিকে, কীর্ত্তনের অসীম সুরেরই পাশে, একই আসরে স্থান দেন, তখনই সঙ্গীতের প্রিয় সেবক বা ভক্তদের ক্ষোভের কারণ না হয়েই পারে না।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুরকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। আমাদের কীর্ত্তনে তা সম্পূর্ণ হয় না বা হতে পারে না। তার একটী কারণ, কথা, তার অর্থ ও অর্থের গভীরতা। অর্থের গভীরতা বা গাম্ভীর্য্যের জন্য সুরকে অনেকখানি সংযম স্বীকার করতে বাধ্য করে এবং আর একটী প্রধান কারণ, কীর্ত্তনে ভক্তিরসের * অর্থাৎ ভগবৎ প্রেমের গানই গীত হয়ে থাকে, (এটা সমালোচক মহাশয়ও হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন)

---

* কীর্ত্তনে ভক্তিরসের গানই গীত হয়ে থাকে' বলার অর্থে কেহ যেন আমি 'বাৎসল্য রস' 'সখ্য রস', 'মাধুর্য্য রস' ইত্যাদি সব রস থেকেই কীর্ত্তনকে বঞ্চিত করেছি ভাবেন না। কেন না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-সংক্রান্ত এ সব রসের মূলে ভক্তিই নিহিত আছে বলে ভক্তিরসের বা ভগবত প্রেমের গান বলেছি। যেমন একটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ—বাৎসল্য রস। মা যশোদার, বালক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপরূপ বাৎসল্যে, আমাদের মনে বা অন্তরে, 'বাৎসল্য' ভাবই না জেগে, সেই 'বাৎসল্য রসকে' উপলব্ধি করতে গিয়ে ভক্তি ভাবই জেগে ওঠে অর্থাৎ 'আহা! শব্দের সঙ্গে, নিহিত সেই ভক্তিরসেই অন্তর আপ্লুত হয়ে ওঠে—এইটেই আমার বক্তব্য।—লেখিকা

সেজন্য কীর্ত্তনকে, সঙ্গীতের একটা শ্রেণী, বা সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত আমি মনে করি। হিন্দুস্থানী বা উচ্চ সঙ্গীতে 'গজল' 'ভজন' ইত্যাদি একেক শ্রেণীর সঙ্গীত। 'গজলে' সাধারণতঃ প্রেম সঙ্গীত এবং সে সঙ্গীতকে দুই অর্থেই গ্রহণ করা যায় (কোনও কোনও প্রেমসঙ্গীতকে ভগবৎ সঙ্গীত মনে করে নেওয়া চলে) এইরূপ দুই শ্রেণীর গানই গীত হয়ে থাকে, এবং 'ভজনে' কেবল ঈশ্বরানুরাগ সম্বন্ধীয় সঙ্গীতই গীত হয়ে থাকে, একথা কে না জানে। তাই সুরের দিক দিয়ে এদের বিকাশ সীমাবদ্ধ, তাই সঙ্গীতের মধ্যে এরাও একেকটী শ্রেণীভুক্ত হয়ে আছে, এবং আমার মতে এও উচ্চ সঙ্গীতেরই বিকাশের একেকটা দিক্‌রূপেই প্রমাণ হয়ে আছে। তবে, এ প্রমাণ থেকে কীর্ত্তনকে আমি বঞ্চিত করেছি ভাবলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ তাকে আমি উচ্চ সঙ্গীতের সুরের উচ্চতার সঙ্গে তুলনায় খর্ব্ব করলেও, কীর্ত্তন যে উচ্চ সঙ্গীতেরই বিকাশের একটা দিক্—এ অস্বীকার করার ব্যর্থ চেষ্টা আমি করেছি বলেতো মনে পড়ে না। তবে এ না হয়েই পারে না—কথার নিগড়ে সুর বাঁধা পড়লে, স্বাধীনতা তার কমে যেতে বাধ্য। তাহলে বিকাশও তার সীমার গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ হয়ে পড়ে, এইটেই কি প্রমাণ হয় না?

শ্রদ্ধাস্পদ মিত্র মহাশয়ের জিজ্ঞাস্য—সুর বলতে আমি কি বুঝি অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা না কারিগরি। (বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ ৪৯৮—৪৯৯ পৃষ্ঠা)। এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। স্বরের কেবল মিষ্টত্বও নয়, কেবল কারিগরিও নয়। সুর বলতে, এককথায় আমি মনে করি সঙ্গীতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। সুর যখন স্বরের কারিগরি, বা স্বরের মিষ্টতা নিয়ে কেবল স্বররাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত থাকেন, তখন সঙ্গীত একটী প্রাণহীন পাষাণ প্রতিমা! কিন্তু ঐ সুরই, স্বরের, ঐ কারিগরি ও ঐ মিষ্টতা নিয়ে অন্তররাজ্যে প্রবেশ করে, যখন সমস্ত অন্তর মন্থন করে নতুন জিনিষ,—অনুভূতির পরশ পায়, তখন সে তারই কোলে আত্মসমর্পণ করে,—তখনই সঙ্গীতকে জীবনদান করে' বেরিয়ে আসে সে যুগলরূপে! তখন সঙ্গীত আর পাষাণময়ী প্রতিমা নয়;—তখনই সঙ্গীত প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত। বাইরের আবরণের মধ্যে যতক্ষণ তাকে দেখা যায়, ততক্ষণ তো সে বাইরেরই দ্রব্য। বাইরের আবরণের মধ্যেই প্রকৃত রূপ যে তার আড়াল হয়ে থাকে। অন্তরের সংস্পর্শে যখন সে আসে, তার পূর্ণরূপ এবং অন্তরের সঙ্গে তখনই তার প্রকৃত সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই তো তার আসল রূপ। সেখানেই তার প্রাণ। শুধু সঙ্গীত বলে নয়, অনুভূতি সাপেক্ষ জিনিষের পক্ষেই ইহা অতীব সত্য নয় কি? কাজেই সুর বলতে ঠিক আমি কি বুঝি, এক কথায় বলা বা বোঝানো বড় শক্ত।

তিনি অতঃপর লিখেছেন"............সঙ্গীতের মধ্যে শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা বা যাহাকে ব্যক্তিত্ব বলে, তাহা ফুটিয়া ওঠা চাই"—(বঙ্গবাণী অগ্রহায়ণ ৪৯৮ পৃষ্ঠা) এ সম্বন্ধে তাঁর সহিত আমার মতদ্বৈধ তো নাই, উপরন্তু আমার প্রবন্ধে আমি এই কথাই দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি, অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কথার গভীরতা বা গাম্ভীর্য্য ততটা না থাকার জন্যই শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে বা ফুটিয়ে তুলবার সুযোগ বা scope ঢের বেশী পায়। তবে আমার ভাষার দীনতার দরুণ, তাঁরই মতো, আমারই বক্তব্য আমি এতটা বিশদভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হইনি; একথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

তিনি আরেক জায়গায় লিখেছেন "কঠিন কঠিন সুর, কঠিন কঠিন তাল কীর্ত্তনেও বিরল নহে। ইহাতেও সুর-বৈচিত্র, সুরের কারুকার্য্য যথেষ্ট আছে, একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।" এখানেও

তাঁর সহিত আমার একই মত। আমিও আমার প্রবন্ধে সুর বৈচিত্র্য 'যথেষ্ট' বাক্যের পরিবর্ত্তে 'খুব বেশি' (বঙ্গবাণী আশ্বিন ১৯২ পৃষ্ঠা) বাক্যটী ব্যবহার করেছি। তবে 'যথেষ্ট'র সঙ্গে 'খুব বেশি'র একটী আভিধানিক অর্থের প্রভেদ থাকলেও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলেই আমার ধারণা। তালের কথা আমি কোনও সঙ্গীতেই বিশেষভাবে উল্লেখ করিনি। যেহেতু, সঙ্গীত বলতে তালও সংলিপ্ত, একথা সবাই জানেন (যদিও উচ্চাঙ্গের 'আলাপে' তাল না থাকার দরুণ সুরের মহিমা বা উচ্চতা বুঝবার বা উপলব্ধি করবার কোনও অন্তরায় ঘটে না)। তারপর তিনি লিখেছেন……"ধ্রুপদ খেয়ালে যেমন তাল লয় আছে, দ্রুত বিলম্বিত ছন্দ আছে, গতির নানা প্রকার ভঙ্গি আছে, কীর্ত্তনেও সেই প্রকার (বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ ৪৯৮ পৃষ্ঠা)। সুরের দিক দিয়েই নিশ্চয় তিনি এই তুলনা করেছেন? কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই সুরের 'গতির' নানা প্রকার বিস্তার যে আছে এবং সেই বিস্তারের দিক দিয়েও কি তা ধ্রুপদ বা বিশেষভাবে খেয়ালের সমকক্ষ? এই 'বিস্তারের' কথা সমালোচক মহাশয় কিছু উল্লেখ করেন নি।

শ্রদ্ধেয় মিত্র মহাশয় লিখেছেন "যে গান, এত ভাব-প্রবণতার দাবী করে, যে গানে ভগবল্লীলা প্রত্যক্ষবৎ ফুটাইবার প্রয়াস করে, যে গানে সাধন ভজনের অনুকূলতা সম্পাদন করে, সে গান বিনা সাধনায় লাভ করা যায়, এ ধারণা অন্যায় নহে কি?" (বঙ্গবাণী অগ্রহায়ণ ৪৯৯ পৃষ্ঠা)। উত্তরে, প্রথমতঃ বলতে চাই—সঙ্গীত সাধনার দুইটী দিক আছে। একটী কণ্ঠের, যাকে বলে স্বরসাধনা, অন্যটী সুরের সাধনা (সুর, বা তার সাধনা সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি)। সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম সোপানই স্বর সাধনা, এ সত্য বোধ হয় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও অবিদিত নেই। কাজেই কীর্ত্তনে 'স্বরসাধনা' (বঙ্গবাণী ৪৯৯ পৃষ্ঠা) সম্বন্ধে তাঁর সহিত আমার মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। তবে আমার "উচ্চ সঙ্গীত শুনলেই বোঝা যায় এ জিনিষ সাধনা ছাড়া হয় না" (বঙ্গবাণী আশ্বিন ১৯৩ পৃষ্ঠা) এই কথাটির অর্থে কি তিনি স্বরসাধনাই বুঝেছেন? জানতে চাই, যেহেতু স্বরসাধনাক্ষম (অর্থাৎ গানের কণ্ঠ যাঁর নেই) ব্যক্তিও অনেক সময় বড় সঙ্গীতজ্ঞ বা সঙ্গীতের সমজদার বলেই খ্যাতি অর্জ্জন করে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে "আয়ত্ত করতে গেলে রীতিমত সাধনার প্রয়োজন" (বঙ্গবাণী আশ্বিন ১৯৩ পৃষ্ঠা) এই কথাটির অর্থে মিত্র মহাশয় ধরে নিয়েছেন—কীর্ত্তনে এ সাধনার প্রয়োজন হয় না, এই কথাই প্রমাণ হয়। এখানে আমার জিজ্ঞাস্য—বাস্তবিক তাই প্রমাণ হয় কি? তাহলে এবিষয় তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ আছে! কেননা মানুষের গুণগ্রাহী মন যখন তন্ময় বা মুগ্ধভাবে কোনও কিছুর গুণবর্ণনায় নিযুক্ত থাকে, তখন, তার সৌন্দর্য্য বা মহত্ত্ব, বোঝাবার বা প্রমাণ করবার সময়, বক্তার মনের ধারণা ও মাপকাঠি অনুসারে অনেক সময় যুক্তির অবতারণা করে থাকেন। অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা সেটা কত বড়, কত উঁচু দেখাতে বোঝাতে বা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাই থেকে সে যুক্তি, প্রমাণস্বরূপ তারই একচেটে দাবী হয়ে থাকবে বা থাকতে হবে, এর অন্য কোনও সদর্থ বুঝতে আমি অক্ষম। জীবনের প্রত্যেক অনুভূতিই অল্পবিস্তর সাধনা-সাপেক্ষ। কাজেই 'কীর্ত্তনে সাধনার প্রয়োজন হয় না' এমন কথা বলা, বা ভাব প্রকাশ করা, আমার পক্ষে প্রকারান্তরে অসম্ভব না হয়েই পারে না। কীর্ত্তন বাঙ্গলাদেশের নিজস্ব সঙ্গীত (বঙ্গবাণী আশ্বিন এবং অগ্রহায়ণ) 'বাঙ্গালীর রত্ন' (বঙ্গবাণী আশ্বিন) প্রভৃতি কথা আমি একাধিকবার বলেছি। তাছাড়া সমালোচক মহাশয়ও একথা সর্ব্বান্তঃকরণেই স্বীকার করেছেন যে 'কীর্ত্তনকে আমি উচ্চাসনই প্রদান করেছি'—(বঙ্গবাণী ৫০৪ পৃষ্ঠা)। বাস্তবিক 'বাঙ্গালীর শিল্প প্রতিভার অক্ষয় কীর্ত্তি কীর্ত্তন' এবিষয় কেবল আমার কেন কাহারো দ্বিমত নেই

বা থাকা সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ এবার আমি বলব 'ভাব প্রবণতা' বা 'সাধন ভজনের অনুকূলতা সম্পাদন' তো রামপ্রসাদী, বাউল প্রভৃতি অন্যান্য লোক সঙ্গীতেও সাধিত হ'য়ে থাকে (এখানে, আশা করি কেহ রামপ্রসাদী বা বাউলকে আমি ছোট বলছি ভেবে আমার ভুল বুঝবেন না। কারণ যে কোনও Creationই বড়। কাজেই এর আবেদনও যে বড়, সে অস্বীকারের চেষ্টা বা অভিপ্রায় আমার নেই)। কিন্তু সঙ্গীতের দিক দিয়ে অর্থাৎ সুরের দিক দিয়ে কীর্ত্তনের পূঁজি যে অনেকই বেশী, এ স্বীকার বোধ হয় তিনিও করতে কুণ্ঠিত নন? যার যে সত্য দাবী, তাকে সত্য বলে মেনে, বা স্বীকার করাতে, যদি 'কারো মনে ব্যথা লাগবার কারণ হয়' (বঙ্গবাণী অগ্রহায়ণ ৫০৪ পৃষ্ঠা) তাহলে বড় দুঃখের সঙ্গে এ কথা না বলে' উপায় নেই যে তাঁরা সত্য স্বীকারে কুণ্ঠিত। তারপর 'ভাব প্রবণতা'র দাবী তো কবিতা, কাব্য, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতিও করে থাকেন, তাই বলে তাদের তো কেউ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত ক'রে বিচার করতে যাবে না বা করবার ব্যর্থ চেষ্টা পাবে না! সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন যখন সুর, তখন তার মধ্য দিয়ে, তার গতি বা গতির বিস্তারের মধ্য দিয়েই সঙ্গীতের বিকাশ দেখতে হবে,—"অক্ষয় অফুরন্ত বিরাট কাব্য সাহিত্যের" (বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ ৪৯৯ পৃষ্ঠা) মধ্যে নয়। শ্রদ্ধেয় মিত্র মহোদয় অতঃপর লিখেছেন, "সেদিন চলিয়া গিয়াছে যখন সভাকবি শ্রীকৃষ্ণলীলা পদ রচনা করিয়া পরম ভট্টারক রাজাধিরাজগণের মনোরঞ্জন করিতেন, সেদিন গিয়াছে যখন মণিপুর হইতে পশ্চিম কাংড়ার উপত্যকা পর্য্যন্ত, কবিচারণ ও গায়কগণ ব্রজলীলানুস্মরণ করিয়া জনসাধারণের মনে রস সঞ্চার করিতেন, যখন এদেশে কানুছাড়া গীত ছিল না, সেদিন গিয়াছে যখন বাঙ্গলার বিখ্যাত অবিখ্যাত সকল কবিই কীর্ত্তনের পদাবলী রচনা করিয়া আমাদের জন্য অক্ষয় অফুরন্ত বিরাট কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেন" (বঙ্গবাণী অগ্রহায়ণ ৪৯৯ পৃষ্ঠা)—এ কথায় আনন্দ আমার না হয়ে পারে না। কারণ কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব আমি যেদিক দিয়ে দাবী করেছি, শ্রদ্ধাস্পদ মিত্র মহাশয়ও সেদিক দিয়েই তাকে আরো বিশদভাবে বিস্তৃত করে লিখেছেন। আমিও কি 'ভাবপ্রবণতা', 'সাধন ভজনের সহায়তা', 'কবিত্ব' ও 'ভগবন্ত প্রেমের' দিক দিয়েই কীর্ত্তনকে বড় বলিনি? 'শ্রীকৃষ্ণলীলার পদ রচনা' 'কানুছাড়া গীত' বা 'অক্ষয় অফুরন্ত বিরাট কাব্য সাহিত্য'—এর একটাও কি সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সুরের দাবী করছে, না সেই 'অক্ষয় অফুরন্ত' ভগবত প্রেমেরই অনুকূলতা সম্পাদনের দাবী করেছে, এখন ইহা সুধীপাঠকবৃন্দের বিবেচ্য এবং বিচার্য্য। এরূপ সমালোচনা প'ড়ে মনটা একটু আশ্চর্য্য হয়ে উঠে যে তাঁর মতে উচ্চশিক্ষিত এবং ভাবপ্রবণ ব্যক্তিও সমালোচনা করতে বসলে ভুলক্রমে খণ্ডনীয় বিষয়টিরই পক্ষ অবলম্বন করেন, তাকেই আরো বিশদভাবে পরিস্ফুট করে তোলেন। তবে আমার যে এটা যথেষ্ট সাহায্যই ক'রেছে, অন্তরের সঙ্গে এ কথা না মেনে উপায় নেই, যেহেতু লেখনীর অক্ষমতা ও ভাষার দীনতাই আমার সম্বল।

কীর্ত্তনের আরম্ভ বা উদ্ভব কোথায় এবং তার কারণ কি? একটু ভাবলেই দেখা যায় না কি যে সঙ্গীতের বিকাশ সংকল্পে কীর্ত্তনের সৃষ্টি নয়? শ্রীকৃষ্ণনাম বা লীলা বোঝবার জন্য, মানবের অন্তরে, নিষ্কাম প্রেমবিলানো তত্ত্ব প্রচারের জন্য, এক কথায় ধর্ম্মভাবের পুনরুদ্ধার নিমিত্তই কীর্ত্তনের সৃষ্টি হয়েছিল। কেন না কথার চাইতে সুরের, স্বাভাবিক একটা আকর্ষণী বা মোহিনী শক্তি আছে বলেই, সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে সেই লীলাতত্ত্ব বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম, ছোট, বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন প্রত্যক্ষবৎ ফুটে উঠেছে। সঙ্গীতের বিকাশের চাইতে, তাকে আশ্রয় করে, তার মিলনে ভক্তিভাবকে গড়ে তোলাই কি কীর্ত্তনের মূল উদ্দেশ্য বা

উদ্ভব ছিল না? কীর্ত্তনের বিষয় ভাবলেই 'কানু' ধ্বনি অন্তরে গুমরে গুমরে ওঠে! কেন না কীর্ত্তন, কানু (শ্রীহরিলীলা) স্মৃতিতেই গড়া। এই যে স্মৃতি, (association)—এর মাদকতাই কি অজ্ঞানিতে আমাদের কীর্ত্তনের আসরে টেনে নিয়ে যায় না? কীর্ত্তন শুনতে যাবার আগে, এ কথা কমই মনে হয় যে কেবল সঙ্গীত শুনতে বা কেবল তারই আনন্দধারা আকণ্ঠ পান করতে যাচ্ছি (হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে)—কীর্ত্তন শোনবার সময়ে ভগবানের নাম, ভগবত প্রেমের ব্যাখ্যা, তাঁর লীলা, বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং সেই সঙ্গে বৈষ্ণব কবিগণের 'অক্ষয় অফুরন্ত বিরাট কাব্য সাহিত্যের' সৃষ্টি পদাবলীর অত্যন্ত ভাবরাশির অপরিমেয় যে আনন্দরস, তাকেই হৃদয়ঙ্গম করতে, জানতে বা বুঝতে যাচ্ছি, অন্তরের ব্যাকুলতায় এই দিকই বেশী বৃদ্ধি পায়. এ কথা অস্বীকারের তো উপায় নেই। সেই জন্যই কীর্ত্তনের ভক্ত যাঁরা, কীর্ত্তনকে তাঁরা যে কেবল সঙ্গীত জ্ঞানেই ভালবাসেন, তা নয়। তার পূত স্মৃতিকে মনোমন্দিরে পূজা ক'রে সঙ্গীত দিয়ে তার আরতি করেন। সে স্মৃতি, যে অন্তরে পূজার অধিকার পায় না "এমন লোকই কীর্ত্তন যে স্থানে গীত হয়, সে স্থান পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নহেন" (বঙ্গবাণী অগ্রহায়ণ) এবং সেই স্মৃতিপূজিত অন্তরে তাই সময় সময় সুরের তানালাপে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। সেইজন্যই আমি ব'লছি যে "কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ সঙ্গীতানন্দ বিলানো নয়—তার লক্ষ্য ভিন্ন" (বঙ্গবাণী আশ্বিন); এবং সেইজন্যই 'কীর্ত্তনের ভক্তদের কালোয়াতী বা ওস্তাদী সঙ্গীত বর্জ্জনের' (বঙ্গবাণী অগ্রহায়ণ) কোনও কারণ সাধারণতঃ থাকে না। তাই পূর্ব্বেই কীর্ত্তনকে সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত বলেছি (কেন না বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিয়েই কীর্ত্তনের উৎপত্তি, এ কথা কে না জানে)। কারণ সঙ্গীত ছাড়াও তো সে নয়, যেহেতু সঙ্গীতের সব অবলম্বনই যখন তার মধ্যে প্রতীয়মান। তবে আবেদন বা অভিব্যক্তিতায় সুরের চাইতে ভাবেই সুব্যক্ত, সুস্পষ্ট বা প্রকট এ অস্বীকার করার উপায় আছে কি? 'সুরের দীনতা' বলতে আমি এ কথা বলিনি যে "বৈঠকী সঙ্গীতে যে সকল রাগরাগিণী ব্যবহৃত হয়," (বঙ্গবাণী অগ্রহায়ণ, ৫০১ পৃষ্ঠা) সে সকল হতে কীর্ত্তন বঞ্চিত। আমি কেবল এই কথাটিই বল্‌বার বা দেখাবার চেষ্টা পেয়েছি যে, সকল রাগ বা রাগিণী বিস্তারের ঢের বেশী সুযোগ বা scope হিন্দুস্থানী বা উচ্চসঙ্গীতে পাওয়া যায়। (কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি)। হিন্দুস্থানী বা উচ্চসঙ্গীতে, সেই প্রত্যেকটী রাগ বা রাগিণীকে, একেকটী মহাসমুদ্রজ্ঞানে, তাকে মন্থন করে শিল্পী যে অমৃতরাশি এবং রত্নাদি দানে সে সঙ্গীতকে আরো অমৃতময় ও ধনী করে তুলে থাকেন সে সকল সম্পদের কাছে কীর্ত্তনের সুর-সম্পদের "অপেক্ষাকৃত দীনতা" (আশ্বিন—১৯৩ পৃষ্ঠা বঙ্গবাণী) অস্বীকারের ত কোন কারণ খুঁজে পাই না। কীর্ত্তনেও সুর সম্পদ যে যথেষ্ট আছে এ স্বীকার অন্তরের সঙ্গে আমি একাধিক বার করেছি—এ পাঠকবৃন্দ সকলেই অবগত আছেন। এখানে একটী তুলনা দেব। যেমন সমুদ্র এবং নদী উভয়েতেই জল, গতি, তরঙ্গ, ছন্দ, সবই সংলিপ্ত, এবং এ সবের ভিতরই দুজন গড়ে উঠেছে। একের সৌন্দর্য্য কেবলই সুনীল জল আর তরঙ্গোচ্ছ্বাস, অপরের সৌন্দর্য্য, স্মৃতি সৌরভ মথিত তার দুই কূল, সেই তীরের দু ধারে কখনও গাছের সার কখনও বালির মাঠ, কখনও ধানের ক্ষেত ইত্যাদি। আবার সুরধুনি বক্ষে, সেই তরঙ্গ আনন্দহিল্লোলে ২।১টী তরীর কখনও দোলায়িত কখনও ধীর পদবিক্ষেপে সমাগম এবং অন্তর্দ্ধান—এই যে চারিদিকের একটা সৌন্দর্য্য বা স্মৃতি, ইহারই সৌরভে নদীর সৌন্দর্য্য—শুধু জলে তো নয়! অথচ জলছাড়াও সে নয়। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী তাই তো নদীকে এমন ক'রে বুকে আঁকড়ে ধরতে চায় এবং পারে! কিন্তু সুনীল জলধি এই সমুদ্র, এর বিস্তার এবং বিশালতা, তরঙ্গের উচ্চতা, জলের গভীরতা যে নদীর চাইতে ঢের বেশী এ সম্বন্ধে কারো দ্বিমত আছে কি? কীর্ত্তনকে আমি খর্ব্ব করেছি সঙ্গীতের দিক্ দিয়ে। অন্য দিকে কি? তবে তুলনা করা সম্বন্ধে অনেকের মত-প্রভেদ থাকতে পারে এবং সে রুচি

মানুষের ইচ্ছাধীন। 'রসগোল্লা' বা 'সন্দেশ' দু জিনিষের তুলনা সম্ভব নহে, যেহেতু দুইটী দুই আকারে পরিণত। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন তুলনা হয় না, উভয়েতেই যখন ছানা চিনি প্রভৃতি একই মাল মশলা আছে। উত্তর—সবই আছে কিন্তু পাক আলাদা হওয়ার দরুণ আকার ও স্বাদে তফাৎ হয়। যেমন মানুষ, পশু, পক্ষী সবই তো একই মালমশলা—অর্থাৎ রক্তমাংস গড়া, কিন্তু পাক আলাদা হওয়ার দরুণ বিভিন্ন আকার ধারণ করে, অর্থাৎ মানুষ দেখলে লোকে তাকে গরু বলবে না, মানুষই বল্‌বে। তুলনা সম্ভবে, যখন একের সহিত অন্যের সামঞ্জস্য থাকে, দুইএর ভিতর একের সাড়া পাওয়া যায়, দুই যখন এক সূত্রে গাঁথা পড়ে, দুইয়ের প্রাণ যখন একই রন্ধ্রে বেজে ওঠে। কীর্ত্তন ও উচ্চ সঙ্গীতকে তুলনা করেছি, যখন সঙ্গীত বলে জেনেছি। কাজেই সঙ্গীতের যেটুকু দাবী (সুর) সেটুকু নিয়েই তুলনা করেছি। তবে পূর্ব্বেই বলেছি তুলনা করা, না করা, নির্ভর করে মানুষের অভিরুচির উপর।

শেষতঃ, আমি উচ্চাঙ্গের কীর্ত্তন (বঙ্গবাণী ৫০০ পৃষ্ঠা) সম্বন্ধে আলোচনা করেছি কিনা এবং তৎসহিত 'গরাণহাটী' বা 'মনোহর সাহীর' কীর্ত্তনের অনতিকঠিন একখানি পদ শিখিতে (বঙ্গবাণী ৫০১ পৃষ্ঠা) আমার কতদিন লাগে একথা মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করেছেন। কীর্ত্তনের কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপের বিখ্যাত গণেশদাস কীর্ত্তনীয়া বা রামদাস বাবাজী, উচ্চশ্রেণীর কীর্ত্তন করে থাকেন বলেই আমাদের ধারণা (এ ধারণা আমার ভুল কিনা জানি না) এবং তাঁহাদের কীর্ত্তন শোনার সৌভাগ্য বাল্যাবধি আমাদের হয়েছিল। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ-গায়ক যদ্যপি ইঁহারা নাও হ'য়ে থাকেন, তথাপি তাঁহারা যে উচ্চাঙ্গের কীর্ত্তনই করে থাকেন, এ সম্বন্ধে কীর্ত্তনের ভক্তমাত্রেই অবগত আছেন। তবে তিনি যে লিখেছেন "সমালোচনার রীতি অনুসারে......তাহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ যাহা তাহাই গ্রহণ করিতে হয়............কাশ্মীরের একখানি নিকৃষ্ট শাল বা জার্ম্মানীর একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাল লইলে চলে কি?" (বঙ্গবাণী ৫০০ পৃষ্ঠা)। উত্তরে আমার বক্তব্য, তাঁর মতে কাশ্মীরের নিকৃষ্ট শালই আমি নিয়েছি মানলাম, কিন্তু জার্ম্মাণীর 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট' শাল যে নিয়েছি তার প্রমাণ কি? উচ্চ সঙ্গীতের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদের গান শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তাহা তো আমি আমার প্রবন্ধে কোনও স্থানে প্রকাশ করেছি বলে' জানি না। কেবল তাই নয়, বস্তুতঃ ইহাই আমার জীবনের বড় ক্ষোভ যে, আমি তাই থেকে এ যাবৎকাল বঞ্চিত। তবে, উচ্চাঙ্গের উচ্চ সঙ্গীত শ্রবণের সৌভাগ্য অবশ্যই আমার হয়েছে, তাই থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, উচ্চ সঙ্গীতের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক, তারই মধুর সঙ্গীত শ্রবণের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় উচ্চাঙ্গের খেয়াল গায়ক নামে বিখ্যাত। এখন তিনিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এমন কোনও প্রমাণ হয় না। কাজেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিনা সে বিচারের যেমন দরকার দেখিনা, তেমনি গণেশ দাস, রামদাস বাবাজী প্রভৃতি ব্যক্তিগত উচ্চাঙ্গের কীর্ত্তন গায়ক নামেই খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন বলে জানি, কাজেই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন গায়ক কিনা (তাঁর মতে যদি নাও হ'ন) সে বিচারেরও দরকার দেখিনা। তবে "সমালোচনার রীতি অনুসারে জার্ম্মাণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা কাশ্মীরের নিকৃষ্ট শাল" যে কি করে গ্রহণ করা হোল, তাঁহার এ যুক্তি বুঝতে আমি একান্তই অক্ষম। এক তাঁহার মতে গণেশ দাস বা রামদাস বাবাজী-প্রমুখ ব্যক্তিগণ যদি নিম্নশ্রেণীর কীর্ত্তন গায়ক হয়ে থাকেন তো এ যুক্তি খানিকটা সত্য, সে বিষয় তাঁর সহিত আমার মত-প্রভেদ নেই।

সর্ব্বশেষে, প্রবন্ধ আমার যে বৃহদাকার ধারণ করছে, সে বিষয়, এবং পাঠকবৃন্দের এবার ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনার আশঙ্কা, যে মনে উঁকি ঝুঁকি না মারছে, তা নয়, তবে এবার তাঁদের আশ্বাস দিতে সাহস

হচ্ছে যে, প্রবন্ধ শেষ করবার অভিপ্রায় বা দৃঢ়সঙ্কল্প এবার করেছি। আশা করি, আমার এ সুবৃহৎ এবং বিস্তৃত আলোচনায় আমার বক্তব্য পাঠকদের বুঝবার সহায়তা করেছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সমালোচনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উত্তর দিতে হলে, প্রবন্ধ যে আরো অনেকই বড় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হোত। সেইজন্য উত্তর দেওয়া যতটা সম্ভব, যুক্তিসঙ্গত মনে করেছি, তারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করলাম। আমার সমুহ মন্তব্য প্রকাশে যে অসমসাহসের পরিচয় দিয়েছি, তার মধ্যে, অন্যায় দাবী যদি কিছু করা হয়ে থাকে, তো সুধী পাঠকবৃন্দ এবং শ্রদ্ধেয় মিত্র মহাশয়ের নিকট অমার্জ্জনীয় আমার এ প্রগল্‌ভতা, মার্জ্জনীয় হবে বলেই ভরসা।

শ্রীমতী সাহানা দেবী

কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব ?

(উত্তরের প্রত্যুত্তর)

আমি গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার বঙ্গবাণীতে "কীর্ত্তন ও উচ্চ সঙ্গীত" প্রবন্ধের যে সমালোচনা করিয়াছিলাম, শ্রীমতী সাহানা দেবী তাহার একটি উত্তর দিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য থাকিলে জানাইতে বলিয়াছেন। বাদ প্রতিবাদের আসরে নামিতে হইলে প্রচুর অবসর ও অসামান্য দক্ষতার প্রয়োজন। আমার এ দুইয়েরই অভাব। তবে এ বিষয়টির এমন একটি আকর্ষণী শক্তি আছে যে মনে হয় আমার বক্তব্য বিষয় কিছু থাকিলে, তাহা সাধারণ পাঠকগণকে বলিতে পারিলে যেন কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হয় না। আমি যে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা মূল প্রবন্ধ লেখিকার জবাব হিসাবে তত নহে, যত বিষয়টিকে বিশদ করিবার জন্য।

শ্রীমতী সাহানা দেবী আমার সমালোচনা অবহিতচিত্তে পাঠ করিয়াছেন এবং তাহার উত্তর দেওয়া যে প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, ইহাতে আমি আনন্দ ও গৌরব বোধ করিতেছি। আমার বক্তব্য বিষয়ের সহিত প্রায়শই তিনি ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি তাঁহার পক্ষের কথা ও যুক্তি আমি তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া একটু মৃদু বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন নাই। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে বাস্তবিক মতভেদটি কোথায় ? একটি বিষয় সুধী পাঠক লক্ষ্য করিবেন। লেখিকা তাঁহার মূল প্রবন্ধে একাধিকবার বলিয়াছিলেন যে কীর্ত্তনকে খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্য তাঁহার নাই। (বঙ্গবাণী, আশ্বিন)। এখন আমার সমালোচনার উত্তরে প্রথমেই তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি কীর্ত্তনকে খর্ব্বই করিয়াছেন। (তাঁহার উত্তরের দ্বিতীয় প্যারা)। সুতরাং আমি আমার সমালোচনায় যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা যে সর্ব্বথা উপযোগী হইয়াছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আমি আমার প্রবন্ধের কোনও স্থলে উচ্চ সঙ্গীতকে খর্ব্ব করিতে অথবা কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করি নাই। লেখিকা আমার যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই ; অথচ দেখিতেছি তিনি তাঁহার পূর্ব্ব মতও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই। সুতরাং তাঁহার যে সকল কথার উত্তর আমি সমালোচনায় দিয়াছিলাম, সেই সমস্ত কথার পুনরায় অবতারণা করাতে আমার মনে হইতেছে, যে তিনি হয়ত সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিবার

অবসর পান নাই। সে সকল প্রসঙ্গে, আমার সমালোচনাটি পুনরায় পাঠ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা ব্যতীত আর উপায়ান্তর দেখি না।

সমালোচনার উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথা এই ; সুর ও কথা লইয়া কীর্ত্তন। উচ্চসঙ্গীতে সুরের অনুভূতিই বেশী। কথা যেখানে সুরকে আচ্ছন্ন করে, বা আড়াল করিয়া দেয়, সেখানে প্রকৃত সঙ্গীতের মর্য্যাদা খর্ব্ব হয়। কথা বাদ দিয়া কীর্ত্তন হয় না, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আলাপে কথার প্রয়োজন থাকে না। যেখানে কথার বেড়ায় সুরের অবাধগতি বা স্বাধীনতা নষ্ট হয়, সেখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীতানন্দ নাই।

আমার বোধ হয় এ স্থলে লেখিকা কথা ও সুরের পার্থক্য সম্বন্ধে বিষম গোলযোগ করিয়া তুলিয়াছেন। কথা ও সুরের মধ্যে যে একটি নিবিড় সম্বন্ধ আছে, আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাহি না। সুর যে কথাকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহাও না হয় নাই বলিলাম। কিন্তু ইহা কি ঠিক নহে যে, কথা ও সুর দুইটি পৃথক্ বস্তু ? একই কথা ভিন্ন ভিন্ন সুরে গীত, হইতে পারে। মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা উল্‌টাইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটি গানের স্বরলিপিতে কথা এক জনের, সুর অপরের। সুর 'কথা'র অনুবর্ত্তন করিয়া স্বাধীনতা হারাইতে যাইবে কেন ? সুরের থপ্‌পরে পড়িয়া কথা মাঠে মারা যায়, ইহার দৃষ্টান্ত বরঞ্চ বেশী। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে যে কথা নিতান্ত কোণঠেসা হইয়া পড়ে, সেটা কলাবৎগণের জুলুম ব্যতীত আর কিছু নহে। সে জুলুমে যে সঙ্গীতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়, এ কথাও কেহ না বলিয়া দিলে বুঝিতে পারা কঠিন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের গান শুনিবার সৌভাগ্য ভাগলপুরে আমার হইয়াছিল, তাহাতে কথা ও সুর উভয়ই সুন্দর রূপে সপ্রকাশ ছিল। স্বর্গীয় বিশ্বনাথ রাওয়ের বহু গান আমি শুনিয়াছি, তাহারও কথার প্রতি ঔদাসীন্য দেখি নাই। আমি তাঁহার নিকট কিছুদিন গান অভ্যাস করিয়াছিলাম। আমি যে সকল গান শিখিয়াছিলাম, তাহার রচনা, ভাব ও সুর প্রত্যেকটিই উপভোগের বস্তু। শ্রীমতী সাহানা দেবীরও গান শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, তবে তাঁহার মুখে হিন্দুস্থানী অর্থাৎ উচ্চ সঙ্গীত শুনি নাই। কাজেই বলিতে পারি না, কথা তাঁহার গানে কোন স্থান অধিকার করে।

সুরের অনুভূতি অল্পবিস্তর সকলেরই আছে। পুরুষ অপেক্ষা নারীর মধ্যে এই অনুভূতি যে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন সুর। ভক্তচূড়ামণি সঙ্গীতৈকপ্রাণ নারদের সঙ্গীতে নারায়ণের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া অমৃতবাহিনী সুরতরঙ্গিনীর জন্ম হইয়াছিল, এ কথা পুরাণে শুনিতে পাই। প্রাণ মাতাইতে, হৃদয় গলাইতে সংসার তাপত্রয়দগ্ধ জীবনের মরুভূমিতে মন্দাকিনী বহাইতে, একমাত্র সুরের মোহিনী শক্তিই পারে। লেখিকা সত্যই বলিয়াছেন, "বিশুদ্ধ সঙ্গীতানন্দ তাকেই বলি, যখন কেবল সুরেই প্রাণ মাতিয়ে দেয়, হৃদয় হরণ করে নেয়, আপনাকে ভুলিয়ে দেয়। কথার অর্থ বা গভীরতার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় না, মন উৎসুক হয় না। সুর তখন একাই একেশ্বর, সুর তখন সঙ্গীতের দেবতা, সঙ্গীতের উপাস্য-অন্তর তখন তারই পূজারী।" সুন্দর! সঙ্গীতের অনুভূতির সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা ভাল করিয়া বলা আমার সাধ্যের অতীত।

অনুভূতির এই পরীরাজ্য হইতে বাস্তবে নামিয়া আসিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুরের গতি ও বিলাস অনুসারে তাহা কতকগুলি রাগরাগিণীতে বিভক্ত হয়। কথা ও রাগরাগিণীর অতীত যে সুর, তাহা ঐ অনুভূতির রাজ্যের কথা। সে ধরা-ছোঁয়া দেয় না। একখানা সুরট মল্লার শুনিলে আপনার হৃদয়ের সমস্ত

তন্ত্রীগুলিতে ঝঙ্কার দিয়া প্রাণকে যে অপূর্ব্ব রসে অভিষিক্ত করিয়া দিল, সে আপনার ব্যক্তিগত, নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বস্তু। তাহাতে কোনও আলোচনা বা বিশ্লেষণের ছুরিকা প্রয়োগ করা চলে না। কিন্তু সুরের মধ্যে যে শাশ্বত, নিত্য, সার্ব্বজনীন ব্যাপার আছে, তাহা জানিবার, বুঝিবার ও শিখাইবার বিষয়। তাহাই বিভিন্ন রাগরাগিণীতে বিভক্ত হইয়া সঙ্গীতকে নানা বিচিত্রতায় বিভূষিত করিয়াছে। এই বিবিধ রাগরাগিণীর বিচিত্রিত সুর-সম্পদ যে সঙ্গীতে আছে, তাহাই অসীম, সসীম নহে। যে কোনও কথা-প্রপঞ্চে এই সুর সংযোগ করিয়া তাহাকে অসীমত্বের গৌরবে গরবিত করিয়া তোলা যায়। সুতরাং কীর্ত্তনে যদি এই সকল রাগরাগিণী থাকে, যাহা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আছে, তাহা হইলে সুরের দিক দিয়া তাহাকে খর্ব্ব কেমন করিয়া করা চলে, ইহা আমি বুঝিতে অক্ষম। প্রশ্ন হইতে পারে কীর্ত্তন যে এই সকল সুরের দাবী করিতে পারে, তাহার প্রমাণ কি? আমরা জানি অনেকে ইহা আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। দেখিতেছি শ্রীমতী সাহানা দেবী সে দলভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। যাহা হউক, 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে এক সময়ে কীর্ত্তন গানে রাগরাগিণী মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিত। কীর্ত্তনেও বিশুদ্ধ আলাপের রীতি অজ্ঞাত ছিল না।

গায়ক বাদক যৈছে করে অভিনয়
যৈছে সে সভার শোভা কহিল না হয়।
নরোত্তম বেষ্টিত এসব পরিবারে
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্র শোভা করে।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাধুর্য্যের নাহি সীমা।
সংকীর্ত্তন আবেশে কি মধুর ভঙ্গিমা॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত চন্দ্রে।
গণ সহে চিন্তায় মানসে মহানন্দে॥
বারবার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে॥
রাগিণী সহিত রাগ মূর্ত্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি স্বরগ্রাম মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা॥
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরম মাদক সুধা নাহি তার সম॥

—ভক্তি রত্নাকর।

কীর্ত্তন গানের এই বর্ণনা যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ইহাকে অন্য সঙ্গীত হইতে মূলতঃ পৃথক্ বলিয়া বুঝিব কি প্রকারে? যেহেতু ইহাতে কথা বা কবিতার চরম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, যেহেতু ইহা ভক্তিপ্রধান, যেহেতু ইহা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয়, সেই হেতু ইহার দৈন্য, সেই হেতু ইহার অপকর্ষ, ইহা আদৌ যুক্তিসহ নহে। ইহার তত্ত্ব সাম্প্রদায়িক হইতে পারে, ইহার ভাষা আমাদের এই বাংলা ভাষা হইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত হইতে ইহাকে নির্ব্বাসন করিতে হইবে, এরূপ অনুদারতা শ্রীমতী সাহানা দেবীর শোভা পায় না।

'কথার বেড়ায় সুর আটকা পড়ে'—এ কথা কি সঙ্গীতজ্ঞেরা অনুমোদন করিবেন? হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের

রচয়িতা সুরদাস, নওল কিশোর প্রভৃতি কবিগণ কখনও কি ইহা কল্পনায়ও আনিতে পারিয়াছিলেন? কল্পনা করিতে পারিলে তাঁহারা আমাদের জন্য এ বেড়ার সৃষ্টি করিয়া যাইতেন, এমন মনে হয় না। নওল কিশোরের একখানি পদ দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে—

ভৈরবী—চৌতাল।

আজ কি ছবি অম্বে বরণ না যাতে হায় মুসে।
কনক বরণ মণি জটিত আ ভূখন বসন বিজু ছটা যেইসে॥
সিংহ পর্ বিরাজিত দশ ভুজ অয়ুধ ধরে
শীষ্ স মুকুট কুট অরুণ উদে তসি
নওল কিশোর ওর বসে ধেয়ানে নিশিদিন
ইহ বর মাঙ্গে তোসে॥

এই যে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া গায়ক কবি নিশিদিন মাতা দশভুজার ধ্যান করিবার বর মাগিতেছেন, ইহা কি তাঁহার সুরের অন্তরায় হইবার জন্য অভিপ্রেত? সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকগণই ইহার বিচার করিবেন।

কথাকে বাদ দিয়া সুর স্বাধীন হয়, লেখিকার এ উক্তি যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে যন্ত্র সঙ্গীতে এবং বিশুদ্ধ আলাপচারিতেই তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অন্য কোথায়ও নহে। কিন্তু আলাপচারীতে স্বরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জনের সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যঞ্জন যথা তুম্ নারি না না ইত্যাদি। স্বর যথা—আ-অ-ও: ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণে হিন্দুস্থানীর নামগন্ধও ত নাই; অর্থাৎ ইহা হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী গুজরাটী পাঞ্জাবী নির্ব্বিশেষে সকলেই দাবী করিতে পারেন। হিন্দুস্থানীরা প্রথমে এই আলাপচারীর আবিষ্কার করিয়াছেন, কিনা, তাহা সঙ্গীতেতিহাসের আলোচনাসাপেক্ষ।

উচ্চ শ্রেণীর কীর্ত্তন আজকাল শুনিতে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কেন কঠিন, তাহা আমি আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিশদরূপে বলিয়াছি। নিরলসভাবে স্বর সাধনা করিয়া, রাগরাগিণীতে অধিকার লাভ করিয়া কীর্ত্তন গাহিতে আমি এপর্য্যন্ত কাহাকেও শুনি নাই। ইহার একমাত্র কারণ কীর্ত্তনের বর্ত্তমান অবনতি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রণালী এক, কীর্ত্তনের প্রণালী অন্য। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সাধক এখনও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি প্রায় লোপ পাইতে চলিয়াছে। এই জন্য তুলনায় সমালোচনা করা কঠিন বলিয়াছিলাম। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বিস্তার আছে, কারিগরি আছে, কীর্ত্তনেও তাহা আছে। আজকাল যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিস্তার যে শ্রেষ্ঠ তাহা আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতে কীর্ত্তনের প্রতিভাকে খর্ব্ব করা হয় না। বিনা যন্ত্রের সাহায্যে যাহারা সমস্ত রাগরাগিণীকে মানুষের কণ্ঠে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিত, তাহাদের প্রতিভা বিশ্ববিজয়িনী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর কোনও সঙ্গীতেই দেবতার অমূল্য দান মানব কণ্ঠের এমন বিমোহিনী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

লেখিকা দুইজন সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়কের নামোল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন গান শুনিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজি ও গণেশ দাসের নাম এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়া তিনি আমার সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূতই করিয়াছেন। আধুনিক বৈষ্ণবজগতে শ্রেষ্ঠ গায়ক হইলেও, ইঁহারা উভয়ে যে এক প্রণালীর গান করেন না, ইহা নিশ্চয়ই লেখিকার বিচার করিবার অবসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত

রামদাস বাবাজি নাম-কীর্ত্তনে সিদ্ধ; শ্রীযুক্ত গণেশ দাস রস-কীর্ত্তনে প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত কীর্ত্তনীয়া রেণেটি ও মনোহরসাহী গান করেন, বেশীর ভাগ বোধ হয় রেণেটি। শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজির নাম-কীর্ত্তনে সুরের দিক অপেক্ষা ভাবের দিক এত বেশী যে, তাঁহাকে কীর্ত্তন-গায়ক হিসাবে আলোচনার ক্ষেত্রে আনিবার কোনও প্রয়োজন করে না। শ্রীমতী সাহানা দেবী নিজে সঙ্গীতে এমন সুনিপুণ; অথচ তিনি এই পার্থক্যটুকু লক্ষ্য করেন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। উচ্চ সঙ্গীতের মধ্যে যেমন টপ্পা, * তরল সুরে গীত হয় কীর্ত্তনের মধ্যে সেইরূপ রেণেটি। উচ্চাঙ্গের কীর্ত্তন বলিতে গরাণহাটী বা মনোহরসাহী বুঝিতে হয়।

আর একটি কথা লেখিকা মহোদয় বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ আবশ্যক। তিনি বলিতে চাহেন যে, 'সঙ্গীত বিকাশের সংকল্প হইতে কীর্ত্তনের উদ্ভব নয়'। কীর্ত্তনের উদ্ভব বৈষ্ণব ধর্ম্মের 'তত্ত্ব-প্রচারের জন্য'; 'এক কথায় ধর্ম্মভাবের পুনরুদ্ধার নিমিত্ত কীর্ত্তনের সৃষ্টি হয়েছিল।' ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার চেষ্টা শ্রীচৈতন্যের সময় হইতে, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন ঐ সময়েরও পূর্ব্ব হইতে যে ছিল, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের অন্ততঃ শতবর্ষ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার একখানি গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে অভিহিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ ও রায় রামানন্দের সঙ্গে—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ

রাত্রিদিন আস্বাদন করিতেন।—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত স্বরূপ জয়দেবের পদ সুন্দর গায়িতে পারিতেন:—

স্বরূপ গোসাঞিতে কহে গাহ এক গীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়ত সংবিৎ॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনায়া॥

চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১৫শ পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে কীর্ত্তনের সম্বন্ধ লেখিকা কোথায় পাইলেন, তাহা আমি জানি না। নাম-সংকীর্ত্তন অবশ্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু লীলা কীর্ত্তন ও নাম সংকীর্ত্তনে প্রভেদ অনেক। লীলাকীর্ত্তনে সঙ্গীতানন্দই মুখ্য উদ্দেশ্য।

সঙ্গীত মানব মনের অতুলনীয় সৃষ্টি। প্রাণের স্বাভাবিক স্পন্দন হইতে ইহার জন্ম। নির্ঝরিণী যেমন পাষাণের বক্ষ ভেদ করিয়া আপনিই জন্ম লাভ করে, সঙ্গীত ও তেমনি প্রাণের আবরণ ভেদ করিয়া স্বতঃ উৎসারিত হয়। তাই বিশ্বপ্রাণ সঙ্গীতের স্বাভাবিক মূর্চ্ছনায় আপনিই সাড়া দেয়। ইহা কষ্টকল্পিত কৃত্রিম কসরৎ মাত্র নহে। প্রকৃত সঙ্গীত মাত্রেই সমগ্রতার দাবী করে। সমগ্র প্রাণের অনুভূতি, সমগ্র সত্তার বেদন ইহাতে আছে। সঙ্গীত প্রাণের কোনও অংশবিশেষকে স্পর্শ করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ইহা তাহাকে মুখর করিয়া তোলে, ভাবকে কদম্ব ফুটাইয়া দেয়, ছন্দের লাস্যলীলাকে বিলাস ভঙ্গিমায় মনোহর করে। সঙ্গীত সর্ব্বব্যাপী। কীর্ত্তনের মধ্যে সঙ্গীত বিচিত্র ভাবপ্রেরণায় সৃষ্টি করে। কখনও সুরে, কখনও

* টপ্পা বলিতে সাধারণ খেমটা বা ঠুংরি যেন কেহ বুঝিবেন না। ইহাও উচ্চ সঙ্গীতের একটি বিকাশ।

কাব্যে, কখনও ছন্দে, কখনও ভাবে তরঙ্গিত লীলায়িত হইয়া উঠে। সুরতান লয়ে সঙ্গীত যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন ভাষা স্বভাব সুরেরই সহায়তা করে। সুর তখন মূর্ত্তিমান হইয়া একাই আকাশ বাতাস বিশ্ব ভরিয়া দেয়। ভাষার বেড়া তখন সুরকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। যতক্ষণ সঙ্গীত আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ না করিতে পারে, তন্ময়তা আনিয়া না দিতে পারে, ততক্ষণ শত কথার আবেদন থাকিলেও তাহা প্রাণস্পর্শী হয় না। কীর্ত্তনের মধ্যে কাব্যহিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ পদ আছে, যাহার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল। কিন্তু সেগুলি যেমন তেমন ভাবে গাহিলেই যে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন হইল, এ কথা ত কেহ বলে না। কীর্ত্তনকে কথার আবেদন হিসাবে যে বিচার করি, তাহার কারণ কবিতা হিসাবেও যে তাহা অমূল্য। আর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাহা করি না, তাহার হেতু অনেক স্থলে কবিত্ব-সম্পদ তাহাতে যথেষ্ট নাই। আবার এমনও হইতে পারে যে আমরা হিন্দুস্থানী ভাষায় তেমন অভিজ্ঞ নহি। সুতরাং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আমরা ভাষাকে উপেক্ষা করিয়া সুরের উপভোগে যত্নশীল হই। ইংরেজি গানেও কখন কখনও এইরূপ হয়। আরও একটি কারণ এই যে কীর্ত্তন এক একটি 'পালা' হিসাবে গীত হয়। যথা, রূপাভিসার, মান, বিরহ ইত্যাদি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সেরূপ রীতি নাই। কাজেই তিন চারি ঘণ্টা ব্যাপী কীর্ত্তনে নাটকীয় ভাবাববোধের নিমিত্ত (dramatic interest) সহজেই কথার বাহুল্য ধরা পড়িতে পারে।

যাহা হউক, আমার বক্তব্য সকল কথাই প্রায় বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আমি প্রতিবাদ হিসাবে আর কিছু বলিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিব।*

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ছিটে-ফোঁটা

জন না জামাই ?

(ডিটেক্‌টিভ গল্প)

(১)

সে বছর কপূরথালার জাল চুনীচাঁদ ও ঝালাকাটির মোটর ডাকাতী লইয়া যখন পৃথিবীর ডিটেক্‌টিভ মহলে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, সেই সময়ে একদিন Sherlock Holmes তাঁহার কম্বল ও ক্যাম্বিস ব্যাগ লইয়া আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "Watson, প্রস্তুত হইয়া লও, এখনি যাত্রা করিতে হইবে। আমি তোমাকে সাত মিনিট মাত্র সময় দিতে পারি।"

আমি তাড়াতাড়ি দাড়ি কামাইয়া, চা খাইয়া Holmesএর সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলাম "এবার কতদূর ?"

* এ সম্বন্ধে আর কোন প্রত্যুত্তর মুদ্রিত হইবে না। বং সং

Holmes—"এই কয়েক হাজার মাইল মাত্র। একবার ভারতবর্ষে হাওয়া বদলাইয়া আসিব।"

আমি মুখের মধ্যে খানিকটা চুরুট গুঁজিয়া দিয়া হাস্যবেগ সংবরণ করিলাম।

(২)

Holmesএর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অতি অল্পদিনের মধ্যে কিরূপে এই দুর্ভেদ্য সমস্যার মর্ম্মভেদ করিয়াছিল তাহার বিবরণ সংবাদপত্রের ভাঙা অক্ষরে এতক্ষণে দেশ বিদেশে ছড়াইয়া গিয়াছে। আমি আর তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করি না।

কার্য্য শেষ করিয়াই আমরা ফিরিয়া যাইব স্থির ছিল। কিন্তু পারিলাম না। ভারতের স্নেহপাশ কি এত সহজে ছিন্ন করা যায়?

আহা! কি বিচিত্র এই দেশ। ইহার কোথাও অভ্রভেদী মহীরুহ, কোথাও মহীরুহ নাই। কোথাও উদ্দাম জলপ্রপাত, কোথাও জলপ্রপাত আদৌ নাই। কোথাও কোকিলের কূজন ও কলাপীর কেকা কবিজনের কর্ণে সুধা-বর্ষণ করিতেছে, কোথাও কেতকীর কুঞ্জ ও কচুর কাণ্ড মেদিনীর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া প্রসার লাভ করিতেছে, কোথাও কেউটিয়া ও কাঁকড়া-বিছার কামড়ে লোকের চাকুরী যাইতেছে। আরও আশ্চর্য্য, এ দেশের একদিকে সমুদ্র ও অপর দিকে পাহাড়। ইহা ছাড়া, এখানকার গাছে সবুজ পাতা হয়, এবং ফলের আগে ফুল হয়। এদেশে বন আছে, নদী আছে, বাতাস আছে, আকাশ আছে এবং আকাশে মেঘ আছে। তবে আর এখানকার লোক অন্য দেশে যাইবে কি করিতে? ইহারা বলে "এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি।" মরিতেছেও।

(৩)

বেলা তখন তিনটা বাজিয়াছে। আমি Holmesএর বাসায় গিয়া দেখি বসিবার ঘরে দরজা জানালা সব বন্ধ, এবং কোথাও লোকজনের সাড়া নাই। দ্বারে টোকা দিতেই ভিতর হইতে Holmesএর জলদ-গম্ভীর স্বর শুনিলাম "Come in." নিঃশব্দে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি Holmes টেবিলের উপর উপু হইয়া বসিয়া গাঁজায় দম দিতেছেন, এবং খিৎমদ্‌গার ফৈজু পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেছে।

আমি ত অবাক্! জিজ্ঞাসা করিলান "কি হে, আবার গাঁজা ধরিয়াছ না কি?"

Holmes. আর কি করি বল? এ অনার্য্য দেশে এক গ্রেণ কোকেন পর্য্যন্ত সহজে পাইবার উপায় নাই।

আমি। কোকেন নাই বলিয়া গাঁজা খাইবে?

Holmes—গাঁজা জিনিসটা ভাল। এক ছিলিম টানিয়া দেখিবে?

আমি। না।

Holmes—বেশ স্নিগ্ধকর।

আমি। আমার প্রয়োজন নাই।

Holmes—কেন ?

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম "কেন ? আমার মাস্‌শ্বশুর কখনও গাঁজা খাইয়াছেন বলিতে পার ?"

Holmes এর কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

এই মহাপুরুষকে ইতিপূর্ব্বে কখনও তর্কে পরাস্ত হইতে দেখি নাই। বুঝিলাম কাজটা ভাল করি নাই। তাই মন ভুলাইবার জন্য বলিলাম "তোমার হাতে বুঝি কোন কাজ নাই ?"

Holmes—কোথায় কাজ ? এই Barbaric pearls and gold এর দেশে আসিয়া ভাবিলাম ইহাদের crimesও barbaric হইবে। হরি হরি ! ইহাদের crime হইতেছে পয়সা খরচ করিয়া হোটেলে খাওয়া, এবং মার খাইয়া বাপান্ত করা। ছোঃ!

এমন সময়ে বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল যে বাহিরে একজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছেন। Holmes গাঁজার কলিকা ছুড়িয়া ফেলিয়া এক মুহূর্ত্তে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং লোকটীকে ভিতরে আনিতে আজ্ঞা দিলেন।

আগন্তুক আর কেহই নহেন, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত Inspector গোফুলানন্দ ভাদুড়ী। Holmes অগ্রসর হইয়া ভাদুড়ীর করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন "খবর কি ?"

ভাদুড়ী। একটা বড় জটিল সমস্যায় পড়িয়াছি। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী বেলা ৮৷৷০টার সময় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে একটী মৃতদেহ ভাসিয়া আসে।——

Holmes. তাহার পিঠে, বুকে এবং দুই বগলের নীচে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

ভাদু। আপনি ইতিমধ্যে সমস্ত খবর পাইয়াছেন দেখিতেছি। আপনি কি মনে করেন কেহ ইহাকে খুন করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিল ?

Holmes.—অসম্ভব। মরিবার পরে কেহ এক পেট জল খাইতে পারে না।

ভাদু। ঠিক ত। লোকটার পেটে ও ফুস্‌ফুসে যথেষ্ট জল ছিল।—তবে কি আঘাত গুলি accidentএর ফল ?

Holmes.—বুকে, পিঠে ও দুই বগলের নীচে বুঝিয়া সুঝিয়া আঘাত করিল, বড় বুদ্ধিমান্ accident !

ভাদু। তাহাও ত বটে। কিন্তু খুনই যদি হইয়া থাকে ত খুনীকে ধরা ত সহজ ব্যাপার হইবে না। মৃতের হাতের উল্কি হইতে জানা গিয়াছে তাহার নাম মুকুন্দ। ইহা ছাড়া লাশের সঙ্গে এমন কিছু ছিল না যাহা হইতে তাহার বা হত্যাকারীর কোন ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে।

Holmes.—ছিল বৈ কি।

ভাদু। ছিল।

Holmes.—তাহার পকেটে পানের ডিবায় একটী পান ছিল।

ভাদু। তাহাতে কি?

Holmes.—তাহাতেই সব।

ইহার পর Holmes অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন। বলিলেন. "এখন সাড়ে চারটা বাজিয়াছে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে আসামী নিজে আসিয়া ধরা দিবে। তবে ধরিতে একটু বেগ পাইতে হইবে।" তাহার পর আপন মনে বলিতে লাগিলেন "লোকটা ষণ্ডা, বেঁটে, কাল, লোমশ— "

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই একজন সসঙ্কোচে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। লোকটী যেমন কাল, তেমনি ষণ্ডা। চাদরের ভিতর হইতে তাহার বুকের লোম দেখা যাইতেছিল।

Holmes.—জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি তারিণী চট্টোপাধ্যায়?"

লোক। আজ্ঞা হাঁ।

Holmes.—শিবপুর হইতে আসিতেছেন?

লোক। হাঁ।

Holmes.—আপনি মাতঙ্গিনী দেবীর অভিভাবক?

লোক। হাঁ।

Holmes.—আপনার হাতে টাকা দিবার পর আর কেহ টাকা লইতে আসিবে না ত?

লোক। আর কে আসিবে? আমার বাড়ীতে দ্বিতীয় পুরুষ নাই। আরও মাতঙ্গিনী আমার হাতেই টাকা দিতে বলিয়াছে। বলিয়া একখানি চিঠি বাহির করিল। Holmes চিঠি পড়িয়া, দশটাকার কুড়িখানি নোট তাহার হাতে গণিয়া দিলেন, এবং ভাদুড়ীকে ইসারা করিলেন। ভাদুড়ী বিদ্যুদ্গতিতে তারিণীর হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া দিলেন। তখন লোকটা যা চীৎকার করিল।

(৪)

আমি বলিলাম "তুমি কি যাদু জান? লাশের পকেটের একটী পান হইতে তুমি হত্যাকারীর সন্ধান পাইলে কিরূপে ইহা আমার বুদ্ধির অতীত।"

Holmes.—Nothing simpler. পানের উপর আঙুল দিয়া চুণ লাগান হয়। সুতরাং তাহাতে আঙুলের ছাপ থাকে। আঙুলের ছাপ পাইলে আঙুলের অধিকারীকেও পাওয়া যাইতে পারে।

আমি। তাহা ত বুঝিলাম। কিন্তু কিরূপে?

Holmes একখানি খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন আমাকে পড়িতে দিলেন। আমি পড়িলাম "দুইশত টাকা পুরস্কার! সর্ব্বোৎকৃষ্ট পান সাজার জন্য উক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। কুললক্ষ্মীগণ নিজ নিজ হাতের সাজা পানের সহিত নাম ও ঠিকানা ———

"ও! বুঝিয়াছি! এই উপায়ে তুমি বাংলার প্রতি গৃহ হইতে পানের নমুনা সংগ্রহ করিয়াছ।"

Holmes.—ঠিক ধরিয়াছ।

আমি। তারপর তারিণীকে আবিষ্কার করিলে কি করিয়া?

Holmes.—মুকুন্দ যুবক। তাহার পকেটে মাতঙ্গিনীর সাজা পান। মাতঙ্গিনীর একমাত্র অভিভাবক তারিণী, এবং মুকুন্দ তারিণীর ঘরের লোক নহে।

আমি। তুমি বলিতে চাও মাতঙ্গিনীর সহিত মুকুন্দের ———

Holmes.—Exactly!

আমি। এবং তারিণী প্রতিহিংসা বশে ———

Holmes.—খুন করিয়াছে।

আমি। আশ্চর্য্য! কিন্তু লোকটা যে কাল, ষণ্ডা, লোমশ ———

Holmes.—প্রেম, প্রতিহিংসা, প্রহারপটুতা,—এক কথায় Hyper adrenal.

আমি। Hyper adrenal নহে এমন লোকও ত খুন করে।

Holmes.—কেন করিবে না? অনেকে করে।

আমি। তবে?

Holmes হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সেই শুভ্রহাস্যের বিমল জ্যোৎস্নালোকে নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া আমি সঙ্কুচিত হইয়া গেলাম।

(৫)

আসামীর কাঠগড়ায় তারিণীকে দেখিয়াই বুঝিলাম লোকটা খুনী। তাহার মুখে ভয় বা অনুতাপের কোন চিহ্নই ছিল না। বলা বাহুল্য সে অপরাধ অস্বীকার করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, লোকটা পুকুর চুরি করিতে চাহে,—বলিতে চাহে সে জীবনে কখনও খুন করে নাই। Holmes তখন লাফাইয়া উঠিয়া তাহার নাকের সামনে একখানি ফটো দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাকে চিনিতে পার?"

তারিণী বলিল "হাঁ। ইনি আমার জামাতা মুকুন্দরাম।"

"জামাতা!" Holmes একটু থতমত খাইয়া গেলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "এই জামাতাকে তুমি গত ১লা ফেব্রুয়ারী বাঁশের খোঁচা দিয়া জলে ডুবাইয়া ছিলে?" এই কথা শুনিবামাত্র তারিণী মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পর উঠিয়া সাশ্রুকণ্ঠে দোষ

স্বীকার করিল "হুজুর আমি মুকুন্দকে খুন করিয়াছি, আমাকে দণ্ড দিন। হুজুর আমি কার্য্যোপলক্ষে তিন দিন কলিকাতায় ছিলাম। তাহার পর নৌকাযোগে বাড়ী ফিরিতেছিলাম। শিবপুরের কাছে আসিয়া দেখি একজন লোক জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। লোকটী কে সন্ধ্যার অন্ধকারে ভাল চিনিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমি স্থির করিলাম ইহাকে উদ্ধার করিব। কারণ উদ্ধার করিলে স্বর্গে যাইতে পারিব। কিন্তু লোকটার কি জাত জানা না থাকায় তাহাকে ছুঁইতে পারিলাম না। বাঁশের খোঁচা দিয়া তীরে উঠাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কোন ফল হইল না। হায়! তখন যদি জানিতাম ইনি আমার জামাতা।" ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন "দড়ি দিয়া টানিয়া তুলিলেই পারিতে। তুমি বাঁশের খোঁচা দেওয়াতেই লোকটী মরিয়াছে।"

তারিণী বলিল "হুজুর, বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই, জ্ঞানে আমি এবম্বিধ কার্য্য করিয়াছি।"

এই ওজর সন্তোষজনক মনে না হওয়াতে ম্যাজিষ্ট্রেট তারিণীকে সেসনে চালান দিলেন।

তারিণীর কথায় Holmes কিন্তু অভিভূত হইয়া পড়িলেন। গদগদকণ্ঠে বলিলেন "ও! কি বিরাট এই জাতি! কি প্রচণ্ড ইহাদের চরিত্রবল!"

আমি বলিলাম "এরূপ চরিত্রবল কয়জনেরই বা আছে। ইহারা মুখে যাহা বলে কার্য্যে যদি তাহা করিত তবে সকলেই তারিণীর মত হইতে পারিত। কিন্তু সেরূপ অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকে।"

Holmes. যাহা হউক জীবন মরণ ইহাদের নিকট কত তুচ্ছ!

আমি। হাঁ। একথা স্বীকার করিতেই হইবে। জীবনের প্রতি ইহাদের ঔদাসীন্য একেবারে—অপার্থিব।

(৬)

সেসন কোর্টে তারিণীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ টিঁকিল না। জজ সাহেব রায় দিলেন তারিণী good faith এ কাজ করিয়াছে। তাহার কোন দোষ নাই। অপরাধ যদি কেহ করিয়া থাকে ত সে মৃতব্যক্তি স্বয়ং। সে এতক্ষণ ধরিয়া হাবুডুবু খাইতে পারে আর নিজের জাত কুলের পরিচয় দিতে পারে না? যাহা হউক ঘটনা খুবই regrettable. তবে ভবিষ্যতে এরূপ দুর্ঘটনা আর না ঘটিতে পারে এই আশায় Indian Penal Code-এ সেই অবধি একটী নূতন ধারা যোগ করা হইল :—

"Whoever, out of doubt, determination, disease, deformity, or deranged internal secretion, conceals, or fails to reveal, his caste or creed, at the time of death from violent, nonviolent or other causes, has committed an act of Omission. for which, he is punishable, hereunder, by beng subjected,

after death, to section, dissection, laceration and maceration by a medical man in the—"

আমি শুনিতে পাই দেশের এক দল উকীল, হাকিম ও দারোগা একবাক্যে প্রচার করিয়া থাকেন যে Penal codeএ এরূপ কোন ধারা নাই। ইহারা যদি সবটা এমন করিয়া উড়াইয়া দেন ত আমি নাচার। হয় তাঁহারা মিথ্যা বলিতেছেন, না হয় আমি মিথ্যা বলিতেছি। ইহার অধিক আমার আর কিছু বলিবার নাই।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

রুদ্ধ-প্রেম

আমার পাষাণ অন্তরে
প্রেমের নদী রুদ্ধ-গতি গর্জ্জে গিরি-কন্দরে
চিত্ত গুহার আঁধার কারায় যে
মুক্তি পাবার পথটি হারায় রে
যেন, ঘোরে সে হায়, গোলক-ধাঁধায়, কোন মায়াবীর মন্তরে,
ইন্দ্রজালে অন্ধরে
যতই যুঝে পায়না খুঁজে পথ,
চতুর্দ্দিকেই উদ্গত পর্ব্বত,
তবু হ'য়ে অধীর পাষাণ প্রাচীর সঙ্গে করে দ্বন্দ্বরে,
যোঝার নাহি অন্তরে,
যবে কর্ণমূলে সিন্ধু-কূলের গান
মর্ম্মে পশি' আকুল করে প্রাণ,
যেতে চায় সে ছুটে, পাষাণ টুটে, লঙ্ঘি বাধা-বন্ধরে
চূর্ণি ধ্যান-মন্দিরে
অমনি যে হায়, শিকল বাজে পায়
শক্ত পাষাণ রক্ত চোখে চায়
তখন ব্যর্থ আশায় বুকের ব্যথায় লুটায় কঠিন কন্দরে
প্রেম নদী মোর অন্তরে।

ভাব্‌ছে নদী আপ্‌নাকে হায়, সিন্ধু বুকে করে
মিলিয়ে দিয়ে, বিলিয়ে দিয়ে ধন্য-জীবন হবে!

আমার হৃদয়-পিঞ্জরে,
প্রেমের পাখী থাকি থাকি কারে ডাকে ক্ষীণস্বরে
খাঁচার শোভা পরিপাটী অতি
সোনার বাটী হীরা মোতীর জ্যোতি,
আবার, চিত্ত হরে' নৃত্য করে অপ্সরা, গায় কিন্নরে
স্বর্গ সুখের চিহ্নরে

তবু প্রাণে নাইক মোটেই সুখ,
ব্যথায় সদা গুমরে ওঠে বুক,
সেই মুক্ত বনই মনকে নাচায়, সোনার খাঁচায় হীন করে
চায় না সে বন ভিন্নরে,
পাখী আবার পেতে তাহার কান
শোনে যখন নীল গগনের গান,
হতাশ প্রাণে আকাশ পানে চায় সে সারাদিন ধরে'
হয় না শিকল ছিন্নরে !
পাখী এখন পড়ছে বাঁধা বুলি
গেছে ভুলি গাইতে পরাণ খুলি,
গায় সে শুধু পরাণ বঁধু যখন লয়ে বীণ করে
মধুর সুরে গুঞ্জরে !

সুখের সোনার খাঁচায় বসে' ভাব্‌ছে পাখী তবু
মুক্ত আকাশ মুক্ত বাতাস মিলবে নাকি কভু !

আমার মনের মন্দিরে
কোন্ সে দেবীর চরণ সেবি' হ'লেম প্রেমে বন্দীরে,
পৃষ্ঠে দোলে কৃষ্ণ কেশের রাশি,
বিম্বাধরে কম্বু ধবল হাসি,
তার চন্দ্র-বদন, নম্র নয়ন, গ্রীবার কিবা ভঙ্গীরে,
ক্রৌঞ্চ মরাল সঙ্গীরে !
কোমল-তনু কমল দলে ভরা
মর্ম্মটি, হায়, মর্ম্মরেতেই গড়া,
সেই চরণ তলে নানান ছলে ঘোরে আমার মনটিরে
পাইনা ত তার মন ফিরে ;
সারা জীবন মরণ-বাঁচন পণ,
নয়ন-ধারায় পূজার আয়োজন
দেবী, দেয়না অভয়, হয়না সদয়, তবুও তারে বন্দিরে
মনের গোপন মন্দিরে !
মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয় মন
বিসর্জ্জনের করি আয়োজন,
তখন ক্ষুধা হরণ, সুধা-ক্ষরণ হাস্তে করে সন্ধিরে
কতই জানে ফন্দীরে !
শক্ত করে মায়ার ডোরে কে মোরে হায় বাঁধে,
চিত্ত মম বন্দী সম মুক্তি তরে কাঁদে।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমালোচনা।

" সুদুর্লভাঃ সর্ব্ব-মনোরমাঃ গিরঃ "

মাসিক সাহিত্য

মাসিক বসুমতী—মাঘ, ১৩৩২।

কাশ্মীরের মহারাজা (২য়)। শ্রী হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। এই প্রবন্ধে সূক্ষ্মদৃষ্টি হেমেন্দ্রবাবু, ''মহারাজা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছিল,—সে সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত" হইয়াছেন; এবং এই "আলোচনা" প্রসঙ্গে লেখক স্বীয় ওজস্বিনী ভাষায় ও অখণ্ডনীয় যুক্তিবলে এবং সেই সঙ্গে একেবারে দলিল দস্তাবেজের সন-তারিখ-পৃষ্ঠা প্রভৃতির উল্লেখপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে,—অচিরবিড়ম্বিত অভাগ্য রিপুদমনের ন্যায় প্রতাপসিংহও কিরূপে একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের কবলে বলিপ্রদত্ত হইয়াছিলেন।—পড়িলে শবদেহও বোধ হয় মোড়ামুড়ি ছাড়িতে চায়; ভারতের দুর্ভাগা রাজন্যবর্গের লাঞ্ছনা-বহুল অদৃষ্ট স্মরণে চক্ষে জল আসে!

কাশ্মীরের জরীপ-জমাবন্দীর জন্য নিযুক্ত উইংগেট নামক এক শ্বেতপুরুষ ১৮৮৮ সালের ১লা আগষ্ট তারিখের রিপোর্টে বলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস, তিনি (মহারাজা প্রতাপসিংহ) "সর্ব্বদাই সহানুভূতিশীল, ভূমিসংক্রান্ত সমস্যায় মনোযোগী, এবং সর্ব্বোপরি রাজকর্ম্মচারীদিগের অনাচার হইতে কৃষক-কুলকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প।" এই রিপোর্টের আটমাস পরে, ঐ প্রতাপসিংহকেই "কুশাসনের প্রবর্ত্তক ও পরিচালক বলিয়া রাজ্যশাসনভারচ্যুত করা হয়।"—ইহার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উপস্থাপিত করা হয়,—তন্মধ্যে একটি—"কাশ্মীরে ভূমিকর অধিক হওয়ায় কৃষকদিগের পক্ষে তাহা প্রদান কষ্টসাধ্য।" হেমেন্দ্রবাবু বলেন,—"এই অপরাধে যদি রাজাকে রাজ্যচ্যুত করা সঙ্গত হয়, তবে ভারতে ইংরাজ সরকারের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য?"

হেমেন্দ্রবাবুর এই প্রবন্ধটিতে কাশ্মীরের তদানীন্তন রাজমেধ যজ্ঞের যে অপূর্ব্ব বিবরণ আছে, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। তৎকালের এবং তৎপরবর্ত্তী সময়ের নিরপেক্ষ ইংরাজ-সঙ্কলিত পুস্তকাদি হইতে প্রমাণ-প্রয়োগ উদ্ধারপূর্ব্বক হেমেন্দ্র বাবু একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে,—কাশ্মীরের একখানি ছোট ("রাজ-তরঙ্গিণী" না হোক) "প্রতাপতরঙ্গিণী" প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার লেখায় দেখিতে পাই, প্রতাপ-ঘাতী "ষড়যন্ত্রের মধ্যে রেসিডেণ্ট, রাজা অমরসিংহ, (প্রতাপসিংহের ভ্রাতা) ও রাজস্ব-সচিব পণ্ডিত সুরাজকৌল ছিলেন।" কাশ্মীরের "বিভীষণ" অমরসিংহই শেষে মীরজাফরের মত কাশ্মীরের গদিতে স্থাপিত হন। এরূপ উপাদেয় প্রবন্ধ সকলেরই পড়া উচিত। প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক বলেন—"এইরূপে রেসিডেণ্টের কথায় মহারাজার কথা অবিশ্বাস করিয়া ভারতসরকার পূর্ব্বকৃত সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া মহারাজা প্রতাপসিংহকে রাজ্যভারমুক্ত ও অপমানিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বিনা বিচারে অপরাধী স্থির করিয়া লইয়া যে স্বৈরশাসনপ্রিয়তার পূর্ণ পরিচয় প্রকট করিয়াছিলেন, সেই ঘটনার পর বিনা বিচারে শত শত ভারতীয় প্রজার স্বাধীনতা হরণ করায় তাহাই পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।" বেলজিয়মের সহিত সন্ধিভঙ্গ করায় কিন্তু জার্ম্মান সম্রাট পিল্লল-

নয়নে একান্ত ঘৃণিত ও কদর্য্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের ঐটাই প্রধান অজুহাত। হেমেন্দ্রপ্রসাদের লেখনী অমর হউক।

ত্যাগীর লাভ। শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। ইহা একটি ছোট সামাজিক গল্প। প্রভাবতীর লিখিবার শক্তি আছে। নারী-হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য তাঁহার "কাকিমায়" সুন্দর প্রতিফলিত হইয়াছে। রতনের কাকা "কিশোর বাবু" শরৎচন্দ্রের "নিষ্কৃতির" হাত এড়াইতে পারেন নাই;—একটু হাতটান হওয়া দরকার।

মহাভারত ও ভারতবর্ষের ইতিহাস। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কর্ণেল)। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় একজন চিন্তাশীল লেখক ও পাশ্চাত্য 'সোসিওলজি' প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত, উপরন্তু তিনি একজন বিচক্ষণ ও প্রবীণ ডাক্তার। সুতরাং তাঁহার অন্যান্য পুস্তক ও প্রবন্ধাদির ন্যায় বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিও অতি উপাদেয় ও যৌক্তিকতার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"মহাভারত কি, বুঝিতে হইলে রামায়ণ কি, প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন"—এই ভাবে প্রতিপাদ্যের অবতরণিকা করিয়া কর্ণেল মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নিজের কপোলকল্পিত একটি কথাও বলেন নাই। খাঁটি, সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিকের চক্ষে মহাভারত পাঠপূর্ব্বক যেমন যেমন তাঁহার বিচারবুদ্ধিতে মনে হইয়াছে, তাহাই সরল ছাত্রের মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা তাড়াতাড়ি রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে কিছু জানিতে চান,—অন্ততঃ রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে নিজেদের অজ্ঞতা ক্ষালনপূর্ব্বক লোক-নয়নে কতকটা কম "অপ্রস্তুত" হইতে চান, তাঁহারা এ প্রবন্ধটি অবশ্য পড়িবেন। আর যাঁহারা রামায়ণাদির ঐতিহাসিকত্ব কতদূর, হৃদয়ঙ্গম করিতে চান, তাঁহারাও ইহা পাঠ করিলে পরিতৃপ্ত হইবেন। তবে "হনুমানজী" "জাম্ববানজী" "সুগ্রীবজী" প্রভৃতি যাঁহাদের দেবতা,—তাঁহারা এ প্রবন্ধ পড়িলে ব্যথিত হইবেন মাত্র।

সুরধুনী, (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায়। কবিশেখর কালিদাস রায়ের ইহা একটি অতি মধুর কবিতা। পড়িতে পড়িতে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে কবির সহিত ঘুরিতে হয় এবং ক্ষণকালের জন্য বর্ত্তমান ভুলিয়া যাইতে হয়। সুকবি কালিদাসবাবুর এই "সুরধুনী" এমনই লহরে লহরে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে, যে আত্মবিস্মৃত হইয়া পাঠককে ইহার সাথে সাথে ছুটিতে হয়,—সে ছোটায় ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, অবসাদ নাই। আমরা ব্যথিত হৃদয়ে এই বঙ্গবাণীতেই তাঁহার ব্যবসাদারি কবিতার উল্লেখকালে দু' একটি তীব্র কথা কহিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কেননা, বাঙ্গালার তিনি গর্ব্বের পাত্র, শ্লাঘার কেতন। তাঁহাকে ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর ক্রমে উন্নততম কল্পনার স্তরে দেখিতে চাই, তাহার বিপরীত দেখিলে মনে বড়ই কষ্ট হয়, প্রাণে লাগে। আজ তাঁহার এই "সুরধুনী" কবিতায় যদি নাম নাও থাকিত, তবুও আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, ইহা আমাদের সেই—"নন্দকুল চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার" গীতিকার সুকবির সঙ্গীত। বহুকাল পূর্ব্বে অমর কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের—"নির্ম্মলসলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও" পড়িয়াছিলাম আর আজ কবিবর কালিদাস রায়ের—এই "সুরধুনী" পাঠ করিলাম। কালিদাস বাবু—

"নমি সুরধুনী পতিতপাবনী তুমি সনাতনী সারাৎসারা
নমি মা অমলা, কমলাদয়িতচরণকমল-মধুর-ধারা।"

বলিয়া ত্রিপথগাকে প্রণাম করিয়া পূজায় বসিয়াছেন, আর

"ভব সিকতায় মার মমতায় অনল শয্যা পাতিয়া রেখ,
তারকব্রহ্ম নাম কানে দিও, জননি আমার শিয়রে থেক !"

বলিয়া পূজা শেষ করিয়াছেন—মধ্যে পূজাকালে মার অর্চ্চনার জন্য কবি স্বীয় চিরস্নিগ্ধ ও চিরনবীন কল্পনা-কানন হইতে যে সমুদয় সুন্দর সুন্দর কুসুমের আহরণপূর্ব্বক অঞ্জলি দিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মভাবময় হৃদয়ের ভক্তি-চন্দনে মাখিয়া যে সকল অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন তাহা যথার্থই দেখিবার বস্তু।

কবির সঙ্গীত সার্থক হইয়াছে, কবির অমরী কল্পনার মূর্চ্ছনার মার প্রাণ গলিবেই গলিবে। কালিদাস বাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তিনি এইরূপ কবিতা লিখুন,—বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। মাসিক বসুমতীর এই অনুপম সঙ্গীত সকলকেই কান পাতিয়া শুনিতে অনুরোধ করি।

স্বাস্থ্য—ফাল্গুন, ১৩৩২।

ভেষজ মীমাংসা। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী, এম এ, এল্ এম্ এস্। ইহা একটী সারগর্ভ ও অবশ্যপাঠ্য প্রবন্ধ। আত্মবিস্মৃত জাতির চৈতন্যোদ্দীপক 'ষ্ট্রীক্‌নিয়া ইনজেকসন'। প্রবন্ধটির সমস্তই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ সামান্য একটু উদ্ধৃত হইল—"শিলাজতু ধাতুবহুল পর্ব্বতের ধর্ম্মবিশেষ, পর্ব্বত গাত্র হইতে বহির্গত হয় বলিয়াই উহার নাম শিলাজতু। "জতু" শব্দের অর্থ গালা বা আঠা। এহেন দ্রব্যকে বৃক্ষরূপে দাঁড় করাইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত সার্কুলারে "শিলাজতু" বৃক্ষ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গবেষণার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল।"—ইহার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের বাহুল্য অভিপ্রেত। ভাষার দিক্ দিয়া দেখিলে প্রবন্ধটি প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়।

আকস্মিক বিপদ ও তাহার প্রতিকারের উপায়। কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় 'কবিরত্ন' এম এ, এম বি। এই প্রয়োজনীয় প্রবন্ধে বৈদ্যরাজ যামিনীভূষণ ১৮টি "আকস্মিক বিপদ" ও তাহার "প্রতিকারের" উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শুধু বাঙ্গালী পুরুষ নহে, বঙ্গের বর্ত্তমান গৃহদেবতাগণেরও ইহা অবশ্যপাঠ্য। তবে দুইএকটি উপায় একটু যেন কেমন ঠেকিল, যথা—"কোন গাছ হইতে পড়িয়া গিয়া বা গাড়ীর তলায় পড়িয়া সর্ব্বশরীরে আঘাত প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র চিকিৎসক ডাকিতে পাঠাইবে।" তবে এই প্রথম উপায়ের পর অন্য উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। ফলকথা, এতাদৃশ উপদেশের ভূয়ঃপ্রচার আবশ্যক।

স্বাস্থ্য কথা। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। হেমেন্দ্র বাবুর এ দুর্দ্দশা কেন? নেহাৎ জোর করিয়া ধরিয়া তাঁহার দ্বারা এই লেখাটুকু কালিকলমে আঁকা হইয়াছে। প্রতিলাইনে গড়ে চব্বিশটি অক্ষর, এইরূপ পনরটি লাইনে বিরাট "স্বাস্থ্যকথা" বিবৃত! বিস্ময়ের বিষয় বটে। তবে "নাম্‌কা-ওয়াস্তে" বড় বড় লেখকের সংস্পর্শ রাখা দরকার। সে হিসাবে "স্বাস্থ্য"-সম্পাদক নিরপরাধ। কিন্তু হেমেন্দ্র বাবুর ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের এরূপ গবাক্ষে বায়ুসেবন শোভন হয় নাই। প্রত্যুত ক্ষতি হইয়াছে।

বাঁচিবার উপায়। ডাঃ স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু Kt., C. I. E., O. B. E.—ইহাও একটি ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধ, অবশ্য বাঙ্গালাভাষায়। ইহার দ্বারা গণনাথ-যামিনী-শোভিত মাসিকের কোনো অতিরিক্ত গৌরব হয় নাই। পরন্তু, উদ্দার্য্যচর্ব্বণের মাত্রাধিক্যে ইহা (প্রবন্ধ?) অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়াছে। বাঙ্গালীর বণগালিতা প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া লেখক অনেকটা "রিসার্চ্চ" করিয়া ফেলিয়াছেন, যথা—"ইংরাজদিগের প্রথম আমলে যখন মহারাট্টীরা উড়িষ্যায় অত্যাচার আরম্ভ করিতে থাকে, তখন রাজা নবকৃষ্ণের পিতা রামচন্দ্র উড়িষ্যায় গমন

করিয়া তাহাদিগকে "বিতাড়িত" করিয়াছিলেন। আজ সেই বাঙ্গালীই জীবন্মৃত,—কারণ কি? প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া।", রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য খ্যাপনে শতমুখ হইয়াও লেখক জমাইতে পারেন নাই। নূতন কোনো কথাই বলেন নাই। "বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" ইত্যাদি অদ্ভুত বাঙ্গালা ভাষা "বীচামের পিলের" বিজ্ঞাপনেই শোভা পায়, মাসিক পত্রে নহে। "বাঙ্গালা দেশের মৃত্তিকার নিম্নে যে জলপ্রবাহ হয়, তাহা বর্ষাকালে ভূমির উপরিভাগ হইতে নিকটেই থাকে।"—ইত্যাদি বিচিত্র অস্ত্রোপচারে বঙ্গভারতীর অঙ্গে "এক্স্‌পেরিমেণ্ট" না করিয়া, নাইট মহোদয় যে ভাষায় অনেকে স্বপ্ন দেখেন, সেই ইংরাজী ভাষায় লিখিতে মনস্থ করুন।

সবুজপত্র, মাঘ, ১৩৩২।

ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি—(একটি পারিবারিক সমিতিতে পঠিত)—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী। বাঙ্গালাভাষায়, ঠাকুরমার গল্পের ন্যায়, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ, ইতিপূর্ব্বে এমন সুন্দরভাবে আর লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। দ্বিতীয়ভাগ বা বোধোদয় পর্য্যন্ত যাহাদের বিদ্যা, তাহাদের সহিত অনেক F. R. G. S. পর্য্যন্ত ইহা পড়িয়া শুধু যে আমোদ পাইবেন, তাহা নহে, অনেকটা শিখিতেও পারিবেন। একটি বাজে কথা নাই। আদ্যন্ত পাঠকের কৌতূহল বৃদ্ধির মালমসলায় পরিপূর্ণ। বীরবল বাহাদুর তাঁহার চিরপ্রিয় ও সযত্নবর্দ্ধিত আলস্যকে কিছুদিনের জন্য changeএ পাঠাইয়া—যদি কৃপাপূর্ব্বক একখানা সত্যিকার ছেলেদের "জিওগ্রাফি" লেখেন,—বাছারা বাঁচিয়া যায়। সেই একঘেয়ে "আকার গোল, কিন্তু উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপার" চাপে তাদের দুধের প্রাণ আর হাঁপসায় না। এই প্রবন্ধটিও একখানা ছোট্ট বইএর আকারে ছাপাইয়া পড়িতে দিলে মন্দ হয় না। তবে তার প্রধান অন্তরায়, যাঁরা আমাদিগকে মা'র চেয়েও ভালবাসেন, তাঁদের ভালবাসার প্রাচীর। পাছে এমনধারা বই পড়িলে ছেলেরা হঠাৎ কিছু শিখিয়া ফেলে,—তাই দেশের যিনি যতই হিতকামী হইয়া প্রাণপণে কেতাবপত্র লিখুন না কেন, ঐ প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্ভেদ্যদুর্গে সেগুলির 'প্রবেশ নিষেধ'। নিজের দেশের শিক্ষায় নিজেদের ঘরের ছেলেপিলের শিক্ষায়ও "ঝাল খাইতে হইবে পরের মুখে,"—অর্থাৎ তাঁহারা বলিবেন—"পড়িতে পারহ,"—তবেই পড়িতে পারিবে, নতুবা নহে.— কেননা, তাঁরা যে পৈতৃক জমিদারী হইতে সাহায্য করেন, অর্থাৎ aid দেন। লেখক যে একজন কত বড় তীক্ষ্নদৃষ্টি এবং শক্তিশালী চিত্রকর, তাহার প্রমাণ এই "জিওগ্রাফির" প্রত্যেক পংক্তিতে দেদীপ্যমান।

সবুজপত্র, ফাল্গুন, ১৩৩২।

বিদায়ে।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী। যতীন্দ্রমোহনের এই "বিদায়ে" অনেক আনন্দের জিনিষ আছে। যে কবিতার পাঠে হৃদয় নির্ম্মল হয়, অনাবিল আনন্দ-রসধারায় প্লাবিত হয়, তাহাই প্রকৃত কবিতা। এই "বিদায়ে" কবিতায় ক্ষণকালের জন্য পাঠকের নিজের তহবিলে হাত পড়ে। যখন কবির—

"জীবন-ঘাটের আধেক সোপান প্রায় ত হলাম পার,
যে ক'টা ধাপ রয়েছে আর বাকি,—
ভাঙন্‌-ধরা শেওলা-পিছল তাও যে চারিধার—
পার হ'তে আর পারব সে ক'টা কি?

দিনের আলো নিবিয়ে আসে ক্লান্ত আঁখির পাতে,
আস্‌ছে কানে কালো জলের ডাক ;
তবু আমায় ফিরতে বলিস্ তোদের খেলাঘরে,
ওরে পাগল, হাতছানি তোর রাখ্ !"

কবিতা পাঠ করি, তখন সত্যই মনে ভাবি—

" পার হ'তে আর পারব সে ক'টা কি ?"

যতীন্দ্রমোহনের এই কবিতা পাঠ কালে একটা মানসিক তন্দ্রায় হৃদয় অলস হইয়া আসে। সত্যই কবির সহিত কোন্ প্রৌঢ়ের মনে না হয় যে—

লাগ্‌ছে গায়ে শীতের হাওয়া, জাগ্‌ছে শিহরণ,
ভাবৃছি আজ এ জীবন-সীমানাতে—
নূতন সাথীর নূতন রূপটি কি মনোহরণ,
কি পরিচয় হবে বা তার সাথে !"

জীবন সন্ধ্যায় সংসারতরঙ্গিণীর তীরে বসিয়া কবির সাথে কে না ভাবে—

" ঐ যেখানে ঢেউএর শেষে নদীর পরপারে—
ঝাপ্‌সা আঁখির দৃষ্টি-অন্তরালে,
অজানা ঐ আঁধার-ঘেরা অচিন বেড়ার ধারে
সন্ধ্যাবধূ তারার বাতি জ্বালে,—
ঐখানে ঐ সুদূর পারের নূতন পথের শেষে
মোর তরে কি বাজ্‌ছে সাঁঝের শাঁক !
এপার—সেত দেখাই গেল, যাব যে ঐ পারে,—
যেখানে ঐ নীল মোহানার বাঁক্ !"

এরূপ কবিতা বঙ্গভাষার সম্পদ্ এবং ক্লান্ত হৃদয়ের অমৃত-লেপ-সম্মিত।

প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩২।

কৃষক।—(কবিতা) শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। ইহা একটি সুপাঠ্য কবিতা। কল্পনাকুশল লেখক "কৃষক" এই নামের দ্বারাই কবিতার "বস্তু নির্দ্দেশ" করিয়াছেন। লেখার প্রধান গুণ—পাঠককে আকর্ষণ করিয়া কবিতার মধ্যে ডুবাইয়া ফেলা—ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। উপেক্ষিত কৃষককে সম্বোধন করিয়া ভাবুক লেখক অনেক ব্যথার কথা কহিতে কহিতে বলিতেছেন—

" ওগো ও মাটির বন্ধু, নিভৃতবিলাসী,
রহস্যের নবমন্ত্রে তব
মুঞ্জরিছে পত্রশ্যাম বসন্ত-বৈভব
তরুণিত চির-অভিনব।

বরষসঞ্চিত তা'র বক্ষের বেদনা
ফুল হ'য়ে ফুটিবারে চায় ;
মূক মেদিনীর ব্যথা খুঁজে ফিরে পথ,
এস বন্ধু, ভাষা দাও তায়।
বীজের গোপন পক্ষে শিহরে উল্লাস
তরু হ'য়ে উঠিতে আকাশে ;
কোরকের বদ্ধ হিয়া পেতে চায় ছাড়া
দিশাহারা অশান্ত বাতাসে ;
নবীন আষাঢ় এল উড়ায়ে নিশান
তৃণদল আনন্দে বিহ্বল ;
এস কবি পূর্ণ করো তাদের কামনা
স্বপ্ন হোক্ সার্থক সফল।"

এইরূপ সমবেদনায় অধীর হইয়া লেখক—

"এখনো তোমার বাঁশী বেজে উঠে দূরে
প্রভাতের ভাঙ্গাইয়া ঘুম"—

বলিয়া যেন নিজেই পাগল হইয়া উঠিয়াছেন এবং দূর অতীতে গিয়া পড়িয়াছেন—সে অতীত আজ শ্মশানের মত রুদ্রভীষণ, ভয়ঙ্কর নীরবতায় আচ্ছন্ন। সেই শ্মশানে দাঁড়াইয়া কবি—

"কোথা সেই হত্যাপ্রিয় আততায়ী দল
দিগ্বিজয়ী যাহাদের নাম ;
কোথা সেই রণোল্লাস, কোন্ ধূলিতলে
ধূলি হ'য়ে লভিছে বিশ্রাম !
ম'রে গেছে রাজা ও নকীব—রক্ত-লেখা
সে-কাহিনী বিস্মৃত সুদূর।
তৈমুরের অস্থি ল'য়ে নগর তোরণে—
খেলা করে পথের কুকুর।
আপনার আশীবিষে দহন-জর্জ্জর
আপনি মরেছে তা'রা সব,
আজও তুমি বেঁচে আছ হে চিরনবীন,
হে কিশোর, তরুণ পেলব !"

বলিয়া সজল-নয়নে ভারতের চিরনবীন কৃষককে আলিঙ্গন করিতে বাহুপ্রসারণ করিতেছেন। পরক্ষণেই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া কবি দেখিতেছেন—

"আকাশ ধূসর করি' ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
আজিকেও এসেছে আবার,
অতীতের অতিকায় বারণের সম—
সুবিরাট বীভৎস-আকার।"

সে মত্ত ঐরাবত অতিভীষণ অতিবীভৎস—

"মুখ তার রক্তমাখা, লোহাগড়া দাঁত,
মুহুর্মুহু অনল উদ্গার;
ধরণীর স্নিগ্ধশোভা শ্যাম দেহবাস
নিশ্বাসেতে জ্ব'লে হয় ক্ষার।
দন্ত তার প্রাণহীন দেহের আহার
বৃত্তি শুধু দুর্ব্বলপীড়ন;
একেশ্বর ধনিকের ফুলাইয়া পেট
লক্ষ জনে দেয় অনশন"—

এত বড় বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা যার, কবি বলেন—

"ভাগ্যে তা'র অশনি-সম্পাত;
কক্ষচ্যুত জ্বালাময় ক্ষিপ্ত গ্রহসম
অর্দ্ধপথে হবে বাজী মাৎ"

আকাশগঙ্গার স্রোতে উদ্দাম দিগ্‌গজের ন্যায় যেদিন কালের অনন্ত ও ভীষণ তরঙ্গে এই মত্ত ঐরাবত ভাসিয়া যাইবে, হে কৃষক,—

"তখনও রহিবে তুমি, ধরণীর প্রিয়,
হে তরুণ, হে অমর কবি!
তখনও ধরার বক্ষে মোহন তুলিতে
ফুটাইবে স্নিগ্ধশ্যাম ছবি।"

তুমি এমনই ত্রিকালজীবী কৃষক। কত উপদ্রব, কত অত্যাচার তোমার উপর দিয়া গিয়াছে,—তুমি অচল অটল ভাবে—

"যুগে যুগে ঝঞ্ঝাবাত প্লাবনদহন
শির পাতি' করেছ গ্রহণ;
অক্রোধে জিনেছ ক্রোধ, শান্তিতে বিগ্রহ,
—ক্ষমা দিয়া হিংসার বারণ"

তুমি এমনই চিরন্তন, তুমি এমনই সর্ব্বংসহ কৃষক। তোমাকে কি বলিয়া অভিবাদন করিব?

কবির এই সুন্দর কবিত্ব যথার্থই উপভোগের বস্তু। কবিতাটি নির্ব্বিকারে সকলের পাঠ্য। আমরা সাহিত্যের চিরশ্যাম কল্পকাননে অরীন্দ্রজিৎকে সাদরে অভিবাদন করিতেছি। ভগবান বুদ্ধের "অক্রোধেন জিনে ক্রোধং অসাধুং সাধুনাজিনে"—উপদেশ শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে সুন্দর খাপ খাইয়াছে।

হসন্তুতরফদার—কুড়ুলরাম রচিত, ঢেঁকিরাম বিচিত্রিত। ইহা পরশুরাম রচিত ও নারদ বিচিত্রিত চিত্রের ব্যর্থ অনুকরণ। লিখিবার ভঙ্গিতে সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু রস তেমন ফোটে নাই।

সুদর্শন

জীবনের বসন্ত

(গল্প)

বালিগঞ্জে বিমল-দেবীর বাড়ী ভারী সমারোহের পার্টি ছিল। মিউজিক স্কুলের ছাত্রীরা গান-বাজনা আর অভিনয়ে আসর জমাইয়া তুলিয়াছিল খুব, কাজেই পার্টি ভাঙ্গিতে রাত এগারোটা বাজিল।

সুরমা সেই পার্টিতে গিয়াছিল; পার্টি ভাঙ্গিলে মোটরে বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়া একেবারে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। ছেলেমেয়েরা খাটে শুইয়া ঘুমাইতেছে। সুরমা একবার চকিতের জন্য ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের পানে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল, ছোট খোকার ঘুমন্ত মুখে একটা চুমু খাইল, তারপর পাশের ঘরে চলিয়া গেল, বেশভূষা ত্যাগ করিবার জন্য।

খোকার ঝী আসিয়া দাঁড়াইলে সুরমা প্রশ্ন করিল,—ছেলেমেয়েরা খেয়ে-দেয়ে শুয়েচে তো?

খোকার ঝী কহিল,—হ্যাঁ।

—ঘুম ভাঙ্গেনি কারো?···আমায় খোঁজেনি?

—না।

—বাবু কখন এলেন রে?

—বাবু তো এই-মাত্তর ওপরে এলেন, এসে নিজের ঘরে গেছেন।

—আমায় খুঁজেছিলেন?

—না।

—তুই যা।···ওঃ-কাপড়-চোপড়? তা এসব রাত্রে এই ঘরেই থাক। তুই শুধু আমার কাপড় আর সেমিজটা দিয়ে যা—দিয়ে শু'গে যা, রাত হয়েছে অনেক।

খোকার ঝী সাড়ী-সেমিজ দিয়া শুইতে গেল।

সুরমা প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়াইল। কমলা-লেবুর রঙের ক্রেপ-সিল্কের শাড়ী আর তারি ব্লাউজ, গলায় কলারের নীচে মুক্তার মালা···বসন-ভূষণগুলা তার রঙের সঙ্গে এমন মানাইয়াছিল যে পার্টিতে মিসেস্ সেন তার রূপের কতখানি তারিফ করিলেন,···শুধু রূপ! কেমন শ্রীটুকু···সুরমার ঠোঁটের কোণে গৌরবের একটা হাসি খেলিয়া গেল। আপনাকে নানাভাবে নিরীক্ষণ করিয়া শাড়ী-আঁটা ক্রচ্‌টা সে খুলিয়া ফেলিল। তারপর মুক্তার মালা, ব্রেশলেট খুলিয়া আর্শির টেবিলে রাখিয়া ব্লাউজ খুলিল। আর্শির বুকে আপনার নিরাভরণ মূর্ত্তির পানে তার নজর পড়িল। সে চমকিয়া উঠিল। এ সে-ই···! গালে ব্লুম-রুজ মাখা, গহনা আর রঙীন কাপড়-চোপড়ের আড়ালে তার সারা দেহে এই যে অপরূপ শ্রী ফুটিয়াছে,

এ তার নিজের দেহের,না, মদনের-কাছ-হইতে-মাগিয়া-লওয়া সেই চিত্রাঙ্গদার রূপ-যৌবনের মতই কৃত্রিম। আজই পার্টির ঐ অভিনয়ে সেই গানটা…গানের ছত্র সুরমার মনে পড়িল,—

বয়স আমার এগিয়ে গেছে, যৌবনেরি সীমার পারে…
মন মানে না, সে-যৌবনে জড়াতে চায় বারে-বারে!

এর পরের কথাগুলা ঠিক মনে নাই, তবে মনের সঙ্গে বয়সের এই বিরোধে নায়িকার কি বেদনাই না বাজিতেছিল। এত বড় ট্রাজেডি আর আছে, বিশেষ নারীর পক্ষে। বয়স কোনো দিকে না চাহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, মন তো তেমন করিয়া ছুটিতে পারে না। সে ঐ যৌবনের সমস্ত মাধুরীটুকুকে আপনার মাঝে প্রাণপণ শক্তিতে যে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। জগতের এই চলা-ফেরার পথে লোকের পর লোক আসিতেছে…যৌবনের মন্দিরটির কাছেই সব-চেয়ে বেশী ভিড়। এ মন্দিরের দ্বার ছাড়িয়া কেহই আর নড়িতে চায় না। লক্ষ্মীছাড়া বয়সটার কিন্তু না আছে মায়া, না আছে মমতা—রসকস বুঝিবারো তার শক্তি নাই।…অথচ মন তাকে ছাঁটিয়া ফেলিতেও পারে না।

সুরমার মনে হইল, গানের সে ছত্রগুলা…যেন তারি অন্তরের কথা! তারো বয়স হইয়াছে। কিন্তু পাছে সে খপরটুকু বাহির হইয়া পড়ে, তাই প্রাণপণে বাহির হইতে এই দেহটাকে নানা সাজ-সরঞ্জামে গুছাইয়া রাখিতে সর্ব্বক্ষণ এ কি চেষ্টা। নিজেকে সাজাইয়া রাখিতে কি কারিগরিই না করিতে হয়। এর চেয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা নারীর আর কি আছে। কিন্তু যার জন্য বিশেষ করিয়া এ চেষ্টা,—সেই স্বামী…

তিনি তাঁর কাগজ-পত্র, আর ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়াই দিনরাত মশগুল! কি মোহিনী বেশ ধরিয়া তাঁর সামনে সুরমা কতবার গিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তিনি কি কোনোদিন মুখের পানে চাহিয়া সুরমাকে তেমন আদর সোহাগ করিয়াছেন। জীবনে প্রথম যেদিন বসন্ত-উদয় হইল, সেদিনকার সেই অজস্র আদর, অফুরাণ অর্থহীন কত-না প্রণয়-কাকলী..... ...আজ তার কিছু নাই। সে কত দিনের কথা। হোক্ দীর্ঘ দিন, তবু আজো তেমনি আদর পাইবার জন্য সুরমার মনে তো তেমনি আকুলতাই জাগিয়া আছে ......

সুরমার মনে হইল, এই কৃত্রিম সাজ-সজ্জার ফাঁক দিয়াই কি সে তবে স্বামীকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে।…

কথায় বলে, নারী কুড়ি পার হইলেই যৌবন-সীমার বাহিরে চলিয়া যায়। এ কথা সে কোনদিন মানে নাই। তার বয়স হইয়াছে ত্রিশ, চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে, তাদের পরিচর্য্যা করিতেই সময় কাটিয়া যায়। সব সত্য…কিন্তু স্বামীর কাছে সে যে তাঁর সেই সুরমাই আছে। একটু প্রণয়-সুধার পিয়াসী, একটু আদরের কাঙাল।

টেবিলের উপর তোয়ালেখানা পড়িয়াছিল। সুরমা তোয়ালে ঘষিয়া মুখের রং মুছিয়া ফেলিল।

রাত বারোটা বাজে। পাশের ঘরে ছেলেমেয়েরা ঘুমাইতেছে! ছেলে-মেয়েদের লইয়া সে এই ঘরেই শোয়। স্বামীর শয্যা…তার ও-পাশের ঘরে। সেই যে কবে তু'জনে তু'ঘর লইয়া আলাদা হইয়াছে, সে-অবধি এই ব্যবধান। তু'জনে দেখা কি হয় না? হয়। অসদ্ভাব নাই, বিমুখতা নাই, কাজের কত কথা, সাংসারিক বিষয় লইয়া অতি-তুচ্ছ পরামর্শ… ! সব ঠিক আছে। সমস্ত ব্যাপারেই সুরমা যা করে, তা'ই হয়, স্বামীর দিক হইতে এতটুকু অনুযোগের সুরও ওঠে না। দৈবাৎ কোনটায় স্বামী যদি বলেন, তাইতো…সুরমা অমনি জবাব দেয়, তা…তোমার মত না থাকে যদি,…স্বামী অমনি তার কথায় বাধা দিয়া হাসিয়া বলেন— না, না, তোমার ব্যবস্থাই ঠিক। তাতে আমার অমত নেই মোটেই।…

সংসারে সুখ যাকে বলে, তার অভাব নাই। সাম্‌নে-আড়ালে পাড়ার মেয়েরা সুরমার সৌভাগ্যের কত কাহিনীই গাহিয়া বেড়ায়।…তবে…?

আজ অভিনয়ে ঐ গানটা শুনিয়া অবধি…আর শুধু তাই নয়। তার উপর, এই আয়নার সামনে দাঁড়াইতেই হঠাৎ সুরমার বুকটা কেমন হাহাকার করিয়া উঠিল! নারী কি এইটুকুই চায়? এই আধিপত্য পাইলেই কি তার সব পাওয়া হইল?…সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

বাহিরে চাঁদের-জ্যোৎস্নায় আলোর পাথার বহিয়া চলিয়াছে। ফাল্গুন মাস। স্নিগ্ধ বাতাসে সারা পৃথিবী যেন উল্লাসে আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। অদূরে কোন্ গৃহের কোণে বসিয়া এই চাঁদের আলোয় বিশ্ব ভুলিয়া কে গাহিতেছিল—

সখি, সে গেল কোথায়!
তারে ডেকে নিয়ে আয়!
দাঁড়াবো ঘিরে তারে তরুতলায়!

পাথরের পুতুলের মত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া সুরমা সে গান শুনিল। গান থামিলে তার চেতনা হইল।…নির্লজ্জ সাজ, নির্লজ্জ সে…তাই এখনো সে সাজ গায়ে রাখিয়াছে। এ সাজে কি সে লাভ করিল! শুধু সাজের দিকেই মন ঢালিয়া মূঢ়ের মত কিসের গৌরব স্বপ্নে সে এমন অচেতন ছিল! এ সাজের পানে কে চাহিয়া দেখিয়াছে! যার দৃষ্টির লোভে এ সাজে প্রথম নিজেকে সাজাইবার আকুলতা প্রাণে জাগিল, যৌবনের বিদায় লওয়ার মস্ত খপর এই সাজের জমকে যার কাছে সে পৌঁছিতে দিতে চাহে নাই, সাজের আড়ম্বরের ঘটায় তার কথাই যে সে ভুলিয়া বসিয়া আছে।

আজ বসন্তের এই উচ্ছ্বাসে-নিশ্বাসে সাজের খোলস কোথায় সরিয়া গিয়াছে। মনের ভিতরকার প্রচণ্ড দৈন্য-হাহাকার এক নিমেষে সেই সাজের ফাঁকি ছিঁড়িয়া চোখে ধরা পড়িয়াছে।

স্বামী···! তাঁর কাছে যাইতে বড় সাধ হয়! তিনি যদি একবার মুখের পানে চাহিয়া দেখেন,···আগেকার মত তেমনি দৃষ্টিতে চাহিয়া একবার একটু আদর করেন!···

কিন্তু এই রাত্রে কি বলিয়া হঠাৎ স্বামীর কাছে গিয়া দাঁড়াইবে? আদর ভিক্ষা চাহিতে··· সোহাগের কাঙালিনী?···ছি! এর চেয়ে লজ্জা আর নাই! কাঁদিয়া আদর মাগিবে স্বামীর কাছে? তার চেয়ে···!

হঠাৎ একটা কথা মনে হইল। গহনাপত্র যে-আলমারিতে থাকে, সে-আলমারিটা স্বামীর ঘরে। রাত্রে কোথাও গেলে ফিরিয়া গহনাগুলা সুরমা নিজের ঘরে আর্শির টেবিলের ড্রয়ারে রাখে, পরদিন সকালে সেগুলা আলমারিতে তোলে! গহনা তোলার অছিলা কাজেই চলে না! তবে···? ঠিক!···কিন্তু ছলা! উপায় নাই! নারীর সে আশ্রয় লইতেই হইবে······ না হইলে ···

মুক্তার কলারটা ফাঁশ দিয়া জড়াইয়া গলায় আঁটিয়া শাড়ীর আঁচল কোনমতে গায়ে জড়াইয়া সুরমা গিয়া স্বামীর ঘরের দ্বারে দাঁড়াইল।

ঘরে জ্যোৎস্না একেবারে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তা-সত্ত্বেও ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিতেছে, আর সে-আলোয় বিছানায় শুইয়া স্বামী কি-একখানা বই পড়িতেছিলেন। সুরমা একটা নিশ্বাস ফেলিল। ঐ নীরস বইয়ের পাতায় এত কি সুধার স্বাদ পাইয়াছ গো তুমি!

বহিখানা উপন্যাস। নায়ক-নায়িকার খুব একটা ঘোরালো রকমের প্রণয়-সমস্যার মাঝখানে পড়িয়া স্বামীর বুকটা নিমেষের জন্য কেমন ধ্বক্ করিয়া উঠিল! কবেকার কোন্ অতীতের ভুলিয়া-যাওয়া স্মৃতির রাশ বুকের মধ্যে ঝড় তুলিল। বহিখানা বুকের উপর রাখিয়া স্বামী আকাশের পানে চাহিলেন। আকাশে তুষার-শুভ্র আলোর হিল্লোল! তার উপর একরাশ ফোটা ফুলের গন্ধ বহিয়া ফাগুন-বাতাস দুরন্ত শিশুর মত ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছিল।

সুরমা নিমেষের জন্য দাঁড়াইয়া স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল। বুক তার দুলিয়া উঠিল। তারপর কখন্ এক সময় ডাকিল,—ওগো···বলিয়াই সে একেবারে আসিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইল।

স্বামী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, চাঁদের আলোয় সুরমাকে কি সুন্দর দেখাইতেছিল!

এত রাত্রে সুরমা! স্বামী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিলেন, কহিলেন,—কি বলচো? ছেলেদের কারো অসুখ হলো না কি?

সুরমা কহিল,—না।

—আঃ! স্বামী আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। সুরমার বুকে কে যেন পাথর ছুড়িয়া মারিল। শুধু কাজ—কাজের কথা ছাড়া স্বামী স্ত্রীর আর কথা নাই? হায় রে!

স্বামী কহিলেন,—তুমি ঘুমোও নি যে এখনো?

সুরমা আবার নিশ্বাস ফেলিল। সে কহিল,—না, বালিগঞ্জে বিমলাদিদির ওখানে নেমন্তন্ন ছিল না? মিউজিক-স্কুলের মেয়েরা অভিনয় করলে,—দেখে ফিরচি এই।

স্বামী কহিলেন,—ওঃ!

ছোট্ট একটু স্বর। কিন্তু সে স্বরে যেন একরাশ তীক্ষ্ণ তীর গাঁথা ছিল। তার সব কয়টা আসিয়া সুরমার বুকে বিঁধিল। এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে সে···সুরমা কখন্ কোথায় যায়, ফিরিল কি না, স্বামী তার খপরও রাখেন না। সে খপর রাখার প্রয়োজনও মনে করেন না। তার মুখে কোন কথা ফুটিল না।

স্বামী কহিলেন,—তবে··· ?

সুরমা বেদনাহত মনটাকে নাড়া দিয়া কহিল,—তবে আবার কি···। আসতে কি নেই?

স্বামী কহিলেন—না, তা থাকবে না কেন? তবে আসো না কি না, তাই, বলচি···তার পর আর কি বলিবেন, স্বামী ভাবিয়া পাইলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হইল, তাইতো, সুরমা দাঁড়াইয়া আছে। তিনি বলিলেন,—তা বসো, সুরো—

সুরো! সেই ডাক! এ ডাক সে কতদিন শোনে নাই। এ জীবনে কখনো শুনিয়াছিল—না, সে স্বপ্নের কথা?...ওগো, হ্যাঁগো এমনি ডাকেই যে ঘরকর্ণার কথা সব চুকিয়া শেষ হইয়া যায়।

সুরমা বলিল—এমনি বসতে আসিনি। কলারটা খুলতে পারচি না, তাই···যদি দেখে খুলে দাও...

—দিচ্ছি! বলিয়া স্বামী বসিলেন। সুরমাকে এক-রকম বুকের উপর টানিয়া স্বামী কলারের ফাঁশটায় হাত দিলেন। আবেশে সুরমা দুই চক্ষু মুদিল।

বহুক্ষণ নাড়াচাড়া টানাটানি করিয়াও ফাঁশ খুলিতে না পারিয়া স্বামী কহিলেন—হলো কি! এ যে খোলা যাচ্ছে না—

সুরমা কহিল,—ছাড়ো, নিজে দেখি আর-একবার।

স্বামীর বেশ লাগিতেছিল—এই স্পর্শটুকু। বুকের উপর সুরমা এই যে ঢলিয়া পড়িয়াছে···খোঁপার নীচে সেমিজের লেশের উপর আলোর রেখার মত সুরমার ঘাড়ের যেটুকু দেখা যাইতেছে, এই যে রঙের উচ্ছ্বাস-আভাটুকু—

সুরমা কহিল—ঠিক ফাঁশটায় নজর করে ছাখো দিকিন—

স্বামী আরো মুখ নামাইলেন। মন মুহূর্তের জন্য মাতাল হইয়া উঠিল। আবেশে

চেতনা হারাইয়া সুরমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া স্বামী তার গ্রীবায় চুম্বন করিলেন। সুরমার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া-দুলিয়া উঠিল।

স্বামী কহিলেন—তুমি একজন রূপসী, সত্যিই···

সুরমা কহিল,—সত্যি বলচো ?

স্বামী কহিলেন,—সত্যি কথাই, সুরো। মনে নেই, একদিন তোমার এই কেশের রাশি, তোমার এই পাৎলা গোলাপী ঠোঁট, তোমার ঐ চোখদুটী···এদের উপর কত কবিতা লিখেচি যে ! তোমায় বলতুম না যে, তোমার রূপের গর্ব্ব আমার মনে কতখানি ! এত রূপ কোথাও সত্য দেখিনি। এখনো···বয়স হয়েচে তো···তবু এ রূপ দেখলে বিহ্বল হতে হয় !

সুরমার সমস্ত চেতনা যেন বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। সে কহিল,—কি বলচো তুমি, এঁ্যা !

স্বামী একটু অপ্রতিভ হইলেন; হাসিয়া বলিলেন,—বয়স হয়েচে এখন···কথাটা বেমানান্ হলো···না ?

সুরমার মন ক্ষোভে দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল, না, না, না ! কিসের বেমানান্ ! ও আদরের কথাগুলা মন কি বিহ্বল হইয়াই গ্রহণ করিয়াছে !···মুখে সে কিছু বলিতে পারিল না। স্বামীর সঙ্গে নূতন করিয়া আজ যেন আবার আলাপ-পরিচয় করিতে হইবে। সেই ফুলশয্যার রাত্রির মত······মনের কথাগুলা হুবহু বলিয়া গেলে এখন যেন কেমন-ধারা শুনাইবে ! সুরমা চুপ করিয়া রহিল। লজ্জায় কুণ্ঠিত হইলেও কি যেন পাইবার আশায় মন তার দুলিতেছিল !

কারো মুখে কোন কথা নাই।

দূরে তখনো গান চলিয়াছে···আর-একটা। এবার সে গাহিতেছিল—

কেন ধরে রাখা সে যে যাবে চলে
মিলন-যামিনী গত হলে।

সুরমা ভাবিল, কে ও, লোকটীকে হঠাৎ আজ এমন সব গানে পাইয়া বসিল কেন ? না, না মিলন-যামিনী গত হইবে না, গত হইবার নয় !

স্বামী হাত বাড়াইয়া সুরমার হাতখানি ধরিলেন, ডাকিলেন,—সুরো···

সুরমা বলিল—কেন ?

তাইতো কি বলা যায় ? স্বামী ভাবনায় পড়িলেন, অথচ বলিবার কত কথা যে বুকের মধ্যে মর্ম্মরিয়া উঠিতেছে !

সুরমা বলিল,—বাঃ ! আমার কলারটা খুব খুলে দিলে তো !

সুরমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া স্বামী আবার তার মুক্তার কলার ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা স্প্রীং ভাঙ্গিয়া গেল; কলার খুলিল।

সুরমা কহিল,—যাঃ, ভেঙ্গে ফেললে ?

স্বামী কহিলেন—তাতে কি! সারতে দিয়ো কাল।

সুরমা কলারটা হাতে লইয়া দেখিতে লাগিল। স্বামী তেমনি বিহ্বল দৃষ্টিতে সুরমার পানে চাহিয়া থাকিয়া তাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। কহিলেন,—ভাঙ্গা গহনা জোড়া লাগে, কিন্তু আমাদের প্রাণ দুটো না ভেঙ্গেই যে ছেড়ে আছে—এ কি জোড়া লাগে না?

সুরমা স্বামীর পানে চাহিয়া ছিল। জানলা দিয়া চাঁদের যত আলো আসিয়া সুরমার মুখের উপর পড়িয়াছিল। মুখে কি শোভাই না ফুটিয়াছিল! স্বামী সে শোভা দেখিতে লাগিলেন—তন্ময় হইয়া।

সুরমা বলিল,—সেইজন্যেই এসেচি তো। আর দূরে রেখো নাঃগো। আজ বুঝেচি, সংসার আছে, সেই সঙ্গে তুমিও আছ, ঠিক···কিন্তু আমিও আছি, আমাদের মন-দুটোও আছে।

স্বামী সুরমার পানে চাহিয়া রহিলেন। সুরমা সহসা দুই হাতে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাঁর মুখে চুম্বন করিয়া কহিল,—আজ আমায় তোমার পায়ের কাছটিতে পড়ে থাকতে দাও। দুজনে দুজনকে এতদিন যে অবহেলা করে এসেচি, আর তা হবেনা। এ অবহেলা আমি সহ্য করবো না!···বলিতে বলিতে সে ঝাঁজিয়া উঠিল, কহিল,—কেন সহ্য করবো?··· কখনো না! আমি স্ত্রী···স্বামীর কাছে স্ত্রী কি চিরদিন এ আদর প্রত্যাশা করবে না?

স্বামী কহিলেন,—নিশ্চয়!······সত্যি সুরো, হঠাৎ একদিন যেন প্রাণের তার দুটো ছিঁড়ে গেল! মনে হলো, আমাদের প্রাণের দেনা-পাওনা সব চুকে গেছে।······মনে আঘাত বেজে আছে, প্রচুর····কিন্তু উপায় কি! যে-দীপ তার জ্বলা শেষ করে দেছে, তার কাছে আলোর প্রত্যাশাও যে নেই আর!

সুরমা কহিল,—কে বললে, দীপের জ্বলা শেষ হয়ে গেছে? হয়নি। অনন্তকাল ধরে জ্বলবার শক্তি রাখে এ মনের দীপ!·········বয়স হয়েছে? কিসের বয়স! মন আজও তেমনি আছে, তেমনি কাঁচা, তেমনি তাজা······সেই পনেরো বছর আগেকার মত! বয়স হলেই মনকে পিষে খেঁতো করে ফ্যালে, বুঝি!······না, আমি শুনবো না······দূরে আর থাকবো না। আমি তোমার কাছে আসবো, নিত্যি আসবো······আর এমনি করেই তোমায় আদর করতে হবে! দূরে সরিয়ে দিলে চলবে না!······বলো, সরাবে না?······আজো তোমার আদরের তেমনি কাঙাল যে গো আমি······

স্বামী হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—কলারের ফাঁশ খোলা তাহলে ছুতো······?

সুরমা ঘাড় নাড়িয়া আবার ঝাঁকানি দিয়া কহিল,—হ্যাঁ, ছুতোই। ছুতো···তা কি হবে? কেন তুমি আমায় ডাকোনি এতদিন তোমার কাছে?······ঐ নীরস বইখানা তোমায় বেশী আনন্দ দিতে পারে আমার চেয়ে?

স্বামী কহিলেন—না, না। কিন্তু তোমারো দোষ, সুরো! আরো আগে কেন তুমি

আসোনি আমার কাছে!......অনেক জ্যোৎস্নারাত্রে এমন হয়েছে, মন যেন কিসের জন্যে আকুল, কি পাবার জন্য অধীর!......এই সব বই-কাগজ নিয়ে তার অভাব পূরণ করতে গেছি!......অথচ রাজ্যের আরাম নিয়ে তুমি আছ, আমার এত কাছে!

সুরমা কহিল,—আজ এই চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধে-ভরা ঐ বাতাস......ভাগ্যে এদের পানে নজর পড়লো......তাইতো বুঝলুম...

স্বামী কহিলেন,—কি বুঝলে, সুরো?

সুরমা কহিল,—যে, জীবনের বসন্ত ফুরোয় না, ফুরোবার নয়। শরীরের বয়স থাকতে পারে, মনের বয়স নেই, মন চির-যৌবন!

দূরের লোকটি আর একটা-গান ধরিয়াছিল,—

কথা নয়, কথা নয়, নয় কলরব গো......
অধরে অধর, প্রাণে প্রাণ অনুভব গো!......

স্বামী কহিলেন,—শুনচো?......এ যেন আকাশ-বাণী... ...বেছে বেছে কি গানই গাইছে!......

সুরমা স্বামীর পানে চাহিয়াছিল,......বিহ্বল দৃষ্টি দুই চোখে ভরিয়া। স্বামী তার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিলেন,—ওরই কথা শিরোধার্য্য করি, এসো। কথা নয়, কথা নয়......শুধু প্রাণ দিয়ে প্রাণ-অনুভব....

বাহিরে চাঁদের আলোয় ফাল্গুন-হাওয়ার মত্ত উচ্ছ্বাস সমানে চলিয়াছে। একটা পাখীও সে আলোর বাণে প্রাণটাকে ভাসাইয়া দিয়া গাহিয়া উঠিয়াছে,—পি-য়...পি-য়.. পি-য়...

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

টুকটুকে রামায়ণ। শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। ২য় সংস্করণ। কবিবর নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের পরিচয় অনাবশ্যক। এককথায় বাঙ্গালা ভাষায় পত্তময় শিশুসাহিত্যের তিনিই প্রথম প্রচারক বলা যাইতে পারে। নবকৃষ্ণ বাবুর "শিশুরঞ্জন রামায়ণ," "ছেলে খেলা" প্রভৃতি একসময়ে সাহিত্যকাননে সুধাবৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার কবিতার জোড়া নাই। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে 'প্রচারে'—নবকৃষ্ণ বাবুর সেই "শেষ" কবিতায় যে কেমন একটা সাড়া পড়িয়াছিল, তাহা আজও মনে পড়ে। তার পর স্বনামে বিনামে নবকৃষ্ণ বাবুর কত কবিতা বাহির হইয়াছে। ভারতীর অনুগৃহীত নবকৃষ্ণ লক্ষ্মীর নিগ্রহে বাধ্য হইয়া কতজনকে কত কবিতা লিখিয়া দিয়াছেন, অন্যের নামে তাহা প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা আজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর নবকৃষ্ণের লেখার সহিত পরিচিত, তাঁহারা পাঠমাত্রেই ধরিতে পারিয়াছেন যে, সে লেখা নবকৃষ্ণ বাবুর। সুদর্শনের দপ্তরে এরূপ

বহু প্রমাণ আছে। সেই দীর্ঘসূত্রী কবি নবকৃষ্ণ জীবনের অপরাহ্নে—আর একবার তদীয় উপেক্ষিত বীণায় স্বরসংযোগ করিয়াছেন, তাহারই রেকর্ড—এই টুক্‌টুকে রামায়ণ। ইহার প্রথম সংস্করণ হয় ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসে। তাড়াতাড়িতে তখন অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল, এবার সে দুঃখ নবকৃষ্ণ বাবু দূর করিয়াছেন, তীব্র সমালোচক তীক্ষ্ণদৃষ্টি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই রামায়ণপাঠে যে মন্তব্য দিয়াছেন, তাহাতে আছে,—"বইখানির নাম 'টুক্‌টুকে রামায়ণ।' রাঙ্গা টুক্‌টুকে নয়, টুক্ টুক্ করিয়া রামায়ণের সকল কথাই ইহাতে আছে। * * "পদ্মপুরাণ, কালিদাস, ভবভূতি, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস রামায়ণে যে সকল কথা জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে লবকুশের যুদ্ধ নাই, অকালে দেবীর বোধন নাই, অগস্ত্যের মুখে রাবণের দিগ্বিজয়ের কথা নাই ; খাস, খাঁটি বাল্মীকি রামায়ণের কথাই আছে। ভাষা ও ছন্দ সেই আগেকার মত। ইহাতে সংস্কৃতের ঘনঘটা নাই। সাদাসিধে চল্‌তি কথায় লেখা হইয়াছে।" * * "সকল বাঙ্গালীর বাড়ীতেই এক এক খানা বই থাকা আবশ্যক। * *" আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শাস্ত্রীমহাশয়ের উক্তির সহিত একমত। ছাপা, ছবি, কাগজ, বাঁধানো—সবই সুন্দর। এই "টুক্‌টুকে রামায়ণের" সঙ্গীতে বাঙ্গালার বিষণ্ণ পল্লী মুখরিত হউক, এই কামনা।

সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ। (দ্বিতীয় খণ্ড)। শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি, এ, বি, এল। লাহিড়ী মহাশয় প্রৌঢ়ত্বের প্রথম উষায় রাজনীতিক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে পা বাড়াইয়াছেন। বহু সাধু সন্ন্যাসীর সদুপদেশের এরূপ একত্র সঙ্কলনে লাহিড়ী মহাশয় জিজ্ঞাসুবৃন্দের একটা মহান উপকার করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার যে খ্যাতি, এই পুস্তকে তাহা বৃদ্ধি পাইবে। ইহা প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ করা উচিত।

বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী। "বা—সহস্রবৎসরের সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব ইতিহাস।" শ্রীমুরারিলাল অধিকারী প্রণীত। মূল্য রাজসংস্করণ ১॥০, সাধারণ ১।০। ১৮২ পৃষ্ঠা। কাগজ ও বাঁধাই উত্তম। অতি অল্পকথায় কোনরূপ আড়ম্বর না করিয়া খৃষ্টীয় ১০১৪ সাল হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত দীর্ঘকালের মধ্যে যে সকল বৈষ্ণব পদরেণুতে বঙ্গদেশ পবিত্র হইয়াছে, এবং প্রধান প্রধান যে সকল বৈষ্ণবগ্রন্থে বাঙ্গালীর গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে, সেই সমুদয়ের পরিচয়ে গ্রন্থখানি এতই স্পৃহণীয় হইয়াছে যে, হাতে করিলে শেষ না করিয়া রাখা যায় না। আত্মবিস্মৃত জাতির চৈতন্য-সম্পাদনে এতাদৃশ গ্রন্থের বহুলপ্রচার আবশ্যক। প্রত্যেক বাঙ্গালী ছাত্রের ইহা পড়া উচিত। পুস্তকের প্রথমাংশে "শ্রীশ্রীগৌরগণ" ও শেষে "অনুক্রমণিকা" এই দুইটির সংযোজনে গ্রন্থখানির উপাদেয়তা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য হওয়া বিধেয়। সেলি-বাইরণ কাউপারের জন্মভূমির ভৌগোলিক ইতিবৃত্তে অবসন্ন মেধার পক্ষে ইহা কতকটা বলকারক হইতে পারে।

মহাত্মা তুলসীদাস।—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ; মূল্য দুই টাকা। ২২১ পৃষ্ঠা। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই উত্তম।

গ্রন্থারম্ভে "নিবেদন" নামক অংশের প্রথমেই শচীশ বাবু "গ্রন্থখানি জীবনী বা ইতিহাস নহে। যাঁহাদের হিন্দুশাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই।" এবং "যাঁহারা মনে করেন অলৌকিক ঘটনা-মাত্রই বিশ্বাসের অযোগ্য, তাঁহারা কৃপা করিয়া এ পুস্তক পাঠ করিবেন না।"—বলিয়া নিজের যে অপূর্ব্ব অনুমান-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এ গ্রন্থসম্বন্ধে কোনো কথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। অথচ, সমালোচনার জন্য আবার যখন বঙ্গবাণী কার্য্যালয়েও পাঠাইয়াছেন, তখন একেবারে অধঃকরণই বা কি করিয়া করা যায়। বেশ সুন্দর সুন্দর গল্পে পুস্তকখানি পরিপূর্ণ। "ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর" গল্প পড়া বা শোনার চেয়ে এসব গল্প পড়ায়

উপকার আছে। মহাত্মা তুলসীদাসের পবিত্র নাম সংযোগের ফলে, অনেক অসম্ভব ও সম্ভব বলিয়া মানিয়া লইতে অনেকের আপত্তি নাও হইতে পারে? সমালোচনার ক্রকচপত্রে ইহা না তোলাই ভালো। গল্প-লেখক গ্রন্থকারকে ৺ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের শূন্য আসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অন্যায় হয় না। অবশ্য সাবালক হওয়ার পর।

বাঁচিবার উপায়।—শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ১০১ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা; ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উত্তম।

গ্রন্থকার—"সর্ব্বশ্রেণীর নেতাগণের নিকট প্রার্থনা জানাইতে ইচ্ছা" করিয়াছেন যে, "তাঁহারা দেশরক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করুন এবং" গ্রন্থকারের "নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন।" প্রস্তাবটি এই:—

"ফ্রান্স জার্ম্মানী প্রভৃতি সুসভ্য দেশে বিশিষ্ট লোকহিতকর কার্য্যের জন্য" যেমন "কতকগুলি বণ্ড (Bond) বাহির করা হয় এবং লটারী করিয়া ক্রমে ক্রমে বণ্ডগুলি পরিশোধ করা হয়;" তেমনি "একশত কোটি টাকার বণ্ড বাহির করিলে প্রত্যেক বণ্ডের মূল্য পঁচিশ টাকা ধার্য্য করিলে চারিকোটি বণ্ড বাহির হইবে। * * * বণ্ডগুলি সমস্ত বিক্রয় হইলে একশত কোটি টাকা * * * হস্তগত হইবে ও তাহা প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক" প্রভৃতিতে "জমা রাখিতে হইবে।" "শতকরা ছয় টাকা সুদ পাওয়া" যাইবে "এবং তদ্বাবদ * * হাতে প্রত্যেক বৎসর ছয় কোটি টাকা আসিবে; এই টাকার মধ্যে এক কোটি টাকা বণ্ড পরিশোধের জন্য ব্যয় করিয়া বাকী পাঁচ কোটি টাকা যদি পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য খরচ করা হয় তাহা হইলে প্রতি বৎসর বহু পল্লী মৃত্যুর ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারে।" এইটই অর্থাৎ এই প্রস্তাবটিই হইল গ্রন্থের মূল এবং একমাত্র সূত্র। অবশিষ্ট সমস্তটুকু ঐ সূত্রেরই ভাষ্য ও ব্যাখ্যা। এরূপ প্রস্তাব যত অধিক হয়, ততই মঙ্গল। আমরা একদম ভুলিয়া গিয়াছি যে, চাকরি ছাড়া আরও অনেক পথ আছে, যদ্দ্বারা সহজে জীবিকার্জ্জন হইতে পারে। সুতরাং ছোট হউক বড় হউক, এইরূপ 'স্কীমে'র আলোচনায়ও জাতীয় জীবনের জড়তা ক্রমে কাটিতে পারে। সেই হিসাবে গ্রন্থখানির উপযোগিতা আছে। তবে "একমণ তেলও পুড়্‌বে না, রাধাও নাচ্‌বে না"—এই যা' ভয়। গ্রন্থকার বলেন—"এইরূপ ভাবে কার্য্য হইলে বাঙ্গালা দেশ ভূস্বর্গে পরিণত হইবে—এবং স্বরাজ আপনিই আসিয়া পড়িবে। * * * ইহা অহিংসা অসহযোগের অপেক্ষা অনেক সহজ, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন।"

গ্রন্থকার সরল ব্যক্তি, সরলভাবে দেশের হিতকথা কহিয়াছেন,—এজন্য তিনি প্রশংসার্হ।

মুক্তির ডাক। মন্মথ রায় বি এ, (প্রণীত) "একাঙ্ক নাটক, এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ প্রথম অভিনয় রজনী ষ্টার থিয়েটার। মূল্য ছয় আনা মাত্র।"

দ্বিজেন্দ্রলালের "একটা নূতন কিছু" করা আজকাল বিষম রোগে দাঁড়াইয়াছে। তবে শুধু এ গ্রন্থকারের পক্ষে নহে। যখন "চারু বন্দ্যো" "প্রমথ চৌধুরী" "সুতনু সরকার" "পেলব রায়" হয়, তখন "মন্মথ রায়" হইবেনা কেন? মাঝে একটা "নাথ" বা "ভূষণ" লেখার চেয়ে শেষে "বি-এ" লেখা ঢের ভালো। অত বড় জীবন্মুক্ত পরমহংসদেবের "কথামৃত"র যিনি বর্দ্ধক, তিনি এমন কি একেবারে আড়ালে থাকিয়া শুধু "ম-কথিত" বলিয়াই নীরব হইয়াছেন। তবে আর ইহাতে দোষ কি? যাক্ বাজে কথা। বইখানি মন্দ নহে। সেই প্রাগৈতিহাসিক

বৌদ্ধযুগের প্রথম অবস্থায়, বিম্বিসারের আমলের ঘটনা। বইখানির সর্ব্বাপেক্ষা গুণ ইহা ছোট্ট, অথচ একটানে একটা সুন্দর ভাবের অভিব্যক্তি। হাত আর একটু পাকিলে রায় মহাশয় এই পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ করিবেন। তা'হলে আর অম্বার চরিত্রে নারীত্ব বিরোধী ভাব ফুটিবার অবসর পাইবে না। নারী ভাগ্যদোষে পিশাচী হইলেও নারীই থাকে, পুরুষ হয় না।

ভারতে হিন্দু ও মুসলমান। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। আট আনা, ৮৫ পৃষ্ঠা। কাগজ ভালো।

ইহাতে ১—ভারতে হিন্দু; ২—হিন্দুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা; ৩—হিন্দু ও মুসলমান; ৪—ভারতে মুসলমান; ৫—হিন্দুত্বের প্রকৃতি; ৬—মোসলেম প্রতিভা এবং ৭—নেশনে ঐক্যসূত্র—এই ৭টী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। নলিনী বাবুর চিন্তাশীলতা প্রতি প্রবন্ধেই পরিস্ফুট। আজকাল অনেক রাম রহিম যেপ্রকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, হিন্দু মোসলমানের মধ্যে বিরোধানল জ্বালাইবার ইন্ধন সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাতে এরূপ পুস্তকের নিতান্ত প্রয়োজন। সোজা কথায় এখন দরকার। নলিনীবাবু তাহা কহিয়াছেন। বইখানি পাঠ করিবার উপযুক্ত। "মোসলেম প্রতিভায়" লেখক একস্থলে বলিতেছেন "মোসলেম সাধনা হইতেছে কর্ম্মের সাধনা। মুসলিম হইতেছে কর্ম্মযোগী। অনন্ত শক্তিস্বরূপ ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া, একটা সহজ শ্রদ্ধা লইয়া, তাঁহারই যন্ত্ররূপে কর্ম্ম করিয়া যাওয়া, কর্ম্মের মধ্যে তাঁহারই মহিমা প্রস্ফুটিত করিয়া প্রসারিত করিয়া চলা—ইহাই মুসলিমের মূল সাধনা"—"সারল্য ও শক্তি ইহাই মুসলিমের প্রাণ।" শুধু হিন্দুর নহে; বঙ্গের অনেক মোসলমানেরও এইটুকু প্রণিধান-সহকারে পাঠ করা উচিত। স্যর আবদার রহিম কি বলেন? আঁ্যা!

হিমালয় পরিভ্রমণ। শ্রীরত্নমালা দেবী। গ্রন্থের নামেই প্রতিপাদ্যের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ভূমিকায় মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় বলিয়াছেন,—"শ্রীমতী রত্নমালা দেবী স্বনামধন্য সুকবি ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দৌহিত্রী—আনুষ্ঠানিক হিন্দু গৃহের কুলবধূ। তাঁহার মত মহিলার পক্ষে দেশভ্রমণ নানা বিঘ্নসঙ্কুল। কিন্তু সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি আসমুদ্র হিমাচল ভারতের নানা তীর্থ দর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার বদরীনারায়ণ ও কেদার যাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।" বস্তুতঃ আড়ম্বরবিহীন সরল ভাষায় এই ভ্রমণ কাহিনী বিবৃত। বদরীবিশালায় পৌঁছিবার জন্য গ্রন্থকর্ত্রীর প্রাণে যে কত আবেগ, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ইহাতে প্রচুর। লেখিকার বর্ণনশক্তিও চমৎকার। কখনো তিনি "মেঘরাজ্য" ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে—আরও ঊর্দ্ধে উঠিতেছেন, এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া অধোবর্ত্তিনী চিরসুন্দরী ধরিত্রীর শোভা দর্শনে স্তম্ভিত হইতেছেন। কখনো আবার ধরণীর স্নিগ্ধ-শ্যাম বক্ষে দাঁড়াইয়া অভ্রংলিহ পর্ব্বতরাজের নিতম্বে মেঘমালার নর্ত্তন দেখিতে দেখিতে পাগলিনী হইয়া উঠিতেছেন। মদনমোহনের দৌহিত্রী প্রকৃতই মদনমোহনের দৌহিত্রীর মতন "পাখী সব করে রবে"র ভাষায় অতি উপাদেয়ভাবে আদ্যন্ত গ্রন্থখানি রচিত করিয়াছেন। আমরা ইহার ভূয়ঃপ্রচার কামনা করি।

সুদর্শন।

প্রাচীন রাজমালা—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত, ঢাকা জগৎ আর্ট প্রেসে মুদ্রিত, পৃঃ—৬১৭, মূল্য ৩৲ টাকা।

'বাঙ্গালী ঐতিহাসিক হিসাবে শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় সুপরিচিত। তাঁহার পাঠান-রাজবৃত্ত, প্রাচীন-ভারত প্রভৃতি গ্রন্থাবলী বাঙ্গলা ভাষার অমূল্য রত্ন। প্রাচীন রাজমালায় ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তৃত দেশের

প্রত্যেক প্রদেশের পুরাকাল হইতে হিন্দুরাজত্বের অবসান কাল পর্য্যন্ত সাধারণ ইতিহাস হৃদয়গ্রাহী করিয়া বিবৃত হইয়াছে। 'বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি।' যে জাতির ইতিহাস নাই, যাহার অতীত অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিংবদন্তি ও অলৌকিক ঘটনারাশিতে আচ্ছন্ন, তাহারা আত্ম-বিস্মৃত না হইয়া পারে না। বিজিত জাতির ইতিহাস তাহাদের পূর্ব্ব গৌরব, তাহাদের সভ্যতার বিকাশ ও ফল বহু শতাব্দী বিদেশীর দ্বারা লিখিত ও প্রচারিত হইলে সত্যের অপলাপ ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। ইদানিং কতিপয় ন্যায়নিষ্ঠ সত্যানুসন্ধিৎসু বিদেশী ও ভারতবাসী ইতিহাস আলোচনায় একনিষ্ঠ হওয়ায় পুরাতত্বের বহু অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে, এবং আশা করা যায় রামপ্রাণ বাবু প্রভৃতি পথি-প্রদর্শনের অনুসরণে বাঙ্গালায় তথা ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস অচিরে সুলিখিত হইয়া বঙ্গবাণীর সম্পদ ভাণ্ডার পূর্ণ করিবে।

ইংরাজ শিক্ষাভিমানী অনেকের ধারণা যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত ঘটনাবলী পৌরাণিকী আখ্যায়িকা মাত্র। তাঁহারা এই গ্রন্থের প্রথম অংশকে অবিশ্বাস্য মনে করিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত বিষয় সমূহের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন, কারণ আজকাল পাথুরে প্রমাণ বা ভূপ্রোথিত তাম্রলিপি ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। মহাভারত রূপক হইতে পারে তাহা আখ্যায়িকা নয়। তথাপি গুপ্ত মহাশয় এই গ্রন্থে প্রত্নতাত্ত্বিক সার উইলিয়াম জোন্স হইতে আরম্ভ করিয়া পার্‌জিটার, প্রিন্সেপ, কানিংহাম, ফ্লিট, ভিনসেণ্ট স্মিথ, ভাণ্ডারকর, পিলে বা রাখাল দাস কাহারও মতামত বাদ দেন নাই। বাঙ্গালী পাঠক অন্ধ বংশ, গুপ্তবংশ বা কাশ্মীর, আসাম, বঙ্গদেশ, রাজপুতানা, দক্ষিণাপথ, তামিল ভূমি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থ পাঠে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তবে প্রতি প্রদেশের বিবরণে সময়ানুক্রমিক তারিখ না থাকায় পৌর্ব্বাপর্য্য বুঝা যায় না। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিজ্ঞান (Philosophy of Indian History) আজও লিখিত হয় নাই। আজিও Guizot, Rousseau বা Morleyর ন্যায় ঐতিহাসিক ভারতে জন্মে নাই, সেজন্য ভারতবর্ষের তথা বাঙ্গালা বা অপর প্রদেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য ও ক্রমবিকাশ সহজে বুঝা যায় না। প্রাচীন রাজমালার মুদ্রাঙ্কণ ভাল হয় নাই। এই শ্রেণীর পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধি অমার্জ্জনীয়। ঐতিহাসিক গ্রন্থে বিষয়-সূচী ব্যতীত বর্ণানুক্রমিক নামসূচী, রাজগণের বর্ষ সূচী এবং গ্রন্থ বিবরণী (Bibliography), থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ইহাদের অভাবে 'রাজমালা' অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার ওরিয়েণ্ট্যাল কনফারেন্সের অধিবেশনে গুপ্ত মহাশয়ের নিকট এই পুস্তক প্রকাশের আভাষ পাই। তিনি বয়সে খুব প্রাচীন হইলেও তাঁহাতে নবীন যুবকের উৎসাহ দেখিয়াছি। বাঙ্গালী মাত্রেই বাঙ্গলা দেশের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস দেখিবার জন্য উৎসুক। শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি প্রামাণিক ইতিহাস লিখিলেও তাহা শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতির নির্ঘণ্ট মাত্র। তৃষিত বাঙ্গালীকে কোনও ক্ষমতাশালী লেখক কি জ্ঞান বারি দানে তৃপ্ত করিবেন না?

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

ক্ষুদকুঁড়া। কবিতা গ্রন্থ। শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত। মূল্য আট আনা। বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক কবি কালিদাস যে ক্ষুদকুঁড়ার নৈবেদ্য লইয়া পূজা মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন, আকারে ক্ষুদ্র হলেও তাহা "বিদুরের ক্ষুদের" মতই সমাদর যোগ্য। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই বিবিধ মাসিকপত্রে

প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং যাঁহারা আধুনিক বাংলা কবিতা পাঠ করিয়া থাকেন, এই কবিতাগুলি তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত। কিন্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি একত্র পরস্পর সম্বদ্ধভাবে পাঠ করিয়া তাঁহারাও অভিনব কাব্য পাঠের আনন্দ উপভোগ করিবেন।

বাংলাদেশ ও বঙ্গপল্লীর প্রতি যে গভীর অনুরাগে কবির হৃদয় পরিপূর্ণ, ক্ষুদকুঁড়ার অনেকগুলি কবিতা তাহার দ্বারাই অনুপ্রাণিত। 'শেষসম্বল' 'গাভীহারা' 'অনাবৃষ্টি' 'মেছুনী' প্রভৃতি কবিতায় দরিদ্র অশিক্ষিত পল্লীবাসীর দুঃখ শোকের সহিত কবির নিবিড় পরিচয় ও আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার 'মিলনোৎকণ্ঠিতা' ও 'প্রোষিত ভর্ত্তৃকা' নিতান্তই পল্লীগ্রামের গৃহস্থ ঘরের 'ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞা' বঙ্গবধূ; কোন কাব্য উপন্যাস পাঠ করিয়া তাহারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখে নাই।

আর এক শ্রেণীর কবিতায় কবি দাম্পত্যজীবনের বিচিত্র প্রণয়লীলা বর্ণন করিয়াছেন। 'আসন্নপরিণয়া' হইতে 'গিন্নী' পর্য্যন্ত—গৃহলক্ষ্মীর নানা রূপের ও নানা ভাবের চিত্র সুনিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে পার্থিব প্রেমের আধ্যাত্মিক পরিণতি দেখাইয়া কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

প্রিয়াসহ প্রেমলীলা ওগো প্রাণনাথ, তব রুদ্ধদ্বারে শুধু নিত্য করাঘাত।

*　*　*　*　*　*

বাঁশরী শুনেছি তার দেখিনিক চোখে, তুমি প্রিয়া তার সাথে মিলনের দূতী
এ লোক হইতে নিয়া যাও অন্য লোকে, ওগো স্বাহা, জীবনের সকল আহুতি।

এই পুস্তকের স্থানে স্থানে কতকগুলি বিদেশী (৯১ পৃঃ—৯৩ পৃঃ) কবিতার অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুবাদে কবি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কবি কালিদাসের স্বভাবসিদ্ধ ভাবের স্নিগ্ধতা, ভাষার লালিত্য, ও ছন্দের বৈচিত্র্য এ গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আশা করি ক্ষুদকুঁড়া সাহিত্য-সমাজে যথোচিত সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

অতসী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বরদা এজেন্সি—কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—হইতে প্রকাশিত। ১৭৮ পৃষ্ঠা, মূল্য—১৸০।

প্রথমেই ভাবিয়াছিলাম এখানি একখানি উপন্যাস। কিন্তু খুলিয়া দেখিলাম—ইহা একখানি ছোট গল্পের বই—ছয়টী ছোট গল্প পুস্তকখানিতে সন্নিবিষ্ট। যাঁহারা শৈলজানন্দ বাবুর লেখার সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন, তাঁহার লিখন-পন্থা গতানুগতিক নহে। তাঁহার পুস্তকে একটি প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে—এবং সমাজের উপেক্ষিত, প্রপীড়িত ও পদদলিতদিগের পক্ষ লইয়াই তিনি আসরে নামিয়া থাকেন। বক্ষ্যমাণ পুস্তকের গল্প কয়টী সমাজের উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত দিগের কয়টী করুণ চিত্র। প্রথম চিত্রের ধ্বংসপথের যাত্রিগণের অন্যতম অতসী ও অতসীর মা পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে একটি অত্যুজ্জ্বল করুণ চিত্র—বঙ্গীয় সমাজের দুর্দ্দশার একটি জীবন্ত ইতিহাস। দ্বিতীয় চিত্রের রামতনু বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ব্যানার্জ্জী লক্ষ্মীবাবুর পাশে বেশ ফুটিয়াছে। দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেই যে হৃদয়হীন হয়না, ব্যানার্জ্জী তাহারই পরিচয়। তৃতীয় চিত্রের ভবতোষ ও রতনমণি সমাজের আর দুইটী রত্ন এবং প্রভা একটি সমাজের চিরদিনের ইতিহাস

"বাজিকর" চিত্র সমাজের আর এক পৃষ্ঠা—শিল্পিসুলভ দুই-একটি মাত্র রেখাপাতে কিরণের মলিন মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। "আলো আঁধারী"—একশ্রেণীর বালকগণের আলোআঁধারী জীবনের পরিচয়—আলোকের আকর্ষণে ছুটিয়া আসিয়া কেমন করিয়া অন্ধকারের নিবিড়তার মধ্যে তাহারা নিক্ষিপ্ত হয় তাহার ইতিহাস। শেষ গল্পটি মানভূম বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলার ভাদু পূজার আশ্রয়ে প্রস্ফুটিত সমাজের আর একটী মসীময় চিত্র। প্রত্যেক চিত্রেই শিল্পিজনোচিত রেখাজ্ঞানের পরিচয় সুস্পষ্ট।

মাটির ঘর—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—বরদা এজেন্সি, কলেজষ্ট্রীট্ মার্কেট্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত—১৯৫ পৃষ্ঠা, মূল্য—২৲ দুই টাকা। "মাটির ঘর" একখানি উপন্যাস। নিম্নশ্রেণীর জীবনের সহিত অন্তরঙ্গতা ও সহানুভূতির পরিচয় তাঁহার এই পুস্তকখানিতেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মূল আখ্যানটির বিশেষ কোন সৌন্দর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না; বরং মনে হয় গল্পটির সচ্ছন্দগতি স্থানে স্থানে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। শঙ্কর-পরিবার ও অনিল-পরিবারের মাটির ঘরে বাস, তাহার চারিদিকে "সোনার বাংলা" "মাটির মা," ও "বসুন্ধরা" প্রভৃতির সমাবেশ কাব্য হিসাবে সুমধুর বটে, কিন্তু ইহা কি সত্যই জীবন সংগ্রামের কোন সমাধান? আমাদের মনে হয় মূল আখ্যানে শৈলজা বাবুর কোন কৃতিত্ব নাই, তাঁহার বিশেষত্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে। যখনই দেখি "সাহেবদের দো-মহলায় ইলেক্‌ট্রিক পাখাটা বিনা কারণেই বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে,"—আর বৃদ্ধ কেরাণী পয়সার অভাবে খালি পায়ে খালি মাথায় রাস্তার রৌদ্রতপ্ত কঙ্করের উপর দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে অপিসে চলিয়াছে—তখনই বুঝিতে পারি এ শৈলজা বাবুর হাতের ছাপ। আবার যখনই দেখি "হাসপাতালের ভিতর হাতে-পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কয়েকজন রোগী জলের জন্য চীৎকার করিতেছে", আর কম্পাউণ্ডার বাবু টেবিলের উপর শুইয়া গল্প করিতেছেন, অথবা যখনই শুনিতে পাই কম্পাউণ্ডার বাবু চেঁচাইতেছেন, "এইবার টেরটা পাও চাঁদ! হাসপাতালে বিনা-পয়সায় ঘা ধোয়াতে এসেছ, দেখ, কেমন মজা!" তখনই তাহার ভিতর দিয়া আমরা শৈলজা বাবুকে দেখিতে পাই। কিন্তু ফণীর বাচালতা দেখিলে অথবা স্ত্রীর স্বামীর প্রতি "বা রে চাঁদ" সম্ভাষণ শুনিলে আমরা শৈলজা বাবুকে হারাইয়া ফেলি।

মরীচিকা—শ্রীপঞ্চানন মজুমদার প্রণীত—বরদা এজেন্সি, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত—২১৮ পৃষ্ঠা—মূল্য এক টাকা বারো আনা।

এখানি একখানি উপন্যাস। ঘটনা সংস্থানে ঘাত প্রতিঘাতের সমাবেশের চেষ্টায় অস্বাভাবিকতা আসিয়া পড়িয়াছে। লেখকের লিখিবার ক্ষমতা প্রশংসনীয় এবং যাঁহারা সাধারণ গল্পে আমোদ পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের এই বই খানি পড়িতেও ভাল লাগিবে।

পুস্তকখানির আখ্যান-বস্তু অতি সংক্ষেপে এইরূপ—কেদার, স্ত্রী প্রমদার ষড়যন্ত্রে, জ্যেষ্ঠা-ভ্রাতৃবধূ বিমলাকে গৃহবহিষ্কৃত করিলে, বিমলা গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিল, তারপরে রমেশ ডাক্তার কর্ত্তৃক বিমলার উদ্ধার, হাসপাতাল বাস, রমেশের বাগান বাড়ীতে কিছুদিন বাস, পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ, বিমলার পলায়ন, কাশীবাস, সেখানে জমীদার পুত্রের কবলে পতন, আশ্চর্য্যরূপে উদ্ধার, পুরীতে ধীবরগৃহে বাস, রমেশের পুরী আগমন, মৃত্যুকালে বিমলার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিশেষে রমেশের বৈরাগ্য। পড়িতে পড়িতে মনে কৌতূহল ও বিমলার প্রতি সহানুভূতি জাগিয়া উঠে। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

প্রসাদ। শ্রীকৃষ্ণশশী গোস্বামী। প্রবন্ধের বই। মূল্য ১৲—মূল্য আরও অল্প হওয়া উচিত ছিল। ১ম প্রবন্ধ—'বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব কবির স্থান'। অধিক মাত্রায় কবিতা-উদ্ধরণ করার জন্য প্রবন্ধটি অযথা দীর্ঘ। বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যের রস সম্ভোগের অনেক নিদর্শন এ প্রবন্ধে দৃষ্ট হয়। ২য় প্রবন্ধ—কর্ম্মবিজ্ঞানের দুইধারা—লেখক এই প্রবন্ধে প্রাচ্য জগতের কর্ম্মধারার সহিত পাশ্চাত্য কর্ম্মধারার তুলনা করিয়াছেন। ৩য় প্রবন্ধ—'প্রকাশের আনন্দ'—এ প্রকাশ নিত্য আনন্দস্বরূপ রসব্রহ্মের ভূমায় আত্মপ্রকাশের আনন্দের কথা। দার্শনিক প্রবন্ধ। ভক্তিবাদের সহিত ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্যের চেষ্টা লক্ষিত হয়।

৪র্থ প্রবন্ধ—পাশ্চাত্য জগতে নব্যদর্শনের প্রতিষ্ঠা। দেকার্ত্তে ও বেকনকেই ইনি প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন।

শেষ প্রবন্ধ—ভারতীয় রাজনীতির দিগ্‌দর্শন। এ প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন—মহাত্মা গান্ধীর বাণীই প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির সম্পূর্ণ অনুগামী।

উচ্ছ্বাসমালা। শ্রীললিতমোহন সিংহ বর্ম্মা। নীতিপুস্তক। মূল্য—অজ্ঞাত।—লেখক গদ্যে পদ্যে নীতিসূত্রগুলিকে বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থখানিকে সৎসাহিত্যের পদবীতে স্থান দেওয়া যায় না বটে কিন্তু সুনীতি প্রচারের যে উপকারিতা ও মূল্য তাহার মর্য্যাদা ইহাকে দিতেই হইবে। বাঙ্গালায় শান্তিশতক, বৈরাগ্যশতক বা মোহমুদ্গরের ন্যায় গ্রন্থ অদ্যাপি জন্মে নাই—লেখক যদি উচ্ছ্বাসমালাকে সরস করিয়া লিখিতে পারিতেন—তাহা হইলে অন্ততঃ সদ্ভাবশতকের সপংক্তি হইতে পারিত।

গোরুর গাড়ী। কবিতার বই। শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত। মূল্য।৵০। ভোলানাথ বাবুর সঙ্গে সাহিত্যের দরবারে আগে মোলাকাৎ হয় নাই। রস রচনায় তাঁর এমন খোলাহাত আমরা তাহাও পূর্ব্বে টের পাই নাই। ভোলানাথের এই প্রথম ফসল, যাহা তিনি গোরুর গাড়ীর মারফতে পাঠিয়েছেন, তাহা আমরা সাদরে সাহিত্যের গোলাজাৎ করিয়া লইলাম। বাংলার রসিকগণ এখন মূষিক হইয়া সম্ভোগ করুন।

মাঝে মাঝে গাড়ীর চাকায় তৈলের অভাব ও গোরুর ডাবায় খৈলের অভাব হইয়াছে। পথও কম নয়—১১৫০ পদে সমাপ্ত। পথে খানা ডোবা নাই বলিলেই হয়—ধূলা কাদারও উৎপাত নাই—বলদ জোড়া যেন জলদ্ ঘোড়া। গাড়ীও বেশ মজবুৎ। স্বয়ং গুরুর বাড়িতেই (বোলপুরে) এ গোরুর গাড়ী তৈয়ারী।

পাগল দ্বিজদাসের গান। সাধক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গীত সংগ্রহ। মূল্য ১।০।

সঙ্গীতগুলি শান্তরসোপেত। লোকগুরু রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথি, দেওয়ানজী, নীলকণ্ঠ ইত্যাদি সাধক কবিগণের অনুসরণে এগুলি রচিত। গানগুলি পড়িলে আউলিয়া, বাউলিয়া, সহজিয়া মরমিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব ও ভজন সঙ্গীতগুলিকে মনে পড়ে। দ্বিজদাস, সঙ্গীত সাহিত্যে মধুকান, কৃষ্ণকমল, পাগল কানাই, লাখন ফকীর, কাঙাল হরিনাথ ইত্যাদি মহাত্মাদের সঙ্গে সমান মর্য্যাদা লাভ করিবেন। সাধক কবি, দেহতত্ত্ব, অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ, সাকার-নিরাকার-বাদ, রসতত্ত্ব-বৈরাগ্যযোগ, লীলাতত্ত্ব ইত্যাদি অনেক দুরূহ তত্ত্বকথা সঙ্গীতের সুরে সরস, মর্ম্মস্পর্শী ও মধুরভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য শুনিতে পাই, সুন্দরের সেবক—কিন্তু দেখিতে পাই এই সৌন্দর্য্যতন্ত্রী রসসাহিত্য এদিকে চিরসুন্দরকে শিব সুন্দরকে—সেই চির রসময়কে—রস হইতে বিদায় দিয়াছে। আগে ফকীর, বাউল, বৈরাগী কাঙালদের

রস সাহিত্যে চির সুন্দরের—রসব্রহ্মের উপাসনা চলিত তাহা আজ নাগর সাহিত্যের বিজাতীয় ভোগ সমারোহের প্রসারে লুপ্তপ্রায়। সাধক দ্বিজদাস যে সেই ভজনের ধারা আজো নিভৃতে রক্ষা করিয়াছেন—তাহাতে আমরা কৃতজ্ঞ।

গৌরাঙ্গলীলা রহস্য—প্রথম খণ্ড ; শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র বিরচিত ; ৪০২ পৃষ্ঠা ; ভাল ছাপা ও বাঁধা ; মূল্য দেড় টাকা।

লেখক ডাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্র একজন প্রাচীন চিকিৎসক ; তিনি যে বহুদিন ধরিয়া অতি যত্নে চৈতন্যদেবের জীবন চরিত ও বৈষ্ণব সাহিত্য পাড়িয়াছেন, গ্রন্থের প্রতি-ছত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি গৌরাঙ্গের নিজের উক্তি ও তাঁহার সমকালীন শিষ্যদের উক্তি চিকিৎসকের মত পরীক্ষা করিয়াছেন ও সেই পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বঙ্গের নব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিউরেস্থেনিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত ছিলেন, আর তাঁহার অনেক দিকের উত্তেজনা ও ভাব মূর্চ্ছা প্রভৃতি সেই শারীরিক দুর্ব্বলতার ফলে হইত। ডাক্তার মিত্র সাহসে ভর করিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রমাণে যাহা স্থির মস্তিষ্কে লিখিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবদের বিশেষ আলোচ্য ; বৈষ্ণবেরা যদি দেখাইতে পারেন যে উক্ত বিবরণে ও সিদ্ধান্তে ভুল আছে, তবে ধীর ভাবে তাহা দেখাইতে পারেন।

(রুষিয়ার) অত্যাচারী শাসক। শ্রীসুরেশ চন্দ্র বর্ম্মণ। প্রকাশক—আর্য্য পাব্লিশিং কোং, কলিকাতা ; মূল্য পাঁচ আনা। পুস্তিকাখানি টলষ্টয়ের "Rule by Murder" অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থকার 'অবতরণিকা'র কয়েক পৃষ্ঠায় টলষ্টয়ের জীবনের ও আদর্শের যে নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ। "Rule by Murder" গ্রন্থে টলষ্টয় "ফাঁসী দেওয়া প্রবন্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাঁর যুক্তি তর্ক সব এই আলোচ্য পুস্তিকাতে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।" বইখানির ভাষা সহজ সরল অথচ ওজস্বিনী।

বৌদ্ধ গান ও দোঁহার ভাষা

দোঁহা দুইখানির ভাষা যে আলাদা আলাদা, আর সে ভাষার সঙ্গে যে চর্য্যাগানগুলির নানা রকমের ভাষাকে এক করা চলে না, তাহা অতি অল্প পরীক্ষাতেই ধরা যায় ; তবে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ঐ প্রভেদ ধরিতে পারেন নাই বলিয়া অল্প গোটা কতক দৃষ্টান্ত দিতেছি। এক সরহের দোঁহাকোষের মধ্যেই যে কারক বুঝাইবার বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রভৃতির রূপ, খাঁটি একরকমের নয় তাহা উপেক্ষা করিয়াই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইবে, কারণ সে সকল প্রভেদের হেতু বুঝাইতে গেলে দোঁহাকোষের ব্যাকরণ লিখিতে হয়। প্রথমে সরহের দোঁহাকোষে পাই :—

(১) বহ্মণে হি নজানন্ত হি ভেড়ু। [ভেড়ু=ভেদ, উকার দিয়া কর্ম্মকারক] এবই [এইরূপে] পটিঅউ [পঠিত] এ চউবেঅ [চতুর্ব্বেদ]।

(২) জিম তিসি তিসিঅ-ণে ধাবই
মর সোসে নভজ্জলু কহি পাবই।

[এইখানকার "সোসে" শব্দটির গায়ে "নভজ্জলু"-র "ন"-টি লাগাইয়া শাস্ত্রী মহাশয় যে গোল করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্লোকের অর্থ:—তিসি অর্থাৎ তৃষ্ণাতুর যেমন তিসিআ অর্থাৎ মৃগতৃষ্ণিকার দিকে ধায়, ও তাহার ফলে সোসে অর্থাৎ পিপাসায় মরিয়া যায়, আর কাজেই "কহিঁ" অর্থাৎ কেমন করিয়া বা নভজ্জলু অর্থাৎ নভের জলকে পাইতে পারে। এখানে কর্ম্মকারকের বিভক্তি "উকার" লক্ষ্য করার জিনিষ ও কহিঁ (সং কস্মিন্—পালি—কহিং) যাহা এখন হিন্দিতে কাঁহা ও উড়িয়াতে কাঁহি—তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। এই "নভের জল" হঠ-যোগের পারিভাষিক শব্দ।]

এই শ্রেণীর প্রাকৃত বা অপভ্রংশকে কেবল এই হেতুর জোরে বাঙ্গলা বলা চলে, যে ঐ ভাষার পুঁথি একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত নিজে হাতে নেপাল হইতে বহিয়া আনিয়া ছাপিয়াছেন। ইহাকে বাঙ্গলা বলিলে প্রাচীন সকল প্রাকৃত ও অপভ্রংশই বাঙ্গলা,—এমন কি বেদের ভাষাও বাঙ্গলা, কেন না উহাতে আমাদের ব্যবহৃত অগ্নি আছে, পুরোহিত আছে ইত্যাদি।

ইহার পর কৃষ্ণাচার্য্য ওরফে কাহ্নুর দোঁহাকোষের দৃষ্টান্ত দিতেছি; কাহ্নুর চর্য্যাগান-গুলি যে স্পষ্ট একটি প্রাদেশিক ভাষাবহুল, তাহাও পরে দেখাইব। দোঁহাকোষের দৃষ্টান্ত:—

(৩) বোহিচিঅ রজভূষিঅঅ ফুজ্জোহ্লেসি হুউ।
পোক্খরবিয় সহাবস্থহ নি অ দেহহি দিধউ॥

টীকার ব্যাখ্যা ধরিয়া যে অর্থ দিতেছি তাহাতেই ইহার ব্যাকরণের বা ভাষার ভিন্নতা দেখা যাইবে:—বোধিচিত্ত, যাহা রজ-ভূষিত অর্থাৎ অপতিত, তাহা "ফুজ্জোহ্লেসি" চিত্তবজ্রের দ্বারা অশ্লিষ্ট হউক (হুউ); পুষ্করের বা পদ্মের বীজ স্বভাবসুখে নিজ দেহে ধারণ করুক (দিধউ=আধান করুক)।

(৪) বহি নিক্কলিত্তা কলিত্তা সুন্নাসুন্ন পইঠত্তা।
সুন্নাসুন্ন বেণী মাজ রে বট কিংপি নহি দট্টা॥

বহি:-নির্গতত্ব—এইরূপ ভাব আকলন করিয়া (কলিত্তা=কলিত্বা,—অসমাপিকা ক্রিয়া) শূন্যাশূন্যে প্রবেশ করিয়া (পইঠত্তা—ত্বা) শূন্যাশূন্য এই দুইএর মধ্যে (বেণী=উভয়) হে মূঢ়, কিছুই কি দৃষ্ট হয় না? [ছাপায় মূল শ্লোকে "মাজরে" এক শব্দ করিয়া লেখা আছে; উহাতে ওড়িয়া "মাঝরে"=মধ্যে, এইরূপ হয়; কিন্তু "রে"টিকে স্বতন্ত্র করিয়াই অর্থ করা গেল। "বেণী" শব্দটি ঠিক প্রাকৃত বা অপভ্রংশের বটে, কিন্তু ঐ শব্দটি এই অর্থে এখন কেবল ওড়িয়াতেই ব্যবহৃত হয়। অন্য একটি দোঁহায় "স্থান" অর্থে "থাব" আছে; এই "থাব"

—ঠাব ঠিক স্থান অর্থে ওড়িয়ায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত। ইহাতে ভাষা ওড়িয়া প্রমাণিত হয় না, কিন্তু তবুও কথাগুলি নির্দ্দেশ করা গেল।]

এই অল্প দৃষ্টান্তেই দুইখানি দোঁহাকোষের ভাষার প্রভেদ অতি সুস্পষ্ট হইবে। আর ঐ ভাষা যে বাঙ্গলা নয়, তাহাও বুঝাইতে হইবে না। এখন এই ভাষার সঙ্গে চর্য্যাগানের ভাষার পরীক্ষা করিতেছি। প্রথমে সরহের নামে যে চর্য্যাগানগুলি আছে, সেগুলি হইতে এমন কয়েকটি ছত্র তুলিতেছি যাহাতে ব্যাকরণ অর্থাৎ ভাষা স্পষ্ট হয় ; যথা :—

(ক) মিছেঁ (বৃথায়) লোঅ (লোক) বন্ধাবএ (বন্ধাপয়তি = বাঁধে) অপনা (আপনাকে)।

(খ) জইসো (যেমন) জাম (জন্ম) মরণ বি (ও) তইসো (তেমন) !

(গ) উজুরে (সোজা বা ঋজুরে ! অর্থাৎ সোজা যাওরে) উজু ছাড়ি (ঋজুপথ ছাড়িয়া) মা লেহু (লইও না) বঙ্ক (বাঁকাপথ)।

(ঘ) হাথেরে (হাতে, ৭মী ; এই "রে" সম্বোধনের না হইলে ওড়িয়া ৭মী হয় ; কিন্তু এখানে সম্বোধনই মনে হইতেছে) কাঙ্কাণ (কঙ্কণ) [হাতে কঙ্কণ থাকিতে] মা লোউ (নিওনা ; "লেহু" ও "লোউ" একইরূপে ব্যবহৃত) দাপণ (দর্পণ,—কর্ম্মকারক)।

(ঙ) চীঅ (চিত্ত) থির করি ধহু রে (ধর,—অনুজ্ঞায়) নাহী (হে নাবিক বা নেয়ে)।

উদ্ধৃত পদগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ, চর্য্যার সরহের ভাষাও যে বাঙ্গলা নয় তাহা সুস্পষ্ট। এবারে কৃষ্ণাচার্য্যের বা কাহ্নুর অল্প কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি, যাহাতে সংক্ষেপে ভাষার কাঠাম বা ব্যাকরণ প্রত্যক্ষ হয়।

(চ) এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ ॥
কাহ্নু বিলসঅ আসবমাতা
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥

(ছ) নগর বাহিররে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছইছোই যাই সো বাহ্ম নাড়িআ ॥

(জ) সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥

(ঝ) তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটলিউ
কাজণ কারণ সমহর ঢালিউ ॥

(ঞ) তিশরণ নাবী কিঅ অঠকু থারী
নিঅ দেহ করুণা শূনমে হেরী।

উদ্ধৃত চরণগুলির (অথবা ঐ চরণ সম্বলিত গানগুলির) ব্যাখ্যা না দিয়া কেবল ভাষার ব্যাকরণ অল্প একটু বুঝাইবার জন্য কয়েকটি শব্দের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। (১) "মোড়িউ" (মর্দ্দিয়া) ও "তোড়িউ" (তুড়িয়া বা ভাঙ্গিয়া) শব্দ দুইটিতে "উ" যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া হইয়াছে; আবার "(ঝ)" দৃষ্টান্তে "বিটলিউ" ও "ঢালিউ" শব্দ দুইটিতে "ক্ত" প্রত্যয়ের "ত" এর স্থানে "উ" হইয়াছে ও এইরূপ প্রয়োগ অনেক স্থানে আছে। অসমাপিকা ক্রিয়াতেও আরও অনেক স্থানে "উ" প্রত্যয় আছে। (২) আবার দেখা যাইবে যে, "(চ)" উদাহরণের শেষ ছত্রে "পইসি" শব্দে "প্রবেশ করিয়া" অর্থ করা হইয়াছে, অর্থাৎ "উ" প্রত্যয় হইতে ভিন্ন প্রত্যয় বসিয়াছে। "(ছ)" উদাহরণে "পইসি" শব্দের মত "ছুই" বা "ছুঁই" (ছুঁইয়া) সিদ্ধ হইয়াছে; "(জ)" উদাহরণে আবার অসমাপিকা ক্রিয়ায় "ভাঞ্জীঅ" (ভাঙ্গিয়া) আছে, যাহা ব্যাকরণের হিসাবে "ছুঁই" প্রভৃতি হইতে অভিন্ন। ঐরূপ আবার "(ঞ)" উদাহরণের "করিয়া" অর্থে "কিঅ" রহিয়াছে। (৩) "(ছ)" উদাহরণের প্রথম শব্দটি মূলে "বারিহ" আছে, কিন্তু টীকায় "বাহির" আছে; এখন দেখিতেছি যে সপ্তমী পদে যেখানে সংস্কৃতে "বাহ্যে" হইবে, সেখানে "এ" বিভক্তির স্থলে "রে" বিভক্তি আছে; অধিকরণের এই "রে" যাহা কি কেবল ওড়িয়া ভাষার বিশেষত্ব, তাহা কাহ্নুর রচনায় বহু স্থানে আছে। প্রথম ছত্রটি তিলমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া যদি ওড়িষার সর্ব্বত্র পড়া যায়, তাহা হইলে চাষা পল্লীর মেয়েরা পর্য্যন্ত বলিবে যে ঐ চরণটী তাহাদের অতি প্রচলিত ওড়িয়া ভাষায় রচিত; ঠিক ঐ কয়েকটি শব্দ দিয়াই যে এখন ওড়িয়াতে ছত্রটীর অর্থের অনুরূপ ভাব ব্যক্ত করিতে হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যে দশ নম্বরের গান হইতে ঐটুকু উদ্ধৃত, তাহাতে ওড়িয়া ব্যাকরণের পদ ও শব্দ প্রচুর রহিয়াছে; "পুছমি" "মারমি", "লেমি" প্রভৃতি নির্ভুলরূপে ওড়িয়া উত্তম পুরুষের এক বচনের পদ, আর "ফুলের দল" অর্থে যে "পাখুড়ী" আছে তাহাও ওড়িষ্যার নিত্য ব্যবহৃত শব্দ; বাঙ্গলায় ঐ শব্দটি "পাঁপ্‌ড়ি,—"পাখুড়ী" কেবল ওড়িয়াতেই আছে। ঐ গানের মধ্যেই "ঘলিলি" (পরাইলাম) পদটি পাই; "ঘলিলি", "ঘড়িলি" "ঘুড়াইলি" প্রভৃতি ঠিক ঐ অর্থে ওড়িষার বিভিন্ন প্রদেশে তাজা আছে। (৪) "ঞ" দৃষ্টান্তে অধিকরণের বিভক্তি রহিয়াছে "মে" যাহা কি খাঁটি হিন্দী। যে তের নম্বরের গান হইতে দৃষ্টান্তটি উদ্ধৃত, তাহাতে "শূনমে" (শূন্যমে) ছাড়া "তরঙ্গে" অর্থে "তরঙ্গমে" পাইতেছি। প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষারূপে পরিণত হওয়ায় যেসকল প্রত্যয় ও বিভক্তি বিশেষ বিশেষ ভাষার বিশেষত্ব হইয়াছে, সেই বিভিন্ন বিশেষত্ব কেমন করিয়া এক রচনায় বা একজনের রচনায় পাওয়া যায়, তাহার বিচার পরে হইবে। এখানে এইটুকু লক্ষ্য করিলেই যথেষ্ট হইল যে কাহ্নুর রচনা বাঙ্গলা নয়। ইহাও নিশ্চিত যে চর্য্যার কাহ্নুর ভাষা দোঁহার কাহ্নুর ভাষা

হইতে ভিন্ন। ইহাও এখানে বলা উচিত যে, দোঁহা দুইখানির ভাষা অল্প বিভিন্ন প্রাচীন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ, আর ঐ প্রাকৃতকে বা অপভ্রংশকে এখনকার নির্দ্দিষ্ট প্রদেশের ভাষা বলিলে বেজায় ভুল করা হয়।

ভাষা নির্ণয় করিতে হইলে ও ভাষায় ভাষায় প্রভেদ ধরিতে হইলে ব্যাকরণের বিশেষত্ব দিয়া ধরিতে হয়, গোটাকতক শব্দ দেখিয়া ধরিতে গেলে প্রতি পদে ভুল হইবে; কারণ কাছাকাছি অনেক ভাষাতেই একই রকমের অনেক শব্দ থাকিতে পারে ও থাকে। যে প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত হইতে পূরবিয়া হিন্দী, মৈথিলী, নেপালী, আসামী, বাঙ্গলা ও ওড়িয়ার উৎপত্তি, সে প্রাকৃত পড়িতে গেলে ওড়িয়া বাঙ্গালী প্রভৃতি সাধারণ পাঠকদের মনে হইবে যে ঐ ভাষা তাহার নিজের ভাষার সঙ্গেই কেবল মিলিতেছে, আর সে ভাষা কেবল তাহারই নিজস্ব। প্রাকৃতে জ্ঞান থাকিলে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা জানা থাকিলে সেরূপ ভুল হয় না। প্রাচীন সময়ের পূর্ব্বাঞ্চলের মাগধী ভাষা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ছাঁচে গড়িয়া উঠিবার পর কোথাও হইয়াছে হিন্দী, কোথাও ওড়িয়া ও কোথাও বাঙ্গলা; এইরূপ বিশেষত্ব জন্মিবার পূর্ব্বের ভাষাকে কোন প্রাদেশিক ভাষা বলা চলে না। গোটাকতক শব্দের মোহে পণ্ডিত হরপ্রসাদ এই মোটা কথাটায় ভুল করিয়াছেন।

ওড়িয়ার কাঁহি (কোথায়), তঁহি (সেখানে), যঁহি (যেখানে), এথু বা এঠুঁ (এখান থেকে বা থে), বাহিররে (বাহিরে), মোতে (আমাকে বা মোএ বা মোরে বা মোকে বা মোক্), তোহর (তোর), করিবি বা করিমি (আমি করিব), এণু (একারণে), প্রভৃতি বিশেষত্বগুলি ওড়িয়ার নিজস্ব,—অন্য ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ আলাদা। ওড়িয়াতে ভাব প্রকাশের যে বিশেষ রীতি-সিদ্ধি (Idiomatic use) আছে, তাহাও সেই ভাষার বিশেষত্ব; আমরা যেমন বলি নিয়ে-টিয়ে অথবা নিয়ে-থুয়ে, সেই রকম পশ্চিম ওড়িষায় পাই ঘেনি-মেলি, ঠিক যেমনটি ৬নং গানের প্রথমেই আছে; ঐরূপ রীতিসিদ্ধ প্রয়োগকে প্রাদেশিক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, কোন রকমে অন্য ভাষায় টানিয়া লওয়া চলে না। এই অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত ধরিয়া যদি কেহ চর্য্যাগানগুলি পড়েন, তবে যেখানে ওড়িয়ার প্রাদেশিকতার প্রভাব আছে তাহা সুস্পষ্ট হইবে। শব্দের প্রাদেশিকতা পাকা প্রমাণের জন্য লওয়া শক্ত, তবুও অন্য প্রাদেশিকতার সঙ্গে মিলাইলে প্রমাণের মূল্য বাড়ে; এই শ্রেণীর দুইটি শব্দের দৃষ্টান্ত দিতেছি। বালক শব্দ স্ত্রী প্রত্যয়ে হয় বালিকা না হয় বালা; উহার "বালি" রূপটি কেবল ওড়িষায় অতি প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত পাই। মাল্য বা মালা কথাটি ওড়িয়া ভাষায় চিরকালই মালি-রূপে পাই। যে সব গানে পাঠকেরা ওড়িয়ার প্রভাব দেখিবেন, সেখানে বালি ও মালি প্রত্যক্ষ করিবেন। আরও ওড়িয়া ব্যাকরণের ও রীতিসিদ্ধির দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, কিন্তু প্রয়োজন নাই।

বাঙ্গালী পাঠককে ওড়িয়ার প্রয়োগ যেরূপ বুঝাইবার প্রয়োজন, হিন্দীর সম্বন্ধে তত প্রয়োজন নাই। এয়্সা, যেয়্সা, এইসন্, কইসন্, অধিকরণে "মে" বিভক্তি, করণ কারকে "সে" বিভক্তি প্রভৃতি অনেকের নিকটেই পরিচিত। বাঙ্গলার যে "কি"—What অর্থ-জ্ঞাপক হিন্দীতে উহার সাহিত্যিক রূপ "কিয়া," আর সাধারণ লোকমুখের প্রয়োগ—"কা," যেমন প্রথম গানেই—"কা করি আই" পদে পাই। এইরূপ "কা" যে হিন্দীর প্রাদেশিক,—কোনরূপে বাঙ্গলা নয় তাহা নিশ্চিত। উল্লিখিত প্রথম গানের মধ্য হইতে ভুল পাঠের "পাটের" উঠিয়া যাওয়ায় এমন একটী প্রাদেশিক কথা নাই যাহা প্রাকৃত রচনার মধ্যে নিবিষ্ট হিন্দী প্রাদেশিক শব্দ নয়। লুই ঠাকুর সাতগাঁএর পুকুরের মাছ উপন্যাসের কল্পনায় খাইয়াছেন, কিন্তু তিনি কিছু বাঙ্গলায় লেখেন নাই; লুইএর রচিত গান আছে দুইটি, যথা: প্রথম ও ২৯ নং গান। প্রথম গানের এক স্থানে অর্থ করিতে ভুল করিয়া শাস্ত্রীমহাশয় বাঙ্গালা পাইয়াছেন; সেটি বুঝাইতেছি। চর্য্যার অবধূতদের ধর্ম্ম হইল এই যে, কোন সমাধিতে ফল নাই, শরীরকে কোন কষ্ট দেওয়ায় ফল নাই, কেবল অবধূতিকাদের সঙ্গে কোন এক শ্রেণীর সহজানন্দ গুরুর উপদেশ অনুসারে পাওয়াই ধর্ম্ম; তাহা না করিলে উদ্দিষ্ট সুখ দুঃখের হেতুতে (তেঁ) মরিয়া যায়। এ অর্থ ধরিলে বাঙ্গলা বাহির হইত না।

২৯ নং গানের "জাহের" ও "কাহেরে" একটু বুঝাইতে হয়; ঐ দুইটি পূরবিয়া হিন্দীতে—বিশেষ শবর দেশের লরিয়া ভাষাতে চলিত আছে; কিম্ হইতে উৎপন্ন হিন্দী শব্দের একটি দ্বিতীয়রূপ "কাহ," আর সেই শব্দের গায়ে প্রত্যয় বসিয়াছে। আর একটি প্রয়োগের কথা বলিতেছি। পাঠান্তরে যেখানে পাইতেছি "ময়্ দিবোঁ," সেখানে শাস্ত্রী মহাশয় দিয়াছেন—দিবি; এক দিকে "আমি দিবি" বাঙ্গলায় হয় না, অন্যদিকে টীকায় পাইতেছি "ময়া দাতব্য"; কাজেই "দিবি"-কে কোন প্রকারে—বাঙ্গলার "দিবি" করা চলে না। লুই ছাড়া আরও কয়েক জনের রচনা হিন্দীবহুল। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত বৌদ্ধগান স্থান বিশেষে যখন পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন তখন যদুবাবু প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"মহাশয়, এ যে পাকা হিন্দী"; শাস্ত্রী মহাশয় তাহা শুনিয়া গম্ভীরমুখে বলিলেন—"certainly not," ও তাহার পর চলিয়া গেলেন।

যে সকল গানে বাঙ্গলা ভাষার প্রভাব আছে সেগুলি এ সমালোচনায় নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নানা প্রদেশের সহজিয়াদের পুরুষ-মেয়েরা খুব সম্ভব উত্তম-পশ্চিমের কোন একটি স্থানে আড্ডা গাড়িয়া এই সকল গান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্বাঞ্চলের মাগধী ভাষার কাঠামের মধ্যে (অনেক স্থলে প্রাচীন মাগধীর প্রাধান্য বজায় রাখিয়া) ওড়িয়া, হিন্দী, নেপালী, মৈথিলী, বাঙ্গলা কি অবস্থায় ঢুকিতে

পাইয়াছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রাচীন কালের প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে যে গানগুলি প্রচলিত ছিল, তাহাই প্রাদেশিক অবধূত গায়কদের মুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া খিঁচুড়ি পাকাইয়াছে; কিন্তু তাহা ঠিক নয়, কারণ গানের যাঁহারা রচয়িতা তাঁহারাই এমন একালের অনেক কথা ব্যবহার করিয়াছেন ও একালের আচারাদির উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে স্বয়ং লেখকদিগকে একালের হইতে হয়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে এদেশে পারদের ব্যবহার চলিত হইবার পর উহার রসানে দীর্ঘজীবি বা চিরজীবি হইবার যে সাধনা হইয়াছিল, তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেই পারে না। এইরূপ আর যে সকল দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি, তাহাদের পুনরুল্লেখ করিব না। এই হালের যুগের সকল প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষাই পূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল। কাজেই সে সময়ে যাঁহারা কোন কারণে প্রাচীন সময়ের ভাষায় চেষ্টা করিয়া রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের রচনায় আপনাদের প্রাদেশিকতা অনায়াসেই প্রবিষ্ট হইয়াছে, নহিলে ছত্রের পর ছত্র প্রাদেশিক ভাষায় মূলের সুর বজায় রাখিয়া লিখিত হইতে পারিত না। সুপণ্ডিত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় মনে করেন যে, গানগুলিতে যে অপভ্রংশ বা প্রাকৃতের পরিচয় পাওয়া যায়, উহাতেই অনেক কাল ধরিয়া সহজিয়াদের সম্প্রদায়ে রচনা করিবার পদ্ধতি দাঁড়াইয়াছিল, আর সেই পদ্ধতি অনুসারে একালের লোকেরা প্রাচীন অপভ্রংশে পদ রচনা করিতে গিয়া যে যাহার নিজের প্রাদেশিকতা নিজের রচনায় জুড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রাদেশিক ভাষা চলনের পর যোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্তও যে প্রাকৃত ভাষায় রচনা করিবার পদ্ধতি বা ফেশান্ চলিয়াছিল, প্রাকৃত পইঙ্গল গ্রন্থখানিতে তাহার অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে।

চর্য্যাগানগুলির খাঁটি অর্থের আভাষটুকু পাইলেও পাঠকেরা দেখিবেন যে চর্য্যাগানগুলিকে ঠিক বৌদ্ধগান নাম দেওয়া কঠিন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশিত বইখানির দ্বিতীয় নাম দিয়াছেন—"হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষা"; আমরা যতটুকু সমালোচনা করিয়াছি তাহাতেই দেখিতেছি, উহা হাজার বছরের পুরাণ নয়, ও ঐ ভাষাকে বাঙ্গলা ভাষা বলা চলে না, গান বিশেষে বাঙ্গলা ভাষার প্রভাব থাকিলেও বলা চলে না। তাহা হইলে ইউরোপীয় একটি বাণীতে যেমন Holy Roman Empire সম্বন্ধে বলা হয় যে উহা Holy নহে, Roman নহে, Empire-ও নহে, অবস্থাটি সেই রকম দাঁড়াইতেছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

১৩৩২ ও ১৩৩৩

১

গেছে মরে গেছে প্রবীণ বর্ষ, এবে নবীনের অভ্যুদয়।
ওগো পুরাতন, চাহিনা তোমারে! রয়েছে তোমাতে মৃত্যু-ভয়!
মহাকাল সদা গ্রাসিছে প্রাচীনে, নূতন ওড়াবে কেতন তার!
জবু-থবু শত জীর্ণ জীবনে জাগাবে হর্ষ অহঙ্কার!
প্রাচীনের মাঝে আছে অনুতাপ, আছে সঙ্কোচ কুণ্ঠা কত!
নীচতা দীনতা মজায় তাহারে, হয় না তবুও মর্ম্মাহত!
বাঁচিবার পথে চলিতে সদাই বিধি-নিষেধের গড়েছে নীতি!
শিথিল-চর্ম্ম বৃদ্ধ বরষ! মানিবে কে তব ধর্ম্ম—রীতি?

২

মরে গেছ তুমি, বাঁচা গেছে, বাবা! দুঃখ মোটেই করি না তা'তে!
নূতনেরে পথ ছেড়ে দিতে হবে, নিত্য নূতনে জীবন মাতে!
ফোঁগ্‌লা দাঁতের হাস্য চাহিনা, সে হাসি নিমেষে মিলাতে পটু!
পাতা-ঝরা বড় শাল্মলীগাছে লাল ফুলগুলি দৃষ্টি কটু!
অতীতের সাথে হয়েছে অতীত নিরাশা বেদনা প্রাণের জ্বালা!
আধ-ফোটা ফুল ফুটিয়া উঠিয়া হৃদয়-কুঞ্জ করিবে আলা!
প্রাচীনের মোহ অতি দুঃসহ, এনেছিল ভবে বিষণ্ণতা!
জগতেরে এবে পুলকে নাচাবে নবীনের মহা প্রসন্নতা!

৩

কচি কিসলয়ে সাজিয়া প্রকৃতি বরিছে নবীন বর্ষে আজি।
উলু ছায়্ পিক আকুলি' আমের মুকুল-কষায় কণ্ঠ মাজি'!
'বৌ-কথা-কও' গগনে ভুবনে আজি নিশিদিন নূতনে ডাকে!
বিরহ-কাতর নিখিল হৃদয় সুখের আঘাতে ফোঁপাতে থাকে!
এসো! এসো! এসো! এসো হে নবীন, নয়ন-জুড়ানো মোহন বেশে
তোমার মহুয়া-মদিরায় প্রাণে সবুজ স্বপ্ন জাগাও এসে!
এসো জ্যোৎস্নার ওড়্‌না উড়ায়ে, বকুলের বনে ফোটায়ে ফুল!
যুবা-যুবতীর হৃদয়-মাঝারে সুখ-চঞ্চল জাগাও ভুল!

৪

বিরহিণী-প্রাণে সঞ্চারি' আশা করো এ ভুবন পুণ্যভূমি!
রূপ-সুধা-লোভী উপোসী হিয়ার পিয়াসা মিটাও, বন্ধু তুমি!
জগতের যত কিশোর-কিশোরী—তারাও তোমার সঙ্গ মাগে!
অকাল-পক্ক পাণ্ডু আনন রাঙাও আল্‌তা-রঙীণ রাগে!

এসো সুন্দর! উদারহৃদয়! রাতে দূরাগত বেণুর মত!
আবেশ-মধুর সম্ভোগ সম এসো উল্লাস মূর্চ্ছাহত!
আনো আনন্দ, নব নব আশা, উৎসাহ-ভরা কর্ম্মরাশি!
জাগাও, মাতাও শুষ্ক জগৎ প্রাচীনের পচা শাসন নাশি'!

৫

এক উত্তম আচার-নিয়ম চিরকাল কভু মান্য নহে।
কলের কলুষে সেও হয় কালো— সত্যদর্শী ঋষিরা কহে!
কতশতরূপে বিধাতা স্বয়ং আপনারে সদা প্রকাশ করে!
বাঁধা রীতি নীতি মানিয়া এখন মানব-সমাজ গুমরি' মরে!
তাই নব সাজে সাজিয়া প্রকৃতি নিয়ত মানবে ডাকিছে আজি!
নূতনের ডাকে মেতেছে জগৎ, হৃদয়-তন্ত্রী উঠিছে বাজি'।
আর কেন তবে? এসো, এসো সবে! নবীন বর্ষে বরিয়া লও!
নূতন চিন্তা ভাব-সাধনায় আবার জগতে বাঁচিয়া রও!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

চৈত্রে

ভুল সংশোধন-ফাল্গুনের সম্পাদকীয় মন্তব্যে "কাজের আহ্বান" প্রসঙ্গে Sir Valentine Chirol এর সহিত লোকমান্য তিলকের যে মকদ্দমা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া ভুলক্রমে তিলক নামের পরিবর্ত্তে Sir Sankaran Nair এর নাম লেখা হইয়াছিল।

* * * *

রমিঅ রোঁলা—ফরাসী সুধী ও লেখক রমিঅ রোঁলার নাম জগদ্বিখ্যাত। গত জানুয়ারী মাসে তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইল; সে সময়ে উঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য ফরাসী দেশে একটি সভা হয়, আর ঐ সভার লোকেরা সভ্য জগতের সকল স্থানের বহু লেখকদিগকে রোঁলার সম্বন্ধে কিছু কিছু রচনা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। এইরূপে বহু রচনা সংগৃহীত হইয়া যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে, সেখানির দৃশ্য অতি মনোহর। সুপ্রসিদ্ধ আইন্‌ষ্টাইন্‌, এইচ, জি, ওয়েল্‌স্‌, বোএর্‌, প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতেব রচনা এই গ্রন্থে আছে। ঐ গ্রন্থে ভারতের যে আটজন লেখকের রচনা মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গান্ধিজি, কবি রবীন্দ্রনাথ ও স্যর জগদীশচন্দ্র বিশেষ বিখ্যাত; অন্য পাঁচ জন লেখকের নাম:—অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কালিদাস নাগ, দিলীপ কুমার রায়, শ্রীমতী সুনীতি দেবী ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গলা—যাঁহারা এদেশের অধিবাসী, তাঁহারা যে বাঙ্গালী একথা অনেকে ভুলিয়া যান; এবিষয়েও লোকের ভুল হয় যে যাঁহারা বাঙ্গালী তাঁহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গলা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না, অথবা হওয়া উচিত নয়। এদেশের লোকে খৃষ্টান হইলে, খৃষ্টের জন্মের দেশের ভাষা তাঁহাদের ভাষা হয় না, আর মুসলমান হইলেও মাতৃভাষা আরবী হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মুসলমানদিগকে বাঙ্গলা পড়াইতে বাধ্য করা চলে না বলিয়া স্যর্ আবদুর রহিম মত প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সুখের বিষয় যে, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালীদের বড় বড় প্রতিনিধি সভার লোকেরা স্যর্ আবদুরের মতের সমর্থন করেন নাই ও বিশেষভাবে সকলে দলে-বলে জানাইয়াছেন যে তাঁহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গলা ও তাঁহাদের সন্তানেরা বাঙ্গলা পড়িয়া পরীক্ষা দিবে। উত্তর-পশ্চিমের মুসলমানেরা পার্‌সী ও আর্‌বী শব্দবহুল হিন্দী ভাষায় কথা কহেন, অর্থাৎ যে দেশে বাস সেই দেশের ভাষা ব্যবহার করেন। সে অজুহাতে অন্য দেশের মুসলমানেরা যে কেন হিন্দীকে মাতৃভাষা করিবে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। ধর্ম্ম বিষয়ের সমতা হইলেই যদি সকল দেশের সকলকে এক ভাষা অবলম্বন করিতে হয়, তবে স্যর্ আবদুর রহিম এমন একটি ভাষা গড়িয়া দিন্ যাহা তুরস্কে, আরবে, পারস্যে, আফ্‌গানিস্তানে ও ভারতের মুসলমান সমাজে চলিতে পারে। ইউরোপের খৃষ্টানদের মধ্যে এ বুদ্ধি দেখা দেয় নাই, সকলেরই নিজের ভাষা আছে। জন্মভূমির ভাষা পরিহারের চেষ্টা, যে আত্মক্ষয়ের চেষ্টা, ইহা স্যর্ আবদুর বুঝেন না বলিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

বাঙ্গালা প্রচলনের সূত্রটি ধরিয়া স্যর্ আবদুর উত্তেজিত মাথায়, অতি অসংযত ভাষায় ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ব্যবস্থাকেই দূষিয়াছেন। তিনি ক্রোধের উত্তেজনায় ভুলিয়াছেন—(১) বিশ্ববিদ্যালয় জোর করিয়া সকলকে বাঙ্গলা পড়াইতে চান্ না, অন্য ভাষার পরীক্ষার্থী থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় সে দাবি গৃহীত হইবার কথা আছে; (২) মুসলমান ছাত্রেরা যে আর্‌বী, পার্‌সী পড়িতে আসেন না, তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় দায়ী নহেন, বরং দু-চারজন ছাত্রের জন্যও ঐ ভাষা পড়াইবার সুবন্দোবস্ত আছে; (৩) সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় সকলের জন্য উন্মুক্ত, কখনও কোন বিষয়ে মুসলমানের উন্নতির পথে বাধা দেওয়া হয় নাই। যাহা ক্রোধের উত্তেজনায় বলা হইয়াছে, তাহার সমালোচনা করিয়া আমরা বিবাদ বাড়াইব না।

* * * *

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা—পঞ্জাবের হরপ্পায় ও সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারোতে অতি প্রাচীন কালের সভ্যতার অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে। এদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা মাটি খুঁড়িয়া যে সকল এযাবৎ চিত্রলিপি প্রভৃতি বাহির করিতেছেন, তাহা কতদিনের প্রাচীন, কাহাদের কীর্ত্তি ও চিত্রলিপির অর্থ কি, এ সকল কথা তাঁহারা ধরিতে পারিতেছেন না, অথবা তাহা ধরিবার সাধ্য তাঁহাদের নাই; এদেশের ঐতিহাসিকেরা যাহা কুড়াইতেছেন, তাহার তত্ত্বব্যাখ্যা করিতেছেন ইউরোপের পণ্ডিতেরা।

পঞ্জাবের হরপ্পার যেস্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে, সেস্থানে প্রত্নতত্ত্ব

বিভাগের কাজ চলিয়াছে ; ১৮৭২ অব্দে বিখ্যাত কনিংহাম এই স্থান হইতে উদ্ধৃত একটি 'সিল্' (seal) যথাসাধ্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সেই বিবরণে চিত্র লিপির যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তাহা ঠিক হয় নাই, তবে উহা যে অতি প্রাচীন তাহা ধরিতে ভুল করেন নাই। ইহার পর ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ অব্দে ঐ স্থানে ঐরূপ আর দুইটি 'সিল' পাওয়া গিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ফ্লিট্ সাহেব ১৯১২ অব্দে রয়েল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটির জর্ণালে (৬৯৯-৭০১ পৃঃ) উক্ত তিনখানি সিলের বিবরণ ও চিত্র প্রকাশ করায় উহাদের প্রতি ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল ; সিলে অঙ্কিত বৃষভ যে ভারতীয় বৃষভ নয়, একথা ফ্লিট্ সাহেব লিখিয়াছিলেন। ইহার পর যখন মহেঞ্জোদারোতে হরপ্পার চিত্রলিপির অনুরূপ চিত্রলিপি প্রভৃতি পাওয়া যায়, তখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব বিলাতের Sayce প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদিগকে সেগুলি পরীক্ষা করিতে দেন। সে পরীক্ষা এখনও চলিতেছে ও উহার ফলে এতটুকু ধরা পড়িয়াছে যে, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে যাঁহাদের অতি প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন রহিয়াছে, তাঁহারা বাবিলনের আদি সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা সুমের জাতির লোক আর সেই সুমের্ জাতীয়েরা পঞ্জাব হইতেই পশ্চিম এসিয়ায় গিয়াছিলেন। সুমের জাতীয়দের ভাষায় যে অনেক আর্য্যভাষার শব্দ পাওয়া যায়, তাহা ১৮০৮ অব্দে ডাক্তার এড্ওয়ার্ড্ হিঙ্ক্স্ দেখাইয়াছিলেন। এখন আবার নূতন আবিষ্কারগুলি ধরিয়া ওয়াডেল্ সাহেব বলিতেছেন যে ভারতের ও ইউরোপীয়দের ব্যবহৃত আর্য্যভাষায় যত আর্য্য-ধাতু মূলক শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অর্দ্ধেক শব্দ বা ধাতু সুমেরদের ভাষায় পাওয়া গিয়াছে। ওয়াডেল্ ইহাও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাবিলনের বিবরণ হইতে সুস্পষ্ট ধরিতে পারা যায় যে, মহাভারত প্রভৃতিতে উল্লিখিত হর্য্যশ্ব-বংশের রাজারা বাবিলনের কয়েকজন রাজার সমকালীন ছিলেন, আর তাঁহাদের সময় খৃঃ পূঃ ৩০০০ হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। এদেশে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাজ পরিচালিত হয় সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে ; কাজেই ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞেরা এদেশে কাজ না করিলে ভারতের আদিযুগের সভ্যতার বিবরণ শীঘ্র জানা যাইবে না।

এতদিন প্রমাণের অভাবে স্বীকৃত হইতেছিল যে ভারতের আর্য্যসভ্যতা মিশরের ও বাবিলনের সভ্যতার বহু পরবর্ত্তী। নূতন আবিষ্কারের ফলে এই মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আর ইহাই হয়ত প্রতিপন্ন হইবার মত হইয়াছে যে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবেই পশ্চিম এসিয়ার সভ্যতার উৎপত্তি। ভারতের আর্য্যেরা বিদেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া যে মতবাদ চলিত আছে, উহা যে অসার তাহা এই মন্তব্য লেখক অন্য প্রমাণে অনেকবার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; নূতন আবিষ্কারের নিপুণ ব্যাখ্যায় এ তথ্যটিও সুনিশ্চিত হইতে পারে।

ঐতিহাসিক তথ্য ও নৃতত্ত্ব প্রভৃতির অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় উপযুক্ত ভাবে আয়ত্ত করিতে গেলে যেরূপ উদ্যোগ করিতে হয়, এদেশে তাহা করা হয় নাই ; ঐ সকল বিষয়ের জন্য অন্যদেশে যাহা হইতেছে তাহার তুলনায় এদেশের কাজ যৎসামান্য মাত্র। আমাদের জ্ঞানের জন্য কৌতূহল নাই, ইহা লজ্জার কথা। তবুও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের দেশের সভ্যেরা প্রত্নতত্ত্বের কাজ বাড়াইবার হিসাবে টাকা মঞ্জুর করেন নাই। সার বেসিল্ ব্লাকেট্ এবারে প্রয়োজনের ব্যয় সাধিয়া অনেক টাকা হাতে রাখিয়াছেন, আর

সেই টাকা যে অনায়াসেই প্রত্নতত্ত্বের জন্য ব্যয়িত হইতে পারিত তাহা দেখাইয়াছিলেন; তবুও এদেশের শিক্ষিত সভ্যেরা তেল লবণের কল্পিত হিসাবের অজুহাতে জ্ঞানপ্রসারের জন্য টাকা দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। আমাদের উন্নতি বহুদূরে।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুক্তি—যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সন্দেহে,—আদালতে অপরাধী প্রমাণিত না হইয়া দণ্ডিত ও নির্ব্বাসিত, উপেন্দ্রনাথ তাঁহাদের একজন। ইঁহার মুক্তির সংবাদ, আমাদের গভীর দুঃখের নিবিড় অন্ধকারে একটি আলোক রেখা। সুভাষচন্দ্র-প্রমুখ ভারতের কৃতী সন্তানেরা যে প্রকার দুঃখ কষ্ট সহিয়া কর্ম্মক্ষম সুবিকশিত তরুণ জীবনকে সঙ্কুচিত ও মলিন করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহার মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ বহুপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে; আমরা সে কাহিনীর বিশেষ আলোচনা করিব না। মনের দুঃখ মনে চাপিয়া কেবল উপেন্দ্রনাথের কথা বলিব।

১৯০৮ অব্দের বোমার মাম্‌লায় উপেন্দ্রনাথ তাঁহার সহচরদের সঙ্গে কয়েক বৎসর আন্দামানের কারাগারে কঠোর দণ্ড ভুগিয়া যখন মুক্তি পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার জীবনের দুর্দ্দিনের কাহিনী দ্বীপান্তরের কথা নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন। এই দ্বীপান্তরের কথার মত সুরচিত সরস নিবন্ধ বঙ্গসাহিত্যে বিরল। আমরা তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভায় উৎফুল্ল হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির সুখময় কল্পনা করিয়াছিলাম; আমাদের আশার অনুরূপ পাইয়াছিলাম ও অনেক হাস্যরসের মধুরতায় মনোহর করিয়া তিনি যে সুশিক্ষাপ্রদ উনপঞ্চাশী লিখিতেছিলেন, তাহা সাহিত্যে অমূল্য। কিন্তু সহসা আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইল; না জানি কি অপরাধে দ্বীপান্তরের দণ্ডমুক্ত উপেন্দ্রনাথ আবার নির্ব্বাসিত হইলেন। কয়েক বৎসর নির্ব্বাসনের দণ্ড ভুগিয়া তিনি এখন মুক্তি পাইয়াছেন; আমরা আশঙ্কা মিশ্রিত আনন্দে এই সংবাদ প্রচার করিতেছি।

রাজনীতির আসরে ও সরকার বাহাদুরের শাসন পদ্ধতির দরবারে উপেন্দ্রনাথের আসন কোথায় জানি না; আমাদের সাহিত্যে তাঁহার আসন অতি উচ্চে। আমরা উপেন্দ্রনাথকে সাহিত্য-সভার সেই আসন অধিকার করিতে অভ্যর্থনা করিতেছি, ও আশ্বস্ত প্রাণে কামনা করিতেছি, তিনি দীর্ঘ জীবনে, সুস্থ শরীরে, নিরুদ্বেগে, দুঃখ-মুক্ত প্রফুল্ল মনে সাহিত্য সেবায় আপনার জীবনকে ও স্বদেশকে ধন্য করুন।

ভ্রম-সংশোধন

গত মাসের 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত "৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর" শীর্ষক কবিতাটির পঞ্চম ছত্রটি মুদ্রিত হয় নাই। সেটি এই :—

মহাস্নান-শেষে আজি অমৃতের পুত্রদের সাথে।

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.



বঙ্গবাণী



বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ'

৫ম বর্ষ
১-'৩৩

বৈশাখ

৩য় সংখ্যা

পথের দাবী*

(৩১)

পরদিন প্রভাত হইতেই আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ জমা হইতেছিল, রাত্রে ফোঁটা কয়েক জলও পড়িয়াছিল, কিন্তু আজ মধ্যাহ্ন কাল হইতে বৃষ্টি এবং বাতাস চাপিয়া আসিল। কাল ভারতী সুমিত্রাকে যাইতে দেয় নাই, কথা ছিল, আজ খাওয়া-দাওয়ার পরে সে বিদায় লইয়া বাসায় যাইবে। কিন্তু এমন দুর্য্যোগ সুরু হইল যে, বাহিরে পা বাড়ানো শক্ত, নদী পার হওয়াত দূরের কথা। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও জল উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। শশী হিন্দুহোটেলে থাকে, দুপুরবেলা বেড়াইতে আসিয়াছিল, এখনও ফিরিতে পারে নাই। বেলা কখন্ শেষ হইল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল জানা ও গেল না। ভারতীর উপরের ঘরে জানালা কবাট বন্ধ করিয়া আলো জ্বালিয়া বৈঠক বসিয়াছে। সুমিত্রা আপাদমস্তক চাপা দিয়া আরামকেদারায় শুইয়া, শশী খাটের উপরে উবু হইয়া বসিয়া, নীচে কম্বলের শয্যায় অপূর্ব্ব, এবং তাহারই জলযোগের আয়োজনে মেঝের উপরে

ও স্বার্থহীন নিষ্পাপ প্রীতিতে তাহার হৃদয় উপ্‌চিয়া পড়িয়াছে,—আপনাকে সে সম্বরণ করিবে কি দিয়া ? আতিশয্য যদি হইয়াই থাকে তাহাকে বাধা দিবে কিসে ? সুমিত্রা নিঃশব্দে দেখিতেছিল, নীরবেই রহিল, কিন্তু ঘৃণা ও নিগূঢ় ঈর্ষায় রচিত যে দুর্ভেদ্য যবনিকা এতদিন তাহার চোখের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অকস্মাৎ অপসারিত হইয়া যতদূর দেখা যায় শুধু অনাবিল সৌহৃদ্যের স্বচ্ছ স্রোতস্বতীই সে এই দুটি নর-নারীর মাঝখানে প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাইল। মুহূর্ত্তের জন্যও কখনো যে তথায় কলুষ স্পর্শ করিয়াছে মনে করিতে আজ তাহার মাথা হেঁট হইল। গোপন করিয়া করিবার, লজ্জা করিয়া করিবার ভারতীর কিছুই ছিল না বলিয়াই সে এমন লজ্জাহীনার মত সব্যসাচীর আপনার হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল, এ কথা আজ সুমিত্রা বুঝিল।

এতক্ষণ মানুষটিকে লইয়াই ভারতী ব্যস্ত ছিল, এখন বোঁচ্‌কাটির প্রতি তাহার লক্ষ্য পড়িল। উদ্বিগ্ন শঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এই ঝড়-জলের মধ্যে সহচরটিকে সঙ্গে এনেছ কেন বলত ? কোথাও চলে যাচ্চো না তো ? মিথ্যে বলে ঠকাতে পারবেনা তা' বলে রাখ্‌চি, দাদা।

ডাক্তার হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার মুখের চেহারায় নিজের মুখে আর হাসি আসিল না, তথাপি তামাসার ভঙ্গীতে লঘু করিয়া কহিলেন, যাবো না তো কি রামদাসের মত ধরা পোড়ব নাকি ?

শশী মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক তাই।

ভারতী রাগ করিয়া কহিল, ঠিক তাই! আপনি কি জানেন শশিবাবু, যে মতামত দিচ্চেন!

বাঃ জানিনে ?

কিচ্ছু জানেন না!

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, ঝগড়া করলে খিচুড়ি বিস্বাদ হয়ে যাবে। আচ্ছা অপূর্ব্ববাবু, কালকের জাহাজে না গেলে ত আপনি সময়মত পৌছতে পারবেন না ?

অপূর্ব্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, মায়ের শ্রাদ্ধ আমি এখানেই কোরব ডাক্তার।

এখানে ? হেতু ?

অপূর্ব্ব মৌন হইয়া রহিল, ভারতীও জবাব দিল না।

ডাক্তার মনে মনে বুঝিলেন কি একটা ঘটিয়াছে যাহা প্রকাশ করিবার নয়। কহিলেন, বেশ, বেশ। তা'হলে ফিরে যাবারই বা দরকার কি। চাক্‌রিটা আপনার আছে না ?

অপূর্ব্ব ইহারও উত্তর দিল না। শশী কহিল, অপূর্ব্ববাবু সন্ন্যাস নেবেন।

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, সন্ন্যাস ? এ আবার কি কথা!

তাঁহার হাসিতে অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হইল। কহিল, সংসারে যার রুচি নেই, জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে এ ছাড়া তার আর পথ কি আছে ডাক্তার?

ডাক্তার কহিলেন, এ সব বড় বড় আধ্যাত্মিক ব্যাপার, অপূর্ব্ববাবু, এর মধ্যে অনধিকার চর্চ্চা করতে আমাকে আর প্রলুব্ধ করবেন না, তার চেয়ে বরঞ্চ শশীর মত নিন্, ও জানে শোনে। ইস্কুলে ফেল্ হয়ে একবার ও বছরখানেক ধরে এক সাধু-বাবার চেলাগিরি করেছিল।

শশী বলিল, দেড় বছরের ওপর।

সুমিত্রা ও ভারতী হাসিতে লাগিল। অপূর্ব্বর গাম্ভীর্য্য ইহাতে টলিল না, সে কহিল, মায়ের মৃত্যুর জন্যে আমার নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হয়, ডাক্তার। সে দিন থেকে আমি নিরন্তর এই কথাই ভেবে আসচি। যথার্থই সংসারে আমার প্রয়োজন নেই, এ আমার কাছে তিক্ত হয়ে এসেছে।

ডাক্তার ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বোধ হয় তাহার হৃদয়ের সত্যকার ব্যথা উপলব্ধি করিলেন, সস্নেহ মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, মানুষের এই দিক্‌টা কখনো আমার ভেবে দেখবার আবশ্যক হয় নি অপূর্ব্ববাবু, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, হয়ত, এ ভুল হবে। তিক্ততার মধ্যে দিয়ে সংসার ছেড়ে শুধু হতভাগ্য লক্ষ্মীছাড়া জীবনই যাপন করা চলে, কিন্তু বৈরাগ্য সাধনা হয় না। করুণার মধ্যে দিয়ে, আনন্দের মধ্যে দিয়ে না গেলে কি—কিন্তু, ঠিক ত জানিনে—

ভারতী অকস্মাৎ যেন এক নূতন জ্ঞান লাভ করিল। ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি ঠিক জানো দাদা, তোমার মুখ দিয়ে কখনো বেঠিক কিছু বার হয় না,—হতে পারেনা। এই সত্য।

ডাক্তার বলিলেন, মনে ত তাই হয়। মা মারা গেলেন। কেন এসেছিলেন, কিসের জন্যে আপনি যেতে চান্‌না, কিছুই আমি জানিনে, জানবার কৌতূহলও নেই, কিন্তু কারও আচরণে তিক্ততাই যদি পেয়ে থাকেন, সমস্ত অনাগত কালের তাই শুধু সত্য হ'ল, আর অমৃত যদি কোথাও লাভ হয়ে থাকে, জীবনে তার কোন দাম দেবেন না?

অপূর্ব্ব কহিতে গেল, সংসারে দাদা যদি—

ডাক্তার বলিলেন, সংসারে অপূর্ব্বর দাদা বিনোদবাবুই আছেন, ভারতীর দাদা সব্যসাচী কি নেই? সে গৃহে যদি স্থান আপনার নাও থাকে, কলকাতার সেই ছোট্ট বাড়ীটুকুই কি বামনের বিশ্বব্যাপী পদতলের ন্যায় পৃথিবীতে কোথাও আপনার আর ঠাঁই রাখেনি? অপূর্ব্ববাবু, হৃদয়াবেগ দুর্মূল্য বস্তু, কিন্তু চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে দিলে এতবড় শত্রু আর মানুষের নেই।

অপূর্ব্ব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু ধর্ম্মসাধনা বা আত্মার মুক্তি কামনায় আমি সংসার ত্যাগ করতে চাইনি ডাক্তার, যদি করি, পরার্থেই কোরব। আমাকে আপনাদের

বিশ্বাস করা কঠিন, না করলেও দোষ দেবার নেই, কিন্তু একদিন যে অপূর্ব্বকে আপনারা জান্‌তেন, মায়ের মৃত্যুর পরে সে অপূর্ব্ব আমি আর নেই।

ডাক্তার উঠিয়া আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, তোমার এ কথাটা যেন সত্য হয় অপূর্ব্ব।

অপূর্ব্ব গাঢ়কণ্ঠে বলিল, এখন থেকে আমি দেশের কাজে, দশের কাজে, দীন দরিদ্রের কাজেই আত্মনিয়োগ কোরব। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিতে লাগিল, কলকাতায় আমার বাড়ী, সহরেই আমি মানুষ, কিন্তু সহরের সঙ্গে আর আমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ রইল না। এখন থেকে পল্লীসেবাই হবে আমার একমাত্র ব্রত। একদিন কৃষি-প্রধান ভারতের পল্লীই ছিল প্রাণ, পল্লীই ছিল তার অস্থি-মজ্জা-শোণিত। আজ সে ধ্বংসোন্মুখ। ভদ্রজাতি তাদের ত্যাগ করে সহরে এসেছে, সেখান থেকে তাঁদের অহর্নিশি শাসন করে, এবং শোষণ করে। এ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ—বন্ধন তারা রাখেনি। না রাখুক, কিন্তু চিরদিন যারা এঁদের মুখের অন্ন এবং পরণের বস্ত্র যুগিয়ে দেয়, সেই কৃষককুল আজ নিরন্ন, নিরক্ষর এবং নিরুপায় হয়ে মৃত্যুপথে দ্রুতবেগে চলেছে। এখন থেকে আমি তাদের কল্যাণেই আত্মনিয়োগ কোরব। এবং ভারতীও আমাকে প্রাণপণে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে, আবশ্যক হলে কুটীরে কুটীরে গিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করবার ভার উনি নেবেন। আমার সন্ন্যাস দেশের জন্যে, নিজের জন্যে নয় ডাক্তার।

ডাক্তার বলিলেন, সাধু প্রস্তাব।

তাঁহার মুখ হইতে কেবল এই দুটি কথাই কেহ প্রত্যাশা করে নাই। ভারতী ম্লান হইয়া কহিল, আর একদিক দিয়ে ধরলে এ তো তোমারই কাজ দাদা। এই কৃষি-প্রধান দেশে কৃষক বড় হয়ে না উঠ্‌লে ত কোন কিছুই হবেনা।

ডাক্তার কহিলেন, আমি ত প্রতিবাদ করিনি ভারতী।

কিন্তু তোমার উৎসাহও ত নেই দাদা!

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, দরিদ্র কৃষকের ভালো করতে চাও, তোমাদের আমি আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু আমার কাজে সাহায্য কোরচ মনে করবার প্রয়োজন নেই। চাষারা রাজা হোক্, তাদের ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্, কিন্তু সাহায্য তাদের কাছ থেকে আমি আশা করিনে।

অপূর্ব্বর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কারও ভালো করতে হবে বলে আর কারও গায়ে কালি ছড়াতে হবে তার মানে নেই অপূর্ব্ব বাবু। এদের দুঃখ দৈন্যের মূলে শিক্ষিত ভদ্রজাতি নয়, সে মূল বার করতে হলে তোমাকে আর একদিকে খুঁড়ে দেখ্‌তে হবে।

অপূর্ব্ব কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কহিল, কিন্তু এই কি সকলে আজ বলেনা?

বলুক। যা ভুল তা' তেত্রিশ কোটী লোকে মিলে বল্‌লেও ভুল। বরঞ্চ, এই শিক্ষিত ভদ্রজাতির চেয়ে লাঞ্ছিত, অবমানিত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত সমাজ বাঙ্‌লা দেশে আর নেই। তাঁর উপরে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে তাদের ভরাডুবি করাতে চাও কেন? পরদেশের সকল যুক্তি এবং সকল সমস্যাই কি নিজের দেশে খাটে ভেবেচ? বাইরের অনাচার যখন পলে পলে সর্ব্বনাশ নিয়ে আস্‌চে, তখন আবার অন্তর্বিদ্রোহ সৃষ্টি কর্‌তে চাও কিসের জন্যে? অসন্তোষে দেশ ভরে গেল,—স্নেহের বাঁধন, শ্রদ্ধার বাঁধন চূর্ণ হয়ে এলো কিসের জন্যে জানো? তোমাদেরই দু-দশজনের দোষে,—শিক্ষিতের বিরুদ্ধে শিক্ষিতের অভিযানে। শশি, একদিন তোমাকে আমি এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলাম মনে আছে? নিজেদের বিপক্ষে নিজেদের দুর্নাম ঘোষণার মধ্যে একটা নিরপেক্ষ স্পষ্টবাদিতার দম্ভ আছে, এক প্রকার সস্তা খ্যাতিও মুখে মুখে প্রচারিত হয়, কিন্তু এ শুধু ভুল নয়, মিথ্যা। মঙ্গল তাদের তোমরা করগে, কিন্তু অপরের কলঙ্ক রটনা করে নয়, একের প্রতিকূলে অপরকে উত্তেজিত করে নয়,—বিশ্বের কাছে তাদের হাস্যাস্পদ করে নয়! সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত সে একদিন এসে পৌছবে, কিন্তু আজও তার বিলম্ব আছে।

সকলেই নীরব হইয়া রহিল, শুধু ভারতী ধীরে ধীরে কহিল, কিছু মনে কোরোনা দাদা, কিন্তু বরাবরই আমি দেখে এসেছি পল্লীর প্রতি তোমার সহানুভূতি কম, তোমার দৃষ্টি শুধু সহরের উপরে। কৃষকদের প্রতি তুমি সদয় নও, তোমার দু' চক্ষু আছে কেবল কারখানার কুলি-মজুর-কারিগরদের দিকে। তাই তোমার পথের-দাবী খুলেছিলে এদেরই মাঝখানে। আর হৃদয় বলে যদি কোন বালাই তোমার থাকে সে শুধু ছেয়ে পড়ে আছে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ভদ্র জাতি নিয়ে। এরাই তোমার আশা-ভরসা, এরাই তোমার আপনার জন। বল, এ কি মিথ্যা কথা?

ডাক্তার বলিলেন, মিথ্যে নয় বোন্, অত্যন্ত সত্য। কতবার ত বলেছি তোমাকে, পথের দাবী চাষার হিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়, এ আমার স্বাধীনতা অর্জ্জনের অস্ত্র। শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী। তাই, পাবে আমাকে কুলি-মজুর-কারিকরের মাঝখানে কারখানার ব্যারেকে, কিন্তু পাবেনা খুঁজে পাড়াগাঁয়ে চাষার কুটীরে। কিন্তু কথায় কথায় শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যটি যেন ভুলে যেয়োনা দিদি। এই বলিয়া ষ্টোভের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, দেশোদ্ধার দুদিন দেরি হলে সইবে, কিন্তু তৈরি খিচুড়ি পুড়ে গেলে সইবেনা।

ভারতী ছুটিয়া গিয়া হাঁড়ির ঢাকা খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া হাসিমুখে কহিল, ভয় নেই দাদা, বাদল রাতের খিচুড়িভোগ তোমার মারা যাবেনা।

কিন্তু বিলম্ব কত?

ভারতী বলিল, মিনিট পনেরো কুড়ি। কিন্তু তাড়া কিসের বল ত?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, আজ যে তোমাদের কাছে আমি বিদায় নিতে এলাম।

কথা যেমনই হৌক, তাঁহার হাসিমুখের দিকে চাহিয়া, কেহই তাহা বিশ্বাস করিল না। বাহিরে ঝড় জলের বিরাম নাই, ভারতী ক্ষণিকের জন্য জানালা খুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাপ্‌রে বাপ্! পৃথিবী বোধ হয় ওলট-পালট হয়ে যাবে। বিদায় নেবারই সময় বটে, দাদা! চোখের পলকে তাহার অন্য কথা মনে পড়িল, কহিল, আজ কিন্তু তোমাকে ওই ছোট্ট ঘরটিতে শুতে হবে। নিজের হাতে আমি চমৎকার করে বিছানা করে দেব, কেমন? এই বলিয়া সে হৃদয়ের নিগূঢ় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া রান্নার কাজে লাগিল। ডাক্তারের নিকট হইতে যে কোন উত্তরই আসিল না তাহা সে লক্ষ্যও করিল না।

যথাসময়ে আহার্য্য প্রস্তুত হইলে, ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, সে হবে না ভারতী, পরিবেশনের অছিলায় তুমি বাকি থাক্‌লে চল্‌বেনা। আজ আমরা সকলে একসঙ্গে খেতে বোস্‌ব।

ভারতী সম্মত হইয়া বলিল, তাই হবে দাদা, চারজনে আমরা গোল হয়ে খেতে বোস্‌বো।

ডাক্তার কহিলেন, গোল হয়ে খেতে পারি, কিন্তু বুভুক্ষু অপূর্ব্ববাবু না নজর দিয়ে আমাদের হজমে গোল বাধান। সেটা ওঁকে বল।

অপূর্ব্ব হাসিল, ভারতীও হাসিমুখে কহিল, সে ভয় আমাদের থাক্‌তে পারে, কিন্তু তোমার হজমে গোল বাধাবে কে দাদা? ও আগুনে পাহাড়-পর্ব্বত গুঁড়িয়ে দিলেও ত ভস্ম হয়ে যাবে। যে খাওয়া খেতে দেখেচি! এই বলিয়া ভারতী আর একদিনের খাওয়া স্মরণ করিয়া মনে মনে যেন শিহরিয়া উঠিল।

ভোজন-পর্ব্ব আরব্ধ হইল। অন্ন-ব্যঞ্জনের সুখ্যাতিতে এবং লঘু হাস্য-পরিহাসে ঘরের আব-হাওয়া যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। খাওয়া যখন পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে, সহসা রসভঙ্গ করিয়া ফেলিল অপূর্ব্ব। সে কহিল, দিন দুই পূর্ব্বে খবরের কাগজে একটা সুসম্বাদ পড়েছিলাম, ডাক্তার। যদি সত্য হয়, আপনার বিপ্লবের প্রয়াস একেবারে নিরর্থক হয়ে যাবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁদের শাসন-যন্ত্রের আমূল সংস্কার করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শশী চক্ষের পলকে রায় দিল, মিছে কথা! ছল্!

ভারতী ঠিক যে বিশ্বাস করিল তাহা নয়, কিন্তু অকৃত্রিম উদ্বেগের সহিত কহিল, ছলনা নাও ত হতে পারে শশীবাবু। যাঁরা নেতা, যাঁরা এই অর্দ্ধশতাব্দকাল ধরে,—না দাদা, তুমি হাস্‌তে পারবেনা বল্‌চি!—তাঁদের প্রাণপণ আন্দোলনের কি কোন ফল নেই ভাবো? বিদেশী শাসক হলেও ত তাঁরা মানুষ, ধর্ম্মজ্ঞান এবং নৈতিক বুদ্ধি ফিরে আসা ত একেবারে অসম্ভব নয়।

শশী তেম্‌নি অসঙ্কোচে অভিমত প্রকাশ করিল, অসম্ভব! মিছে কথা! ধাপ্পাবাজী!

অপূর্ব্ব কহিল, অনেকে এই সন্দেহই করেন সত্য।

ভারতী বলিল, সন্দেহ তাঁদের মিথ্যে। ভগবান কি নেই নাকি। এবং [illegible]

অপরিসীম আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল, শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন, অত্যাচার-অনাচারের সংস্কার,—এ সব যদি সত্যই হয়, তোমার বিপ্লবের আয়োজন, বিদ্রোহের সৃষ্টি,—তখন ত একেবারেই অর্থহীন হয়ে যাবে দাদা!

শশী কহিল, নিশ্চয়!

অপূর্ব্ব কহিল, নিঃসন্দেহ!

ভারতী তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, দাদা, তখন এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ছেড়ে আবার শান্তমূর্ত্তি নেবে বল?

ডাক্তার দেয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া মনে মনে হিসাব করিয়া কতকটা যেন নিজেকেই কহিলেন, বেশি দেরি নেই আর। তাহার পরে ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, ভারতী, এ আমার ভয়ঙ্কর কিম্বা শান্ত মূর্ত্তি আমি আপনিই জানিনে, শুধু জানি, এ জীবনে এ রূপ আমার আর পরিবর্ত্তন হবার নয়। আর তোমার নমস্য নেতাদের,—ভয় নেই দিদি, আজ তাঁদের নিয়ে আমোদ করবার আমার সময়ও নেই, অবস্থাও নয়। বিদেশী শাসনের সংস্কার যে কি, প্রাণপণ আন্দোলনের ফলে কি তাঁরা চান্, তার কতটুকু আসল, কতটুকু মেকি,—কি পেলে শশীর ধাপ্পাবাজী হয় না, এবং নমস্যগণের কান্না থামে, তার কিছুই আমি জানিনে। বিদেশী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙিয়ে যখন তাঁরা চরম বাণী প্রচার করে বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেছি। আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেছে। হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দেমাতরমের দিব্বি করে বল্‌ছি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব। দেখি, কার সাধ্য বাধা দেয়!—এ যে কি প্রার্থনা, এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু জানি, তাঁদের এই চাওয়া এবং পাওয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, সংস্কার মানে মেরামত,—উচ্ছেদ নয়। গুরুভারে যে অপরাধ আজ মানুষের অসহ হয়ে উঠেছে তাকেই সুসহ করা; যে যন্ত্র বিকল হয়ে এসেছে মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে কৌশল বোধ হয় তারই নাম শাসন সংস্কার। একটা দিনের জন্যও এ ফাঁকি আমি চাইনি, একটা দিনের জন্যও বলিনি কারাগারের পরিসর আমার আর একটুখানি বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে ধন্য কর। ভারতী, আমার কামনায়, আমার তপস্যায় আত্ম-বঞ্চনার অবসর নেই। এ তপস্যা সাঙ্গ হবার শুধু দুটি মাত্র পথ খোলা আছে,—এক মৃত্যু, দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা।

তাঁহার এই কথাগুলির মধ্যে নূতন কিছুই ছিলনা, তথাপি, মৃত্যু ও এই ভয়াবহ সঙ্কল্পের পুনরুল্লেখে ভারতীর বুকের মধ্যে অশ্রু আলোড়িত হইয়া দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। কহিল, কিন্তু, একাকী কি করবে দাদা, একে একে সবাই যে তোমাকে ছেড়ে দূরে সরে গেল?

ডাক্তার বলিলেন, যাবেই ত। আমার দেবতা যে ফাঁকি সইতে পারেন না বোন্।

ভারতীর মুখে আসিল, সংসারে সবাই ফাঁকি নয় দাদা, হৃদয় পাথর না হয়ে গেলে তা টের পেতে। কিন্তু এ কথা আজ সে উচ্চারণ করিল না।

আহার শেষ হইলে ডাক্তার হাত-মুখ ধুইয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। কেহই লক্ষ্য করিল না যে তাঁহার চোখের দৃষ্টি কিসের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ধীরে ধীরে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। এবং একটা কান যে বহুক্ষণ হইতেই সদর দরজায় সজাগ হইয়াছিল তাহা কেহই জানিত না। পথের ধারে কি একটা শব্দ হইল, তাহা আর কেহ গ্রাহ্য করিল না, কিন্তু ডাক্তার সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নীচে অপূর্ব্ববাবুর চাকর আছে না? জেগে আছে? ওহে হনুমন্ত, দোরটা একবার খুলে দাও।

কোথায় কাহার কিরূপ শয্যা প্রস্তুত হইবে তাহাই ভারতী সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া কহিল, কাকে দাদা? কে এসেছেন?

ডাক্তার বলিলেন, হীরা সিংহ! তাঁর আসার আশায় পথ চেয়ে আছি। কি বল কবি, কতকটা কাব্যের মত শোনাল না? এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

ভারতী বলিল, এই দুর্য্যোগে তোমার একার কাব্যের জ্বালাতেই আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে আছি। আবার ভগ্নদূত কিসের জন্যে?

শশী কহিল, ভগ্নদূত তুচ্ছ নয় ভারতী, সে না হলে অতবড় মেঘনাদ-বধ কাব্য রচনাই হোতোনা।

দেখি, ইনি কোন্ কাব্য রচনা করেন! এই বলিয়া ভারতী উঁকি মারিয়া দেখিল, অপূর্ব্বর ভৃত্য বাহিরের কবাট খুলিতে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিল, সে সত্যই হীরা সিংহ। ক্ষণেক পরে আগন্তুক উপরে আসিয়া সকলকে অভিবাদন করিল, এবং হাতজোড় করিয়া সব্যসাচীকে প্রণাম করিল। পরণে তাহার সেই অতি সুপরিচিত সরকারী উর্দ্দি, সরকারী চাপরাশ, সরকারী সুরাঠা, কোমরে টেলিগ্রাফ পিয়নের চামড়ার ব্যাগ,—এ সমস্তই ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিয়াছে। বিপুল দাড়ি গোঁফ বহিয়া জল ঝরিতেছে,—বাঁ হাত মুঠা করিয়া নিঙ্ড়াইয়া বোধ হয় নিজেকে কিঞ্চিৎ হাল্কা করিবার চেষ্টা করিল, এবং তাহারই ফাঁক দিয়া অস্ফুটধ্বনি শুনা গেল, রেডি।

ডাক্তার লাফাইয়া উঠিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ সরদারজী! কখন্?

নাউ। এই বলিয়া সে সকলকে পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া নীচে যাইতেছিল, কিন্তু সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কি হয়েছে সরদারজী? কি নাউ?

অথচ, সবাই জানিত এই মানুষটির গলায় ছুরি দিলে রক্ত ছুটিবে কিন্তু বিনা হুকুমে কথা যুটিবে না। সুতরাং, উত্তরের পরিবর্ত্তে তাহার ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু-গুম্ফ ভেদ করিয়া গুটি

কয়েক দাঁত ছাড়া আর যখন কিছুই বাহির হইল না, তখন বিস্ময়াপন্ন কেহই হইল না। সবাই জানিত, ইহার নিন্দা-খ্যাতি, মান-অপমান, শত্রু-মিত্র নাই ; দেশের কাজে সব্যসাচীকে সে সর্দ্দার মানিয়া এ জীবনের সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত সুখ-দুঃখ বিসর্জ্জন দিয়া কঠোর সৈনিক-বৃত্তি মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। আর তাহার তর্ক নাই, আলোচনা নাই, সময়-অসময়ের হিসাব নাই, কিছু একটা কঠিন কাজের ভার ছিল, কর্ত্তব্য পালন করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। ইহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়া ডাক্তার নিজে যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

ক্ষতি এবং অনিষ্ট কত যে হইয়াছে দূর হইতে নিরূপণ করা শক্ত। সম্ভবতঃ, যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যতই হোক, দুটা কাজ তাঁহাকে করিতেই হইবে। তাঁহাদের জ্যামেকা ক্লবের যে অংশটা সিঙ্গাপুরে আছে তাহাকে বাঁচাইতেই হইবে, এবং যেখানে হোক, এবং যেমন করিয়া হোক ব্রজেন্দ্রকে তাঁহার খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। নদীর দক্ষিণে সিরিয়মের সন্নিকটে একখানা চিনা জাহাজ মাল বোঝাই করিয়া দেশে চলিয়াছে, কাল অতি প্রত্যূষেই তাহা ছাড়িয়া যাইবে, ইহাতেই কোনমতে একটা স্থান পাওয়া গিয়াছে। এই সম্বাদই হীরা সিংহ এইমাত্র দিয়া গেল।

শুনিয়া সুমিত্রার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। খুব সম্ভব, ব্রজেন্দ্র এখন সিঙ্গাপুরে। এবং, যে ব্যক্তি তাহার সন্ধানে চলিল, তাহার দৃষ্টি হইতে স্বর্গে মর্ত্তে কোথাও তাহার পরিত্রাণ নাই। তখন বিশ্বাসঘাতকতার শেষ বিচারের সময় আসিবে। ইহার দণ্ড যে কি তাহা দলের মধ্যে কাহারও অবিদিত নহে, সুমিত্রাও জানে। ব্রজেন্দ্র তাহার কিছুই নহে, এবং, অপরাধ যদি সে করিয়াই থাকে শাস্তি তাহার হোক, কিন্তু যে কারণে সুমিত্রা অকস্মাৎ এমন হইয়া গেল, তাহা ব্রজেন্দ্রের দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া নহে, তাহা এই যে, ব্রজেন্দ্র পতঙ্গ নহে। সে আত্মরক্ষা করিতে জানে। শুধু তাহার পকেটের সুগুপ্ত পিস্তল নহে, তাহার মত ধূর্ত্ত, কৌশলী ও একান্ত সতর্ক ব্যক্তি সংসারে বিরল। তাহার মস্ত ভুল এই হইয়াছে যে, ডাক্তার হাঁটা-পথে বর্ম্মা ত্যাগ করিয়া গেছেন এই কথা সে যাবার পূর্ব্বে নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়া গেছে। এখন কোনমতে যদি সে ডাক্তারের খোঁজ পায় ত বধ করিবার যতকিছু অস্ত্র তাহার তূণে আছে প্রয়োগ করিতে মুহূর্ত্তের দ্বিধাও করিবে না। বস্তুতঃ, জীবন-মরণ-সমস্যায় অপরের বলিবারই বা কি আছে!

কিছুই নাই। শুধু হীরা সিংহের শান্ত মৃদু দুটি শব্দ 'নাউ' এবং 'রেডি' তাহাদের সকলের কানের মধ্যেই সহস্রগুণ ভীষণ হইয়া সহস্র দিক দিয়া আঘাত প্রতিঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভারতীর মনে পড়িল তাহাদের মৌলমিনের বাটীতে একদিন জন্মতিথি উৎসবের পরিপূর্ণ আনন্দের মাঝখানে অতিথি এবং সর্ব্বোত্তম বন্ধু রেভারেণ্ড লরেন্স আহারের

টেবিলে হৃদ্‌রোগে মারা গিয়াছিলেন। আজিও ঠিক তেম্‌নি অকস্মাৎ হীরা সিংহ ঘরে ঢুকিয়া মৃত্যুদূতের ন্যায় একমুহূর্ত্তে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ শশী কথা বলিয়া উঠিল। মুখ দিয়া ফোঁস্ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সব যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্চে ডাক্তার।

কথাটা শাদা এবং নিতান্তই মোটা কথা। কিন্তু সকলের বুকের উপরে যেন মুগুরের ঘা মারিল।

ডাক্তার হাসিলেন। শশী কহিল, হাস্‌ুন আর যাই করুন, সত্যি কথা। আপনি কাছে নেই মনে হলে সমস্ত যেন ব্ল্যাঙ্ক,—ফাঁকা, ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। কিন্তু আপনার প্রত্যেকটি হুকুম আমি মেনে চল্‌বো।

যথা?

যথা, মদ খাবোনা, পলিটিক্সে মিশ্‌বোনা, ভারতীর কাছে থাক্‌বো এবং কবিতা লিখ্‌বো।

ডাক্তার ভারতীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। তখন রহস্যভরে প্রশ্ন করিলেন, চাষাড়ে কবিতা লিখ্‌বেনা কবি?

শশী কহিল, না। তাদের কাব্য তারা লিখ্‌তে পারে লিখুক, আমি লিখ্‌চিনে। আপনার সে-কথা আমি অনেক ভেবে দেখেচি। এবং, এ উপদেশও কখনো ভুলবনা যে, আইডিয়ার জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারে শুধু শিক্ষিত ভদ্র সন্তান, অশিক্ষিত কৃষকে পারেনা। আমি হব তাদেরই কবি।

ডাক্তার বলিলেন, তাই হোয়ো। কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয় কবি। মানবের গতি এইখানেই নিশ্চল হয়ে থাক্‌বে না। কৃষকের দিনও একদিন আস্‌বে, যখন তাদের হাতেই জাতির সকল কল্যাণ অকল্যাণের ভার সমর্পন করতে হবে।

শশী কহিল, আসুক সেদিন। তখন, স্বচ্ছন্দ, শান্ত চিত্তে সব দায়িত্ব তাদের হাতেই তুলে দিয়ে আমরা ছুটি নেব। কিন্তু আজ না। আজ আত্মবলিদানের গুরুভার তারা বইতে পারবে না।

ডাক্তার উঠিয়া আসিয়া তাহার কাঁধের উপর ডান হাত রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না।

অপূর্ব্ব এতক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হইয়া শুনিতেছিল, ইঁহাদের কোন আলোচনাতেই কথা কহে নাই। কিন্তু শশীর শেষের দিকের মন্তব্য তাহার ভারি খারাপ ঠেকিল। যে কৃষকের মঙ্গলোদ্দেশে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প সে স্থির করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে এই সকল অভিমতে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, মদ খাওয়া খারাপ, বেশ, উনি ছেড়ে দিন; কাব্য-চর্চ্চা ভালো, তাই করুন, কিন্তু কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষের কৃষককুল কি এম্‌নি তুচ্ছ, এতই

অবহেলার বস্তু ? এবং, এরাই যদি বড় হয়ে না ওঠে, আপনাদের বিপ্লবই বা করবে কে ? এবং, করবেই বা কেন ? আর পলিটিক্স ! যথার্থ বল্‌চি ডাক্তার, কৃষকের কল্যাণে সন্ন্যাস-ব্রত যদি আমি না নিতাম, আজ স্বদেশের রাজনীতিই হোতো আমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য !

ডাক্তার ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা, প্রসন্ন স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্যে তাহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, আমি কায়-মনে প্রার্থনা করি তোমার সদুদ্দেশ্য যেন সফল হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রও তাচ্ছল্যের সামগ্রী নয়। দেশের ও দশের কল্যাণে বৈরাগ্যই যদি গ্রহণ করে থাকো কারও সঙ্গেই তোমার বিরোধ বাধবে না। আমি শুধু এই কথাই বলি, অপূর্ব্ববাবু, সকলে কিন্তু সকল কাজের যোগ্য হয় না।

অপূর্ব্ব স্বীকার করিয়া বলিল, আমার চেয়ে এ শিক্ষা আর কার বেশি হয়েছে ডাক্তার? আপনি দয়া না করলে বহুদিন পূর্ব্বেই ত এই ভ্রমের চরম দণ্ড আমার হয়ে যেতো। এই বলিয়া পূর্ব্বস্মৃতির আঘাতে তাহার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

শশী এ ঘটনা জানিত না, জানানো কেহ আবশ্যক বিবেচনাও করে নাই। অপূর্ব্বর কথাটাকে সে প্রচলিত বিনয় ও শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শনের অতিরিক্ত কিছুই মনে করিল না। কহিল, ভ্রম ত করে অনেকেই, কিন্তু দণ্ডভোগ করে চলে যে নিজের জন্মভূমি। আমি ভাবি, ডাক্তার, আপনার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কে আছে ? কার এতখানি জ্ঞান ? জাতি ও দেশ নির্বিশেষে কার এতখানি রাষ্ট্রতন্ত্রের অভিজ্ঞতা ? কার এত ব্যথা ? অথচ, কিছুই কাজে এলোনা। চায়নার আয়োজন নষ্ট হয়ে গেল, পিনাঙের গেল, বর্ম্মার কিছুই রইল না, সিঙ্গাপুরেরও যাবে নিশ্চয়ই,—এক কথায়, আপনার এতকালের সমস্ত চেষ্টাই ধ্বংশ হবার উপক্রম হয়েছে। শুধু প্রাণটাই বাকি, সেও কোনদিন যায়।

ডাক্তার মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। শশী কহিল, হাসুন আর যাই করুন, এ আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি।

ডাক্তার তেম্‌নি হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, দিব্য চক্ষে আর কিছু দেখ্‌তে পাওনা কবি ?

শশী বলিল, তাও পাই। তাইত আপনাকে দেখ্‌লেই মনে হয় নিরুপদ্রব, শান্তিময় পথে যদি আমাদের সত্যকার পথের দাবী সূচ্যগ্র মাত্রও খোলা থাক্‌তো !

অপূর্ব্ব বলিয়া উঠিল, বাঃ! একই সঙ্গে একেবারে দুই উল্টো কথা!

সুমিত্রা হাসি গোপন করিতে মুখ ফিরাইল, ডাক্তার নিজেও হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ, ওঁর মধ্যে দুটো সত্তা আছে অপূর্ব্ববাবু। একজন শশী, আর একজন কবি। এইজন্যেই একের মুখের কথা অপরের মনের কথায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে এমন বেসুরার সৃষ্টি করে। একটু থামিয়া বলিলেন, বহু মানবের মধ্যেই এম্‌নি আর একজন নিভৃতে বাস করে। সহজে তাকে ধরা যায় না। তাই মানুষের কথার ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব মাত্রই তার কঠোর

বিচার করলে অবিচারের সম্ভাবনাই থাকে বেশি। অপূর্ব্ববাবু, আমি তোমাকে চিন্‌তে পেরেছিলাম, কিন্তু পারেননি সুমিত্রা। ভারতী, জীবন-যাত্রার মাঝখানে যদি এম্‌নি আঘাত কখনো পাও দিদি, পরলোকগত দাদার এই কথাটি তখন যেন ভুলোনা। কিন্তু, এইবার আমি উঠি। ঘাটে আমার নৌকা বাঁধা আছে, ভাঁটার মুখে অনেকখানি দাঁড় না টান্‌লে আর ভোর রাত্রে জাহাজ ধরতে পারব না।

ভারতী শঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল, কহিল, এই ভয়ঙ্কর নদীতে? এই ভীষণ ঝড়ের রাত্রে?

তাহার ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে সুমিত্রার আত্মসংযমের কঠিন বাঁধ ভাঙিয়া পড়িল। সে পাংশু মুখে প্রশ্ন করিল, সত্যিসত্যিই কি তুমি সিঙ্গাপুরে নাম্‌বে না কি? এ কাজ তুমি কখ্‌খনো কোরোনা, ডাক্তার, সেখানকার পুলিশে তোমাকে ভাল করেই চেনে। এবার তাদের হাত থেকে তুমি কিছুতেই———

কথা তাহার শেষ হইল না, উত্তর আসিল, তারা কি এখানেই আমাকে চেনেনা সুমিত্রা?

কিন্তু এই লইয়া তর্ক করিয়া ফল নাই, যুক্তি দেখাইবার অবসর নাই,—হয়ত বা, প্রশ্নটা সুমিত্রা শুনেও নাই; যে কথা বাহিরে আসিবার ব্যাকুলতায় এতদিন মাথা কুটিয়া মরিতেছিল তাহাই অন্ধবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিল,—কেবল একটিবার ডাক্তার, শুধু এইবারটির মত আমার উপরে তুমি নির্ভর করে দেখ তোমাকে আমি সুরবায়ায় নিয়ে যেতে পারি কি না! তারপরে টাকায় কি না হয় বল!

ডাক্তার হেঁট হইয়া জুতার ফিতা বাঁধিতেছিলেন, বাঁধা শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন, টাকায় অনেক কাজ হয় সুমিত্রা, তার অপচয় করতে নেই।

সকলেই বুঝিল এ আলোচনা বৃথা। উপায়হীন বেদনায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া সুমিত্রা অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল, ভারতী কহিল, আমাকে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে চল্‌লে দাদা, অথচ, বারবার বল্‌তে আমাকে,—আর শুধু আমাকে কেন, আমাদের মত বয়সের যেখানে যত মেয়ে আছে তাদের প্রতি তোমার বড় লোভ, সকলকেই তুমি অত্যন্ত ভালবাসো, সে কি এই?

ডাক্তার সায় দিয়া বলিলেন, সত্যই ভালবাসি ভারতী। মেয়েদের পরে যে আমার কত লোভ, কত ভরসা সে কথা আমার নিজের মুখে তোমাদের জানাবার সুযোগ হল না, কিন্তু পারো যদি দাদার হয়ে এই কথাটা তাদের জানিয়ে দিয়ো বোন্‌।

ভারতী সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, জানাবো এই যে আমাদের শুধু তুমি বলি দিতে চাও।

ডাক্তার মুহূর্ত্তকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, বেশ, তাই বোলো। বাঙ্‌লা-

দেশের একটি মেয়েও যদি তার অর্থ বোঝে আমি তাতেই ধন্য হব। এই বলিয়া তাঁহার সুবৃহৎ বোঁচ্‌কাটা কাঁধে তুলিয়া লইলেন। তাহার পিছনে পিছনে সকলেই নীচে নামিয়া আসিল। ভারতী শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, দেশের আয়োজন যার নিষ্ফল হয়ে যায়, বিদেশের আয়োজনে তার কি হয় দাদা? যারা অন্তরঙ্গ সুহৃৎ একে একে সবাই ছেড়ে গেল, এখন যে তুমি একেবারে নিঃসঙ্গ,—একেবারে একা!

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, একাই আরম্ভ করেছিলাম, ভারতী! বিদেশ? কিন্তু, ভগবান এইটুকু দয়া করেছেন মানুষের মর্জ্জিমত ছোট বড় প্রাচীরের বেড়া তুলে তাঁর পৃথিবীকে আর সহস্র কারা-কক্ষে পৃথক করে রাখবার তিনি যো রাখেন নি। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি যায় বিধাতার রাজপথ একেবারে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। একে রুদ্ধ করে রাখবার চক্রান্ত মানুষের হাতের নাগাল ডিঙিয়ে গেছে। এখন এক প্রান্তের অগ্ন্যুৎপাৎ অপর প্রান্তে স্ফুলিঙ্গ উড়িয়ে আন্‌বেই আন্‌বে ভারতী, সে তাণ্ডব দেশ বিদেশের গণ্ডী মান্‌বেনা!

কিন্তু, এদিকে যে রুদ্রের সত্যকার তাণ্ডব ঘরের বাহিরে তখন কি উন্মাদ মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছিল, ভিতর হইতে তাহা কেহই উপলব্ধি করে নাই। বিদ্যুতে, ঝঞ্ঝায়, প্লাবনে ও বজ্রাঘাতে সে যেন একেবারে প্রলয় সুরু হইয়া গিয়াছিল। এবং, ডাক্তার অর্গল মুক্ত করিতেই এক ঝলক সুতীক্ষ্ণ বৃষ্টির ছাট ভিতরে ঢুকিয়া সকলকে ভিজাইয়া, আলো নিবাইয়া, সমস্ত ওলট্ পালট্ করিয়া ঘর ও বাহির চক্ষের পলকে অন্ধকারে একাকার করিয়া দিল।

ডাক্তার ডাকিলেন, সরদার জী?

বাহিরে হইতে সাড়া আসিল, ইয়েস্ ডক্টর, রেডি।

সকলে চমকিত হইল। এই দুঃসহ বায়ু ও মুষলধার বৃষ্টি মাথায় পাতিয়া কেহ যে এই সূচী-ভেদ্য আঁধারে দাঁড়াইয়া নিশ্চল-নিঃশব্দ প্রহরায় নিযুক্ত থাকিতে পারে এ কথা যেন সহসা কেহ ভাবিতেই পারিল না।

ডাক্তার রহস্যভরে কহিলেন, তাহলে আসি এখন! এই বলিয়া বাহিরে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই অপূর্ব্ব ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, একদিন যে আমি প্রাণ পেয়েছিলাম একথা চিরদিন মনে রাখবো ডাক্তার।

অন্ধকার হইতে জবাব আসিল, তুচ্ছ পাওয়ার ব্যাপারটাকেই কেবল বড় করে দেখলে, অপূর্ব্ববাবু, যে দিলে তাঁকে মনে রাখ্‌লে না?

অপূর্ব্ব চীৎকার করিয়া কহিল, মনে? এ জীবনে ভুলব না। এ ঋণ মরণ পর্য্যন্ত আমি—

দূরে আঁধারের মধ্যে হইতে প্রত্যুত্তর আসিল, তাই যেন হয়, প্রার্থনা করি সত্যকার দাতাকে যেন একদিন তুমি চিন্‌তে পারো অপূর্ব্ব বাবু! সেদিন সব্যসাচীর ঋণ—

পরে ক্ষণকালের জন্য যেন কাহারও সংজ্ঞা রহিল না। অচেতন জড়মূর্ত্তির ন্যায় কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল থাকিয়া ভারতী অকস্মাৎ চকিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে উপরে উঠিয়া আসিতেই সবাই তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে জানালা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় নিষ্পলক চক্ষু দুটি অন্ধকারে একাগ্র করিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল। এমন কতক্ষণ কাটিল। সহসা ভীষণ শব্দে হয়ত কাছে কোথাও বাজ পড়িল, এবং তাহারই সুতীব্র বিদ্যুৎ শিখা শুধু পলকের জন্যই আকাশ ও ধরাতল উদ্ভাসিত করিয়া একবার শেষ দেখা দেখাইয়া দিল।

এই ভয়ানক দুর্য্যোগে বাটীর বাহিরে আসিয়া ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার মত উন্মাদ বোধ হয় পুলিশের মধ্যে কেহ ছিল না, তথাপি রাজপথ এড়াইয়া উভয়ে মাঠের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ঝোপ ঝাড় ও কাঁটাগাছের বেড়া; এই সূচীভেদ্য আঁধারে পিচ্ছিল পথ-হীন পথে বিপুল বোঝার ভারে একজন আনত দেহে সাবধানে অগ্রসর হইয়াছে, এবং অপরে বিরাট পাগড়ীর নীচে প্রচণ্ড বারিপাত হইতে যথাসম্ভব নিজের মাথাটা বাঁচাইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে।

নিমিষ মাত্র। নিমিষ মাত্র পরেই সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া রহিল শুধু নিবিড় অন্ধকার।

হঠাৎ গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিয়া উঠিল, দুর্দ্দিনের বন্ধু! নমস্কার।

অপূর্ব্ব দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া সরদার হীরা সিংহের উদ্দেশে নিঃশব্দে নমস্কার করিল। তাহার মনের মধ্যে হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল।

ভারতী তেমনি পাষাণ মূর্ত্তির মতই অন্ধকারে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শশীর কথাও যেমন তাহার কানে গেল না, তেমনি জানিতেও পারিল না ঠিক তাহারই মত আর একজন নারীর দুই চক্ষু প্লাবিয়া তখন এমনি অশ্রুপ্রবাহই বহিয়া যাইতেছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বর্ষ-সম্ভাষণ

স্মৃতির দীপের ক্ষীণ আলোকে স্পষ্ট নাহি পড়ত' চোখে
অতীত ছিল আলো-ছায়ায় মাখা,
ভবিষ্যৎও ছিল আবার অমার সূচিভেদ্য আঁধার
গুহার মাঝে ছড়িয়ে তাহার পাখা,
বর্ত্তমানের মুক্ত বুকে মানুষ তখন হাসত' সুখে
দুঃখে, শোকে কাঁদ্‌ত ঝর' ঝর,
মিল্‌ত' যেটা হাতে হাতেই তুষ্ট ছিল কেবল তাতেই
ভাবত' না কি ঘট্‌বে অতঃপর,
গুণত' শুধু রাত্রি, দিবা, জান্‌ত' না মাস, বর্ষ কিবা,
কালের নদী চিত্রে যেন আঁকা,
জীবন সাথেই সব ফুরাত' স্রোতের মুখ আর কে ঘুরাত,
মৃত্যু-পারে ভাবত সবই ফাঁকা।

না জানি কোন পুণ্য প্রাতে নামল' ধরায় আলোর সাথে
আনন্দেরই মন্দাকিনী-ধারা,
মানুষ হ'ল আশায় ভরা, জীবন-নদী কলস্বরা
ছুটল' প্রেমে চূর্ণি' প্রাচীন কারা,
জাগ্‌ল মনে রাগ, অনুরাগ, করে' হাজার খণ্ডে বিভাগ
বর্ষে, মাসে কালের পরিমাণ,
বিরহিনী আশায় থাকি' পুষ্পে গণে ক'দিন বাকী
—বর্ষ-শেষে শাপের অবসান,
ছয়টি ঋতুই নেচে নেচে আনন্দ দেয় যেচে যেচে
এবার গেল, আসবে আবার ফিরে,
এম্‌নি করে' হর্ষে, আশায়, বর্ষ আসে, বর্ষ পালায়
পৌঁছে মানুষ বৈতরিণীর তীরে।

চায় সে তখন আগু-পিছু, সন্দেহ তার নাইক কিছু
যাতায়াতের পথটি চেনা-শোনা,
ধরিত্রী মা'য় যায়নি ভুলে. তৃণের সনে দুলে দুলে,
তার কোলেতেই করছে আনাগোণা,

যুগে যুগে এই দেশে সে কত নূতন নূতন বেশে
এসেছিল, আস্‌বে কতবার,
জনম, মরণ তুচ্ছ কথা, সিন্ধু বুকে উর্ম্মি যথা,
কালের মুখের ক্ষুদ্র সে ফুৎকার,
অতীত নয় আর ছায়ায় ঢাকা, ভবিষ্যৎও আলোয় মাখা
যুক্ত তারা বর্ত্তমানের ডোরে,
জড়, চেতনের নাইক ধাঁধা, এক শিকলে সবাই বাঁধা,
জন্ম-মরণ চক্র সনে ঘোরে।

একটি ছোট আবর্ত্তনে ঐ দেখ, হায়, ক্ষুণ্নমনে
গতবারের "নবীন" বরষ গত,
থাক্‌বে না সে যাবেই চলে', ফিরবে না সে চোখের জলে,
—কাঁদলে আরও বাড়বে বুকের ক্ষত,
সমুখ পানে ফিরাও আঁখি, নবীন উষার আলোক মাখি'
নবীন অতিথ ঐ যে তোমার দ্বারে,
জলে, স্থলে, গগনতলে আপনি বেতার-বার্ত্তা চলে
হর্ষ কাঁপে বিশ্ব-বীণার তারে,
নবীন কুসুম ফুটল' বনে, নবীন অলির গুঞ্জরণে
জাগছে মনে কতই নবীন আশা,
গাইছে শ্যামা উছাস ভরে কোকিল মাতায় কুহুস্বরে
মনে, বনে হাজার পাখীর বাসা।

গতবারের বাঞ্ছা যত মরেনি ত', মূর্চ্ছাহত,
সঞ্জীবনী মন্ত্রজলে আজ,
বেঁচে আবার উঠবে তারা ফুলের মতই ফুটবে তারা
মল্লিকা, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ;
ভাব্‌না কেন কর্‌চ' তুমি, এই ভারতের শ্মশানভূমি
শব-সাধনার ক্ষেত্র চিরন্তন,
ভূত-পিশাচের অট্টহাসে পালাও কেন মিথ্যা ত্রাসে
সাধন কর, মিল্‌বে আশার ধন,

গতবারের নিষ্ফলতায় কাতর হ'লে বুকের ব্যথায়,
আশার লতায় ফুট্‌বে নাক ফুল,
তরঙ্গে না শঙ্কা করি' ভরসা ক'রে ভাসাও তরী,
এই অকূলে পাবেই পাবে কূল।

উদ্দীপনার দীপক রাগে বিশ্ব-বীণায় যে সুর জাগে
লও হে তুলে একটি কণা তার,
অবহেলার ধূলায় লীনা দেখি, তোমার প্রাণের বীণা
উচ্ছ্বসিয়া দেয় কিনা ঝঙ্কার,
হ'ক না ছোট, হ'ক না বড়, কর্ম্মস্রোতেই ঝাঁপিয়ে পড়
জড়ের মত থেকোনা আর ঘরে,
সংশয়ের এই তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে লও হে ডেকে,
মান্য-অতিথ এল বছর পরে,
ল'য়ে প্রীতির পুষ্পমালা সাজাও প্রাণের বরণডালা
দাও হে পেতে হৃদয়-সিংহাসন,
আশা রাখ, ভরসা রাখ, ব্যর্থ এবার হ'বে নাক
হর্ষ ভরা বর্ষ-সম্ভাষণ।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্য্য শিল্পের ক্রম

দেখা যায় যে আর্য্য অনার্য্য নির্ব্বিশেষে একসময়ে তাবৎ মানুষই নানা দেবতার কল্পনা ও উপাসনা করছে প্রাতঃসূর্য্য, মধ্যাহ্ন সূর্য্য, অস্তমান সূর্য্য, আকাশ, অগ্নি, গাছ, পাথর ইত্যাদি ইত্যাদি। বৈদিক যুগেও আরণ্যক ঋষিরা দেখছি এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনা করে নানা মন্ত্র উচ্চারণ করছেন এবং কোথাও কোথাও এইসব দেবতার মন্ত্রমূর্ত্তি গড়ে তোলারও লক্ষণ দেখি—যেমন উষাকে ভাষা দিয়ে একটি কুমারী মূর্ত্তিতে ধরা হল, যেমন সূর্য্যকে তিন বর্ণের তিন মূর্ত্তি দেওয়া হল, অগ্নিকে দেখা হ'ল যজমানের কামনাবাহি দূতরূপে। এই ভাবে তাবৎ দেবতা একটি একটি সুনির্দ্দিষ্ট ধ্যান মূর্ত্তি পেতে চল্লো আস্তে আস্তে মানুষের কাছে অগ্নিদেব যূপকাষ্ঠ এরা প্রত্যক্ষরূপ পেয়ে গেল, বৈদিক আমলে ঋষিরা নানা-কোণ-বিশিষ্ঠ বেদীর মধ্যে অগ্নিকে ধরে এবং যূপ ও ইন্দ্রধ্বজকে নানা বর্ণের পুষ্পমালা

চামর ইত্যাদিতে সাজিয়ে ধরলেন। ভারতবাসী আর্য্যগণের সঙ্গে এই বৈদিক যুগে ভারতের বাহিরে, আর্য্য ও অন্যব্রতগণের দেবতার রূপকল্পনা ও রূপপ্রদানের মধ্যে একটা চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে দেখা যায়। ভারতের ঋষিদের কল্পিত ইন্দ্রকে আমরা নানা নামে নানা উপাখ্যানের মধ্যে খুঁজে পাই খুব আদিম মনুষ্যসমাজের মধ্যেও, এছাড়া দেবশিল্পী আছেন যিনি নানা অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি গড়েন। বেদে ত্বষ্টা এবং ঋভুগণ শিল্পী বলে কথিত হচ্ছেন—"যাঁহারা অশ্বিদ্বয়কে রথ নির্ম্মাণাদি কার্য্যদ্বারা প্রীত করেন, যাঁহারা জীর্ণ পিতামাতাকে যুবা করেন, যাঁহারা ধেনু ও অশ্ব নির্ম্মাণ করেন, যাঁহারা অসংত্রা কবচ নির্ম্মাণ করেন" ইত্যাদি নানা কারিগরির কথা! কারিগরের হাতের কাযের প্রশংসা এবং কারিগরকে সম্মান দেওয়া হয়েছে বারে বারে বৈদিক যুগে—

(১) "হে বলের পুত্র, সুধন্বার পুত্র, ঋভুগণ! তোমরা এখানে আগমন কর, তোমরা অপগত হইওনা। এই সবনে মদকর সোম রত্নদাতা ইন্দ্রের পরেই তোমাদের নিকট গমন করুক।"

(২) "ঋভুগণের রত্নদান আমাদের নিকট এই যজ্ঞে আগমন করুক। যেহেতু তাঁহারা শোভন হস্তব্যাপার দ্বারা ও কর্ম্মের ইচ্ছাদ্বারা এক চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলেন এবং অভিযুত সোম পান করিয়াছিলেন!"

(৩) "তোমরা চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলে এবং বলিয়াছিলে—হে সখা অগ্নি অনুগ্রহ কর! হে রাজগণ! হে ঋভুগণ! তোমরা কুশলহস্ত, তোমরা অমরত্ব পথে গমন কর।"

(৪) "যাহাকে কৌশলপূর্ব্বক চারিটী করা হইয়াছিল সেই চমস না জানি কি প্রকারেরই ছিল? তোমরা হর্ষের জন্য সোম অভিষব কর, হে ঋভুগণ! তোমরা মধুর সোমরস পান কর।" * * *

(৮) "তোমরা সুকর্ম্মদ্বারা দেবতা হইয়াছিলে হে বলের পুত্রগণ! তোমরা শ্যেনের ন্যায় দ্যুলোকে নিষণ্ণ আছ, তোমরা ধন দান কর হে সুধন্বার পুত্রগণ! তোমরা অমর হইয়াছ।

(৯) হে সুহস্ত ঋভুগণ! যেহেতু তোমরা রমণীয় সোমদানযুক্ত তৃতীয় সবনকে সুকর্ম্মেচ্ছা প্রযুক্ত প্রসাধিত করিয়াছ, অতএব তোমরা হৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের সহিত অভিযুত সোম পান কর।" (বামদেব ঋষি) ঋভুগণকে বলা হয়েছে—সুন্দরান্তঃকরণ—"হে সুন্দরান্তঃকরণ ঋভুগণ!" ঋভুগণ কিছু নকল করেন না তাও বলা হয়েছে—"তোমরা মানসিক ধ্যান দ্বারা সুবৃত ও অকুটিলগামী রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলে!" ঋভুগণকে বলা হয়েছে রূপদক্ষ—"তোমরা শ্রেষ্ঠ ও দর্শনীয় রূপ ধারণ করিয়াছ…তোমরা ধীমান্, কবি ও জ্ঞানবান আমরা তোমাদিগকে এই স্তোত্রদ্বারা আবেদন করিতেছি।"

এক আকারের হাতা কি চামচ ছাঁচে ঢালাই হয়ে চারখানা কেন দুশোখানা হাতা

ও চামচ হচ্ছে এখন এতে আমরা অবাক হইনে, কিন্তু শিল্পের যখন সূত্রপাত হচ্ছে ভারতবর্ষে তখনকার দিনের মানুষ কি বিস্ময়ের চোখেই দেখছে এই সমস্ত কারিগরদের ব্যাপার এবং কি সম্মানই বা দিচ্ছে তাদের, তা বেশ বোঝা যায় উপরের মন্ত্রগুলি থেকে।

ঋষিরা বল্লেন—মানুষের রচনা সমস্ত দেবতার রচনার কনিষ্ঠ—"দেবশিল্পানাম্ অনুকৃতিঃ।" দেবতার সহায় যজ্ঞ কার্য্যের সহায় হল শিল্পীগণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া গেল বৈদিক যুগের সে হিসাব নিলেম তা থেকে। নির্ম্মাণের কৌশল সমস্ত রূপ দেবার চেষ্টা আস্তে আস্তে পাচ্ছে মানুষ। মানুষ তপস্যা করছে উৎকৃষ্ট জ্ঞান পাবার জন্য, মানুষ তপস্যা করছে সুন্দর সমস্ত শিল্পকলাকে পাবার জন্য—এরও প্রমাণ পাচ্ছি বৈদিক যুগে। জ্ঞানের উৎকর্ষ সব দিক দিয়ে পাবার জন্য ঋষিরা তপস্যা করছেন যখন তখন দেখি অন্য আর এক সমাজের মানুষ তারা অন্যব্রত হলেও মানব শিল্পের উৎকর্ষের হিসেবে আরণ্যক ঋষিদের চেয়ে একটু যেন উপরে রয়েছে—লোহার কেল্লা সুরক্ষিত নগর নির্ম্মাণে পটু অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ ইন্দ্রের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এমন সব অন্যব্রত তারা।

ইন্দ্রের দূতী সরমা যখন পণিগণের নিকটে এসে ইন্দ্রের বীরত্ব বর্ণন সুরু করলেন সেই সময়ে পণিগণ উপহাস করে বল্লে—ইন্দ্রের কথা কি বল? আমাদেরও অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং যুদ্ধ বিদ্যায় আমরাও একেবারে অপারগ নই!

বৈদিক যুগে প্রধান দেবতা হলেন ইন্দ্র। এই ইন্দ্রের মূর্ত্তি ঋষিরা যে ভাবে কথায় ফুটিয়েছেন তাতে করে তাঁকে হিন্দু আমলের ঐরাবতে চড়া নধর মূর্ত্তিতে আমরা দেখতে পাইনে। বেদের ইন্দ্র রথে চড়ে যুদ্ধে চলেন, ঘোড়ায় চড়ে যজ্ঞে আসেন। আমাদের সুপরিচিত সূর্য্য মূর্ত্তির কিম্বা কল্কি অবতারের সঙ্গে কতকটা মিল দেখি বেদের ইন্দ্রের—"অভিমুখবর্ত্ত ইন্দ্র, আমাদিগকে আশ্রয় ও ধন দানের জন্য আমাদের নিকটে অশ্বে আরোহণ করতঃ আগমন করুন।"......"যিনি পর্ব্বতের ন্যায় প্রবৃদ্ধ ও মহান, যিনি তেজস্বী যিনি শত্রুর পরাভবের জন্য সনাতন কালে উৎপন্ন হইয়াছেন।"

ঋষিরা যাদের নাম মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন সে সব দেবতা সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র মেঘ জলরূপেই ছিল তাঁদের চোখের সামনে সাক্ষাৎ অগ্নি সাক্ষাৎ সূর্য্য। সুতরাং খুঁটিনাটি মূর্ত্তির ধ্যান তাঁরা দিলেন না, যদিও মূর্ত্তিশিল্প বড় একটা এগোয়নি কিন্তু অন্যান্য শিল্পব্যাপার চলেছে দেখি—বস্ত্র, অলঙ্কার, রথ, শকট এবং নানা তৈজসপত্র এ সকল প্রস্তুত হচ্ছে দেখা যায়। বৈদিক যুগে—মাটির বাসন হাঁড়ি-কুড়ি, জাঁতা এবং লোহা ও নানা ধাতু ঢালাই করে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি গড়তে গড়তে এইভাবে কত যুগ কেটে ছিল আর্য্যগণের প্রতিমাগঠনের শিল্প জানার পূর্ব্বে তার ঠিক নেই।

রামায়ণ থেকে পাওয়া যায় স্বর্ণসীতার কথা, সেই যদি ধরা যায় প্রথম প্রতিমা গড়ার

আরম্ভ আর্য্যজাতির, তবে বলতে হবে সেটাও রাক্ষসদের কাছ থেকে এসেছিল, কেননা লঙ্কায় মায়াসীতার খবর রামের রাজসূয়ের আগের ঘটনা।

রাবণের পুষ্পক রথ এবং রাবণের পুরীর যা বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে বুঝি যে, আর্য্যেতর সমস্ত জাতি তারা কলাকৌশলে ভারতবাসী আর্য্যদের অপেক্ষা অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

মহাভারতের যুগে ভারতীয় আর্য্যেরা সভ্যতার প্রায় চরম শিখরে উপনীত দেখা যায়। কিন্তু তখনও দেখি যুধিষ্ঠিরের সভা প্রস্তুত করতে এল শিল্পকার ময়দানব, কিরাতের ঘর থেকে এল গাণ্ডিব অর্জ্জুনের! এমনি সব খুঁটিনাটি কথা থেকে ধরা যায় আর্য্যেতর তারাই ছিল (artist) আর্টিষ্ট এবং কারিগর, রূপ দিতো তারা কল্পনাকে। এরা বিশ্বের তাবৎ রূপকে দখল করতে পারতো বিদ্যার দ্বারায় সেইজন্যে অনেক সময় এদের যাদুকর ভাবা হতো। মায়াবী আর শিল্পী এ দুয়ের মধ্যে পরিষ্কার ভেদ অনেক দিন করে নি মানুষ।

ঋষিরা যে সব দেবতার কল্পনা করে গেলেন তাদের মধ্যে ইন্দ্রকেই তাঁরা প্রধান স্থান দিলেন কিন্তু ইন্দ্রের প্রতিমা তাঁরা গড়েন নি ধ্যানমাত্র দিয়েছিলেন। রামায়ণ মহাভারতের সময়েও ইন্দ্রের মূর্ত্তি নাই। রাজার পর রাজা, নরেন্দ্র তাঁরা যথার্থভাবে ইন্দ্রত্ব পাবার জন্য শতাশ্বমেধের আয়োজন করছেন, সেখানে ইন্দ্রের বাহন অশ্ব, এবং ইন্দ্রধ্বজ দুইই পূজা পায় কিন্তু স্বয়ং ইন্দ্রের প্রতিমাটির দেখা নাই। সুমন্ত্রসারথি ইন্দ্রের রথ নিয়ে আসেন নরেন্দ্রের জন্য, ইন্দ্রও আসেন পৃথিবীতে কিন্তু তাঁর রূপ ধরা পড়ে না আর্টিষ্টের কৌশলের মধ্যে! এইভাবে চলতে চলতে একদিন ইন্দ্রপূজা বন্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা আরম্ভ করে দেয় বৃন্দাবনের গোপজাতি, তার পর আসেন আর্য্যেরা গোপজাতির অনুসরণে পূজা দিতে নতুন দেবতাকে। এইভাবে দেখি দুই যুগের দুই দেবতা শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক ইন্দ্রের স্থান পেয়ে বসেছেন। বৈদিক ইন্দ্রের পাশে ইন্দ্রাণীকে দেখিনে, মরুৎগণকে দেখি, কিন্তু রামের পাশে সীতা, শ্যামের পাশে রাধা এও জানাচ্ছে আর্য্য অনার্য্য দুই সভ্যতার পরিণয়ের ইতিহাস।

মূর্ত্তিপূজা এবং প্রতিমাশিল্পের সূত্রপাতেই বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তত্ত্বচিন্তার দিক দিয়ে ভারতবাসীর মন তখন উপনিষদের একেশ্বরবাদ থেকে শূন্যবাদে পৌছে গেছে, কিন্তু শিল্পকলার দিক দিয়ে ভারতবাসী তখন দেখি সবে কাটতে শিখছে পাথর। সেই পুরাতন যুগের বনস্পতি, কল্পতরু, ইন্দ্রধ্বজ, অশ্বমেধের ঘোড়া, সূর্য্যরথের একটি চাকা, এমনি নানা প্রাচীনতম কল্পনা নতুনতরো প্রতীক দিয়ে ধরে চলেছে মানুষ পাথরের স্তুপের গায়ে। সাহিত্যে জাতকের উপাখ্যান সমস্ত বলে চলেছে কোন্ আর্য্যপূর্ব্ব যুগের বনবাসী অবস্থার নানা জন্তুজানোয়ার সমস্তের উপাখ্যান। এই বৌদ্ধযুগে আর্য্যেরা যেন আর একবার পুনরাবৃত্তি করে চলেছে সব দিক দিয়ে সেই পুরাতনী উষার আলো অন্ধকারে ঘেরা অবস্থা, রাবণ রাজার অশোক

বনের স্মৃতি অনেকখানি মায়াদেবীর অশোকতলার মূর্ত্তিখানিতে দেখা গেল, বুদ্ধের কণ্ঠক ঘোড়া ইন্দ্রাদি দেবতা তাকে অনুসরণ করেছেন, ধর্ম্মচক্র সে একচক্র সূর্য্যের আকারে দীপ্তি পাচ্ছে স্তম্ভের উপরে, সাঞ্চি স্তূপের কল্পতরুর ছায়ায় বুদ্ধের চরণচিহ্ন মনে পড়াচ্ছে শ্রীরামের পাদুকা কিম্বা তারও আগেকার বনস্পতির পূজাটি।

নতুন ভাবের নতুন উন্মেষ, নতুন শিল্পের নতুন উন্মেষের লক্ষণ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে বৌদ্ধ-শিল্পের প্রথমাবস্থায়! যূপ-কাষ্ঠ নেই—হয়ে গেছে তারা পাথরের স্তম্ভ একটার পর একটা এবং সেই সব স্তম্ভের শিখরে সিংহ, হস্তী, পশু, পক্ষী যারা আর্য্যেতর অবস্থার দেবতা এবং পরে দেবতার বাহন হয়ে পড়লো তারা শোভা পাচ্ছে যূপে বাঁধা জন্তু। পাথরের সঙ্গে তখন নতুন ভাব করছে শিল্পীরা, কাঠের উপরের কারুকার্য্যের অভ্যাস সম্পূর্ণ ভুলতে পারে নি—চৈত্য বিহার গিরিগুহা সব জায়গাতে এরি ছাপ রাখছে শিল্পীদের হাত। বৈদিক দেবতার ধ্যানের অবশেষ তখনো মনে রয়েছে—ইন্দ্রের বজ্র বৌদ্ধযুগের অলঙ্কার শিল্পে স্থান পাচ্ছে সুগঠিত রূপ পেয়ে, "দ্বা সুপর্ণ" তারা হংসমিথুন হয়ে দ্বারের উপরে উড়ে বসছে, অতি প্রাচীন ঋভুগণের নির্ম্মিত রথের চাকা—ধর্ম্মচক্র এবং চাকা চাকা পদ্ম ফুলের রূপ ধরে নতুন শোভা বিস্তার করছে চৈত্যে বিহারে মঠে প্রাসাদে! মানুষের আর্য্য অবস্থার এবং তারও পূর্ব্বেকার স্মৃতি ও কল্পনা বৌদ্ধ শিল্পের প্রত্যেক পাষাণে আপনাদের ব্যক্ত করে চল্লো, তারপর একদিন বুদ্ধের ধ্যানী প্রতিমা গড়তে সুরু করলে শিল্পীরা। আর্য্যেতর জাতির শিল্প-চেষ্টা এবং আর্য্যজাতির উৎকৃষ্ট চিন্তা এক পরিণয় সূত্রে ধরা পড়লো বুদ্ধ-প্রতিমাতে। এই সময়ে গ্রীকশিল্পী কেউ গান্ধার দেশে বুদ্ধমূর্ত্তি গড়তে চেয়ে ছিল কিন্তু ঠিক্ মূর্ত্তি সঠিক্ প্রতিমা দিতে পারে নি—তারা কাপড় পরা—কুঞ্চিত-কেশ নকল বুদ্ধ দিয়ে গেল, আসল বুদ্ধমূর্ত্তি সম্পূর্ণ অন্যভাবে গড়া হল দেখি—অনুরাধাপুরের অরণ্যে এই বুদ্ধ-প্রতিমা পাওয়া গেল বুদ্ধের নির্ব্বাণের অনেক শত বৎসর পরে বহির্ভারতের এক শিল্পীর গড়া প্রতিমা। সেখানে ঋষি-প্রতিম একটি মহাপুরুষ কোনো সাজসজ্জা না দিয়ে গড়েছেন শিল্পী, চোখভোলানো চাকচিক্য বা সৌন্দর্য্য মোটেই নাই ঐ মূর্ত্তিতে—রূপবান পাথর ধ্যান-নিমগ্ন এইটুকুই দেখালেন শিল্পী—সেই যুগযুগান্তরের আরণ্যক অবস্থার কথা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলে, বৌদ্ধ সভ্যতার চরম ক্ষণে আবার উচ্চারিত হল ভারতের বাহিরে সমুদ্রপারে—"যিনি পর্ব্বতের ন্যায় প্রবৃদ্ধ ও মহান এবং যিনি তেজস্বী"।

বৈদিক কাল থেকে আরম্ভ করে অনেক যুগ ধরে 'অদ্বিতীয় ঈশ্বরের' ধারণাতে পৌঁছেচে যখন মানুষের মন গভীর জ্ঞানের ধারা ধরে, সেই সময় থেকে রসের ধারা ধরে চলতে সুরু করলে শিল্পীদের মানস সারা বৌদ্ধ যুগ অতিক্রম করে অদ্বিতীয় বুদ্ধ মূর্ত্তির ধারণাতে পৌঁছাতে। জ্ঞানীর পথে যেমন নানা জটিল ও বিচিত্র তর্ক বিতর্ক, শিল্পীর পথেও তেমনি নানা কর্ম্মের নানা

রীতি পদ্ধতির বিচিত্রতা গিয়ে মিল্লো একটি কেন্দ্রে; জ্ঞানী বল্লেন বৃক্ষৈব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকঃ, শিল্পী দেখালে—স্তব্ধ মূর্ত্তি!

এই বৌদ্ধযুগে, আর্য্য এবং অন্যত্রও, কুরু এবং পাণ্ডবদের ইতিহাসের আর একবার যেন পুনরাবৃত্তি হতে দেখি বৌদ্ধভিক্ষু এবং ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম সংঘর্ষে, ধর্ম্ম রাজত্বে ইন্দ্রত্ব পাবার জন্য সংগ্রাম, একের জন্যে অনেকের সমাবেশ! ধর্ম্মে একাধিপত্য এবং কর্ম্মে একাধিপত্য এই হ'ল বৌদ্ধযুগের পরের ইতিহাস।

রাজতন্ত্র যেমন, তেমনি ধর্ম্মতন্ত্র শিল্পতন্ত্র সমাজতন্ত্র একই সঙ্গে বিধিবদ্ধ হতে চল্লো শিল্পের দিক দিয়ে। আরণ্যক ঋষিদের তেত্রিশ কোটি দেবতা নতুন করে বিধিবদ্ধ ভাবে গড়ে তোলার কায আরম্ভ হতেই সেই আর্য্যেতর শিল্পীদের মতামত নিয়ে টানা টানি পড়ে গেল—ময়শিল্প মত, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের মত অনুসারে গড়া হয়ে মন্দির চূড়া সমস্ত অরণ্য আর পর্ব্বতের প্রতীক এবং প্রতিমা হয়ে দেখা দিলে—হিন্দু সভ্যতার উৎকর্ষের যুগেও মানুষ পাথরকে পর্ব্বতকে অরণ্যকে ভুলতে পারলে না—ত্রিলোকের প্রতিমা দিয়ে লোকারণ্য হয়ে উঠলো মন্দিরের আগোগোড়া প্রস্তর, কল্পনার রাজ্য ছেড়ে রূপের রাজত্বে বেরিয়ে এল তেত্রিশকোটীর চেয়ে বেশিদিনের পুরোনো সমস্ত দেবতা!

নতুন নতুন দেবতার রূপে, বাহনের রূপে, প্রতীকের ছলে, প্রতিমার বেশে, দেবলোক নেমে এল মর্ত্ত্যলোকের বুকের উপরে। শিল্পীর রচা রূপের পরিখাও দুর্গ প্রাচীর তারি মধ্যে চিরদিনের মতো দেবতা সমস্ত বরাভয় হস্তে স্থির হয়ে বসলেন, শিল্প কৌশলের চমৎকারিতা পরিপূর্ণতা পেয়ে তাবৎ শিল্পকে একটি অদ্বিতীয় স্থান দিতে চল্লো জগতে। এই যুগটাকে ভারত শিল্পে অবতার যুগ বলে ধরতে পারি, আর্য্য অনার্য্য সবাই মিলে কালে কালে যে সব কল্পনার সঞ্চয় কাব্যে সাহিত্যে ধর্ম্মগ্রন্থে জমা করে তুল্লে মানুষ সেই গুলোই রূপ পেয়ে অবতীর্ণ হতে থাকলো কলা কৌশলের রাস্তা ধরে। যা গল্পে কথায়, যা সুরে ও ছন্দে, যা তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় অগোচর ভাবে বর্ত্তমান হচ্ছিল চোখের সাম্‌নে রূপ ধরে দাঁড়ালো চিত্রপটে প্রস্তর ও ধাতু মূর্ত্তিতে নাট্যে নৃত্যে যাত্রায়।

ইন্দ্রের বজ্র সে রূপ ধরে পূজার্হ হয়ে রইলো তিব্বতের শিল্পীদের হাতে, ইন্দ্র রূপ পেলেন ইলোরা গুহার শিল্পীর হাতে, সূর্য্য রূপ পেলেন উড়িষ্যার কারিগরের হাতে, বাংলা রূপ দিলে দেবীগণের, দ্রাবিড় সভ্যতা রূপ দিলে প্রলয় তাণ্ডবের ছন্দকে রূপের বিরাট ঢেউ! ভাব দুয়ে মিলে রূপের রাগ লীলা চল্লো! আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর বাহির দুই গতি মস্ত একটা চক্র সৃষ্টি করলে পৃথিবীর শিল্পীদের জগতে কত উষা কত রাত্রি কত শীত কত শরৎ ও বসন্ত ক্ষণে ক্ষণে আলো ছায়া এবং মায়ার রং বুলিয়ে গেছে এই যুগ যুগ ব্যাপী আমাদের শিল্প চেষ্টার উপরে পাথরে চিত্রে অলঙ্কারে ভূষণে কাপড়ে মন্দিরে দীনের কুটীরে রাজার প্রাসাদে তার লক্ষণ সমস্ত সুস্পষ্ট বিদ্যমান দেখি আজও।

প্রত্নতত্ত্ববিদ তাঁরা যে ভাবে এক একটী রাজবংশের সঙ্গে জড়িয়ে শিল্পের ইতিহাস টুকরো টুকরো ভাবে বিচার করে চলেছেন তাতে করে আর্য্য শিল্পের পরিপূর্ণ রূপটা চোখে পড়তে বিলম্ব হয়। মৌর্য্যশিল্প, গুপ্ত শিল্প, মোগল শিল্প এমনি গোটাকতক ভাগ দেখি, কিন্তু শুধু এই টুকুর মধ্যেই শিল্প বদ্ধ নয়—নদীর একমুখে যেমন অনন্ত প্রস্রবণ, অন্য মুখে যেমন অনন্ত সমুদ্র,—দুটি কূল যা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে যেমন বদ্ধ নয় নদী—তেমনি এই আর্য্য শিল্পের ধারার একমুখ অনার্য্য অবস্থার অদৃশ্য গোপনতার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, আর এক মুখ তার আর্য্য অবস্থার অপার বিস্তারের মধ্যে নিমগ্ন হয়েছে!

সমুদ্রের একটা বিন্দু জল থেকে সমুদ্রের বিরাট প্রসার কিছুই ধরা যায় না, সমুদ্রের জল নীল ও নোণা, মিঠা নয়, এটা এক ফোঁটা থেকেও বোঝা যায়—কিন্তু সমুদ্র কি ব্যাপার তার একটুও ধারণা হয় না একটি ফোঁটা দিয়ে; তেমনি মৌর্য্য বংশাবলীর এতটুকু পাত্রে, কি গুপ্ত রাজ্যের আমলে ধরে দেখলেম ভারত অভারত ব্যাপী বিরাট আর্য্য শিল্পকে—এ যেন ঐরাবতের দেখা সেই ভাবে হল যে ভাবে একদল অন্ধকারে কেউ ঐরাবতের পা, কেউ শুঁড়, কেউ লেজ, কেউ কান ছুঁয়ে ছুঁয়ে বল্লে—ইহার স্তম্ভের আকৃতি, ইহার সর্পের আকৃতি ইহার সূর্পের আকৃতি!

বঙ্গোপসাগরের তীরে মরুভূমির মাঝে কোণার্কের সূর্য্যরথ, এবং বোম্বাই অঞ্চলের একটা সম্পূর্ণ পর্ব্বতকে একটুকরো পাথরের মতো কেটে কৈলাস পতির কৈলাস, এই দুই সীমানাতে আর্য্য শিল্পের চলাচল বন্ধ হল তার পর এসে পৌঁছলো বাইরের একটা নতুন ধারা। এখন সহজেই মনে হয় আর্য্য শিল্পের শেষ করি অস্তমিত সূর্য্যের রথের এবং শূন্য কৈলাসের কাছে! ওদিকে মরুভূমি এদিকে পর্ব্বতকন্দর এ শুধু একটা অধ্যায় শেষ হ'ল শিল্পের ইতিহাসে। মোগল আমলে আর্য্যশিল্পই আবার নতুন রূপ সৃষ্টির সূত্র ধরলে কিন্তু সেই পুরাতন ভারতীয় ভাব বইতে থাকলো মোগল শিল্পের অন্তরে অন্তরে।

দেবতা নয় এবারে নরদেব—'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা'—তাঁর পুরী নির্ম্মানের জন্যে ডাক পড়লো শিল্পীর, মন্দির নয় কিন্তু সমাধি মন্দির। সেই বৌদ্ধযুগের রামায়ণের যুগের কুরুপাণ্ডবের যুগের স্বপ্ন নতুন করে নতুন আকারে ধরা পড়ে গেল শ্বেত পাথরে রক্ত পাথরে নীল যমুনার ধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নতুনতরো ত্রিমূর্ত্তি যার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও কলা কৌশলের কাছে জগতের শিল্পরসিক তারা আর্য্য অনার্য্য নির্ব্বশেষে সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ দিচ্ছে প্রণাম দিচ্ছে আজ!

কলকাতার কাছেই দুটো তিনটে কবর স্থান রয়েছে সেখানে অনেকগুলো নানা আকারের কবর আছে কিন্তু সেগুলো কবরমাত্র—কাগজ-চাপা ঢেলা যে ভাবে থাকে সেই ভাবে মৃতদেহ গুলোকে চেপে রয়েছে পাথর আর ইঁট। কবর গুলো কারো কিম্বা কিছুর প্রতিমা

দেয়না, বলে মাত্র, আমি কবর রূপকে আচ্ছাদন করেছি, রূপকে ফোটাতে আমি নেই—কিন্তু ঐ তাজবিবির কবর কত কবি কত যাত্রী তাকে দেখে মুগ্ধ হল ও বল্লে, একি সুন্দরী একি সুন্দরী। এই বিচিত্ররূপে নানা লোকের কাছে দেখা দিচ্ছে অথচ একটি সে। বহুযুগের সন্ধানে ভারতবাসী শিল্পীরা পেয়ে গেল এই সত্য ভুলবে কেমন করে? তাজমহলের পাথরের রক্ত শ্বেত এবং নদী ও আকাশের নীল এক করে আর্টিষ্ট গোরস্থানের একটা সামান্য কবর গড়ে গেল বল্লে ভুল বলা হয়—অনেকবর্ণের পাথরের ত্রিমূর্ত্তি নতুন ছাঁদে গড়া, শিল্পশাস্ত্রের বাঁধা নিয়মে গড়া নয় কিন্তু রসের আপন নিয়মে গড়া একটি প্রতিমা বলতে পারি একে।

ইউরোপের শিল্পী তারা ভারতবাসী শিল্পীদের মতোই এক যুগে সুবিধা পেলে প্রতিমা গড়ে তোলবার—তাদের ধর্ম্ম তাদের ডাক দিলে যিশুর প্রতিমা গড়ে দিতে—প্রতিমার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধকে যে ভাবে সবার করে দিয়ে গেল ভারতবাসী শিল্পীরা, কই তেমন ভাবে ওরা তো গড়তে পারলে না, নিস্ফল রইলো ওদের চেষ্টা যিশুর প্রতিমার বেলায়! রাজাদের প্রতিমা তাও গড়তে পূর্ব্ব পশ্চিম দুই ভাগ পৃথিবীর যে কেউ শিল্পী তাদের ডাক পড়লো—ভারতবাসী রাম রাজা, রাবণ রাজা, দেবরাজ থেকে আরম্ভ করে রাজরাজেন্দ্র সবি লিখনে রাজদেহের সাদৃশ্য দিলে অথচ ঠিক রাজাটি নয়, রাজশ্রীর প্রতিমা একটি একটি এই দিলে ভারতশিল্পী! কিন্তু সেই রোমক আমল থেকে এ পর্য্যন্ত সমস্ত ইউরোপের রাজাদের ছবি দেখি সেখানে এ রাজা, সে রাজা, কেউ বুড়ো কেউ যুবা, সুন্দর সবাই, সুবেশ সবাই, কিন্তু ঔরঙ্গজেবকে যে ভাবে পাই, সাজাহানকে পাই, জাহাঙ্গীরকে পাই একটা একটা রস মূর্ত্তিতে—সে ভাবে পাই না তো ওদের রাজাদের! রসের প্রকাশ এই বিশ্বসংসার এটা ভারতের আর্য্যশিল্পের কথা, ও-দেশের কথা স্বতন্ত্র—রূপের জয়, দৃষ্টরূপের—মানসরূপের নয়! ইউরোপের শিল্পী এবং ভারতের শিল্পী, একের কাছে অপরে অন্যব্রত বলে পরিচিত হচ্ছে শিল্পের দিক দিয়ে এখনো। এমন একদিন আসবেই যখন এই দুই অন্যব্রত এক হবে, যে ভাবে এক হয়েছিল আর্য্যে অনার্য্যে বহুযুগ পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে। এই যে দুই ভিন্ন পন্থী এক হতে চল্লো এর লক্ষণ আমাদের ঘর বাড়িতে আমাদের বেশভূষায় চারিদিক থেকে ফুটছে, যা দেখে দেখে আমরা সময়ে সময়ে ভয় পেয়ে বলি বুঝি আর্টের সঙ্গে আপনাকেও হারাতে বসেছি আমরা। ঠিক এই কথাই একদিন হয়তো বলেছিলেম আমরা মোগল আমলে এবং তার পূর্ব্বে ও তারো পূর্ব্বে—'পরধর্ম্ম ভয়াবহ' কিন্তু ভয়ের মধ্যে দিয়ে তবে আসে—অভয়রূপ আশীর্ব্বাদ—এই সত্য এখনো দেশের শিল্পীরা সিংহবাহিনী দেবী মূর্ত্তি দিয়ে ঘোষণা করছে, যুগ যুগ আগেও কৃষ্ণবর্ণোদ্ভবা শ্বেতবর্ণা উষা ভারতবাসী আর্য্যশিল্পীদের রচনার মধ্যে দিয়ে ফুটেছে কতবার। রাধা শ্যাম—ভিন্ন এবং এক, গোচররূপ এবং অগোচর রসরূপ দুই মিলে এক—একথা বর্ণে বর্ণে অক্ষরে অক্ষরে সত্য করে তুলেছে আর্য্য এবং অনার্য্য দুয়ে মিলে নিজেদের শিল্পে। ভারতশিল্পের সূত্র হল

এই—রূপের সঙ্গে রূপাতীত এক হয়ে গাঁথা। যুগে যুগে একটি একটি যুগচিহ্ন যা আমাদের শিল্পের ধারা রেখে গেল ফেলে দেশের উপরে তার প্রত্যেকটি এই সূত্র ধরে রইলো। "সবমূরত বীচ অমূরত" মূর্ত্তের সঙ্গে মিলিয়ে রইলো অমূর্ত্ত! গাছের ফুলে হাতের সুতোয় মিলে হল এক গাছি মালা, মনের শিল্পী আর দেব শিল্পী দুয়ের মিলনে হল রসরচনা, এ সব কথা—কবীর, যিনি মুসলমান হয়েও আর্য্য, তিনিও বল্লেন, ঋষি, যিনি আর্য্য হয়েও অনার্য্য, তিনিও বল্লেন।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"শেষ-মুহূর্ত্তে"

(৭)

হিমতুষারদ্রবময়ী খরস্রোতা অমলধবল পবিত্রা জহ্নুকন্যা হরিদ্বারের শোভাবর্দ্ধন করিয়া কলোচ্ছ্বাসে বহিয়া চলিয়াছেন।

গিরিশৃঙ্গের নীচে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। অস্তমেঘ সেই পুণ্যতীর্থের চারিদিকে যেন হোম-শিখার ন্যায় গগনমণ্ডল আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। উপরে সূর্য্যাস্তের পার্ব্বতীয় দেশের শোভা, আর নীচে ভাগীরথীতীরে আরাধনা-নিযুক্ত গৈরিকধারী অসংখ্য সন্ন্যাসী। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ভক্ত সন্ন্যাসীদের হৃদয়োত্থিত স্তোত্রের ঝঙ্কার পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে অনুরণিত হইয়া উঠিতেছিল। সুজাতা মুগ্ধ হৃদয়ে স্খলিত চরণে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিতেছিলেন, দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে—সুজাতা ও তড়িৎ হরিদ্বারে আসিয়াছে। দুই দিনের মধ্যেই তাহাদের ফিরিবার কথা ছিল; কিন্তু চারিদিন হইয়া গিয়াছে তথাপি প্রকৃতির এই নগ্ন-সৌন্দর্য্যের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিতে মন চাহিতেছিল না; আরও কয়েকদিন থাকিয়া তবে তাঁহারা যাইবেন। দিনের আলো ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছিল, হিম-শীতল বাতাস গায়ে যেন তীক্ষ্ণমুখ শলাকার মত বিঁধিতেছিল, দ্বারবান সসম্ভ্রমে জানাইল যে, এখন বাসায় ফিরিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।

"যাচ্ছি" বলিয়া সুজাতা আর একটু অগ্রসর হইলেন। সম্মুখে স্থিরা সৌদামিনীর মত এক সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া বিস্ময়ে তাঁহার গতিশক্তি স্তম্ভিত হইয়া গেল। তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "একি উমা না?"

সুজাতার কথা সন্ন্যাসিনীর কাণে পৌঁছিল। সন্ন্যাসিনী একমনে গঙ্গার দিকে চাহিয়া

বসিয়াছিল। সেও বিস্মিতভাবে সুজাতার দিকে চাহিয়া দেখিল। পর মুহূর্ত্তে তাহার মুখে যেন আনন্দের জ্যোৎস্না তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। "হ্যাঁ দিদি, আমি উমা" বলিয়া সে সুজাতাকে প্রণাম করিল। সুজাতা ব্যথাভরা মমতাপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "একি বেশ, উমা!" উমা তেমনই একটু হাসিয়া কেমন এক বেদনাকাতর কণ্ঠে বলিল, "কেন, এ বেশেরও কি আমি যোগ্যা নহি, দিদি?"

সুজাতা উমার কথায় চমকিয়া উঠিলেন। একি কথা উমার! এই কথাগুলির অন্তরালে রুদ্ধ বেদনার কাতর ক্রন্দন গুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে নাকি? সুজাতা স্নেহ-পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে উমার দিকে চাহিয়া কোমল-কণ্ঠে বলিলেন, "উমা! আমি কি তোমায় এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রে বড় ব্যথা দিয়েছি?"

কথাটা বলিয়া উমা নিজেই নিজের ব্যবহারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। এমন কথা কেন আজ তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল? বহুদিন সে ত কৈ আর কোনও স্মৃতি মনে করে নাই! তবে আজ সুজাতার কাছে তাহার একি দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল—কেন তাহার ব্যথিত হৃদয়ের ক্রন্দন ভাষার আকারে বাহির হইয়া পড়িল! উমা স্নিগ্ধ হাস্যে সহজভাবে বলিল "সে কি দিদি? তোমার কথায় ব্যথা পেলুম, এ তুমি কি ক'রে ব'ল্লে দিদি? আমিই বোধ হয় তোমায় এই 'বেখাপ' কথা ব'লে কষ্ট দিয়েছি। দিদি, মনে কিছু ক'রোনা। আপনার জনকে দেখলে মনটা একটু কেমন হয়ে পড়ে, তাই দু'একটা অসংলগ্ন কথা বেরিয়ে যায়, আর কিছুই নয়" বলিয়া উমা সরল ছেলেমানুষের মত হাসিয়া কথাটা ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। সুজাতা উমার এ ভাবটাকেও সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। নীরবে আন্‌মনে কি ভাবিতে লাগিলেন।

উমা অতি মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সব কেমন আছে দিদি? অনেকদিন ত তোমাদের খবর রাখিনি।"

সুজাতা কিন্তু হাসিয়া উত্তর দিতে পারিলেন না। অন্যমনস্কের মত বলিলেন, "ভাল, কিন্তু এতদিনের মধ্যে আমায় একটা খবর দাওনি কেন, উমা?"

"দিদি!" উমার সে কণ্ঠস্বর সুজাতার হৃদয়কে আবার আহত করিল। তিনি স্বীয় কোমল করপুটে উমার পেলব করতল গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"কেন উমা?"

"সংসারের সঙ্গে সব সম্বন্ধই যে কাটিয়েছি আমি! খবর দেওয়া নেওয়া, সেত আর হয় না দিদি!"

সুজাতা আবেগভরে স্নেহ-পরিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "উমা!"

"দিদি।"

সুজাতা উমার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার করপল্লব আরও একটু চাপিয়া সহানুভূতি

পূর্ণ স্নিগ্ধ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন সংসার ছাড়্লি বল্‌বি বো'ন ?" সুজাতা দেখিলেন যে এই প্রশ্নে উমা যেন একটু শিহরিয়া উঠিল। তারপর করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল, "দিদি, অতীতের স্মৃতি যে মন থেকে মুছে ফেল্‌তে গুরুদেব ব'লেছেন! এখন সে আলোচনায় যে আমার এ ব্রতকে অপমান করা হবে দিদি! ক্ষমা কর। আমি যে সে উমা, তা' ভুলে যাও দিদি!" উমা নীরবে নীচের দিকে চাহিয়া রহিল। সুজাতা বুঝিলেন, উমা তাহার ব্যর্থ-জীবনের কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহে। সে তাহাতে মনে বেদনা পায়। কিন্তু এই তরুণীর জীবনের কোনও সাধ না মিটিতে সে সন্ন্যাসিনীর কঠোর জীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়াছে এই চিন্তা তাহার হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল। যাহার ঔদাসীন্যে এমন একটা জীবন এমনভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহাকে তিনি মনে মনে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। যদি তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হইত তবে নিশ্চয়ই তিনি উমার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিতেন। ভাবিতে ভাবিতে মমতাময়ীর আয়তলোচনে দুই বিন্দু অশ্রু আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "কতদিন এখানে এসেছ উমা ?"

"মাস দুই।"

"তুমি কবে এসেছ দিদি ?"

"আজ চার দিন।"

"তবু এসেছিলে ব'লে দেখা হ'ল।"

"আসার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তড়িতের সঙ্গে শিমলায় এসেছিলুম, আস্‌ছে হপ্তায় ক'লকাতায় যাব। হঠাৎ মনে হ'লো হরিদ্বার দেখে যাই, আবার কবে আসি না আসি, এত কাছে যখন এসেছি, তখন ঘুরে যাওয়াই ভাল। বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা হবে ব'লেই মনের এই অবস্থা হ'য়েছিল, এটা যেন বিধাতা আমার প্রাণের ইচ্ছাটাকে পূরণ ক'রবেন ব'লেই এই ইচ্ছা দিয়েছিলেন। তা'না হ'লেত আজ তোমায় দেখ্‌তে পেতুম না।"

উমা একটু হাসিয়া বলিল, "আমায় দেখ্‌বার জন্যে সত্যিই কি দিদি তোমার মনে কিছু হ'তো ?"

"হ'তো না উমা! তোকে যে আমি বড় ভালবাসি।"

উমা শুধু একবার সুজাতার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। সে হাসি কি ক্রন্দনের রূপান্তর? সুজাতা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। উপরে তখন দশমীর চাঁদ গঙ্গাবক্ষে সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া হাসির লহর তুলিতেছিল। উমার হাস্য কি তাহারই মত মধুর ও হৃদয়-গ্রাহী ?

"দিদি, রাত্রি হ'ল যে, তুমি বাড়ী যাও।"

"যাচ্ছি উমা। তুই কোথায় আছিস ?"

"ঐ যে ঢালু যায়গাটায় একটা কুটীর দেখছো, ঐখানেই আমি মাতাজীর সঙ্গে আছি।"

"মাতাজী কে?"

"আমার এখানকার অভিভাবিকা।"

"ওঃ! তোমার সে গুরুদেব কোথায়?"

"কল্‌কাতায় আছেন।"

"আমি তোমার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলুম, নকুলেশ্বর তলার সে বাড়ীতে তিনি নেই। পাশের বাড়ীর লোকেরা বল্‌লে তাঁরা উঠে অন্য বাড়ীতে গেছেন।"

"না, সেখানে নেই, ঐ কাছাকাছি কোথাও আছেন শুনেছি। উঠি দিদি, আমার ফেরবার সময় হ'য়েছে।"

"কি আর ব'ল্‌বো উমা, এস তবে। কাল ছুপুরেই আমি আশ্রমে এসে তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব।"

উমা পাশের মাটীর জলপূর্ণ কলসীটা কক্ষে তুলিয়া লইবার আগে সুজাতাকে একটী প্রণাম করিল।

সুজাতা ফিরিলে তড়িৎ বলিল, "একি বেড়ান দিদি? এই ঠাণ্ডায় মানুষ কি এত রাত্তির অবধি বাইরে থাকে?"

সুজাতা শান্তস্নিগ্ধ কণ্ঠে কলিলেন, "আজ আমার বেড়ান সার্থক হ'য়েছে।"

"তার মানে!"

"সে অনেক কথা। খাওয়া দাওয়ার পর ব'লব।"

আহারাদি শেষ হইতে অন্যদিন অপেক্ষা আজ রাত্রি একটু বেশী হইল। তড়িৎ তাহার বিছানায় শুইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সার্থক বেড়ানটা কি দিদি?"

"সার্থক নিশ্চয়ই। এখানে যে উমাকে দেখ্‌ব, তাত স্বপ্নেও কল্পনা করিনি।"

"তাঁরা বুঝি তীর্থ ক'র্‌তে এসেছেন?"

"তাঁরা মানে আর কেউ নয়, শুধু উমা।"

"একা তিনি! কি রকম?"

"সে বড় কষ্টের কথা। উমা সন্ন্যাস নিয়ে এখানে বাস ক'রছে।"

"সন্ন্যাস নিয়ে মানে?"

"মানে সংসারের মায়া মোহ পাশ কাটিয়ে ঈশ্বরের ওপর জীবন সঁপে গেরুয়া প'রে দিন কাটাচ্ছে।"

তড়িৎ সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি!"

"হ্যাঁ।"

"কেন ?"

"তা কি ক'রে ব'লব।"

"দিদি ওঁর সমস্ত পরিচয় কি জেনেছ ?"

"না।"

তড়িৎ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। আর কোনও কথা হইল না। পরদিন সুজাতা উমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আহারের পরই বাহির হইলেন। কিন্তু হায়! সুজাতার এ পরিশ্রম বৃথা হইল। সুজাতা গিয়া দেখিলেন, কুটীরে কেহ নাই, কুটীরের দ্বারে একটা তালা দেওয়া। সুজাতা ভাবিলেন যে, কোথাও হয়ত দুইজনে গিয়া থাকিবে, এখনই আসিবে। অনেকক্ষণ সেখানে উমার অপেক্ষায় সুজাতা বসিয়া রহিলেন কিন্তু উমা কি অন্য স্ত্রীলোক ফিরিল না। সন্ধ্যার আগে একজন বৃদ্ধ সন্ধ্যাসী আসিয়া সেই কুটীরের দ্বার খুলিলেন। সুজাতা ত্রস্তভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে যে দুটী স্ত্রীলোক থাকেন, তাঁরা কোথায় গেছেন ?" সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ সুজাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কোথায় গিয়েছেন, তাত আমি জানি না ; তবে মাস কতকের জন্য এই কুটীরে যে ঠাকুর আছেন, তাঁর ভার আমার হাতে মাতাজী দিয়ে গেছেন" বলিয়া সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সুজাতা বুঝিলেন উমা তাহার সঙ্গ এড়াইতে চাহে, তাই সে পলাইয়াছে। সুজাতা বড় জোড়ে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে কোন রকমে টানিয়া লইয়া বাসার দিকে রওনা হইলেন।

(৮)

"অনেকদিন পরে আপনার পায়ের ধূলো এ বাড়ীতে দিলেন।"

"হ্যাঁ মা।"

"আপনার খোঁজ আমি অনেক ক'রেছি কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইনি।"

"কি ক'রে পাবে, মা, তার ইচ্ছাতেই যে আমি লুকিয়েছিলুম।"

"কেন ?"

"আজ সব বল্‌তেই এসেছি" বলিয়া উমার গুরুদেব একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

সুজাতা উৎসুক হইয়া আগ্রহসহকারে উমার গুরুদেবের মুখের প্রতি চাহিলেন।

"মা, উমা তোমায় তার জীবনের কোন কথাই বোধহয় বলেনি ?"

সুজাতা বলিলেন "না, কোন কথাই আমায় বলে নি। উমা কোথায় ? সেই হরিদ্বারেই ?"

"না।"

"তবে ?"

"আমার কাছেই।"

"তা' হ'লে—"

"ব্যস্ত হ'য়োনা মা, স্থির হ'য়ে শোন।"

"উমা আমার মেয়ের চেয়েও বেশী স্নেহের পাত্রী" বলিয়া গুরুদেব আর একটী নিশ্বাস ফেলিলেন। "উমার দশ বছর বয়সে বিবাহ হয়, কিন্তু তার স্বামী তাকে পছন্দ করলেন না; কারণ সে ছোট, অশিক্ষিত ব'লে। মায়ের পছন্দে ধিক্কার দিয়ে তাকে এক মাসের মধ্যে ত্যাগ ক'রে, এক বন্ধুর শিক্ষিতা, হালফ্যাসানের বোনকে বিয়ে ক'রে বিলাত যাত্রা ক'রলেন। তারপর আর কোন সম্বন্ধই কারো সঙ্গে কারও রইল না। কেউ কাউকে চেনেও না, খোঁজও রাখেনা,—যে যা'র পথে চল্‌তে লাগল।"

সুজাতা চমকিয়া উঠিলেন, তাহার দৃষ্টিপথ হইতে একটা পর্দ্দা সরিয়া গেল, তিনি কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, আর শুন্‌তে চাইনে, সব বুঝেছি।"

"কিছুই শোননি মা, বুঝতে হয়ত পেরেছ; কিন্তু তা'র ইচ্ছায় আজ আমি তোমার কাছে সব বল্‌তে এসেছি। কারণ সে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলো তোমায় তার সব কথা ব'ল্‌বে ব'লে।"

কি দুর্দ্দৈব! কেন তিনি এতদিন বুঝিতে পারেন নাই? এ সন্দেহ তাঁহার মনে আসা উচিত ছিল। কিন্তু বুঝিতে পারিলেই বা প্রতীকারের উপায় কিছু ছিল কি? তবু তবু—

সুজাতা প্রস্তরমূর্ত্তির মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন, "তারপর উমা তা'র অধ্যবসায়ের দ্বারা ইংরাজি থেকে সংস্কৃত পর্য্যন্ত মন দিয়ে শেখে। শুধু শেখা নয়, যাতে লোকে বিদুষীর মধ্যে তুলনা করে, সেই রকম শেখা শেখে। তার রচনা অনেক মাসিকপত্রে বেরিয়েছে এবং সে সব লেখা লোক আগ্রহসহকারেই পড়ে। আর কত গুণ যে তার, তা, আমি ব'লে শেষ ক'র্‌তে পারি না, মা। তার সামান্য সাহচর্য্যেই বোধ হয় তুমি তা' টের পেয়েছ। যাক, বাপের ভিটা ও শ্বশুর বাড়ীর পৈতৃক ভিটা দেখবার জন্য সে তোমাদের দেশে এসেছিল। তারপর নদীতে ডোবা, কর্ম্মসূত্রে তোমাদের সঙ্গে মিলন। তারপর বালিগঞ্জে তুমি এসে তা'কে নিয়ে এলে। এই আনাই তা'র কাল হ'লো। বাড়ীর কে একজন বুড়ো ঝির কাছে সে তোমার বাপের বাড়ীর সব পরিচয় ভাল ক'রে নেয়। তোমার ভাই যে তার স্বামী, সে তা' বুঝতে পারে। তারপর তোমার মার মৃত্যুর পরেও তাঁর যে ঘর তোমরা সাজিয়ে রেখেছ, সে ঘরে ওর বিয়ের সময়ের এক খানা ফটো এখনও বাঁধান আছে। সেখানিও সে দেখ্‌তে পায়। এই সব নানা কারণে ওর মন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে, তাই তোমার কাছ হ'তে পালিয়ে আসে। কিন্তু অত সহিষ্ণু, ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি মেয়ে আমার একেবারে অধীর হ'য়ে প'ড়ল। আজীবন

রুদ্ধ পতিপ্রেম তার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কোন মতেই সে আর তাহা রোধ করতে পারে না। তারপর সে ইচ্ছা করেই এ-বন্যায় বাঁধ দিতে গেল সন্ন্যাস নিয়ে। কিন্তু হায় মা। তার সে তরুণ পল্লবিত হৃদয়কে সে কিছুতেই রাখতে পারলে না। হয়ত পারত, হয়ত ভুলে যেত, ক্রমে ভরা গাঙ্গে ভাঁটা আরম্ভ হত, যদি আবার তোমার সঙ্গে তার হরিদ্বারে দেখা না হ'তো।" গুরুদেব কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "বড় চাপা মেয়ে, নীরবে সে তার সব যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল। কখনও তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়েনি, কিন্তু হৃদয়কে সে ক্ষতবিক্ষত ক'রে গভীর খাদে পরিণত ক'রে ফেললে। কঠোর সন্ন্যাস-জীবন, তার হৃদয়ে আগুন,— আর কতক্ষণ শরীর বয়! তাই আজ মৃত্যু তার সকাতর আহ্বানে শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তরীয়ের প্রান্তভাগদ্বারা সজল নেত্রযুগল মার্জ্জনা করিলেন।

সুজাতা যন্ত্রণাকাতরকণ্ঠে বলিলেন, "উমা মৃত্যুশয্যায়! একবার দেখান আমাকে। আমি তার কাছে মা'র হ'য়ে ক্ষমা চেয়ে নিই।"

স্থির কণ্ঠে গুরুদেব বলিলেন, "মা, তার জীবন অপরাহ্ণের একটী আশা পূরণ করবে?"

"বলুন, যেমন করে পারি, তার আশা পূরণ করবো।" সুজাতা মুখে চোখে কেমন এক অধীরতা প্রকাশ করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ধীরে ধীরে গুরুদেব বলিলেন, "সে একবার তড়িৎকে দেখতে চায়।"

"তড়িৎকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। বসুন, আমি গাড়ী আনতে বলি।"

"না, আমি চললুম। তুমি তড়িৎকে নিয়ে এস; আমি এখন উমাকে নিয়ে তার পিতার বাড়ী অর্থাৎ তার বাড়ীতেই আছি—বেথুন কলেজের সামনেই।"

কোর্ট হইতে আসিয়া তড়িৎ সবে খাবার খাইতে বসিয়াছে, সুজাতা ঝড়ের মত বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক নিশ্বাসে বলিলেন, "তড়িৎ, শীগগির খেয়ে নাও, উমা নাকি মৃত্যুশয্যায়। আমাদের দেখতে চেয়েছে, এখনই যেতে হবে।"

তড়িৎ খাবারের ডিসটা ঠেলিয়া দিল। চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত মুছিতে মুছিতে বলিল, "চল।"

নীলিমা ব্যস্তভাবে বলিল, "ওকি মুখের খাবারটা খেয়ে যাও।"

তড়িৎ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "একটা মানুষ মরছে, আর আমি বসে খাবার খেয়ে নিয়ে তবে তার সঙ্গে দেখা করব। যদি না দেখতে পাই?"

সুজাতা ও তড়িৎ যখন সিঁড়িতে নামিয়াছে, জোর পায় নীলিমা সেখানে আসিয়া বলিল, "আমি চটিটা বদলে এখনই আসছি, তোমরা আমায় না নিয়ে যেওনা।"

তড়িৎ বলিল, "শীগ্‌গির, মোটে দেরী করো না।"

সুজাতার বুকটা একটু কাঁপিয়া উঠিল। তার পর কোমলস্বরে বলিল "না নীলা, সেখানে তোমার গিয়ে কাজ নেই, ছেলেপুলের মা।"

সুজাতার কথায় বাধা দিয়া নীলিমা বলিল, "আপনাদের সকলের মুখে শুধু তাঁর প্রশংসাই শুন্‌ছি; তাঁকে একটু দেখে আসি।"

সুজাতা দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, সেখানে তোমার যাওয়া চলেনা।"

নীলিমার অভিমান হইল। সে ঘরের দিকে ফিরিয়া গেল; কাহারও বড় কথা সে সহ্য করিতে পরিত না। সুজাতা ও তড়িৎ যখন গুরুদেবের সঙ্গে উমার ঘরের নিকট উপস্থিত হইল, সুজাতা তখন মৃদুস্বরে তড়িৎকে বলিলেন, "তড়িৎ! আমার আজকের অনুরোধটুকু তুমি রেখে দিদিকে যে ভালবাস, তার পরিচয় দাও ভাই!" তড়িৎ অনুযোগের সঙ্গে বলিল, " ভালবাসি কিনা তার পরিচয় আজকে দিতে হবে, এ কি কথা দিদি?"

" হ্যাঁ তড়িৎ আজকেই বুঝব যে, সত্যি তুমি আমার মায়ের পেটের উপযুক্ত ভাই?"

" আঃ! কি বলই না দিদি?"

" কি তবে শোন—

এমন সময় গুরুদেব ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এস মা! উমা তোমাদের জন্য বড় ব্যস্ত হ'য়েছে।"

সুজাতা তড়িৎকে ইঙ্গিতে আশ্বাস দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তড়িৎ দিদির প্রস্তাব শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুধু নিজের মনের মধ্যে নানা প্রকার আলোচনা করিতে লাগিল।

একখানা ছোট খাটের উপর শুভ্র শয্যায় উমার রোগশীর্ণ দেহলতা এলাইয়া ছিল। সুজাতা তাহাকে দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি তাহার মাথার কাছে গিয়া বসিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "উমা, একেবারে শেষ সময় আমাদের ডেকে আন্‌লি?" আর কোন কথা সুজাতার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না। শুধু গুহানির্গত জাহ্নবীধারার ন্যায় অশ্রু প্রবাহ উমার ধৃত হস্ত সিক্ত করিতে লাগিল। উমা সম্মুখের প্রাচীরের দিকে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

একটু পরে সুজাতা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিলেন, "উমা, আর দুদিন আগে কেন বলিস্‌নি?"

ধীর অথচ ম্লানকণ্ঠে উমা উত্তর দিল, " সে অদৃষ্ট ত আমি করিনি দিদি! ওঃ। বড় ব্যথা, বাবা!" উমা বুকে হাত দিয়া একটা অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িল।

উমার গুরুদেব "মা মা" বলিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া বেদনা স্থলে মালিশ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে খানিকটা রক্ত যখন উমার মুখ দিয়া উঠিয়া তাহার যন্ত্রণার

আশু উপশম করিল, তখন উমা একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া একটু সুস্থ হইয়া করুণ-হাস্যে বলিল, "দিদি, আমার প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছি ত ?"

"উমা, আমায় কষ্ট দিতে কি তোর ভাল লাগ্‌ছে ?"

"না দিদি, তোমায় আমি কষ্ট দিয়ে ত কোন সুখ পাব না। তোমাদের হাসি মুখের আশীর্ব্বাদ নেব ব'লেই ত আজ আনিয়েছি। তোমাদের আশীর্ব্বাদই যে আমার এই পথের পাথেয় ক'রে নিয়ে যাব! দিদি, আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রবে ত তোমরা ?"

দরজার শব্দে সুজাতা দেখিলেন তড়িৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। চকিতে সুজাতা উঠিয়া তড়িতের হাত ধরিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তবে যাও, তড়িৎ! তা'র আগে কোথায় যাচ্ছ? সাধ্বীর কাছে ক্ষমা চাও, নইলে কত বড় অভিশপ্ত জীবন যে তোমায় বইতে হবে, তা কি বুঝ্‌ছ না ?" বলিয়া প্রায় মূহ্যমান তড়িৎকে এক রকম টানিয়া লইয়া সুজাতা তাহাকে উমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড় করাইলেন। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "চেয়ে দ্যাখ্‌, তড়িৎ এ কে? কি করে একটা নারী-জীবন ব্যর্থ ক'রে দিইছিস্‌! কিন্তু তবু তোর কাছে অপমানিতা, অনাদৃতা এই নারী—তোর স্ত্রী—আজ তোর জন্যেই নিজের হৃদয়ের সঙ্গে যুঝে মরণের মুখে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা চাইছে! চিরদিনের অনাদৃতাকে আজ দুটো মুখের কথায় সান্ত্বনা দিয়ে কিছু প্রায়শ্চিত্ত কর্‌। তার 'শেষ মুহূর্ত্তে'—"

"মা, চুপ! আর নয়। উমা, মা আমার! চেয়ে দেখ, তোমার স্বামীর চোখে জল পড়্‌ছে! উমা! উমা!"

"বাবা!"

"এই যে মা!"

"দিদি!"

"উমা, বোন!"

"কৈ তিনি? আমায় আশীর্ব্বাদ করুতে বল, আর আমার এই দুর্ব্বলতার জন্য ক্ষমা করুতে বল। এই শেষ মুহূর্ত্তে তোমাদের বিরক্ত ক'রে যাচ্ছি; কিন্তু এ সাহস শুধু তোমার ভালবাসার জন্যেই হ'য়েছে দিদি! ক্ষমা—ক্ষমা কর।"

সুজাতা ভৎর্সনাপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "তড়িৎ।"

তড়িৎ উমার শয্যাপার্শ্বে সংজ্ঞাহীনের মত 'কাঠ' হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সমস্ত ভাবনা চিন্তা তাহার মস্তিষ্ক হইতে তখন যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উপলব্ধির ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত তাহার ছিল না। শুধু এই মাত্র অনুভূতি তাহার সমগ্র ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করিয়া দিল যে, আজ তাহার জীবনের একটা প্রলয়ের দিন আসিয়াছে। সুজাতার ভৎর্সনায় তড়িতের

মানসনয়নে অনেক দিনের ক্ষীণচ্ছায়া একটা ঘটনার আভাষ অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে উমার সহিত তাহার সম্বন্ধ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অমনই যেন প্রচণ্ড অনুশোচনার ভীষণ আঘাতে তাহার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় ব্যথিত. ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার তীব্র দাহ দাবানলের মত ভীমতেজে তাহার হৃদয় ও মনকে এক মুহূর্ত্তে জর্জ্জরিত করিয়া দিল। প্রথম যৌবনের অপরিণত বুদ্ধি ও খেয়ালের বশে সে মানব-জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছিল—কি পাষণ্ড সে।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সহোদরার দিকে চাহিয়া তড়িৎ বলিয়া উঠিল, "যদি জেনেছিলে তবে আগে বলনি কেন? এই কি আমাদের মিলন?"

সুজাতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, এই ত মিলন। জীবনের প্রাক্কালে, ও এসেছিল তোমার কাছে; আবার জীবনের 'শেষ মুহূর্ত্তে' ও তোমার কাছে এসেছে।"

তড়িৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিল "ঠিক, ঠিক—এই ত মিলন।" তারপর তড়িৎ সন্তর্পণে উমার রুক্ষ কেশমণ্ডিত মাথাটি কোলের উপর রাখিয়া আকুল কণ্ঠে বলিল, "উমা, উমা!

"তড়িৎ বাবু! দেখুন—দেখুন"—বলিয়া যখন গুরুদেব জান্‌লার কাছ হইতে ছুটিয়া আসিলেন, তখন উমার চক্ষু স্থির, কিন্তু মুখে এক অজানিত আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওষ্ঠযুগল মৃদু মৃদু স্পন্দিত হইতেছে, যেন কত কি কথাই সে বলিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ গুরুদেব আকুলকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন "মা, তোর উমা নাম সার্থক! তপস্বিনী উমা আমার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ক'রে এ বুড়োকে মা হারা ক'রে চ'লে গেলি!"

ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া সুধীর ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, "আঃ! এত গোল ক'র্‌ছেন কেন বাবা?" তারপর ডাক্তারবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু, দেখুন।"

ডাক্তার পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এ কি! শেষ হ'য়ে গেছে!"

তড়িৎ পাগলের মত অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চাহিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "না, শান্তিতে ঘুমুচ্ছে।"

শ্রীআভাময়ী রায়চৌধুরাণী

সবুজ পাতাগুলি

অদূরে ধীর বায়ে উজল রোদ মেখে
অশথ-পাতাগুলি দুলিছে থেকে থেকে,
সবুজ পাতাগুলি
করিছে কোলাকুলি—
চপল ভাইগুলি যেন রে নেচে নেচে
এ ওরে ভালবাসে কত না যেচে যেচে।
পাতার দোলাদুলি
দিল রে প্রাণে তুলি'
গোপন কোন্ বাণী প্রকৃতি-প্রাণ হতে,
কি যেন দূর কথা এল রে ভাব-স্রোতে।
এই যে আমি চলি,
হাসি, ও খেলি, বলি,
এই যে মোর মাঝে প্রাণের মাতামাতি—
এই এ ছোট প্রাণ
মহতো মহীয়ান্
সবার পিছে রহে তৃণে ও ধূলাসাথী।
ফুল যে হাসে, ফোটে,
তরু যে ঠেলে ওঠে,
তৃণ যে দোলে, নাচে, পাতারা করে খেলা,
এক সে একই প্রাণ
বিকাশে অফুরাণ
মানুষে জীবে তৃণে তাহারি লীলা মেলা।
অশথ-পাতাগুলি
করিছে কোলাকুলি,
দোলে রে দোলে তারা, পরাণে দেয় দোলা ;
আজিকে প্রাণে মনে
শোণিত-গতি সনে
ও দোলা মিশে দোলে, বুঝি তা ভাব-ভোলা।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

হিন্দু-মোসলেম প্যাক্ট

বঙ্গবাণী-সম্পাদক মহাশয়,

আপনি ত হুকুম দিয়ে গেলেন আমাকে বঙ্গবাণীর জন্য একটা প্রবন্ধ যা হোক কোরে খাড়া করতেই হবে; কিন্তু আপাততঃ দেখতে পাচ্ছি বীণাপাণির সেবা করার চেয়ে গদাপাণির সেবা করাই বেশী দরকার। প্রাণে যদি বাঁচি ত সাহিত্য-চর্চ্চাটা দু'দিন পরেও হতে পারবে।

দেখেই ত গেছেন আমার বাড়ীটী একেবারে মুসলমান বস্তির মাঝখানে। এ কথাটার অর্থ যে কি তা আর এই দুর্দ্দিনে স্পষ্ট কোরে না বললেও চলবে। বস্তিতে যারা বাস করে তারা প্রায় সবাই রাজমিস্ত্রী অথবা মজুর। দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্যে এদের কাজকর্ম্ম প্রায় বন্ধ; তবে সন্ধ্যার পর দেখতে পাই, সবাই লাঠি বা মশাল তৈরি করছে, কিম্বা ছুরি ছোরা শাণাচ্ছে। সেদিন লাঠি তৈরি করবার সময় এদের নানা রকম খোসগল্প হচ্ছিল। ভগলু সব চেয়ে প্রাচীন। সে বল্লে—"আরে না, না; কাবুল আসতে পারবে না; ইংরেজ তাকে রুখে ফেলবে। তা ছাড়া কাবুল অনেক দূরে যে!" করিম বয়সে ছোট। সে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, নিজামের ফৌজ আসবে, শুনিছি যে। নিজাম এলেই হবে। তারপর হিন্দুদের একবার দেখে নেব।"

বস্তির ভিতর এই সব উচ্চ অঙ্গের রাজনীতির চর্চ্চা শুনে আমার কাণ খাড়া হয়ে উঠলো।

রেজাক একখানা ছোরায় শাণ দিচ্ছিল। সে বল্লে—'এই ইংরেজ শালারা যদি না থাকত, তা হলে সব বেটা হিঁদুকে ধরে গোরু খাইয়ে দিতুম।' বুড়ী ফুলজানি এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। হিঁদুদের গোরু খাওয়ানতে তার একটু আপত্তি দেখা গেল। বেচারা বোধ হয় ভাবলে যে সত্যি সত্যিই যদি এতগুলো মদ্দ পুরুষ হিঁদুদের গরু খাওয়াতে আরম্ভ করে, তাহলে গরু রাঁধতে রাঁধতে তাকে হায়রাণ হতে হবে। সে আস্তে আস্তে একটু প্রতিবাদ করে বল্লে—'আচ্ছা, গরু খেলেই যে মুসলমান হবে তার মানে কি? খৃষ্টানও ত হয়ে যেতে পারে!'

ভগলু তার জবাব দিলে। দেখলুম লোকটী শুধু প্রাচীন নয়, ধার্ম্মিকও বটে! সে বল্লে—"গরু খাওয়াবার আগে কলমা পড়িয়ে নিতে হবে।" করিম খুব খুসী হয়ে উঠলো। বল্লে—"ঠিক বলেছ বড় মিঞা; গরু খাবার পর বেটারা হয়ত গোবর খেয়ে পেরাচিত্তির করবে। কিন্তু কলমার আর কাটান নেই।"

লাঠি আর ছোরার সাহায্যে যারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের সংকল্প করছিল, তাদের সকলকেই আমি অনেকদিন থেকে চিনি। তারা কেউ লোক মন্দ নয়। সবাই আমার বাড়ীতে রাজমিস্ত্রীর কাজ করেছে। বুড়ী ফুলজানি আমার ছেলের অসুখের সময় নানা জায়গা

খোঁজ করে ছাগল দুধের জোগাড় করে দিয়েছে। ভগলু আমার একখানা বিশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়ে নিজে সেধে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। ফুলজানির এক বিধবা বোন হজ্জ করতে যাবার সময় তার সারা জীবনের সঞ্চিত ৪২৫৲ টাকা আমারই কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল। তখন তাদের কারও মনে পড়েনি যে আমি হিঁদু, সুতরাং কাফের। তারা যখন বেহেস্তে যাবে, তখন আমার সঙ্গে তাদের দেখা শুনা হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আজ দাঙ্গা হাঙ্গামার পর মৌলভী সাহেব এসে তাদের সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেছে; আর তারা সর্ব্ব কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে ছোরা ছুরি শাণাতে লেগে গেছে। এখন শুধু একবার নিজামের ফৌজ এসে পড়লেই হয়!

নিজামের ফৌজ আসবার আগে ইংরেজের ফৌজ এসে পড়বার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু একদিন গভীর রাত্রে এরা যদি স্বপ্ন দেখে যে নিজাম বাহাদুর এসে হাজির হয়েছেন, আর ঘুমের ঘোরে এরা যদি ছুরি, ছোরা, মশাল, শাবল নিয়ে ধর্ম্মপ্রচার করতে বেরিয়ে পড়ে, তাহলে হয়ত এই কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আগামী মাস থেকে সৈয়দ মোহম্মদ ঘেঁচুউদ্দীন বা ঐ রকম একটা কিছু হয়ে যেতে হবে। তাতে বেশী দুঃখ নেই; দুঃখ শুধু এই যে জাতও যাবে, আর পেটও ভরবে না। নবাবী আমল হলে হয়ত নাম বদলানর সঙ্গে সঙ্গে কালিয়া পোলাও কাবাবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে যেতে পারতো; কিন্তু আজকাল ত সে দিন নেই। কিন্তু আমার নিজের দুর্গতি যাই হোক, এ কথা যখন ভাবি যে দু-তিন পুরুষ পরে আমারই বংশধরেরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফার্সিতে প্রমাণ করতে লেগে যাবে যে তাদের কোন্ এক পূর্ব্বপুরুষ নাদির সার সঙ্গে খোরাসান থেকে ভারতবিজয় করতে এসেছিলেন, যখন ভাবি যে হারুণ-উল-রশিদের নাম শুনে তাদের জিভ দিয়ে জল পড়বে, খলিফার দুঃখে তাদের ঘুম হবে না, 'শাতিল আরব' স্বাধীন করবার খেয়ালে তারা নিজেদের দেশের পরাধীনতা ভুলে যাবে, আর আমার ভায়েদের বংশধরদের কাফের মনে করে তারা নাক সিঁট্‌কাবে—তখন হেসে আর বাঁচিনে। তারা হয়ত বল্‌বে যে বাংলা তাদের মাতৃভাষাও নয়, পিতৃভাষাও নয়, চৌদ্দ পুরুষের কারও ভাষাই নয়; আর আঠারটা বোতাম লাগান আংরাখা আর চুড়িদার পাজামার উপর প্রকাণ্ড একটা তুর্কি ফেজ উঠিয়ে প্রতিপন্ন করে দেবে যে বিশুদ্ধ আরবী বা তুর্কি রক্ত ছাড়া এক ফোঁটাও বাজে রক্ত তাদের শরীরে নেই!

এই সব ভেবে চিন্তে সে রাত্রে ত আর ঘুম হলো না। তার পর দিন তাড়াতাড়ি উঠে কংগ্রেস আফিসে খবর দিলুম। কংগ্রেসী কর্ত্তারা আশ্বাস দিলেন—'কিচ্ছু ভয় নেই; তাঁরা সব ঠিক করে দেবেন।' দন্তবিচ্ছেদ করে তাঁদের ধন্যবাদ দিলুম বটে, কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগলো। কি জানি, বাবা, তাঁরা সব ঠিক করতে করতে এ দিকে সগোষ্ঠী আমি না ঠিক হয়ে যাই! কিন্তু না, কর্ত্তারা তাঁদের কথা ঠিক রেখেছেন দেখলুম। তাঁরা একটা

মৌলভীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মুসলমান ভ্রাতাদের শান্ত করতে। মৌলভী সাহেবটী ধার্ম্মিক লোক; হজ করে ফিরে এসেছেন; তা ছাড়া সুন্নতের জোরে একটা স্বরাজী কারবারে একটী বড় চাকরীও জোগাড় করেছেন। সুতরাং ভাবলুম তিনি ধর্ম্মের খাতিরেই হোক, আর চাকরীর খাতিরেই হোক, ছোরা, ছুরি, মশালের একটা মীমাংসা করে দিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি মোটরে চড়ে বস্তির চারদিকে বার দুই ঘুর পাক খেয়ে কোথায় যে সরে পড়লেন তার সন্ধান পেলুম না।

এ তো মহা বেগতিক! তা হলে কি এই বুড়ো বয়সে কাছা খুলে কলমা পড়তে হবে না কি? হয় ত বা তারও সময় থাকবে না, আগেই অগ্নিপক্ক হয়ে যেতে হবে।

ভাবতে ভাবতে প্রায় কাহিল হয়ে পড়বার জোগাড় হয়েছি, এমন সময় আমাদের পল্টু এসে উপস্থিত। হাতে একগাছি খেঁটে লাঠি, পরণে খাকির হাফ প্যান্ট। আমি বললুম—'পল্টু, এই খিলাফৎ কোম্পানীর জ্বালায় যে রাত্রে ঘুমুবার জো নেই, তার কি ব্যবস্থা করি বল্ দেখি। এরা যে ক্রমাগত লাঠি তৈরি করছে আর ছোরা শাণাচ্ছে—দেখে ত আমার হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে গেছে। নেতারাও হার মেনে গেছে, পুলিসেও হার মেনে গেছে। এখন তোরা যদি কিছু না করতে পারিস ত এ দেশ ছেড়ে ত পালাতে হয়।"

পল্টু একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—'আপনি প্যাক্ট চালাবার বন্দোবস্ত করছেন না কেন?'

আমার পিত্তি জ্বলে গেল। বল্লুম—"রক্ষে কর, বাবা; তোমাদের প্যাক্টের ফলেই এরা আস্কারা পেয়ে গেছে। ভাবছে, গায়ের জোরে যা খুসি তাই করবে। আজ বলছে শতকরা ৮০টা চাকরী আমাদের চাই, কাল হয় ত বলে বসবে শতকরা ৮০টা হিঁদুর মেয়ে আমাদের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। নইলে আমরা তোমাদের সঙ্গে ভোট দেব না।"

পল্টু একটু হেসে বল্লে—"প্যাক্টের সবদিকটা আপনি ভেবে দেখেন নি, দেখছি। আসল প্যাক্টটা হচ্ছে সর্ব্বতোমুখী। সব বিষয়েই ওদের বেশী ভাগ দিতে হবে, তা না হলে বনিবনাও হবে না, এ কথা ত আমরা মেনেই নিয়েছি। এখন না বল্লে চলবে কেন? আমাদের মন্দির যদি ২০টা ভাঙ্গে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ৮০টা মসজিদ ভেঙ্গে পড়া চাই, আমাদের যদি ২০টা জখম হয় তাহলে ওদের জখম হওয়া চাই ৮০টা। তা না হলে ওদের ভাগে কম পড়বে; আর প্যাক্ট রক্ষা করা হলো না ভেবে ওরা চোটে যাবে। কিন্তু ওদের হিসাব যেমনি ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দেবেন, অমনি ধাঁ করে মিল হয়ে যাবে।"

পল্টুর কথা শুনে আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। বল্লুম—'এ সব কি সর্ব্বনেশে কথা বলছিস, পল্টু? এতে যে মারধোর বেড়েই চল্‌বে।'

পল্টু বল্লে—"আজ্ঞে না; প্যাক্টের উপর আপনার শ্রদ্ধা নেই বলেই আপনি ভয় পাচ্ছেন। বিশ্বাস না হয়, হাতে হাতে আপনাকে ফল দেখিয়ে দিচ্ছি।"

পণ্টু লাঠি নিয়ে বস্তির ভিতর ঢুকে পড়ল। আমার ভয় করতে লাগল, পাছে গোঁয়ার ছেলেটা না একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে!

আধ ঘণ্টা পরে যখন পণ্টু ফিরে এল, আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—'কি পণ্টু, কি করে এলি?'

পণ্টু বল্‌লে—'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারেন। আমি করিম মিঞাকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে বস্তি ছেড়ে লাঠালাঠি করতে বের হলে, ফিরে এসে আর বস্তি দেখতে পাবে না। করিম বুদ্ধিমান লোক, ইঙ্গিতেই বুঝে নিয়েছে যে আমরা প্যাক্ট-পন্থী।'

* * *

তার পর থেকে নিজামের ফৌজ কত দূর এল, সে সংবাদ আর পাই নি!

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব-বীমা*

ভারতবাসীর মাথার ঘি

আমার কথা অতি সামান্য আর বলবার জিনিষও মাত্র একটী। ডাইনে বাঁয়ে, ঝালে ঝোলে, অম্বলে যেদিকে যাই, ঘুরতে ফিরতে, সামনে পিছনে সেই এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছি। যদি কেহ আমাকে গভীর দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে বলেন আর সে বিষয়ে আমার যদি কোনো দখল থাকে তা'হলেও ঠেকতে ঠেকতে সেখানে গিয়েই পৌঁছব।

কথাটা এই, আমরা আজকাল আছি কোথায়? আমাদের দেশটা ঠিক্ কোন্ অবস্থায় রয়েছে? এটা জরিপ করা আমার ব্যবসা। এইজন্য আমাদের দেশের লোকের মাথাটা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টাও জরিপ করা আমার কাজ। মাথার বাহির দিকটা মাপা যায়, আর ভিতরটাও মাপা যায়। মাথার বাহির নিয়ে কারবার সাধারণতঃ আমি করি না। ভিতরটাতে, মগজের মধ্যে ঘি কতটা আছে, আমাদের মাথায় কতটা আছে, আর ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, মার্কিণ এদের মাথায়ই বা কতটা আছে, এই সব মাপাজোপা আর তুলনা করা আমার পেশার অন্তর্গত।

মাঝে মাঝে অতীতের কথাও বলে থাকি, সেকেলে গ্রীস, রোম, চীন, ভারত, পারস্য ইত্যাদি নানাদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকি। তাতেও প্রশ্ন একই। গ্রীকই হউক,

* জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত অন্যতম বাংলা বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড বিবরণ। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী শর্টহ্যাণ্ড লইয়াছিলেন।

হিন্দুই হউক, খৃষ্টানই হউক আর মুসলমানই হউক তাদের মাথায় ঘি কতটা ছিল? তা মাপবার জন্য কতকগুলি বিশেষ্য বিশেষণ ব্যবহার করা আমার রেওয়াজ নয়, রেওয়াজ কতকগুলি বস্তু আবিষ্কার করা আর তার সাহায্যে মাথার ভিতরকার ঘি ও সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টা পাকড়াও করবার কৌশল উদ্ভাবন করা। এ হচ্চে আমার একমাত্র আলোচনার বিষয়।

অতীতই হউক আর বর্ত্তমানই হউক এই ঘি মাপামাপির কারবারে লক্ষ্য আমার বাঁধা। কি তত্ত্ব হিসাবে, কি আলোচনা-প্রণালী হিসাবে, সকল হিসাবেই আমার একমাত্র ধ্যেয়—ভারতবর্ষ।

বর্ত্তমান জগতের নানা স্তর

সেদিন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কথা বল্‌তে গিয়ে বর্ত্তমান যুগটাকে আমি ৪ ভাগে ভাগ করেছি:—(১) ১৮৪৮—৭৫ খ্রীঃ (২) ১৮৭৫—৯৪ খ্রীঃ (৩) ১৮৯৪—১৯০৫ খ্রীঃ (৪) ১৯০৫—২৫ খ্রীঃ। দেখতে হবে আমরা এখন এর কোন্ জায়গায় আছি। আপনারা বল্‌বেন—"আমরা পূর্ব্বের লোক। আমাদের ল্যাটিচিউড অত আমাদের লঙ্গিচিউড অত" ইত্যাদি। আমি বলছি আমরা পূর্ব্বেও নই, পশ্চিমেও নই। আমরা আছি কোন একটা বিশ্বব্যাপী সিঁড়ির নির্দ্দিষ্ট ধাপে। আমরা ছুটে চলেছি, জগতের লোকও ক্রমাগত ছুটে চলেছে, চল্‌তে চল্‌তে দেখি কেহ সিঁড়ির ৪র্থ ধাপে, কেহ ৩য় ধাপে এসে পৌঁছিয়েছে। আমরা যেখানে এসে পৌঁছিয়েছি সেটা ১৯২৫।২৬ সালের ধাপ নয়, এমন কি ১৮৭০ সালের ধাপও কি না সন্দেহ আছে। বোধ হয় কোন কোন দফায় আমরা ১৮৪৮ সালের ধাপেই আছি। কড়াক্রান্তিতে হিসাব করে দেখ্‌লে মনে হবে যে হয়ত আমরা ১৮৭০ সালের আগে কি পরে ডাইনে কি বাঁয়ে কোন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। এ হল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমার কথা।

ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈব বীমা (বীমা, বোমা নয়) এই তিনটী সম্বন্ধে আলোচনা করলেও আমরা বেশ জানতে পারব আমরা ঠিক্ কোথায় আছি। আপনারা প্রথমেই বোধ হয় স্বীকার করবেন, বীমা জিনিষ আমাদের দেশে নাই। ব্যাঙ্ক আছে, বীমা নাই। একথা বল্লে হয়ত মিথ্যা কথা বলা হয় কেননা স্বদেশী আন্দোলনের সময় বীমা বস্তু কিছু কিছু হয়েছিল। কিন্তু আমি যে দরের বীমার কথা বল্‌ছি সেটা ভারতের ত্রিসীমানায় নাই। এদিক থেকে যদি আলোচনা করি তাহলে আমরা কোথায় আছি তা সহজেই অনেকটা ধরা পড়ে যাবে। আজকে সে হিসাবে আলোচনা করব না, অন্যান্য তরফ হ'তে মাত্র কয়েকটী কথা বলব।

ব্যাধি, বার্দ্ধক্য আর দৈব এই তিন বীমা তিন স্বতন্ত্র বস্তু। একটার সঙ্গে আরেকটার যোগ নাই। এ জিনিষগুলা কি তাই বিশ্লেষণ করা আমার বিশেষ উদ্দেশ্য।

স্বদেশ-সেবা কাহাকে বলে ?

১৯০৫ সালে যখন লড়াই হয়, রুশ-জাপানী লড়াই, তখন আমরা "জন্ম-গ্রহণ" করেছি বা কর্‌ছি। যুবক ভারত জন্ম গ্রহণ করেছিল। তখন অনেক কথা শুনেছি ও শুনিয়েছি, শিখেছি ও শিখিয়েছি। তারপর আজ ২১ বৎসর চলে গেছে। শুনতে পাই জাপানীদের মতন স্বদেশ-সেবক জাতি পৃথিবীতে কম। স্বদেশী বক্তৃতা করতে হ'লে আমরা আগে জাপানের দৃষ্টান্ত দিই। বিদেশী জাতিকে সম্মান করা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু বিষয়টা তলিয়ে দেখা দরকার। জাপানে গিয়েছি, সেই লড়াই এর অনেক দিন পরে গিয়েছি।

স্বদেশ-সেবা বস্তুটা কি আমরা বেশ জানি। অন্ততঃ পক্ষে ১৯০৫—১৪ সাল আমার বেশ জানা আছে। এই ১০ বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের এই ধারণা ছিল যে, যে স্বদেশ-সেবক সে না খেয়ে মরবে, তার ঘরে হাঁড়ি চড়বে না, হয়ত চড়বে একবেলা। দুবেলা আঁচানো তার কপালে লেখা নাই। তার রোজগার করবার ক্ষমতা আছে কিন্তু সে রোজগার করবে না। ম্যালেরিয়ায় ভুগছে তবু সে কাজ কর্‌ছে। ইত্যাদি ইত্যাদি ধারণা আমাদের আছে এবং ছিল। এই কয় বৎসরের খবর যারা রাখেন তাঁরা জানেন যে, বাংলায় হাজার হাজার না হউক অন্ততঃ শত শত লোক ছিল যারা বাস্তবিকই এক, দুই বা আড়াই বৎসর ঐরূপভাবে চলেছে। চিরকাল চলেছে তা বলি না।

জাপানের স্বদেশ-সেবক রাষ্ট্র

তারপর জাপানে গেলাম। তার আগে বিলেতে গিয়েছি। ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখাশোনা করেছি, জাপানীদের সঙ্গে সেইরূপই করেছি, পরে ফরাসীদেশে গিয়েছি, জার্ম্মাণীতে গিয়েছি ইত্যাদি। আমাদিগকে অতি অপদার্থ জাতি বলা হয়; আমরা স্বদেশ-সেবক জাতি নই, আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই যখন তখন আমাদিগকে এইরূপ তিরস্কার করা হয়ে থাকে। কিন্তু নিজ চক্ষে কি দেখে এলাম ?

জাপানের প্রথম কথা—রাষ্ট্রশক্তি। ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিণের প্রধান কথা রাষ্ট্রশক্তি। স্বদেশ-সেবা কোথায় ? ওসকল দেশে স্বদেশ-সেবক কৈ ? জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী সর্ব্বত্র দেখলাম,—স্বদেশ-সেবা বল্‌তে আমরা যা বুঝি সে দরের স্বদেশসেবা সে সকল দেশে নাই। কাজ করব আর না খেয়ে মরব, ৫।৭।১০ বৎসর ধরে এভাবে জীবন সমর্পণ করতে হবে,— এ ধারণা, এ রকম কার্য্য-প্রণালী সেখানে দেখি নি। তাহলে ওসব দেশ কি করে' চলছে ? আপনারা বলবেন—"এত বড় লড়াই চল্ল, লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিল— তারা স্বদেশ-সেবক নয় ! " আমি বলি—ঢাকের বাজনার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে অসংখ্য লোক যখন এক সঙ্গে মাতোয়ারা হয়ে ছুটে চলে তখন এমন কেহ থাকেনা যে মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে। যা হয় হউক এই ভেবে তারা হুজুগে ছুটে চলে। তারা ভাবে "আমি

গেলাম, না হয় লড়াইয়ে মরতে। আমার স্ত্রীপুত্র পরিবার বাপদাদা, মাসীপিসী এদের ভার ত একজন নিচ্ছে?"

মহাভারতের আদর্শ

মহাভারতেও এ প্রশ্ন এ সমস্যা উঠেছিল। অমুক রাজাকে কোন ঋষি জিজ্ঞাসা করছেন "মহারাজ এই যে লোকরা লড়াইয়ে যাচ্ছে এরা মরলে এদের পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছ ত?" এখানে কথা এই, যারা যুদ্ধে যায় তাদের পরিবারের ভরণপোষণ করে রাষ্ট্র। যুদ্ধে এক লক্ষ কি বিশ পঁচিশ হাজার জাপানী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে জুতো পায়ে, মদ খেয়ে সঙ্গীত গেয়ে চল্ল। কারণ তারা জানে দেশে যারা রইল তারা প্রতিপালন করবে তাদের কে যারা তার উপর নির্ভর করছে। কাজেই ভাবনা তাদের নাই। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা সর্ব্বত্রই তাই।

রাইনল্যাণ্ডের জার্ম্মাণ দৃষ্টান্ত

ধরুন জার্ম্মাণীতে এই রাইনল্যাণ্ড নিয়ে কি বিপুল আন্দোলন হয়েছে। তারা বলছে "আমরা না খেয়ে মরে যাচ্ছি জার্ম্মেণী রসাতলে গেল" ইত্যাদি। এ সময় কয়জন লোক, কয়জন উকিল ডাক্তার নিজের গাঁট থেকে পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে কোনো দুঃস্থ লোককে উদ্ধার করেছে? অতি কম। এই জার্ম্মাণ জাতি যারা মরে যাচ্ছে নিজের দেশের লোকের জন্য, তাদের পরিবারের লোকের জন্য দান ধ্যান করছে এমন লোক অতি অল্পই আছে। ভাববেন না আমি অতিরঞ্জিত করে বলছি। এ জিনিষের ওসব দেশে আদৌ প্রয়োজন নাই। কেন প্রয়োজন নাই? মনে করুন, একজন পণ্ডিত রসায়ন চর্চ্চা করতে করতে মরে গেলেন। তার পরিবারের সংস্থানের জন্য একটা সরকারী ব্যবস্থা রয়েছে। কুলী মজুর কেরাণী প্রত্যেকের বেলায়ই এইরূপ। মহাভারতেও অন্ততঃ "আদর্শ" হিসাবে এ প্রশ্ন উঠেছিল। রাজা সে ভার নিত। এখন রাষ্ট্র যা করে মান্ধাতার আমলে রাজা সেটা করত। তখন রাষ্ট্র ছিল রাজা, সেই জন্য মহাভারত বলেছেন "রাজা কালস্য কারণম্"। এসব ব্যবস্থা করা ছিল রাজার "কর্ত্তব্য"। আজকাল জার্ম্মাণীতে জাপানে রাষ্ট্রএই সব করছে। ঐসকল মুল্লুকে স্বদেশ-সেবা বলে বস্তু আছে কিনা বুঝতে হলে মাথা ঘামান আবশ্যক। মনে রাখবেন ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈববীমা সম্বন্ধে আমি খেই হারায়নি।

কর্ম্মদক্ষতার ভিত্তি

দ্বিতীয় কথা, এক একটা লোক কর্ম্মদক্ষ হয় কি করে'। কি ঐতিহাসিক কি বৈজ্ঞানিক যে কাজটা নিয়ে রয়েছে সেই কাজটা নিয়ে চিরকাল থাকবে কি করে, এই হচ্ছে প্রশ্ন। যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করিনা কেন, যে লোক কাজ করছে সে ৬ মাস, ১॥ বৎসর

কি ২ বৎসর মাথা ঠিক রেখে নিশ্চিন্তভাবে যদি করতে না পারে দর্শনই বলুন বিজ্ঞানই বলুন আর যাই বলুন কিছুই গড়ে উঠতে পারে না। যে লোক কাজ করছে যাতে সে বরাবর নির্ভাবনায় ধীর স্থিরভাবে কোন একটা মত বা প্রণালী দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাস, বৎসর ধরে প্রতিপালন করতে পারে তা দেখতে হবে। বাঙালী আমরা একজনও তা পারিনা। আপনারা সকলেই জানেন ম্যালেরিয়া হয় নাই এমন একটী বাঙালীও আছে কিনা সন্দেহ। কাজ করতে করতে মাথা ধরে নাই এমন লোক কয়জন আছে জানি না। ১ দিন ২ দিন না হয় ৩ দিন, ৪র্থ দিন মাথা ধরবেই। ব্যারাম একটা কিছু আছেই আছে।

এসব কথা গভীরভাবে ভাবা ও বুঝা দরকার। জাতি হিসাবে আমাদের কর্ম্মদক্ষতা আছে কিনা বুঝা দরকার।

দুঃখ নিবারণের সেকেলে দাওয়াই

মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলে বুড়ো হতেই হবে। তেমনি মানুষ হয়ে জন্মিলে তার ব্যারাম হয়ই হয়। ফরাসী জার্ম্মাণ ও আমেরিকান—তাদেরও হয়। মানুষ সকলেই, কেহ জানোয়ারও নয় দেবতাও নয়। তেমনি, মানুষ মরলেই বুড়ো বাপ, বিধবা স্ত্রী, অনাথ শিশু মানুষের থাকবেই থাকবে। বিধবা-সমস্যা আছেই আছে।

এসব কথা যদি গভীর দার্শনিক হিসাবে আলোচনা করতে যান, তারও একটা দিক আছে। বুদ্ধদেব বলেছেন মানুষ হলে দুঃখ থাকবেই, দুঃখ থাকলে তার কারণও আছে, সে কারণ নিবারণের উপায় সম্বন্ধেও তিনি নানা কথা বলে গেছেন। "সত্যচতুষ্টয়" আর "অষ্ট পথ" অতি প্রসিদ্ধ কথা। মানুষ মাথা খাটিয়ে উপায় উদ্ভাবন করে ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, দৈব, মৃত্যু, বিধবা, অনাথ ইত্যাদি সমস্যার মীমাংসা করে গেছে। একে দুঃখবাদ বলতে হয় বলুন, সুখবাদ বলতে হয় বলুন। কথা হচ্ছে রক্তমাংসের শরীরে এসব জিনিষ আছেই। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে তা যদি থাকে ভারতবর্ষে সেটা নিবারণ করা যাবে কি করে। মান্ধাতার আমলের লোকেরা—যথা সেন্টপল, জার্ম্মাণ দার্শনিক ব্যেমে ইত্যাদি সাধু, ঋষিরা (খৃষ্টান মুল্লুকেও হাজার হাজার সাধু, ঋষি আছে) এবং আমাদের দেশের সাধুরাও কেহ কেহ এক রকম উপায় আবিষ্কার করেছেন। বলেছেন,—"কুছ পরোয়া নেই। না জন্মালেই হল। সংসারের কথা বেশী চিন্তা না করে, সংযম টংজম করে' বনেগিয়ে ধ্যান ধারণা তপস্যায় কাটিয়ে দিলেই হল। জন্মাবার দরকার নাই" ইত্যাদি। আমি এই ধরণের মতকে হাস্যাস্পদ মনে করি না। মানুষের মাথার পক্ষে এও একটা বড় আবিষ্কার। এই ধরণের আবিষ্কার কেবল ভারতে হয়েছে তা নয়, কেবল চীনে হয়েছে তা নয়, মুসলমান খৃষ্টান সকল মুল্লুকেই হয়েছে।

যুগ-প্রবর্ত্তক বিস্‌মার্ক

আজ কালকার দিনেও আবার মানুষ এই দিকে মাথা খাটিয়ে দেখেছে। যদি মানব জীবনকে সুখময় করতে হয় কর্ম্মদক্ষ করতে হয়, মানুষকে যদি মৃত্যু পর্য্যন্ত নির্ভাবনায় কর্ম্ম করতে হয় তা হ'লে তার জন্য আর কোনো প্রণালী অবলম্বন করা যায় কিনা মানুষের মাথা সে দিকেও খেলেছে। যেমন ষ্টীম এঞ্জিন আগে পৃথিবীর কোন কারখানায় ব্যবহৃত হত না, মানুষ মাথা খাটিয়ে সেটা বের করে তাকে কাজে লাগিয়েছে, ঠিক তেমনি ১৮৮৩ সালে একটা জিনিষ মানুষের মাথা থেকে বের হল, দেবতার মাথা থেকে নয়, জানোয়ারের মাথা থেকেও নয়, ঋষির কল্পনা থেকেও নয়। মানুষেরই চিন্তার ফলে এসেছে। সে আবিষ্কার ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশে একটু একটু ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের ভারতে এখনও তার নাম পর্য্যন্ত জানে না। সেই ১৮৮৩ সালের জিনিষটার আবিষ্কর্ত্তা ঘটনাচক্রে একজন জার্ম্মাণ। যে সে জার্ম্মাণ নয়, তার নাম বিস্‌মার্ক। তাকে লোকে জানে লড়াইয়ের বিস্‌মার্ক বলে'যে ফরাসীকে কুপোকষা করে, কুটনীতি দ্বারা সমস্ত ইয়োরোপকে ভেদ করে জার্ম্মাণিকে বড় করেছে সেই বিস্‌মার্ক।

আমি বল্‌তে চাই সেটা বড় হলেও হতে পারে। কিন্তু আর একটা বড় জিনিস তার মাথা থেকে বেরিয়েছে। সে জিনিস জগতের এক অপূর্ব্ব অমৃত। সেটা এই—মানুষের ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু হয়। কিন্তু মানুষকে ব্যাধিজয়ী, বার্দ্ধক্যজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়রূপেও গড়ে তোলা সম্ভব। এ সকল দুঃখের প্রতিকার যে উপায় তাকে বিস্‌মার্ক আইনবদ্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে খাড়া করেছেন। আমরা মন্তর আওড়িয়ে থাকি :—

"জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।"

তেমনি এই যে বিংশ শতাব্দী চলছে তার সূত্রপাতের যুগে মানবজাতির জন্য যে হিত-প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রবর্ত্তক সম্বন্ধেও বলা চলে—"জগদ্ধিতায় বিস্‌মার্কায় জার্ম্মণায় নমো নমঃ।" ভারতবর্ষে বীমা শব্দ জানে না তা নয়। বীমা কোম্পানি রয়েছে। কিন্তু এ এক জিনিষ, আর জার্ম্মাণিতে এবং জার্ম্মাণির দেখাদেখি অন্যান্য দেশে যা রয়েছে সে আর এক জিনিষ। বিস্‌মার্ক বর্ত্তমান জগতের অন্যতম যুগ-প্রবর্ত্তক।

ইতালির দুরবস্থা

এই যে সামাজিক আইন কানুন এতে হচ্ছে কি? আজ যে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠিত সমাজ গড়ে উঠছে এটা তার একটা ফল বিশেষ। তার ভিত্তিও বটে। একজন ইতালিয়ান পণ্ডিত বল্‌ছেন, "ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব-বীমা ইত্যাদি সমাজ-ঘটিত আইন কানুন এটা কোন ধনী, বদান্য ব্যক্তির দান নয়। দুনিয়ার সকল সভ্যদেশেই এ জিনিস গোটা দেশের সার্ব্বজনীন ভাররূপে গড়ে উঠছে।

কিন্তু ইতালীতে যখন এই রকম আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল খবরের কাগজওয়ালারা বল্লে— এত বড় কঠিন, দুরাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ জিনিষ আমাদের দেশে হওয়া সম্ভব নয়। আর আজ যতটুকু বীমা-প্রথা ইতালিতে প্রচলিত আছে তার ভিতর দেখছি কেবল ব্যভিচার আর দুর্নীতি।"

অন্য দেশ অপেক্ষা ইতালীর সঙ্গে বোধ হয় ভারতের তুলনা বেশী চল্‌তে পারে, এই রকম প্রস্তাব হ'লে আমাদের দেশের লোকও বলবে—"জিনিষটা এত কঠিন এদেশে হবে না।" ইতালিয়ান পণ্ডিত আবার বলছেন—"এতে বুঝতে হবে আমরা অনভিজ্ঞ। জিনিষটা আমরা বুঝতে পারি না। সকল সভ্যদেশের মাপকাটিতেই আমরা একেবারে জঘন্য জাতি। এই যে বার্দ্ধক্য, দৈব, মৃত্যু এবং ব্যাধি চার রকমের বীমা আজ যা সমস্ত সভ্যজগতে অ আ হয়ে গেছে সে জিনিষের একটা জিনিষ ইতালিতে সবে মাত্র সুরু হয়েছে, সেটা দৈব বীমা।" ইতালিয়ানরা কোন্ অবস্থায় রয়েছে তার তুলনায় আমরা কোথায় আছি, ঐতিহাসিক ভাবে সে আলোচনা সম্প্রতি করব না। বিস্‌মার্কের মাথাটা নিয়ে, মাথার ভিতরকার "ঘিলুটা" নিয়ে কিছুক্ষণ কাটাতে চাই।

দেড় কোটী জার্ম্মাণের ব্যাধি-বীমা

বিস্‌মার্ক দেখল, মানুষ জন্মেছে যখন তখন তার অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অসুখ যদি হয়, তার জন্য দায়ী থাক্‌বে কে? আমরা বলব—"ব্যক্তি স্বয়ংই দায়ী।" ওরা বলছে "তা হলে চলবে না, গোটা দেশটাকে সেজন্য দায়ী করতে হবে।" পাঁচ কোটী বাঙ্গালীর মধ্যে আমি একজন, আমার অসুখ হয়ে থাকে সেটা আমার ব্যাপার, আমার পয়সা না থাকে আমি ভিন্ন আর কে সেজন্য দায়ী থাকবে? ওরা বল্‌ছে "দেশ সেজন্য দায়ী।" খালি দেশ বল্লে হবে না, আমি কোন না-কোন জায়গায় চাকুরী করি, যে আমাকে অন্ন দিচ্ছে তার দায়িত্ব আমার জীবনের উপর রয়েছে, আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রথম দায়িত্ব অন্ন দাতার, দ্বিতীয় দায়িত্ব রাষ্ট্রের, কারণ রাষ্ট্র সকলকে মানুষ ক'রে বাঁচিয়ে রাখে।

রামচন্দ্র পোদ্দার ১০০৲ টাকার চাকুরী করে কি ইস্কুল মাষ্টারী করে। আফিসে হউক, কারখানায় হউক, মজুর হউক, কুলী হউক, কেরাণী হউক দুনিয়ার সকল দেশেই অধিকাংশ লোক চাকুরী করে। ১০০৲ টাকা যদি একজনের মাহিনা হয় ১০৲ টাকা কারখানার মালিক দিল, ১০৲ টাকা নিজে দিল, ১০৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট দিল, মোট ৩০৲ টাকা মাসে মাসে জমা হতে লাগল। এইভাবে যখন জমা হতে থাকবে, যখন তার অসুখ হবে, তখন তার বাপ, স্ত্রী, ছেলের দায়িত্ব কিছু নাই, তার যে মনিব অন্নদাতা সে তাকে এম্বুল্যান্স গাড়ীতে ক'রে হাঁসপাতালে পাঠাবে, হাঁসপাতালে যত শীঘ্র অসুখ সারে সে চেষ্টা তার হবে, তা যদি সে করে তবে বলব তার দায়িত্ব পালন করা হল।

যখন আমি চাকুরী করতে ঢুকেছি তখন আমার মনিব এই রকম ভাবে আমাকে বাঁচাতে

আইনতঃ বাধ্য। যদি না করে তার বিরুদ্ধে নালিশ চলবে, গভর্ণমেণ্ট মকর্দ্দমা চালাবে, তার নানারকম আইন কানুন আছে, তার জন্য স্বতন্ত্র উকিল দরকার, খবরের কাগজের দরকার, ব্যাখ্যার দরকার হয়। বিপুল কাণ্ড, তা আমাদের কল্পনা করাও কঠিন।

আমাদের দেশের যেমন ৫ কোটী লোক জার্ম্মাণীতে ৫॥০ কোটী লোক, তার মধ্যে ১॥০ কোটী লোকের সম্বন্ধে এই রকম নিয়ম জারি আছে। এই দেড় কোটী লোকের যদি অসুখ হয়—তার বাপ দাদা ভাই স্ত্রী দায়ী নয়, তাকে রক্ষা করবার জন্য এমন একটা টাকা আছে যে টাকা যথাসময়ে তার জন্য খরচ হবে। এ ভাবে তারা ২৫ হাজার কর্ম্মকেন্দ্রে সংঘবদ্ধ। গভর্ণমেণ্টের কারখানায় হউক, পোষ্ট আফিসে হউক, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। ১৮৮৩ সালে ব্যাধি-বীমা-সমিতি দ্বারা এতগুলি লোক প্রতিপালিত হয়েছে।

ধরুন, আমি কাজ করতে গিয়েছি, অসুখ হয়েছে, ৩ মাস থাকতে হবে দার্জ্জিলিংএ, আমার পয়সা কোথায়? দরকার হলে দার্জ্জিলিং কি রাঁচি পাঠান আমার মনিবের দায়িত্ব। ১॥০ কোটী লোকের সে দায়িত্ব নাই। জার্ম্মাণীতে এই রকম ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশে যদি সে রকম ব্যবস্থা থাকত তাহলে যখন তখন যে-সে লোকের বানপ্রস্থে যাওয়ার প্রয়োজন হত না। মাথা খাটিয়ে দেখা গিয়েছে এই ১॥০ কোটী লোককে এমন করে কর্ম্মদক্ষ করা যায়, ম্যালেরিয়া হউক, কালাজ্বর হউক যে কোন অসুখ হউক, দার্জ্জিলিং শিলং, দরকার হ'লে মক্কা কামস্কাট্‌কাও পাঠান যেতে পারে। তাহলে বুঝুন স্বদেশসেবার প্রয়োজন কোথায়? খাওয়া পরার ব্যবস্থা থাক্‌লে কে না অসম-সাহসিক, দুঃসাধ্য কাজে ঝাপিয়ে পড়তে পারে?

কর্ম্মদক্ষ আমরা নই। দেখতে হবে কর্ম্মদক্ষ আমরা হব কি করে। যে কাজটা করছি সে কাজটা ঠিক সমানভাবে ৭৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেমন করে চালান যায়। সম্ভব কিনা সেটা বুঝবার জন্য অন্যান্য জাতি কি করে তা দেখা উচিত। তার প্রথম নম্বর ব্যাধি-বীমা।

দৈব-বীমা

দ্বিতীয় নম্বর দৈব-বীমা, এটা আলাদা বস্তু। মনিবের কাজের জন্য রাস্তায় হাঁটতে, মোটর চাপা পড়া সম্ভব। রেলে যেতে যেতে কলিশ্যন হয়ে মরে যাবার সম্ভাবনা আছে। ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে করতে আঙ্গুলের একটুকু কেটে গেল। কে প্রতিকার করবে? তার জন্য আইন হ'ল ১৮৮৪ সালে। তার আগাগোড়া মজার। আমায় কিছু পয়সা দিতে হবে না। আমাকে বাঁচাবার জন্য কাণাকড়ি পর্য্যন্ত যে খরচা সে সব কারখানার মালিক দিতে বাধ্য। ডাক্তারকে ডাকতে সে বাধ্য, ওষুধ পত্রের জন্য সে দায়ী। পরিবার প্রতিপালন করতে মাসিক ভাতা দেওয়া দরকার, মনিব দিবে। হাঁসপাতালে পাঠান দরকার মনিব পাঠাবে। আজ কালকার কথা বলি না, আজ কাল এত সমিতি হয়েছে, নাম করতে গেলে হয়রাণ হতে হবে। ১৮৮৪ সালের কাছাকাছি ৫॥০ কোটী লোকের মধ্যে পৌণে দুই কোটী লোক জার্ম্মেণীতে দৈব-

বীমা করেছিল। তারা হেসে খেলে যা কিছু করতে পারত এখনও পারে, আমরা পারি না। তাদের চিরজীবনের ভার নিয়েছে অন্য লোকে। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে যেতে অসুখ হল। ডাক্তারকে ৪৲ টাকা ফি দিতে হবে সে কথা বাঙালী কয় জন লোক না ভেবে পারে? কিন্তু এই সব লোকের এ প্রশ্ন উঠতে পারে না। এমন একটা চিন্তা এদের মগজে এসেছিল যাতে দৈব নামক বস্তু চিন্তা করবার তাদের আর প্রয়োজন হয় না। জন্ম থেকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তারা নিশ্চিন্তভাবে বেপরোয়াভাবে কাজ করে যায়। এখানে বল্‌তে চাই এ ধরণের চিন্তায় যাদের জীবনটা গড়ে উঠেছে' তাদের সঙ্গে আমাদের টক্কর দেওয়া সম্ভব কি? আমাদের কুলী, মজুর, তাদের কুলী মজুরের সঙ্গে, আমাদের ব্যবসাদার তাদের ব্যবসাদারের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে কি করে? পৌনে দুই কোটী লোক এই রকম স্বাধীন নিশ্চিন্তভাবে জীবনযাপন করছে।

বার্দ্ধক্য-বীমা

তারপর বিস্‌মার্কের মাথায় খেল্ল—এ হলেও চলছেনা, আরো কিছু আছে। মানুষ জন্মেছে যখন বুড়ো হবেই। বুড়ো হলে অথর্ব্ব হবেই হবে। বুড়ো হওয়া আর অথর্ব্ব হওয়া সব ক্ষেত্রে এক নয়। কোন্ বয়সে কাকে বুড়ো বলে দেশ হিসাবে আলাদা, বিলেতে ৭০ বৎসর বয়সে, সুইট্‌সারলেণ্ডে ৬৫ বৎসর বয়সে, প্রুসিয়ায় ৭৫ বৎসর বয়সে বুড়ো হয়। আমরা না হয় ৪৫ বৎসর বয়সেই বুড়ো হই। আইনমতে বুড়ো। বিসমার্ক দেখল লোকগুলো বুড়ো হবেই। "বুড়ো হলে তো ফেলতে পারি না আমাদেরই দেশের লোক এত দিন খেটেছে, ৬০।৬৫।৭০ বৎসর ধরে দেশকে বড় করে তুলেছে তাকে ফেলে দিই কি করে? এ খাটতে পারছে না তার জন্য কিছু করা দরকার।" আবার চালাল বোমা, সে বোমা বার্দ্ধক্য-বীমা। পেন্‌শ্যন্‌লিষ্টি খাড়া হল। এর জন্য টাকা আসছে খানিকটা গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে খানিকটা বুড়োর কাছ থেকে খানিকটা যেখানে সে কাজ করে সেখান থেকে। ১৮৮৯ সালে সেটা হয়। এর মধ্যে পড়েছে পুরুষ স্ত্রী নিয়ে ২ কোটী লোক। এরা যখন বুড়ো হবে, ৭০ বৎসর যখন এদের বয়স হবে তখন এরা পেন্‌শ্যন তালিকায় পড়বে। নিয়ম হ'ল—বুড়ো হবামাত্রই সরকার হতে দেওয়া হবে বৎসরে ৫০ মার্ক বা ৩৭ টাকা। বীমা কোম্পানিতে যে ফণ্ড হল তা হতে দেওয়া হবে ২৩০ মার্ক বা ১৭০ টাকা। এই ২০৭ টাকা সে বৎসরে পাবে। এ হল পেন্সন-বীমা। কেবল তা নয়, অথর্ব্ব হওয়ার জন্য আরো কিছু আছে, তার সঙ্গে আরো কিছু টাকা জুড়িয়ে দেওয়া হয়। ধরা যাক যেন হঠাৎ লোকটা পাগল হয়ে গেল, কি তার হাত পা কেটে গেল। তখন তাকে প্রতিপালন করতে হবে সেজন্য বুড়োর চেয়ে সে কিছু বেশী পায়। গভর্ণমেণ্টের ভাতা ৫০ মার্ক ঠিকই আছে কোম্পানির থেকে আরো কিছু বেশী দিতে হবে (৪৫০ মার্ক=৩২০ টাকা)।

মৃত্যু-বীমা

তারপর মানুষ মরবে এটাও বিসমার্কের মাথায় এল। কেবল যে বুদ্ধদেবের মাথায় এসেছিল, বা যিশুখৃষ্ট কি সেণ্টপলের মাথায় একথা এসেছিল তা নয়। তবে বিস্‌মার্কের মাথার একটা বিশেষত্ব আছে। সে ভাব্‌লে,—একটা উপায় বের করতে হবে, যেই মানুষ মর্‌ল তখন তখনি কেওড়াতলায় পাঠাবার খরচ আছে। সোজা কথা নয়, কেওড়াতলায় লোক পাঠাতে দেড়শ, ২শ, ২॥০শ টাকা খরচ হবে। এ সমস্তের জন্য কোম্পানি দায়ী। এই অবস্থায় হেসে খেলে মরতে পারা যায়। আমি মরলে যদি পয়সা খরচ না হয় আমি যখন তখন মরতে রাজি আছি। তারপর মরালোকের আত্মীয়স্বজনকে প্রতিপালন করতে হবে, ৪ কন্যা ৩ পুত্র বিধবা স্ত্রী রয়েছে তাদের ভরণপোষণ করতে হবে। জার্ম্মাণীতে মা ষষ্ঠীর কৃপা যৎপরোনাস্তি। অন্ততঃ ২০।২১ বৎসর হয় নাই এমন ১০টী সন্তান প্রায় পরিবারেরই গৌরব। ২০।২১ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কত করে দেওয়া হবে? কোনো লোকের একশ টাকার চাকুরী থাক্‌লে, মাসে ২০ টাকা দিতে হবে প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে তার পর যে বিধবা স্ত্রী আছে তাকেও সেই ২০ টাকা হারে দেওয়া হবে।

বিধবা-সমস্যা

একজন বিধবা ২টী মেয়ে নিয়ে পথের ভিখারী হল, আমাদের দেশে বিধবা-সমস্যা যেমন আছে, ওদের দেশেও তাই আছে। মাথা খাটিয়ে জীবনকে কত উপায়ে সুখময় করা যায় তার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ইয়োরোপের বিধবা-সমস্যার মীমাংসা। বিস্‌মার্ক ব্যবস্থা করলে ৩ জনকে মাসে ৬০ টঙ্কা দেওয়া হবে। ভেবে দেখুন বিধবার সব আছে আসবাব পত্র বাড়ী ঘর সব রয়েছে, স্বামী মরে গেলে কিছু খরচ করতে হ'ল না। তার উপর ৬০ টাকা মাসে মাসে পাচ্ছে। বিধবারা, অনাথ শিশুরা তা হলে আর কাঁদবে কেন? বাস্তবিক পক্ষে চখের জল ও সকল দেশে কমে এসেছে।

আর আমাদের দেশে কান্নাকাটির বিরাম নাই। আপনারা বলবেন "স্বামীকে ভালবাসা আমাদের বিধবাদের একমাত্র ধর্ম্ম। আমাদের বিধবারা একেবারে সব সতীসাধ্বী, এইজন্যই কাঁদে। যত অসতী সব ওদের দেশে।" প্রশ্ন করা যাউক আমাদের দেশে বিধবারা যখন কাঁদে, কিসের জন্য কাঁদে? বাপ মরলে আমরা যখন কাঁদি, কিসের জন্য কাঁদি? একবার আলোচনা করে দেখেছেন কি? আমরা বাস্তবের কিছু জানি না। আমরা জানি এক্‌টা বোল, পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ। কাজেই শাস্ত্র আওড়িয়ে আমরা তোতা পাখীর মত বলে ফেলি যে ঐ শ্লোক অনুসারেই আমরা কেঁদে থাকি,—বাপকে ভালবাসি বলে'। কিন্তু এটা মিথ্যা হতেও পারে। সমস্যাটা যুবক ভারতের মনে জেগেছে কি? বোধ হয় জাগে নি, তাই তারা কল্পনারাজ্যে এখনও বিচরণ কর্‌ছে।

বিস্‌মার্কের মাথায় এল এই যে, "স্বামী যখন মরবে বিধবারা কাঁদবেই। এটা অতি স্বাভাবিক এবং প্রথম স্বীকার্য্য। কিন্তু বিধবার চোখের জল কমানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।" অনেক বিধবা পশ্চিমা সমাজেও আছে, যারা মরা স্বামীর কথা ভেবে কাঁদে। পুনর্বিবাহের আইনতঃ সুযোগ থাকা সত্বেও বিবাহ করে না, এমন হাজার হাজার স্ত্রীলোক জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ডের সমাজে আছে। তা থাকা সত্বেও স্বামী মরলে স্ত্রী কাঁদে। বাপ মরলে ওসকল দেশে ছেলে কাঁদে ভালবাসার মুল্লুক, স্নেহ মমতা ভক্তি শ্রদ্ধার রাজ্য খৃষ্টিয়ান-দেশে কম বিস্তৃত নয়। কিন্তু আসল কথা, ক্রন্দন-তত্ত্বে আসল ভালবাসার বিজ্ঞান কতখানি আছে, অর্থ-চিন্তাই বা কতখানি আছে যুবক ভারত একবার ভেবে দেখেছেন কি? বিসমার্ক বল্লে মাথা মুড়িয়ে মরা স্বামীর চরণ বুকে করে' থাকাই অথবা ঐ রকম কিছু করাই বিধবার একমাত্র কর্ত্তব্য নয়। বর্ত্তমান জগতের বিধবাকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ভুলিয়ে রাখা উচিত হবে না। তাদের জন্যও সম্পূর্ণ মানবত্বের নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে।" তাই হয়েছে।

বর্ত্তমান জগতের জন্ম

ভারতে বোধ হয় এমন কোনো পরিবার নাই যেখানে বিধবা নাই, এমন কোন পরিবার নাই যেখানে কাজ করতে করতে চাকুর্য্যে ৩৫।৩৮ বৎসর বয়সে মারা যায় নি। তার ফলে এক একটা পরিবার হাহাকার করছে যেন আর কিছু করবার নাই। হিন্দু-সমাজে আমাদের ঠাকুরদাদাদের আমলে আমরা হাহাকার করেছি, বিসমার্কের ঠাকুরদাদাদের আমলেও জার্ম্মাণরা তাই করেছে। গ্যেটের আমলে এমন কোন ক্ষমতাবান্ জার্ম্মাণি ছিল না যে চিন্তা করতে পারত যে দেড় দু'কোটি লোকের ভার নিবে কোনো এক প্রতিষ্ঠান। সেকেলের বিলাতেও কেহ এইরূপ বলতে সাহস পায় নি। চতুর্দ্দশ লুইয়ের সময় ফরাসীরাও বলতে পারে নি। বিসমার্ক মাথা খাটিয়ে এক একটা প্রণালী, এক একটা কর্ম্ম কৌশল আবিষ্কার করেছে। মান্ধাতার আমলের কোন লোকের মাথায় তা আসেনি। সোজাসুজি আমাদেরও বলা উচিত, হিন্দু সমাজ এ লাইনে কিছুই আবিষ্কার করতে পারে নি। মামুলি যৌথপরিবারের ব্যবস্থায় অবশ্য সেকালের দুনিয়া এই দায়িত্ব কিছু কিছু সামনে চলেছে। আসল কথা, নবীন জগতের সূত্রপাত হয়েছে ১৮৭০—৮৩ সালে। তার আগের কথা আলোচনা করতে হয় কর, প্রত্নতত্ত্ব হিসেবে কর, বাসি মাল হিসেবে কর। কিন্তু যৌবনের কথা যদি শুনতে চাও, ১৮৭১, ১৮৮৩, ১৮৯১ ইত্যাদি সালের কথাই ভাব্‌তে হবে। এই সকল তারিখেই বর্ত্তমান জগতের জন্ম। আমি এখানে আগে বলেছি ইতালি আহা উহু করে বলছে "অন্য জাতি বড় হয়েছে আমরা কিছু করতে পারছি না। আমরা শুধু দৈব বীমা করেছি, তাতেও জুয়াচুরী বাটপাড়ি রয়েছে, কিছু উপকার হচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি।" যেই এ জিনিষ আবিষ্কার হল,

অমনি নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ল, অষ্ট্রীয়া, ডেনমার্ক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল। লয়েড জর্জ্জের জার্ম্মাণীর শিষ্য বলে অখ্যাতি আছে। সে থাক-না থাক তার মাথায় এসেছিল বিলেতে কিছু করার দরকার। তখন বিলেতে "ওল্ড এজ পেনশ্যন" প্রথা প্রবর্ত্তিত হল।

সরকারী আইন বনাম স্বাধীন বীমা

এখন জিজ্ঞাস্য,—বীমা সম্বন্ধে আইন করা উচিত কি? না স্বাধীন রেখে দেওয়া ভাল? এ নিয়ে প্রবল আন্দোলন আছে। যেমন বাণিজ্যে সংরক্ষণ নীতি চলবে না অবাধ নিয়ম চলবে এই নিয়ে ঘোরতর তর্ক চলেছিল তেমনি বীমা প্রথাটা গভর্ণমেণ্টের আইনের সাহায্যে চালানো উচিত না লোকের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ফেলে রাখা উচিত, এই নিয়ে লড়াই চলেছে। দুই রকম তর্ক আছে। একটা হচ্ছে—"তুমি যখন সেয়ানা মানুষ, নিজে বুঝছ অসুখে পড়বে মরবে তোমার বিধবা স্ত্রী থাকবে ছেলে পুলে না খেয়ে মরবে, তাদের ব্যবস্থার ভার তোমার উপর।" এ অতি সঙ্গত কথা, বিরুদ্ধে কিছু বলবার নাই। উল্টা তর্ক নিম্নরূপ— "গভর্ণমেণ্টে এখন বলবে তুই যদি না করিস তোকে করাতে বাধ্য করব।"

এ আজগুবি চিন্তাপ্রণালী নয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে এর নজির আছে। আমরা স্কুলে পড়ব কিনা, ঝি চাকরের ছেলে পড়তে চায় না উপদ্রব মনে করে, ব্যয় করতে পারে না। একথা আমরা বলে থাকি। ঠিক তার উল্টোও আছে। বহুত আচ্ছা, বাধ্যতামূলক একটা শিক্ষার বিধি কর তবেই হবে। তেমনি বীমা বিষয় নিয়ে ধনী ও বিজ্ঞ মহলে বিপুল তর্ক চলছে, আইন করা উচিত কিনা, করলে বাধ্যতামূলক করা হবে কিনা, সার্ব্বজনিক করা হবে কিনা ইত্যাদি। আর সে আইনের প্রত্যেক শব্দ নিয়ে তোলপাড় হয়েছে, অনেক কাণ্ড হয়েছে। এখানে খানিকটা দলিল দেখাতে চাই, ফরাসীর দলিল।

ফরাসী পণ্ডিতদের তর্ক

ফরাসীদেশে এ নিয়ে অনেক বিতণ্ডা চলছে। ফরাসী ধন-বিজ্ঞান-পরিষদের হোমরা চোমরা লোকেরা তার বিরুদ্ধে লেগেছে। তার অনেক কারণ আছে, একটা কারণ এই। ফরাসী পণ্ডিতেরা বলছেন—"বিসমার্ক এই কাজ করেছিল কেন জান? অবশ্য তার কোন মতলব আছে। সে সময় কার্ল মার্কস্ নামে একটা লোক এবং তার বন্ধু এঙ্গেলস্ দুই জনে মিলে জার্ম্মাণীতে ভয়ানক আন্দোলন চালাচ্ছিল। আরেক জন লোক তাদের তাঁবে এসেছিল। নাম তার লাসাল। এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রীয় দল জার্ম্মাণিতে প্রবল ছিল। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াল সোশ্যালিজম বলে একটা জিনিষ তারা মুটে মজুরের দল। সাম্রাজ্যবাদী দল জার্ম্মাণদেরকে বলত "জাতীয়তা বা সামরিকতা ১৮৭০ সালে ফরাসীর হাড় ভেঙ্গে চুরে দিয়েছে, দরকার হলে আবার লড়াই করতে হবে। সবের মধ্যে একমাত্র কথা দেশ, তাকে বড় করতে হবে।"

জার্ম্মাণীর মত বিলেতেও ইম্পীরিয়ালিজম আছে, ফ্রান্সেও তাই আছে। সেসব চিজ আমাদের দেশেও আছে। তার তত্ত্বকথা এই "আগে এদেশের লোক স্বাধীন হউক তারপর চাষীদের বড় করব, আগে স্বরাজ গড়ে উঠুক, তারপর আর সব হবে, ইত্যাদি" সমস্ত পৃথিবীতে একই শাস্ত্র চল্‌ছে।

কার্ল মার্কস্ বনাম বিস্‌মার্ক

যাক, ফরাসী পণ্ডিতদের জার্ম্মাণি সম্বন্ধে মতামত আলোচনা করছি। ফরাসীরা বলে থাকেন—তখন একটা মত চলেছিল তার বিরুদ্ধে আর একটা মত দাঁড়াল, সমাজ-সাম্যদল। তারা মজুরগুলিকে বলতে শিখাল—"মজুরদের স্বার্থ এমন কিছু যা বাস্তবিক রাষ্ট্রীয় স্বার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ হতে পারে না। অভিজাতসম্প্রদায় কর্ত্তৃক শাসিত যে দেশ তার সেবা করলে মজুরদের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে না।" ফরাসী পণ্ডিত-সংঘ—আমিও যার মেম্বর—তারা বলেছে—"বিসমার্ক তেন্দড় লোক। কার্ল মার্কসের মগজে ছিল মজুর জগতকে করায়ত্ত করা। বিস্‌মার্ক ভাবলে এমন একটা কিছু করা দরকার যাতে এই লোকগুলোর কথা আর শোনবার প্রয়োজন না থাকে। মরবে আমি সাহায্য করব, ব্যারাম হলে ওষুধপত্র দিব, যত রকম উপায় থাকতে পারে সব দিক দিয়ে যদি মজুর, গরীব, কেরাণী, ইস্কুল মাষ্টার ইত্যাদিকে সাহায্য করি তাহলে আন্দোলন চালাবে কে? পেট যতক্ষণ ভরা থাকবে ততক্ষণ কেহ কিছু করবে না। অতএব দাও ওদের রুটী, তার উপর দাও একটু মাখম, তারপর মাংস, তারপর আর একটু রুটী।"

ফরাসীরা একটু রুটী আর খুব জোর একটু কফি খায়, জার্ম্মাণরা আগে রুটী, তারপর মাখম তারপর মাংস। তারা খেতে খেতে চলে, কাজ কর্ম্ম করে. পাঁচ পাঁচ বার খায় আর তাদের মজুর চাষীরা পর্য্যন্ত মোটা হয়ে উঠে। বিসমার্ক বল্ল -"সব লোককে পাঁচ বেলা খাওয়াও তাহলে 'স্বদেশী' বক্তৃতা হবে না। যারা আন্দোলন চালাচ্ছে, তাদের মুখ বন্ধ করতে হবে। পেট ভর্ত্তি করলে মুখ বন্ধ হয়। তাই বিসমার্ক তাদের পেট ভর্ত্তি করে রেখেছে" ইত্যাদি ধরণের ব্যাখ্যা পাই ফরাসী-পণ্ডিত-মহলে।

ফরাসীদের আত্ম-প্রশংসা

ফরাসীরা বল্‌ছে—"জার্ম্মাণদের সমাজ পচা তাকে বাঁচাবার জন্য তারা একটা কিছু করছে। আমরা ফরাসী সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টান্ত স্থল, পৃথিবীর যত বড় বড় চিন্তা আদর্শ সব আমরা, এই ফরাসীজাতি আবিষ্কার করেছি, আমাদের লোককে শিখাবে ওরা! আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার যারপর নাই সংযমী, তাদেরকে সংযম শিখাবার প্রয়োজন নাই।" আমি গল্প করছি না। আমি সেই পণ্ডিত-সংঘের সভ্য। তারা আমাকে বলেছে "তুমি ভারতে গিয়ে এই মত প্রচার করবে।"

জার্ম্মাণীর যেমন ক্রুপ ফ্যাক্‌টরী তেমনি ফরাসীদেরও একটা কোম্পানি আছে, তার যে বড় ইঞ্জিনিয়ার তার নাম পিনো। এক বইয়ে সে লিখেছে—"সরকারী বীমার কোন প্রয়োজন নাই, বীমা জিনিষ এবং প্রত্যেক জিনিষই লোকেরা স্বাধীন ভাবে স্বতন্ত্র ভাবে নিজ স্বার্থ অনুসরণ করে গড়ে তুলবে। আইন করবার প্রয়োজন নাই।" ফরাসী পণ্ডিত-সংঘের হোমরা চোমরা লোক আইন করবার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তারা আইন করতে দেবে না। ১৯২৪ সালে এ

সম্বন্ধে পিনোর বই বেরিয়েছে, তা হতে দেখাতে চাই তাদের যুক্তিটা কি। গভর্ণমেন্টের সাহায্য 'না নিয়ে কুলী মজুরদের জন্য ফরাসীরা কি করেছে তার একটা বিবরণ সে বইয়ে আছে এবং আইন না থাকা সত্ত্বেও ফরাসীরা কি করতে পেরেছে তারও কতগুলি দৃষ্টান্ত আছে। যুক্তিটা কি এখানে আমি শুধু তাই দেখাব।

ফ্রান্সের বিশেষত্ব

বইয়ে আছে—"জার্ম্মাণীর অবস্থা আর ফ্রান্সের অবস্থা কি এক? জার্ম্মাণীর যে নর-নারী তারা স্বভাবতঃ শৃঙ্খলীকৃত ও সংঘবদ্ধ; সেখানকার নরনারী যখন তখন যে কোন সংঘের ভিতর ঢুকতে পারে। বক্তৃতা দিয়ে শিখাতে হয় না, সংঘের ভিতর ঢুকা অতি সহজ, আর সেখানকার সুবিধাগুলা তারা সহজেই নিজস্ব করতে পারে। সেখানে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়। তাতেও জার্ম্মাণদের ভ্রুক্ষেপ নাই। স্বাধীনতার স্বাদ জার্ম্মাণী জানে না। ফরাসী কি তাই? ফরাসীরা কেমন? যুগযুগান্তর ধরে, প্রত্যেক সমাজে, সমাজের প্রত্যেক স্তরে যে ফরাসীর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বর্ত্তমান অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থায় উঠতে স্বাধীনভাবে চেষ্টা করেছে, সেই ফরাসী মহলে কি এই নিয়ম খাটতে পারে? কি রকম ফরাসী? যে ফরাসী জমি জমার আইন এমন করে ফেলেছে যার ফলে সব ছোট ছোট টুকুরো টুকরো জমি, যাতে জমিদার নামক বস্তু নাই, যদি থাকে সে জমিদার কি রকম? ছোট ছোট জমির স্বাধীন মালিক; যেখানে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, এত বেশী সেই ফরাসী দেশে কিনা আইন করতে হবে? এই যে ফরাসী কারখানা এই যে শিল্প, এতে কি দেখতে পাই? যেখানে সকলে ছোট-খাট শিল্পের মালিক, অল্প মূলধন-বিশিষ্ট কারখানার মালিক, সেই সমাজে আবার আইন? এ জিনিষ ফরাসীর বিশেষত্ব—

এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার ফরাসী ভূমি।

এ জিনিষটা না আছে বিলাতে, না আছে জার্ম্মেণীতে, না আছে আমেরিকায়।" এভাবের বক্তৃতা চলেছে। বাঙালী চরিত্রেও ,অনেকটা এইরূপই দেখা যায়। বক্তৃতা করতে করতে কেহ বলছে—"বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে, যে আন্দোলনের ঢেউ জাপান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে সেই জাপান হইতে ইত্যাদি।" সেইরূপ বুকনিই শুন্‌ছি এই ফরাসী পণ্ডিতের মুখে। তিনি আবার বল্‌ছেন—"স্বল্প মূলধন-বিশিষ্ট অল্পায়তন কারখানার মালিক, যাদেরকে কোন দিন প্রবল-আয়তন কারখানার মালিকেরা ধ্বংস করতে চেষ্টা করেনি, ছোট ছোট মালিক যারা তাদের থেকে কেহ কেহ বড় মালিক হয়েছে কিন্তু তারা ছোটগুলোকে ধ্বংস করেনি,—সেজন্য বড়দের নিকট ছোটদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত" ইত্যাদি।

বীমা আইন সম্বন্ধে ফরাসী মজুর

এখানে মালিক নিজকে নিজেই ধন্যবাদ দিচ্ছেন। বইখানি কে লিখেছেন? ধরুন যেন টাটা কোম্পানীর মালিক লিখেছেন। তিনি বলেছেন তিনি মজুরদের জন্য যা করেছেন পৃথিবীতে আর কেহ তা করে নি। কুলী মজুর কেরাণী তারা কি সেকথা বলবে? তারা

বলবে—"তাত আমরা জানি না।" সেইরূপ বড় একটা ফরাসী কারখানার মালিক বক্তৃতায় বলছেন—"কেরাণী ও গরীবদের জন্য আমরা যা করেছি, কেহ কখনও তা করেনি, আমরা গরীবদের কখনো বেঁধে রাখিনি।" গরীবদের জিজ্ঞাসা করলে বলবে—"ওর মত জুয়াচোর, বাটপাড় কেহ নাই। যুক্তি দেখাচ্ছেন জার্ম্মাণীতে যে রকম আইন, ফরাসী দেশে তার দরকার নাই। কারণ ছোট ছোট মালিক, ছোট ছোট জমিদার, ছোট ছোট কারিগর, ছোট ছোট কুটীর শিল্পী এ হচ্ছে আমাদের দেশের ফরাসীদেশের বিপুল সমাজ-শক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপুল আর্থিক শক্তি। যেন ফরাসী পুঁজিপতি আর জার্ম্মাণ পুঁজিপতি জাতে ফারাক!"

ঐরূপ লোক থাকা সত্ত্বেও ফরাসীরা এতদিনে আইন বিধিবদ্ধ করেছে। কারা করেছে? মজুরদের প্রতিনিধিরা। ওদের দেশে ৪ কোটী লোক তার মধ্যে প্রায় এক কোটী লোক এই আইনে পড়েছে। তাদের খরচ দেওয়া হবে. অর্দ্ধেক দিচ্ছে মজুররা আর অর্দ্ধেক দিচ্ছে কারখানার মালিকরা।

যুবক ভারতের সমস্যা

কি ফ্রান্স কি জার্ম্মাণি কি ইংলণ্ড সকল সভ্য দেশেই জনসাধারণ ব্যাধি বার্দ্ধক্য ও দৈব বীমা দ্বারা পেন্সন পাচ্ছে। আমাদের পক্ষে সে রকম ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা জানিনা। ১৯২৬ সালে এ জিনিষ আমরা ধারণা করতে পারি কি? অথচ এ ব্যবস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না করব, কর্ম্মদক্ষতা বলে জিনিষ কাকে বলে বুঝতে পারব না। স্বদেশসেবা হিসাবে যদি কাজ করতে চাই, পারব না। ইউরোপের সঙ্গে যদি টক্কর দিতে হয়, পারব না। যে কোন দেশের সঙ্গেই টক্কর দিতে হয় পারব না। আমাদের টক্কর দিতে হবে কার সঙ্গে? একবার ভাবি কি? চোখের সামনে দেখি লড়াইয়ে জার্ম্মাণির হাড় একেবারে ভেঙ্গে গেছে। বিসমার্কের সাধের সাম্রাজ্য ঠুঁটা হয়ে রয়েছে। কিন্তু ওদের আর্থিক দৃঢ়তা অটুট আছে। বিসমার্কের আধখানা কাজ ষোল কলায়ই খাড়া রয়েছে। তা যতক্ষণ ঠিক থাকবে ওদেশকে নড়াতে কেহ পারবে না। জার্ম্মাণী ত জার্ম্মাণী, মনে হয় ইতালী আমাদের থেকে একটু কিছু বেশী বটে কিন্তু আমরা ইতালীর কাছাকাছিও নই। আমরা কারু সঙ্গেই টক্কর দিবার পথে আজ দাঁড়াতে পারি না।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে এ সব করে উঠা দুরূহ হলেও তারই কথা ভাবতে হবে। পাঁচ কোটী বাঙ্গালীর মধ্যে দেড় কোটী বাঙ্গালী এরূপ আইন কানুনে বদ্ধ হবে যার ফলে আমরা আর্থিক হিসাবে স্বাধীন ভাবে নিশ্চিন্ত ভাবে এবং নিরুদ্বেগে যার যার কাজ কর্ম্ম করে যাব। এটা ১৯২৬ সালে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব মনে হচ্ছে। কিন্তু এইসব প্রণালী অবলম্বিত না হলে আমরা কোন কিছু করতে পারব না। আর এ যদি করতে পারি তাহলে অহরহ যেসব বুজরুকি ও আজগুবি কথা বলতে আমরা অভ্যস্ত সে সব কথাও আওড়াবার প্রয়োজন হবে না।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

একা

(আবু পাহাড়ে সূর্য্যাস্ত দেখিয়া)

একা হ'লে তবে পড়ে মনে!
উৎসব প্রাঙ্গণে,
সহস্র কর্ম্মের হাটে বল প্রিয়, কেন
পরশ না পাই তব? হেন
কম্প্র মূর্চ্ছনায়
বেজে উঠে হৃদি তন্ত্রী এ বনচ্ছায়ায়
অস্তোন্মুখ রবিকরে? উপত্যকা শ্যাম,
পল্লবিত বন্যবীথি নয়নাভিরাম,
নীলাভ হ্রদের ছায়া,—বল আজি কোন্
অজানার ডাকে কান পাতি' আনমন
নিস্তব্ধ দাঁড়ায়ে আছে! এ পার্ব্বত্য বায়
ব'হে আনে কোন্ বার্ত্তা সান্ধ্য ম্লানিমায়?
বল আজি শুণি,
কেন নাহি শুনি
সুদূর সংসারচ্ছন্দে তোমার নূপুর?
যখন নিখিলে তব মিলনের সুর
বাজে কহে গেছে সব প্রেমী, ঋষি, কবি,
সানুচুম্বী অস্তগামী রবি
রঞ্জিত সন্ধ্যায় কোন্ রাগিণী তোমার
বাজায় নেপথ্য হ'তে? আজি বসুধার
পীতোজ্জ্বল বক্ষে ধীরে আসি' ঘনাইয়া
গোধূলির ছায়া—কেন উদাসে এ হিয়া?

প্রতি মিলনের ক্ষণে
শঙ্কা কেন অনুক্ষণ জাগে বল মনে :—
শেষ হ'য়ে এল বুঝি হাস্য কলরব,
'আলোক, উৎসব
'ক্ষণিকের, তিমিরে সে মানে পরাভব;
'উজ্জ্বল নিষ্কম্প দীপও নিভিবে নিশ্চিত
'দেখিতে দেখিতে!' কেন হৃদয় কম্পিত,—
হারাই-হারাই সুর কেন উঠে র'ণে
প্রিয় সমাগমে সদা এ আকুল মনে?

প্রতি হাসে মাঝে কেন
বল হেন
নিরুদ্ধ দীরঘশ্বাস নিয়তই স্বনে!

চাহ কি বুঝাতে
কত অসহায় হ'য়ে আসি এ ধরাতে
মোরা নরনারী ল'য়ে আশা কামনার
মরীচিকা-ভরা ডালি? তাই বার বার
প্রতি হাসি গাঁথ বুঝি তুই অশ্রু মাঝে,—
যে মালা বিরাজে
বিলাতে উৎসব-শঙ্খে হাসির গৌরব,
ফুটাতে অশ্রুর কুঁড়ি বিগত বৈভব
প্রাণের শিশির জলে—সে হৃদয় যবে
পূর্ণতায় ভ'রে আসে নিভৃতে নীরবে?

অথবা হে প্রিয়, এই অশ্রু পারাবার
সঞ্চিত ব্যথার পার
রাজে এক অপরূপ সঙ্গীত মেখলা
অদৃশ্য অমরাপুরী! যে নৃত্যচঞ্চলা
বাজায় মুরলী তার সে অমৃত-পুরে
যার রেশ মিশে যায় এ পারের সুরে
যদি নাহি থামে হেথা মাঝে মাঝে হাসি
গীতি, নৃত্য, উৎসবের বাঁশি!

তাই বুঝি আজ
হে রাজাধিরাজ,
মূর্চ্ছিত পূরবী-তানে ছেয়ে দাও মোর
উদাস হৃদয়? টুটি' সর্ব্ব স্নেহ-ডোর
আলোক-মদির-লুব্ধ চঞ্চল এ হিয়া
চাহ উছসিয়া
এ প্রদোষে তব পায়ে দিতে লুটাইয়া!
তাই কি হাসিরে কর ম্লান অনুজ্জ্বল
রহিয়া রহিয়া? তাই এ হিয়া উচ্ছল?

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নির্ম্মলের ডায়েরী*

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাটির পাশের সংবাদ পেয়ে যেদিন সন্ধ্যাবেলা বাসার ছাদে একখানা কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়লাম, আমার সমস্ত দেহমন ক্লান্তি এবং মুক্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্তব্ধ হয়ে রইল। সে কি অবসাদ! আমার মনে হচ্ছিল নিঃশ্বাসটিও যদি আর না ফেলতে হয়, তাহলে একবার প্রাণ ভরে জিরিয়ে নিই। আমার জীবনের ছয় বছর বয়স হ'তে আরম্ভ করে আজ বাইশ বছর বয়স পর্য্যন্ত কেবলই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই কাটিয়েছি।

ষোলবছর পূর্ব্বে, দুই হাত দিয়ে মার গলা জড়িয়ে, তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে থাকা সত্ত্বেও যেদিন সকলে আমায় বিদ্যামন্দিরের দ্বারে উৎসর্গের জন্য নিয়ে এল, সেদিন আমারই মত উৎসর্গকরা নৈবেদ্যগুলি আমার উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চেয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ছে দেখে দ্বিগুণ ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ছিল। তারপর বুঝতেই পারি নি কখন আমিও ওদেরই মত হয়ে গিয়েছি। নূতন কেহ এলে ওদেরই মত তার দিকে চেয়ে হেসেছি। মাষ্টার মশাইকে জব্দ করবার নিত্যনূতন উপায় ওদেরই সঙ্গে বার করেছি।

একটি বিষয় আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারতাম না। আমার সমস্ত মন যখন ঘোষেদের আমবাগানে ছুরি নুন নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত, তখন ঘাড় হেঁট করে স্নু-ঔ-জস্ করতে হবে, সেটা বড়ই খারাপ লাগ্‌ত। তখন আমার যা কিছু করবার ইচ্ছা হত সে সকলের ওপরেই দেখতাম জ্বলন্ত অক্ষর দিয়ে লেখা আছে—নিষেধ। তার পর সেই সমস্ত নিষেধের কাছে মাথা নীচু করে এতকাল চলে এসেছি একটা কলের মত। খুব সুনাম পেয়েছি—আমি একটি ভাল কল তৈরি হয়েছি বলে। যেদিন মুক্তি পেলাম, সেদিন একটা কিছু করতে ইচ্ছা করছে না দেখে কিছুই আশ্চর্য্য হ'লাম না। কেন না আমার ইচ্ছার ওপর যে ষোল বছরের পাথর চাপা রয়েছে। সে যে পঙ্গু! আজ তাকে ছুটি দিলে কি হবে?

ষোলবছর পূর্ব্বেকার সেই সমস্ত ছোট খাট ঘটনাগুলি একটি একটি করে আমার

---

*মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ৺গোকুলচন্দ্র নাগ "বঙ্গবাণী"তে প্রকাশের জন্য "মুক্তি" নামে একটি নাটিকা দিয়া গিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার অল্পবয়সের কয়েকটি লেখাও আমার কাছে ছিল। 'কাঁচা লেখা' বলিয়া তিনি এগুলি ছাপাইতে চাহিতেন না। তাহারই মধ্যের একটি ছোট গল্প আমরা এইসংখ্যার "বঙ্গবাণীর" পাঠক পাঠিকাদের উপহার দিতেছি। সব কয়টি ধীরে ধীরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। পাঠক পাঠিকারা দেখিবেন কঠিন আত্ম সমালোচক গোকুলচন্দ্রের "কাঁচা লেখা"ই আজকালকার মাসিকের সাধারণ গল্প অপেক্ষা কত ভাল। ভবিষ্যৎ "রূপরেখা" ও "পথিকে"র লেখকের গল্প লিখিবার শক্তির পরিচয় তাঁহার এই প্রথম উদ্যমগুলির মধ্যেই যথেষ্ট পাওয়া যায়।

শ্রীসুনীতি দেবী

চোখের সামনে ফুটে উঠে, আমি জেগে আছি কি স্বপ্ন দেখছি তা ভুলিয়ে দিয়েছিল। মৃদু বাতাস মালতীর গন্ধ নিয়ে, আমার ক্লান্ত দেহে মধুর পরশখানি বুলিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ কেন জানি না আমার কান দুটি যেন কিছু শোন্‌বার জন্য সজাগ হয়ে উঠ্‌ল।

আমাদের বাসার পাশের বাড়ীতে কে গান গাইছে। ছুটে এসে পাঁচিলের কাছে দাঁড়ালাম। ও কি গান ?

"আমি যে আর
সইতে পারিনে।"

কি করুণ সুর !

"হৃদয় লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথাভরা ফুলের ভারে গো
আমি যে আর বইতে পারিনে।"

একি হয়ে গেল আমার ! আমার সমস্ত প্রাণ যেন কেঁদে বলছে—আমিও যে আর সইতে পারিনে !

কি সইতে পারে না সে ? আমার হৃদয়লতার ব্যথার কুসুম, সে ত বহুপূর্ব্বে তপ্তধূলায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আজ তার জন্য এমন করে মন আকুল হ'য়ে উঠল কেন ?

ষোলবছরের রুদ্ধব্যথার ভার এমন করে এক মুহূর্ত্তে একটি গান দিয়ে কে নামিয়ে নিল গো ! ওগো অপরিচিতা, এ তুমি আমায় কি শুনালে !

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। চোখ মেলে দেখি সূর্য্যোদয় হচ্ছে ! নিজের অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ছাদের পাঁচিলের কাছে সারারাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌লাম। তখনও বাসার আর কেউ জাগেনি। আমি ঘরে এসে বস্‌লাম। আর বুকের ভিতর তেমন ভার বোধ হচ্ছে না, বড় আরাম পেলাম। সারাদিন সকলের সঙ্গে গল্প করে কাটালাম। আমার মুখে হাসি দেখে বন্ধুরা একটু অবাক হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যাবেলা ছাদে এসে বস্‌লাম। আবার সেই গান। আমার ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে তার পায়ের কাছে বসে পড়ি।

মাকে চিঠি পাঠালাম—এবার ছুটিতে বাড়ী যাব না, বাসাতেই থাক্‌ব মনে করছি, আর এখান থেকেই কোনরকম কাজের চেষ্টা দেখ্‌ব—ইত্যাদি। চিঠি ডাকে দিয়ে সারাদিন পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে দিলাম। আমার তখনকার মনের অবস্থার ঠিক্ বর্ণনা কর্‌তে পারব না। আমার মন পূর্ব্বে কখনও এমন অশান্ত হয়নি ; এত বেশী ব্যাকুলতা কখনও আমার বুকে জাগেনি।

সন্ধ্যাবেলা যেন কিসের আকর্ষণে আবার ছাদে এসে বস্‌লাম। রাত ক্রমেই গভীর

হয়ে এল, কিন্তু আজ আর গান হল না। ক্ষুণ্ণ মনে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুমাতে পারলাম না। কেবলই মনে হতে লাগ্‌ল হয়ত এইবার গাইবে। সকালে জেগে উঠে নিজের ওপর বড় রাগ হতে লাগ্‌ল। কেন ঘুমালাম, হয়ত সে গেয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যায়ও গান হ'ল না। বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠ্‌ল। বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তাদের বাড়ীর সাম্‌নে এসে দেখি তালা বন্ধ। বাসায় ফিরলাম। সে রাত্রি শুতে পারলাম না। এমন করে আমার গলায় ব্যথার মালাটি পরিয়ে দিয়ে সে কোথায় লুকাল!

তারপর একমাস কেটে গেছে, আর একদিনও গান হয় নি। তবু প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় ছাদে বস্‌বার প্রলোভন কিছুতেই দমন করতে পারতাম না।

সেদিন খুব বৃষ্টি নেবেছে। বাদ্‌লার হাওয়া চারিদিক কাঁপিয়ে হা হা করে ছুটে চলেছে। জানালার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে, বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছি, কৃষ্ণচূড়ার ফুলে ভরা ডালগুলি অবিশ্রান্ত বৃষ্টির আঘাতে আনন্দে মাতাল হয়ে দুলে দুলে উঠ্‌ছে। আমার চোখ দুটি কেন যে জলে ভরে উঠ্‌ছিল তা জানি না! কি আমার ব্যথা? কি চাই আমি?

চাকর আমার হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল। খুলে দেখি বাবা টেলিগ্রাম করেছেন।

এতদিন আমার নিজের ইচ্ছা বলে কিছুই ছিল না। যা কিছু আদেশ হয়েছে তা সমস্তই মেনে চলেছি। আজ কেন জানি না! বিদ্রোহের আগুন দারুণ তেজে আমার মনের মধ্যে জ্বলে উঠ্‌ল।

বাড়ীতে ঢুকে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সবাই ব্যস্ত। কাজের লোকের হাঁক ডাকে, ছেলেমেয়েদের আনন্দের কোলাহলে, একটা কোন বড় রকম ব্যাপারের আভাস দিচ্ছে। বিস্তর লোক-সমাগম হয়েছে। চেনা অচেনা সকলেই আমার মুখের দিকে চেয়ে, একটু বিশেষ করে যেন কোন বিষয়ের আলোচনা করতে লাগ্‌ল। অন্দরে পা দিতেই নবাগতা মেয়েদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য, একটু কৌতুক-মেশান কানাকানি আমার বুকটাকে কাঁপিয়ে দিল।

মার কাছে এসে দাঁড়াতেই তিনি আমার সমস্ত অকল্যাণ অজস্র আশীর্ব্বাদ দিয়ে মুছে নিলেন। আমি একটু অভিমানের সঙ্গেই বলে ফেললাম, মা, এ সমস্ত কি? তিনি হেসে কেঁদে আমার মাথাটা বুকে চেপে বল্‌লেন,—কি সমস্ত? আমি বল্‌লাম,—এই যে এত আয়োজন? মা আমার কথা শেষ না হ'তে দিয়ে বলে উঠলেন,—তোর বিয়ে, আয়োজন হবে না? বিয়ে কি অমনি হয় রে পাগলা? আমি বললাম,—না, মা, এ আমার

ভাল লাগছে না। আমি কিছুতেই পারব না। মা অবাক্ হয়ে বললেন,—পারব না কিরে? পরশু তোর বিয়ে, আজ বলছিস 'পারব না।' শোন একবার ছেলের কথা। আমি বললাম, —এর পূর্ব্বে তোমরা ত আমার মত জিজ্ঞেস করনি। মা এবার ভয় পেয়ে বললেন,—তোর কথাটা কি শুনি? আমি বললাম,—এ বিয়েতে আমার মত নেই।

মা যেন কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর নির্ম্মলের কোন স্বতন্ত্র মত যে থাক্‌তে পারে, তা হয়ত তাঁর ধারণার বাইরে ছিল।

আমার কথা মেয়ে মহলে যখন প্রচার হয়ে গেল, সকলেই একমত হয়ে বল্‌লেন, এমন সৃষ্টিছাড়া কথা তাঁরা কখনও শোনেন নি।

সন্ধ্যার পর হরি এসে খবর দিল, বাবা আমায় ডেকেছেন। বাবা ডেকেছেন শুনেই আমার বুকের একদিক্ হতে আর এক দিক্ পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেল। আমি সেদিন যে রকম করে' তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম সেই অবস্থায় যদি কেউ আমায় দেখত, তাহলে নিশ্চয়ই আমার সেই ছয় বছর বয়সের সঙ্গে এই বাইশ বছর বয়সের কোন পার্থক্য দেখতে পেত না।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন,—কি হয়েছে রে নিল্? তুই তোর মাকে কি বলেছিস?

কথাটি অত্যন্ত শ্বেতবর্ণের হলেও ওরই ভেতর রক্তবর্ণটি বেশ সজাগ আছে বুঝতে আমার বাকি রইল না।

আমি মনকে বেশ শক্ত করেই এসেছিলাম। তাই একটুখানি এদিক ওদিক চেয়ে গলাটাকে পরিষ্কার করে বললাম, এবিয়েতে আমার…।

আমার মুখ দিয়ে কোন মতেই আর শেষের কথাটি বেরুল না। বাবা বললেন,—এ বিয়েতে তোর কি? তিনি এমনভাবে এবার কথাগুলি বললেন যে আর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করবার কল্পনাও করতে পারলাম না। মাথা নীচু করে চলে এলাম।

আজ আমার বিয়ে। সকাল থেকে এই দেহটীর ওপর ওরা কত রকমে অত্যাচার আরম্ভ করে দিল। ওগুলিকে অত্যাচার বলতে আমি পারি; কেন না আমার মন যে কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। বাড়ীর ভিতর থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে দেখি, আমার জন্য সকলে অপেক্ষা করে আছেন। দু একজন বন্ধু আমার সঙ্গে কিছু রসিকতা করবার জন্য কাছে এসে দাঁড়াল, কিন্তু আমার মুখের দিকে চেয়ে কেউ সাহস করে কিছু বলতে পারল না। আমিও বাঁচলাম।

তারপর সে কি শাস্তি সুরু হ'ল। ওরা যখন একখানা চাদর আমাদের মাথার ওপর ঢেকে দিয়ে পরস্পরের দিকে চাইতে বাধ্য করাল, কি ভীত চাহনি তার! সে ছবি আজও আমার বুকে আঁকা হয়ে রয়েছে। এই অজানা বাড়ীতে এসে একঘর মেয়ের মধ্যে কি

করে যে সে রাত কাটালাম তাই ভেবে আজও আশ্চর্য্য হয়ে যাই। মাঝে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে দেখি লাল চেলীর ভিতর দিয়ে দুটি কাল চোখ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু দূরে কতকগুলি ছোট ছেলে মেয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। তখন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি ছাদে এসে দাঁড়ালাম।

ফুলশয্যার রাত্রে যখন ঘরে এলাম, দেখি আমার বিছানায় একরাশ ফুলের মতই সে তার দেহখানিকে মেলে দিয়েছে। মুখের ওপর কি আশ্চর্য্য নির্ভরতা! নূতন জায়গায় এসে, এমন নিশ্চিন্তভাবে কেউ ঘুমাতে পারে তা জানতাম না।

তার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালাম। নিজের প্রতি ঘৃণায় মন ভরে গেল। সমস্ত জেনে কেন এমন সর্ব্বনাশ করলাম? কাপুরুষের মত অন্যায়ের কাছে মাথা নীচু না করে, আমার ইচ্ছামত কাজ করা ত আমার ক্ষমতার মধ্যেই ছিল। ও আমার কি করেছিল? আমার বুকের আগুনে আমি পুড়ে ছাই হতাম, ওকে সেই সঙ্গে পুড়িয়ে আমার কি লাভ হল!

হঠাৎ চেয়ে দেখি ফুলগুলি দেহ ধরে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দুই হাত দিয়ে তাকে ঠেলে দিয়ে বললাম—সরে যাও। এই আমার প্রথম স্ত্রী সম্ভাষণ! তারপর ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল'ম।

সকালে বাবাকে বললাম, আমি কিছুদিন বাইরে বেড়িয়ে আসতে চাই। আশ্চর্য্য সেদিন তিনি কোন কারণ জানতে চাইলেন না। আমার হাতে এক া নোটের তাড়া দিয়ে বললেন, এতে সাতশ' কুড়ি আছে। যদি না কুলায় পরে জানিও। পাঠিয়ে দেবো।

বাবার আজকার ব্যবহারটি আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন! আমি তাঁকে প্রণাম করে চলে আসছিলাম, তিনি ডেকে বললেন,—তুমি এখন বড় হয়েছ, অনেক লেখাপড়া শিখেছ, তোমাকে কোন উপদেশ দেব না, শুধু এই কথাটি মনে রেখো,—সমস্ত বোঝবার পূর্ব্বে যা তা একটা বিচার করে নিজেকে মাটি করো না।

আজ প্রায় আটমাস বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছি। ভারতের অনেক তীর্থে ঘুরে বেড়ালাম। তবু আমার মনের আগুন নিবল না যে! মাঝে একবার কলকাতায় ফিরেছিলাম, শুধু সেই গান শোনবার জন্য। দূর হতে জীবনে অন্ততঃ আর একবার যে ঐ গান শুনতে চাই, আমার সে আশা কি মিট্‌বে না?

তখন চিত্রকুটে আছি। বাবার চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, তাঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়েছে, দিনকতক তীর্থে বেড়াতে চান। কোন বিশেষ দরকারে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে।

বাড়ী ফিরে মাকে কোনপ্রকারে শান্ত করে বাবার কাছে এলাম। তাঁর দেহে কতই

না পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। চোখ ছুটির সে তীব্রতা কমে গিয়ে কি অপূর্ব্ব শাস্তভাব ফুটে উঠেছে। সেই গর্ব্বিত ঠোঁট ছুটির ওপর কি মধুর হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি আমায় কাছে বসিয়ে শীর্ণ হাত ছুটিতে আমার মাথা ধরে বললেন,—তোর চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন রে নিল্? এত ঘুরে বেড়ালি তবুত কিছু সারতে পারিস্ নি!

একটু থেমে আবার বল্‌লেন,—কারবারের যা কিছু, তোকে এবার সব বুঝে নিতে হবে। সমস্তই ঠিক করা আছে, এইগুলি পড়লেই বুঝতে পারবি। বেশি শক্ত যদি কিছু লাগে তাহলে আমার কাছে আসিস্ বুঝিয়ে দেব।

আমি ভাবলাম, এতদিন শূন্য মনে ঘুরে বেড়িয়ে আমার শূন্যতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছি, দেখি যদি এবার কাজের মধ্যে ডুবে মনটাকে হাল্কা করতে পারি।

সেই সমস্ত লেখা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। অর্দ্ধেকেরও বেশি সম্পত্তি তিনি সাধারণের উপকারের জন্য ব্যয় করেছেন! বেশ মনে আছে এক সময় আমাদের গ্রামের লোকেরা কোন পূজা উপলক্ষে নাচ গানের খরচের জন্য তাঁর কাছে কিছু সাহায্য চাইতে আসে। তিনি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অবধি তাঁর ওপর কত নিন্দা বর্ষিত হয়ে এসেছে। সেই অবধি আমার মনের ভিতরেও তাঁর প্রতি কেমন একটা বিদ্বেষভাব ছিল। তিনি যে ভিতরে ভিতরে এমন সমস্ত কাজ করেছেন, তার কিছুই জানতাম না।

সন্ধ্যাবেলা যখন তাঁর পা ছুটি মাথায় চেপে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেল্‌লাম, তখন তাঁর চোখ ছুটিও শুক্‌নো ছিল না। আমায় বল্‌লেন,—নিল্, তোমার ওপরই সব ভার রইল। নিজে যা ভাল বুঝবে তাই করো। লোকে কি বল্‌বে তাই ভেবে নিজের ইচ্ছাকে কখনও কলুষিত হতে দিওনা। তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনের সমস্ত গ্লানি মুছে যাক্।

মা আর বাবা চলে যাবার পর একমাস কেটে গিয়েছে। আমি তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাব ইত্যাদি দেখে দিনের বেলা যতটা পারি মনকে ভরিয়ে রাখি, কিন্তু সন্ধ্যা হলে আর কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পারি না, কি এক অসহ্য বেদনায় মন ভরে যায়।

একমাস বাড়ী এসেছি, এর মধ্যে একবারও আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় নি, দেখা করবার ইচ্ছাও করে নি। কাল খাবার সময় একবার পিছনের দিকে চোখ পড়ায় দেখতে পেলাম, অতি সন্তর্পণে কে একজন দরজার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। এই কি আমার স্ত্রী? কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! ফুলশয্যার রাত্রে ওকে একরাশ কুন্দ আর চামেলীর মতই দেখেছিলাম, তাকেই আজ দেখ্‌লাম যেন বৈশাখের রৌদ্রতাপে শুকান লতা। কি ব্যথাভরা

করুণ তার চাহনি। অনুশোচনায় মন ভরে গেল। কিন্তু কোন উপায় যে খুঁজে পাচ্ছি না। আমার এই বিকিয়ে দেওয়া মন নিয়ে ওর কাছে দাঁড়াব কি করে ?

সমস্তদিন পাগলের মত ঘরের ভিতর ছুটাছুটি করেও মনকে শান্ত করতে পারলাম না। আর সহ্য করতে পারছি না। চাকরকে ডেকে তার হাতে একখানা নোট দিয়ে বল্‌লাম—নিয়ে আয়—।

তখন গভীর রাত্রি। সামনের টেবিলের ওপর একটি বোতল রেখে বসে আছি, গ্লাসে খানিকটা ঢালা আছে, স্যাম্পেনের ঈষৎ হলদে রংএর ওপর বাতির আলো পড়ে সমস্ত মনটাকে রঙ্গিয়ে দিচ্ছে। এখনি যত বেদনা যত দুশ্চিন্তা মুছে গিয়ে রঙ্গিন স্বপ্নে মন ভরপুর হয়ে যাবে।

হাত বাড়িয়ে গ্ল্যাস ধরলাম। একি হল ? কিছুতেই যে ওটি মুখের কাছে আন্‌তে পার্‌ছি না। এমন করে আমার সমস্ত দেহ কেঁপে উঠ্‌ল কেন ? ও কিসের শব্দ ? এযে কান্না ! একি আমার বুকের ভিতর হতে বেরিয়ে আস্‌ছে ? মাথাটি নীচু করে বুকের কাছে নিয়ে এলাম,—কই না ! জানালাটিকে ভাল করে খুলে দিলাম।

একি শুন্‌লাম ! এ যে সেই সুর ! একদিন যা আমার বুক ভরে দিয়েছিল ! ছুটে উপরে উঠে এলাম। আমারই ঘরের ভিতর হ'তে যে ঐ সুর উঠ্‌ছে !

দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরলাম। ভগবান আর কিছুক্ষণ আমায় শুন্‌তে দাও। ঐ গান শোন্‌বার জন্য আজ এক বছর পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। আজ আমারই ঘরের মধ্যে তাকে পেলাম ! আমার কান দুটিকে যে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি কি পাগল হলাম ? দরজার চৌকাঠের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম।

আমার বুকের ওপর মুখ রেখে আকুল কান্নায় কে আমার সব ভাসিয়ে দিল ! তার মাথাটি তুলে ধরে বল্‌লাম,—কে তুমি ? সেই কান্নার সুরেই সে বলে উঠল—আমি মাধুরী। কেন্ তুমি নিজেকে এমন করে কষ্ট দিচ্ছ ?

আমার সারা দেহ মন গেয়ে উঠ্‌ছে—

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাই নি !
আমি বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয় পানে চাই নি।"

৺গোকুলচন্দ্র নাগ

হরিহরাত্মা

বা

একদেহে শিক্ষক ও গৃহশিক্ষক

গিন্নি বলেন—"ওগো, হাঁগো, শুনছো নাকি ডাকছে কাক,
ওঠো, ওঠো, ফরসা হ'ল কত ঘুমোও আর না থাক।"
" মধুর বাণী শুনে তাঁহার ধড় ফড়িয়ে উঠি জেগে,
মুখ হাত ধুয়ে, আরও কিছু সেরে নিয়ে ছুটি বেগে,
সেই যে চাকা চালিয়ে দি ভাই, থামে কখন শুনতে চাও?"
"নিশায় সেটা দশ ঘটিকা?—তারও বেশী?" "হয় তাহাও।
ইহার পরও ফাণ্ড আছে ভাই, এইখানেতেই দাঁড়ি নয়,
নাকে মুখে দিয়েই বসি নিয়ে খাতার কাঁড়ি কয়।"
" বারটা?"—"সে প্রতিদিনই, একটা দুটোও হয় কভু,
ভাবি এবার হাত পা ছড়াই, হায়রে রেহাই নেই তবু;
কল্লে খোকা শয্যা-প্রান্তে 'অপোকম্মো' এই সময়,
চড়া সুরে গিন্নি জুড়ে রাগ রাগিণীর দিলেন "জয়",
খুকী কোণে ঘুমুচ্ছিলেন, জেগে উঠে দিলেন তাল,
কপালে হাত দিয়ে ভাবি—কেমন আমার রাজার হাল;
বেহায়া চোখ জুড়ে আসে, শোনে না ভাই এ হাঁক, ডাক,
একটুখানি চোখ এঁটেছে, অমনি শুনি—"ডাকছে কাক";
এতেও যদি কে আমরা বুঝতে নারো,—বুঝব ভাই,
—রাগ কোরোনা—বুঝবো তোমার একটু ঘটে বুদ্ধি নাই;
আমরা যে ভাই বঙ্গভূমির ছ্যাকৃড়া গাড়ীর পক্ষীরাজ,
রাত্রি দিবা ছেলে চরাই, নিজেও চরি সকাল সাঁঝ।"
" কাঁদছো কেন? ভাব দেখি ছুটী আহা পাও কত।"
" ছুটীর পায়ে নতি জানাই; সইতে পারি তাই অত;
ছুটীর কথাই বল্লে যদি—কথা তবে কই দু'টি,
বিদ্যালয়ে পেলেও তাহা, সকাল, বিকাল নেই ছুটী।"
"উপ্‌রি পাবার আশায় খাটো, খাটায় কি কেউ পায় ধরি'?"
"নইলে যে ভাই পেট চলেনা, তিল কুড়িয়ে তাল করি;

তোমরা যা' ভাই একমাসে পাও, পাই না মোরা নয় মাসে,
দেখে মোদের দশা তোমার মোটর চালক,—সেও হাসে।
তারাও ছোটে, মোরাও ছুটি, তফাৎ তবু অল্প নয়,
তার মোটরের ক্ষিপ্ত কাদায় মোদের অঙ্গ সিক্ত হয়;
চরণ মাঝির নৌকা চড়েই বর্ষা মোরা দেই পাড়ি,
ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী ছুট্‌ছেরে ভাই, ছয়টা ঋতু সব বাড়ী.
উপায় নাই, হায় নিরুপায়, পেটের জ্বালা ভয়ঙ্কর।
মোদের পরেই নির্ভরিছে, ভবিষ্যতের বংশধর।
ঘরেতে যা'র নিত্য অভাব, হাড়ীতে যা'র নাই কো চাল,
ছেলে মেয়ের শুক্‌নো মুখ আর মায়ের তাদের হাড়ীর হাল,
মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়া, মা, বাপ বুড়া, সব আছে,
দশের যাহা থাকে, আছে, মুদ্রা শুধু নাই কাছে,
সেকালে ভাই দেশে নাকি ছিল এদের বেজায় মান,
তারি জোরে বেচারীদের টিঁকে তবু থাক্‌তো প্রাণ;
হালে কিন্তু দেখে শুনে এটা বিশেষ বুঝ্‌ছি ভাই,
মুদ্রা যখন নাইকো তাহার, তখন তাহার কিছুই নাই;
দিবারাত্র পরিশ্রমেও ভরে না যার শূন্য হাত,
তাদের পরে নির্ভরিছে দেশের যত সোনার চাঁদ।
ঠাকুর চাকর ভাগলে পরে মাথায় ওঠে পদ্মচোখ,
শিক্ষকের আবশ্যকে—অর্দ্ধোদয়ের মস্তযোগ,
শিক্ষিত ভাই পায় না খেতে, লেখাপড়া হায় কি পাপ।
যে পায় তারও পেট ভরে না, বাণীর প্রতি বিধির শাপ,
তোদের কথা কে শোনে ভাই, আছে আবও বহুৎ কাজ,
চালাও, চালাও, ঘোরাও চাকা, শিক্ষাবাহন পক্ষীরাজ।
জোরসে টান ছ্যাকড়া গাড়ী;—যে দিন ঘোড়ার ছুট্‌বে দম,
সে দিন ঘোড়া চড়বে গাড়ী, অবাক হয়ে দেখ্‌বে যম।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

জাপানের সামাজিক প্রথা

মাধ্যমিক শিক্ষা

পূর্ব্বপ্রবন্ধে জাপানের প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলিয়াছি; এবারে মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতির সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই; কিন্তু নানাবিধ গুরু কাজ-কর্ম্মের মাঝে পড়িয়া অবসরের অভাবে আমার দুইটী প্রবন্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এত দীর্ঘতর হইয়া উঠিয়াছে যে, সেজন্য পাঠকগণের নিকট সর্ব্বাগ্রে আমি ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

আপনারা সকলেই জানেন যে, জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক; সুতরাং বালকবালিকা নির্বিশেষে সকলকেই উহা গ্রহণ করিতে হয়; মাধ্যমিক শিক্ষা কিন্তু বাধ্যতামূলক নহে; এবং ইহাতে আজকাল খরচপত্রও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া দরিদ্রের পক্ষে এই মধ্যশিক্ষা লাভ করা কতকটা কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তবুও আজকাল জাপানীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এত অধিক যে, শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাহারা শিক্ষালাভে যত্নবান হয়; এবং উহা লাভ করিতে না পারিলে সমাজে লজ্জার কারণ হয়। এইজন্য যাহারা দরিদ্র তাহারাও শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পড়াশুনা চালায় কেহই সহজে শিক্ষা লাভের আনন্দ ও সম্মান হইতে বঞ্চিত থাকিতে চায় না। কাজে কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষা যদিও বাধ্যতামূলক নহে, তবু কার্য্যতঃ বাধ্যতামূলক হইয়াই দাঁড়াইয়াছে।

এদেশে সাধারণতঃ যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আসে তাহাদের আর্থিক অবস্থা জাপানী ছাত্রের তুলনায় অনেক ভাল; তবু তাহাদিগকে বৃত্তি বা সাহায্য লাভের দ্বারা পড়িবার খরচ সংগ্রহে ব্যগ্র দেখা যায়; কেহই শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থ সংগ্রহে যত্নশীল নহে। জাপানের অবস্থা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত; সেখানে ছাত্রেরা পড়িবার খরচ পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণের নিকট হইতে না লইয়া প্রয়োজনীয় অর্থ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা স্বয়ংই সংগ্রহ করে। ইহার জন্য কেহ খবরের কাগজ, কেহ বা দুধ ফেরি করে; কেহ কেহ বা ছাত্রদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাগজ, পেন্সিল, খাতা ইত্যাদি জিনিসগুলি নিজেদের মধ্যে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে; এমন কি, দরকার হইলে রিক্স টানিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হয় না। কেহ কেহ বা সকাল-সন্ধ্যায় কোথায় কোন কাজে নিযুক্ত হইয়া নিজেদের মাসিক আয়ের ব্যবস্থা করিয়া লয়। আমাদের দেশের ভাষায় এই সব দরিদ্র ছাত্ররা "কু গাকু সে" নামে পরিচিত। ইহারা বিদ্যালাভের জন্য যে কোন কাজ করুক না কেন তাহাতে ইহাদিগকে কেহ নিন্দা বা অবজ্ঞা করে না, বরং, নানা উপায়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দেয় ও সম্মান দেখায়। বিদ্যার্থীর প্রতি এই শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ভাব প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে; প্রতীচ্য সভ্যতার ফলে ইহা জাপানী সমাজে নব আগন্তুক নহে। এখানে আর একটী কথাও

বিশেষভাবে বলা দরকার যে, যে সব দরিদ্র ছাত্ররা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা পড়িবার খরচ সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন-ব্রত গ্রহণ করে, ছাত্রসমাজের মধ্যে প্রধানতঃ তাহারাই রত্ন এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে, শিক্ষায় ও রাজনীতিতে এ পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এই দরিদ্র ছাত্রসমাজ হইতেই উঠিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে প্রাইমিনিষ্টার ইতো, জেনারেল নার্গ প্রভৃতি অনেকেরই নাম করা যায়।

এই মাধ্যমিক শিক্ষাকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ 'মিড্‌ল্ স্কুল' বা সাধারণ মাধ্যশিক্ষা, দ্বিতীয়তঃ মহিলা শিক্ষা, তৃতীয়তঃ গুরুগিরি শিক্ষা এবং চতুর্থতঃ হইতেছে ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা। যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাদিগকে এই মাধ্যমিক সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আজকাল এই শ্রেণীর বিদ্যার্থী ও বিদ্যালয় প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে জাপানে এই বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ৩৮৫ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; এবং ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা যথাক্রমে ১৯৪,৪১৬ ও ৮২৪২ হইয়াছে। এই কথাটীও এখানে জানিয়া রাখা ভাল যে, এই মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলির কিছু বা গভর্ণমেন্ট-স্থাপিত, কিছু বা মিউনিসিপ্যালিটি অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত। এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পঠন-পাঠন চলিয়া থাকে।

(১) জাপানী প্রাচীন সাহিত্য ও ব্যাকরণ ইত্যাদি।

(২) চীনা ভাষা।

(৩) অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরাজী, কোথাও কোথাও বা জার্ম্মান ভাষা। যাহারা ভবিষ্যতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক বিশেষভাবে তাহাদিগকে এই জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। ইহাতে আপনারা আশা করি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জাপানী চিকিৎসাবিদ্যা প্রধানতঃ জার্ম্মানি চিকিৎসা বিদ্যারই অনুরূপ।

(৪) অঙ্কশাস্ত্র,—বীজগণিত, জ্যামিতি ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি।
(৫) রসায়ণ শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা।
(৬) উদ্ভিদ্ বিদ্যা।
(৭) প্রাণি বিদ্যা।
(৮) শরীর বিদ্যা।
(৯) ভূগোল শাস্ত্র—সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্ববিদ্যার সাধারণ শিক্ষা।
(১০) ইতিহাস—

(১) দেশীয়।

(২) প্রাচ্য, যথা—চীন, ভারত ও মধ্য এসিয়া প্রভৃতি।

(৩) প্রতীচ্য, যথা,—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মান ইত্যাদি।

(১১) সঙ্গীত বিদ্যা।

(১২) চিত্র বিদ্যা।

(১৩) অর্থনীতি, বাণিজ্য বিদ্যা, রাজনীতি, আইন বা ব্যবহার শাস্ত্র।

(১৪) এথিক্‌স্ বা নীতিশিক্ষা।

ইহা ব্যতীত এই বিদ্যালয়গুলিতে ড্রিল বা সামরিক ব্যায়াম বাধ্যতামূলক হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয়; এবং বাধ্যতামূলক না হইলেও আমাদের দেশের প্রাচীন ব্যায়াম-পদ্ধতির মধ্যে জিউজিৎসু, কেন্দ বা "তলোয়ার খেলা, সাঁতার কাটা, কুস্তি লড়া, নৌকা চালানো ও ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতির মধ্যে কোন না কোন একটী লইতে হইবে। ইহা ছাড়া টেনিস ও ফুটবল প্রভৃতি ব্যায়ামমূলক ক্রীড়ায় উৎসাহ দেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়া আসিয়াছি যে, আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থার শিক্ষাবিভাগের প্রধান লক্ষ্য থাকে এই যে, বালকবালিকারা যাহাতে নীতি ও ব্যায়াম শিক্ষালাভ করিয়া শরীর ও মনে বেশ সুগঠিত হইয়া উঠে। মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলিতে এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন লওয়া হয়। এখানে সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর পড়িতে হয়। প্রত্যহ সকাল আটটা হইতে স্কুল আরম্ভ হইয়া বেলা বারটা পর্য্যন্ত উহার কাজ চলে; তারপর একঘণ্টা কি বড় জোর দেড় ঘণ্টা বিশ্রাম। এই সময়ের মধ্যে ছাত্রেরা দুপুরের আহারাদি সারিয়া আসে। আবার দেড়টা হইতে তিনটা-চারিটা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কাজ চলে। গুরু ধরণের পড়াশুনা ইতিপূর্ব্বে সকালেই সারিয়া ফেলিয়া বৈকালের এই পড়াশুনাটা একটু সহজ ধরণের করা হয় এবং শারীরিক ব্যায়ামশিক্ষার আয়োজনও এই সময়েই হইয়া থাকে।

পাছে অনেকের ভুল ধারণা হয় এই ভয়ে এখানে আমাদের দেশের মধ্যাহ্নভোজন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে হইতেছে। অবশ্য একথা আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে জাপানীরা দিনে তিনবার ভোজন করে—সকালে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়। এসব কথা পূর্ব্বে একবার বিশেষভাবে বলা হইয়াছে বলিয়া এখানে কেবল আপনাদের স্মৃতির উদ্বোধের জন্য খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। সাধারণতঃ প্রাতর্ভোজন সারিয়া ছাত্রেরা স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হয় এবং মধ্যাহ্নভোজনের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য একটী ছোট বাক্সের ভিতর পুরিয়া সঙ্গে লয়। আমাদের দেশের ভাষায় এই বাক্সর নাম 'বেণ্ট'; ইহা প্রধানতঃ কাঠ ও ক্বচিৎ লোহার পাত দিয়াও তৈয়ারী করা হয়। এই বাক্সর ভিতরে একধারে ভাত ও আর একধারে তরকারী রাখিবার পৃথক পৃথক খোপ আছে। ছাত্রেরা এই বাক্স গুলি স্কুলের ভোজনগৃহে রাখিয়া আসিয়া পড়িতে বসে। অবশ্য আমার এই কথা হইতেই আপনারা আশা করি বুঝিয়া লইয়াছেন যে, জাপানে প্রত্যেক স্কুলের মধ্যে একটী করিয়া

ভোজনগৃহও আছে। ইহা ছাড়া স্কুল-কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছাত্রদের নিত্য দরকারী জিনিসের দুই-চারিটী দোকানও থাকে; ইহাদের মধ্যে একটি থাকে খাবারের দোকান। যাহাদের বাড়ী হইতে বাক্সে ভরিয়া মধ্যাহ্নভোজনের জন্য খাবার আনা সম্ভব হয় নাই, তাহারা এই দোকানেই উহা সারিয়া লয়।

ছেলেদের মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষালয়ের স্থূল কথাকয়টী বলিয়া লইলাম; তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ খেলা-ধূলা ও ছাত্রাবাস প্রভৃতি সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছু বলিবার আছে, তাহা পরে বলিব। আপাততঃ মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষায়তন সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। পূর্ব্বে বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতির সহিত আপনাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছি; আশা করি তাহা একেবারে ভুলিয়া যান নাই। তাহারা ১২।১৩ বৎসরে উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া মাধ্যমিক মহিলাস্কুলে প্রবেশ করে। এখানে পাঠ্য তালিকা ভেদে কোন-কোন স্কুলে চার বৎসর, কোন কোন স্কুলে বা পাঁচ বৎসর পড়িতে হয়। এই মহিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে 'উচ্চ মহিলা স্কুল' বলা হইয়া থাকে। দশ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া মেয়েরা সাধারণতঃ গৃহকর্ম্মেই নিযুক্ত হইত, উচ্চশিক্ষা গ্রহণে কেহ বড় অগ্রসর হইত না; কেবল ধনী বা অভিজাত শ্রেণীর মেয়েরাই এই ধারণাটিকে বহমান রাখিয়াছিল। কিন্তু আজকাল আমাদের দেশের ভাব এমন হইয়াছে যে, ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মেয়েদেরই, এই 'উচ্চস্কুলে' না পড়িলে, সমাজে নিন্দার কারণ হইয়া দাঁড়াইতে হয়। কাজেকাজেই এই স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে এই স্কুলের সংখ্যা ৪১৭১, শিক্ষকসংখ্যা ৭৪৫৮ এবং ছাত্রীসংখ্যা ১৭৬, ৮০৮২।

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা দরকার যে, মহিলাদের এই উচ্চ বিদ্যালয়গুলি ছাড়াও বালিকাদের সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা ও নানা সুকুমার শিল্প শিক্ষার জন্য অন্য স্কুল আছে; এমন কি অভিনয় প্রভৃতি শিক্ষাদানের জন্যও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহারা ভবিষ্যতে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, কেবল তাহাদের জন্যই উপরি-উক্ত 'মাধ্যমিক মহিলা স্কুল'গুলির প্রয়োজন। এখানকার পাঠ্যবিষয় ও কায়দা কানুন প্রায় ছেলেদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়েরই মত; কেবল ইংরাজীভাষা, অঙ্ক, চীনভাষা ও বিজ্ঞান প্রভৃতিতে তত প্রগাঢ় ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নাই। ইহার অবশ্য একটী প্রধান কারণ এই যে, মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ বিষয়গুলি ছাড়াও কতকগুলি নূতন বিষয় লইতে হয়, যেমন;—দেশীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত, রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি নারী-বৈশিষ্ট্য-সূচক নানা কলা ও শিল্পবিদ্যা এবং 'চা—দ' বা চা তৈয়ারী করিবার নিয়ম, 'শে-থা' বা ফুলের তোড়া বাঁধিবার কৌশল প্রভৃতি জাতীয় বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক অন্যান্য বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া মহিলাদের উপযোগী নানাবিধ

ব্যায়ামেরও আয়োজন আছে। খেলা হিসাবে টেনিস, ফুটবল, ব্যাড্‌মিণ্টন, পিং পং ও সাঁতার প্রভৃতির খুব চলন আছে।

পড়াশুনার সময়, মধ্যাহ্ন ভোজন প্রভৃতির' ব্যবস্থা ঠিক ছেলেদের মত ; উহাতে নূতন কথা কিছু বলিবার নাই। কেবল পোষাক পরিচ্ছদ ও ছাত্রাবাস প্রভৃতি সম্বন্ধে এখনও কিছু বলি নাই ; তাহা পরে ছেলেদের কথা বলিবার সময় বলিব। আপাততঃ গুরুট্রেনিং বা গুরুগিরি শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লইতে চাই।

যাহাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই বা হইবে না, অথচ শিক্ষকতায় জীবন কাটাইতে চায় প্রধানতঃ তাহারাই এই 'গুরুট্রেনিং' বা গুরুগিরি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয় ; এখান হইতে পাস করিয়া বাহির হইলে নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকতার পদ মিলে। অবশ্য যাহারা মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে তাহারাও ইচ্ছা করিলে গুরুট্রেনিং পাস না করিয়াও ঐ পদ লাভ করিতে পারে। তবে গুরুট্রেনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের দাবীই অধিক।

এই বিদ্যালয়ে পুরুষ ও মহিলা ভেদে দুইটী বিভাগ আছে। আজকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও বালক এবং বালিকাদের পৃথক পৃথক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রী গড়িবার জন্য এই বিভাগসৃষ্টির বিশেষ সার্থকতা আছে। এখানে মহিলা ও পুরুষ উভয়কেই পাঁচ বৎসর ধরিয়া পড়াশুনা করিতে হয় ; এবং উভয়ের পাঠ্য বিষয়ও প্রায় উভয়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ন্যায়—বিশেষ কোন তফাৎ নাই বলিলেও চলে, তবে ভবিষ্যতে ইহাদিগকে শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে বলিয়া শিক্ষাদানের প্রণালী ও পদ্ধতিগুলি বিশেষভাবে শিখানো হয়, ইহাই এই স্কুলের বিশেষত্ব।

অন্যান্য বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক ১০।১২৲ টাকা বেতন দিয়া পড়িতে হয় ; এখানে কিন্তু উহা বাধ্যতামূলক নহে। তবে যাহারা বিনা বেতনে পড়ে পাসের পর কয়েক বৎসর তাহাদের গভর্ণমেণ্ট স্কুলে কাজ করিতে হয়। বর্ত্তমানে এই স্কুলের সংখ্যা—৯৪ ; ছাত্রসংখ্যা ১৭৭২০, ছাত্রীসংখ্যা ৮৮৩৫ ; এবং শিক্ষক সংখ্যা ১৮১৮ মাত্র।

এইবার আমাদের দেশের Industrial School বা শ্রমিক বিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার। Industrial education বলিতে আমরা একটী সাধারণ সংজ্ঞা মাত্র বুঝি Commercial education বা বাণিজ্য বিদ্যা, Technical education বা শ্রম শিল্প বিদ্যা, Mercantine and marine education বা বণিক বিদ্যা অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্য দিয়া বাণিজ্য দ্রব্য কিরূপে আমদানী ও রপ্তানী করিতে হয় তাহার কথা, Navigation বা পোত পরিচালন বিদ্যা, এবং Seri-culture বা রেশম শিল্প বিদ্যা প্রভৃতি অনেক কিছু ইহার অন্তর্গত। কাজেই Industrial education সম্বন্ধে বলিতে গেলে ইহাদের প্রত্যেকটী সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা দরকার ; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ঐ সকল বিদ্যা বা বিদ্যায়তনগুলি সম্বন্ধে

আমি এমন কিছু জানি না, যাহা আপনাদিগকে শোনাইবার যোগ্য। কাজেই আমি এবিষয়ে আপনাদিগকে বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত।

যাহারা অর্থাভাবে বা অন্যবিধ সাংসারিক কারণে উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হয়, প্রধানতঃ তাহারাই শীঘ্র উপার্জ্জনের আশায় এই সব স্কুলে প্রবেশ করে। এই স্কুলগুলির প্রত্যেকটীতে উচ্চ ও নিম্ন ভেদে দুইটী করিয়া বিভাগ আছে। উচ্চ বিভাগটীতে পাঁচ বৎসর ধরিয়া পড়িতে হয়, আর নিম্নটিতে চার বৎসর। এখানকার সাধারণ পাঠ্য বিষয়গুলি প্রায় মাধ্যমিক স্কুলের ন্যায়; তবে বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি সেই সেই বিশেষ স্কুলে যে বিশেষভাবে পড়ানো হয়, ইহা আশা করি আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। এই সব বিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগে যাহারা পাঁচ বৎসর পড়ে নিম্ন বিভাগের ছাত্রদের সহিত তাহাদের তফাৎ এই যে, তাহারা এক একটী বিষয় একটু দীর্ঘ দিন ধরিয়া পড়ে, অভ্যাসটাকে একটু পাকা করিয়া লয় এইমাত্র। এই সকল স্কুলের সবগুলিতেই হাতে কলমে শিক্ষাটার উপর খুব জোর দেওয়া হয় এবং ইহাকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

আজকাল এই সব বিভাগেই ছাত্রগণের প্রবেশ করিবার বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। বিশেষতঃ বাণিজ্য ও শ্রম শিল্প বিভাগের নাম এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে আপনারা আশা করি নব্য জাপানের গতি কোন মুখে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন।

আজকাল জাপান নৌবিদ্যাতেও বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে। জাপানী জাহাজ এখন পৃথিবীর সমস্ত বন্দরেই যাতায়াত করিতেছে এবং পোত পরিচালন বিদ্যা সম্বন্ধে জাপানীদের একটু জাতীয় নৈপুণ্যও আছে। ভবিষ্যতে এবিষয়ে জাপান আরও উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া মনে হয়। গভর্ণমেণ্টও এবিষয়ে যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন।

উপরি উক্ত Industrial School গুলির উচ্চ বিভাগের সংখ্যা—৫০৩, শিক্ষক সংখ্যা—৫৯২৯ এবং ছাত্র সংখ্যা ৯৮৮৮৮। নিম্ন বিভাগের সংখ্যা ২৫০, শিক্ষক সংখ্যা ২৪৬৬ এবং ছাত্র সংখ্যা—৫৩০৮২।

এবার মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ কথাগুলির উল্লেখ করিয়া আমার এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাই। প্রথমে ছাত্রদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কিছু বলিব। 'জাপানের প্রাথমিক শিক্ষা' প্রবন্ধে পূর্ব্বে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। আশা করি, আপনারা তাহা একেবারে ভুলিয়া যান নাই। এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পোষাক পরিচ্ছদ অবিকল সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরই মত। তবে এবিষয়ে আপনাদের ধারণাটী দৃঢ় করিবার জন্য পুনর্ব্বার এখানে সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

জাপান গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তারা এদেশের মত কেবল ছাত্রদের শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর দৃষ্টি রাখিয়াই নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করেন না, তাঁহারা ছাত্রদের

পোষাক পরিচ্ছদের উপরও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখেন। কারণ তাঁহাদের ধারণা এই যে, শিক্ষার উপর পোষাক পরিচ্ছদেরও একটা গূঢ় প্রভাব আছে। যাহা হউক, জাপানী ছাত্রদের পরিচ্ছদের বিশেষত্ব এই যে তাহাদের প্রত্যেকেরই পরিচ্ছদ এক ধরণের অর্থাৎ Uniform হইয়া থাকে। তাহারা সকলেই একধরণের টুপি, একধরণের কোট পেণ্টুলান, এক ধরণের জুতা—এমনকি বোতামগুলি পর্য্যন্ত এক ধরণেরই ব্যবহার করিয়া থাকে। কেবল টুপিগুলির সম্মুখভাগে সংলগ্ন মাধ্যমিক স্কুলের নামাঙ্কিত 'তকৃমা'গুলি স্কুলভেদে বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। এই একধরণের পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ছাত্রমণ্ডলী যখন পথ দিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহাদের পরস্পরের পরিচ্ছদের ঐক্য ও সমতাল গতি দর্শকের মনের মাঝে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করে।

ছাত্রদের এই পোষাক পরিচ্ছদগুলি প্রত্যেক স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিজেদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দোকান হইতে 'বাজার দর' অপেক্ষা সস্তায় তৈয়ারী করাইয়া লন, অথচ বাজার চলন অপেক্ষা জিনিস খুব ভালই হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পোষাক পরিচ্ছদও ঠিক ছাত্রদেরই ন্যায় একধরণের অর্থাৎ Uniform হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা কতকটা পাশ্চাত্য ধরণের দেশী পরিচ্ছদই ব্যবহার করিত; কিন্তু আজকাল প্রায় সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধরণের পোষাক পরিচ্ছদেরই চলন হইয়া পড়িয়াছে। মেয়েদের বিদ্যালয়ের জীবন কতকটা বাহিরের জীবন; সেখানকার কাজকর্ম্ম ও চলাফেরার ধরণ-ধারণ অন্যরূপ—ঠিক গার্হস্থ্য জীবনের অনুরূপ নহে; কাজেই তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষদের বাধ্য হইয়াই মেয়েদের পরিচ্ছদ ইওরোপীয় ধরণের করিতে হইয়াছে।

শ্রীআর, কিমুরা

গিরীশচন্দ্রের স্মৃতি

(২)

একদিন সন্ধ্যার পর গিয়া দেখি নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্র তাঁর সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতল হল ঘরে তাকিয়া হেলান দিয়া দুইটী যুবকের সহিত নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। কথার মর্ম্মে বুঝিলাম তাঁহাদের মধ্যে কেহ নাটক রচনা করিয়াছেন এবং সেই নাটকটি গিরীশ বাবুর দ্বারা তাঁহারা সংশোধন করাইয়া লইতে চাহেন। গিরীশ বাবু তাঁহাদিগকে খুব বিনীতভাবে বলিতেছিলেন "দেখুন, আমি সামান্য একটু দেখেছিলাম—সব দেখ্‌তে সময় ক'রে উঠ্‌তে পারি নি।"

যুবক দুটীর মধ্যে একজন বলিলেন "আজ্ঞে, আপনি একটু correct ক'রে দিলে বড় উপকার হ'ত।"

গিরীশ বাবু ব্যস্তভাবে বলিলেন "দেখুন, ঐ জিনিষটা আমার পক্ষে বড় কঠিন। সত্যি বল্‌ছি ঢেলে সাজ্‌বার সময় আমার নেই। তবে আপনার বই পড়ে যদি কিছু suggestions থাকে তা দিতে পারি। কিন্তু তাতেও কিছু দিন সময় লাগ্‌বে। একে বুড়ো হয়েছি—ব্যারামে ভুগ্‌ছি, তার উপর থিয়েটারের জন্য নাটক লিখ্‌তে হয়, ম্যানেজারী কর্ত্তে হয়—নানান ঝঞ্ঝাট—আপনাকে কিছুদিন অপেক্ষা কর্‌তে হ'বে।"

যুবকটী বলিলেন "তা হোক্! আপনি যখন অবসর পাবেন—তখন দেখ্‌বেন। তবে আগামী সপ্তাহে এসে একবার জেনে যাব কি?"

গিরীশ বাবু বলিলেন "বেশ—তাই এসে জেনে যাবেন।"

যুবক দুইটী নমস্কার করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। যুবক দুইটী চলিয়া যাইবার পর গিরীশ বাবু আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "এই দেখ—আমার এক আপদ!"

আমি বলিলাম "কেন—কিসের আপদ?"

গিরীশ বাবু। বুঝ্‌তেই তো পার্‌ছো এঁরা নাটক রচনা ক'রেছেন! নাটক লেখা যে শুধু dialogue নয়—তা এঁদের অনেক বুঝিয়েছি। বই নিয়ে এঁরা যখন প্রথমে এখানে আসেন তখন আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, আপনি নাটকে কি truth দিতে যাচ্চেন। তখন উত্তরে কেবল আবল তাবোল—plot, hero, heroine এই রকম সব বল্‌তে লাগ্‌লেন। পাছে এঁরা মনে কষ্ট পান তাই বই খানা পড়্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছি। দেখ বাজারে আমার একটা বদ্‌নাম আছে যে আমি পরের বই নিতে চাই নি। এর চেয়ে মিছে কথা আর কিছু হ'তে পারে না।

আমি। আমিও তাই শুনেছি।

গিরীশ বাবু। শুনেছ—না? সত্যি বল্‌চি আমার dramatist হবার কোনও কালে ambition ছিল না। আমাদের ছেলে বেলায় হাফ আখড়াই পাঁচালীর খুব চলন ছিল। একদিন ছেলে বেলায় আমি এক পাঁচালীর গাওনা শুনতে যাই—খুব ভিড়—দেখলুম সেই গোলমালের ভিতর একজন সহাস্যবদন পুরুষ এলেন—মুখে চোখে তাঁর প্রতিভার ছবি—বেশ উজ্জ্বল মূর্ত্তি—bright face—আসরের তাবত লোক তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো—বেজায় খাতির, বেজায় সম্মান। আমার তাঁর নাম জান্‌বার জন্য কৌতূহল হ'ল। পাশের লোককে জিজ্ঞেস ক'রে জান্‌তে পার্‌লাম ইনিই কবি ঈশ্বর গুপ্ত। গুপ্ত কবির এই রকম সম্মান প্রতিপত্তি দেখে তখন একবার কবি হবার সাধ হয়েছিল। এই বলিয়া গিরীশ বাবু হাসিলেন।

আমি বিস্মিতভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আশ্চর্য্য! আপনি বল্‌ছেন dramatist হবার উচ্চাশা আপনার কোনও কালে ছিল না—তবে dramalist হ'লেন কিরূপে?"

গিরীশচন্দ্র। দায়ে পড়ে—out of sheer necessity. যখন মাইকেল বঙ্কিম প্রায় dramatised করা শেষ হ'ল, ষ্টেজে আর কোনও অভিনয়োপযোগী নাটক মিল্‌লো না, তখন বাধ্য হ'য়ে নাটক রচনা কর্‌তে হ'ল। একটা নাটক লিখ্‌তে কত দিকে নজর রাখ্‌তে হয়। সাহিত্যিক art-এর চরম আদর্শ—নাটক।

আমি বলিলাম "কেন নাটকের চেয়ে কি উপন্যাসে কম art ?"

গিরীশচন্দ্র। Sir Walter Scott আর Shakespeare পাশাপাশি রেখে পড়্‌লেই বুঝতে পার্‌বে। নভেলে তুমি সব কথা খুলে বল্‌তে পার, বোঝাতে পার, প্রত্যেক চরিত্রের বিশ্লেষণও ইঙ্গিত কর্‌তে পার ; কিন্তু নাটকে তার অবসর কোথায় ? জেন খাঁটী novelist or dramatist একটা central truth-এর উপর ভিত্তি ক'রে সমুদায় plotটী গড়ে তোলেন। Dramatistকে সীমাবদ্ধ কয়েকটী দৃশ্যপটের ভিতর through action কথাবার্ত্তার সমুদায় রস ও ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে সমুদায় চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট ক'রে সত্যকে প্রচার কর্‌তে হয়। নাটকে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন dialogue. একটা সামান্য উদাহরণ দিলেই বুঝতে পার্‌বে। ধর, স্ত্রী-পুরুষের ভাষা। দুঃখ দুর্দ্দশায়, সুখে আনন্দে, বীরত্বে লজ্জায়, পুরুষের ভিতর যে ভাষায় ভাবের উচ্ছ্বাস প্রকাশ হবে—স্ত্রীলোকের ভাষায় ঠিক সেই ভাব বা উচ্ছ্বাস স্বতন্ত্র ভাষায় প্রকাশ হবে। Emotion, feeling একই স্তরের, কিন্তু ভাষা ও বিকাশ স্বতন্ত্র আকারের। আর বেশীর ভাগ সাহিত্যিক এটা আদৌ লক্ষ্য করেন না—যদি তাঁদের লেখায় স্ত্রী পুরুষের নাম পুঁছে দাও তা'হলে নির্দ্ধারণ করা কঠিন হবে, কোন্‌টা পুরুষের বা কোন্‌টা স্ত্রী-লোকের উক্তি।

আমি। কিন্তু মশায়, ভাষার প্রভেদের পরিবর্ত্তে আমরা স্বরের প্রভেদ লক্ষ্য ক'রে থাকি।

গিরীশবাবু। শুধু স্বর।—ভাবে দেহের মাংশপেশীর সংকোচ বিস্তারে প্রভেদ। এই সকলে যেমন প্রভেদ দেখ্‌বে—একটু minutely observe ক'র্‌লে দেখ্‌বে expression of language-এও প্রভেদ। যে কোনও বড় author কে study কল্লে জান্‌তে পার্‌বে। সেক্ষপীরের লেখায় খুব marked and prominent. শকুন্তলায় শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের dialogue mark ক'রে দেখ। আবার এই expressions of languageএর-ও অনেক group আছে। মনে কর একজন যে আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হয়েছে - শিক্ষা দীক্ষা পেয়েছে, যেমন বংশে জন্মেছে—যেমন সমাজে চলাফেরা কর্‌চে—এই সকলের ক্রমানুযায়ী—তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ভাষা ভাবের তারতম্য আছে। প্রকৃত dramatist কে এইগুলি বিশেষ ক'রে observe কর্‌তে হয়।

আমি। মশায়! Dialogue-এর ভিতর এত মার প্যাঁচ আছে—তা আমার পুর্ব্বে ধারণাই ছিল না—তবে একটু আধটু পার্থক্য বুঝতাম।

গিরীশবাবু। জান, Dramaর first Act first scene লেখা বেশী কঠিন কাজ।

মনে কর একজন painter একটা canvas এর উপর paint কর্‌চে। প্রথমে দেখ্‌বে সে লাল নীল সবুজ হরেক রঙের কেবল কতকগুলো line টেনে যাচ্চে—কিন্তু বাইরের লোক কিছু বুঝ্‌তে পারে না—তারা ভাবে ছবি আঁক্‌চে না ছবি আঁক্‌চে। কিন্তু painter এর নিকট তার দাম খুব বেশী—সেইগুলি ঠিক ঠিক তুলিতে উঠ্‌লে তবে আসল ছবিটী ঠিক হ'বে। তেমনি dramaর সেই সব outlines তার প্রত্যেক কথাটীর উপর ভাবী চরিত্রের বীজ ছড়ান। এই dialogue গুলি বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে put করা—dramatist এর সব চেয়ে শক্ত কাজ।

আমি বলিলাম "মশায়! Dialogue এর importance এত বেশী!"

গিরীশচন্দ্র। তুমি বুঝি মনে কর্‌লে dialogue এইখানেই শেষ! না—না—নাটকে dialogue dramatic হওয়া চাই।

আমি। এটা বুঝলাম না—আপনি এতক্ষণ যা বোঝালেন তা বুঝেছি—আপনি যা বল্লেন—সেই গুলোই তো dramatic dialogue.

গিরীশবাবু হাসিয়া বলিলেন "না—না—তা নয়! এতক্ষণ যা বল্লাম ভাল novelistএর পক্ষেও তা আবশ্যক। Dramatic dialogue মানে কথাগুলি এমনভাবে গাঁথা থাক্‌বে যে প্রত্যেক কথাই action indicate কর্‌বে—তাতে এক বা ততোধিক চরিত্রকে ফুটিয়ে তুল্‌বে—সঙ্গে সঙ্গে ভাব বা রসের ফোয়ারা খুলে দেবে অথচ স্বাভাবিক ভাবে স্বচ্ছন্দগতিতে চল্‌তে থাক্‌বে গঙ্গার অনাবিল স্বচ্ছ প্রবাহের মত। ভাল কবিতার একটী শব্দ বা অক্ষর যেমন এদিক ওদিক হ'লে কবিতা খাপছাড়া ও যতিভঙ্গ দুষ্ট হয়, নাটকের dialogueএর গরমিল হ'লে ঠিক তেমনি হয়।

আমি। কিন্তু dialogue কি নাটকের চরম art?

গিরীশবাবু। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যই নাট্যকারের প্রধান art. শুধু নাট্যকার কেন—কবি, ঔপন্যাসিক সকলের পক্ষেই এটা সত্যি। বাস্তব জগতে যেমন আমরা সৃষ্টির লীলা-বৈচিত্র্যে আত্মহারা হই, কবির কাব্যে নাট্যকারের নাট্যে কল্পনার বিচিত্র-সৃষ্টিতে তেমনিই মুগ্ধ হই।—মানব চরিত্রের সৃষ্টি—তার বিকাশ উন্মেষ দেখানই নাট্যকারের আসল প্রতিভা।—ঘটনার পারম্পর্য্যে, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে অন্তর সংগ্রামে মানুষের যে চরিত্র ফুটিয়া উঠে সেটি নিপুণ ভাবে স্তরে স্তরে দেখানোই প্রকৃত নাট্যকারের কলা-কৌশল। রঙ্গমঞ্চে সেই ভাবগুলি represent করা অভিনেতার বিশেষ আবশ্যক। অভিনেতার সঙ্গে নাট্যকারের এইখানে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

আমি। আচ্ছা মশায় মানব চরিত্রের সৃষ্টির রহস্যটা কি? জগতে আমরা হাজার হাজার মানুষ দেখ্‌ছি তাই ফুটিয়ে তোলা কবি ঔপন্যাসিক নাট্টকারের বিশেষ বাহাদুরী—প্রাতিভার পরিচায়ক?

গিরিশবাবু। আর্ট মানে কি তাই? কবি—সত্য প্রচার কর্ব্বেন। সত্যের আকার শিবসুন্দর। যাতে—সকলের মঙ্গল হয় আর যেটা সুন্দর—চিরসুন্দর আর যা নিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত—সেই সত্যশিবসুন্দর কলাবিদের উপাস্য। আলোকে আঁধারে ঘাত প্রতিঘাতে সেই সত্য শিবসুন্দরকে যে মানব চরিত্রগুলির সাহায্যে দেখান—সেগুলি কবির সৃষ্টি প্রতিভা। শুধু প্রাণহীন ফটোগ্রাফ নয়—শুধু আকারে মানুষের ছবি নয়, এক একটী মানব চরিত্র যেন living—জীবন্ত সজীব। কি জান, জগতে যেন সে রকম মানুষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়—শুধু হাজার হাজার কেন—লক্ষ লক্ষ! কিন্তু তবুও সে মানব চরিত্র জগতের নয় কবি কল্পনার। কবি তার ভিতরের স্তরে স্তরে শুধু বিশ্লেষণ ক'রে দেখান না—ভাব জগতে তার বিকাশ দেখান।—প্রত্যেক মানুষ একটা ভাবের আকার। শুধু সেটাই আঁকা কবিত্ব বা art নয়। অতি সাধারণ ছুটো স্ত্রী-পুরুষকে নায়ক নায়িকা ক'রে কবি একটা ভাব জগতের সৃষ্টি করেন। নায়ক নায়িকার অনুরাগ মান অভিমান যা নিত্য সংসারে ঘট্‌চে—তাই নিয়ে কবি প্রেমের বিকাশ করেন, ঘাত প্রতিঘাতে প্রেমের মহিমা বিস্তার করেন—আর সঙ্গে সঙ্গে যে গুলো তার ছায়া—ভান্—সে গুলোর অসারতা বুঝিয়ে দেন। সকলে নিত্য নিত্য কত প্রেম কত প্রেমকলহ দেখ্‌তে পায় কিন্তু সে গুলি কি কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে? কবি যখন কল্পনায় ভাব জগতের সেই মানব চরিত্রের সৃষ্টি করেন তখন মানুষ অবাক হ'য়ে দেখে আর ভাবে। দেখ, ম্যাকবেথের মত উচ্চাশয় অনেকের ভিতর দেখ্‌তে পাবে—উচ্চাশয় ম্যাকবেথের মতন উত্থান পতন অনেকের ভিতর দেখ্‌বে—কিন্তু সে গুলি কি প্রতিনিয়ত তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে? কিন্তু কবি যখন কল্পনালোকে ভাব জগতের সৃষ্টি ক'রে ম্যাকবেথের চরিত্র স্তরে স্তরে দেখান যে কি অন্তঃসংগ্রামের জয় পরাজয়ে ম্যাকবেথের উত্থান পতন হ'চ্চে—তখন সেই ভিতরের জিনিষ দেখ্‌তে পেয়ে তুমি অবাক হ'য়ে কবির সৃষ্টি-মাধুর্য্য বুঝ্‌তে পার। বাইরের লড়াই ভিতরের লড়াই—পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপর্য্যয়ে জয় পরাজয়ে যে মানুষটী গঠিত হয় তাই কবির সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিও তাই। সৃষ্টি কর্ত্তা তাঁর অনন্ত জগতে অনন্তভাবে অনন্ত জীবের সৃষ্টি প্রতি মুহূর্ত্তে কর্‌ছেন, কবি সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কল্পনায় সান্ত জগতে কয়েকটী মানুষ চরিত্রে সেই অনন্ত ভাবের লহরী ইঙ্গিত ক'রে দেখান।—এটাই কবির সৃষ্টি। নাট্যকারের এই সৃষ্টিশক্তি থাকা চাই।

আমি। আপনি তো আর্টকে সত্যশিবসুন্দরের বিকাশ বল্লেন—কিন্তু এটা তো সকলে স্বীকার করেন না। তাঁরা—অশিব অসুন্দর ও অসত্য যা জগতে ঘট্‌চে তাও আর্টের অন্তর্গত ব'লে প্রচার করেন।—তাঁরা বলেন যে সত্যের শুধু শিবসুন্দর রূপ নয়, অশিব ও অসুন্দর রূপও আছে।

গিরীশবাবু। যাঁরা বলেন—তাঁরা art জানেন না—সত্যকেও জানে না।—সত্য—

চিরন্তন—সত্যের মূর্ত্তি শিব, সত্যের রূপ সুন্দর। যা অসত্য—তা অস্থায়ী—চিরন্তন হ'তে পারে না;—যা অসত্য তা অশিব—অসুন্দর—তা কখনও আর্টের লক্ষ্য হ'তে পারে না। অবশ্য সত্য শিবসুন্দরকে দেখাতে হ'লে অশিব অসুন্দর ও অসত্যকেও দেখিয়ে দিতে হয়। মিথ্যার লুকোচুরী সংগ্রাম চলচে—মানুষ প্রতিনিয়ত প্রতিমুহূর্ত্তে তার ভিতর দিয়ে চ'লে সত্যকে আঁকড়াবার চেষ্টা করচে, সুন্দর ভেবে অসুন্দরকে আলিঙ্গন করচে, শিব মনে ক'রে অশিবকে ইষ্ট ভাবচে—এই ভুল ভ্রান্তি প্রতিনিয়ত হ'চ্চে, তাই ব'লে এই ভুল-ভ্রান্তি চরম সত্য নয়—প্রকৃত কলাবিদের লক্ষ্য নয়। জেনো—কবি সত্যের পথপ্রদর্শক।

আমি। আমার দুয়েকটী বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়েছিল—তাঁরা শিক্ষিত, পণ্ডিত, চরিত্রবান,—তাঁরা বল্লেন কবি তো স্কুল মাষ্টার নন কিম্বা নীতিশিক্ষক নন যে কবি শুধু নীতি প্রচার করবেন। কবি আর্টের উপাসক—সংসারে মানবের প্রকৃত ছবি তাঁরা আঁকবেন—কল্পনার লীলা দেখাবার জন্য—কবি আঁকবেন তাঁর কল্পনা মত—art for art's sake.

গিরীশচন্দ্র। তাঁদের বল্লে না কেন—কবি স্কুল মাষ্টার বা নীতিশিক্ষক নন, কিন্তু তিনি সত্য শিব সুন্দরের প্রচারক। ব্যাস বাল্মিকীর চেয়ে কোন্ স্কুল মাষ্টার বা নীতিশিক্ষক বেশী শিখায়? কবি যে লোকশিক্ষক—সত্য প্রচারক। কবি তো সত্যি আবর্জ্জনার স্তূপ দেখাতে আসে নি? নগ্ন সৌন্দর্য্যের একটা খ্যাতি আছে তাই ব'লে সৌন্দর্য্য দেখাবার জন্য মেয়ে পুরুষ নগ্ন হয়ে কি চলাফেরা করে? যদি কেহ করে তবে তৎক্ষণাৎ তাকে পাগ্‌লা গারদের ব্যবস্থা করবে। বাল্মিকী, রাবণ সূর্পনখা দেখিয়েছেন, আবার রামসীতাও দেখিয়েছেন। কবি শুধু অসুন্দর অশিব আঁকবেন—আর শিবসুন্দরের ধার দিয়ে যাবেন না আর্টের মাথার দিব্যি তা নয়। কবি মন্দ ছবি আঁকবেন, কিন্তু ভালকে অধিকতর পরিস্ফুট করবার জন্য—সয়তান থাকবে কিন্তু খ্রীষ্টের মহত্ব দেখাবার জন্য। শুধু সয়তান আঁকাই আর্ট নয় যদি খ্রীষ্ট না থাকে। Art for art's sake অতি নীচু কথা—art for truth's sake সত্য কথা।

আমি। কিন্তু মশায় দুনিয়াতে কদাকার বীভৎস ছবি—উৎকট রকমের ব্যভিচার—সব তো আছে—তবে আপনি শুধু সত্য শিব সুন্দর আর্টের লক্ষ্য বলছেন কেন?

গিরীশচন্দ্র। সত্যসুন্দর শিব যে আর্টের রূপ। কিন্তু তুমি একটী বিষয় বুঝচো না। কদাকার বীভৎস ছবি দেখাতে পার সত্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখাবার জন্য। শুধু কদাকার বীভৎস ছবি আঁকাই কোনও কলাবিদের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। দান্তে নরকের ছবি এঁকেছেন—অতি বীভৎস দৃশ্য—কিন্তু তা শুধু স্বর্গের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির পার্থক্য দেখাতে। কবি-শক্তির তারতম্য অনুসারে কেহ ভাল ছবি আঁকতে দক্ষতা দেখান, আবার কেহ মন্দ ছবি আঁকতে দক্ষতা দেখান—সকলের শক্তি সমান নয়। কিন্তু তা বলে আর্টের চরম সত্য শিব

সুন্দর রূপ মিছে হ'তে পারে না। প্রকৃত কবি জীবনে কিছু না দেখে কিছু অনুভূতি না ক'রে লেখেন না। অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে নাট্যকার হওয়া যায় না।

আমি। কিন্তু আপনি যে কল্পনার কথা বল্লেন তা তো মিছে। কল্পনা কখনও সত্য হ'তে পারে না।

গিরীশচন্দ্র। কল্পনা মিথ্যে কে বল্লে? কল্পনা—বাস্তব—সত্য। বাস্তব জগৎ থেকে কল্পনার উদয় হয়—কল্পনার অনুভূতি হয় প্রাণে। অধ্যাত্মরাজ্যে সাধক প্রথম কল্পনার সহায়তায় মনস্থির ক'রে ইষ্টের চিন্তা করেন। কল্পনা সত্যরাজ্যের পথ। কে বলে কল্পনা মিথ্যা? কবি যে সত্যের সাধক তাই কল্পনা দিয়ে সত্যের সন্ধানে যান।

আমি। এটা বুঝতে পার্‌চি না। কল্পনা—imagination—যেটার আদৌ অস্তিত্ব নেই—সেটা কি ক'রে বাস্তব সত্য হ'বে? গল্প রচনা আমার মন থেকে তৈরী হ'ল—বাস্তব জগতে তার অস্তিত্ব ছিল না—তা কি ক'রে বল্‌বো বাস্তব সত্য!

গিরীশচন্দ্র। বেশ কথা। মনে মনে তুমি একটা গল্প রচনা করলে—কেমন? বাস্তব জগতে যা দেখ্‌চ শুন্‌চ সে সব নিয়ে তো গল্প রচনা করেছ—না? বাস্তব জগতে যা কখনও দেখনি শুননি এমন কিছু মনে মনে ভাবতে পার? মানুষ দেখচো, পশুপক্ষী দেখচো, পাহাড় পর্ব্বত অরণ্য শ্যামল প্রান্তর নদ নদী সমুদ্র দেখচো—তাই ভাবচো—তাই লিখচো। মানুষের রাগ অনুরাগ কলহ বিবাদ চক্রান্ত ষড়যন্ত্র উদারতা কৃপণতা ত্যাগ আসক্তি প্রেম প্রতিশোধ দেখছো—তাই ভাবচো—তাই দেখাতে মানুষ দিয়ে ঘটনার সন্নিবেশ করচো—যে ঘটনা সংসারে ঘ'টে থাকে—তবে সেটা মিছে কোথায়? বল্‌বে—যে আমার রচাটা তো আমি গড়েচি। কিন্তু কি দিয়ে গড়েছ? বাস্তব জগতের সব নিয়ে সাজিয়েছ—এই কল্পনা। সেটা মিছে হ'বে কেন? ভাব—মিছে নয়, প্রতিনিয়ত প্রতি পদে সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলেছে মানুষের ভিতর দিয়ে তা মিছে নয়, তা ভাবা মিছে নয়,—তা আঁকা মিছে নয়। বুঝলে কল্পনা বাস্তব কিনা? এই যে সৃষ্টি এটা তো পরমপুরুষের কল্পনা থেকে হ'য়েছে। "আমি এক বহু হ'ব।"—এই তো শাস্ত্রে বল্‌চে। শুধু আমাদের কেন—বাইবেলে দেখ ভগবানের বহু হবার ইচ্ছে হ'ল—তাই বহু হলেন। কবির সৃষ্টির মূলেও এই কল্পনা। কল্পনা মিছে হ'তে যাবে কেন? এই কল্পনা মহান্ শক্তিবিকাশ। এই কল্পনার বলে তুমি অসীম সৌন্দর্য্যের রাজ্যে যেতে পারচো, এই কল্পনাবলে তুমি বিদ্যুৎ অপেক্ষা দ্রুত-গতিতে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যেখানে ইচ্ছে যেতে পার—এই কল্পনার বলে তুমি অপার অপার্থিব আনন্দ ভোগ করতে পার—সেই কল্পনা মিছে? কল্পনায় সত্য প্রতিভাত হয়, কল্পনা সত্যরাজ্যের পথ। কল্পনা বাস্তব সত্য। বুঝেছ?

আমি। আজ্ঞে হাঁ। আমার একটা বিষম ভুল ভেঙ্গে গেল। অবশ্য সাধুদের নিকটে

কল্পনা সম্বন্ধে ধারণা হয়েছিল—তাই আপনার কাছে শুনলাম। তবে কবির কল্পনা ও সাধকের কল্পনা যে এক তা আদৌ বুদ্ধিতে আসেনি। নাট্যকারের সৃষ্টি-শক্তিই প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় তাও বুঝ্‌তে পারলুম।

গিরীশচন্দ্র।—বিলেতে নাটকের উৎপত্তির মূল ধর্ম্ম। যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনে লোকে আনন্দে উৎসবে মত্ত হ'ত। সেই আনন্দোৎসব থেকে প্রথম অভিনয় কথোপকথন দৃশ্য-পটের আমদানী হ'ল—লোকে এই তামাসায় বিশেষ আকৃষ্ট হ'ল—শেষে পাদরীরা ধীরে ধীরে খৃষ্টীয় পর্ব্বদিনে নাটক রচনা করে' অভিনয় কর্‌তে লাগ্‌লো। ইউরোপের সমস্ত দেশে পাদরীরা নাটক রচনা ক'রে অভিনয় করে যীশুর জীবন ও লীলা, বাইবেলের ঘটনাবলী প্রচার কর্‌তে লাগ্‌লো। এইরূপে ইউরোপে নাটকের উৎপত্তি হ'তে লাগ্‌লো। দেখ, প্রথমেই একটা সত্যবস্তুকে প্রচার কর্‌বার জন্য নাটকের উৎপত্তি। আর আমাদের দেশেই কি? ভরত ঋষি নাট্যকলার প্রচার কর্‌লেন। এই দেশে ঋষিদের দ্বারাই নাটকের প্রথম প্রচার হয়।

আমি।—কিন্তু সেগুলি কি নাটক?—আজকালকার সাহিত্যিক কষ্টিপাথরে তার মূল্য একটি কাণা কড়িও নয়।

গিরীশচন্দ্র।—কি ক'রে বুঝ্‌লে? বেশীর ভাগ নাটক লুপ্ত। ইউরোপে হাতের লেখা পুঁথিও অনেক মিলে না। কতকগুলো পুঁথি পাওয়াতে ছাপাখানার আবিষ্কারের পর ছাপান হ'য়েছে।—সেগুলোর ভিতরে যে নাটকীয় কলাকৌশল নেই—তা জোর ক'রে বলা যায় না। আমাদের দেশে তো বেশীর ভাগই নষ্ট হ'য়েছে। তা হোক্—কালের অনন্ত গতি—মহাকালের গর্ভে কত কি লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে এই কথা বল্‌চি যে দেখ নাটক, কবিতা, অভিনয়, সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যার আলোচনা সবদেশে ধর্ম্মাচার্য্য, ধর্ম্মপ্রচারকদের দ্বারা সুরু হয়েছে—তাঁদের দ্বারাই প্রচার হয়েছে। মূলে সত্যকে প্রচার কর্‌বার জন্য এই কলাবিদ্যার আলোচনা। অসত্যকে অসুন্দরকে প্রচার কর্‌বার জন্য কলাবিদ্যার উৎপত্তি হয় নি।

আমি।—অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন সংস্কৃত ভাষায় নাটক নেই।—এটা কি ঠিক্ কথা।

গিরীশচন্দ্র।—আমি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত নই—বল্‌তে পারি নি। তবে আমার "শকুন্তলার" অনুবাদ কর্‌বার একটা ইচ্ছে আছে। "শকুন্তলা" নাটকের অনেক western scholarরা প্রশংসা ক'রেছেন—কবি গেটে তো "শকুন্তলা" নাটকের বিশেষ ভক্ত ছিলেন বল্‌লেই হয়। সাদাসিধেভাবে দেখ মহাকবি কালিদাস প্রথমেই কি সুন্দর dramatic situationএ শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রথম মিলন দেখিয়েছেন। ঋষির শান্ত তপোবনে শকুন্তলা সখীদের সঙ্গে বৃক্ষমূলে জল সেচন কর্‌ছেন, হরিণশিশুকে আদর কর্‌ছেন,—প্রকৃতির প্রত্যেক লতা পাতা জীব জন্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে প্রিয় সম্বোধনে আহ্বান কর্‌ছেন—নিজের অনুপম

রূপমাধুরীর গর্ব্ব নাই—সে গর্ব্ব সে সৌন্দর্য্য ঋষির তপোবনে তাকে কে মনে করিয়ে দিবে। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের মুকুল অঙ্কুরিত হয়েছে তাই প্রকৃতিকে আপনার ব'লে মনে কর্‌ছেন—আর সেই সসাগরা ভারতের অধীশ্বর বীর্য্যবান মৃগয়াকাতর নরপতি সেইখানে অতিথিরূপে উপনীত। এই কল্পনা নাটকীয় কল্পনা। কথাবার্ত্তা হাবভাব নাটকীয় গুণে পরিপূর্ণ।

আমি। কিন্তু বঙ্কিম বাবু ভবভূতির উত্তররাম চরিতে বিশেষ নাটকীয় গুণ আছে ব'লে বর্ণনা করেছেন।

গিরীশচন্দ্র।—থাক্‌তে পারে। কিন্তু আমার বোধ হয় নাটক হিসাবে শকুন্তলা শ্রেষ্ঠ। শকুন্তলা অনুবাদ ক'রে অভিনয় কর্‌বার আমার ইচ্ছে আছে তবে ঠাকুর কি করেন বল্‌তে পারি না। এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় অনুবাদ করা কঠিন। ম্যাক্‌বেথের অনুবাদ ক'রে থিয়েটারে অভিনয় কর্‌তে আমার ১৬।১৭ বছর লেগেছিল।

আমি।—সে কেমন ?

গিরীশচন্দ্র।—ম্যাক্‌বেথ অভিনয় করবার বহু পূর্ব্বে ম্যাক্‌বেথ অনুবাদ ক'রে ফেলে রেখেছিলাম। আমি থিয়েটার কর্‌বার বহু পূর্ব্বে ইংরেজী কবিতার অনুবাদ ক'রে হাত মক্স করেছি। কত কবিতা ছিঁড়ে ফেলে নষ্ট করেছি। কি জান কথার পরিবর্ত্তে কথা বসানই অনুবাদ নয়। যে ভাষায় অনূদিত হ'বে সেই ভাষার স্বচ্ছ গতিতে ভাবগুলি পরিস্ফুট হ'বে। এটা যে বিদেশীয় ভাষার কিছু পড়্‌চি তা মনে হবে না। আমাদের দেশে অনুবাদ-সাহিত্য নেই বল্‌লেই হয়। যারা ইংরেজী থেকে অনুবাদ করে তারা এত অপরিপক্ব যে অনুবাদগুলি হয় ছেলেমানুষি নয় কটমট। বিশেষ পরিপক্ক হাতে যদি ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি বিদেশীয় সাহিত্য translated হয় তবে বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে অপূর্ব্ব রত্নের আমদানী হয় কিন্তু আমাদের দেশের সহিত্যিকেরা সেদিকে বড় একটা অগ্রসর হন না—সকলেই কবি ঔপন্যাসিক নাট্যকার হ'তে প্রয়াস করেন।

আমি।—আমাদের দেশে বাস্তবিকই অনুবাদ সাহিত্যের বিশেষ অভাব।

গিরীশচন্দ্র। অনুবাদে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ফরাসী জার্ম্মাণী গ্রন্থগুলি ইংরাজীতে এমন সুন্দর তরজমা হয়েছে যে মনে হয় না সেগুলি অনুবাদ পড়্‌চি। আর সব দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার করায়ত্ত থাকে।

আমি। আচ্ছা আপনি শুধু "ম্যাকবেথ" অনুবাদ ক'রে ক্ষান্ত হলেন কেন ? সেক্ষপীরের অন্য বইগুলি অনুবাদ কর্‌লে বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ নাট্য সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হ'ত।

গিরীশচন্দ্র। মনে তো ক'রেছিলাম যে ম্যাক্‌বেথের পর ওথেলো, হ্যামলেট, কিংলিয়ার প্রভৃতি বই অনুবাদ ক'রে অভিনয় কর্‌বো। কিন্তু যদিও সকলে ম্যাকবেথ নাটকের অনুবাদের প্রশংসা ক'রেছিলেন কিন্তু দর্শকাভাবে রঙ্গালয়ে অভিনয় সত্বর বন্ধ হ'ল। অথচ অভিনয়

বেশ সুন্দর হ'য়েছিল। কাজে কাজেই থিয়েটারের সত্বাধিকারী প্রভৃতির অনিচ্ছা দেখে আর অনুবাদ কর্‌লাম না। ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য না হ'লে আমার হাত পা বাঁধা।

আমি। ম্যাকবেথ অভিনয় জম্‌লো না?

গিরীশচন্দ্র। না। কি জান—বেশীর ভাগ লোক যায় নাচ গান শুন্‌তে। থিয়েটারে নাটক দেখ্‌তে খুব কম লোকেই যায়। বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া এই নাটক সাধারণের উপযোগী হয়নি। শিক্ষিত সম্প্রদায় একবার দেখে আর বড় বেশী দেখে না।

আমি। শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদের বাংলা থিয়েটারকে ভাল চ'খে দেখে না।

গিরীশচন্দ্র। কি ক'রে জান্‌লে?

আমি। শুন্‌তে পাই।

গিরীশচন্দ্র। কি শুন্‌তে পাও?

আমি। অনেকের মত--বিলেতের বর্ত্তমান থিয়েটারের সঙ্গে আমাদের থিয়েটারের তুলনা হ'তে পারে না।

গিরীশচন্দ্র। থিয়েটারের তো হ'তে পারে না, কিন্তু আর কিসে হ'তে পারে শুনি? সাহিত্যে, রাজনীতিতে, ব্যবসায়ে, শিল্প বাণিজ্যে, খেলায়, যুদ্ধে, শৌর্য্যে বীর্য্যে বর্ত্তমানে কিসে তুলনা হ'তে পারে শুনি? শুধু থিয়েটারের ঘাড়ে দোষ দিলে হ'বে না।

আমি। অনেকে বেশ্যা ও মূর্খ গুণ্ডা দিয়ে থিয়েটার করান বলে।

গিরীশচন্দ্র। সত্যি কথা। বিলেতেও অভিনেত্রীর যে সমাজে উচ্চ স্থান আছে তা নয়। বেশ্যা না নিয়ে কুমারী ও কুলবধূ কি ষ্টেজে অভিনয় কর্‌তে আস্‌বে? রুচিবাগীশরা কি বলেন তা বুঝ্‌তে পারি না।

আমি। তাঁরা বলেন বোধ হয় যে মেয়ে না নিয়ে ছেলেদের দ্বারা ফিমেল পার্ট অভিনয় করালেই হয়।

গিরীশচন্দ্র। সে চেষ্টা বৃথা। ৺রাজকৃষ্ণ রায় তার চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন। বাবুরা কথায় কথায় বিলেতের উদাহরণ দেন কিন্তু সেখানে স্ত্রীলোকের অভিনয় কি ছেলেরা করে? ছেলেদের দ্বারা করালে কতকগুলো এঁচোড়ে পাকা বয়াটের সৃষ্টি করা হ'বে। আর আজ যে ফিমেল পার্ট কর্‌লে হয় তো এক বা দুই বছর পরে সে আর কিছু করতে পারবে না। বয়সে ধরলেই তার গলার স্বর মোটা ও বিকৃত হবে। আর তাতে কি অভিনয়ের উন্নতি হবে? কোনও দেশে কোথাও হয়েছে? এদেশেও নট নটী ছিল।

আমি। বেশ্যার সংস্রবে থিয়েটার পাপগ্রস্ত হয়েছে এইরূপ কেউ কেউ মনে করেন। এই রকম থিয়েটারে গেলে ছেলেরা দুর্নীতিপরায়ণ হবে—তাদের নৈতিক চরিত্র খারাপ হবে এবং থিয়েটারে গেলে তারা অধঃপাতে যাবে।

গিরীশচন্দ্র। দেখ যাঁরা বেশ্যা ও মূর্খ নিয়ে থিয়েটার করাতে সমাজে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্চে বলেন তাঁদের আমি একটা কথা বল্‌তে চাই। যা হোক ত্যাগ করুন আর যাই করুন এই বেশ্যা আর মূর্খ তো সমাজে বিদ্যমান আছে। তাদের ত্যাগ করা কিম্বা ঘৃণা করাই কি সমাজ সংস্কার! যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য কোনও অবতার পুরুষই এদের ত্যাগ বা ঘৃণা করতে শেখান নি—তাঁরা এদের জীবন উন্নত ক'রে দিয়েছিলেন। আমি ঐ মহাপুরুষদের অনুসরণ কর্ব্বার দম্ভ করিনা কিন্তু যা হোক বেশ্যাদের একটী নূতন পথে চালিত কচ্চি যে পথে তারা ইচ্ছা করলে পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে, উচ্চ চিন্তা করতে পারে এবং বাজারে দাঁড়িয়ে অন্য লোককে প্রলোভিত কর্‌তে ক্ষান্ত থাকবে। মূর্খ গুণ্ডা বলে যাদের ঘৃণা কচ্চেন—তারাও তো সমাজের লোক—দেশের লোক। ঘৃণা দিয়ে তাঁরা সংস্কার করবেন? আমি তো তাদের অর্থার্জ্জনের একটা সুগম পথ খুলে দিয়েছি—অভিনয় করতে এরা উচ্চ চিন্তা উচ্চভাবের আবৃত্তি ও অভিব্যক্তি করে, কিন্তু বলতে পার এই সব রুচিবাগীশরা এদের সংস্কার করবার কি চেষ্টা করেছেন? বেশ্যার অভিনয় দেখলে যদি ছেলেরা খারাপ হয়ে যায় তবে তাঁরা বায়স্কোপ দেখা বন্ধ করুন। বায়স্কোপে যে সকল নগ্ন, কদর্য্য, বীভৎস ছবি দেখান হয়—রঙ্গালয়ের রঙ্গমঞ্চে তা কখনও দেখাবার কল্পনা পর্য্যন্ত হ'তে পারে না। বায়স্কোপ দেখলে ছেলে খারাপ হয় না? কবিতা ও উপন্যাস প্রভৃতি পাঠবন্ধ করা উচিত, কেননা তাতেও কুশিক্ষা ও দুর্নীতির ছবি অঙ্কিত থাকে। ইংরেজী থিয়েটার দেখলে তাঁদের বোধ হয় রুচি বজায় থাকে—কি বল?

আমি। ম'শায় আমার বোধ হয় যাঁরা বলেন তারা শুচিবাইগ্রস্তের মত পবিত্রতা-বাইগ্রস্ত।

গিরীশচন্দ্র। তা নয়। ছেলে বেলা এঁরা বেশ্যা ও বদমায়েস গুণ্ডাকে ভিন্ন চ'খে দেখে এসেছেন ও ঘৃণা করতে শিখেছেন। এঁদের মনে সত্য সত্য এ রকম একটা ধারণা দৃঢ় হ'য়ে আছে যে যারা বেশ্যা ও গুণ্ডার সংস্রবে আসে—তারা জাহান্নমে যায়। এই কথাগুলি যে সম্পূর্ণ মিছে তা নয়। বাস্তবিকই বেশ্যার কুহকে কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়েছে, বেশ্যার কুটিল চাউনিতে অনেক যুবক বিপথগামী হয়েছে এই সব সত্য কথা। কিন্তু রঙ্গালয়ে নাটক দেখার নাম তো বেশ্যার সংস্রবে আসা নয়। রঙ্গালয়ে কর্ত্তৃপক্ষ আছে—রঙ্গমঞ্চে কোনওরূপ অভদ্র বা অসভ্য ব্যবহারে শাসন আছে এবং যারা অভিনয় করে তারা নিজ নিজ চরিত্র play কর্‌তেই ব্যস্ত—তারা দর্শক-বৃন্দের মনোরঞ্জন কর্‌তেই চেষ্টিত,—রঙ্গালয়ে যুবকদের সর্ব্বনাশ কর্‌বার অবসর তাদের কোথায়? ভাল নাটক অভিনীত না হ'লে অন্য কথা। তবে আমার মনে হয় যে বেশ্যা ও গুণ্ডা আমাদের সমাজের একটী বিষম সমস্যা। এদের শুধু ঘৃণা ও উপেক্ষা কর্‌লে চল্‌বে না। এরা একদিকে পিশাচ পিশাচী, আবার অন্যদিকে চালিত হ'লে এদের দ্বারা সমাজের অনেক হিত হ'তে পারে। থিয়েটারের মত প্রতিষ্ঠান ছাড়া এদের দাঁড়াবার জায়গা কোথায়?

আমি। বেশ্যার ও বদমায়েসের সঙ্গ যে সকলেরই ত্যাগ করা উচিত এতে আপনি কি অন্যমত ?

গিরীশচন্দ্র। আমার যা মত তা তো বলেছি। বাস্তবিকই এদের সংসর্গ এদের সঙ্গ বিষধর সর্পের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। কেন? এরা পাপলালসার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু বছরে বছরে যদি সমাজে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তবে তার কি প্রতিকার ? ব্যক্তিগত ভাবে কুসঙ্গত্যাগ সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কিন্তু সামাজিক হিসাবে শুধু ত্যাগ বা ঘৃণা কর্‌লে চ'ল্‌বে না। এরা সমাজ শরীরে ব্যাধি বিশেষ কিন্তু সে ব্যাধির তো প্রতিকার করতে হবে। রঙ্গালয়ের মত প্রতিষ্ঠানে এরা উচ্চ আদর্শ ও উচ্চ ভাব শিখতে পারে আর রঙ্গালয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও শিক্ষিত হ'তে হবে। রঙ্গালয় জাতীয় জীবনের একটী প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। কোনও ভাবের প্রচার করতে হ'লে রঙ্গালয় একটী প্রধান প্রতিষ্ঠান। দেখ, যখন আমি ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় পাই তখন থিয়েটার ছাড়্‌বার এক একবার ঝোঁক হ'ত। কিন্তু ঠাকুর ছাড়তে চাইলেই বল্‌তেন "না না থাক্—ওতে অনেক উপকার হচ্চে।" এর মর্ম্ম আমি তখন বুঝতে পারি নি। এখন মনে হয় আমি নিজে কিছু কচ্চি না তাঁরই কাজ কর্‌চি। নাটকে তাঁরই ভাবের প্রচার হচ্চে—আর রঙ্গালয় পতিত পতিতার আশ্রয়। যে ছলনাময় জগতে তারা বাস করে তবুও কিছুক্ষণ তারা একটা অন্য জগতের আস্বাদ পায়। অভিনেত্রীদের কেহ কেহ অতি ভক্তি ভরে ঠাকুরের ছবিকে প্রণাম করে আর তাদের অনুতপ্ত হৃদয়ের ব্যথা ঠাকুরকে সরলভাবে জানায়। একবার এই হলঘরে কতকগুলি অভিনেত্রী আসে—সে সময় স্বামিজী (আমেরিকায় যাবার অনেক আগে) উপস্থিত ছিলেন। আমি তাদের বলেছিলাম—তোরা একবার সরলপ্রাণে তাঁকে ডাক—তার' আশ্রয় নে—দেখবি আর তোদের ভয় নেই ইত্যাদি। স্বামিজী আমাকে ও-সব গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, ভক্তি ইত্যাদি ব'লে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। আমি তখন উত্তেজিতভাবে ঠাকুরের নামের গুণ ও ঠাকুর যে পতিতপাবন তা বল্‌তে লাগলাম। ভগবানের নাম যে একবার নেয়, দুনিয়াতে তার আর কোনও ভয় নেই। এই সব যখন বলচি তখন স্বামিজী উঠে আমাকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে বল্লেন "জি সি—এই সব dangerous doctrine preach করচো। আমি জানি নামের গুণ, আমি জানি তিনি পতিতপাবন, তিনি দুর্ব্বল পতিত তাপিতদের জন্য এসেছিলেন—কিন্তু—" স্বামিজী ছল ছল চক্ষে বলিলেন, "I love purity—পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্র প্রচার কর"—এই বলিয়া গিরীশবাবু বলিলেন "স্বামিজীর সেই দিব্যমূর্ত্তি আমার চখের সাম্‌নে ভাস্‌চে।"

আমি গিরীশবাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

প্রত্যাবর্ত্তন

আবার এসেছি ফিরে 'দারুকেশ্বরে'র তীরে
গিরি-দরী পার,
এ পিয়াল-শাল-বনে র'ব হেথা এক কোণে
কুটীরে আমার।
দিগন্তে ফিরোজা-নীলে কে তুলি বুলায়ে দিলে
গাঢ় নীলিমায় ?
হেরি সুপ্ত সিংহ সম 'পঞ্চকোট' দীপ্ততম
পৌরুষ-প্রভায়।
হে শৈল তোমার পানে অপলক দু'নয়ানে
দেখিয়াছি চেয়ে,—
অজেয়—অটল মূর্ত্তি, মেঘের কেশর-স্ফূর্ত্তি
জটাজূট ছেয়ে!
হে অচল স্নেহডোরে টানিয়া এনেছ মোরে
সেই পল্লীপথে,
বহিছে প্রসন্ন হাওয়া, পাখীর কীর্ত্তন-গাওয়া
ধ্যানের জগতে।
পিছুপানে ফিরে চাই, সে স্নেহের নীড় নাই,
সে পুণ্য-কুটীর
চিহ্নহারা মোর কাছে, শুধু শূন্য স্মৃতি আছে,
ব্যথা সুগভীর।
সে ব্যথা মর্ম্মের মাঝে পরতে পরতে বাজে,
গুমরে অন্তর,—
অদৃষ্ট-প্রচেষ্টা-কাল হরিয়াছে অন্তরাল
তিরিশ বৎসর।
কর্পূর-কণিকা প্রায় মুহূর্ত্তে উবিয়া যায়
জীবন-লহরী।—
তিরিশ 'বিজয়া'-শেষে পথের পথিক-বেশে
কোলাকুলি করি।

জাগো সত্য-শুভ্র-বুদ্ধি, কর এ অন্তর-শুদ্ধি,
বহ সুপবন,
নগরীর নাগপাশ বদ্ধ যে করেছে শ্বাস,
বিষাক্ত জীবন।
অন্ধ 'গুটি-পোকা' প্রায় শত পাকে আপনায়
শতধা বেড়িয়া,
নির্ম্মি' দ্বার-হীন কারা কাঁদিছে আনন্দহারা
বন্দী এই হিয়া।
যেমতি পঙ্কিল নীর পরশিয়া জাহ্নবীর
পবিত্র লহরে,
হারা'য়ে মালিন্য তার ভরে অর্ঘ্য দেবতার
পূজার প্রহরে,
তেমনি এ রুদ্ধ হিয়া শুদ্ধ হো'ক মন্ত্র নিয়া
নিসর্গ-দীক্ষায় ;—
এসেছি পরম ক্ষণে, এই বনে পদ্মাসনে
বসিব পূজায়।
এ মঙ্গল-নিকেতনে উপাসিব শান্তমনে
ইষ্ট-দেবতায়,
যাঁর লীলা-জাগরণে এ জগৎ জাগে ক্ষণে
বিরাট্ শোভায়।
জানি গো দিবস-যামী কদাপি কল্যাণ-কামী
বিনাশ না পায়,—
কোথা সে শাশ্বত সুখ সন্ধান পেয়েছে বুক
গহন গুহায়।
প্রবেশিনু এই ঘরে প্রণমি' ভকতিভরে
সে পুরুষোত্তমে ;
আজি হ'তে সর্ব্বজীবে হেরি যেন সেই শিবে
এই সেবাশ্রমে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

খেয়ালী

অপরাজিতার মৃত্যুর বছর খানেক পরে করুণা একদিন সঙ্কোচ কাটাইয়া বীরেশকে বলিয়াছিলেন, "বীরু, আর কত দিন এভাবে থাকবি, বল ?"

বীরেশ স্বপ্নোত্থিতের মত জবাব দিয়াছিল, "কি বলছ দিদি ?"

দিদি আমতা আমতা করিতে লাগিলেন, "বলছি কি—বলছি যে বলি - "

বিপত্নীক ভ্রাতার কাছে ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া তিনি বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে পারিলেন না। বীরেশ যদি পত্নীবিয়োগে একদিনও কাহারও নিকট অশ্রুপাত করিত, অথবা কিছু দিন শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া সাধারণের মত শান্ত হইয়া যাইত, তবে বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপন সহজ হইত। হাসিমুখেই সে সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে, গল্পসল্পেরও একতিল ব্যতিক্রম হয় নাই। এমন লোকের কাছে সুখদুঃখের কোন কথা বলাই কঠিন।

করুণা মাঝে মাঝে ভাবিতেন, হয়তো বীরেশ অগ্নিগর্ভ শৈলের মত নিজস্ব জ্বালা বহিরাবরণে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। কখন বা মনে করিতেন, সংসারের সাধারণ পাঁচ জনের মত তাহার শোকও কালের প্রলেপে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। তাহার বয়স চল্লিশ পূর্ণ হইতে এখনও তিন চার বছর বাকি। এই বয়সে বিবাহ করা অযুক্ত বা নিন্দনীয় নয়। এই এক বৎসরে তাহার কতগুলি চুল সাদা হইয়া গিয়াছে বটে, গণ্ডাস্থিও খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, বর্ণটা ম্লান হইয়া গিয়াছে, ললাটেও দু'একটি রেখাপাত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে এমনি বা হইয়াছে কি ? ইহা অপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া নরেশচন্দ্রও তো আবার 'সংসারী' হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত করুণাকে কুণ্ঠানীরব থাকিতে দেখিয়া বীরেশ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "দিদি, আমার বিয়ের কথা বলছিলে তুমি ?"

সেই হাসিতে প্রশ্নকর্ত্তার প্রচ্ছন্ন মর্ম্মান্তিক রোদন অনুভব করিয়া করুণা আর কোন কথা বলিতে পারেন নাই। কিন্তু বীরেশ হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল, "সীতা ও ইরার বিয়ে হোক, তাদের মেয়ে হোক ; তারপর তোমার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখব। তুমি সেই ছেলে বেলা থেকে একই ভাবে আছ, আমি কি একদিনও থাকতে পারব না ?"

সেই দিন করুণা বিরলে যাইয়া অপরাজিতাকে স্মরণ করিয়া সিক্ত চক্ষু মুছিলেন, বিবাহের কথা আর তুলিলেন না।

করুণাকে রেঙ্গুন বাসে একান্ত অনিচ্ছুক জানিয়াই বীরেশ সেখানকার মোটা মাহিনার

চাকরী ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতার কোন সওদাগরী আফিসে চাকরী জুটাইয়া লইয়াছিল। মাতৃহীনা সীতাকে নিজের কাছে রাখিতেই অপরাজিতার চিরকালের ইচ্ছা ছিল। দাদার অসন্তুষ্টির ভয়ে বীরেশ তাহার জীবনে সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই। কিন্তু মরণে তাহার ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক ইচ্ছা বীরেশের কাছে অবশ্য প্রতিপাল্য হইয়া উঠিল। তাই সীতাকে এক রকম জোর করিয়াই নিজের কাছে রাখিল, করুণাকেও যাইতে দিল না। করুণা কলিকাতায় থাকায় কিরণ যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। সুতরাং নরেশও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। দাদার অপ্রীতির ভয়েও করুণা ছোট ভাইটিকে মেসে অথবা ঠাকুর চাকরের উপর ফেলিয়া রাখিয়া দেশে ফিরিতে পারিলেন না।

ভাল ঘরেই ইরার বিবাহ হইয়াছিল। এখন সীতাকে লইয়া বীরেশ ভাবনায় পড়িয়া গেল। তাহার বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত হইলেই সে ইরার মারফতে এক একটা আপত্তি জানাইয়া বসে; তাহার যে পছন্দই হয় না। সে এক একবার মনে ভাবিত, সেকালের অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীদান প্রথা মন্দ ছিল না, তাহাতে মেয়েদের পছন্দের কোন বালাই থাকিতে পাইত না। কিন্তু করুণা যদি সীতার অপছন্দের কথা ঘূণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন, তবে লজ্জাহীনতার জন্য সীতাকে কঠোর তিরস্কার করিতেন। সেই তিরস্কারে কোন কোন দিন সীতার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িত। তাহা দেখিয়া বীরেশ তৎক্ষণাৎ মতান্তর গ্রহণ করিয়া করুণাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নরম সুরে বলিত, "দিদি, সীতাকে কিছু ব'লোনা তুমি। মেয়ে যখন বড় করেছি, তখন তার মতামত অগ্রাহ্য করলে নিজেরাও দুঃখ পাব, তাকেও দুঃখ দেব।"

করুণা গর্জ্জিয়া উঠিতেন, "হিন্দুর ঘরের মেয়ে এত বড় করে রাখাই বা কেন, তার মত শোনাই বা কেন?"

তখন বীরেশ তাহার যুক্তির ভাণ্ডার খুলিয়া দিদিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিত যে, স্ত্রীপুরুষের অধিকারের সমতা থাকাই ন্যায়সঙ্গত। ছেলেরা যদি পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতে পারে, অপছন্দ হইলে প্রকাশ করিতে পারে, তবে মেয়েরাই বা পারিবেনা কেন,—ইত্যাদি। দিদি বীরেশের যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতেন কিনা সন্দেহ, তবে তিনি অল্পেই চুপ করিয়া যাইতেন; বেশী বকাবকি করা তাঁহার ধাতে সহিত না। তাঁহার একটু সান্ত্বনা এই ছিল যে, সীতা অত বড় হইয়াও আইবুড়ো আছে, ইহা লইয়া কলিকাতা সহরে গঞ্জনা দিবার বড় কেহ ছিল না। কলিকাতার নির্জ্জীব বাড়ীগুলা গায় গায় লাগালাগি হইয়া থাকিলেও তাহাদের সজীব অধিবাসীদিগের মধ্যে অপরিচয়ের যথেষ্ট ব্যবধানই থাকিয়া যায়।

যে প্রতিবাসীর সঙ্গে বীরেশের পরিবারের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল, সৌভাগ্য ক্রমে সে ছিল যুবাপুরুষ এবং তাহার বাড়ীতে মা বোন বা স্ত্রী ছিল না। সুতরাং সীতার বিষয়ে প্রতিবাসীর সমালোচনার ভয়ও করুণার ছিল না। আর সেই সুবোধকে করুণা ঘরের

ছেলে বলিয়াই মনে করিতেন। কারণ তাহার অমায়িক ব্যবহারএবং পিসিমা সম্বোধন তাঁহার এতটা ভাল লাগিত যে, তিনি তাঁহাদের ও সুবোধের মধ্যে আর্থিক অবস্থার অসামঞ্জস্যটা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুবোধের কাকা ছিল বীরেশের সহাধ্যায়ী। সেই সূত্রে আলাপ, তারপর ঘনিষ্ঠতা।

সুবোধের পিতা দালালি করিয়া বহু অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। অর্থের অভাব না থাকিলেও সে নিজেও হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার প্রতিভা আছে। বন্ধুবান্ধবগণ তাহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল বলিয়াই আশা করে।

বীরেশের বাড়ীতে প্রত্যহ সুবোধের একবার আসা চাই-ই। মাঝে মাঝে সে ছুটি উপলক্ষে নিজের মোটরে করিয়া করুণা ও সীতাকে ৺কালীঘাটে কালী দর্শন করাইয়া আনিত, কখন বা জ্যুলজিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। বীরেশের মনে এক একবার আশা হইত, সুবোধ হয়তো সীতাকে বিবাহ করিবে। যদিও রূপ, শিক্ষা, চরিত্র, ধন, সমস্তই তাহার আছে; কিন্তু সীতাও তো অযোগ্য নয়। অমন রাণীর যোগ্য রূপ, তাহাতে গুণ এবং শিক্ষা মিলিত হইয়া আছে। বীরেশ আফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া আসিয়াও যে প্রত্যহ সীতার শিক্ষকতা করিত। যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেওয়ার সম্বল তো তাহার নাই। অথচ শিখিবার অমন শক্তি এবং ইচ্ছাও তো বিনষ্ট করা যায় না। সীতাকে পড়াইতে পড়াইতে বীরেশের মনে হইত, তাহার কলেজে প্রাপ্ত শিক্ষা আফিসে না হইলেও গৃহে সার্থক হইয়া উঠিতেছে।

সীতা সুবোধকে বেশ আদর যত্ন করিত দেখিয়া বীরেশ মাঝে মাঝে পুলকিত ও আশান্বিত হইয়া উঠিত। সীতা বুদ্ধিমতী হইলে সুবোধকে কোন রকমেই অযোগ্য মনে করিবে না। সুবোধ যে অনেক ধনবানের প্রার্থনীয় জামাতা, ইহা মনে হইলেই বীরেশ আবার নিরুৎসাহ হইয়া পড়িত। সুবোধের যদি কেহ অভিভাবক থাকিত, তবে হয়তো এতদিনে বীরেশ বিবাহের প্রস্তাবটা করিয়া ফেলিত। সুবোধের কাছে কথাটা বলিতে কেমন বাধ বাধ মনে হয়। যদি সে অনিচ্ছুক হয় এবং সেই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া অন্যের দ্বারা অনিচ্ছাটা প্রকাশ করে, তবে তাহা বড় লজ্জার কথা হইবে।

সেদিন রবিবার। আহারান্তে কিছুকাল শয়ন করিয়া থাকিয়াও যখন বীরেশ ঘুমের লক্ষণ টের পাইল না, তখন সীতাকে ডাকিয়া বলিল, "কিছু পড়ে শোনাও মা।" গত সন্ধ্যায় ক্রীত সংবাদ পত্রটা অধিকাংশ অপঠিত অবস্থায় টেবিলের উপর পড়িয়াছিল, সীতা সেটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "এইটে পড়ি।"

বীরেশ বলিল, "পড়।"

সীতা পড়িতে লাগিল, বীরেশ মুদিত নেত্রে শুনিতে লাগিল। সীতা গভর্ণমেণ্টের নূতন পাশ করা আইন সম্বন্ধীয় একটা প্রবন্ধ পড়িতেছিল। লেখকের চমৎকার রচনারীতি,

ভূয়োদর্শন এবং যুক্তির সারবত্তা শ্রোতার সম্মুখে যেন মূর্ত্ত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেছিল। শুনিতে শুনিতে এক সময়ে শ্রোতার মন লেখকের সত্তা হইতে সরিয়া গিয়া শুধু পাঠিকার সুন্দর বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ এবং মিষ্ট স্বরে বদ্ধ হইয়া পড়িল। সে স্নেহমুগ্ধ প্রশংসমান দৃষ্টি দিয়া সীতাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। পড়া বেশী অগ্রসর হইতে পাইল না, করুণা আসিয়া পড়িলেন। তিনি সীতাকে বলিলেন, "হাঁরে, আজ ধীরার আসবার কথা নয়? তার জন্যে কি খাবার করতে হবে, তাতো কিছু বললিনে?"

সীতা উঠিয়া কাগজটা ভাঁজ করিতে করিতে বলিল, "তুমি এতক্ষণ খেটে খুটে এলে, এখন একটু জিরিয়ে নাও। আমি যাচ্ছি পিসি মা—" বলিয়া সীতা চলিয়া গেল।

সীতা চলিয়া গেলে করুণা পা ছড়াইয়া মেঝে বসিলেন, বলিলেন, "বীরু, দাদা সীতার যে সম্বন্ধটার কথা লিখেছিলেন, তার কি হলো?"

বীরেশ নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, "সে একটা সম্বন্ধ! সে ছেলে কি সীতার যোগ্য? কম টাকায় হবে বলেই দাদা সেটা করতে চান।"

"তা তুইও যখন বেশী টাকা দিতে পারবিনে, তখন বোধ হয় সীতা আইবুড়োই থাকবে চিরকাল? গাঁয় থাকলে যে এতদিনে সবাই তোদের একঘরে করত।"

"তাই বলে মেয়েটাকে তো জলে ফেলে দেওয়া যায় না।"

"তোদের সাহেবী ঢঙ্ আমি বুঝিনে। যা খুসী করগে, আমি শীগগিরই দেওরের কাছে চলে যাচ্ছি। এসব অনাসৃষ্টি আমি বরদাস্ত করতে পারব না।"

"তাই বলে এখনি উঠছ কেন? শোন, শোন, সীতার একটা ভাল সম্বন্ধ—"

"কোথায়? কোথায়? ছেলে—"

"আঃ, অত ব্যস্ত হও কেন দিদি? বলতে দাও। সুবোধের হাতে যদি সীতাকে দিতে পারি, তা হলে আমার মনের মত হয়।"

কথাটা শুনিয়া মুহূর্ত্তে করুণার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া পর মুহূর্ত্তে আবার ম্লান হইয়া গেল। তিনি ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "তার আশা নেই। কত বড় বড় ঘর থেকে তার বাড়ী ঘটক আসছে।"

বীরেশ ঈষৎ গর্ব্বিত কণ্ঠে বলিল, "সীতাও তো রূপে গুণে ছোট নয় দিদি। তুমি কাউকে কিছু বলোনা। চেষ্টা করে দেখি না, কি হয়। জগতে অসম্ভব কিছু নেই।"

৩

বীরেশের বাড়ীর ঠিক সম্মুখেই সুবোধের বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে খানিকটা খালি জমি। বাড়ীটা মূল্যবান নানা উপকরণে সজ্জিত। বাড়ীতে দাসদাসী আবশ্যকের অতিরিক্ত থাকিলেও সুবোধের আপনার জন কেহ ছিল না। ছিলেন এক দূর সম্পর্কীয়া দিদিমা। করুণা মাঝে

মাঝে সুবোধের দিদিমার কাছে বেড়াইতে আসিতেন। এক-একদিন সীতাও তাঁহার সঙ্গে আসিত এবং সুবোধের পাঠাগারের আলমারী ঘাঁটিয়া পড়িবার জন্য বই লইয়া যাইত। আলমারীগুলা ইংরেজি দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, নাটক, উপন্যাসে পূর্ণ, বাঙ্গলা বই বড় বেশী ছিল না। তাই সীতা এক দিন সুবোধকে বলিয়া ফেলিল, "আপনি পুরাদস্তুর সাহেব, আপনার গায় বাঙ্গলার গন্ধও নেই।"

সুবোধ সীতার কথা শুনিয়া বিস্ময়ের ভান করিয়া নিজের নারীজনোচিত কোমল সুশ্রী দেহটির পানে চাহিল, তারপর পরণের মিহি ঢাকাই ধুতি এবং দেশী সিল্কের জামাটির প্রতি কয়েকবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বলিল, "তুমি বল কি সীতা? আমার গায়ের কালো রং থেকে আরম্ভ করে কাপড়, জামা সবিতো বাঙ্গলার নিজস্ব।"

সীতা হাসিয়া বলিল, "অতিরিক্ত বিনয়টা হচ্চে ছদ্ম গর্ব্ব। আপনার রং কালো নাকি? না, আমি ফরসা বলব বলে কথাটা বললেন?"

"বিনয় তো করি-ই-নি, কেন না সাহেবদের সাদা রঙের কাছে আমার রং কিছু নয়। আর তুমি ফরসা বলবে, সে ভরসাও আমার নেই, আমার চেয়ে তুমি ঢের ফরসা।"

"এখন বর্ণতত্ত্বালোচনা রেখে দিয়ে—"

"খপ্ করে তুমি আমায় সাহেব বললে কেন, বল দেখি।"

"বাঃ, আপনি সাহেব নন তো কি? আপনার চিন্তাটা পর্য্যন্ত সাহেবি প্রথায় চলে। আপনার লাইব্রেরী খুঁজে বাঙ্গলা বই আবিষ্কার করা দায়।"

"অর আবিষ্কার করতে পারলে, সেটা কলম্বসের আবিষ্কারের মতই গৌরবজনক হয়; কি বল?"

"না, আমি কিছু বলিনে।"

"কেন, রাগ নাকি? আচ্ছা বল দেখি, বাঙ্গলা সাহিত্যে ক'খানাই বা ভাল বই আছে?"

"ঢের আছে। আপনি তো বাঙ্গলা পড়েন না, সাহিত্যের খবর কি জানবেন?"

"আচ্ছা, তুমি নামই বলনা, না হয় সেগুলি পড়ে দেখব।"

সীতা অনর্গল অনেকগুলি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম বলিয়া গেল।

ইহার সাত আট দিন পরে সীতা করুণার সঙ্গে সুবোধের বাড়ী বেড়াইতে গেল। করুণাকে পাইয়া সুবোধের দিদিমা গল্প জুড়িয়া দিলেন। দুই প্রৌঢ়ার সুখ দুঃখ বা ঘরকন্নার আলোচনা সীতার মন সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিতে পারিতেছিল না। সে কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কয়েকবার হাই তুলিয়া উঠিয়া সুবোধের পড়িবার ঘরে গেল। যদি কিছু ভাল বই পাওয়া যায় ত সময় কাটান যাইবে। সে দিন কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে কোর্ট বন্ধ ছিল। সুবোধ তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়াই পড়িতেছিল। সীতা তাহা জানিত না। সে ঘরে

ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল, "আপনি আজ কোর্টে যান নি ?" সুবোধ সীতার আগমন জানিতে পারিয়াছিল এবং আশা করিতেছিল, বই খুঁজিতে সে এখানে আসিবে। সে স্মিতমুখে বলিল, "আজ যে ছুটি।"

সীতাও স্মিতমুখে বলিল, "তাই নাকি ? বেশ! বেশ! কিন্তু কোর্টে আপনার না গেলেও তো চলে। আর বেশী টাকা না হলেই বা কি ?"

"মানুষের ধন-পিপাসার কি নিবৃত্তি আছে ?"

"তাতো নয়, একলাটি আপনার বাড়ীতে থাকতে ইচ্ছা করেনা, তাই কোর্টে যাওয়া। একটি সঙ্গী জুটিয়ে নিন না কেন ?"

"তুমি খুঁজে দাও।"

"দেব। এ আলমারীটা কবে কিনলেন ? এতে সব নতুন বাঙ্গলা বই দেখছি যে।" কক্ষ তলে পতিত রুমালখানা তুলিতে তুলিতে সুবোধ হেঁটমুখে বলিল, "চার পাঁচ দিন হবে এ গুলি কিনেছি।"

সীতা আলমারীর নিকট অগ্রসর হইয়া কি রকম খুসীর সহিত বইগুলি দেখিতেছিল, সুবোধ স্থিরভাবে তাহাই দেখিতে লাগিল। সীতার বই দেখা শেষ হইলে ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত সে বলিল, "সে দিন আমি ঠাট্টা করেছিলাম, তাই কি এতগুলা টাকা——"

সুবোধ বলিয়া উঠিল, "না, না, তা কেন ? বইগুলি কিনব বলে অনেক দিন থেকেই ভাবছি। এর ভেতরে কতগুলা বই তোমার পড়া আছে ?"

"প্রায় সবগুলি পড়েছি। দু'চার খানা পড়িনি, তা আজ নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু।"

সুবোধের বলিতে ইচ্ছা হইল, "আলমারী সুদ্ধ তুমি নিয়ে যাও"। কিন্তু সে ইচ্ছা তাহাকে দমন করিতে হইল। সীতাকে সে চিনিত। তাহাকে কিছু গ্রহণ করাইতে পারা সুসাধ্য নহে। গত বছর সীতার জন্ম দিনে সে তাহাকে দু'টি কাণের দুল দিতে গিয়াছিল, সীতা হাসিমুখে এমনভাবেই তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল যে, সে রাগ করিতেও পারিল না। সীতা বেশ খোলা খুলি ভাবেই হাসি গল্প, আদর যত্ন করে বটে, কিন্তু তবু যেন সে বহুদূরেই রহিয়া যায়। আপনাকে ধরা ছোঁওয়া দিতে চায় না। এই রহস্যময়ীর প্রচ্ছন্ন হৃদয় জানিবার জন্য এক-এক সময়ে তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হয়, কিন্তু জানিবার কোন পথই সে আবিষ্কার করিতে পারে না।

"কি ভাবছেন ?"

সীতার কথায় একটু খানি চমকিয়া সুবোধ চাহিয়া দেখিল, সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

সুবোধ অপ্রতিভের মত বলিল, "ভাবব আবার কি ?"

সীতা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি বলি, ইন্দুলেখার কথা ভাবছেন।"

সুবোধও হাসি মুখে বলিল, "সেটা অসম্ভবই বা কি ?"

"তবে আপনি ভাবতে থাকুন, আমি এখন আসি" বলিয়া সীতা হাসিতে হাসিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ইন্দুলেখা ভবানীপুরের রঘুনাথ বাবুর কন্যা। রঘুনাথ বাবু বড় লোক, এক মাত্র কন্যা ইন্দুলেখাই তাঁহার উত্তরাধিকারিণী। ইন্দু দেখিতেও বেশ সুন্দরী! সেই ইন্দুর সঙ্গে সুবোধের বিবাহের কথা হইতেছিল। সুবোধের পিতার জীবিত কালেও বিবাহের কথা একবার উঠিয়াছিল। কিন্তু সুবোধ পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই বলিয়া প্রসঙ্গটা চাপা পড়িয়াছিল। সুবোধের পড়া শেষ হইতে না হইতে পিতার মৃত্যু হয়। এখন রঘুনাথ বাবু সেই পুরাতন প্রস্তাবটা উপস্থিত করিয়াছেন।

আজ সীতার পরিহাসে সুবোধ যেন সচেতন হইয়া ইন্দুর কথা ভাবিতে লাগিল। ইন্দু কোন মতেই সুবোধের অযোগ্য নয় বটে, কিন্তু তবু যেন তাহার মধ্যে একটা বিরাট অভাব সুবোধ অনুভব করিতে লাগিল। ইন্দুর সঙ্গেও তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু যে মেয়েটি এই মাত্র কক্ষত্যাগ করিয়া গেল, তাহার মধ্যে যে প্রাণের অপূর্ব্ব স্পন্দন, তেজস্বিতার অপরূপ বিকাশ এবং অনাবশ্যক সঙ্কোচহীন শোভন গতির বিচিত্র ভঙ্গি—যেন মূর্ত্ত হইয়া এখনো কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহা ইন্দুলেখাতে অপ্রাপ্য। এই জন্যই বুঝি সীতা সুদূর ও সুদুর্ল্লভ হইয়াও তাহার চিত্ত মধ্যে আপনার মহিমময় প্রভাব বিস্তার করিতেছিল।

যাহা দুর্জ্জয়, তাহা জয় করিবার ইচ্ছা এমন প্রবল হয় কেন ? কে এই রহস্য ভেদ করিতে পারে ? সীতা কি চিরকাল এমনি দুর্জ্জেয়, এমনি সুদূর হইয়া থাকিবে ? তাহার বাহিরে তরুণতার যে সৌন্দর্য্য লীলার উৎসব ক্ষণে ক্ষণে চলিতেছে, অন্তরে কি তাহার কোন সাড়াই পৌঁছিতেছেনা ? প্রকৃতি কি সেখানে পরাভূতা ? রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, কিছুই কি সেখানে পৌঁছিতে পারে না ?

জল খাওয়ার জন্য দিদিমার জোর তলপ ঝি আসিয়া জানাইলে সুবোধ ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল।

৪

বর্ষার রাত্রি। সমস্ত আকাশ মেঘে ছাওয়া। আকাশের কালো বুক শতধা বিদীর্ণ করিয়া শত ধারে জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। বর্ষার আকাশের মতই ম্লান গম্ভীর মূর্ত্তি লইয়া শৈলজা বাতায়নে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার উদাস দৃষ্টি আকাশে বদ্ধ হইয়া থাকিলেও সে বর্ষণরত মেঘের রূপ দেখিতেছিল না। অদূরে একটা কদম গাছ ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছিল। সেই ফোটা ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ ভরা সজল বাতাসের ঝাঁপটা মুক্ত বাতায়ন পথে আসিয়া শৈলজার কাপড় ভিজাইয়া দিতেছিল, সে দিকেও তাহার লক্ষ্য ছিল না।

এমনি একটা বর্ষা রাত্রির রুদ্রমূর্ত্তি শোণিত-পিপাসু রাক্ষসের মত আসিয়া অজিতকে গ্রাস করিয়াছিল। সে দীর্ঘ তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা হইলেও জ্বলন্ত ছবির মতই শৈলজার চক্ষে ভাসিতেছিল। সেই অজিত,—যে স্ত্রীলোকের মধ্যে মাকেই সবচেয়ে বড় করিয়া চিনিয়াছিল, সেই অজিতকে একটা অভাবনীয় কদর্য্যকাণ্ডের নায়ক প্রতিপন্ন করিয়া মায়ের বুক হইতে দস্যুরা ছিনাইয়া লইয়া গেল। দগ্ধমর্ম্ম অজিত গৃহ বহিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ঘটনার কিছুই শৈলজা জানিতে পারে নাই। দুর্ভাগ্য সেদিন নানা দিক দিয়াই একান্ত নির্ম্মমভাবে আসিয়াছিল, নহিলে শৈলজা সেদিন অসুস্থ হইয়া অতবেলা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়িয়া থাকিবে কেন? অতর্কিতে দস্যু আসিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া দিয়া গেল। অজিতের প্রকৃতি যে শৈলজার কাছে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। অজিতের চেয়েও যে অজিতকে সে বেশী চিনিত।

অমন একটা ভীষণ কুৎসিত কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া যাওয়া হরপ্রসাদের পক্ষে অস্বাভাবিক না হইলেও শৈলজার পক্ষে যে সম্পূর্ণ অসম্ভবই ছিল। সে যে অজিতকে নিজের হাতে গড়িয়া তুলিয়াছে। কথাটা যখন সে হরপ্রসাদের মুখে শুনিয়াছিল তখন সে পরিপূর্ণ অবিশ্বাসে দৃঢ়কণ্ঠেই বলিয়াছিল যে, ইহা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু হরপ্রসাদ তাহার কথায় অধিকতর ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিলেন বলিয়াই সে তখনকার মত চুপ করিয়াছিল। অজিতের স্তব্ধতা হরপ্রসাদের কাছে অপরাধের প্রমাণ স্বরূপ হইয়া থাকিলেও সে নিমিষের জন্যও অজিতের প্রতি সে-বিশ্বাস হারায় নাই। সে স্বামীর সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া গিয়া অজিতের সন্ধানের জন্য দিকে দিকে লোক ও তার প্রেরণ করিয়া দিল। হরপ্রসাদকে লুকাইয়া অতি গোপনেই তাহাকে ইহা করিতে হইয়াছিল।

ব্যর্থ! ব্যর্থ! শৈলজার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, অজিতের কোন সন্ধানই মিলিল না! যে অজিত একটি দিনের জন্যও মায়ের কাছ ছাড়া হইতে পায় নাই, এতদিনেও তাহার কোন সন্ধানই নাই! হরপ্রসাদের কঠোর নিষেধ-আজ্ঞায় অত বড় বাড়ীতে কেহ তাহার নামটি পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে পায় না। মায়ের হৃদয়ের অব্যক্ত ব্যথা, বিশ্বের যিনি মা তিনিই শুধু জানিতে পারিলেন; আর কেহ জানিল না, জানিতে চাহিলও না। অজ্ঞাত দেশে সম্ভাবিত সহস্র বিপদের মধ্যে শুধু পুত্রের জীবনটি রক্ষার জন্য মাতৃহৃদয় হইতে অহরহ যে ব্যাকুল প্রার্থনা নীরবে নিবেদিত হইতে লাগিল, তাহা শুধু অন্তর্য্যামীই জানিতে পারিলেন। হরপ্রসাদের অগ্নিদাহে শৈলজার অশ্রুও শুকাইয়া গেল। এক সঙ্গে অমিয় ও ধীরাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াও তাহার ক্ষত জ্বালা একতিল জুড়াইল না। হায়, এ জগতে কাহারও স্থান কাহারও দ্বারা পূর্ণ হয় না। শৈলজা বজ্রদগ্ধ উপবনের মত পড়িয়া রহিল।

তারপর সহসা একদিন হরপ্রসাদের মুখের গাঢ় মেঘ অপসৃত হইল, তাঁহার দৃষ্টির তীব্র

জ্বালা শান্ত হইয়া আসিল। শৈলজা গভীর বিস্ময়ে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি সিক্তনেত্রে সিক্তকণ্ঠে বলিলেন, "সুখবর আছে।" তাঁহার বিচলিত ভাব দেখিয়া শৈলজার বিস্ময় গভীরতর হইল। সে কথা কহিল না। এক বছর অজিতের খবর নাই, তাহার পক্ষে সুখবর কি হইতে পারে! হরপ্রসাদ বলিলেন, "সত্যিই অজিতকে তুমি চিন্‌তে পেরেছিলে, আমি পারিনি! আজ খবরের কাগজে একটা মোকর্দ্দমার খবর বেরিয়েছে। রামতারণের ছেলেই বিনোদিনীকে বের করে নিয়েছিল, এখন ত্যাগ করেছে। বিনোদিনী তার ছেলের ভরণপোষণের জন্য রামতারণের ছেলের নামে নালিস করেছে। ওরা দু'জনে এখন কলকাতায় আছে।"

ঝঞ্ঝাহত লতার মত শৈলজা স্বামীর পায় আছড়াইয়া পড়িয়া অশ্রুবন্যায় তাঁহার পা দু'খানি প্লাবিত করিয়া দীর্ণকণ্ঠে বলিল, "ওগো তবে আমার অজিতকে আমার কোলে এনে দাও। এই এক বছর তাকে হারিয়ে, কি দুঃখ যে মুখ বুজে সয়েছি, তাতো একটি দিনের তরেও তুমি জানতে চাওনি। নির্ম্মল নির্দ্দোষ, শিশুর মত মা নামে ভোলা আমার অজিত,—তাকে তুমি তাড়িয়ে দিলে! আমাকে যদি আগে জানতে দিতে, তা হলে কি এমন বিপদ ঘটে? এনে দাও, আমার অজিতকে এনে দাও, তার অভাব তো আমি আর সইতে পারছিনে!"

পত্নীর অশ্রুধারা তরল অগ্নির মত হরপ্রসাদকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি ছুটিয়া বাহিরে গেলেন।

আবার প্রবল উদ্যমে অজিতের সন্ধান চলিতে লাগিল। বহু সংবাদপত্রে সন্ধানদাতার জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষিত হইল। কিন্তু কোনই ফল হইল না। সুদারুণ অপমানে আহত জর্জ্জরিত হইয়া অজিত কোথায় লুকাইল? শৈলজার প্রাণ বিনিময়েও কি তাহাকে পাওয়া যায় না? অজিত, অজিত, ফিরে আয় বাবা! যাদু আমার, মাণিক আমার, ফিরে আয়! তোর বাবার অপরাধ-কুণ্ঠিত মুখ দেখে তাঁকে যে আর কিছুই বলা যায় না। তাঁর ভ্রান্তির জন্য নিঃশব্দে তিনি কত বড় প্রায়শ্চিত্ত করছেন, এ যদি তুই জানতিস, তা হ'লে তাঁর ওপর আর রাগ করে থাকতে পারতিস নে। আয় বাবা, ফিরে আয়!

"মা!"

শৈলজা অত্যন্ত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, ধীরা। হাহাকারের মত একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। তিন চার দিন হইল ধীরা এখানে আসিয়াছে।

ধীরা বলিল, "ইস্, জলে তোমার কাপড় ভিজে গেছে যে মা" বলিয়াই সে ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল এবং অবিলম্বে একখানা শুষ্ক কাপড় হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপড়খানা শৈলজার হাতে দিয়া বলিল, "কাপড় ছেড়ে এস, বাবা তোমাকে ডাকছেন।"

শৈলজা নীরবে কাপড় ছাড়িয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দেখিল, হরপ্রসাদ অন্ধকার নির্জ্জন বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। সে বলিল, "বারান্দায় আলো দেয়নি কেন? অন্ধকারে রয়েছ, তাও কি কেউ দেখছে না?"

হরপ্রসাদ বলিলেন, "অন্ধকার বেশ লাগছে। বারান্দায় আলো নিবিয়ে দিতে আমিই বলেছি।"

"আমায় ডেকেছ তুমি?"

"হাঁ, বো'স, কথা আছে।"

এই বলিয়া হরপ্রসাদ একখানা বেতের চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন, শৈলজা স্বতন্ত্র আসনে তাঁহার অত্যন্ত নিকটেই বসিল।

হরপ্রসাদ কিন্তু বহুক্ষণের মধ্যে একটি কথাও কহিলেন না। জিজ্ঞাসা করিবার উৎসাহ শৈলজারও ছিল না। দু'জনই নিঃশব্দ, বাহিরে বৃষ্টিপতনের অবিশ্রান্ত ঝম্ ঝম্ শব্দ হইতেছিল মাত্র।

হরপ্রসাদ প্রথম স্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন, বলিলেন, "আজ আবার যোগেশ বাবুর দেওয়ান এসেছিলেন।"

শৈলজা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

হরপ্রসাদ কিছুকাল ইতস্ততঃ করিলেন। তারপর নিরপরাধকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়া কুণ্ঠা, লজ্জা ও অনুতাপের গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া পড়ার মত স্বরে বলিলেন, "তুমিতো জান, যোগেশ বাবু অমিয়র সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে দেড় বছর ধরে কত আগ্রহ প্রকাশ করছেন। অমিয় বি, এ, পাস না করলে বিয়ে দেব না বলেই এতদিন তাঁকে থামিয়ে রেখেছিলাম। এবার অমিয় অনারসুদ্ধ বি, এ পাস করেছে, আর তো যোগেশবাবুকে ঠেকিয়ে রাখা চলে না।"

"কি করতে চাও তুমি এখন?"

"অমিয়র যখন বিয়ে দিতে হবে, তখন আর দেরী করায় লাভ কি? যোগেশ বাবু বড় লোক, ভাল লোক, মেয়েটিও তাঁর সুন্দরী, সংস্বভাবা। যোগেশবাবুকে কি বলব? তোমার কি মত?"

"আমার মত কেন জিজ্ঞেস করছ? তোমার ছেলে, তোমার মত হলেই হলো।"

"অমিয় তো তোমারও ছেলে, তার বিয়েতে কি তোমার মত চাই না?"

শৈলজা বহুক্ষণ আপনাকে সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছিল, আর পারিল না। আসনের পিঠে হেলিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "ব'লোনা। ওকথা ব'লোনা। নিজে উদ্যোগী হয়ে আমি যে ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, আমি তাকে

হারিয়েছি! এজীবনে বুঝি তার মুখখানি আর দেখতে পাব না, তার মুখের 'মা' ডাক আর শুনব না, এমনি ভাগ্য আমার! পূর্ব্ব জন্মে যেন কোন্ মা'র বুক থেকে ছেলে কেড়ে নিয়েছিলাম, সেই মহাপাপে আমার বুকে দিনরাত আগুন জ্বলছে। ছেলের বিয়ের মত আর আমায় জিজ্ঞেস ক'রো না!"

হরপ্রসাদ বাণবিদ্ধের মত ছট্ ফট্ করিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাহারও মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। কিন্তু হরপ্রসাদ বুঝিলেন, বাহিরের বর্ষা ধারার মতই শৈলজার চোখের ধারা পড়িতেছে।

হরপ্রসাদ আবার বারান্দায় পাদচারণা করিতে লাগিলেন, শৈলজা সেই আসনের উপরই পড়িয়া রহিল। কিছুকাল পরে ছেলে কোলে করিয়া ধীরা আসিয়া বলিল, "খোকা কেবল 'দিদা' 'দিদা' করছে, ওকে নাও মা" বলিয়া মায়ের কোলে ছেলে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শৈলজা খোকাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কপোলে অধর স্থাপন করিল। হরপ্রসাদও ধীরে ধীরে স্ত্রীর নিকটে আসিয়া খোকার অন্য কপোলে অধর স্থাপন করিলেন। শৈলজার তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল, শিশু অজিতের উভয় কপোলে এমনি ভাবে হরপ্রসাদ ও অন্নপূর্ণার অধর যুগপৎ স্পৃষ্ট হইয়াছিল, ঘটনাটা দৈবাৎ তাহার চোখে পড়িয়াছিল। পলকে শৈলজা ক্রোড়স্থিত খোকার অস্তিত্ব ভুলিয়া গেল। সহস্র স্মৃতি মণ্ডিত হইয়া শিশু অজিতই তাহার দৃষ্টির সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সদ্যবর্ষণ-ক্ষান্ত তাহার চক্ষু দু'টি হইতে আবার তপ্ত অশ্রু উৎসারিত হইতে লাগিল।

ইহার কয়েকদিন পরে ধীরা একদিন মাকে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইল, এক কোণের একটা কক্ষের মেঝে শৈলজা উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে। ধীরা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "একি মা, এমন করে পড়ে আছ কেন? ওঠ, ওঠ।" কিন্তু তখনই ধীরার মনে পড়িল, আজ অজিতের জন্মতিথি। এই তিথিতে শৈলজা কত ঘটা করিত। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অজিতের বন্ধুদের খাওয়াইত। অজিতের কল্যাণ কামনায় গ্রামের সকল দেবালয়ে পূজা পাঠাইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিত। দরিদ্র শিশুদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিত। ধীরার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে আঁচলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "ছি, মা, এমন করে যদি তুমি কাঁদ, তা হলে দাদার অকল্যাণ হবে যে।"

অজিতের অকল্যাণ হবে! শৈলজা ভয়ে শিহরিয়া তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল।

ধীরা মায়ের গায় হাত্ বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তুমি যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছ মা; তারার কাছে শুনলাম, তুমি এক টুকরা ভাল খাবার মুখে দাও না, ভাল বিছানায় শোওনা, সারারাত মেঝে পড়ে থাক। তুমি এরকম করলে আমাদের প্রাণে কি লাগে না?"

শৈলজা বলিল, "লাগে মা, তা জানি। কিন্তু যখনি ভাবি যে, আমার অজিত ভাল খাবার, ভাল বিছানা—" শৈলজা আর কথা শেষ করিতে পারিল না, তাহার দুই চক্ষে অশ্রুর বান ডাকিল।

"আবার কাঁদছ! তোমার কোন ভয় নেই, দাদা তোমাকে ছেড়ে বেশী দিন থাকতে পারবেন না, শীগ্‌গিরই ফিরে আসবেন। ওঠ, কাত্যায়নীর বাড়ী পূজো পাঠিয়ে দাও। আজ দাদার জন্মতিথি।"

শৈলজা উঠিয়া পূজা পাঠাইয়া দিল এবং রামুকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার হাতে একশত টাকার নোট দিয়া বলিল, "অজিত যে সব গরিবদের সাহায্য করত, তুমি তাদের দিও।" তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, আর কিছু বলিতে পারিল না। সেই দিন দুপুরবেলা ধীরা অমিয়কে বলিল, "মা কি হয়ে যাচ্ছেন, তুমি একটু দেখতে শুনতে পার না?"

অমিয় বই পড়িতেছিল, বই হইতে চক্ষু না তুলিয়াই বলিল, "মা কি আমার কথা শোনেন? না, আমার দিকে ফিরেও দেখেন? দাদাই তাঁর সব!"

ধীরা বলিল, "ছি, ছি! ছোড়দা, দাদার ওপর এখনো তোমার এই ভাব!"

ধীরার তিরস্কারে অমিয় লজ্জিত হইল, বলিল, "আমি তো সব সময়ে মা'র কাছে থাকতে পারিনে। কি করলে মা সুস্থ থাকবেন, তাও তোর মত ভাল বুঝিনে। তুই কিছু দিন মা'র কাছে থাক্, তা হলে মা'র মন ভাল থাকবে।"

(৫)

বীরেশের সার্টগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। কিছুদিন সেই ছেঁড়া সার্টই সেলাই করিয়া তালি দিয়া চলিল। আজিও সে আফিসে যাইবার সময়ে সীতাকে ডাকিয়া বলিয়া গেল, "আলনার ওপরে সার্ট দু'টো রেখে গেলাম, আবার ছিঁড়ে গেছে, দেখে শুনে সেলাই করে রাখিস মা।" সীতা তখন কিছু বলে নাই, কিন্তু বীরেশ আফিসে চলিয়া গেলে চাকরকে বাজারে পাঠাইয়া কাপড় আনাইল। তারপর সেই কাপড় কাটিয়া সার্ট সেলাই করিবার জন্য কলের কাছে গিয়া বসিল। তখন অপরাহ্ণ। করুণা সুবোধের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া সীতাকে বলিলেন, "সুবোধের বড্ড জ্বর হয়েছে সীতা। ওর দিদিমা তো কোন কাযের লোক নন্। চাকর বাকর কি আর আপনার লোকের মত বুঝে সুঝে কিছু করতে পারে? কেবল বড় লোক হলেই মানুষ সুখী হয় না। দেখলাম, একটা চাকর সুবোধের মাথা টিপে দিচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই তা তার মনের মত হচ্ছে না।" সীতা ক্ষণকাল কাটা কাপড়ের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সেগুলি একধারে গুছাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি একবার সুবোধবাবুকে দেখতে যাব পিসিমা? তোমাদের অসুখ বিসুখ হলে

তিনি তো খুব দেখেন শোনেন। ঝিকে নিয়ে যাব ?" করুণা একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তা যাও, কিন্তু বেশী দেরী ক'রোনা।"

সীতা উঠিল। অনতিবিলম্বে সে সুবোধের বাড়ী পৌঁছিয়া তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, করুণার কথা সত্য। ভৃত্যের সেবা প্রভুর আরামের পরিবর্ত্তে বিরক্তিই উৎপাদন করিতেছিল। সীতাকে সুবোধের পালঙ্কের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া ভৃত্য সসম্ভ্রমে একধারে সরিয়া দাঁড়াইল। সীতা বলিল, "আপনার নাকি বড্ড জ্বর ? কবে হলো ?"

সুবোধ বলিল, "তিন চার দিন।" ভৃত্যকে বলিল, "এঁকে কিছু বসতে দাও।"

ভৃত্য তাড়াতাড়ি একখানা আসন আনিয়া সীতার কাছে রাখিল। সীতা আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "তিন চার দিন জ্বর হয়েছে, কৈ শুনিনি তো। একটা খবরও কি দিতে হয় না আমাদের ?"

সুবোধ স্নিগ্ধ কণ্ঠের এই স্নেহপূর্ণ অনুযোগ মনে মনে উপভোগ করিয়া একটুখানি হাসিল, কিছু বলিল না। সীতা বলিল, "হাসলেন যে বড়। মনে মনে ভাবছেন বুঝি, অকর্ম্মা মেয়েগুলি ছেলেদের বোঝা হয়েই চিরকাল আছে। দুঃখের কথা ওদের জানিয়ে কি হবে ?"

সুবোধ বলিল, "না সীতা, সে কথা ভাবিনি। সত্যি যদি তোমরা বোঝা হয়েই থাক, তবে সে বোঝা যে আমাদের কত সুবহ, তা তোমরা হয় তো জান না। তোমরা না হলে আমাদের একটি দিনও চলে না। অসুখ হলে মা'র কথা, দিদির কথাই ভাবি। তাঁরা যদি আজ বেঁচে থাকতেন ! উঃ !"

"ওরকম করছেন কেন ?"

"মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

সীতা মুহূর্ত্তকাল ভাবিল। তারপর একটুখানি ঝুঁকিয়া সুবোধের কপালের উপর হাতখানি রাখিল। তারপর ধীরে ধীরে কপালের দুইধার টিপিয়া দিতে লাগিল। সুবোধের চক্ষু দু'টি ধীরে ধীরে নিমীলিত হইয়া গেল। সে স্থির হইয়া শুইয়া রহিল।

সেবা-প্রাপ্ত এবং সেবা-পরায়ণা কাহারও মুখে কথা ছিল না। ভৃত্যও দ্বারপ্রান্তে নীরবে দাঁড়াইয়া প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমনি করিয়া কিছুকাল গেল। গভীর স্তব্ধতা সীতার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি এখন উঠি, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।"

সুবোধ স্বপ্নোত্থিতের মত চক্ষু মেলিয়া ক্ষণকাল সীতার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল। সীতার হাত তখনও তাহার কপালের উপরেই ছিল। সেই হাতখানিতে ঈষৎ চাপ দিয়া ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুবোধ বলিল, "আচ্ছা, এস। কিন্তু কাল কি—"

সীতা তাড়াতাড়ি বলিল, "হাঁ, নিশ্চয় আসব। রাত্রে কি দিদিমা আপনার কাছে থাকেন?"

সীতার কথায় সুবোধ এমনি মুখভঙ্গি করিল যে, তাহাতে সীতার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, দিদিমার থাকায় সুবোধের কোন লাভ নাই।

সীতা চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার স্পর্শ সুবোধের কপালে লাগিয়া রহিল। সে সমস্ত রাত্রিই সেই স্পর্শ অনুভব করিল।

পরদিন সীতা সকালবেলা আসিয়া নিজের হাতে সুবোধকে পথ্য খাওয়াইয়া গেল। দু'চার দিনের মধ্যে সুবোধ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু এজন্য সে খুসী হইল না।

সেদিন বৈকাল বেলা সুবোধ সীতার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে সহসা প্রশ্ন করিল, "সীতা, বাঙ্গালীর মেয়েরা রামের মত স্বামী প্রার্থনা করে কেন, বলতে পার?"

সীতা ঈষৎ বিস্ময়ের হাসি হাসিয়া বলিল, "হঠাৎ এ কথা কেন?"

সুবোধ বলিল, "আমি একবার গ্রামে মাসিমার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম, ছোট ছোট মেয়েরা ব্রত করছে আর বলছে, 'রামের মত সোয়ামী পাব, লক্ষ্মণের মত দেওর পাব', আরও কত কি। লক্ষ্মণের মত দেওর অপ্রাপ্য হলেও প্রার্থনা করতে বাধা নেই। কিন্তু রামের মত স্বামী চায় কেন মেয়েরা?"

কথা হইতেছিল বীরেশের পড়িবার ঘরে বসিয়া। সেল্‌ফের উপর একখানা রামায়ণ ছিল, সীতার দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। সে বলিল, "রাম প্রার্থনীয় ন'ন্ কেন, শুনি?"

সুবোধ ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কিসে রাম প্রার্থনীয়? প্রজারঞ্জন ধর্ম্ম পালনের ছল করে নিরপরাধা সীতার বর্জ্জন! সীতাও রামের প্রজা, সীতাও রামের স্ত্রী। তাঁর প্রতি কি রাজার বা স্বামীর কোন কর্ত্তব্য ছিল না?"

শিশিরার্দ্র বিকশিত নীলপদ্মের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িলে তাহা যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সীতার চক্ষু দু'টি তেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "ছিল বৈকি; সে কর্ত্তব্য তিনি পালনও করেছেন।"

"বিনা দোষে বর্জ্জন করে খুব চমৎকার কর্ত্তব্যই পালন করেছেন! আমার মনে হয়, আদর্শ রাজা বলে রামের একটা অভিমান ছিল, তার জন্যেই এমন কাযটা করেছেন।"

"অমন কথা বলবেন না। সীতা রামের প্রজা এবং স্ত্রী। প্রজার চেয়ে স্ত্রী ঢের বেশী আপনার। স্ত্রী সুখ-দুঃখ-ভাগিনী, সহধর্ম্মিণী। প্রজাপালন রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ধর্ম্মপালনের পথ সব সময়ে পুষ্পাকীর্ণ থাকে না বোধ হয়। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই আনন্দকে পেতে হয়। আনন্দের কথা যাক, দুঃখের কথাই বলি। প্রজারঞ্জন রাজার ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম পালন করতে যেয়ে রামকে যে দুঃখের গুরুভার বহন করতে হয়েছিল, তার ভাগ

সীতাকে ছাড়া আর তো কাউকে দিতে পারেননি তিনি। স্ত্রীর সহায়তা ছাড়া এমন ধর্ম্ম পালন তো সোজা নয়। প্রজাকে দুঃখ না দিয়ে রাম তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকেই দুঃখের ভাগ দিয়েছিলেন, এবং সীতার দুঃখ দ্বিগুণ করে নিজে ভোগ করেছিলেন। সেকালের রাজার ধর্ম্মাধর্ম্মকে প্রজারা নিজেদের সুখদুঃখের নিয়ামক বলে বিশ্বাস করত। রাম অত বড় দুঃখ সইতে পেরেছিলেন বলেই সর্ব্বকালের লোকের মনে অত বড় হয়ে আছেন, তাঁর মহিমা তারকা বা রাবণ বধে নয়। তারপর রামের একাগ্র একনিষ্ঠ সুগভীর প্রেম কি সীতার সব দুঃখ সুবহ ও সার্থক করে তোলেনি ?"

সুবোধ আর তর্ক করিল না, শুধু প্রশ্ন করিল, "মেয়েরা কি সব সময়ে সুগভীর প্রেম বুঝতে পারে ?"

সুবোধের কণ্ঠস্বর সীতার দৃষ্টি নমিত করিয়া দিল। তবু সে জোর করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিল, "পারে হয়তো।"

সুবোধ ধীরে ধীরে আসিয়া সীতার পাশে দাঁড়াইল। তাহার নত মুখের পানে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া অত্যন্ত আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "পারে ? সীতা, পারে ?"

সীতা কোন কথা না বলিয়া ত্রস্ত পদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুবোধও বাড়ী চলিয়া আসিল। কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার কথা শুনিয়া সীতার কপোল দু'টি আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই রক্তিম আভাটুকু তাহার স্মৃতিপটে অত্যন্ত উজ্জল হইয়া রহিল এবং তাহা ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাহার পরিপূর্ণ চিত্ত আশায় আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

তবে সীতার অমত নাই। তাহার প্রমাণ, তাহার মুখের সলজ্জ স্নিগ্ধতা। তবে আর বাধা কি ? সুবোধের অভিভাবক সে স্বয়ং, তাহার নিজের পক্ষে আর কাহারও মতামতের প্রয়োজন নাই। শুধু বীরেশবাবুর সম্মতি পাইলেই হয়। তাঁহার অসম্মতির কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু প্রস্তাবটা কি ভাবে করা যায় ? সীতার কাছে 'প্রোপোজ' করিয়া তাহার স্পষ্ট সম্মতি আদায় করিয়া তারপর বীরেশবাবুর কাছে জিজ্ঞাসা করা কি সঙ্গত ? না, সে বড় বেশী সাহেবী হইয়া যাইবে। আর, বীরেশবাবুই বা কিরকম লোক ? তিনি এত জায়গায় মেয়ের সম্বন্ধ খোঁজেন, অথচ আভাস ইঙ্গিতেও সুবোধকে কিছু বলেন না।

"কি সুবোধ, কার ধ্যানে এমন মগ্ন হয়ে আছ ?"

সুবোধ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, প্রতিবাসী বন্ধু পরেশ। বলিল, "এস পরেশ, এস।"

সর্ব্বাপেক্ষা কোমল আসনখানা বাছিয়া পরেশ বসিল। কক্ষ বৈদ্যুতিক আলোকে উজ্জ্বল, মাথার উপর বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরিতেছিল। সে আরামে চক্ষু বুজিয়া বলিল, "সুবোধ, কি ভাবছিলে এতক্ষণ ?"

সুবোধ বলিল, "ভাবছিলাম, কে বললে ?"

"বাঃ, আমি কতক্ষণ তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তুমি কিছু টের পাওনি।

"চুরি করে এলে টের পাব কি করে ?"

"চুরি করে আসিনি। ভাবী বধূটির কথাই ভাবছিলে নাকি ? কবে দিনস্থির হলো ? আমরা 'ইতর জনেরা' মিষ্টান্ন পাব ?"

"এখনি কিছু মিষ্টান্ন খেয়ে যাও না ?"

"মিষ্টি মুখ দেখে মিষ্টান্ন খেতে হয়, নইলে কি আর খাওয়া হয় ?"

"তবে এবার তোমার মিষ্টান্ন খাওয়া হলোনা।"

"কেন ? চিরকুমার থাকবার প্রতিজ্ঞা করেছ নাকি ? না, হতাশপ্রেমে দগ্ধ হচ্ছ ?"

"তা হতে পারে।"

"কিন্তু তোমার জ্বরের সময়ে বীরেশবাবুর ভাইঝি যেরকম ঘন ঘন যাতায়াত করেছে, তাতে প্রেমটা তো হতাশ বলে সন্দেহ হয় না, খুব আশান্বিত হয়েছে বলেই মনে হয়।"

সুবোধের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দেখ ভদ্রলোকের মেয়ের নাম করে ঠাট্টা করাটা ভদ্র রীতি নয়।"

সুবোধের রাগ দেখিয়া পরেশ হাসিয়া উঠিল, বলিল, "রাগ করছ কেন ? বীরেশবাবু তাঁর ভাইঝির জন্যে আমাকে পাত্র খুঁজতে বলেছিলেন, আমি তোমাকে পাত্র ভেবে রেখেছি। ঠাট্টার কথা ছেড়ে দাও। সীতা সব রকমেই ভাল মেয়ে। তবে অন্য জায়গায় বিয়ে করলে দশ পনেরো হাজার ঘরে আনতে পারবে, এখানে তা হবে না। কিন্তু তাও বলি, সীতার মত মেয়েও সব জায়গায় পাবে না। আর, টাকার দরকারই বা কি ? তোমার তো টাকার অভাব নেই। কি বল, বীরেশ বাবুকে তোমার সম্মতি জানাব ?"

সুবোধ মনে মনে ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া চিন্তার ছল করিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল। তারপর পরেশের কথায় রাজি হইল।

পরেশ সাত আট দিন পরে আসিয়া অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সুবোধকে জানাইল যে, সেই রাত্রেই সে বীরেশবাবুর কাছে কথাটা বলিয়াছিল, শুনিয়া খুব খুসী হইয়া তিনি বলিলেন যে, এতো তাঁহার আশাতীত সৌভাগ্য। সীতার বাবার কাছে পরদিনই তিনি চিঠি লিখিলেন। আজ নাকি সেই চিঠির জবাব আসিয়াছে এবং নরেশবাবু নাকি জানাইয়াছেন যে, তিনি কলিকাতায় মেয়ের বিবাহ দিবেন না। পাড়া গেঁয়ে মানুষের কি আশ্চর্য্য বুদ্ধি !

আগামী বারে সমাপ্য

৺সরোজবাসিনী গুপ্তা

সমালোচনা

" সুদুর্ল্লভাঃ সর্ব্ব-মনোরমাঃ গিরঃ "

মাসিক সাহিত্য।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন, ১৩৩২

শ্রুতিস্মৃতি--(পূর্ব্বানুবৃত্তি) স্বর্গীয় মহারাজ জগদীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত চরম রচনা। আড়ম্বরবিহীন প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত "শ্রুতিস্মৃতি" মহারাজ সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই, ইহা বঙ্গসাহিত্যের যে কত বড় দুর্দ্দৈবের পরিচায়ক, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মহারাজের "হস্তাক্ষর-প্রতিলিপি" সংবলিত এই অসমাপ্ত অংশটুকু এক হিসাবে অমূল্য। কালের অক্ষয় শিলাফলকে খোদিত থাকিয়া ইহা সাহিত্যের ভবিষ্য-ঐতিহাসিকগণের অশেষ উপকার করিবে। এইটুকুই জগদীন্দ্রনাথের শেষ লেখা—ইহা ভাবিতেও বুক ফাটিয়া যায়।

নব বর্ষে—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

"মানসীর জন্মতিথি উপলক্ষে" সুলেখক বিপিনবিহারীর ইহা একটি পরম উপাদেয় প্রবন্ধ। "মানসী" সৃষ্টির পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে কিরূপ ঘোরতর দলাদলি ছিল, এবং 'মানসীর" আবির্ভাবের পর, ক্রমে কিরূপেই বা তাহা ধীরে ধীরে অপসৃত হইল, ও এখনও হইতেছে, তাহার বিশদ বিবরণ এবং সেই সঙ্গে চিন্তাশীল স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক জ্ঞানগর্ভ উক্তি। প্রবন্ধটি সকলেরই পড়া উচিত।

মাঘে—(কবিতা) শ্রীপ্রিয়ংবদা দেবী। মোটেই জমে নি।

ফাল্গুনে—(কবিতা) ঐ ; ইহাও "তথৈবচ"।

বঙ্গবধূ—"(উপন্যাস)" শ্রীসরসীবালা বসু।

একঘেয়ে এবং অত্যন্ত বাসি। নূতনত্ব বা মৌলিকত্ব আদৌ পাইলাম না। তবে ভরসা—"ক্রমশঃ," দেখা যাক্।

বঙ্গের শ্রমজীবী—শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

বিশ্বেশ্বর বাবু একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি। এই প্রবন্ধও তাঁহার অপরাপর প্রবন্ধের ন্যায় যুক্তিপূর্ণ ও সরল ভাষায় অভিব্যক্ত। মফঃস্বলের শ্রমজীবীদের অনেক তথ্যে ইহা পরিপুষ্ট। রাজকার্য্যব্যপদেশে বঙ্গের নানাস্থানে ঘুরিয়া বিশ্বেশ্বর বাবু যে কত সূক্ষ্মভাবে পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহ অনুধাবন করিয়াছেন, আলোচ্য-প্রবন্ধ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজকাল এইরূপ প্রবন্ধের আধিক্য একান্ত অপেক্ষিত।

বসন্ত—(কবিতা) শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়।

নামেই কবিতার বিষয়পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বসন্তকুমারের এই "বসন্ত এল পুনরায়"——সত্য হইতে পারে, কিন্তু পাঠ করিয়া আমাদের ত্রিসীমায়ও সে "এল" না।—এ সব কবিতায় লাভ কি ? কতকগুলি "অলস অঙ্গ শিথিল কবরী" গোছের শব্দযোজনার নাম যদি কবিতা হয়, তবে ইহাও একটি "কবিতা";—নতুবা ইহা "পান-বসন্তের" চেয়েও বিরক্তিকর।

ফাল্গুনী—(কবিতা) বন্দে আলী মিয়া।

একটি সুন্দর কবিতা। মিয়াসাহেবের প্রাণ আছে। কল্পনাদূতীর অঙ্গুলীসঙ্কেতে আত্মবিস্মৃত হইয়া সামান্য কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে লেখক সুন্দর একখানি ছবি আঁকিয়াছেন। এই দুইমাস ধরিয়া মাসিকপত্রে "বসন্তের" "মাঘের" "ফাল্গুনের" একেবারে অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। সত্য বলিতে কি—মাঘ-ফাল্গুনের নামের উপর পর্য্যন্ত একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, মাঝে মাঝে মনে হয়, 'চ'ত্‌ব'শেখ' এলে বাঁচি; এরূপ সঙ্কট কালে মিয়া বন্দে আলীর "ফাল্গুনী"তে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ফাল্গুনী পাঠের সঙ্গে সঙ্গে——

"তরুমর্ম্মরে শুনিতেছি, আজি কাহার নূপুরধ্বনি ;—
পল্লবনের কম্পনে কা'র কাঁকণ উঠিছে রণি ?
কা'র আজি মৃদু পরশন লাগি
তৃণের পিয়াসা উঠিয়াছে জাগি
কোন্ সুরবালা দাঁড়ায়েছে আজি
মনের দুয়ারে আসি ?"

"ঝরে পড়া ওই তমালের পাতে
কার খোঁজে আজি ক্ষ্যাপা বায়ু মাতে
বুক মাঝে তার লুকানো রয়েছে
কাহার অশ্রুরাশি ?"

ভাবিয়া এই জীবনসন্ধ্যায় আমরাও উন্মনা হই।

সাহিত্য ও ধর্ম্ম—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সাহিত্যের সহিত ধর্ম্মের কতখানি সম্বন্ধ, ধর্ম্ম রসোৎপত্তির কতটা সহায়তায় সমর্থ, প্রভৃতি কতিপয় জটিল সমস্যার সমাধানে সেনগুপ্ত মহাশয় পর্য্যাপ্ত প্রয়াস করিয়াছেন। প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত, সেন মহাশয়ের ভাষায় বলি "কেবল গালি দিয়া তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বঙ্গদর্শনের এবং দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনীর আমল হইতে এই দুরূহ বিষয় লইয়া কত তর্কবিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। লেখক সেই তর্ক সাহিত্যে আর একটি অধ্যায় যোজনা করিয়াছেন। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। প্রবন্ধের সর্ব্বত্র লেখকের চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট।

হোলি—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

ইহা ভারতের সেই বড় প্রিয় বড় শ্লাঘার হোলি সংক্রান্ত এক অতি অনুপম প্রবন্ধ। খগেন্দ্রনাথ রস-সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং নিজেও একজন সুরসিক পুরুষ। তিনি দুঃখ করিয়া প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন—"বসন্ত যে কবে আসে, কর্ম্মজীবনে তাহার দিনপঞ্জিকা রাখা দায়।"—কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধপাঠে বুঝিলাম,—রসময়ের কৃপায় তাঁহার হৃদয়ে চিরবসন্ত জাগরূক, অন্যথা তদীয় দর্শন-ক্ষত-হৃদয়ে এমন নিরাবিল রসের উৎস ছুটিবে কেন? বৈষ্ণব-সাহিত্যে লেখকের যে কি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং তিনি নিজেও যে একজন কত বড় "দীনাতদীন" বৈষ্ণব, তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ এই প্রবন্ধের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, স্বর্গীয় দেশবন্ধু সম্পাদিত নারায়ণ পত্রে মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের লিখিত "গৌরচন্দ্রিকা" নামক মধুর প্রবন্ধের পর,

বৈষ্ণবসাহিত্য বিষয়ক এরূপ উপাদেয় প্রবন্ধ আর বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। মধুর বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের "হোরী" খেলায় মত্ততা বর্ণন করিতে গিয়া, লেখক সত্যই যেন "তদ্ভাব ভাবিত" হৃদয়ে মাতিয়া গিয়াছেন, যেন কত যুগযুগান্তের সেই অতীত রসরঙ্গে আপনাকেও ডুবাইয়া দিয়াছেন। খগেন্দ্রনাথের সে ভাষার উচ্ছ্বাসে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে পাঠককেও সমস্ত ভুলাইয়া তন্ময় করিয়া তুলিতেছে। "রাধাশ্যাম আজ রঙ্গে "হোরী" খেলিতেছেন। আনন্দের আর সীমা নাই। উভয়েব অরুণিম অঙ্গে শ্রমজলবিন্দু দেখা দিতেছে। হোরী খেলিতে খেলিতে কখনও পরস্পরের মুখারবিন্দের প্রতি উভয়ে চাহিয়া দেখিতেছেন",—লেখকের বৈষ্ণবী দৃষ্টিতে সে "চাহনি"র মাহাত্ম্য কি সুন্দর ফুটিয়াছে। প্রেমিক লেখক——

"ক্ষণে ক্ষণে স্থকিত বদন চন্দ্র নিরখত
বৈছন চান্দ চকোরি।"

বলিয়া "বৃন্দাবনের হোরী রঙ্গে" আপনাকেও ধরা দিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য সমুদ্রে আশৈশব নিমগ্ন থাকিয়াও লেখক "মধুব বৃন্দাবনের" ভাবে বিভোর হইয়াছেন। আজ তাঁহার নয়নে "অরুণিত আকাশে, মেঘ, চাঁদ, নক্ষত্র—সকলই অরুণ।" আজ—

"অরুণ মেঘের কাছে অরুণ চন্দ্র নাচে
নখতর অরুণ আকাশে।"

রস বস্তু সকলের ভাগ্যে উপভোগ্য হয় না, উহা "সহৃদয়-সম্বেদ্য।" সুতরাং লেখকের এই রসানুভূতি তদীয় সহৃদয়তারই প্রতিবিম্বন। তিনি ধন্য। তাঁহার রসভাবমধুর হৃদয় স্থিরবসন্তের ফাগে চিরদিন "অরুণিত" থাকুক। "বৃন্দাবনের তরুলতা, যমুনার জল, নির্ম্মল আকাশ, ফলফুল সবই" যেমন "রাঙ্গা," তেমনি লেখকের ভাবালস নয়নে আজ সমস্তই "রাঙ্গা" হইয়াছে। আজ তিনি যেদিকে তাকান, সমস্তই লালে লাল। আজ তাঁহার—

"রাঙ্গা ময়ুর নাচে গাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥

আজ আনন্দ আর ধরে না।"—বসন্তের এমনিই আনন্দ-সাগরে লেখক আজ স্বীয় "কর্ম্মজীবন" মিশাইয়া মহানন্দে মাতিয়াছেন। বসন্তের এই ফাগু খেলায় যে সত্যসত্যই মাতিতে পারে, তার রঙ্গের অভাব হয় না, পার্থিব রঙ্গ যতই ফুরাইয়া আসে, হৃদয়ের অপার্থিব রঙ্গ—অর্থাৎ অনুরাগ—ততই বাড়িতে থাকে। লেখকের ভাষায় বলি,—রঙ্গের অভাবে হতাশ হইও না। "রঙ্গ ফুরাইয়া গিয়াছে? তার জন্য ভাবনা কি? কত রঙ্গ চাও, আমরা দিতেছি। তোমার কৃপায় আমাদের রঙ্গের (অনুরাগের) অভাব নাই।" কিন্তু সে রঙ্গ "সে ফাগু বাহিরের রক্ত-রজঃ নহে। সে অভ্র আবীর নহে। সে অন্তরের নব-অনুরাগের অরুণ লেখা। এই ফাগু মনেই উড়ায়, মনেই লাগে।" এ আবীরের মনের এই চিরনূতন ফাগুর কোনো দিন ক্ষয় হয় না। এই—

"আবিরে অরুণ সব বৃন্দাবন উড়িয়া গগন ছায়।
বন্ধুয়া আমার হিয়ার মাঝারে কেহ না দেখিতে পায়॥
চপল নয়ন পিচকারী যেন নীরখে নয়ন মোর।
নব অনুরাগ ফাগু ভরল তনু মন করি জোর॥"

এমনই আকিঞ্চনের পর "অনুরাগ ফাগু হইল। নয়নের চাহনি পিচকারী স্বরূপে পরস্পরের মুখে পুনঃ পুনঃ

নিপতিত হইতে লাগিল।" এইভাবে, খগেন্দ্রনাথের রসময়ী ভাষার ঝঙ্কারে প্রবন্ধের সর্ব্বাঙ্গ উল্লসিত। ইহা ছাড়া "হোরী" উৎসবের ঐতিহাসিকতা জানিতে হইলে এই প্রবন্ধ যে অবশ্যপাঠ্য, তাহাতে সংশয় নাই।

শ্রেষ্ঠ গান (কবিতা) শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।—তানসেন সম্বন্ধে ইহা একটি ক্ষুদ্র কবিতা। খুব সুন্দর। রমণী বাবুর হাত পরিষ্কার, বীণাও সুসম্বদ্ধ,—তাই কবিতাটিতে একটি শান্ত-মধুর ভাব ফুটিয়াছে। কবিতাটি এতই ছোট যে, কোনো স্থান উদ্ধার করিবার যো নাই, করিলে সবটুকুই করিতে হয়, কিন্তু সেটা রীতিবিরুদ্ধ। তাই আমরা বিরত হইলাম

ভারতবর্ষ, চৈত্র—১৩৩২।

মিলনপূর্ণিমা (১০) ক্রমশঃ। ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন, এম, এ, ডি, এল, । ফাল্গুনের বঙ্গবাণীতে ফাল্গুনের ভারতবর্ষ সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা ডাক্তার সেনের সৌরীনের মুখে রেখাকে বলিতে শুনিয়াছি—"আর দেরী নেই রেখা, চকোরচকোরীর মিলনপূর্ণিমা এসে পৌঁছেছে—"ইত্যাদি। আবার এমাসে অর্থাৎ এই ভরা চৈত্রে দেখিতেছি সৌরীনের চাকরী হ'য়ে যাওয়ায় "টেলিগ্রামখানা হাতে করিয়া রেখা আনন্দকম্পিত অন্তরে তাহা পাঠ করিল। তার মনের ভিতর নৃত্যোৎসব লাগিয়া গেল। এতদিন সৌরীনের সঙ্গে যে পরিপূর্ণ একত্ব সে কামনা করিয়া আসিয়াছে, তাহা আজ হাতের ভিতর আসিয়াছে তাহাদের ভিতরকার এই যে অসহ্য দূরত্ব তাহা দূর হইবার দিন আসিয়াছে—চক্রবাক চক্রবাকীর মিলনপূর্ণিমা সমাগত,—"এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্যাপারটা কি? "চকোর চকোরীর মিলনপূর্ণিমা" আর "চক্রবাক চক্রবাকীর মিলনপূর্ণিমা"—এ দু'টো জিনিষ কদাচ হিসাবমত এক হইতে পারে না। চকা-চকীর পক্ষে অমাবস্যা পূর্ণিমা দুইই সমান, কেননা রাত্রিতে তাহাদের মিলনের সম্ভাবনা নাই। কি ট্রাম, কি বাস্, কি "ফেরি ষ্টীমারের ফার্ষ্ট ক্লাসের কেবিন"—কোথাও নহে। ডাক্তার সেন চকোরী ছাড়িয়া হঠাৎ চক্রবাকী ধরিলেন কেন? এতে যে সমস্ত রসটুকু রসাভাসে পরিণত হইল! লিখিতে বসিয়া খেই হারাইলে চলিবে কেন? তার পরের কথাটা ত মোটেই বুঝিলাম না। অর্থাৎ যাহা বুঝিতেছি, তাহাই যদি সত্যিকার অর্থ হয়, তবে ত রেখা-সৌরীনের ঘোর অমাবস্যা উপস্থিত বলিতে হইবে। সৌরীনের চাকরী হইলেই কি রেখার বাঞ্ছিত "পরিপুর্ণ একত্ব" তার "হাতের ভিতর" আসিবে? এ "একত্বটা" কি? সৌরীনের চাকরী হইলেই তাহাকে লইয়া বেথুন কালেজের বোর্ডিং ছাড়িয়া রেখার দেশান্তরে বা পৃথক্ কোনো স্বাধীন আস্তানায় "একেশ্বরী" হইয়া বসিতে পারিলেই কি রেখার "একত্ব" পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়? না, এ ছাড়া এই "একত্বের" অন্য কোনো গূঢ় মানে আছে? যে মানে "ট্রামকারে" "ষ্টীমারের কেবিনে" বা "বোটানিকেল গার্ডেনে" পরিস্ফুট হইবার অবসর পায় নাই। আশাকরি লেখক পরবর্ত্তী অংশে ইহার একটা সমাধান করিবেন। ডাক্তার সেনগুপ্ত সৌরীনকে "স্থিতিবান" করিয়া বসাইতে চাহেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার লেখার এবং সেই সঙ্গে রেখারও স্থিতি যে কতকটা লজ্জিত হইল, তাহা কি তিনি ভাবিয়াছেন? তিনি নিজে একজন স্থিতিমান লেখক, তবুও কেন যে "স্থিতিবান হইয়া" "মহদনুষ্ঠান সম্পন্ন" করিতে চান, (ভা, ব, ৪৯১ পৃঃ) তাহা বুঝিলাম না। মাতৃভাষার কমনীয় উদ্যানে স্বৈরচারিতার মাত্রা বাড়াইয়া লাভ কি? "মহদনুষ্ঠানে" কেবল যে অনুষ্ঠানের মহত্ব" একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে—তাহা নহে, পরন্তু "মহৎ" শব্দ গিয়া অনুষ্ঠানের সম্বন্ধি-রূপে খাড়া হইয়াছে; অর্থাৎ লেখকের বক্তব্য "মহৎ"—বড় যে অনুষ্ঠান, তাহা "মহতের" অর্থাৎ কোনো বড় লোকের

"অনুষ্ঠান" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার এই "স্থিতিবান" "মহদনুষ্ঠানে" হয়ত জননী বঙ্গভাষা স্বর্গীয় কাব্যবিশারদের সুরে কান্দিয়া কহিবেন—

"ও তোর বিষম চাপে যায় বুঝি প্রাণ
ছেড়ে দে বাপ্‌ ও নীলমণি।
ও তোর যার কল্যাণে জগৎ দেখা
আমি রে তোর সেই জননী।"

তারপর "এই প্রক্রিয়ার ভিতর খুব বিদ্বান এবং একটি সাধারণ রকম শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভিতর খুব বেশী কোনও তারতম্যের অবসর হয় না। যে বস্তু বিদ্যাকে জীবনের পক্ষে কার্য্যকরী করিয়া তোলে, তাহা তীব্র ও বৃহৎ কল্পনাশক্তি।" (ভা, ব, পৃ ৪৯১)। বাস্‌! চমৎকার "সারমন্‌,"—জিনিষটা কি? হয় দার্শনিক, না হয় ঔপন্যাসিক হও, দু'টো হওয়া এত তাড়াতাড়ি চল্‌বে কেন? কথাটা কি? কিছুইত বুঝিলাম না ছাই। দেখা যাক্‌ পরে কি দাঁড়ায়।

বাল্যবিবাহ ও অকাল মৃত্যু—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, বি-এ, এটর্নি-এট-ল। বিগত ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষে "বাল্যবিবাহ ও অকাল মৃত্যু" শীর্ষক যে প্রবন্ধ চারুবাবু লিখিয়াছিলেন, কার্ত্তিকের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র দাস মহাশয় তাহার প্রতিবাদ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ সেই প্রতিবাদের পুনঃ প্রতিবাদ। সুতরাং এরূপ মসীযুদ্ধে পক্ষ গ্রহণ অনুচিত; কিন্তু চারুবাবুর এই পুনঃপ্রতিবাদ পড়িয়া আমরা প্রচুর আনন্দ পাইয়াছি। প্রবন্ধটির আদ্যন্ত যুক্তি-তর্ক-মীমাংসা দ্বারা সুদৃঢ়, শাস্ত্রীয় কবচে সংরক্ষিত এবং বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে বিমণ্ডিত। শাস্ত্রের কোনো একটি বচন আত্মমতের অনুকূল অর্থদ্যোতক হইলেই উল্লাসে আটখানা না হইয়া অন্যান্য বচনের সহিত একবাক্যতা সমাধানপূর্ব্বক তাহার অর্থ গ্রহণ করাই চিরাচরিত পন্থা। চারুবাবু সেই পথ ধরিয়া মীমাংসা করিয়াছেন; অর্থাৎ 'ক্রোমলেদারে' বাঁধানো মনু যাজ্ঞবল্ক্য স্পর্শ না করিয়া, খাঁটি তালপাতার পুঁথি ঘাটিয়া বচনপ্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। বাজে বকেন নাই। মতের মিল না হইলেই যে তৎক্ষণাৎ তাহা "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে, এতটা স্পর্দ্ধা শাস্ত্রানুগত-বুদ্ধি চারুবাবুর নাই, যেন কোনোদিন হয়ও না। প্রবন্ধটি বড় সুপাঠ্য হইয়াছে। পরিশেষে একটি কথা,—বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ প্রভৃতি লইয়া এখন আর প্রতিভা ক্ষয় না করিলেও চলে, কেননা দেশ আপনিই তাহা পরিহার করিতেছে। সুতরাং এ বৃথা আলোচনায় লাভ কি?

উর্ব্বশীর অভিশাপ—(কবিতা) শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়। বেজায় লম্বা, যেন কাজি নজরুল ইসলামের কবিতা। তবে শেষোক্ত কবির লেখায় প্রাণ আছে, সেইজন্য তাহার দীর্ঘত্ব রসভঙ্গ করে না, আর আলোচ্য কবিতা প্রাণহীন, সুতরাং বিরক্তিকর।

সবুজপত্র, চৈত্র—১৩৩২।

পেনাঙের পথে—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সবুজপত্রের পনরটি পৃষ্ঠা ব্যাপী এই জাহাজ ভ্রমণের বৃত্তান্তে ডাক্তার সুনীতিকুমার আদৌ জমাইতে পারেন নাই। "সন্দেশ" "খোকাখুকু" প্রভৃতি শিশুরঞ্জন মাসিক পত্রে এই কাহিনী হয়ত জমিত, কেননা—খাসা 'গপ্‌পর' মত লেখা। লেখককে আমরা একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি বলিয়া জানি, কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে তাহার কোনোই পরিচয় পাইলাম না। জাহাজ কেমন? "সামনেটা

দোতলা ; উপরের তলায় যন্ত্রপাতি * * নীচের তলায় কতগুলি ক্যাবিন, সেখানে খালাসীদের জায়গা। * * তার পরে হচ্ছে একতলা খোলা ডেক ; * * তারপর জাহাজের মধ্য ভাগটা ; সেখানে সব নীচে ইঞ্জিন ঘর, তার উপরে খোলা ডেকের সঙ্গে একতলায় কতগুলো ক্যাবিন ; * * তার উপরে প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন, আর তার চার ধারে খোলা ডেক ; আবার তার উপরে হচ্ছে কাপ্তেনের ঘর, জাহাজ চালাবার চাকা এই সব। * * *" সুনীতিকুমারের লেখনীর এই ব্যর্থতায় আমরা দুঃখিত।

লোহার ব্যথা—(কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত। ত্রিশটি পঙ্‌ক্তিতে একটি সুন্দর কবিতা। বার বার পড়িতে ইচ্ছা যায়। সেই ভোর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কর্ম্মকার ভাই হাতুড়ি পিটাইতেছেন, তিলমাত্র বিরাম নাই ; লোহা সবিনয়ে বলিতেছে, "পিটুচ্ছই ত, ভাই একটু জিরিয়ে নাও, আমিত গিছিই, কিন্তু তোমার অবস্থা দেখেও দুঃখ হচ্ছে।"—কবিতাটি পড়্‌বার সময়ে—

"পাঁচশ বছর এম্‌নি করে স'য়ে আছি সমুদয়" মনে পড়ে। ব্যঞ্জনাত্মিকা এরূপ কবিতার ভূয়ঃ প্রচার প্রার্থনীয়। ইহাই প্রকৃত "ধ্বনিকাব্য"—বাচ্যার্থকে ছাড়াইয়া ইহার ব্যঙ্গার্থ চমৎকারিতা প্রকাশ করিতেছে।

লোহা বলিতেছে—

"ও ভাই কর্ম্মকার !
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক কর্ম্ম আর ?
কোন্ ভোরে সেই ধরেছ হাতুড়ি রাত্রি গভীর হ'ল,
ঝিল্লিমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোলগো যন্ত্র তোল।"

পিটুনির চোটে বিকৃতাকার লোহা গভীর দুঃখে কান্দিতেছে—

"রাত্রি দুপ'রে মনে নাহি পড়ে কি ছিলাম আমি ভোরে ;
ভাঙিলে গড়িলে সিধা বাঁকা গোল লম্বা চৌকা করে।
কভু আতপ্ত, কভু লাল, কভু উজ্জ্বল রবি সম ;
কভু বা সলিলে করিলে শীতল অসহ্য দাহ মম।
অজানা দু'জনে গলা'য়ে আগুনে জুড়িয়া মিটালে সাধ ;
বড় হতে কভু বাহুল্যবোধে মাথা কেটে দিলে বাদ।
ঘন ঘন ঘন পরিবর্ত্তনে আপনা চিনিতে নারি ;
স্থির হ'য়ে যাই, ভাবিবারে চাই—পড়ে হাতুড়ির বাড়ি।"

লোহা কর্ম্মকারকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

"ও ভাই কর্ম্মকার ! * * *
কহ গো বন্ধু, কহ কানে কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা তোমার দিনের রুজি ?
তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি ?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ ভাই—হাতুড়ির মারফতি ?"

কিন্তু কর্ম্মকার ভায়া নীরব ; কোনো উত্তর নাই ; তিনি পিটিয়াই যাইতেছেন। চমৎকার ভাব।

কাগজ—বীরবল। ("আনন্দবাজারের" জন্ত বিশেষভাবে লিখিত) আনন্দবাজারের জন্মতিথি পূজার দিনে পুরোহিত বীরবল ঠাকুরের স্বস্তিবচন। এক কথায় বলি—অপূর্ব্ব। গৈরিক স্রাবের স্থায় ভাষার নির্ঝর তরতর বেগে ছুটিয়াছে, ভাব যেন চতুষ্পার্শ্বের প্রবাহরাশির মত আসিয়া—সেই নির্ঝরিণীতে মিশিতেছে। খাঁটি সত্য, প্রিয় সত্য, অপ্রিয় সত্য,—বীরবলের কষ্টিপাথরে জল্ জল্ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, বীরবলের ভাষা ও ভাবের সম্পদ্ যে কত বেশী, তাহা যদিও সর্ব্বজনবিদিত, তবুও এই প্রবন্ধটিতে তাঁহার সে পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে তাঁহাকে উদ্দেশে নমস্কার করি। এমন লেখা যে ভাষায় বাহির হয়, তার আর মার নাই। মানব সমাজের স্বর্গারোহণের আর বড় বেশী দেরি নাই,—বীরবল বলেন—"মানব সমাজ তার উন্নতির শেষ ধাপে এসে পৌচেছে। এর পরেই তার স্বর্গারোহণ—বক্তে বক্তে।" তবেত দেখ্ছি মহা মুস্কিল। কাউন্সিল এসেম্ব্লির উপায়? তবে ভরসা—অনেকে স্বর্গারোহণের পূর্ব্বেই সরিয়া আসিয়াছেন।

দোলপূর্ণিমায়—(কবিতা) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৫ই ফাল্গুন ১৩৩২। একটি প্রকৃত কবিতা। বসন্তের প্রকৃত শ্রী, দোলপূর্ণিমার প্রকৃত মাধুরী যদি উপভোগ করিতে চাও, তাহলে "দোল ফাগুনের চাঁদের আলোর সুধায় মাখা" কবির হৃদয়াকাশের দিকে একবার তাকাও। প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে।

প্রবাসী, চৈত্র—১৩৩২

দিবসের শেষে—(গল্প) শ্রীজগদীশ চন্দ্র গুপ্ত। একটি ছোট গল্প,—ভাবের স্ফুরণে আদ্যন্ত উজ্জ্বল।—গরীব রতি নাপিতের সুখের সংসার, স্ত্রী নারাণী ও তার পাঁচ বছরের ছেলে পাঁচু—এই তিনজনে মনের সুখে দিন কাটায়। পাঁচু স্বপ্নে দেখেছে—তাকে আজ কুমীরে নেবে,—মাকে সে সেই কথা বলায় মা আজ আর ছেলেকে কোলছাড়া করিতে চায় না। সন্ধ্যাবেলায়,—"দিবসের শেষে"—দুরন্ত পাঁচু সমস্ত গায়ে ধূলামাটি মেখে একটি ছোট ভূত সেজে এসে হাজির। তুলসী তলায় প্রদীপ ও ঘরদুয়োরে সাঁজের বাতি দেখাতে নারাণী ব্যস্ত, রতি পাঁচুকে নিয়ে নিকটবর্ত্তী কামদা নদীতে গিয়েছে, ছেলেকে ধুইয়ে মুছিয়ে নিজেও গা' ধুয়ে আসবে। কামদায় কোনো দিন কেহ কুমীর দেখে নাই,—রতি নিশ্চিন্ত, কেননা—ছেলেরা কত-কিই-না বলে। গা' হাত-পা ধুয়ে পিতাপুত্রে বাড়ী ফির্বে, এমন সময়ে একটু হিসেবের ভুলে সত্যিই হঠাৎ পাঁচুকে কুমীরে নিয়ে গেল। নারাণী দৌড়ে এসে তীরে মূর্চ্ছিত। লোকে লোকারণ্য। একবার মাত্র ওপারের দিকে দেখা গেল,—কুমীরটা ভেসে যেন একবার পাঁচুকে আকাশের দিকে কাকে দেখিয়ে—অমনি আবার ডুব্ল। সব শেষ। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এল, নারাণীর বুক ও রতির সংসার চিরদিনের মত অন্ধকারে ডুবিল। এই করুণ কাহিনী জগদীশচন্দ্র এমনই দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন যে, পাঠকালে অশ্রুসংবরণ দায়। লেখক হিসেবী লোক,—গল্পের কোথাও বাজে 'আগড়ম্-বাগড়ম্' নাই। ভাষাও বেশ সংযত।

চিত্ত বাসন্তী—(কবিতা) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত। ইহা একটি সুপাঠ্য কবিতা। লেখক—দার্শনিকের চক্ষে বসন্তের রূপলহরী দেখিতেছেন ও চিত্রকরের হস্তে তাহার সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করিতেছেন। বাসন্তীরাণীকে ধরিতে লেখক পাগল হইয়াছেন—যেদিকে তাকান্,—ঐ এক রূপ, ঐ এক বিভূতি। গতজন্মের কত বিস্মৃত স্মৃতির উন্মেষে লেখক "সারদা মঙ্গলের" কবির মত উন্মত্ত হইয়া কহিতেছেন—

"————উদাসীর মত
আছাড়ি' পরাণ মোর কাঁদে অবিরত

সন্ধ্যালোকে নদীতীরে চক্রবাক সম ;
দিবারাত্রি সুপ্তিহীন জাগরণ মম !
ওগো মৌন, কথা কও, কথা কও রাণী,
অন্তরে জ্বালিয়া দিব্যপ্রেমজ্যোতিখানি ॥"

কবিতার অধীশ্বরী দেবতা লেখকের বাসনা পূর্ণ করুন।

"আমি ও তুমি" কুড়ুলরাম রচিত, ঢেঁকিরাম বিচিত্রিত। "গড্ডালিকার" ছায়ায় পড়িয়া কুড়ুলরামের পদ্য যে আদৌ গজাইতেছে না,—তা' হয়ত তিনি "Zানৃতি" পারেন না, তাই এত, "হাসেন-হোসেন" করিতেছেন। দিনখন দেখিয়া কেচে গণ্ডূষ করুন, তবে যদি জমে।

প্রিয়া।—(কবিতা) শ্রীচন্দ্রশেখর আঢ্য। কবিতাটির নামটুকুই যা' জমিয়াছে আর সব বাজে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।—অধ্যাপক কর্ম্মিকির বিদায় উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা। লেখকের নাম নাই, সুতরাং হিসাবমত সম্পাদককেই লেখক ধরিয়া লইতে হইবে।

"আচার্য্য কর্মিকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধ অনুসারে উপনিষদ্ সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাগুলি উৎকৃষ্ট, এবং এদেশেই প্রকাশিত হইবে। দুঃখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধগুলির পাঠ উপলক্ষ্যে এরূপ বন্দোবস্ত করেন নাই, ও আচার্য্য মহাশয়ের এরূপ অভ্যর্থনা করেন নাই যদ্দ্বারা আমাদের মাতৃভূমির বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশে গৌরবান্বিত হইতে পারেন।"—বলিয়া লেখক উপসংহার করিয়াছেন। অর্থাৎ গত ৭।৮ বৎসরের অভ্যাসগুণে, যেটুকু পারেন, তাঁহার "মাতৃভূমির বিশ্ববিদ্যালয়ের" গাত্রে হুল ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পৃথিবীর নানাদেশ হইতে জ্ঞানী মহাজনদিগকে আনাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। এটা নূতন নহে। প্রতিবারেই সমস্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, যাঁহারা জ্ঞানপিপাসু, তাঁহাদের সমাগম হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে নিয়মানুসারে অর্থও পর্য্যাপ্ত ব্যয় করেন। জ্ঞানের মন্দিরে আত্মম্ভরিতার স্থান নাই, তাই হয়ত ২।৪ জন আসেন না। নতুবা প্রকৃত জ্ঞানার্থীর সমাগমের কোনো দিনই অভাব হয় না। দেশবরেণ্য অধ্যাপককে বক্তৃতাদান করিতে আহ্বান করা হয় কিন্তু অভিনন্দনাদি দিয়া তাঁহাকে লঘু করা হয় না। ইউরোপের কত মনস্বী অধ্যাপক ত আসিয়াছেন, বক্তৃতা দিয়াছেন, কৈ কখনো কাহাকেও ঐরূপ কিছু করা হয় নাই। "বিদেশে গৌরবান্বিত" হইবার কারণ সম্বন্ধে ঘোর মতভেদ বিদ্যমান; কেহ হয়ত ভাবেন —"অভ্যর্থনা" "অভিনন্দন" প্রভৃতি, কেহ ভাবেন—সংযতভাবে বক্তার অভিভাষণ শ্রবণ করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের "রিডার" বা বক্তার বক্তৃতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রকাশ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাহা "এদেশেই প্রকাশিত" হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ত কাহারও ভাসুর নন্ যে; হিন্দুদের মত, তাঁর নাম উচ্চারণে বাধা থাকিতে পারে। কল্পিত দোষ প্রদর্শনে ত কখনো বাধা দেখিতে পাই না। কথায় বলে—"যাকে হের্‌তে নারি, তা'র চলন বাঁকা" বলি আর কেন? দেখিলে ত প্রাণপণ করিয়া আজ ৫।৭ বচ্ছর, এখন থামিয়া যাও না বাপু। এতকাল মাছি হইয়া দেখিলে, এখন একবার বাকী কয় দিন ভ্রমর হইতে একটু চেষ্টা কর দেখি। বেলা যে গেল! অধ্যাপক কর্মিকিকে তিনটি বক্তৃতার দরুণ বিশ্ববিদ্যালয় সহস্র মুদ্রা পারিশ্রমিক দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় বেগার লইবার পক্ষপাতী নহেন।

মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন—১৩৩২।

কলিকাতা ও সহরতলী—৫৪ বৎসর পূর্ব্বে (ক্রমশঃ, ২য় প্রবন্ধ) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই প্রবন্ধটি পড়া উচিত। বর্ত্তমান যুগের "শঙ্করাচার্য্য" আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাংলার দুর্দ্দশায়, পল্লীরাণীর দুর্দ্দশায় যে কত ব্যথিত, এই প্রবন্ধের প্রতি পঙ্‌ক্তি তাহার সাক্ষী। আচার্য্য রায় বাষ্পস্তম্ভিতকণ্ঠে কহিতেছেন—"আমাদের দুর্ভাগ্য যে, অধুনা পল্লীগ্রামে বাস করা অসভ্যতার পরিচায়ক। কলিকাতায় আসিয়া তথাকথিত সভ্যসমাজে বাস করাই এখন সকলের লক্ষ্য হইয়াছে।"

"আধুনিক সভ্যতা যাহাকে বলে—সেটা সাম্যনিদর্শনমাত্র—বহির্ভাগ দুরস্ত রাখিতে পারিলেই আজকাল সভ্য আখ্যা পাওয়া যায়।"

"বাংলায় ৮১টি জুটমিল আছে, তন্মধ্যে মাত্র ২টি মাড়োয়ারীর।"

"আমি ত খদ্দর খদ্দর করিয়া পাগল। গত বৎসরের যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখি, ২৫ হইতে ৩৫ কোটি টাকার বিলাতী কাপড় এদেশে আমদানী হইয়াছে।"

"আলিপুরে ৭ শত ৫০ জন এবং খুলনায় এক শত জন উকীল আছেন। তাহার উপর প্রতিবৎসর ১০।১৫ জন ওকালতীতে যোগদান করিতেছেন।"——"বরিশালে গিয়া কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, তথায় এমন ২।৪ জন উকীল আছেন যাঁহারা মাসিক ৫।৭ শত টাকা উপার্জ্জন করেন। অবশিষ্ট উকীলরা গড়পড়তায় মাসিক ১৫ টাকা পান কি না সন্দেহ।"——"অথচ প্রতি বৎসর ২ হাজার ছাত্র আইন শিক্ষা করিতেছে। ইহা কি অর্থনীতির আত্মহত্যা নহে?"

"—এখন বাংলাদেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। জীবনযাত্রার প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের মুখের গ্রাস বিদেশে যাইতেছে। রেল অথবা ষ্টীমারে চড়িলেই টিকিটের মূল্যের চৌদ্দআনা বিদেশের তহবিলে চলিয়া যায়। যে দুই আনা আন্দাজ এই রহিল, তাহা ষ্টিশন মাষ্টার, খালাসী প্রভৃতি ভাগ করিয়া লয়। বৈদ্যুতিক শক্তি বিদেশীর হাতে—

"পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে"

এরূপ উপাদেয় প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে বঙ্গের প্রতিগৃহে বিতরিত হওয়া প্রার্থনীয়।

গজুরভজন—(৪) শ্রীঅমৃতলাল বসু (ক্রমশঃ নাই) রসরাজ অমৃতলালের রসময়ী লেখনী বর্ষার কূলপ্লাবিনী তটিনীর মত তরতর বেগে বহিয়া গিয়াছে। কুঞ্জতারিণী ও চন্দন বষ্টমীর আলেখ্যের "ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে" শ্রীধাম নবদ্বীপের বাবাজী ও মাগোঁসাইদের অস্পষ্ট প্রতিকৃতি অতি সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথায় কার চোখের আল্‌সিতে চিতে ধরেছে, কে কখন কেন ঘন ঘন হাই তুল্‌ছে—শ্রীধামের মাহাত্ম্যে কার কখন কি রস উথ্‌লে উঠ্‌ছে—"বৃন্দাবন made patent বৈষ্ণবের" পদধূলিতে কার আঙ্গিনা কখন কি ভাবে পবিত্র হচ্ছে, এ সকলের নিখুঁত্‌ ছবি যদি দেখিতে চাও—"গজুরভজন" পড়।

বসন্তের কবিকুঞ্জ।—বিভিন্ন লেখক লেখিকায় বসন্ত-কালোচিত, মোট ১২টি কবিতা। সম্পাদক মশায় যেন কাঙালী বিদায় কর্‌তে বসেছেন, দরাজ হাতে বারোজনের মন রেখেছেন। কোনোটিই আলোচনার যোগ্য নহে। সম্পাদক মহাশয়ের দুরবস্থা দর্শনে বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর সেই "পারি না কারো হাত ছাড়া'তে"—গান মনে পড়িতেছে।

———

সুদর্শন

মাটীর ব্যথা

তোরা কি বুঝিবি শ্যামল বুকের
গোপন মর্ম্মে কি জ্বালা বহি'—
কত লাঞ্ছনা, অনাদর গ্লানি
দীর্ঘনিশাসে লুকা'য়ে সহি!

আপন বুকের রস বরষিয়া
স্নেহের দুলালে রাখি সরসিয়া;
স্তন্য ধারার অভাবে নিয়ত
রক্ত-ব্যথার জ্বালায় দহি!

মোর মধুমাস হরণ করিয়া
শাখে শাখে ভাতি ফুঠিয়া উঠে—
আমার হাসিটী চরণে দলিয়া
মুঞ্জরি' তৃণ নিয়ত লোটে!

আমার ভূষণ হরি' চুপে চুপে—
ভবনে ভবনে আনে নব রূপে!
হারাইয়া সব পিছে দেখি হায়
আপনার বাকী নাহিক েোটে!

মূকের বেদনা মুখর হইয়া
মরুভূ গাথায় যখন নাচে—
তখন আমার মুক্ত বেদনা
দরদীর কাছে করুণা যাচে!

তার আগে কেবা বোঝে হতাশায়....
কত আঁখিজল ঝরে নিরালয়ে।
পাঁজর জ্বালানো রিক্ত ব্যথায়
অভাগিনী আর কেমনে বাঁচে?

গৃহ-কোণে কোণে কন্যার জ্বালা
প্রাণের বেদনা আনিছে ডাকি'—
কাটাকাটি শত, অশ্রু-ধারায়
তুলিছে করুণ মূরতি আঁকি'।

প্রতিদানে এই মহাছলনায়—
বুকের আগুণে শুধু ঘি জোগায়!
কতদিন আর কতযুগ বল
দুঃসহ ব্যথা চাপিয়া রাখি?

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বৈশাখে

পরলোকগতা সরোজকুমারী দেবী—বঙ্গবাণীর গতবর্ষের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের সংখ্যায় সরোজকুমারী দেবীর "অমল" উপন্যাসখানির প্রথম দুইটি অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল; এই সময়ে উপন্যাস-রচয়িত্রী কঠিন পীড়ায় পড়েন ও সেইজন্য পরবর্ত্তী তিন মাস ধরিয়া উপন্যাসের অন্য অংশ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারে নাই; আর সেই পীড়ার ফলেই প্রায় এক মাস পূর্ব্বে লেখিকার দেহান্ত হইয়াছে। লেখিকার স্বামী রায় বাহাদুর যোগীন্দ্রনাথ সেন হাতের লেখা সমগ্র উপন্যাসখানি এখন আমাদের হাতে দিয়াছেন, কিন্তু আমরা এখন যে কারণে ঐ সুরচিত উপন্যাসখানি প্রকাশ করিতে না পারিয়া ক্ষুন্ন হইতেছি সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি। গত বৎসরের শেষ সংখ্যাতেও ঐ উপন্যাস প্রকাশের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইতে পারে নাই, আর তাহার পর নূতন বৎসরের দুই মাসের মধ্যেও ঐ উপন্যাসের

অংশ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এখন নূতন গ্রাহকদের পক্ষে গত বৎসরের লেখা খুঁজিয়া উপন্যাসের ধারাবাহিকতা ধরিয়া উপন্যাসখানি পড়িয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া ঐ উপন্যাসখানির প্রকাশ বন্ধ থাকায় অন্য নূতন উপন্যাস প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি; এখন অনেকগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস প্রকাশ করা বঙ্গবাণীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। যাহাতে এই সুরচিত মনোজ্ঞ উপন্যাসখানি পূর্ণভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, ও বঙ্গবাণীর গ্রাহকেরা উহা পড়িবার সুবিধা পান, তাহার জন্য আমাদের সাগ্রহ চেষ্টা রহিল। সাহিত্য-চর্চ্চা ও সাহিত্য-রচনায় যিনি সারা জীবন আনন্দ লাভ করিয়াছেন ও বঙ্গবাণীর প্রতি যাঁহার বিশেষ আদর ছিল সেই সুশিক্ষিতা পরলোকগতা সরোজকুমারী দেবীর উদ্দেশে আমরা এই প্রসঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

*   *   *   *

বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলন—এবারে চৈত্রমাসে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল বীরভূম শিউড়িতে, ও প্রবাসী বাঙ্গালীরা তাঁহাদের সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক উৎসব করিয়াছিলেন কানপুরে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ ছিলেন বলিয়া বীরভূমের সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, আর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও অসুস্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্থলে কানপুরে সভাপতি হইয়াছিলেন সঙ্গীত-নিপুণ ও কবি-ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত অতুল প্রসাদ সেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের আগামী বর্ষের সম্মিলন দিল্লীতে হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

বীরভূমের সম্মিলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত ও সাহিত্য শাখার সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী। কোন কোন পথভ্রান্ত মুসলমান নেতা বঙ্গভাষার প্রতি বিদ্বেষ দেখাইয়া যে আপনাদের অনিষ্ট করিতেছেন, শ্রীমতী সরলা দেবী তাহা তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ শিউড়িতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে যে ঐ বিষয়েই অনেক কথা বলিতেন, তাহা প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত তাঁহার একটি প্রবন্ধে সূচিত হইতেছে। আমাদের যে দেশে জনম, যে দেশে বাস, সে দেশের ভাষা ছাড়িলে যে এদেশের কোন সম্প্রদায়ের লোক উন্নতি লাভ করিতে পারেন না, তাহা আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় লিখিয়াছি। আশা করি দেশের সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকে স্বদেশের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হইয়া আপনাদিগকে ও জন্মভূমিকে ধন্য করিবেন।

*   *   *   *

কলিকাতার দাঙ্গা—আমরা খুব কম পক্ষে পাঁচ ছয় বার এই পত্রিকায় এই নির্ভুল সত্যটির আলোচনা করিয়াছি যে, এদেশবাসীরা যদি সাধারণের সমান স্বার্থ ও কল্যাণের দিকে তাকাইয়া ভারতবাসী নামে আপনাদের প্রকাশ্য পরিচয় না দেন, আর যদি নিজেদের ব্যক্তিনিষ্ঠ

বা সম্প্রদায়নিষ্ঠ ধর্ম্মমতের নামে পরিচিত হইতে চা'ন, তবে বৈষম্যের সংঘর্ষণে একতা ও উন্নতি অসম্ভব হইবে। হিন্দু বলিলে যাহা বুঝায় তাহার সঙ্গে যাহা মুসলমান বলিলে বুঝায় তাহার মিল থাকা অসম্ভব। দেশের কল্যাণের জন্য যাহা সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষে প্রয়োজন, তাহা লোকসাধারণকে বুঝাইয়া সকলের মিলনের চেষ্টা না করিয়া যখনই "হিন্দুমুসলমানে" মিলন ঘটাইবার চেষ্টা হয়, তখনই অসম্ভবকে লইয়া খেলা করা হয়। তবুও যেমন করিয়াই হউক্ মানুষেরা আপনাদের সুবুদ্ধি ও শান্তিপ্রিয়তার গূঢ় টানে বহুদিন ধরিয়া আপনাদের কাজ করিয়া আসিয়াছে ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ধরিয়া অনেক দিন লড়াই করে নাই। আশা ছিল যে অভ্যাসের ফলে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্ব্বিবাদে কাজ করিতে শিখিবে ও ধীরে ধীরে সকলের দৃষ্টি দেশের স্থায়ী কল্যাণের দিকে পড়িবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে স্যর আবদুর রহিমের মত শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ মুসলমান হিতকর নীতির পরিপন্থী হইয়া গত শীত ঋতুতে আলিগড় বিদ্যাপীঠের সভায় অসংযত ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বক্তৃতার সমালোচনা করিয়াছি আর ঐ বক্তৃতাটিকে নিঃসম্পর্কিত ইউরোপীয়েরা যে হিন্দু-বিদ্বেষমূলক মনে করেন, তাহাও বলিয়াছি। স্যর আবদুর অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে জীবনের সকল লক্ষ্যে ও ব্যবহারের প্রতি খুঁটি-নাটিতে মুসলমানেরা হিন্দু হইতে এত পৃথক যে, কোন উপায়েই হিন্দু মুসলমানে মিল হওয়া অসম্ভব। তিনি অতি দৃঢ় ও তীব্র ভাষায় আর্য্যসমাজের লোকেদের শুদ্ধি-বিধান পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া উহার প্রতিষেধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্পের কথা বলিয়াছিলেন। পদস্থ ব্যক্তিদের এরূপ উক্তির ফল যে বিষময় হইতে পারে, তাহা কয়েকখানি ইংরেজী পত্রের ইংরেজ সম্পাদকেরাও বলিয়াছিলেন।

সকলেই জানেন যে কলিকাতার দাঙ্গার সূত্রপাত হইয়াছিল মুসলমানদের সহিত আর্য্য-সমাজের লোকেদের সংঘর্ষে। এ সংঘর্ষটি যে স্যর আবদুরের অসংযত ভাষার উত্তেজনায় ঘটিয়াছিল, এরূপ বলিতে পারিনা; কারণ, কাকও উড়িল আর তালও পড়িল, ইহা দেখিয়া কাকে তাল ফেলিয়াছে বলা চলে না। তবে একথা কিন্তু পরিস্ফুট যে, আর্য্যসমাজের উপরে স্যর আবদুরের ক্রোধ অত্যধিক, আর মুসলমানদের দল বিশেষেও ঐরূপ ক্রোধ বদ্ধমূল আছে।

আর্য্যসমাজের লোকেরা মুসলমানদের ঐ মনের ভাবের কথা জানিতেন; তাই যখন তাঁহারা পুলিশের কাছে তাঁহাদের মিছিল বাহির করিবার পাস্ চাহেন, তখন বিশেষভাবে মুসলমান মস্‌জিদের নিকটে পুলিশের বিশেষ পাহারা চাহিয়া ছিলেন। পুলিশের লোকেরা হয়ত বিষয়টিকে তেমন গুরুতর মনে করেন নাই, ও সেইজন্য মুসলমান মস্‌জিদের কাছে কোনরূপ আকস্মিক আক্রমণ নিবারণের ব্যবস্থা করেন নাই। যে মস্‌জিদের সম্মুখের রাস্তায় দাঙ্গার সূত্রপাত হয়, সেই মস্‌জিদে ও মস্‌জিদের নিকটে আগে হইতে দাঙ্গা বাধাইবার উপকরণ সংগৃহীত ছিল বলিয়া যে জনরব শুনিয়াছি, তাহা সত্য কিনা, গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধানে স্থির হওয়া উচিত।

জনরবটি অমূলক প্রতিপন্ন না হইলে বলা কঠিন যে আর্য্যসমাজের লোকেরা তাঁহাদের ব্যবহারে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন কিনা।

মুসলমানেরা আর্য্যসমাজকে ভাল করিয়াই চেনেন; আর্য্যসমাজের লোকেরা জাতিভেদ মানেন না, মুসলমানকেও শুদ্ধি দিয়া দলে টানেন, ও হিন্দুদের প্রতিমা পূজার বিরোধী। তবে আর্য্যসমাজের উপরে ঝাল ঝাড়িতে গিয়া মুসলমানেরা দাঙ্গা বাধাইবার মুখেই হিন্দুর দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া হিন্দুদিগকে দাঙ্গার আবর্ত্তে টানিলেন কেন? হিন্দুরা আর্য্য-সমাজীদের বিরোধী, কিন্তু এইরূপ ব্যবহারে দাঙ্গা বাধিয়া গেল—হিন্দু-মুসলমানে। এ দাঙ্গায় অনেক পাশব অত্যাচার ও পৈশাচিক নরহত্যা হইয়াছে,—যাহারা দূর সম্পর্কেও দাঙ্গায় লিপ্ত ছিল না, দাঙ্গাকারীরা নৃশংসভাবে তাহাদের অনেকের প্রাণ নিয়াছে ও সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে। দাঙ্গার কোলাহলের সুবিধায় অনেক পশুপ্রকৃতি গুণ্ডারা নরহত্যা করিয়া লোকের সম্পত্তি লুট করিয়াছে।

যাঁহারা মনে করেন যে কুশিক্ষিতদের মনে যে সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ প্রচ্ছন্নভাবে জমাট ছিল, তাহা এই দাঙ্গার ঝঞ্ঝায় উড়িয়া গেল, তাঁহারা ভ্রান্ত। পাপকে মানসিক চিন্তায় পুষিলে চিত্ত মলিন ও কলঙ্কিত হয় সত্য, কিন্তু পাপের অনুষ্ঠান করিতে সুবিধা না পাইলে ঐ পাপবুদ্ধি ক্ষয় হইতে থাকে; আর পাপের কাজ অনুষ্ঠিত হইলেই মনের পাপ সবল ও দৃঢ় হয়। কাজেই যাহা ঘটিয়াছে, সমাজকে অনেক দিন ধরিয়া তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে। ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিতে পৃথিবীর তাপ উপশমের উপমাটি হিংসা-বিদ্বেষের অভিনয়ের বেলায় খাটে না। হিন্দু গুণ্ডা হোক্, মুসলমান গুণ্ডা হোক্, যাহারা এই পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহারাই সমাজে নৃশংস পাপিষ্ঠের সংখ্যা বাড়াইয়াছে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে সামরিক বলের পরিচয় হয় সৎসাহসে ও সংযত ব্যবহারে; চুরি-ডাকাতিতে ও এই শ্রেণীর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সামরিক বলের পরিচয় মেলে না। এই দাঙ্গার সম্পর্কে এদেশের যুবক ছাত্রদের ব্যবহারের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কল্যাণকর শক্তি-বৃদ্ধির নিদর্শন মিলিয়াছে; সে কথা পরে বলিব।

গোড়ায় আর্য্যসমাজীরা যে ভাবে পুলিশের সাহায্য চাহিয়াছিলেন তাহা যদি মিলিত, তবে এই দাঙ্গা বাধিতে অথবা বাড়িতে পারিত না! সে সময়ের কথায় কেহ বলিতে পারেন না যে, পুলিশের পক্ষে তখন যথেষ্ট সংখ্যায় কর্ম্মক্ষম রক্ষক পাঠান অসম্ভব ছিল। আর্য্য-সমাজীদের বিনা প্রার্থনাতেই পুলিশের পক্ষে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, কারণ তাঁহারা পাস্ দিবার সময় রাস্তায় মস্‌জিদের স্থিতির কথা জানিতেন ও আর্য্যসমাজীদের উপর মুসলমানদের গভীর আক্রোশের কথাও জানিতেন। হইতে পারে যে শেষকালে পুলিশের কাজ মোটের উপর ভালই হইয়াছে, কিন্তু অনেক গভীর সঙ্কটের সময় যে পুলিশকে ডাকিয়া

ডাকিয়া কোন সাহায্য যথা সময়ে পাওয়া যায় নাই, তাহা অনেকে স্পষ্ট ভাষায় অনেক সংবাদ-পত্রে লিখিয়াছেন। দাঙ্গাকারীরা যখন হিন্দুর ঠাকুর-মন্দির ভাঙ্গিয়াও তৃপ্ত না হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেন্সি কলেজ আক্রমণ করিল ও সেখানকার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাহসী বৃদ্ধ দরোয়ানকে নৃশংসভাবে হত্যা করিল, তখন টেলিফোনে ডাকিয়া ডাকিয়া যথা সময়ে পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এমন অনেক স্থলের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। স্বয়ং পুলিশের লোকে কোন কোন স্থানে লুট-তরাজ করিয়াছে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, আর পুলিশের কর্ত্তারাও নাকি তাহা নিতান্ত অমূলক নয় মনে করিয়া অনুসন্ধান চালাইতেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের দুঃখময় দুর্ঘটনা, মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতাল আক্রমণ ও ডাকগাড়ীর শিখ চালককে হত্যা করিয়া ডাকের বস্তা লুট প্রভৃতি দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারি যে দাঙ্গাকারীরা উন্মত্ত ও ধর্ম্মান্ধ নয়,—তাহারা স্থিরমতি চক্ষুষ্মান্ ডাকাত। হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়া যাহারা মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়াছে, সম্পত্তি ধ্বংস করিয়াছে ও লুটিয়াছে, নরহত্যা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে, তাহারাও ডাকাত। ইউরোপীয় দেশের তুলনায় এই নৃশংস শ্রেণীর লোকের সংখ্যা কলিকাতায় অথবা ভারতের অন্যত্র কত অধিক, তাহা আমাদের বলিবার সাধ্য নাই। তবে এই শ্রেণীর পাপ ও পাপিষ্ঠ যে কেবল স্বরাজপ্রার্থী ভারতেরই বিশেষ সম্পদ, তাহা নয়। কেবল "শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা," এঅবস্থা পৃথিবীর কোন দেশেরই নয়। দেশ রক্ষা ও পাপ নিবারণের জন্য সকল দেশে ফৌজ ও পুলিশ রাখা হয়; তবে ইউরোপে তাহারা কাজ করে ভাল, আর আমাদের দেশে আমরা পুলিশের সাহায্য চাহিলে স্বরাজ প্রার্থনার খোঁটা খাই। ভারত যদি স্বরাজ পায়, অথবা তাহাকে যদি স্বরাজ দান করা হয়, তাহা হইলে দেশ যে কেবল স্বরাজ নামের দব্‌দবাইএ চলিবে তাহা নয়,—দুষ্টের ও নৃশংসের দমনের জন্য ফৌজ ও পুলিশ রক্ষিত হইবেই ও তাহারা উপযুক্ত কাজ করিবার জন্য দায়ী রহিবে। কাজেই আমাদের গাছে উঠিবার আগেই এই এক কাঁদি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ উপহার দেওয়া চলে না; যে আমরা স্বরাজ চাই বলিয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিলে কেবল লজ্জায় মুখ লুকাইয়া থাকিব আর পুলিশ বা ফৌজের সাহায্য চাহিব না। যাঁহারা ব্যঙ্গ করিয়া দেখাইতেছেন যে পুলিশ না হইলে আমাদের চলে না, রাজা রক্ষা না করিলে আমরা রক্ষিত হইতে পারি না, তাঁহারা কি বলিতে চান যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ পুলিশ ও ফৌজশূন্য ও রাজশক্তিশূন্য একটা বিশাল অরাজকতা? স্বরাজ হাতে আসিলে স্বরাজের পুলিশ কাজে অপটু হইলে স্বরাজের কলঙ্ক হইবে, আর এখনকার পুলিশের অপটুতায় প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির গায়েই কলঙ্ক লাগে। সরু ও আঁকা-বাঁকা গলির অজুহাতে অক্ষমতা ঢাকিবার চেষ্টাও যাহা, এক হাতে ঢাল ও আর এক হাতে তলোয়ার ধরিয়া বেহাত হইয়া পড়িবার ওজরও তাহাই।

এই আঁকাবাঁকা সরু গলিওয়ালা সহরকেই শৃঙ্খলায় রাখিবার দায়িত্ব রহিয়াছে, সরকার বাহাদুরের উপর। এই দাঙ্গায় ঠিক কিরূপ শ্রেণীর কত লোক জুটিয়াছিল, তাহা এখনও অনুসন্ধানে নির্ণীত হয় নাই, তবে কি হিন্দু কি মুসলমান প্রায় সকল বাঙ্গালীই দাঙ্গার সহিত অসম্পৃক্ত ছিলেন, এই আনন্দজনক সংবাদ অনেকের মুখে পাইয়াছি। হিন্দুরা দুঃস্থ মুসলমানদিগকে ও মুসলমানেরা নিপীড়িত হিন্দুদিগকে অনেক স্থলে আশ্রয় দিয়াছেন, এ সংবাদও পড়িয়াছি। দাঙ্গা থামাইবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা যেভাবে কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন, তাহা সরকারের উপেক্ষিত হইলেও আমাদের কাছে প্রশংসনীয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও সার্ভেণ্ট সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী যেরূপে আপনাদের জীবন বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া কাজ করিয়াছেন নিতান্ত দুর্ম্মুখও তাহার প্রশংসা করিতে বাধ্য।

কেন যে কর্পোরেশন ও কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নিয়ন্ত্রিত, যুবক সেবকদলকে দাঙ্গার সময়ে দুঃস্থদের রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে দেওয়া হয় নাই, তাহা সরকারি কর্ম্মচারীরাই জানেন; কিন্তু তাহারা অনুমতি পাইলে যে ভাল কাজ করিতে পারিত, ও পুলিশের সাহায্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সাহায্য দিয়া অনেককে রক্ষা করিতে পারিত, তাহা আমরা যুবক ছাত্রদলের কর্ম্মের দৃষ্টান্তে জোর করিয়া বলিতে পারি। আমাদের যুবক ছাত্রেরা দেশের ভবিষ্যতের আশা। তাহাদের অসম্প্রদায়িক উদারতা, জীবন সংশয়ের ব্যাপারে নির্ভীকতা, কর্ত্তব্য পালনে অটলতা ও পৈশাচিক উত্তেজনার মধ্যে ধীরতা ও স্থিরপ্রাণতা দেখিয়া আমরা আনন্দে উৎফুল্ল ও আশায় উদ্দীপ্ত। যে মূঢ়েরা যুবক ছাত্রদের এই কীর্ত্তির মহিমাকে তুচ্ছ ও নগণ্য বলিয়াছে, তাহারা কৃপার পাত্র। পাছে পুলিশের ও সৈন্যদের প্রাপ্য প্রশংসা কিছু কম পড়ে ভাবিয়া যাঁহারা যুবক ছাত্রদের দীপ্ত কীর্ত্তিকে ঢাকিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের আদর নাই।

আমাদের যুবক ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কুশিক্ষিত হয় নাই, তাহারা যে কর্ত্তব্যের আহ্বানে সকল বিপদসঙ্কুল কাজে মাথা দিতে পারে, ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া দেশের সকলকে তুল্যরূপে সেবা করিতে পারে, এই দৃষ্টান্তেই যথেষ্ট যে এদেশ, শাসনের দায়িত্ব মাথায় বহিতে সম্পূর্ণ উপযোগী। দাঙ্গার দৃষ্টান্ত দিয়া যাঁহারা আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের অনুপযোগিতার কথা বলিতে চান, তাহারা হয় আমাদের বদ্ধশত্রু না হয় এত বড় আহাম্মক যে, সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ পাইয়াও দাঙ্গার ব্যাপারটির চারি পাশে প্রদীপ্ত সামাজিক উন্নতির অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন না।

দাঙ্গা থামাইবার উদ্যোগে সকল শ্রেণীর নেতা ও কর্ম্মীরা অগ্রসর হইয়াছিলেন, সংবাদ পাইয়াছি; কিন্তু এ কাজে যিনি অগ্রসর হইলে ভাল কাজ হইত বলিয়া বিশ্বাস করা যায়,

অনেক মুসলমান যাঁহার নেতৃত্ব বরণ করিয়াছেন শুনিতে পাই, সেই স্যর্ আবদুর রহিম এ সময়ে দেখা দেন নাই কেন ? অন্যদিকে আবার দেখিতে পাই যে, দেশের অন্যান্য নেতারা হিন্দু-মুসলমান অভেদে সকল দুঃস্থের সেবার জন্য ও ধর্ম্মের ভেদ না করিয়া মন্দির ও মস্‌জিদ মেরামতের জন্য টাকা তুলিতেছেন ও মিলনের অন্য অনুষ্ঠান করিতেছেন ; স্যর আবদুর রহিম কিন্তু কেবল মুসলমানদের নালিস শুনিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছেন, মুসলমানদের সাহায্য দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন ও মুসলমানদের জন্য কলিকাতায় আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবেন বলিয়া সুর তুলিয়াছেন। এই দুর্দ্দশাতেও যাঁহার চৈতন্য হইল না, প্রাণে একবিন্দু উদারতা সঞ্চারিত হইল না, তিনি যত বড় শিক্ষিত হইলেও সুবুদ্ধি নহেন। সুখের বিষয় এদেশে বহু শিক্ষিত মুসলমান আছেন যাঁহারা পদ-গৌরবে স্যর্ আবদুরের সমকক্ষ না হইলেও সুবুদ্ধিতে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অবশ্য শিক্ষিতদের মধ্যে দু-চারিজন এমন মুসলমানও আছেন (হয়ত হিন্দুদের মধ্যেও তেমন আছেন) যাঁহারা বড় সুবুদ্ধির পরিচয় দেন না ; এমন হাস্যকর সংবাদও পড়িয়াছি, যে একজন মুসলমান নাকি লিখিয়াছেন যে, হিন্দুরা যেখানে দুঃস্থ মুসলমানদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সেখানে হিন্দুদের নাকি উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদিগকে বন্দী করিয়া রাখা।

দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হইয়া এসময়ে যাঁহারা কিছু লেখেন বা বলেন তাঁহারা একদিকে কলিকাতায় একবার দাঙ্গা থামিবার পর আবার নরহত্যার দাঙ্গার পুনরুত্থান দেখিয়া, ও অন্যদিকে কুমিল্লায়, সাসারামে ও জব্বলপুরে পাপানুষ্ঠান বাড়িবার সংবাদে সংযত হউন। যাহার উত্তেজনাতেই হউক বহুদূরস্থানেও হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করা ও ঠাকুর চুরি করা যখন চলিতেছে, তখন হিংসা-বিদ্বেষের বিষকে সংক্রামক না করিবার দিকে সকলের দৃষ্টি পড়া উচিত। যাঁহার প্রভাবের সময় মোস্লেম রাজ্যের বহুবিস্তৃতি হইয়াছিল, সেই মহাত্মা ওমরের দুইটি বাণী হিন্দু ও মুসলমানকে তুল্যভাবে স্মরণ করিতে বলিতেছি :—যিনি দাসের প্রতিও অত্যাচার করেন স্বর্গের দ্বার তাঁহার পক্ষে রুদ্ধ ; যাঁহারা জগদীশ্বরের নামে হিংসা-বিদ্বেষের কাজ করেন তাঁহারা আল্লার শত্রু।

* * *

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন—যাঁহারা নিজের গৌরবে ও কীর্ত্তির মহিমায় দেশে আপনাদের স্মৃতি অক্ষয় করেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁহাদের মধ্যে প্রধান একজন। তিনি সারা দেশে এতই আদৃত ছিলেন যে দেশের প্রতিগৃহের লোকেরাই এখন তাঁহার জীবন-চরিতের সহিত পরিচিত। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কেবল এই বঙ্গদেশে যত টাকা উঠিয়াছিল, তাহারই আয়ে চিত্তরঞ্জন প্রদত্ত ১৪৮ নং দক্ষিণ রসারোডস্থ ভবনে উক্ত সেবাসদন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সেবাসদনে স্ত্রীলোকদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে ও স্ত্রীলোকদের চিকিৎসায় যাঁহারা শুশ্রূষা করিতে শিক্ষা পান সেই নর্সদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা

হইয়াছে। সেবাসদনের চিকিৎসালয়ে আসিয়া স্ত্রীলোকেরা ত ঔষধ পাইবেনই, তাহা ছাড়া চব্বিশ জন স্ত্রীলোক যাহাতে সেবাসদনে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতে পারেন তাহার পাকা বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্ত্রীরোগ-চিকিৎসায় যিনি অভিজ্ঞ ও পারদর্শী বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত, সেই ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায় সেবাসদনের সকল আভ্যন্তরিক কাজ পরিচালনের ভার লইয়াছেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ আরও কয়েকজন এই চিকিৎসালয়ের কাজের সহিত যুক্ত হইয়াছেন। এই সেবাসদনে মাসিক ব্যয় যে আড়াই হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা স্মৃতিভাণ্ডারের আয় হইতে ব্যয়িত হইতে পারিবে। কাজেই বলিতে পারি যে এই সেবাসদনটি আশানুরূপ উপযোগিতায় স্থায়ী হইল।

যে গৃহে সেবাসদন প্রতিষ্ঠিত হইল, উহা আয়তনে রাজপ্রাসাদের মত; কাজেই স্থানের অভাব কিছুমাত্র হইবে না। এখন ঐ গৃহটির উত্তর ভাগে যে অনেকখানি জমি আছে, তাহার উপরেও আর একটি বড় বাড়ী করিয়া চিকিৎসালয়ের প্রসার বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প আছে। গৃহটির দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে যে পুকুরটি আছে উহাও ভরাট করিয়া সেখানে বাড়ী তুলিয়া চিকিৎসালয়ের অধিকতর প্রসার বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে। এসকল কাজ সম্পন্ন হইলে সেবাসদনটি সহরের একটি শ্রেষ্ঠ নারী-চিকিৎসালয় হইবে।

দেশবন্ধু যে গৃহ ও সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন তাহা তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকার ঋণে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু দেশবন্ধুর নামে ও সেবাসদনের শুভ উদ্দেশ্যের নামে উত্তমর্ণেরা অনেক টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন, আর এমন কি একজন উত্তমর্ণ তাঁহার পূর্ণ প্রাপ্য ষাট হাজার টাকা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছেন; তুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকাতেই সকল ঋণ শোধ হইয়াছে। দেশের লোকেরা অনেক করিয়াছেন, তবুও এই সেবাসদনকে পূর্ণগৌরবে রক্ষা করিবার জন্য সকলে অগ্রসর হইবেন আশা করি।

* * * *

শ্রীহট্ট বঙ্গে ফিরিল—শ্রীহট্ট বা শিলেট জেলার লোকেরা যে বাঙ্গালী সে কথা বাঙ্গালীকে শোনাইতে হইবে না। শাসনের সুবিধার জন্য এই জেলাটিকে আসামে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু এখন জেলার অধিবাসীদের আবেদনে ভারত সচিব ঐ জেলাটিকে বাঙ্গলাদেশের শাসনাধীন করিয়া দিলেন। শিলেটের অনেক ব্যক্তি সেকালে ও একালে আমাদের বঙ্গদেশের গৌরব, সেইজন্য এই সংবাদে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

* * * *

সুভাষচন্দ্রের মানহানির মকদ্দমা—সুশিক্ষিত ও সাহসী দেশসেবক সুভাষচন্দ্র বসুকে যখন আদালতের বিনা বিচারে গবর্ণমেণ্ট কারারুদ্ধ করিলেন তখন এদেশে স্বল্প পরিচিত কেথলিক্ হেরাল্ড নামক পত্রের উক্তি অনুসরণ করিয়া ইংলিশমান পত্র লিখিয়াছিলেন যে সুভাষচন্দ্র গোপনে বিপ্লবপন্থী রাজ-দ্রোহীদের দলে ও কর্ম্মে লিপ্ত থাকার অপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। এরূপ অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ বড় সোজা কথা নয়, কারণ এ অপরাধের দণ্ড অতি গুরু; আর যাহারা উহাতে লিপ্ত হয় তাহারা লোকচক্ষে কুচরিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। সুভাষচন্দ্র ইহাতে ইংলিশমানের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অনেক টাকার খেসারতের দাবিতে মানহানির মকদ্দমা উপস্থিত করেন। অভিযোগের মূলে যদি অল্প পরিমাণেও সত্য থাকিত, তবে ইংলিশমানের মত শক্তিশালী পত্র সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাহা

প্রমাণিত করিতে পারিতেন, কারণ এরূপ শ্রেণীর মানহানির মকদ্দমায় প্রতিবাদী নিজের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার অধিকারী। ইংলিশমান পত্র এদেশে প্রবাসী উচ্চতম পদস্থ ধনী ব্যক্তিদের ও প্রভুতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আবরণে ও অনুগ্রহে রক্ষিত; সে পত্রকে যখন স্বীকার করিতেই হইল যে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা অন্যায়ভাবে অসতর্কিত অবস্থায় লেখা হইয়াছিল ও তাহার যথার্থতা সম্বন্ধে ইংলিসমান কিছুই জানেন না, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে সুভাষচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া কারারুদ্ধ করা কত অন্যায় হইয়াছে। ইংলিশমান আদালতে দোষ স্বীকার করায় বরং লঘু দণ্ড হইয়াছে ও তাঁহাকে দুই হাজার টাকা সুভাষচন্দ্রকে খেসারত স্বরূপে দিতে হইবে। মকদ্দমার এই বিচারে আমরা আনন্দিত, কিন্তু সে আনন্দ গভীর দুঃখের শ্বাস ফেলিয়া উপভোগ করিতে হয়।

* * * *

শোক সংবাদ—টাকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্, সাহিত্য সমাজে ও দেশ হিতৈষণার কর্ম্মভূমিতে লব্ধ প্রতিষ্ঠ ছিলেন। খুব সম্ভব, ৬২ কি ৬৩ বৎসর বয়সে গত চৈত্র মাসে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল। তিনি ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের পারদর্শিতায় এম্ এ, উপাধি পাইয়াছিলেন ও পরে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র গভীর যত্নে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যাঁহাদের উদ্যোগে ও অবিচ্ছিন্ন অনুরাগে সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি তাঁহাদের প্রধান একজন ছিলেন, ও নিরন্তর সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াই জীবন ক্ষয় করিয়াছেন। তাঁহার পরবাদ-সহিষ্ণুতা, সাধুতা ও সৌজন্য তাঁহাকে সকল সমাজেই লোকপ্রিয় করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বঙ্গের একজন কৃতী সন্তানকে হারাইলাম।

* * * *

[পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব—কুৎসিত দাঙ্গার বিস্তৃতিতে পাশব অত্যাচারের ভয়ে ছাপাখানার কাজ কর্ম্ম যথাসময়ে চলিতে না পারায় এমাসে পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিল।

চিত্র পরিচয়

বিরহ

এই সংখ্যার প্রথমে যে ত্রিবর্ণ চিত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা "বাশলী চিত্রাবলী" নামে পরিচিত চিত্র সমূহের অন্যতম চিত্র। সম্ভবতঃ ইহা সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত। শ্রীশ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের শ্লোক অবলম্বনে চিত্রখানি অঙ্কিত হইয়াছিল। সুন্দর রেখাঙ্কন ও অতিসুন্দর রঙের সমবায়ের জন্য চিত্রগুলি বিখ্যাত। বক্ষ্যমাণ চিত্রের আখ্যান বস্তু এইরূপ ঃ—

রাত্রি সমাগত। কৃষ্ণবিরহে রাধা অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন—তাঁহার দুইজন সখী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। কৃষ্ণ অদূরে একটী বৃক্ষে হেলান দিয়া অলক্ষ্যে রাধাকে দেখিতেছেন।

দ্রষ্টব্য—আগামী সংখ্যা হইতে ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের একখানি নূতন উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবে।

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.


বঙ্গবাণী



কলেজষ্ট্রীট মার্কেট



বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৫ম বর্ষ
১৩৩২-'৩৩

জ্যৈষ্ঠ

প্রথমার্দ্ধ
৪র্থ সংখ্যা

মিত্রাক্ষর

মিল বাংলা কবিতার একটি অপূর্ব্ব অলঙ্কার—শুধু অলঙ্কার নয় দাতাকর্ণের কবচকুণ্ডলের মত ইহা বাংলাকবিতার অঙ্গের অঙ্গীভূত ও জীবনের 'সঙ্গীভূত'। শ্রুতিরঞ্জনী শ্রীমাধুরীর জন্য মিলের যুগ্মককে বঙ্গকাব্য-সরস্বতীর শ্রুতিযুগলে কুণ্ডলযুগল বলা যাইতে পারে!

সংস্কৃতে মাত্রাসমক শ্রেণীর পাদাকুলক, পজ্ঝটিকা ইত্যাদি ছন্দ ও গীত্যার্য্যা ও গাথা শ্রেণীর কয়েকটি ছন্দ ছাড়া অন্যান্য ছন্দে মিল নাই। কিন্তু সংস্কৃতে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণবৈষম্যের জন্য এবং তাল মান ও যতি অনুযায়ী বিধিবদ্ধ স্বরসন্নিবেশের জন্য এমন একটি ছন্দঃস্পন্দের সৃষ্টি হয় এবং এমন একটি তরঙ্গায়িত লীলা পদের মধ্য দিয়া নাচিয়া চলে, যাহার জন্য মিলের অভাবে মাধুর্য্যের অভাব হয়না। পংক্তিশেষে কেবল অক্ষরসাম্যই নাই কিন্তু প্রত্যেক পদের প্রত্যেক অক্ষরের স্বরমাত্রার সহিত অন্যান্য পদগুলির তৎতৎস্থানীয় অক্ষরের স্বর মাত্রার অক্ষুণ্ণ মিল ও সাম্য আছে। ইহা ছাড়া অনুপ্রাস যমকাদি শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্য্য আছে। স্বরমাত্রার সামঞ্জস্য সুসন্নিবেশ ও শৃঙ্খলিত বিন্যাসের ফলে সংস্কৃত ছন্দে যে স্বরস্পন্দ ও মধুস্যন্দ ঘটিয়া থাকে, অনুপ্রাসবাহুল্য সত্ত্বেও বাংলা ছন্দে তাহা সম্ভব হয় না। 'মিল' বাংলা ছন্দের সেই অভাব কতকটা দূর করিয়াছে। তাই বাংলাভাষার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছন্দগুলির জন্য মিল অপরিহার্য্য।

মিলই বাংলা কবিতায় তাল মান লয় যতি রতি সবই নিয়মিত করে—পদ্যকে গদ্যাত্মকতা হইতে রক্ষা করে, কবির লেখনীকে বিরাম দেয় ও সংযত করে। আবৃত্তিকালে পাঠকের কণ্ঠস্বরকে উত্থানপতনের সাহায্য করে—স্নেহাক্ত করিয়া তাহার বাগ্‌যন্ত্রকে অবাধে চলিবার বেগদান করে। মিল রচনার গতিক্লিষ্টতা হরণ করে—সুরকে বার বার নবীভূত করিয়া দেয়, ধ্বনিক্লান্ত কর্ণের ক্লান্তি-বিনোদ ঘটাইয়া নব নব উত্তেজনা দেয়। দীর্ঘছন্দের পথে 'মিল'-গুলি যেন মিলনের পান্থনিবাস।

গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া মিল ছন্দকে নব নব রূপ ও সৌষ্ঠবদান করে। বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বহুলপরিমাণে মিলের উপরই নির্ভর করে। মিলের সংস্থানই এক ছন্দ হইতে অন্য ছন্দকে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। মিলই একপদকে একাধিক পদে ভাঙিয়া সাজায়—বহু পদ ও পদাংশে গুচ্ছ বাঁধে ও শ্লোকের স্তবক রচনা করে—ধ্রুবপদকে বারবার ফিরাইয়া আনিয়া দেয়, পদবৈচিত্র্যের মধ্যে একটা আন্তরিক ঐক্যবন্ধন রক্ষা করে এবং সমগ্র রচনার মাধুর্য্য লালিত্য সৌষ্ঠব ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে। মিল সংযমের বল্গা দু'টি ধরিয়া পদান্তে বিরাজ করে এবং কোন পংক্তিকেই উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেয় না। দুইটি মাত্র অক্ষরকে অবলম্বন করিয়া মিল পদযুগ্মের বাকী সমস্ত বর্ণগুলিকেই শাসন করে।

'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল,'—এই নীরস গদ্যপংক্তিও নানা সুরে গাওয়া যাইতে পারে—কিন্তু গায়ককে এরূপ গদ্য পংক্তিটী সুরে মধুরায়িত করিতে রীতিমত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। সম্পূর্ণ অর্থমর্য্যাদা ও রসসৌকর্য্য রক্ষা করিয়া গদ্য বা গদিত বাক্যকে গাওয়া যায় না। তাই সঙ্গীতের জন্য ছন্দিত ও পদবদ্ধ বাণীর এত প্রয়োজন। এই ছন্দিত বাণী যদি মিলের দ্বারা ঝঙ্কৃত হয় তাহা হইলে উহা সঙ্গীতের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠে—গায়ককে গাহিতেও ক্লেশ পাইতে হয় না। মিল তাহার রাগ রাগিণীর তরঙ্গলীলা ও স্বরবৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়তা করে—যতি বিরতি ও সমের সংস্থান নির্দ্দেশ করিয়া সুরের যাত্রাপথকে সুগম করিয়া দেয়। শ্রোতারও সঙ্গীতের অর্থ ও রসবোধ করিতে কোন অসুবিধা হয় না। যাহা গীতিও বটে কাব্যও বটে অর্থাৎ গীতিকাব্য—তাহাতে মিলই প্রধান ঐশ্বর্য্য। জয়দেব এই মিলের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন—তাই সংস্কৃত ছন্দের নানা মাধুর্য্য থাকা সত্ত্বেও তিনি মিলকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়াছেন। প্রাকৃত পিঙ্গলসূত্রের অধিকাংশ ছন্দেই মিলের চমৎকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে।

বাংলা কবিতায় মিলের মাধুরী যেমন শ্রুতিবিনোদন করে—অন্য কোন প্রকার বর্ণবিন্যাস বা শব্দচাতুর্য্য তেমনটি করিতে পারে না। শ্রুতি বিনোদন করে বলিয়াই উহা স্মৃতিবিনোদনও করে। তাই মিলান্ত পংক্তি সহজেই স্মৃতিগত হইয়া যায় এবং ধৃতি ক্ষেত্রে আসন লাভ করে। ছন্দোগতি, একটি শব্দের পর অন্য শব্দটিকে মনে পড়ায়,—মিল

একটি পংক্তির পর তার মিত্র-পংক্তিকে মনে পড়ায়। 'সম' তৎসমকে মনে পড়ায়—মনস্তত্ত্বের Law of association by similarity and contiguity এক্ষেত্রে কাজ করে।

মিলের আকর্ষণী শক্তি উদাসীন পাঠককেও কবিতার সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া লইয়া যায়। মিল কবিতার ছন্দে এমন একটি তরঙ্গের সৃষ্টি করে—যাহাতে পাঠকের কাণ ও প্রাণ ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতে বাধ্য হয়—এমন একটি নৃত্যহিল্লোলের সৃষ্টি করে—যে নৃত্যের আবেশ পাঠকের কাণে ও প্রাণে লাগিয়া যায়,—কাণের সঙ্গে প্রাণ নাচিতে নাচিতে কবিতার দোলযাত্রায় যোগ দেয়। একবার নাচন পেলে সে নাচন থেকে সহজে বাঁচন নাই। নৃত্যের একটা নির্দ্দিষ্ট বেগ আছে—তাহার একটা পরিমিত তৃষ্ণা আছে—সে তৃষ্ণা মিটিবার আগেই যদি নাচন থামিতে বাধ্য হয় তবে নর্ত্তক বসিয়া বসিয়াও নাচে—শুইয়া শুইয়াও খানিকক্ষণ নাচিয়া লয়। 'মিল' কবিতায় যে নাচনের সৃষ্টি করে তাহার বেগ ও তৃষ্ণার টানে পাঠকের কাণ ও প্রাণ নাচিতে নাচিতে চলে—ক্লান্তি জন্মিবার আগেই যদি কবিতা থামিয়া যায়, তবু সে নাচন থামে না—খানিকক্ষণ আরো অনিচ্ছাতেও (reflexively) চলিতে থাকে—কাজেই ছন্দ ও মিলের রেশের সঙ্গে আবোল তাবোল অর্থহীন কথায় মনে মনে মিল দিয়াও নাচনের তাল রাখিতে হয়।

দুইটি পদকে মিল এক বৃন্তে দুইটি পুষ্পের মত ফুটাইয়া তুলে, ছন্দ তাহাকে বর্ণ-সৌষ্ঠব দেয়, কিন্তু মিল তাহাকে মধু ও সৌরভ যোগায়। মিল দুইটি পদকে এমন অটুট বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে যে পাঠকের মনে উহারা চিরাবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করে। একটি 'পত্রের' দুইটি দিকের মত অবিভাজ্যভাবেই রহিয়া যায়। একটি পংক্তিকে না ভাবিয়া অন্য পংক্তিটিকে ভাবাও যায়না। দুইটি পংক্তি যুগল বাহুর মত আমাদের চিত্তকে বেষ্টন করিয়া ধরে—সে বাহুবন্ধন সহজে ছাড়ান যায় না। এই প্রীতিবন্ধনের জন্য মিলান্ত পদগুলি এত লোককান্ত। সর্ব্বপ্রকার লোকসাহিত্য এই মিলান্ত ছন্দেই রচিত হইয়া আসিতেছে। সকল দেশের জনসাধারণ তাই মিলের ভক্ত। তাই দেশের অধিকাংশ প্রবাদ প্রবচন, 'বচন', অনুশাসন মিলান্ত ছন্দে লোকমুখেমুখে রচিত হইয়া জনপরম্পরায় এত সহজে ও অবিকৃতরূপে চলিয়া আসিতেছে। আপনার অক্ষম দুর্ব্বল বচনে যখন আর কুলায় না—আপনার যুক্তি তর্কে যখন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না—যখন আপনার নীরস অমিল বাক্যজাল প্রাণপণে বিস্তার করিয়াও তৃপ্তি হয় না—তখন 'কোন' অজ্ঞাত নাম গোত্র লোককাণ্ড কবির সমিল বচন প্রয়োগ করিয়া বক্তা আপন বক্তব্য শেষ করে। মিল বন্ধনের এমনি প্রভাব যে সমিল বচন প্রবচনগুলিই জনসাধারণের বেদ-কোরাণ-নীতিশাস্ত্র-রীতিশাস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। সমিল বচনে এমনি একটা রহস্য বিজড়িত আছে যে জনসাধারণের চিত্তে উহা যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উৎপাদন করে। জনসাধারণের বহুদিনের অভিজ্ঞতা সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাগুলি যুগ হইতে যুগান্তরে মিলের সূত্রেই গ্রথিত আছে। মিল যে অপূর্ব্ব লোক-সাহিত্য রচনা

করিয়া রাখিয়াছে—সেই সাহিত্য, সেই অনুশাসনমালা, সেই অগ্রন্থলব্ধ বিদ্যা, নিরক্ষর ও বর্ণজ্ঞান-মাত্রসম্বল জনসাধারণের একমাত্র অবলম্বন, চরিত্রগঠনের সহায়—জীবনের যাত্রাপথের পাথেয়। গ্রন্থস্থ বিদ্যার সহিত অনেক ক্ষেত্রে জীবনের কোন বিশেষ যোগ নাই, উহা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে পারে, যুক্তিতর্কপ্রয়োগে সাহায্য করিতে পারে, ভাষার পারিপাট্য দান করিতে পারে, অন্নার্জ্জনেরো সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু জীবনের দৈনন্দিন লোকযাত্রার সহিত তাহার বিশেষ প্রাণের সম্পর্ক নাই। প্রতিদিনকার ছোটখাট খুঁটীনাটী ঘটনার সহিত গ্রন্থগতবিদ্যার যোগ নাই. গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের নিত্যকৃত্যগুলিকে তাহা নিয়মিত বা পরিচালিত করে না। তাহা ছাড়া, গ্রন্থের বিদ্যা এত সহজে পুরুষপরম্পরায় অতীত হইতে বর্ত্তমানে--বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে বিতত হয়না—লোকপরম্পরায় মুখে মুখে অতি সহজে অনায়াসে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয় না এবং কোন দিনই সর্ব্বজনাধিগম্য হয় না। কৌতূহল ও কৌতুকের দুটি পাখার উপর ভর করিয়া পাখীর ঝাঁকের মত, জনারণ্যের সমিল বচনগুলি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে উড়িয়া চলিয়া যায়, বিনা ক্লেশে বিনা অবধানেই ধরা পড়ে, পোষা পাখীর মতই যেন হাতে হাতে উড়িয়া বসে। সমিল প্রবাদ প্রবচনগুলি যে বিদ্যা বহন করে তাহার আদান প্রদানেও বেশ একটা সাধারণতন্ত্রতা (democracy) আছে,—চতুষ্পাঠীর চতুষ্কোণের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়. ইহাতে গুরু শিষ্যের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট বৈষম্য নাই—এ বিদ্যার সকলেই ছাত্র সকলেই শিক্ষক। বাড়ীর নিরক্ষর ঠাকুরমার কাছ হইতে আরম্ভ করিয়া পাড়ার মেছুনী পর্য্যন্ত ইহার শিক্ষকতা করে।

এই সংক্ষিপ্ত সমিল সানুপ্রাস বচনগুলি কর্ম্মীদের কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতার ফল—কর্ম্মক্ষেত্রেরই আবিষ্কার, কর্ম্মশ্রুতির গৃহ্যসূত্র। কর্ম্মজীবন স্বেদসিক্ত, কিন্তু তাহার অভিজ্ঞতার ফল মিলের গুণে রসসিক্ত। এগুলি খনার বচন, ডাকের বচন ইত্যাদি নানারূপ ধারণ করিয়া কুটীরে কুটীরে কর্ম্মীদের শ্রমযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—পল্লী-সংসার ও পল্লীক্ষেত্রের সকল জীবনধারাকেই নিয়মিত করিতেছে। মিলই তাহাদিগকে সাধারণ অমার্জ্জিত ও প্রাকৃত বাক্যাবলী হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া, অনাবশ্যক শব্দপুঞ্জকে বর্জ্জন করিয়া, সূত্রাকারে রহস্যময় মন্ত্রস্যুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সেগুলির রচনা শিষ্ট বা সুষ্ঠু নয়। রুচি তেমন মার্জ্জিত সমুন্নত নয়—একমাত্র মিলই তাহাদিগকে গৌরব ও বৈশিষ্ট্য দানে শ্রদ্ধার্হ করিয়া রাখিয়াছে।

কর্ম্মকুণ্ঠকে কর্ম্মীরা ঐ বচনসাহায্যেই নিন্দা করে—হঠকারীকে সতর্ক করে, নবব্রতীকে উৎসাহিত করে, ফলাফলের ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করে—সাফল্যলাভ করিলে ঐ বচনেরই জয়মালা কণ্ঠে পরাইয়া দেয়, আবার আত্ম-বিশ্বাস হারাইলে ঐ বচনমধুতেই আশ্বাস দেয়। কেহ উপদেশ বা পরামর্শ চাহিতে গেলে বিজ্ঞজন একটি সমিল প্রবচন উচ্চারণ করিয়াই নীরব

রহিতে পারেন, উপদেশপ্রার্থীও দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়াই প্রসন্ন চিত্তে চলিয়া যায়—সে বুঝে,—ঐ সংক্ষিপ্ত বচনের অন্তরে কত বড় সত্য নিহিত আছে।

পল্লীবাসিগণের ভাষাসম্পদ প্রচুর নয়—মিল দেওয়ার কৌশলও তাহারা জ্ঞাতসারে চর্চ্চা করে নাই—অথচ মিল না দিলে তাহাদের তৃপ্তি হয় না—নিজের বচনকেও অমর করিতে পারে না। তাহাদের অমার্জ্জিত ও অসম্যক্ মিলে (Uncouth Rhyme) কিন্তু মিলের আগ্রহটুকু এমনি উন্মুখ হইয়া আছে, যে যাহারা উচ্চারণ করে তাহারা মিলের ক্রটী সারিয়া লয়। শ্রদ্ধা ও আগ্রহ চিরকালই এমনি সকল দোষ ক্রটী উপেক্ষা করিয়াই চলে। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়" এখানে 'যায়' ও 'হয়'—এ ঠিক মিল হইল না—অনায়াসে 'রাজায় রাজায় যুদ্ধে হায়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়," এইরূপ মিল কেহ চালাইতে পারিত—কিন্তু তাহা কেহ করে নাই বা করিতে সাহস করে না। সিন্দূরচন্দনলিপ্ত ভগ্নপাণি দারুবিগ্রহের ন্যায় ঐ প্রকার অশিষ্টমিল বচনগুলি অমার্জ্জিত অসংস্কৃত রূপেই আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে,—মিলে ক্রটী থাকুক, মিলের আগ্রহে ও উচ্চারকের শ্রদ্ধায় কোন ক্রটী নাই। পূর্ণাঙ্গ মিল বাণীকে ত অমর করেই। মিলের আগ্রহনিষ্ঠাও বাণীর জীবনীশক্তি বাড়াইয়া দেয়—মিলের সম্পূর্ণ দায়িত্বময় কর্ত্তব্য অশিষ্ট মিলও সম্পাদন করিতে পারে।

মিল আমাদের জনসাধারণের জন্য শুধু শাস্ত্র গড়ে নাই—শস্ত্রও গড়িয়াছিল, তাহারা জানিত সাধারণ অমিল গদ্য গদার মত কাষ্ঠখণ্ড মাত্র, দেহের মাংসপেশীর উপরই তাহার যত পরাক্রম—মিলের ফলা লাগানো পদ্যের শর ভিন্ন মর্ম্মস্থল ভেদ করা যায় না। তাই তাহারা ঐ প্রকারের তীক্ষ্ণশরে তূণগুলি ভরিয়া রাখিয়াছে। প্রতিপক্ষকে নির্ব্বাক করিতে ঐ শরপ্রয়োগের ব্যবস্থা বরাবর চলিয়া আসিতেছে। এমন কতকগুলি ছড়া প্রবচন আমাদের পল্লীসমাজে চলিত আছে যাহাদের অন্তরে মিলের পুটে—শত সহস্র বৃশ্চিকের বিষ পুঞ্জীভূত আছে। মিলই ঐ বিষকে তীব্র ও ঘনীভূত করিয়া রাখিয়াছে। এগুলির প্রয়োগ বড়ই মর্ম্মান্তিক। প্রতিপক্ষ যদি অরসিক হয় তবে ক্রোধে প্রতিহিংসায় অন্ধ হইয়া উঠে। আর রসিক হইলে তার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, সেও মিল-দেওয়া ছড়ায় উত্তর দেয় এবং ক্রোধের দিকে ততটা মনোযোগ না দিয়া সমিল বচনে প্রতিহিংসা লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। কাজেই এ ক্ষেত্রে মিল একটা অভিনব রসের সৃষ্টি করিয়া ক্রোধের রৌদ্ররসে রসাভাস (?) ঘটিয়ে দেয়—তখন অবিমিশ্র ক্রোধকে আর পাওয়া যায় না। পল্লীগ্রামে দুই পাড়াকুঁদুলী যখন ঝগড়া জুড়িয়া দেয়, তখন গ্লানির ভাষা একেবারে নিঃশেষ করিয়া প্রয়োগ করে, কিন্তু কিছুতেই হারজিতের মীমাংসা হয় না, উত্তেজনারও উপশম হয় না। পুনঃপুনঃ গালাগালির আবৃত্তি করিয়া রসনার ক্লান্তি আসে কিন্তু রোষণার শান্তি হয় না, তখন ভামিনীরা ছড়া কাটিতে আরম্ভ করে। তখন বুঝা যায় এইবার শেষ হইয়া আসিয়াছে—শ্রোতাদেরও কর্ণপীড়ার একটু উপশম হয়, বিরক্তি ক্রমে কৌতুকে পরিণত

হয়। দুটি নারীর নরীনৃত্য-ও যে রসসঞ্চার করিতে পারে নাই মিল সেই রসের সঞ্চার করিয়া ফেলে, তখন চণ্ডীদ্বয়ের চণ্ডিমায় সে রসের আমেজ লাগে, হয়ত হাসিয়া ফেলে, পার্শ্ববর্ত্তিনীদের সঙ্গে কথাও কহিয়া ফেলে—কলহে ক্রমভঙ্গ হইয়া যায়, ছড়াও মুহুর্ম্মুহুঃ জুটিয়া উঠেনা।—নূতন নূতন ছড়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হয়। রাঢ়দেশের বালিকারা ভাদু বা ভাজোর গানের ছড়া কাটাকাটি করিতে গিয়া তীব্র শাণিত মর্ম্মান্তিক ও গ্লানিকর বাক্য নিঃশেষ করিয়াই প্রয়োগ করে কিন্তু মিলের এমনি মাধুরী ও মহিমা যে, শত অমিলের মধ্যেও বিবদমানাদের ভিতর একটা রসের মিল জমিয়া উঠে। পূর্ব্বে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে সকল বিবাদেরই এমনিতর 'মধুরেণ' সমাপন হইত। এই শ্রেণীর অপূর্ব্ব সরস বিবাদে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকট হইয়া উঠে।

পূর্ব্বে দুই পাড়া বা দুই গ্রামের কবির দলের লড়াই লাগিয়া যাইত, নিরঙ্কুশ কবিসেনগণ মুখে মুখে মিল দিয়া শাণিত অঙ্কুশ প্রয়োগ করিত—নতুবা গাহিয়া সুরের শানে আরো শাণিত করিয়া তুলিত; সত্য অসত্য অনেক গ্লানি-নিন্দা মিলের গুণে মুখরোচক হইয়া উঠিত—প্রতিহিংসা ক্রমে 'মিলে মিলে'—মিলই বাড়াইত। বিবাদটা কিল বা ঢিলের বদলে মিলের সাহায্যেই অগ্রসর হইত। মিলই যেখানে বিবাদের অস্ত্র সেখানে অমিলটা আর স্থায়ী হইতে পারিত না। নিন্দাগ্লানি অপবাদ যতই তীব্র হউক, একমাত্র মিলই প্রতিপক্ষের অন্তরে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার সৃষ্টি করিত। নিতান্ত অরসিক ব্যক্তি, যে মিল-দেওয়া বচনে উত্তর দিতে জানে না, সে ছাড়া অন্য কেহ অসহিষ্ণু হইত না। বলাবাহুল্য কবির দলে অবশ্য সে শ্রেণীর অরসিকের ঠাঁইও ছিল না। মিলের মধ্যস্থতায় গ্রাম্য বিবাদগুলিতে যে সন্ধি স্থাপিত হইত সে সন্ধিসূত্র, সভ্য সমাজের অনেক সুস্বাক্ষরিত সুরচিত সুচিন্তিত সন্ধি পত্র অপেক্ষা মৈত্রীবলে অধিক বলীয়ান হইত।

দারুণ অভিমান অনেক সময় শ্লিষ্ট সমিল বচনে আকার লাভ করিয়াছে, কিন্তু মিলের খাতিরে বচনের 'লক্ষ্য' ব্যক্তি সে শ্লেষের জন্য আদৌ ক্লেশ অনুভব করে না। উদাহরণ স্বরূপ "যম জামাই ভাগ্না---তিন নয় আপ্না"—ইহা অভিমানের বাণী এবং রীতিমত তীব্র। এক ঢিলে দুই পাখীকে যমের বাড়ী পাঠানর মতন একমিলে জামাই ও ভাগ্নেকে যমের পাংক্তেয় করা হইয়াছে। কিন্তু এত বড় মর্ম্মান্তিক কথাতেও যে জামাই বা ভাগিনা রাগ করে না তার কারণ বচনটিতে মিল আছে,—অমিল গদ্যে বলিলে কি অনর্থই না ঘটিতে পারে!

বাংলাদেশে পুরুষদের সংস্কৃত শ্লোকে দেবপূজা ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদেরও বাংলাভাষায় একটা পূজাব্রতাদির প্রথা চলিয়া আসিতেছে, ইহা ছাড়া মানত মানসিক পার্ব্বণাদি আছে—পতিপুত্রের কল্যাণকামনায় অনেক প্রকার ক্রিয়াকৃত্য অনুষ্ঠানাদি আছে,—মৃতবৎসা ও বন্ধ্যার পৃথক আরাধনা আকূতি ও আবেদন আছে। এ সকলের জন্য যে

একটা বিরাট শাস্ত্রসংহিতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সবই চলিত বাংলায় মিল-দেওয়া ছন্দে রচিত। ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, শীতলা, চণ্ডী, মনসা, সুবচনী ইত্যাদি যে সকল দেবতা অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের উপাসনার ব্যবস্থা সমিল বাংলা ছন্দে। আমাদের শুদ্ধান্তচারিণীগণ পুরুষগণ অপেক্ষা অধিকতর শুদ্ধির পক্ষপাতিনী, লোক মুখে মুখে উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, সাধারণ গদ্য বাক্যে তাঁহারা দেবতার আরাধনা করিতে চাহেন না—সেজন্য তাঁহাদের দেবতার আরাধনার জন্য মিল-বন্ধনে পবিত্র ছন্দিত বাক্যের প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহাদের "আবেদন নিবেদনের থালাগুলি" সমিল বচনের শুভ্রশুচি নৈবেদ্যে পূর্ণ। মিল তাঁহাদের পক্ষে কেবল শ্রুতিবিনোদক নয়, শ্রদ্ধা ভক্তিরও উদ্বোধক এবং উপাসিকাগণ প্রত্যাশা করেন মিল-দেওয়া বচন দেবতার চিত্ত সহজে বিগলিত করিবে। মিলই গার্হস্থ্য তন্ত্রমন্ত্র সংহিতার মধ্য দিয়া আমাদের অন্তঃপুরিকাগণের ভক্তিধারাকে বহমান রাখিয়াছে। নিরক্ষর পল্লীগৃহিণীগণ মুখে মুখে শিখিয়া কন্যা বধূদের শিখাইয়া উপাসনা-পদ্ধতিকে অবিকৃত ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। মিল না থাকিলে ছড়া বচনগুলি মন্ত্রের মর্য্যাদা লাভ করিত না—সহজে শিখিয়া অপরকে শিখান ও সহজে মনে রাখাও সম্ভব হইত না।

আমাদের গৃহিণীদের বালিকা বয়স হইতেই মিলের অনুশীলন চলিয়া আসিতেছে। বালিকারা সমিল বচনেই পুণ্যিপুকুর, গোকল, যমপুকুর ও সাঁজপুজুনীর ব্রত করে—পুতুলের সোহাগ করে,—ছোট ভাইকে ঘুম পাড়ায়,—ভাইএর কপালে ফোঁটা দেয়—শিবঠাকুরের তিন বৌএর ভাগ্যাভাগ্যের কথা শোনে, আপনআপন ভবিষ্যৎ সংসার ও গৃহস্থালীর পূর্ব্বাভাস লাভ করে। জীবনের মিলটা তাহাদের তাড়াতাড়িই জোটে, তাই শিশুকাল হইতে মিলের চর্চ্চা করে—শুধু হাঁড়ীর সহিত সরার ও শিলের সঙ্গে নোড়ার মিল দিয়া নয়,—অক্ষরের সহিত অক্ষরের মিল দিয়াও—শুধু পুতুলের বিবাহ দিয়া নয়—কথায় কথায় বিবাহ দিয়াও। বালিকা মিলের মালমশলায় একটা স্বপ্নপুরী গড়িয়া রাখে—বিবাহের আগে ভাবে, ঐ স্বপ্নপুরীইর বুঝি সে হুরীপরী বা রাণী হইবে। বিবাহের পর নববধূ শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় রাশি রাশি যৌতুকের সঙ্গে রাশি রাশি মিলের কৌতুক সাথে লইয়া যায়। যৌতুকগুলি সকলে লুটিয়া লয়—সম্বল থাকে ঐ কৌতুকগুলি। অপরিচয়ের মাঝখানে নূতন সংসারে বিজনে বসিয়া সেইগুলি মৃদুগুঞ্জনে আবৃত্তি করে অথবা শিশুদেবরকে সেগুলি শুনাইয়া নীরস নিরানন্দ সন্ধ্যাগুলি কাটাইয়া দেয়—স্বামীর সহিত হৃদয়ের মিল হওয়ার আগে পর্য্যন্ত শব্দের মিলই তাহার জীবনটিকে সরস রাখে।

জানিনা শিশু কোন চির মিলনের দেশ হইতে এই অমিলের দেশে আসিয়া পড়িয়াছে, এখনো সেই দেশের স্মৃতি তাহার প্রীতি ও শ্রুতি ভরিয়া আছে। মিল দেখিলেই তাহার 'দীল' খুসী হইয়া উঠে। সে অবাক হইয়া ভাবে এখানে এত অমিল কেন? এত অমিলের

মধ্যেও শিশু তাই একটা মিলের জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে—তার ভাবের অভাব নাই কিন্তু ভাষার পুঁজি বড় কম। শিশুর কাছে সকল শব্দই প্রায় সমান, সবল গুলিই ধ্বনিধনে সমান ধনী, লোকে কতকগুলির অর্থ দিয়াছে—কতকগুলির দেয় নাই অথবা কতকগুলির অর্থ বোঝে—কতকগুলির বোঝে না। তাহাতে শব্দের বা ধ্বনির অপরাধ নাই। ধ্বনি মাত্রেই শিশুর কাছে সার্থক—অর্থের জন্য নহে—মাধুর্য্যের জন্য। শিশুকবি মিলঝঙ্কারের এত পক্ষপাতী যে, মিলটি বজায় রাখিয়া যে কোন্ ধ্বনির দ্বারাই সে ছন্দপূরণ করিয়া লইয়াছে—অর্থের জন্য একটুও চিন্তা করে নাই।—"ঘণ্টা কাঁসর সানাই বাজে—"এমন যে বাদ্য বাজে—নিশ্চয়ই কেহ সাজে,—নতুবা এত বাদ্য কেন? কিন্তু কে সাজে? শিশু নিঃসঙ্কোচে বলে "আগাডুম—বাগাডুম—ঘোড়াডুম" সাজে।—আগাডুম ঘোড়াডুমের অর্থ না থাক্—ধ্বনি আছে—মিলের প্রয়োজন সাধন করিয়াছে, এই যথেষ্ট। বাঁশ যে—"ছোটবেলায় কাপড় পরে—বড় হলে ন্যাংটা" এ বড়ই অদ্ভুত—নগ্নশিশুর পক্ষে এ বড় মজার কথা—ইহাতে শিশুর প্রাণে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল—শিশু বলিয়া উঠিল—'ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাংটা'। মিলের জন্য একটি নিরর্থক 'টা'এর আমদানী হইয়াছে, আর আনন্দের ধ্বনি ঐ 'ড্যাং' কেই চারিবার উচ্চারণ করিয়া শিশু পদপূরণ করিয়া লইয়াছে।

শিশু সব সময় দুই পংক্তি পূরণ করিয়া লইবারো প্রয়োজন বোধ করে নাই—মিল হইলেই যথেষ্ট।—"মোষ্—তোর গোদা পায়ে খোস্" "হাতী—তোর গোদা পায়ে লাথি"। মহিষ যদি বলে—"তুমি অন্যায় বল্‌ছ আমার পা একটু গোদা বটে—কিন্তু আমার পায়ে খোস্ ত নাই—গাল দেবে দাও, মিথ্যা কথা বলোনা"। শিশু বলিবে—"তোমার খোস হয়েছে কি না হয়েছে, আমি জানিনা—তুমি যখন মোষ, তখন অবশ্যই তোমার পায়ে খোস্ তোমার পায়ে খোস না থাকাটাই সত্য হলো—তোমার সঙ্গে খোসের যে এমন মিল হয়, সেটা বুঝি মিথ্যে হলো?—তুমি গোরু হলে নিশ্চয়ই ও কথা বল্‌তাম না।" হাতী কিছুই না বলিতে পারে—সে শিশুর কচি পায়ের লাথি পাইয়া ধন্য হইয়া বুঝিয়া লয়, 'মিলের লোভই শিশুকে এতটা সাহসী করিয়াছে'। তবে বাদুড় বলিতে পারে—"আমি যা খাই তা তেঁত না হয় হলো, কিন্তু খুকুমণি তোমার 'মেঁতো'-টা কি?" শিশু বলিবে "মেঁতো'-টা যে কি তা' আমি জানিনা—তবে ওটা খুবই দরকারী—ওটা ছাড়া আমি তোমার মিষ্টি মিষ্টি আম তাল নিচুকে কিছুতে যে তেঁতো করতে পারি না।" হনুমানকে শিশু যে সম্ভাষণ করিয়াছে—তাহাতে অক্ষরের মিলই আছে—বক্তব্য বিষয় গুলিতে আদৌ মিল নাই।—কলা খাওয়ার সঙ্গে—জগন্নাথ দেখিতে যাওয়ার—বিশেষতঃ মাইতো বৌএর বাবা হওয়ার কোন সম্বন্ধ বা অর্থ সঙ্গতি না থাকিলেও কপিবর শিশু কবিবরের কবিত্ব নীরবে উপভোগই করে।

এক ঢিলে দুই পাখী মারার কথা আছে—শিশু কিন্তু একমিলে একটিকে মারিয়াছে—

অন্যটিকে আদর করিয়াছে। "শঙ্খচিলের মাথায় ছাতি—গোদাচিলের মাথায় লাথি।" গোদাচিল যতই চীৎকার করুক—'মিল যখন ঠিক আছে, তখন শিশুর রায় বদ্‌লাইবে না।

সূয্যিমামা ও চাঁদামামা ছাড়া শিশুর যে মানুষ মামা আছে তার বাড়ী যাওয়ার জন্য শিশু তিনবার 'তাই' দিয়াছে—একবার 'তাই' এ মামার বাড়ীর সম্ভাবিত আদরের উল্লাস প্রকাশ পাইতে পারেনা। "মামার বাড়ী যাই"—তারপরই মামীর অনাদরের প্রতিফল স্বরূপ তাহার দুয়ার অপবিত্র করিয়া যাই। 'তাই'-এর এখানে দুইবার 'যাই' এর সঙ্গে মিল আছে। 'যাই' এর সঙ্গে 'যাই' এর আবার মিল কি? আমরা দোষ ধরিতে পারি। কিন্তু শিশুরও উত্তর আছে "এই দুই 'যাই'ত এক নহে—একবার সোল্লাসে মামার বাড়ী 'যাই'—তারপর ক্ষুণ্ণ হইয়া মামার বাড়ী হইতে নিজের বাড়ী 'যাই'—এই দুই যাওয়া ত এক নহে।"

শিশু, চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘ, বাদল, বৃষ্টি, ঝড় তরুলতা পশুপক্ষী,—এক কথায় প্রকৃতির সংসারের সকল পরিজনের সঙ্গেই সমিল প্রলাপে (?) আলাপ পরিচয় করিয়া থাকে—সে বচনে না আছে অর্থসঙ্গতি—না আছে ভাবসামঞ্জস্য না আছে সাহিত্যব্যাকরণের সম্বন্ধ। আছে কেবল মিলের ধ্বনিরই প্রাধান্য।

শিশু যে দিনান্তে মাতৃঅঙ্কে ঘুমাইয়া পড়ে তাহা বর্গীর ভয়ে নয়—জুজুর ভয়েও নয়—ন্যাজঝোলার ভয়েও নয়—মিলের মাধুরীই 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' তাহার নয়ন মুদাইয়া দেয়। শিশু খেলায় মাতে মিলের কৌতুকে, প্রথম পা ফেলিতে শেখে মিলের তালে তালে—নৃত্য করে মিলের করতালিতে। মিলই প্রথম তাহার হাতে খড়ি দিয়া বর্ণপরিচয় করায়। মিলের মাধুর্য্যেই মসীর বর্ণমালা তাহার কণ্ঠে স্বর্ণমালা হইয়া শোভা পায়।

ভাষার মিলনঝঙ্কারের প্রতি শিশুর অহেতুকী মমতা দেখিয়া মনে হয়—এই মাধুর্য্য-বোধশক্তি—সৌন্দর্য্য-বোধশক্তির ন্যায় মানুষের সহজাত—শিশুর অঙ্কুরিত চিত্তে উহা প্রচ্ছন্ন থাকে, উহা তাহার আত্মার অঙ্গীভূত। অনুশীলন করিলে বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ শক্তি বাড়িতে পারে—ক্রমে ছন্দোজ্ঞানে পরিণত হইয়া কবিত্বে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে। প্রত্যেক শিশুর অন্তরে মিলের প্রীতির অন্তরালে কবিত্ব শক্তি প্রসুপ্ত থাকে—অনুকূল অবস্থা ব্যবস্থা শিক্ষা দীক্ষা সুযোগ সুবিধা ঘটিলে কালে প্রবুদ্ধ হইতে পারে। মানুষ কণ্ঠস্বর লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বরের বৈচিত্র্য অনুভব করিতে শিখিয়াছে শ্রুতি-শক্তির ক্রম বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে বৈচিত্র্যের মাধুর্য্যও-উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য বোধের ফলে যখন তাহার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তখনি সে ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির মিলে অজ্ঞাতসারে আনন্দ অনুভব করিয়াছে। বর্ব্বরতা হইতে মানব সভ্যতার উদ্‌বর্ত্তনের সকল স্তরেই সঙ্গীত-মাধুর্য্য-বোধের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ ও মিলের প্রতি আজন্মসিদ্ধ প্রীতি দৃষ্ট হয়। ধ্বনির

সহিত অর্থের ধ্রুব সম্বন্ধ নির্ণয়ের আগে, বাগর্থের সংপৃক্তি-নির্দ্দেশের আগে, অক্ষর ও লিখন-পদ্ধতি আবিষ্কারের বহু আগেই মানুষ যেমন গান গাহিতে জানিত, ঝঙ্কারমাধুরী উপলব্ধি করিত, তেমনি ছন্দের মাধুর্য্যও বুঝিত—মিলের মাধুর্য্যও উপভোগ করিতে পারিত। আমরা যেমন করিয়া শব্দবিন্যাসে ছন্দ গঠন করি ঠিক তেমন করিয়া তাহারা ছন্দোগঠন করিতে পারিত না সত্য—কিন্তু পাখীর গানে, পশুর কণ্ঠস্বরে, নদীর কলধ্বনিতে, বাতাসের প্রবাহে, ভ্রমরাদির গুঞ্জনে, প্রকৃতি-রাজ্যের সহস্র ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে যে-সকল ছন্দ অনবরত ঝঙ্কৃত —সেগুলিকে তাহাদের কর্ণ অবশ্যই ধরিয়া ফেলিত এবং কেবল শ্রবণপুটে তাহারা মাধুর্য্যটুকু পান করিয়াই নিরস্ত হইত না-মাধুর্য্যটুকু বার বার লাভ করিবার জন্য অর্থহীন ভাষায় তাহার মুহুর্ম্মুহুঃ অনুকরণও করিত। শিশু যেমন কোকিলের কুহুধ্বনি শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে তাহার অনুকরণ করে—অসভ্য মানুষ তেমনি প্রকৃতির সকল ছন্দই উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিত। আবার কথা কহিতে কহিতে কতকগুলি ধ্বনির আকস্মিক মিলন যখন শ্রুতিমধুর হইয়া উঠিত তখন তাহারা সহসা-সংঘটিত সেই মিলনের মধ্যে অবশ্যই বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনুভব করিত। তখন তাহা অবশ্যই শ্রুতি হইতে স্মৃতিতে যাইয়া আসন লাভ করিত অথবা তাহারা সেই ধ্বনি-সমবায়কে উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া অমর করিয়া ফেলিত। শব্দের ও ধ্বনির ঐ আকস্মিক সমবায়ে শব্দে শব্দে যখন সহসা মিলিয়া যাইত—তখন তাহারা সে মিলনকে উপেক্ষা করিতে পারিত না, ধ্বনিতে ধ্বনিতে মিলে-যাওয়া সেই শব্দগুলিকে সুভাষিত ও সুদুর্ল্লভ মনে করিয়া মুখে মুখে বাঁচাইয়া রাখিত। এইভাবে নিরক্ষর অসভ্য মানুষের মধ্যে সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে একটা অলিখিত অপঠিত অমার্জ্জিত সহসারচিত অযত্নলব্ধ কাব্যসাহিত্য প্রধানতঃ মিলকেই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেগুলি চিরজীবনের সঙ্গী হইয়া অন্ধকারে জোনাকীর মত তাহাদিগকে যুগপৎ আনন্দ ও আলোক দান করিয়াছে। মানবাত্মার সহজাত মিলনতৃষ্ণা যেমন মানবজাতির কুলগোষ্ঠী সমাজরাষ্ট্রাদিগঠনে অভিব্যক্ত হইয়াছে—মানব-চিত্তের সহজাত শাব্দিক মিল প্রীতিই তেমনি ক্রমে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া মানব সভ্যতাকে এত ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছে। বারান্তরে মিল সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীকালিদাস রায়

"ভালোবাসা"

ভালোবাসি ?—মিথ্যাকথা !—কে বলিতে পারে বুক ঠুকি'—
দেহছাড়া প্রাণ নিয়ে অনুরাগে আমি চির-সুখী !—
ভণ্ডতার একশেষ—অর্থহীন প্রলাপ-বচন
ছল দিয়ে অনিবার বুঝায়েছে সদা ভীরু মন—
ভালোবাসি আমি ভালোবাসি ! কিযে ভালোবাসি,—
বোঝে কেহ কোন দিন ? স্বার্থে রচি' স্তোক-বাক্যরাশি
ভুলায়েছে আকুল অন্তর। এই নারী—যার পদতলে,
যুগে, যুগে, লক্ষবার বলি দিয়ে গেছে পলে পলে—
শত শত নর-শ্রেষ্ঠ, জীবনের সমস্ত গৌরব,—
লুটে গেছে— ধ্বসে গেছে, দেশ দেশ অনন্ত বৈভব !
একটী চুম্বন মাগি' জীবনের অক্লান্ত সাধনা,
স্বাধীনতা, অর্থ, বিত্ত মানবের ধর্ম্ম, আরাধনা ;
দিয়েছে নিঃশেষে ডালি—করো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তার—
কি পাইবে ?—আত্মতৃপ্তি ? ক্ষণিকের দেহ-সুখ ভার ?
তবু বলো—ভালোবাসি ? মিথ্যাকথা বৃথা প্রবঞ্চন—
নর নাহি নারী চায়—শুধু চায় নারীর যৌবন !
'প্রিয়তম' 'প্রাণনাথ' 'প্রাণ-প্রিয়'—পঙ্গু কথা রাশি—
শুনে চিত্ত জ্বলে মোর। ভালোবাসি ওগো ভালোবাসি,
মানবের চিরন্তন দুর্ব্বলতা, কত ভান ছল,
পঙ্গু করে, রুদ্ধ করে, জীবনের যাত্রা অচঞ্চল !
দূর করো—দূর করো বৃথা এই মত্ত হাহুতাশ
আধ আধ মধুবাণী—প্রণয়ের প্রমত্ত উচ্ছ্বাস।

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

তৃপ্তি

(১)

শিশির বাবুর বাড়ীর অবস্থা ভাল। কিন্তু তবু তিনি ডেপুটিগিরী করেন। পাড়াগাঁয়ে বিষয় কর্ম্ম লইয়া পড়িয়া থাকা তাঁর ধাতে সয় না। তা ছাড়া তিনি আদ্যোপান্ত কাজের লোক। কাজ না থাকিলে তাঁর প্রাণটা হাঁপাইয়া ওঠে। পাড়াগাঁয়ের জীবনের পরিপক্ক আলস্য তাঁর অসহ্য। ডেপুটী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া নানারকম সমাজের হিত চেষ্টায় তাঁর পরম আনন্দ। তাই তিনি পুরাপুরি বিশ বৎসর অক্লান্ত ভাবে ডেপুটিগিরী করিতেছেন। তাঁর মত কর্ম্মপটু সাহসী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ডেপুটি দুর্লভ। বলা বাহুল্য, তাঁর সাহসের প্রধান আশ্রয় তাঁর ধনবল। চাকরী ইস্তাফা দিতে হইলে বা বরখাস্ত হইলে তাঁকে ভাতে মরিতে হইবে না, একথা তিনিও জানিতেন, এবং আর সকলেও জানিত। তাই তিনি লাটসাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া কালেক্টার সাহেব পর্য্যন্ত সকলের সহিত পরম সৌজন্যের সহিত ব্যবহার করিলেও, মাথা খাড়া করিয়া আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেন। ভাল অফিসার বলিয়া তাঁর সরকারে প্রতিপত্তি ছিল, আর যেখানেই যাইতেন সেখানেই দেশশুদ্ধ লোক তাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত।

তাই যখন দুইদিনের জ্বরে হঠাৎ তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হইল, তখন চুঁচুড়ার সহর শুদ্ধ লোক হাহাকার করিয়া উঠিল। শিশির বাবুর যেমন প্রতিপত্তি ছিল পুরুষ মহলে, তাঁর স্ত্রীর বুঝি তার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি ছিল মেয়ে মহলে, আর গরীব দুঃখীর কাছে। গরীবের দুঃখে তিনি কেবল আহা উহু করিতেন না, তাদের ঘর বহিয়া নীরবে তাঁর সেবা পৌঁছাইতেন। আর এদিকে এমন মিশুক, এমন হাস্য রহস্যময়ী নারী চুঁচুড়ার সমাজের মধ্যে ছিল না। মেয়ে মজলিশ তাঁকে ছাড়া জমিত না। বাসর ঘরে তিনি না আসিলে হাসি ফুটিত না। আবার কারও শক্ত রোগ হইলে তাঁর হাসিমুখের সেবা না হইলে রোগ সারিত না।

এমন নারীর মৃত্যুতে সমস্ত সহর শুদ্ধ লোক যে কাঁদিয়া মরিবে সে আর বিচিত্র কি?

যখন বিদ্যুল্লতার সদ্যমৃত দেহ লালপেড়ে শাড়ী ও কপালে সিন্দূর মাখিয়া সহরের সারা পথ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিল, তখন প্রায় সহস্রলোক তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। রাজ্যের নারী তাঁর এগার বছরের ছেলে দিলীপকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাহাকার করিল। জানালায় জানালায় মেয়েদের ভিড় হইয়া গেল। সকলে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "কি ভাগ্যবতী!"

বাস্তবিক বিদ্যুৎ বড় ভাগ্যবতী। তার বিবাহের পর হইতে সে একদিনের তরে দুঃখের মুখ দেখে নাই। সুধু একবার তার কাঁদিতে হইয়াছিল—যখন তার স্নেহময়ী শাশুড়ী ঠাকুরাণী

তাকে সংসারের ভার দিয়া চিরদিনের তরে হাসিমুখে চক্ষু মুদিলেন। যেদিন বিদ্যুতের বিবাহ হইয়াছে, সেদিন হইতে তার স্বামীর সব দিক দিয়া শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তার একটি মাত্র ছেলে দিলীপ। সে দেখিতে রাজপুত্রের মত। বুদ্ধি শুদ্ধি স্বভাব চরিত্র সুন্দর, আর লেখাপড়ায় সে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। স্বামীপুত্রের এমন সৌভাগ্য দেখিতে দেখিতে ভাগ্যবতী বিদ্যুৎ, মাত্র দুইদিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তার মত ভাগ্য কার?

কিন্তু শিশির ইহাতে একদম ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিশ বৎসর হইল তার বিবাহ হইয়াছে, এ বিশ বৎসর এই পরম স্নেহময়ী নারীর প্রীতি সেবা হাস্য তাকে চারিদিক দিয়া এমন করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, তাকে এমন নিবিড়ভাবে জড়াইয়া রাখিয়াছিল যে হঠাৎ এমনি ভাবে তার সে স্নেহবন্ধন ভাঙ্গিয়া পড়িতে সে চারিদিক দিয়া জীবন শূন্য বোধ করিল। তার সকল কাজে বিদ্যুতের হাত ছিল, আফিসের কাজে পর্য্যন্ত সে ছিল তাঁর মন্ত্রদাত্রী, কাজেই সব কাজ করিতে করিতে তার ভয়ানক ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইল। তার মনে হইল যে চারিদিক দিয়া তার সকল আশ্রয় যেন ধপ করিয়া ধসিয়া পড়িয়াছে।

দিলীপ হইল এখন হইতে শিশির বাবুর প্রধান কার্য্য। আফিসের সকল কাজ অবহেলা করিয়া সে দিন রাত আপনাকে ছেলের সেবা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিল। দিলীপ যাতে মায়ের অভাব বুঝিতে না পারে, সকল দিক দিয়া তার জীবন যাতে পরিপূর্ণ ও সার্থক হয় সেইজন্য শিশির বাবু উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

কিছুদিন দিলীপ মাকে হারাইয়া একটু উন্মনা হইল। কিন্তু এমনভাবে তার বেশীদিন রহিল না। এগার বছরের ছেলের মনে অভাবের ছাপ কখনও বেশীদিন থাকে না। তাই দু দিন না যাইতেই সে পূর্ব্ববৎ হাসি খেলা করিতে লাগিল। তা'ছাড়া দিলীপ বরাবরই মায়ের চেয়ে বাপকেই বেশী ভাল বাসিত। পিতার সরকারী কাজকর্ম্মে এত বেশী ব্যাপৃত থাকিতে৹ হইত যে দিলীপ তাঁহাকে পাইত বড় কম। আর যাও পাইত তাতেও আবার মা আসিয়া ভাগ বসাইতেন। তাই মা থাকিতে সে বাপকে কোনও দিনই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাছে পাইত না। এখন সে তাঁকে ষোলআনা রকমে দখল করিতে পারিয়া বরং বেশ একটু উৎফুল্ল বোধ করিল। মায়ের অভাবের ক্ষতিটা এ লাভে তার পোষাইয়া গেল।

কিছুদিন পর শিশির তার এক বিধবা ভগ্নীকে বাড়ীতে আনিল। তাঁর সঙ্গে আসিল আর একটি পোষ্য—তাঁর পুত্র রমেন।

পিসিমার নাম উমা—শিশিরের খুড়তুতো ভগ্নী। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইয়াছিল, শিশিরের তিন চার বছরের ছোট। দেখিতে শুনিতে ভাল নয় বলিয়া তার বিবাহটা তত সুবিধার হইয়াছিল না। কিন্তু শিশিরের পিতা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন উমার টাকা পয়সার অভাব ছিল না। শিশিরও চিরদিনই উমাকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু উমা বড় দুর্ভাগিনী। তার চারটি ছেলে শিশিরের সাহায্যে লেখাপড়া করিয়া মানুষ হইবার মত হইতেছিল, কিন্তু এক বছরের মধ্যে তিনটি ছেলে মারা গেল। অবশিষ্ট রহিল রমেন। তারপর তার স্বামী মারা গেল। সে আজ দুই বৎসরের কথা। রমেনের বয়স তখন তের বছর।

উমা গোড়ায় মেয়েটি মন্দ ছিল না। কিন্তু দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর অশিক্ষিত সঙ্কীর্ণচেতা স্বামীর সঙ্গে বাস করিয়া এবং দারিদ্র্যের কষ্টের ভিতর কাটাইয়া তার সুখলোলুপ হৃদয় অনেকটা সঙ্কীর্ণ ও পরশ্রীকাতর হইয়া উঠিয়াছিল। তার সব চেয়ে বেশী হিংসা ছিল বিদ্যুতের উপর। শিশির উমাকে যত যা দিত, কিছুতেই তার মন উঠিত না। তার মনে হইত দাদা বৌদিদিকে যেমন জিনিষ দেয়, বৌদিদিকে যেমন সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখে তার ভাগ্যে তেমন হয় না। এজন্য যে দায়ী তার বৌদিদি সে বিষয়ে উমার এক ফোঁটাও সন্দেহ ছিল না।

তারপর ছেলেগুলি ও স্বামী মারা যাওয়ার পর তার মনটা যেন কেমন বিকৃত হইয়া গেল। সে ভয়ানক খিট্‌খিটে হিংসুক ও ঝগড়াটে হইয়া উঠিল। সে বিধবা হইলে শিশির তাকে নিজের কাছে আনিয়াছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে সংসারে এত অশান্তির সৃষ্টি করিল যে শিশির বাধ্য হইয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিল। তারপর দুই বৎসর সে দেশে ছিল। আর এই অপমানের জন্য সে বিদ্যুতের উপর অসহ্য বিদ্বেষ পোষণ করিতেছিল।

যখন বিদ্যুৎ মারা গেল তখন কিছুদিন সংসার করিয়াই শিশির বুঝিল যে একর্ম্ম বেটাছেলের নয়—বিশেষ করিয়া তাঁর মত বেটাছেলের। বিদ্যুৎ এ কুড়ি বৎসর তাঁর সংসার এমন সৌষ্ঠবের সহিত চালাইয়া সংসারের সকল চিন্তা হইতে তাঁকে এত পরিপূর্ণরূপে মুক্তি দিয়াছিল যে সংসার চালাইবার শক্তি শিশিরের যাহা ছিল তাহাও নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই ছয়মাস কাল বিদ্যুৎশূন্য সংসার পরিচালন করিয়াই শিশির ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল।

অনেক ভাবিয়া শেষে সে উমাকেই আবার সংসারে আনা স্থির করিল। সে আসিলে সংসারটা নির্ঝঞ্ঝাটে চলিবে, আর উমা দিলীপকেও দেখাশুনা করিতে পারিবে। তা ছাড়া রমেন আসিলে দিলীপের একজন সঙ্গী জুটিবে। তাতে সে থাকিবে ভাল। তাই উমা আসিয়া সংসারে অধিষ্ঠিত হইলেন।

এবার উমার চেহারা ফিরিয়া গেল। এখন বৌদিদি নাই, কাজেই হিংসার প্রধান হেতু নাই। দাদা সংসারের সমস্ত ভার তার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কাজেই সে যা ইচ্ছা তাই করিতে পারে। সুতরাং তার মেজাজ অনেকটা নরম হইয়া গেল।

উমার এ সংসারে এখন বেশ চলিতেছিল, কেবল গোল লাগিল বাড়ীর পুরাতন ঝি মালতীকে লইয়া। মালতী দিলীপ জন্মাইবার দুই বছর আগে হইতে বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে

ছিল এবং দিলীপকে মানুষ করিতে তার বাপমা'র যত্নের চাইতে তার যত্ন ও চেষ্টা কম ছিল না। বিদ্যুৎ মারা যাইবার পর হইতে সে-ই খোকাবাবুর খাওয়া দাওয়াটা দেখিত। উমা আসিয়া যেদিন দুধের পুরু সরটি তুলিয়া নিজের ছেলেকে খাওয়াইল এবং তার তলার দুধটুকু দিলীপকে আদর করিয়া খাইতে দিল, সেদিন মালতী গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, পিসীমা তুমি একি ক'রলে ?"

তারপর যেদিন মালতী দেখিল যে দিলীপের জন্য দুখানা কাঁটার মাছ পড়িল এবং মুড়াটা পেটিটা খাইয়া রমেন স্কুলে গেল, সেদিন সে উমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া ঠাকুরকে খুব খানিকটা ধমকাইল।

এই রকম ব্যাপারে উমা একটু থমকিয়া গেল, কিন্তু একেবারে ভড়কাইল না। এখন হইতে সে রমেনকে খাওয়ান বিষয়ে একটু সাবধান হইল—অর্থাৎ তাহার জন্য ভাল ভাল জিনিষ তাকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া খাওয়াইত। কিন্তু ইহাতেও সে মালতীর হাত হইতে নিস্তার পাইল না। মালতী একদিন শেষে অত্যন্ত শান্তভাবে উমাকে বুঝাইল, "হাঁ দেখ, পিসিমা, এমন ধারা কেন কর বল দিকিনি। ওই দুধের বাছা, মা-মরা, ওর পেট শুকোও কেন ? তোমার ছেলেকে যা' খাওয়াতে মন চায় খাওয়াও না, বাবু তো আর তা বারণ ক'রতে আসেন না। তার জন্য খোকাকে বঞ্চিত ক'রে কি দরকার ?"

উমা এ শান্ত উপদেশ হজম করিতে পারিল না। সে খুব কড়া কড়া কথায় ছোট লোকের বেটীকে মুখ সামলাইয়া কথা কইতে বলিল এবং প্রকাশ করিল যে দিলীপ তার ভ্রাতুষ্পুত্র, তার চেয়ে একটা মাইনা করা ঝি হইয়া যেন সে বেশী দরদ দেখাইতে না আসে—মার চেয়ে মাসীর দরদ—ইত্যাদি।

শ্রীমতী মালতী দাসী ইহার উত্তরে বিরাশী সিক্কার ওজনে শক্ত শক্ত কথা বলিয়া গেল এবং ক্রমে উমাকে সাশ্রু নয়নে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইল।

যখন শিশির বাবু আফিস হইতে ফিরিলেন তখন উমার রাগের আবেগটা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। রাগের প্রথম ঝোঁকটায় সে স্থির করিয়াছিল যে দাদা আসিলেই সে মালতীর নামে তাঁর কাছে লাগাইবে এবং তাকে বিদায় করিতে বলিবে। কিন্তু এখন সে বুঝিল এরূপ করিলে মালতীও ছাড়িয়া কথা কহিবে না। তাহা হইলেই হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গা হইবে। এবং তার মনে হইল যে উপস্থিত ক্ষেত্রে দাদা মালতীর কথাটাই হয়তো বিশ্বাস করিবেন। সুতরাং সে আপাততঃ চাপিয়া গেল। এবং সম্প্রতি খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে মালতীর উপদেশই অনুসরণ করিল!

কিন্তু মালতীর মাথাটা যে চিবাইয়া খাইতে হইবে সে বিষয়ে তার সঙ্কল্পের কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। এই ব্যাপারের দশ পনের দিন পর সে শিশিরের কাছে কথা পাড়িল

যে এতগুলো চাকর বাকরের মধ্যে আবার একটা ঝি রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। শিশির হাসিমুখে বলিল, "না ও থাক, দিলীপকে ও মানুষ ক'রেছে।"

উমা বলিল, "কিন্তু ও যে চোর। আমি এত চোখ রাখি, তবু ও যে কোথা থেকে কেমন ক'রে সব জিনিষ সরায় বুঝতে পারি না।"

এ কথায়ও শিশির বাবু টলিল না দেখিয়া উমা আপাততঃ কথাটা স্থগিত রাখিল।

সে স্থির করিল এ পথে চলিলে হইবে না। মালতীকে দূর করিতে হইলে প্রথমে দিলীপকে হাত করা চাই এবং তার মনটা মালতীর উপর চটাইয়া দিয়া তার মারফতে শিশিরের কাছে মালতীকে বরখাস্ত করিবার আবেদন পেশ করিতে হইবে। তা ছাড়া মালতীর পেঁটরার ভিতর চোরাই মাল ঢুকাইয়া তাহাকে ধরাইয়া দিতে হইবে।

এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে কিছুদিন সময় লাগিবার কথা। দিলীপকে পটানো বড় সোজা কথা নয়। সে একটা ভয়ানক দুরন্ত ছেলে;—ঘরে থাকে কম, পড়াশুনার সময় ছাড়া দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া বেড়ানই তার স্বভাব। সুতরাং তাকে বাগানো বড় সহজ নয়। সে নানা রকম করিয়া দিলীপকে অপরিসীম স্নেহ দেখাইয়া তাহাকে কাছে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দিলীপের মন সহসা তাহাতে গলিল না। উমা তাকে ছোট ছেলের মত আদর সোহাগ করিতে যাইত, তাকে চুমা খাইবার চেষ্টা করিত—তাতে দিলীপ বিরক্ত হইয়া ছুটিয়া পলাইত। এরকম আহ্লাদ নেওয়া কোনও দিনই তার ভাল লাগিত না; বিশেষ বারো বছর বয়সে যে তাকে কেউ চুমা খাইবে এ তাহার অসহ্য ছিল।

কিন্তু উমা তাহাকে চারিদিক দিয়া বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এবং অনেক গবেষণার ফলে দিলাপের মনোদুর্গের একটা গোপন চাবী আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

দিলীপ সাধারণতঃ গল্প শুনিতে ভাল বাসিত। উমা খুব ভাল গল্প করিতে জানিত না, তার পুঁজিও সামান্য ছিল। তাই সে একদিন তার দাদার ছেলে বয়সের কথা গল্প করিতে লাগিল। সে দেখিয়া আনন্দিত হইল যে এ বিষয়ে দিলীপের কৌতূহল ও আগ্রহের অন্ত নাই।

এই সূত্র ধরিয়া পিসীমার সঙ্গে দিলীপের আত্মীয়তার সূত্রপাত হইল। সে দিনের পর দিন বসিয়া পিসিমার কাছে তার বাপের ছেলেবেলার কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া শুনিতে লাগিল। এক একটা কথা দশবার কুড়িবার শুনিয়াও তার আশ মিটিত না। সে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিত। এ কথার আলোচনায় তার যে আনন্দ তার তুলনা ছিল না।

এই সূত্র ধরিয়া উমা সাবধানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং আনন্দের সহিত দেখিল যে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিতভাবে দিলীপ তার হাতের মুঠার ভিতর আসিয়া পড়িতেছে।

তারপর সে একটু একটু করিয়া দিলীপের মনে মালতীর উপর বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। এ কাজটা অপেক্ষাকৃত কঠিন বলিয়া মনে হইল। তবু উমা একেবারে নির্ভরসা হইল না। দেড় বছর কাটিয়া গেল, উমা তবু তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না।

যখন সে মনে করিল যে সফলতা তার প্রায় করায়ত্ত সেইসময় এক ফুৎকারে তার সব সঙ্কল্প ওলট পালট হইয়া গেল।

(২)

শিশিরের এক বন্ধু ছিল হাইকোর্টের উকীল। শিশির তার বাড়ীতে প্রায় যাইত। প্রায়ই শনি রবিবারে হয় সে কলিকাতায় যাইত না হয় তার বন্ধু বিনোদবাবু হুগলী আসিতেন। দিলীপ প্রায়ই সঙ্গে থাকিত, উমা আসিবার পর দিলীপ বেশী থাকিত না। বিনোদের বাড়ীতেই শিশিরের একদিন হঠাৎ তার মিনতির সঙ্গে দেখা হয়। মিনতি বিনোদের ছোট শালী।

মিনতির রঙ ফরসা নয়, বেশ ময়লা। তার মুখখানিও এমন কিছু ভয়ানক প্রশংসা করিবার মত নয়—কিন্তু তার চোখ তুটি ছিল আশ্চর্য্য। অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ কমনীয়তাময় সে চক্ষু—অথচ উজ্জ্বল তীব্র, প্রতিভাময়।

যখন শিশির হঠাৎ বিনোদের বসিবার ঘরে গিয়া ঢুকিল তখন সে দেখিতে পাইল একটি মেয়ে বিনোদের পাশে বসিয়া Tennyson এর In Memoriamএর একটা অংশ বুঝিতেছে। সে ঘরে ঢুকিতেই মিনতি একটু লজ্জিত হইয়া চোখ তুটি নত করিল, কিন্তু খুব ভয়ানক এমন কিছু জড়সড় হইয়া গেল না। লজ্জিত হইয়া শিশির পিছাইয়া গেল।

বিনোদ ডাকিল, "আরে এসো ভায়া এসো, এ কিছু বাঘ সিংহ নয়—এ কেবলমাত্র শালী—অর্থাৎ আমার। এঁর নাম মিনতি—বাপ মায়ের নাম রাখবার সাধারণ ভুলের একটা সামান্য পরিচয়। কেননা মিনতি করা এঁর স্বভাবই নয়, ইনি করেন হুকুম। আর সে হুকুম জজসাহেবদের হুকুমের চেয়ে অনেক কড়া। সেই কড়া হুকুমের চোটে আজ আমার ভারী ভারী ব্রিফ ফেলে এঁকে In Memoriam বুঝাতে ব'সেছি।"

মিনতি একটু হাসিয়া বলিল, "এখন তবে থাক।"

শিশির বলিল, "মাপ ক'রবেন। আমি আপনার কাজে বিঘ্ন হ'তে চাই না। আমি অনেকক্ষণ থাকবো। আপনি আপনার কাজ সেরে নিন। নইলে আমাকে অপরাধী ক'রবেন।"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "তোমার কি বাহাত্তুরে ধ'রেছে নাকি হে। এইটুকু মেয়েকে আপনি বলতে ব'সেছ—আর সে হ'চ্ছে গিয়ে আমার শালী—তোমার বোনের ধাক্কা।"

"চুপ বেয়াদব।" বলিয়া শিশির বিনোদের পিঠে একটা চড় লাগাইয়া দিল। "এখন

তুমি তোমার চাকরী ক'রবে নাকি কর," বলিয়া ঘরের অপর কোণে গিয়া শিশির একখানা ইজি চেয়ারের উপর বসিয়া কাগজ পড়িতে লাগিল।

মিনতি অনিন্দ্য উচ্চারণের সহিত তার কোমল মধুর কণ্ঠে পড়িয়া গেল,

This truth came borne with bier and pall
I knew it when I sorrowed most,
It is better to have loved and lost
Than never to have loved at all.

বিনোদের ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল, সে এই চারটি লাইনের ব্যাখ্যা করিয়া আর দুদশটী কবির দুচারটে বাক্য উদ্ধার করিয়া এ পদের অর্থ ও মাধুর্য্য প্রকট করিয়া গেল।

মিনতি বলিল, "বুঝতে পারলাম না মুখুজ্জে মশায়, ভালবেসে হারালে কষ্ট হয়, না-ভালবাসলে কষ্টটা হয় না। তবে ভালবেসে হারানটা, না ভালবাসার চেয়ে ভাল কেমন ক'রে হ'ল?"

"কবির তাৎপর্য্য হ'চ্ছে এই যে ভালবাসাটাই চিত্তের পক্ষে একটা মস্ত লাভ, আত্মার একটা মস্ত অভ্যুদয়। তার সঙ্গে পাওয়া না পাওয়ার যেমন কোনও সম্বন্ধ নেই, তেমনি সে লাভের হিসাবে, ভালবাসার জিনিষকে হারাণ না হারাণ'র, কোনও সম্বন্ধ নেই। ভালবাসাটাই লাভ—সেইটাই একটা জীবনের গৌরব। সেই গৌরবের আনন্দ তার সার্থকতা সেইটাই একটা মস্ত লাভ। যদি ভালবাসার বস্তু থাকে সেটা মস্ত আনন্দ, মস্ত লাভ। তাকে হারাণ একটা মস্ত লোকসান কিন্তু হারালেও প্রাণের যে অভ্যুদয়ের আনন্দ সেটা থেকে যায়।"

মিনতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা আমার বোধ হ'চ্ছে কবির এভাবের সঙ্গে তাঁর আর একটা ভাবের একটু সম্পর্ক আছে।

One crowded hour of glorious life
Is worth an age without a uame.

কিম্বা

Better an hour of Europe, than a cycle of Cathay

ভালবাসা যে কটা দিন পাওয়া যায় সেই কটা দিন গৌরবের দিন—সেই কটা গৌরবের দিনের জন্য লোকসানটাও তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। তাই নয় কি?"

সমস্তগুলি কথা শিশির সমস্ত চক্ষু কর্ণ দিয়া গিলিতেছিল।

"It is better to have loved and lost
Than never to have loved at all."

এই নিদারুণ সত্য যে তার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ফল। বিদ্যুৎকে হারাইয়া তারও মনে অনেকদিন এমনি কথাই জাগিয়া উঠিয়াছে। কতদিন সে ভাবিয়াছে যদি সে কোনও দিন বিদ্যুৎকে না পাইত, যদি কোনও দিন ভাল না বাসিত! অমনি মনটা আঁৎকাইয়া উঠিত। সেটা এত বড় সর্ব্বনাশ হইত—এত বড় নিদারুণ ক্ষতি, জীবনের এমন একটা শূন্য নিরর্থকথা—যে তার চিন্তাতেও তার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। তখন বার বার টেনিসনের এই দুইটী লাইন তার মনে উঠিয়াছে। অনেকবার সে মনে মনে এই কথা আবৃত্তি করিয়াছে।

কিন্তু এ দুটি লাইনের মিনতির মুখে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শুনিয়া তার একটা সম্পূর্ণ নূতন রকমের অনুভূতি হইল। এ দুইটি চরণের ভিতর যে এত অপরূপ রস আছে সেটা কোনও দিনই শিশির উপলব্ধি করে নাই। ছাপায় গান পড়িয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, সুকণ্ঠে গীত হইলে তার মাধুর্য্য শতগুণ বৰ্দ্ধিত হয়। তেমনি কবিতারও ভালরূপে আবৃত্তি হইলে তার রস-সমৃদ্ধি বিকশিত হইয়া উঠে। একথা চিরপরিচিত। কিন্তু সেই পুরাতন সত্যটা শিশির আজ এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করিল যে পূর্ব্বে সে কখনও ইহা সত্য সত্য আয়ত্ত করিয়াছে বলিয়া তার এখন মনে হইল না। মিনতির অপূর্ব্ব মাধুরীমাখা কণ্ঠের প্রত্যেকটি সুর গিয়া যেন তার অন্তরের কোমলতম পরদায় আঘাত করিল এবং সমস্ত অন্তর একটা অপরূপ রসানুভূতিতে ভরিয়া দিল।

তারপর সে অবাক হইল মিনতির ব্যাখ্যায়। এ মেয়েটি যে শুধু কলেজের পড়া তৈয়ার করিবার জন্য কবিতা পড়ে না, তার রস অন্তর দিয়া গ্রহণ করে ইহা দেখিয়া শিশির ভারি তৃপ্তি অনুভব করিল। আর সে রসানুভূতি যে কত গভীর, তার উপর যে কেমন একটা তাজা মনের ছাপ আছে, তা ভাবিয়া সে মুগ্ধ হইল। আর সেই অনুভূতির ব্যাখ্যান তার সুললিত কণ্ঠে যেন সহস্রগুণ মধুময় হইয়া ফুটিয়া উঠিল। বিস্ময় শ্রদ্ধা ও পুলকে শিশিরের অন্তর ভরিয়া গেল। সে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া একদৃষ্টে মিনতির একাগ্র তন্ময় মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তার মনের ভিতর এমন একটা অপূর্ব্ব আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল যে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা বা অবসর রহিল না।

বিনোদ বলিল, "হাঁ, ও রকম করেও নিতে পার কথাটা Love life জিনিষটারই একটা সার্থকতা একটা গৌরব আছে—সেটা সফল হউক বা নিষ্ফল হউক, এইটাই কবির প্রতিপাদ্য।"

মিনতির দৃষ্টি বই হইতে সরিয়া যেন কোন সুদূর শূন্যে নিবদ্ধ হইয়া গেল। সে কতকটা আবিষ্ট হইয়া বলিল, "শুধু Love life নয়, জীবনের প্রত্যেক সার্থক অনুভূতি সম্বন্ধেই বোধ

হয় একথা সত্য। ভালবাসা বলুন, ধর্ম্মানুভূতি বলুন, দেশাত্মবোধ বলুন, সৌন্দর্য্যবোধ বলুন, সবগুলি অনুভূতিরই এমন এক একটা মহামুহূর্ত্ত আসে যখন মনে হয় যে তারই ভিতর সমস্ত জীবনের সব দিনের চেয়ে বড় একটা অনুভূতি, একটা নিবিড়তর গভীরতর জীবন যেন হঠাৎ বিরাট হ'য়ে প্রকাশ হয়—তখন মনে হয় যে আমাদের রোজকার জীবন যেন একটা mere existence. বোধ হয় একথা সত্য যে We live in moments and not in the days and years.

"বাঃ। Beautiful thought. যাও এখন তোমার এই অনুভূতিটা তাজা থাকতে থাকতে একটা কবিতা লিখে ফেল গে।"

"কিন্তু Wordsworth এর এই লাইন কটা"—

"এখন নয়। এখনকার মত এই একটা মহামুহূর্ত্তই যথেষ্ট"—

"না আমার বোধ হ'চ্ছে, এখন ওর মানে আমি বুঝেছি—

The light that never was on sea or land
The consecration and the poet's dream.

এর মানে হ'চ্ছে বোধ হয় এই যে আমরা যেটা প্রত্যক্ষ করি সেটার মূল্যের চেয়ে তার ভিতর আমরা যে অর্থ ও সৌন্দর্য্য ভরে' দিই সেইটাই হ'ল বড়। Love life জিনিষটার ভিতর বাস্তব প্রেম সম্বন্ধের উপর যেমন একটা consecration and the poet's dream যোগ ক'রে দিয়ে আমরা তাকে গৌরবময় ক'রে দিই। সব জায়গায়ই বোধ হয় তাই। রূপ গৌরব প্রভৃতি জগৎ থেকে আমরা যা পাই তার চেয়ে তার ভিতর আমরা যেটা আমাদের অন্তর থেকে দিই সেইটাই বড় জিনিষ, তার ভিতরই তার সার্থকতা।"

"বস্. তবে আর তুই আমার কাছে কবিতার মানে জিজ্ঞাসা ক'রতে আসিস কেন বল দিকিনি? তুই জন্মেছিস্ কবি হ'য়ে, আর, 'কবিতা রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি'। ফের যদি তুই আমার কাছে কবিতা বুঝতে আসবি তো ঠেঙ্গাবো। কাণ্ট বা হেগেল বুঝতে হয়, তো আসিস।"

"না মুখুজ্জে মশায় আপনার কাছে না এলে এসব কথা আমার মনে আসে না। আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রতে ক'রতে যেন আমার মনের অনেকগুলো দুয়ার খুলে যায়।"

"বন্ধ কর, বন্ধ কর। যার তার কাছে অমন হৃদয়ের দুয়ার খুলে যাওয়া ভাল নয়। তোর দিদি শুনলে হয়তো খেঙড়া হাতে ক'রে আসবে।"

"যান, আপনি কি যে বলেন তার ঠিকানা নেই।"

লজ্জায় মিনতির মুখখানা অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল। এতক্ষণে তার মনে হইল যে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক ঘরে বসিয়া আছেন। তাই সে আরও বেশী লজ্জিত হইয়া পড়িল

এবং সে শিশিরের দিকে একবার অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল শিশির একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সে চাহিতেই শিশির চক্ষু নত করিল। দেখিয়া মিনতি একেবারে রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বই গুটাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিনোদ বলিল, "না মিথ্যে বলিনি ভাই—তোর দিদি বড় হিংসুটে—তোর হৃদয় দুয়ার আমার কাছে এলে অত চট্ পট্ খুলে যায় শুনলে হয়তো এ বাড়ীর দুয়ার তোর কাছে একদম বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে এখন তোর খিলটিল গুলো বেঁশ ক'রে এঁটে রাখ। যার জন্যে খোলা দুয়োরের দরকার হ'বে সে এলে সবগুলো দোর জানালা আলগা ক'রে দিস।"

"যান্ আপনি ভারি দুষ্টুমী করেন।" বলিয়া মিনতি অপূর্ব্ব লীলাছন্দ রচনা করিয়া ছুটিয়া পলাইল।

বিনোদ গিয়া শিশিরের কাছে একখানা চেয়ার লইয়া বসিল।

শিশির বলিল, "তোমার এই শালীটি কি পড়েন বিনোদ?"

"দেখ, তুমি অমন শালী শালী ব'লো না, হয় তো মিনতি চ'টে যাবে। আমি লক্ষ্য ক'রেছি আমার সঙ্গে এই সম্পর্কটায় সে খুব বেশী গৌরব বোধ করে না।"

"তাই নাকি। যাক, উনি কি পড়েন?"

"উঁহু ওটাও চলবে না 'ও' এবং 'উনি' এই দুটি সর্ব্বনাম যে ওর সম্বন্ধে প্রয়োগ ক'রবে সে অবশ্যই একদিন আসবে, কিন্তু তাকে আমি অন্ততঃ প্রথম প্রথম খুব আনন্দের সঙ্গে অভিনন্দন ক'রবো না—আমারও এক আধটুকু হিংসে আছে।"

"এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও হিংসা ক'রে লাভ? পক্কে বিম্বে কাকস্য কিম্?"

"প্রথমতঃ আমার চুয়াল্লিশ এখনও পূর্ণ হয় নি সুতরাং আমি পঁয়তাল্লিশ নই। দ্বিতীয়তঃ কোনও বাবদেই আমি কাকের সঙ্গে তুলনীয় হ'তে পছন্দ করি না।"

"হার মানলুম ভাই। এখন বাজে বকা ছেড়ে আমার কথাটার জবাব দেবে কি?"

"কেন সেটা কি তোমার কাছে খুব কাজের কথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে নাকি? ঘটকালি ক'রবো? কিন্তু তাও বলি, তোমারও বয়স তো আমার কাছাকাছিই। বেলই যদি সে হয় তবে তুমিও তো কাক।"

"চুপ কর। যা' তা বকো' না। আমি সে কথা বলছি না। আমি ভাবছিলাম সে তোমার শালীটি একটি genius। এ বয়সের মেয়ের ভিতর কাব্যের এমন নিবিড় রসানুভূতি বা এমন গভীর চিন্তাশীলতা আমি কখনও দেখি নি।"

"এই রকম কথা আরও দু'চারজন বলে। কিন্তু ও সব কিছু নয়। স্ত্রীজাতির ভিতর বিশেষতঃ ওদের পরিবারে রসের ধাতটা কিছু প্রবল।"

"তাই নাকি ? তা'হলে তোমার গিন্নীরও রসের ভাণ্ডার খুব পূর্ণ।"

"হাঁ, তবে একটু ভিন্ন রকমে—তাঁর রস হাতে পায়ে বাত হ'য়ে ফুটে বেরিয়েছে।"

"দূর পাপিষ্ঠ! যা'ক তোমার স্ত্রীর এই ভগ্নীটি কিন্তু অসাধারণ! তুমি তাঁকে কবিতা লিখতে encourage ক'রো।"

"ওরে বাপরে! তা'হলে সর্ব্বনাশ হ'বে। বিনা উৎসাহে ও পাঁচখানা মোটা খাতা শেষ ক'রেছে। আমি যদি উৎসাহ দি, তাহলে ওর যে স্বামী হ'বে তার ছাপাখানার খরচ দিতে দেউলে' হ'তে হ'বে।"

"তাই নাকি ? আমাকে দিও তো ওঁর একখানা খাতা, আমার ভারি কৌতূহল হ'চ্ছে ওঁর কবিতা দেখতে।"

"সে কৌতূহল সহজেই পরিতৃপ্ত হ'তে পারে। কেননা ওর একখানা খাতা আমি জবর দখল ক'রে রেখেছি।" বলিয়া বিনোদ উঠিল।

শি। "কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার প্রথম কৌতূহলটা পরিতৃপ্ত ক'রবার একটা চেষ্টা ক'রে দেখতে পার।"

"কোনটা ? ও মনে হ'য়েছে। ও কি পড়ে ? ওর মতলব এই বারে বি, এ; দেবার। কলেজে ও যায় আসে। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে কলেজের মাষ্টাররা ওকে যা পড়ায় তার চেয়ে ও ঢের বেশী জানে।"

"এ সন্দেহ অমূলক ব'লে মনে হ'চ্ছে না। কিন্তু তোমার শ্বশুর তো দেখছি ভারি liberal. মেয়েকে এত লেখাপড়া শেখাচ্ছেন।"

"ওরে হতভাগ্য, সে কৃতিত্বটা যথাস্থানে আরোপ ক'রতে তোর এত কি কষ্ট ? আমার শ্বশুর ম'শায়ের এ বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি ছিল। কিন্তু আমি একরকম জোর ক'রে ওকে স্কুলে আটকে রেখেছিলাম। তারপর ওর বুদ্ধিসুদ্ধি দেখে আমার বড় শালাও উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো। শ্বশুর ম'শায় তারপর স্বর্গারোহণ ক'রলেন। এখন আর বাধা দেবার কেউ নেই। তা' ছাড়া আর একটা সুবিধা হ'য়েছে এই যে ওর বিয়ে হ'চ্ছে না। সম্বন্ধের জন্য শাশুড়ী ঠাকরুণ বাড়ীতে ঘটক ঘটকীর হাট বসিয়েছেন, কিন্তু বাঙ্গলার বর গোষ্ঠীর তাঁকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার কোনও তাড়া দেখা যায় না। যে দেখতে আসে সেই ওর রং দেখে মুখভার ক'রে মিষ্টি খেতে সুরু করে।"

"বাঙ্গালা দেশটা কি আগাগোড়াই এত অকাট মূর্খে ভরা।"

"এ সম্বন্ধে আমার একটা নিজস্ব মত আছে সেটা ঠিক তোমার সঙ্গে মেলে না। যারা ওকে না-পছন্দ ক'রছে তারা বুদ্ধিমান ব'লে আমার বিশ্বাস।"

"তোমার এ বিশ্বাসের জোরকে খুব বাহাদুরী দিতে হয়।"

"মোটেই না। লোকে বিয়ে করে ঘর সংসার করবার জন্য। একটা জ্যান্ত কবিতা নিয়ে মাছের ঝোল রান্না কিম্বা বাজার হিসেব লেখানো যেমন অসম্ভব, তেমনি বেহিসাবী অপচয়। কেন না, কবির চেয়ে পাকা রাঁধুনীর হাতের ঝোল ভাল হ'বে, এবং হিসাবের খাতায় কবিতার খসড়া না থাকলেই সেটা মানাবে ভাল। অথচ কবির পক্ষে মাছের ঝোল ও হিসাবের খাতাটা নিতান্তই শক্তির অপচয়।"

"Confounded materialist! যাক তোমার কাব্যের খাতা আমদানী কর।"

বিনোদ খাতাখানা আনিয়া কয়েকটা কবিতা পড়িয়া শুনাইল। তার পর শিশির সেটা তার কাছে ছিনাইয়া লইল। খাতাখানা খুব সুন্দর বাঁধান। তার রেসমের মোড়কের উপর সিল্ক দিয়া ফুলপাতার ভিতর নাম লেখা। আর ভিতরে মুক্তার মত সুন্দর হরপে লেখা কতকগুলি অপূর্ব্ব কবিতা। অনেকক্ষণ ধরিয়া শিশির সে কবিতাগুলি পড়িয়া গেল। যতই পড়িল ততই সে মুগ্ধ হইল।

অনেকক্ষণ পর খাতাখানা পাশে রাখিয়া শিশির বলিল, "আচ্ছা ভাই দিলীপের কি উপায় করি বল দেখি, তাকে আর বাড়ীতে রাখতে মন সরে না।"

"কেন বল দিকিনি?"

"কথাটা বড় রূঢ়, কিন্তু ব'লতেই হ'চ্ছে। বাড়ীর প্রভাবটা তার উপর ভাল হ'চ্ছে না। উমাতে আর ঝিতে মিলে তাকে নিয়ে যে রকম টানাটানি আরম্ভ ক'রেছে, তাতে তার পরকাল খোয়া যাচ্ছে। ওদের হাতে থাকলে ওর ভিতর পৌরুষ কোনও দিনই গড়ে উঠবে না।"

"তাদেরকে বিদেয় ক'রে ওর জন্য একটা ভাল মাষ্টার রেখে দেও। তার বয়স তো বছর বার তের হ'ল—এখন ওর পক্ষে মেয়ে ছেলের হাতে মানুষ হবার বয়েস নয়।"

"কিন্তু তাতে তার খাওয়া দাওয়ার ভয়ানক বেবন্দোবস্ত হয়। আমি কিছুদিন সংসার ক'রে দেখেছি, সে বড় সুবিধা হয় না।"

"বেশ তো, একটা ভাল দেখে সরকার রাখ, না হয় মাষ্টারটিকেই এমন রাখ যে ওর সব দিক দেখতে পারে।"

"সে লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন হ'বে। আমার মনে হ'চ্ছিল ওকে যদি বিলেতের মত কোনও public schoolএ পাঠাতে পারতাম তবে বোধ হয় ভাল হ'ত। আচ্ছা Hastings House স্কুলটা কেমন? তোমার কিছু জানা শোনা আছে?"

"না ভাই ও বড় মানুষের স্কুলের খবরাখবর বড় রাখি না। বাইরে থেকে যা শুনতে পাই সে বড় সুবিধা নয়। কিন্তু সে সব রিপোর্টের উপর আমার বড় আস্থা নেই। কেননা আমাদের দেশের পোনের আনা লোক শিক্ষা সম্বন্ধে খাঁটি up-to-date ideas মোটেই বুঝতে শেখেনি। যা কিছু নতুন তাই তাদের কাছে নিন্দনীয় হ'য়ে দাঁড়ায়।"

"আমি ভাবছি আজ একবার স্কুলটা দেখে আসি। চল না তুমিও চল।"

সেদিন বিনোদের সুবিধা হইল না। পরের দিন যাইবার সঙ্কল্প স্থির হইল।

তারপর শিশির আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার শালীটি কি—"

"Dash it আবার শালী! ও মিনতি দেখ ভাই এ ছোকরা তোকে অপমান ক'রছে। আমার কোনও দোষ নেই ভাই।"

"চুপ! তুমি একটা এক নম্বরের শয়তান। থাকগে, ওই মহিলাটি কি তোমার এই খানেই আজকাল থাকেন।"

"না, তিনি পিত্রালয়ে বাস করেন। তিনি আপাততঃ নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়ায় ক'য়েক দিনের জন্য আমার কুটীর ধন্য ক'রছেন। তার ভা'য়েরা দেশে গেছে। পরীক্ষা সন্নিকট ব'লে উনি দেশে যেতে নারাজ।"

"ওঃ" বলিয়া শিশির অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

শেষে চা পান করিয়া যখন শিশির উঠিল তখন রেসমে বাঁধান খাতাখানা সে হাতে করিয়া চলিল।

বিনোদ চীৎকার করিয়া উঠিল "একি! দিনে দুপুরে ডাকাতি! না বলিয়া পরদ্রব্য লইলে চুরী করা হয়।"

"সেওয়ায় পুস্তকাদি" বলিয়া শিশির খাতাখানা চাপিয়া বগলদাবা করিল। "কিন্তু ভয় পেয়ো না। আমি তোমার সাতরাজার ধন মাণিকখানা অপহরণ ক'রবো না। পড়ে' ফেরত দেবো।"

বাড়ী ফিরিবার পথে শিশির ট্রেণেই খাতাখানা আদ্যোপান্ত দুইবার পড়িয়া ফেলিল। কবিতাগুলি তাহাকে মুগ্ধ করিল। তার মনের ভিতর প্রত্যেক কবিতায় গভীর ভাবের ধারা সঞ্চারিত হইল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে রচয়িত্রীর কথা স্মরণ করিয়া অন্তরে তার অপূর্ব্ব পুলক সঞ্চারিত হইল।

হঠাৎ তার অনুভব হইল যে একথা ভাল নয়। মনে হইল সে মিনতির কথা যে ভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে সে বিদ্যুতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। বিদ্যুতের কথা মনে হইতেই তার মনটা কান্নায় ভরিয়া গেল। সে অত্যন্ত অনুতপ্ত করুণ চিত্তে বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়া দিলীপকে সে ডাকিয়া কাছে লইল এবং অনেকক্ষণ তাঁকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া অন্তর শান্ত করিল।

তারপর মনে হইল যে তের বছরের ছেলেকে লইয়া এমন ভাবটা করা তার ভিতর পুরুষত্বের সম্যক স্ফুরণের অনুকূল নয়। সে উমা ও মালতীর দোষ দিয়াছিল। কিন্তু এখন তার মনে হইল যে সে নিজেও ছেলেকে খুব ভাল শিক্ষা দিতেছে না।

দিলীপকে Hastings schoolএ পাঠান স্থির করিয়া সে পরের দিন কলিকাতা গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

সামাজিক বিরোধ

(জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে চিঠি খানি পাইয়াছি। ইহার ভিতর দুই একটী সাধারণের ভাবিবার কথা আছে মনে করিয়া প্রকাশ করিলাম—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

দাদা,—

খপরের কাগজে যা পড়ছি তাতে তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। সেই স্বদেশী হাঙ্গামার সময় মুসলমানেরা জামালপুরে মন্দির ভেঙ্গেছিল, তারপর বাংলা দেশে ত বড় একটা ও-সব ব্যাপার শুনিনি। হঠাৎ পুরান রোগ দেখা দিল কোথা থেকে? আমি তো অনেক দিন দেশ ছাড়া; ব্যাপারটা হয়ত ঠিক ধরতে পারছিনে; কিন্তু তোমার চিঠি থেকে মনে হয় যে মারওয়াড়ী আর হিন্দুস্থানীদের উপরই ওদের আক্রোশটা বেশী। মুসলমানী কাগজেও দেখতে পাচ্ছি, যত দোষ দিচ্ছে হিন্দু মহাসভা আর আর্য্যসমাজের উপর। মোট কথা পশ্চিমের ঝগড়া যে ক্রমশঃ বাংলার উপর গিয়ে গড়িয়ে পড়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই।

পাঞ্জাবে এ ঝগড়াটা অনেক পুরান,—শিখ গুরুদের সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে। হিন্দু মুসলমানের ঝগড়াটা যে কি জিনিস আর তার গোড়া কোথায়, তা' পঞ্জাবে না এলে ভাল করে বোঝা যায় না। মোগল পাঠান সকলকারই বেলা সামলাতে হয়েছে পাঞ্জাবকে। লাঠালাঠিটাও এখানে অনেক দিন ধরে চলেছে; সুতরাং শত্রুতাও বেশ পাকাপাকি রকমের হয়ে গেছে। পাঞ্জাবে বিদেশী মুসলমানদের বংশধরের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়; তাই এখানকার হিন্দুরা মুসলমানদের কতকটা বিদেশী শত্রুর বংশধর বলেই মনে করে, আর তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে প্রায় সেই রকম। এই বিজেতাদের জয় করবার চেষ্টাতেই শিখেদের সৃষ্টি। শিখেদের হাতে যখন রাজ্য আসে তখন এরা অতীত অত্যাচারের শোধ নিতে ছাড়ে নি। এখানকার মুসলমানদের সে কথা আজও বেশ মনে আছে। পাঞ্জাবে হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধটা অতীত ইতিহাসের জের।

শিখেরা যদি মুসলমানদের সকলকে শিখ করে নিতে পারতো, তা হলে ল্যাঠা চুকেই যেত, কিন্তু লাঠির জোরে বা culture-এর জোরে শিখেরা তা করতে পারে নি। শুধু culture-এর দিক থেকে দেখতে গেলে শিখ ধর্ম্মে আর মুসলমানধর্ম্মে খুব বেশী তফাৎ আছে বলে মনে হয় না। যাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তাদের দোষগুণ অনেকটা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে। হিন্দুয়ানিকে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে শিখধর্ম্মের রূপ নিতে হয়েছে; তাই শিখধর্ম্মের মধ্যে মুসলমানদের দোষগুণ সবই অল্পবিস্তর এসে পড়েছে। গ্রন্থ সাহেব আর

কোরাণ, গুরুদ্বার আর মসজিদ, গুরু আর পয়গম্বর—এসব আসলে প্রায় একই জিনিস ; তবে শিখেদের জিনিষ গুলো হচ্চে এদেশী, আর মুসলমানদের জিনিষ গুলো হচ্চে বিদেশী। এ ক্ষেত্রে যাদের হাতে শক্তি তাদেরই জয় হয়। কিন্তু মোগল পাঠানের হাতে যতদিন রাজশক্তি ছিল, শিখেদের হাতে ততদিন থাকে নি। কাজেই যে experimentটা আরম্ভ হয়েছিল তা শেষ হবার অবসর পায় নি। পাঞ্জাবে শিখ আর মুসলমান পরস্পরের দিকে চোখ রাঙ্গিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

হিন্দুস্থানে হিন্দু মুসলমানের cultural fusion এর চেষ্টায় অনেক "পন্থ"-এর আবির্ভাব হয়েছে। রাজশক্তি নিয়েও কতকটা কাড়াকাড়ি হয়েছে, কিন্তু হিন্দুরা তাতে জয়লাভ করতে পারে নি। পাঠান মোগলের বংশধরেরা হিন্দু সমাজের খানিকটা খসিয়ে নিয়েছে; আর হিন্দি ভাষার ঘাড়ে ফার্সী চাপিয়ে একটা নূতন উর্দ্দু ভাষা আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা উর্দ্দু culture-এর সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে। দিল্লী আর লক্ষ্ণৌ হচ্ছে এই culture-এর আড্ডা। খাঁটি মুসলমানেরা যে হিন্দুদের কতটা ঘৃণার চক্ষে দেখে, তা এই সব জায়গার মুসলমানদের না দেখলে বুঝতে পারা যায় না।

পাঞ্জাবে এক শিখ ভিন্ন সকলেই মুসলমানের culture আর রাজশক্তির কাছে হার স্বীকার করেছে; শিখ cultureও মুসলমানী culture-এর খুব কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে। কিন্তু হিন্দুস্থানে মুসলমানের হাতে রাজশক্তি থাকা সত্ত্বেও হিন্দু culture হিন্দি ভাষার জোরে নিজের স্বাতন্ত্র্য অনেকটা রক্ষা করেছে। এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের গোঁড়ামিও কতকটা বেড়েছে বটে, কিন্তু হিন্দু consciousnessটা বেঁচে আছে।

ইংরেজের আমলে হিন্দুস্থানে আর পাঞ্জাবে মুসলমান cultureকে জয় করবার চেষ্টা করেছে আর্য্য সমাজীরা। মুসলমানদের হাতে এখন আর রাজশক্তি নেই; সুতরাং আগেকার political ঝগড়াটা এখন কতকটা অন্য রূপ নিয়েছে। আর্য্যসমাজীদের ইচ্ছা যে সমস্ত মুসলমানকে আর্য্যসমাজভুক্ত করে নেয়, উর্দ্দুর বদলে হিন্দি চালায়, আর সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে পাঠান মোগলের বিজয়-চিহ্ন মুছে ফেলে। আর্য্যসমাজীদের হাতে রাজশক্তি থাক্‌লে কি হতো বলা যায় না; কিন্তু তা যখন নেই, তখন তাদের চেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমানকে "শুদ্ধ" করে আর্য্য করা, আর উর্দ্দুকে তাড়িয়ে হিন্দি ভাষার প্রচলন করা। কিন্তু মজার কথা হচ্চে এই যে, মুসলমানদের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে এঁদের বুদ্ধি শুদ্ধি আর মেজাজটা হয়ে গেছে মুসলমানদের মত। কোরাণের বদলে বেদ, মসজিদের বদলে আর্য্যসমাজ গৃহ, আর 'তবলিগের' বদলে শুদ্ধির প্রতিষ্ঠা এঁরা করতে চান। এঁরা মনে করেন যে শতধা-বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজ সংঘবদ্ধ মুসলমান সমাজকে গ্রাস করতে পারবে না; তাই হিন্দু সমাজকে ভেঙ্গে চুরে এঁরা এমন একটা militant সমাজ গড়তে চান যা মুসলমানের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।

আর্য্য-সমাজের চেষ্টার ফলে হিন্দু-সমাজ হয়ত একটু বদলাতে পারে; অন্ততঃ হিন্দুসভার তরফ থেকে হিন্দুসংগঠনের চেষ্টা দেখে তাই মনে হয়। কিন্তু মুসলমান-সমাজকে গ্রাস করে ফেলবার শক্তি যে আর্য্য-সমাজের আছে তা মনে করবার কোন কারণ দেখতে পাইনে। কি সামাজিক হিসাবে, কি অধ্যাত্মদৃষ্টির হিসাবে আর্য্য মুসলমানের চেয়ে বড় নয়। সুতরাং এ ঝগড়ার ফলে মুসলমান আর হিন্দু সমাজ দুটোই বেশী সংঘবদ্ধ আর militant হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু কাউকে গ্রাস করতে পারবে বলে মনে হয় না।

বাংলার মুসলমানদের অবস্থা একটু স্বতন্ত্র। বাংলার মুসলমান অনেক, কিন্তু তারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বংশধর; সুতরাং বাংলার হিন্দুদের এক cultural superiority আছে। তা ছাড়া বাংলা ভাষা ভেঙ্গে উর্দ্দুর মত একটা আলাদা ভাষার সৃষ্টি হয় নি। লক্ষ্ণৌ বা দিল্লীর মুসলমানেরা যেমন হিন্দুদের নিকৃষ্ট জীব বলে মনে করে, বাংলার হিন্দুরা বাংলার মুসলমানকে অনেকটা সেই চক্ষে দেখে। বাংলার উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের কাছে নিম্নশ্রেণী হিন্দুদের যে অবস্থা, বাংলার মুসলমানদেরও প্রায় তাই। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাংলার হিন্দুদের গোঁড়ামী অনেক কমে গেছে; আর বাংলার বাইরের মুসলমানের প্রভাবে বাংলার মুসলমানদের মনোভাব অনেকটা বদলেছে। আমার মনে হয় বাঙ্গালী হিন্দু আর বাঙ্গালী মুসলমান দু দলেরই মনে গোঁড়ামীর ভাবটা একটু কম। দু দলেই যদি বাইরের প্রভাব ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তা হলে cultural fusion হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু আপাততঃ কিছু দিন ভেদের মাত্রাটা বেড়েই চলবে বলে যেন মনে হয়।

আপাততঃ যতদুর দেখতে পাচ্ছি তাতে বোধ হয় যে যদি মুসলমান ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের মত ভারতবর্ষে থেকে চলেও যায়, তা হলেও হিন্দুধর্ম্মের উপর বেশ একটা ছাপ রেখে যাবে। শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজ যদি মুসলমানদের প্রভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠে, তা হলে হয়ত একদিন মুসলমান সমাজকে গ্রাস করে ফেলতে পারে, কিন্তু সে শক্তি অর্জ্জন করতে হলে হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান রূপ অনেক বদলাতে হবে। নিজেকে সে রকম পরিবর্ত্তন করবার শক্তি বর্ত্তমান হিন্দু সামাজের আছে কিনা তা জানি নে। ভারতবর্ষ যদি স্বাধান হয়, আর অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন এমন কোন মহাপুরুষের যদি আবির্ভাব হয় যিনি হিন্দু সমাজকে আবার নূতন ছাঁচে ঢাল্‌তে পারবেন, তা হলে এই দুটো সমাজ মিশে গিয়ে একটা নূতন সমাজ গড়ে উঠতে পারে; কিন্তু এখন দু দলের যে রকম্ অবস্থা, তাতে কেউ কাউকে গ্রাস করবার চেষ্টা বিড়ম্বনা বলেই মনে হয়। আমার মনে হয় অন্ততঃ বাংলার হিন্দুদের এখন নিজেদের সমাজটাকে শক্ত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করাই ভাল; যাদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য নেই, তাদের পরকে গ্রাস করতে যাওয়া একটা দুশ্চেষ্টা মাত্র। হয় ত আত্মরক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু মুসলমান-সমস্যা মীমাংসার পথ দেখতে পাওয়া যাবে।

তবে একটা কথা বুঝতে পাচ্ছি যে এ দেশ যদি পরাধীন থাকে, তা হলে নূতন cultureও গজাবে না, আর দুটো জাত মিশে গিয়ে একটা জাতও কখনও হবে না। ইতি

তোমার—

পর-নিন্দা

পরনিন্দা নিশ্চয়ই ভাল নয়। অন্ততঃ কেহই বলিবে না, ভাল। কিন্তু তবু পরনিন্দার মত মুখরোচক জিনিষ জগতে দুটি নাই। ছোট বড় কে কবে পরনিন্দা না করিয়াছে?

আমরাও কয়েকজন মিলিয়া সেদিন এক অনুপস্থিতকে লইয়া তাঁর শ্রাদ্ধ করিতেছিলাম। শুধু কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক মহলে নয়, তখন সর্ব্বত্রই লোকের মুখে আমাদের মত মধুর মন্তব্যগুলি ধ্বনিত হইতেছিল।

"এমন ভীরু কোথায়ও দেখি নাই।"

"একেবারে অপদার্থ।"

"আহা বেচারা বউটি। সারাদিন রোগে একলাটি পড়ে ছট্ফট্ করে, অথচ তাকে দেখ্‌বার লোক নাই।"

"স্বামীর মুখ দেখ্‌বার জন্য পাগল, স্বামী কিন্তু অন্য বিয়ের আয়োজনে মাত্‌ছেন।"

"হৃদয়হীন!"

"আজকালকার ছেলে যে এমন হতে পারে তা কল্পনাও কর্‌তে পারিনি।"

"এদিকে ত বেশ ভাল লোক বলেই মনে হয়, বিদ্বান্—বুদ্ধিমান—"

"রেখে দাও তোমার বিদ্বান্ বুদ্ধিমান—বিদ্যা বুদ্ধি নিয়ে ত ধুয়ে খাবে।"

"লজ্জার কথা কিন্তু।"

"তা আর বল্‌তে।"

এই ছিল প্রথম দিককার মন্তব্য। যে হতভাগ্য ব্যক্তিটির সম্বন্ধে এই মধুর আলাপ তাঁর নাম অচিন্ত্যকুমার সান্যাল, আমাদের কলেজে কাজ করিতেন। ভদ্রলোকের বয়স বেশী নয়—২৮।২৯ হইবে। বেশ সুস্থ অমায়িক লোক। শুনিয়াছিলাম ঘরে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী আছে, কিন্তু সেই স্ত্রীকে বিবাহের পর হইতেই কেহ দেখিতে পারে না। স্ত্রী স্বামীকে খুবই ভালবাসিতেন, কিন্তু স্বামীর মন নাকি কিছুতেই উঠিত না। তিনি স্ত্রীর উপর অত্যাচার দেখিয়াও দেখিতেন না; স্ত্রী বেচারী গুমরিয়া গুমরিয়া মরিতেন। ক্রমে যেমন হইয়া থাকে—স্ত্রীর যক্ষ্মা হইল।

সুস্থ মানুষের উপর নির্দ্দয় ব্যবহার করিবার কারণ থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু রোগী, বিশেষ রোগিণীর উপর অত্যাচার মনকে সহজেই বিদ্রোহী করিয়া তুলে। যে-সে রোগ নয়, যক্ষ্মা। আমরা শুনিলাম অচিন্ত্য অযত্নে অবহেলায় বউটাকে মারিয়া ফেলিবার যোগাড় করিতেছেন। একে তখন আমাদের সকলের বয়স কম ছিল, রক্ত গরম, তার উপর প্রতিদিন নূতন নূতন সংবাদ আসিত—আমাদের সকলের চিত্ত জ্বলিয়া উঠিত। আমরা কষিয়া মনের সাধে তাঁকে গালাগাল দিতাম।

ব্যাপার এইখানেই শেষ হইল না। দিনে দিনে আরো ঘোরতর হইয়া উঠিল, শেষে উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। তখন আমাদের সকলের মুখে এক কথা। ছাত্র মহলেও ঐ কথা।

"শুনেছ?"

"অনেকদূর গড়িয়েছে।"

"কেলেঙ্কারির কথা।"

"আদালতে নালিশ করেছে।"

"শোননি বুঝি? অচিন্ত্যের শ্বশুর তাঁর মেয়েকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা দেয়নি।"

"কি নিষ্ঠুর! তারপর?"

"ভদ্রলোক নালিশ করেছেন যে এরা আমার মেয়েকে মেরে ফেল্‌তে চায়।"

"বেশ হয়েছে। আদালত থেকে একটা বড় শাস্তি দেয়, ত খুব খুসী হই।"

বস্তুত আদালতে নালিশ হইয়াছিল। আমরা প্রতিদিন কাগজ পাঠ করিতাম আর অচিন্ত্যের উপর আমাদের আক্রোশ বাড়িয়া উঠিত। তার মত জঘন্য মানুষ আর কোথাও নাই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে আমাদের বেশীদিন লাগে নাই।

এই সময়টা সত্য সত্যই অচিন্ত্য সান্যালকে আগুনের ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। আগে আমরা অসাক্ষাতে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করিতাম, একটু করুণা হইত। কিন্তু এখন আর করুণার লেশমাত্র রহিল না। তাহার সম্বন্ধে নির্দ্দয় হইয়া পড়িলাম, এবং মনে করিলাম তাহাই সুবিচার, এতবড় অন্যায়কে কোন মতেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

অচিন্ত্য আমাদের নিকট অপমানিত রহিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন না। ছাত্রমহলে তাঁর লাঞ্ছনা গঞ্জনার একশেষ হইত। ইহা জানিতে পারিয়াও আমরা প্রতীকারের চেষ্টা করিতাম না। ভাবিতাম, ইহা উঁহার প্রাপ্য।

কিন্তু আশ্চর্য্য! এত উত্ত্যক্ত হইবার পরও একদিন তাঁকে কারো বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দেখিলাম না। তাঁর আচরণে বুঝা যাইত না তিনি বাস্তবিক দোষী কি না। একবার মনে হইত দোষী, অন্যবার মনে হইত নন। তাঁর মুখে হাসি লাগিয়াই ছিল। অথচ আমি হলফ্ করিয়া বলিতে পারি এত ক্লান্ত বেদনাতুর মুখ আমি আর জীবনে দেখি নাই।

তারপর সব চেয়ে বড় ঘটনা ঘটিল, যা আমরা সকলেই কামনা করিয়াছিলাম অথচ যার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। অচিন্ত্য সান্যালের জেল হইয়া গেল, কি করিয়া বুঝিতে পারি নাই, কতদিনের তাও এখন মনে নাই। সেদিন আমরা বিশ্রামের সময় বসিয়া কলেজে বাস্তবিক বিজয়োল্লাস সম্পন্ন করিয়াছিলাম।

তারপর আস্তে আস্তে আমাদের মন হইতে অচিন্ত্য সান্যাল, স্ত্রীর উপর অত্যাচার,

মোকদ্দমা, জেল নিঃশেষে সব মুছিয়া গেল, কিছু মনে রহিল না। কলেজ যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল, আমরা আসিতে লাগিলাম এবং পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা করিলাম, কিন্তু অচিন্ত্য সান্যালের নহে।

ছয়মাস পর। আমি তখন পুরী যাইতেছিলাম। ষ্টীমার চলিতে আরম্ভ করিলে ঠিক অচিন্ত্যনীয়রূপে অচিন্ত্য সান্যালের সহিত দেখা হইয়া গেল। অচিন্ত্য প্রথম শ্রেণীর কেবিনের সাম্‌নে রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া নদীর দিকে ও পরে সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। সে আগের চেয়ে রোগা হইয়া গিয়াছে। মুখে সে হাসি আর নাই, বিষণ্ণ।

আমাকে সে দেখিতে পাইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। পাক্ বা না পাক্ তার জায়গা হইতে সে একটুও নড়িল না। কবে সে জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছে, কেন সে পুরী চলিয়াছে আমি কিছু জানি না। সেই জানিবার ঔৎসুক্য বা আর কিছু, বলিতে পারি না, আমাকে কেবলি তার দিকে টানিতে লাগিল। মনে হইল তার সঙ্গে গিয়া আলাপ করি। কিন্তু বিদ্বেষটা নাকি অনেক দিনের তাই সোজাসুজি তার কাছে যাইতে আপনা হইতে বিতৃষ্ণা জাগিয়া রহিল। আমি যাওয়া না যাওয়ার সন্দেহে পড়িয়া গেলাম।

সে নিজের কেবিনে চলিয়া গেলে আমি একবার প্রথম শ্রেণীর পাশ ঘুরিয়া আসিলাম। দরজা খোলাই ছিল। তাতে দূর হইতে দেখিলাম একটি মেয়ে শয্যায় শুইয়া আছে, আর তারই মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে অচিন্ত্য। রমণীর মুখ আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, তবু মনে হইল সুন্দরী। তখন মনে করিলাম, এ বেটা বউ না মরিতে মরিতেই বিবাহ করিয়াছে এবং প্রেমের অভিনয় করিতে পুরী যাত্রা করিয়াছে। লোকটার উপর আবার ঘৃণা জাগিয়া উঠিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সূর্য্যাস্তের সময় আসিল। পশ্চিম গগন এক অপূর্ব্ব শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত আমাকে চিরকাল পাগল করিয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের উপর সূর্য্যাস্তের দৃশ্য বর্ণনা করিবার তুলি আমার হাতে নাই। তাহা মহৎ তাহা উদার—মন ভরিয়া উঠে, প্রাণ জাগিতে চায়।

পশ্চিম আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কি যেন আমি গান করিতে চাহিতে-ছিলাম। মনে মনে বলিতেছিলাম, মরি মরি! আর একটা লোক কখন যে নিঃশব্দে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমি তা টের পাই নাই। সূর্য্যের শেষ রশ্মি আকাশে মিলাইয়া গেলে সে বলিল, "যে চিত্রকর আকাশে দিনের পর দিন এমন ছবি এঁকে চলেছে তার মত যাদুকর কোথাও আছে কি?"

ফিরিয়া দেখিলাম অচিন্ত্য সান্যাল। সে বলিয়া চলিল, "মানুষ প্রাণপণ কত চেষ্টা করে সেই যাদুকরের নকল কর্‌তে। কিন্তু তার চেষ্টা চিরকাল অপূর্ণ ই থেকে যায়। একবেলার একটা সূর্য্যাস্তও এমনকরে আঁকবার তার ক্ষমতা নাই।"

সূর্য্যাস্তের শোভা অথবা তার করুণ স্বর ক্ষণকালের জন্য আমার মনকে ভুলাইয়াছিল। তাই উত্তর দিলাম, "দরকারও নাই। মানুষ ত শুধু প্রকৃতিকে হুবহু ফুটাবার জন্যই নয়।"

সে কেমন একরকম সুরে বলিল, "কে বল্‌বে? এত রকম কলার মধ্য দিয়ে মানুষ কোন্ কথাটা বল্‌তে যাচ্ছে? কাকে প্রকাশ কর্‌তে চাচ্ছে—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "নিজেকে"।

"মানি। কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করবার আধারটার কথা ভুলে যেও না ভাই। আমার মধ্যে যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যা সার্থক তাই আমি ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে চাই। কিন্তু কেন চাই? কি দেখে চাই? প্রকৃতিকে নকল করবার আমার স্বাভাবিক ইচ্ছা—"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ছবি আঁক?"

সে কোন উত্তর না দিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। ক্ষণপরে দুই তিনটা ছবি লইয়া আসিল। ছবি সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত আনাড়ি, যদিও প্রকৃতির শোভা আমাকে সর্ব্বদাই মুগ্ধ করে। তবু মনে হইল, ছবিগুলি ভাল লাগিতেছে। অনেক ছবি দেখিয়াছি অনেক ছবি ভাল বলিয়াছি কিন্তু তবু এই প্রথম একজনের ছবি দেখিলাম যাতে মন সত্যই খুসী হইয়া উঠে, এমন কিছু পাই যাহা আর কোথাও পাই নাই।

ঐ লোকটা ছবি আঁকিতে পারে। কেন জানি না, তার উপর আমার মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইল। মনে হইল এমনতর ছবি আঁকিবার তার কোন অধিকার নাই। আমার চির-পরিচিত অচিন্ত্য সান্যালকে চিত্রকর অচিন্ত্য সান্যালরূপে কিছুতেই মিলাইতে পারিলাম না।

লোকটার দেখিতেছি গোপন করিবার প্রয়াস কোথাও নাই, অথচ ইহার আঁকা ছবিও কোনখানে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

"কোন কাগজে তুমি ছবি পাঠাও না?"

"পাঠাই।"

"কই তোমার নামে ছবি কোথাও দেখেছি বলে ত মনে হয় না।"

"আমি ছদ্মনাম ব্যবহার করি।"

"কেন?"—প্রশ্নটা অন্যায়, তবু করিলাম।

সে কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "ছবি আঁকবার বাতিক আমার ছোট বেলা থেকে। সে কথা মনে করলে আমার পড়াশুনা কি করে হল আমিই ভেবে পাই না। (হাসিল) কিন্তু ছবি ছাপাচ্ছি আমি অল্পদিন যাবৎ। তখন আমাকে নিয়ে হৈ চৈ চল্‌ছে। কাজেই আমাকে নাম ভাঁড়াতে হয়েছে।"

কি লোক! স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিয়াছে, মোকদ্দমা হইয়াছে, প্রেম করিয়াছে, জেলে গিয়াছে, ছবি আঁকিয়াছে। প্রিয়তমার মত ছবিকে সে সঙ্গী রাখিয়াছে। এত গোলমাল,

বিদ্রূপ, হাসি, অপমান এবং চিত্ত-বিক্ষোভের মধ্যেও তার মধ্যেকার তাপস মানুষটি চঞ্চল হয় নাই, তার ধ্যান ভাঙ্গে নাই। স্বীকার করিতেই হইবে মানুষটার মধ্যে ক্ষমতা আছে। অথচ মজা এই, সেজন্য তার একটুও অহংকার নাই। সমস্ত সে নীরবে সহ্য করে।

জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার সঙ্গের রমণীটি কে?"

"আমার স্ত্রী।"

বাস্‌। সব শেষ হইয়া গেল। মনের মধ্যে যে একটা কোমল ভাব জাগিতেছিল, তাহা জাগিতে পাইল না, অন্য ছবি জাগিয়া উঠিল। সুন্দর ছবি আঁকিয়া লোক ভুলাইলে কি হইবে? লোকটা যে নীচ সন্দেহ নাই। চাহিয়া দেখিলাম তার যেন আরো অনেক কথা বলিবার আগ্রহ রহিয়াছে, কিন্তু আমার আর শুনিবাব প্রবৃত্তি রহিল না।

এইরূপে আমরা যাত্রা শেষ করিলাম, অচিন্ত্য সাঁন্যালের আর কোন খোঁজ করিলাম না।

কয়েকদিন পরে একদিন বিকালে সমুদ্র-তীরে বেড়াইতেছি। সাগরের একটা শক্তি আছে। এখানে আসিয়া সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত ছাড়া সাগরও আমার মনোহরণ করিয়াছে। সম্মুখে অনন্ত নীল জলের রাশি, ঢেউ আসিয়া তীরে আঘাত করিয়াছে, ছেলেমেয়েরা কলধ্বনি করিতেছে, হাসিতেছে, ভাসিতেছে—এই সব দেখিয়া মনে কেমন এক ভাবের উদয় হইত। মনে হইত, মানব জীবন যাহা চলিতেছে তাই সবটা নহে। এর একটা অদূর দিক আছে যা সাগরের মত মহান্ ও গম্ভীর। বস্তুত সাগরের সংস্পর্শ মানুষকে একটু মহৎ করিয়া তুলে।

আমার হাতে কাজ ছিল না, মাথায় চিন্তা ছিল না, নিশ্চিন্ত আরামে সময় কাটাইয়া শরীর মন সুস্থ হইল। মাঝে মাঝে অচিন্ত্যের সহিত দেখা হইত, বাক্যালাপ করিতাম না। তার কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না, হাসি হাসি অথচ সেই চিন্তিত বিষণ্ণ মুখ।

সেইদিন বেড়াইতে আসিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়িল। দেখি, বেলাভূমিতে একটি তরুণী চেয়ারের উপর বসিয়া আছে, আর অচিন্ত্য তার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।—মা যেমন করিয়া রুগ্ন ছেলের দিকে তাকায় সেইভাবে। বুঝিলাম অচিন্ত্যের স্ত্রী, ইহাকেই ষ্টীমারে দেখিয়াছিলাম।

তরুণী বটে, কিন্তু কি শীর্ণ আর কি কাতর। এই কি অচিন্ত্য সান্যালের নব পরিণীতা স্ত্রী? ইহাকে লইয়া প্রেম করিতে সে পুরী আসিয়াছে? এ যে মড়ার মুখ। এই মড়ার মুখ দেখিলে অতি বড় নির্দ্দয়ের চোখেও জল আসে।

অচিন্ত্যের স্ত্রী সুদূরপ্রসারিত সাগরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। তার সর্ব্বাঙ্গ খুব ভাল করিয়া ঢাকা, শুধু মুখটি বাহিরে রহিয়াছে। গায়ের কাপড় একদিক পড়িয়া গিয়াছিল, অচিন্ত্য অতি যত্নে অতি সন্তর্পণে উঠাইয়া দিল। তার দৃষ্টি যেন বুভুক্ষিতের দৃষ্টি। তার চোখ দিয়া সে যেন সাগর, আকাশ, প্রকৃতির সকল শোভা সৌন্দর্য্য, অচিন্ত্যের মুখ

পান করিয়া লইতে চায়, যেন মরিবার পূর্ব্বে সে পৃথিবীকে একবার শেষ দেখিয়া লইতেছে, শেষ ভালবাসা বাসিতেছে।

এ যে রুগ্ন, এ ত সুস্থ মেয়ে নয়। অচিন্ত্য করিয়াছে কি? জানিয়া শুনিয়া একটা রুগ্নাকে বিবাহ করিয়াছে? বেচারা! তার উপর যত রাগই থাকুক্ না, এখন করুণা বোধ করিলাম।

তাদের দুজনের টুক্‌রা টুক্‌রা কথাবার্ত্তা সমুদ্রতীরের আর সব কিছু ছাপাইয়া কাণে আসিয়া বাজিতেছিল।

"আলো কি চোখে বড় লাগ্‌ছে?"

"না।"

"কি ভাবছিলে রেণু?"

"ভাবছিলাম আমরা পৃথিবীতে এসে মিথ্যাই গোলমাল করে মরি। এত হৈ চৈ, এত ব্যস্ততা কিসের জন্য? বলবে প্রাণের জন্য। কিন্তু প্রাণই কি সব চেয়ে বড়? প্রাণের বড় কিছু নাই?"

"কি আছে?"

"হৃদয়।"

"সত্যি বল রেণু আমি হৃদয়হীন নই?"

রেণু প্রেম-নয়নে অচিন্ত্যের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি কোনদিন তোমাকে হৃদয়-হীন মনে করি নাই, আমার পরম দুঃখের দিনেও না। আর আজ মনে করব? আজকের মত এত কাছে আর কবে তোমাকে পেয়েছি, বল?"

"কিন্তু রেণু আমার কি হবে?"

"তোমার ত কোন দোষ নাই।"

কেমন একরকম মুখ করিয়া অচিন্ত্য বলিল, "তাই বা বলি কেমন করে?"

"বলতে হবে না, আমি জানি।"

"তুমি সবটা জান না।"

"আমি সব জানি গো। কিন্তু যাবার আগে এই কয়টা দিন কেন আর তুমি সেজন্য বিষণ্ণ থেকে আমায় বিষণ্ণ করবে?"

"আমি ত বিষণ্ণ নই। হাসছি।"

আমি অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তারা দুজনে দুজনকে লইয়াই বিভোর, আমার দিকে দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত করিল না। আমি ফিরিয়া গেলাম। সেদিন রাত্রে মনে হইল অচিন্ত্যের জীবন রহস্যময়, অতখানি কঠোর তার উপর আর না হইলেও চলে।

দিন সাতেক পরে অচিন্ত্যের সহিত দেখা হইল, সেদিন সে একা আসিয়াছে। বালুর উপর বসিয়া আছে। বলিলাম, "আজ যে একা।"

"আমার স্ত্রীর শরীর আজ একটু বেশী খারাপ হয়েছে।"

"তোমার স্ত্রী কি রুগ্ন?"

"রুগ্ন।"

"কি অসুখ?"

"যক্ষ্মা।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, নয়? জেনেশুনে রুগ্নাকে বিয়ে করেছ?"

সে কাতরভাবে আমার দিকে তাকাইয়া বলিল, "কার কথা বলচ? রেণুর? ওই ত আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। তারপর আর বিয়ে করি নি। পুরীতে হাওয়া বদ্‌লাতে এসেছি।"

হায় পরনিন্দা এবং পর-চর্চ্চার বাসনা! এই লোভটাকে লইয়া আমরা কত রকম অস্বাস্থ্যকর আলোচনাই না করিয়াছি। ইহার সম্বন্ধে কত কথাই না অত্যন্ত সহজে বিশ্বাস করিয়াছি। অথচ ইহাকে ভাল করিয়া জানিবার চেষ্টা কেহ কোনদিন করি নাই। আজ জীবনে এই প্রথম তার সম্বন্ধে সব কথা জানিবার ইচ্ছা হইল। তাই বলিলাম, "কি রকম? আমরা যে জানি কষ্ট দিয়ে তুমি এতদিনে বউটিকে মেরে ফেলেছ! মোকদ্দমা হল, এত কাণ্ড হল আর আজ—"

"মোকদ্দমাটা মিথ্যা নয়। তবে আমার জীবনে অনেক কিছু জড়িয়ে গেছে যা সত্য নয়, মিথ্যাও নয়—ছাড়াবার উপায় নাই।"

"বলবে কি সব কথা খুলে? তোমার যদি কষ্ট না হয় আর আপত্তি না থাকে তবে আমি শুনতে চাই।"

"আপত্তি?" তার চোখ জ্বলিয়া উঠিল। "না, আপত্তি কিছু নাই। বরং আমার কথা অনেকের কাছেই বলতে চেয়েছি, কিন্তু কেউ শুনতে চায়নি। আগে থেকে অবিশ্বাস করে বসে রয়েছে। তুমি যদি শুনতে চাও শোনাব।"

ততক্ষণে সন্ধ্যার বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সপ্তমীর চাঁদ তার মৃদু আলোতে সাগর, আকাশ ও বিস্তীর্ণ শুভ্র বালুতে একটা তরলতা ঢালিয়া দিয়াছে। ঢেউয়ের উপর মধুর জ্যোৎস্না নাচিয়া চলিয়াছে, নানারকম গুঞ্জন ও স্বর সমস্ত স্থানটাকে রঙীন করিয়া তুলিয়াছে।

সেই অনন্ত নীল আকাশের তলে ও বিশাল বিপুল নীল সমুদ্রের ধারে অচিন্ত্য সান্যাল তার কাহিনী বলিতে লাগিল। বলিল,

"আমার সম্বন্ধে তোমাদের আলোচনা এক সময় খুব পেকে উঠেছিল। আমি জান আমাকে নিয়ে তোমরা খুব আলোচনা করতে, আমার শ্রাদ্ধ করতে। তারপর সময় এল যখন তোমরা ও আমার ছাত্রেরা প্রকাশ্যে আমাকে অপমান করতে ছাড়তে না।

"কিন্তু এও জানি তোমরা আমাকে বাইরে থেকে বিচার করেছ। অন্য একদিক থেকে বিচার করা যে যায় তা তোমরা জান্‌তে না। আমাকে যত দোষ দিয়েছ আমি ঘাড় পেতে স্বীকার করেছি। প্রতিবাদ করি নি। কি করে করব? প্রতিবাদ করা সহজ ছিল না। বুঝানো সহজ ছিল না। এর মধ্যে আমার মা ছিলেন যে।

"রেণুর উপর অত্যাচার হয়েছিল আর তারই ফলে তার এই যক্ষ্মা একথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। দিনে দিনে কি বেদনা সে বুকে রেখেছিল সে কথা কি আমি জানি না? তিলে তিলে সে যে এমন করে দগ্ধ হয়েছে তা কি আমি জানতাম না?

"জান্‌তাম, কিন্তু জেনেও কোন উপায় করতে পারি নি। অক্ষয় এ অবস্থায় তুমি কোন দিন পড় নি, এ অবস্থা তুমি বুঝতে পারবে না। আমি কলেজে আসতাম, নিজের কাজ করতাম, ছাত্রদের কাজ দেখতাম, এমন কি ছবি আঁকতাম, কিন্তু বুকের মধ্যে কি জ্বালা যে পুষে রাখতাম কেউ জানে না। সে জ্বালার কথা বলবারও উপায় ছিল না। হাসি মুখে আমাকে দেখাতে হত আমি ঠিক আছি এবং ঠিক চলছি। কিন্তু আমি ঠিক ছিলাম না। ঠিক থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

"আসলে গোলমালটা আমার সঙ্গে নয়, আমি নিমিত্তের ভাগী মাত্র। গোলমালটা মাকে আর রেণুকে নিয়ে। কোন একটা কারণে বিয়ের দিন থেকে রেণু মার বিষ-নজরে পড়ে যায় চিরদিনের জন্য। কারণটা আমি বলব না। কোন ছেলেই মায়ের নিন্দা করতে পারে না, আমিও পারি না। মা যাই করে থাকুন, ভুলে যেওনা তিনি সর্ব্বদাই আমার মা ছিলেন। সেখানে যুক্তিতর্ক খাটে না, দরকার হয় না।

"প্রথমটা একরকম চলে যাচ্ছিল। কিন্তু রেণু আমার গুমরে গুমরে দগ্ধ হতে লাগল, অনেক বছরের অত্যাচারে রোগে পড়ল, রোগ যক্ষ্মা বলে ধরা পড়তেও দেরী হল না। তখন থেকেই সমস্তটা বিশ্রী হয়ে উঠল।

"মা আমাকে কিন্তু কিছুতেই রেণুর কাছে যেতে দিবেন না, প্রাণান্তেও না। তিনি একেবারে কড়া পাহারা বসিয়ে দিলেন। তুমি ভাই মনে মনে মাকে বিচার করতে যেও না। মার অন্যায় হয়েছিল হয়ত, কিন্তু মার হৃদয়টা দেখো। ছেলে তাঁর প্রাণ। ছেলের জন্য সব তিনি করতে পারেন। রেণু যদি তাঁর আদরের বউ হত তবু আমি জানি আমাকে তার কাছে যেতে দিতেন না। 'ও মাগো যক্ষ্মা রোগীর কাছে নাকি কেউ যায়!' 'আমার স্ত্রী।' 'হোক তোর স্ত্রী। তোর স্ত্রী কি তোর মার কথার চেয়ে বড়?'

"একথার পর চুপ করে থাকতে হত, বলতে পারি না মায়ের কথার চেয়ে স্ত্রীর দাম বেশী।' বাস্তবিক, মার কাছে বউয়ের অনেক আগে ছেলে। বউ তাঁর কে? ছেলে তাঁর সব। আমি একবারও রেণুর কাছে যেতে পারতাম না। বউ যদি তাঁর প্রিয় হত, তবু বরং আমার না গেলে চলত। কিন্তু—

"এই অবস্থা কি দারুণ বেদনা-দায়ক সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। আমার এক এক সময় সমস্ত মন মায়ের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ত। আমার স্ত্রী! আমার রেণু! তার কাছে যেতে পার্‌ব না? তার চরম দুঃখের সময় তার কোন কাজে লাগব না? তবে যে এত ভালবেসেছি সে কি মিথ্যা বেসেছি? পুরুষের অহঙ্কার আমার কি নাই? কর্ত্তব্য কি আমার নাই?

"মা আমার চোখের কোণে বিদ্রোহের আভাষ দেখ্‌লেই বল্‌তেন 'আমি আগে মরি, তারপর যা খুসী তুমি কোর।' সে এমন করুণ, এমন কঠিন কথা যে আমি নিজেরই মরণ কামনা কর্‌তাম। কিন্তু আমি স্ত্রীর কাছে যেতে পারতাম না, মার সঙ্গেও ভাল ব্যবহার কর্‌তাম না। আমি কাপুরুষ হয়ে পড়েছিলাম। মা বল্‌তেন 'মার চেয়ে স্ত্রীই বেশী হল?'

"বিধাতা এতখানি দুঃখ দিয়েও সন্তুষ্ট হলেন না। তারপর আদালতের কেলেঙ্কারিটা ঘট্‌ল। বউয়ের অসুখ, তাকে ভালও বাসেন না—তা সত্ত্বেও মা রেণুকে বাপের বাড়ী যেতে দিবেন না। বেচারা ভদ্রলোক বার বার চেষ্টা করে বিফল হয়ে চটে গেলেন। তিনি বল্‌লেন কি, একজন স্ত্রীলোকের এত স্পর্দ্ধা! আচ্ছা আমি আমার মেয়ে ঘরে নিয়ে আস্‌ব, আর বাবাজীকে একবার টের পাইয়ে দিব। তবে আমার নাম—ইত্যাদি।'

"বাবাজীকে টের পাওয়াতে অবশ্য তাঁর বেগ পেতে হয় নি। বাবাজী নিজের হয়ে সমস্ত দোষ কবুল করেছিল, কোন বিষয়ে প্রশ্ন তুলে নি। কারণ, মাকে সেই মোকদ্দমায় আমার জড়াবার কোন রকম ইচ্ছা ছিল না। আমার জীবনের এই একটা তৃপ্তি আছে যে মা জড়ান নাই চোট্‌টা আমার উপর দিয়ে গিয়েছিল।

"তারপর জেলে চল্লাম। মার দুঃখ ও অনুতাপের কথা ভেবে অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তবু প্রাণে কেমন একটা শান্তি পেয়েছিলাম। যতদিন জেলে ছিলাম, আমি জেলকে দুঃখ বলে মনে করিনি বা তর্ক করিনি জেলে আমার আসা উচিত ছিল কি না। জেলে আমার নিশ্চয় আসা উচিত ছিল। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব না ত কে করবে? আমার অপরাধ? আমার নয় ত আর কার? কে রেণুর এত দুঃখের কারণ? কে রেণুকে ভুগ্‌তে দেখেও নিঃশব্দে বসেছিল! কে মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল? তাঁকে চোখের জল ফেল্‌তে বাধ্য করেছিল? আমি নয় কি? সাজা আমার পাওয়া উচিত নয় কি? সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমি সন্তুষ্ট-মনে জেলে গিয়েছিলাম, সান্ত্বনা পেয়েছিলাম।

যাবার সময় রেণুকে কাণে কাণে বলে গিয়েছিলাম, 'রেণু চল্লাম, কিন্তু আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তোমাকে বেঁচে থাক্‌তেই হবে। আমার প্রায়শ্চিত্তের পর তোমার ব্যবস্থা করব।'

"বিধাতাকে দোষ দিয়েছিলাম। কিন্তু জেল আমাকে রক্ষা কর্‌ল। সে ত অভিশাপ নয়, সে যেন আশীর্ব্বাদ। জেলের পর সব দ্বন্দ্ব মিটে গেল। মা রেণুকে ক্ষমা কর্‌লেন। যে রেণুকে তার বাপের জন্য আরো বেশী করে না দেখতে পারার কথা ছিল তাকে আর দূর করে রাখলেন না। এ কেমন করে হল, তা আমি জানি না। কিন্তু এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

"রেণুকে হাওয়া বদ্‌লাতে তাই সহজ হয়ে গেল পুরী আনা। রেণু জানে সে আর বেশীদিন বাঁচবে না, আমিও জানি। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমাদের এ মিলন যে কি মধুর তা তোমরা কেউ বুঝ্‌তে পারবে না।"

অচিন্ত্য সান্যাল চুপ করিল। দেখিলাম চাঁদের আলোতে তার চোখ চক্ চক্ করিতেছে। আমার প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল উঠিয়া তাকে আলিঙ্গন করি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ আমি, উঠিলামও না, আলিঙ্গনও করিলাম না। চাঁদ মাথার উপরে উঠিল, পথ নির্জ্জন হইয়া আসিল, ঢেউয়ের ছল ছল, বাতাসের শন্ শন্ কাণে আসিয়া লাগিল। বায়োস্কোপের ছবির মত অচিন্ত্য সান্যালের জীবনের ছবিগুলি আমার সাম্‌নে ঘুরিতে লাগিল। কলেজের সেই সব দিনগুলির কথা মনে পড়িয়া গেল যখন তাকে নিয়া কত না আলোচনা করিয়াছি।

অচিন্ত্য সহসা তীরের মত সোজা হইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ চল্লাম ভাই। রেণু হয়ত জেগে বসে আছে।" সে চলিয়া গেল।

আমি বাসায় আসিয়া বাতি জ্বালিলাম। শুইতে যাইবার আগে ডায়েরীর পাতায় লিখিয়া রাখিলাম,—

"অচিন্ত্য সান্যাল আজ তার জীবনের কথা খুলিয়া বলিয়াছে। ট্র্যাজেডী নিশ্চয়ই। কিন্তু লোকটার বর্ণনার শক্তিকে প্রশংসা করিতে হয়। আমার মনে হয় সে অনেক বাড়াইয়া বলিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া বলিয়াছে যে সত্য বলিয়া ভুল হয়। তথাপি একটা শিক্ষা আজ পাইয়াছি। আর পর-নিন্দা করিব না।

শ্রীসুধানলিনীকান্ত দে

ধর্ম্মে গোঁড়ামি

অন্যের ধর্ম্মমতের উপর প্রাধান্য দিয়া নিজের ধর্ম্মমতকে অভ্রান্ত বা নির্দ্দোষ এবং অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া যাঁহার অন্ধ বিশ্বাস, অথবা ঠিক বিশ্বাস না থাকিলেও তদ্রূপ বলিবার জিদ্ আছে, এক কথায় তাঁহাকে গোঁড়া বলে। বিচারহীন বিশ্বাসই শুধু নয়, নির্ব্বিচারে সেই বিশ্বাসকে আঁকড়িয়া থাকাই গোঁড়ামি। কেহ কেহ বলেন, গোঁড়ামি একটু চাই বৈ কি। উহা না থাকিলে ধর্ম্মমতে ও অনুষ্ঠানে শৈথিল্য জন্মে। কিন্তু যাঁহারা সত্যান্বেষী এবং আর সমস্ত ছাড়িয়া সত্যকেই ধরিয়া থাকিতে চান, তাঁহারা কোন মত বা অনুষ্ঠানে শিথিলতা-নিবারক গোঁড়ামিকে রাখিতেই চাহেন না, তাহার কোন প্রয়োজনই স্বীকার করেন না, তাঁহারা যে মত বা বিশ্বাস গোঁড়ামির দ্বারা ধরিয়া রাখিতে হয়, তাহাকে সন্দেহের চক্ষুতেই দেখিয়া থাকেন; আর সেই বিশ্বাসের মূলে গলদ বাহির হইলেই পূর্ব্বসংস্কার পরিবর্ত্তন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। জীবনে এরূপ মুহূর্ত্ত অনেক আসে। কেহ তাহা উপেক্ষা করিয়া মতামত বা বিশ্বাসের মূল্য বড় দেন না; কেহ কেহ তাহার মূলে নাড়া দিতেও চাহেন না। তাঁহাদেরই ঔদাসীন্যই অনেক সময় গোঁড়ামির সংজ্ঞা লাভ করে বটে, কিন্তু তাঁহারা গোঁড়া নাও হইতে পারেন। ধর্ম্মে তাঁহাদের শৈথিল্য স্বীকার্য্য। কিন্তু প্রকৃতই যাঁহারা ধর্ম্মের গোঁড়া তাঁহারা আপন বিশ্বাসমত জীবনযাপন করিতে না পারিলেও, বা, না করিলেও স্বীকৃত মত বা অবলম্বিত পথের যাহা অনুকূল নহে, এমন কথা, সমালোচনা বা যুক্তি কানে তুলিতেও চাহেন না। তাঁহাদের এই নিষ্ঠা তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচায়ক নহে। প্রকৃত ধার্ম্মিককে তাঁহার গোঁড়ামির দ্বারা নহে, কিন্তু তাঁহার জীবনের দ্বারাই জানা যায়। ধর্ম্ম জিনিষটা কি? এবং যে ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা তাহার মূল কি? এ সম্বন্ধে অন্যেরও কিছু বলিবার অধিকার আছে কিনা, এবং অন্যের বিশ্বাসে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার, তাঁহাকে নিজমত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবার নৈতিক অধিকার আছে কিনা এসকল তাঁহার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যেমন স্বীয় পুত্র-কলত্র, ঘটী-বাটী আসবাব-পত্র, তাঁহার নিজস্ব যাবতীয় সম্পত্তি ও মানসম্ভ্রম রক্ষা করেন, এবং অধীন ব্যক্তি বা অধিকৃত বস্তুর প্রতি যথেচ্ছাচার করিবার অধিকার বা অধিকারে দাবী রাখেন, আর তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং বলিলে সহ্য করিবার ধৈর্য্য রাখেন না, তেমনি তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেই বিশ্বাস পোষণ করেন। যাহা সকল ধর্ম্মের মূল ও প্রাণপুরুষ সেই বস্তু লইয়া যেমন গোল নাই, তাহা পাইলেও তেমনি গোল নাই। যত গোল তাহা পাইবার উপায় এবং তাহার সাধনা লইয়া। সেই

অজ, শাশ্বত, সত্য যে কাহারও নিজস্ব নহে এবং অনন্যচিন্ত্যও নহে—উহা যে মুক্ত বায়ু, সূর্য্যকিরণ বর্ষাবারিবৎই ধনী দরিদ্র, মূর্খ, জ্ঞানী আস্তিক নাস্তিক দুর্ব্বল নর ও নারী আবালবৃদ্ধ কাহারও একচেটিয়া করিয়া লইবার বস্তু নহে, তাহা তিনি মানিতেই চাহেন না। তাঁহার কথা —"সেই বস্তু পাইবার একই উপায়, সাধনার এই একই মাত্র পথ। ইহার প্রতিকূল বা হানিকর বা গ্লানিকর কোন কথাই শুনিব না। শুনিলেও মানিব না। যে আমার অবলম্বিত পথ ধরিবে সে আমার আত্মীয়; ভিন্ন পথের পথিক, ভ্রান্ত ও পর। পরের কথা আমি সহ্য করিতে পারি না; তাহার প্রতিবাদ করি, ধর্ম্মযুদ্ধে নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখাই; তাহাতে আমার বিবেক বাধে না।" এই পরমত-অসহিষ্ণুই প্রকৃত গোঁড়া। ইহাঁদের সংখ্যা জগতে কত?

আমার বিশ্বাস ও ভক্তির পাত্র—তা সে ধর্ম্মমতই হউক আর ধর্ম্মের অধিদেবতাই হউন—তাহা জড়ই হউক আর চেতনই হউক,—জীবজন্তু হউক আর মানুষই হউক,—নর-দেহধারী স্বয়ং ভগবানের পূর্ণাবতারই হউন আর অংশাবতারই হউন,—তিনি পীরই হউন আর পয়গম্বরই হউন, অথবা আমার কল্পনার দেবতাই হউন,—আমি তাঁহার যাচাই চাহিনা। যাচাই করিবার মত ভক্তিহীনতা ও ধৃষ্টতার সাহস আমার নাই। আমি বিশ্বাস করি। ইহাই হইল তাঁহার কথা। অতি উত্তম কথা, অতি উদার ভাব। কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে সত্য থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। যিনি বিশ্বাসের মূলে যুক্তিবিচার-বিমুখ হইয়া সত্যের খোঁজই রাখিতে চাহেন না, তিনি সত্যকে অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্বাসকেই ধরিয়া থাকেন, এবং অনুসন্ধিৎসা বা সত্যান্বেষণের মূল্য অস্বীকার করিয়া বিশ্বাসকেই প্রাধান্য দেন। পক্ষান্তরে, সত্যের অনুভূতিই প্রকৃত বিশ্বাসের মূল। সত্যমূলক যে বিশ্বাস তাহা অনপনেয়। তাহা শত সন্দেহ উৎপাদন দ্বারা কোন যুক্তি কোন কূটতর্ক দ্বারা নষ্ট হইবার নহে। তাহা ধ্রুব। কিন্তু যে বিশ্বাস নিজের সত্যানুভূতির দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না, গোঁড়ামিই যাহার মূল, তাহা বিশ্বাস ত নহেই, তাহাকে অন্ধ বিশ্বাসও বলা যায় না। তাহার নাম "জিদ্।" সন্দেহ বিশ্বাসের স্বভাব-শত্রু। ইহা বিশ্বাসের পূর্ব্বে এবং পরেও আক্রমণ করিয়া থাকে। সে সংগ্রামে সত্যমূলক বিশ্বাসই বিজয় লাভ করে। এই সংগ্রাম মনোজগতের ব্যাপার বলিয়া "গোঁড়ামি"—বাহিরে সে পরাজয় প্রকাশ হইতে দেয় না। এদিকে সন্দেহ-দস্যু বিশ্বাস-রত্নটি হরণ করিয়া মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাড়ে। পরপ্রত্যয়ানয়বুদ্ধি অন্ধ-বিশ্বাসীর দুর্ব্বল হৃদয় তখন অবলম্বন চায়। তখন আত্মবোধের অভাবে "প্রবোধ" আসিয়া তাহার দৈন্য ঘুচাইয়া দেয় এবং জিদ্ তাহাকে দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আবৃত করিয়া তাহাকে তাহার ধর্ম্মমতের গোঁড়া করিয়া তুলে।

সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিয়াও যাঁহাদের গোঁড়ামি নাই, তাঁহাদের পরমত-অসহিষ্ণুতাও নাই,

স্বীয় বিশ্বাসে শৈথিল্যও নাই। আবার যাঁহাদের সত্যের অন্বেষণ এবং উপলব্ধিরূপ সিদ্ধি ব্যতীত 'বিশেষ মতামত বা বিশ্বাসে বদ্ধ থাকিবার সাধনা নাই, তাঁহাদের জীবনে কোন ধর্ম্মমতই তাঁহাদের প্রতিকূল নহে। তাঁহাদের অগ্রগতির জন্য কোন পথই নিষিদ্ধ নাই। হয়ত, বর্ত্তমান সকল পথ বা মত তাঁহাদের একে একে পরিত্যজ্য হইতে পারে; কোনটা টিকিয়াও যাইতে পারে। অভিমান বা বিদ্বেষ অথবা গোঁড়ামির বিপরীত-জিদ্ তাহার কারণ নহে। তাঁহারা কোন মতের প্রতি শ্রদ্ধা বা আস্থা না থাকিলে, সেই মতবাদীর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করেন না। তাঁহাদের লক্ষ্য শুদ্ধ সত্য। মনোজগতের দ্বন্দ্ব তাঁহাদের অহরহঃ চলিতে থাকিলেও ধর্ম্মজগতে বিবাদ তাঁহাদের অন্তরে নাই। তাঁহারা যে সত্য উপলব্ধি করেন, তাহা অকপটে ব্যক্ত করিয়া জাতীয় সাহিত্যকে সম্পৎশালী করেন। তাঁহারা জগতের নিকট স্বীয় মতবাদের সমর্থন চাহেন না, পরের বিশ্বাসমত সাধনায় বিঘ্নদানেও প্রবৃত্ত হন না। তাঁহাদের লইয়া মতান্তরে মনান্তরের সম্ভাবনা নাই।

আমরা যে পথ ধরিয়াই যাই না কেন, যদি আমাদের গন্তব্য একই হয়, কিম্বা, তোমার আরাধ্যই যদি আমার আরাধ্য হন, এবং তাঁহাকে যদি এমন সম্বোধন করি, তাঁহার নিকট এমন কিছু প্রার্থনা করি যাহা তুমি কর না, তাহা হইলে আমার পথে বাধা দিবার ও তোমার অপ্রীতিকর বলিয়া আমার মুখবন্ধ করিবার নৈতিক অধিকার তুমি কোথা হইতে পাইলে?

তুমি পবন দেবকে পূজা কর, তুমি আপাদকণ্ঠ আবৃত রাখিয়া উত্তমাঙ্গ মাত্র দেবতাস্পর্শে পবিত্র করিতে থাক। তুমি সূর্য্যদেবের উপাসক; সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিত তোমার আরাধ্য দেবতার তেজঃ, তাঁহার কিরণ তোমার পদস্পর্শ না করে তুমি সাবধান হইয়া থাক। কিন্তু আমি যদি পবন দেবের বাহ্যরূপ বায়ুকে কাচের ঘরে বন্ধ করিয়া তাহার লঘুত্ব গুরুত্ব শক্তি সামর্থ্য যাচাই করি, কিরণের বর্ণ বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে আমাকে দেবদ্রোহী বলিয়া তাড়না ভৎ‍র্সনা করিবার তোমার অধিকার আছে কি? না তাহা নাই। বিশ্বারাধ্যের নিকট তোমার যতটা দাবী করিবার অধিকার আছে মনে করিয়া তুমি তাঁহার দরবারে দাঁড়াও, আমি যদি ঠিক ততটা দাবী করিবার যোগ্য না হইয়াও তাঁহার নিকট তোমারই মতন বা তাহারও বেশী দাবী করিয়া বসি, তাহা হইলে তোমাকে কিছু বলিবার আমার এবং আমায় কিছু বলিবার তোমার কোন অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করি না। যাঁহাকে পাইবার জন্য বা যাহা পাইবার জন্য আমি হিন্দু, তুমি বৌদ্ধ, ইনি খৃষ্টান, উনি মুসলমান ইত্যাদি, তাঁহার অনুকূল বা প্রতিকূল কেহ কিছু বলিলে বা তাঁহাকে কম ভক্তি বা অবিশ্বাস করিলে, এমন কি বর্জ্জন করিলেও তাহাকে তোমার আমার শাসন বা নিন্দা করিবার স্বভাবিক ও নৈতিক অধিকার নাই।

তুমি হিন্দু; তুমি জগন্ময় কেবল হিন্দু আর অহিন্দুই দেখ। তুমি খৃষ্টান; তুমি বিশ্বময় খৃষ্টান আর অখৃষ্টানই দেখ। তুমি তোমার দৃষ্টি ও বিশ্বাসের চতুর্দ্দিকে 'বেড়া দিয়া নিজের

আচার বিচার অভ্যাস লইয়া থাক। আর, যাহারা সেই বেড়ার বাহিরে থাকে, তাহাদের আচারকে সব অনাচার, নিয়মকে সব অনিয়ম দেখ। তুমি বেড়ার ভিতর থাকিয়া আড়াল হইতে ভাব বাহিরের যাহারা সব বিপথ ধরিয়া সোজাই "নরকে" যাইবে। যদি তাহাদের জন্য তোমার প্রাণ সত্যই কাঁদিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের পথের নিন্দা পথিকের নিগ্রহ না করিয়া তোমার সোজা পথটির সকল সন্ধান বলিয়া দিতে পার, তার বেশী করিতে যাওয়া তোমার অনধিকার চর্চ্চা। তুমি তাহাদের ঘৃণা, দ্বেষ, কুৎসা, তিরস্কার, দণ্ডদান করিবার কে? মহাপুরুষোক্ত "যত মত, তত পথ"—একথাটি যদি একবার তলাইয়া বুঝিয়া স্বীকার করিতে পার, তাহা হইলে তোমার গোঁড়া নাম ঘুচিয়া যায়। তোমার গণ্ডি-দেওয়া ছক-কাটা ধর্ম্মমত সাম্প্রদায়িক বাঁধ ভাঙ্গিয়া মুক্তি লাভ করে। গণ্ডি দেওয়াটা যে জড়ের ধর্ম্ম! গুটিপোকা অষ্টে পৃষ্ঠে আপনার চারিদিকে গণ্ডি দিতে দিতে এমন ভাবে অন্ধকার গৃহে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে যে তাহার মুক্তির জন্য প্রাণ যখন হাঁপাইয়া উঠে, তখন তাহাকে তাহার অত যত্ন-নির্ম্মিত গণ্ডির মায়া ত্যাগ করিয়া স্বীয় জীবন্ত সমাধি মন্দিরের প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহির হইতে হয়। মধ্য যুগে লোক দেশ নগর দুর্গাদি অন্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ় প্রাচীরে আবদ্ধ করিতে ভালবাসিত ও তাহার প্রয়োজন বোধ করিত। সমাজকেও তাহারা নানা উপায়ে তেমনি বেড়াজালে বদ্ধ করিতে করিতে, বাহিরের বস্তুকে এইরূপে সীমাবদ্ধ করিতে করিতে অন্তরের বস্তুকেও গণ্ডিবদ্ধ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। পুরুষানুক্রমে এইরূপে ভিতরে বাহিরে বেড়া দিতে দিতে বেড়া দেওয়াটাই মানুষের সংস্কারগত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বেড়া যিনি যত উঁচু যত শক্ত ও অপ্রশস্ত করিয়া বাঁধেন, তিনি সেই পরিমাণে গোঁড়া। গোঁড়ামি যখন অসহ্য শ্বাসরোধক হইয়া উঠে, তখন এক এক জন মহাপুরুষ আসিয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া যান। কিন্তু তাঁহাদেরই বংশধরগণ অস্থিমজ্জাগত সংস্কার এড়াইতে না পারিয়া পুরাতন বেড়ার জীর্ণ উপকরণ এবং অন্যের বেড়া ভাঙ্গা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পুরাতন বেড়ার পরিবর্ত্তে নূতন বেড়া বাঁধিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। ফলে সকল প্রাচীন ধর্ম্মই স্থানকাল ও জাতিগত হইয়া পড়িয়াছে। সত্য যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন অবতার ও ধর্ম্মগুরুরই জীব তরাইবার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বা প্রচারিত ধর্ম্ম সমগ্র মানবের বা দেশ বিশেষে সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য হয় নাই। প্রাচীন কালে যে যে ধর্ম্ম সর্ব্বগ্রাহ্য করিবার চেষ্টায় বহুলাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তৎসমুদয় মানুষের মজ্জাগত সংস্কারবশে বিবিধ সম্প্রদায়গত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা মানবধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে, যাহা সকল দেশ, সকল জাতি, সকল ব্যক্তি ও সর্ব্বকালের উপযোগী হইয়া অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত মূর্ত্তিতে প্রকৃতই "সনাতনত্ব" লাভ করিবে, সেই বিজ্ঞান ও সত্যমূলক ধর্ম্ম যাহা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইবার প্রয়োজনই থাকিবে না। কেবল যাহা অবলম্বন না করিলে মানুষ হইতে মনুষ্যত্বটুকুই বাদ পড়িয়া যাইবে,

যাহার সংরক্ষণ, অনুশীলন ও উৎকর্ষসাধন পূর্ণ মানবত্বে পৌঁছিয়া দিবে, তাহাই মানবজাতির ভবিষ্য ধর্ম্ম হইবে, যে স্থানে পৌঁছিলে, মানুষ সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে দেখিয়া আত্মগর্ব্বে অন্ধ হইবে না, কিন্তু আপনার পূর্ণতার মধ্যে বাঞ্ছিতকে পাইয়া আত্মোপলব্ধির আনন্দে বিভোর হইয়া যাইবে। ইহা কোন এক বিশেষ যুগে বা দেশ বিশেষে আবিষ্কৃত বা সংস্থাপিত হইবে না, কিন্তু তাহা কাল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা কালেরই পরিণতি স্বরূপ প্রকাশ পাইবে।

বেদের ধর্ম্ম, আবেস্তার ধর্ম্ম, কংফুচের ধর্ম্ম, বুদ্ধের ধর্ম্ম, মুশার ধর্ম্ম, য়িশার ধর্ম্ম, শাক্তধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম—যেমটি ছিল ঠিক তেমনটি নাই। পরিবর্ত্তন ও পুনঃ পুনঃ সংস্কারের মধ্য দিয়া তাহার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে—শাখায় প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রবর্ত্তকের ধর্ম্ম, মূলে যাহা ছিল তাহাই আছে, কিন্তু তাহা অনুবর্ত্তীদিগের গ্রহণ করিবার প্রকার ভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। মানবীয় কল্পনা যেমন আদিম মানবের প্রেতপূজা হইতে যুগযুগান্তের সংস্কারের ভিতর দিয়া বেদান্তের সোঽহং তত্ত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তেমনি বর্ত্তমানের কোন ধর্ম্মের রূপই যে অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে না, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ বর্ত্তমানের এই চরম দার্শনিক মতটি যে মানব জাতির সাধারণ বা সর্ব্বগ্রাহ্য ধর্ম্মে পরিণত হইবে তাহাও সম্ভব নয়। যাহা মানবকে পার্থিব জগতের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য করিয়া অতীন্দ্রিয় বোধাতীত জগতে লইয়া যায়, মানব সাধারণ তীর্থযাত্রীদের ন্যায় পাণ্ডার পশ্চাতে সাময়িক সহচর হইয়া তীর্থদর্শনের আনন্দ-লাভ করিতে পারে, কিন্তু আত্মানন্দ লাভের ভরসায় অথবা অনন্ত জীবন লাভ কিম্বা "সোঽহং" উপলব্ধি করিবার সাধনাতেই যে এ জন্মের সারাটি কাল গোঁয়াইবে, তাহার আশা নাই।

মানব-মনের অবস্থা দিন দিন এমন হইয়া আসিতেছে যে, প্রাচীন গোঁড়ামির স্থান সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সংসারে এই গোঁড়ামি আর তাহার আনুষঙ্গিক ভণ্ডামি, ক্রমেই শ্বাসরোধক হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু ইহা এককালে লোপ পাইবারও একটা অন্তরায় এই দাঁড়াইয়াছে যে, প্রাচীন গোঁড়ামি যেখানে হ্রাস পাইতেছে, তথায় নূতন গোঁড়ামি আপনার স্থান করিয়া লইতেছে। মানব জাতির এই মজ্জাগত গোঁড়ামি একেবারে লুপ্ত হইতে আর কত কাল লাগিবে? বোধ হয় সারা কলিযুগটাই লাগিবে।

বৌদ্ধ জগতে অনেক শ্রমণ ও ধর্ম্মগুরুর নিন্দা শুনা গিয়াছে, হিন্দু জগতে বহু দীক্ষাগুরুর কলঙ্ক রটিয়াছে, খৃষ্টান জগতে অনেক ধর্ম্মযাজক ও মঙ্কের ব্যাভিচারাদি সাধারণে বিদিত আছে। কিন্তু বুদ্ধ মহম্মদ খৃষ্ট চৈতন্য রামমোহন রামকৃষ্ণ প্রমুখ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ জীবন ও উপদেশ দ্বারা যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন্ ধর্ম্ম? ভক্তের অতিরঞ্জন ও বর্ণনা বৈষম্যের ভিতর দিয়াও তাঁহাদের জীবনের মূল ধারা অভিন্নই দেখা যায়। তাহা যে আদর্শ ও যে ধর্ম্মই হউক, তাহা গোঁড়ামি নহে। গোঁড়ামিও নহে, বাহ্য অনুষ্ঠান ও ভাষার আবরণে ভণ্ডামিও নহে, আর ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার নামে গুণ্ডামিও নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

দখিনার গান

ওগো—দখিন সমীরণ,
এসেছ ভাই, রঙীন মধুর সুরভি তাই বন।
লোকে বলে গাচ্ছে পাখী
পুষ্পে ভ'রে যাচ্ছে শাখী,
মূলের খবর কেউ রাখে কি? বকায় বিলক্ষণ।
ওগো—দখিন সমীরণ।
আমায় কেবা ভুল বোঝাবে কার কথা বা মানি,
বনের হৃদয়-পঞ্চতারায় বাজাও তুমিই, জানি।
ঐ বীণারাগ শাখায় জাগে
মাতাল করে কানন বাগে
পুষ্প ও নয়, রঙীন রাগে ঝঙ্কৃত স্বপন।
ওগো—দখিন সমীরণ।
গমক তোমার নীড়ে নীড়ে কূজন হ'য়ে বাজে
তোমার সুরই মীড়ে মীড়ে কীচক বেণু ভাঁজে।
ছন্দ তোমার 'গন্ধ'রূপে
ঘুরে বেড়ায় চুপে চুপে,
সুরভি মূর্চ্ছনা তোমার মাতাল করে মন।
ওগো—দখিন সমীরণ।
সুরের মধু জাগ্‌ছে ফুলে জম্‌ছে মধুর চাকে,
ফিরে আবার হচ্ছে মুখর অলির ঝাঁকে ঝাঁকে।
তোমার যত রাগরাগিণী
পরশে ভাই সবায় চিনি
কাঁদায় আমায়, হাসায় আমায়, জাগায় শিহরণ।
ওগো—দখিন সমীরণ।
পঞ্চ শরের বন্ধু, বাজাও পঞ্চ তারা বীণ,
পঞ্চমে তান তুলে গাহো নিত্যই নবীন।
গন্ধ পরশ রূপে রসে
সে সুর আমার মর্ম্মে পশে,
পঞ্চ দুয়ার খুলে প্রাণে করছি আবাহন।
ওগো—দখিন সমীরণ।

শ্রীকালিদাস রায়

"পারে যাবার আর কে আছে?"

প্রকাণ্ড জাহাজটার মধ্যে চূড়ান্ত গোলমাল চলেছে।

গোপন অশ্রু, উচ্ছল কলহাস্য, উত্তপ্ত স্পর্শ-বিনিময়, চিঠি দেবার প্রতিজ্ঞা, ব্যস্ত সারেঙ্ ও খালাসী, দেরী-হয়ে-উদ্বিগ্ন যাত্রীদল।

জনতা থেকে একটু দূরে একটি প্রত্যক্ষগোচর নির্জ্জনতায় জাহাজের রেলিঙ্ ধরে' দাঁড়িয়ে একটি পুরুষ ও নারী পারের দিকে চেয়ে ছিল, যেখানে পঙ্কিল পিছল ঘাটের ওপর পাত্‌লা বাদল টিপ্ টিপ্ করে' ঝরে' পড়ছে।

খুব সুখকর দৃশ্য সেটি নয়। এও সম্ভবতঃ খুব আশ্চর্য্য নয় যে মেয়েটি সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা প্রকাণ্ড গরম জামাটা গায়ে দিয়েও ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠ্‌ছিল পারের দিকে চেয়ে।

"শীত কর্‌ছে, নোরা?" ছেলেটির হাত একমুহূর্ত্তের জন্য মেয়েটির হাতখানি স্পর্শ কর্‌ল।

"বাতাসটা যেন বিঁধ্‌ছে," মেয়েটি বল্‌লে—"কিন্তু আমি ঠাণ্ডা লাগার কথা ভাব্‌ছি না।"

মেয়েটি দাঁত দিয়ে তার নীচের ঠোঁট্ চেপে ধর্‌ল। ছেলেটি তার পানে একবার চেয়ে চোখ্ ফিরিয়ে নিল। সে জান্‌ত, নোরা তার মেয়ের কথা ভাব্‌ছে। ঐ ক্ষুদে শিশুটিই তাদের মধ্যিখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্বামীটা অসভ্য মাতাল, সে ত' অনেক দিনই গ্রাহ্যের বাইরে চলে' গেছে, সুধু সেই এক রত্তি জুঁইফুলের মতো টাট্‌কা খুকীটিই তার জীবনের এই পাঁচ বছর ধরে' ছেলেটির প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অথচ দুরতিক্রম্য বাধা বিস্তার করেছিল।

কিন্তু এখন একান্ত হতাশ ও নিরুপায় হয়ে নোরা ছেলেটির সঙ্গে চলে যাওয়ার অনুরোধে সম্মত হয়েছে। ছোট ছেলে যেমন প্রজাপতির পাখায় হাত রাখে, এম্‌নি করে' অতি আল্‌গোছে ছেলেটি যখন আনন্দকে স্পর্শ করতে পার্‌ছে, তখন কি না নোরা তার কথা না-ভেবে অন্য পুরুষের উপহারদত্ত বঞ্চিত রিক্ত নিঃসম্বল সন্তানের কথা ভাব্‌ছে!

প্রচণ্ড ঈর্ষা তাকে গ্রাস কর্‌ছিল, ক্রোধ এত তপ্ত হয়ে উঠেছিল যে মুখ দিয়ে তার কথা বেরুল না। নোরা তার এই নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করেনি। সে রেলিঙে ভর দিয়ে তন্ময় হয়ে ঘাটের ভিজা শীতল বৃষ্টি-ঝলমল্ পাথরগুলির পানে চেয়ে রইল।

ঝির্ ঝির্ ঝির্—বাদল চলেছে। যেন তার কাছে ছুটে আসবার জন্য কার দু'টি অস্ফুট পদশব্দ!

সে কান্নায় ফুঁপে উঠল; নীল ঘোমটার অন্তরালে তার মুখখানি চোখের জলে ভিজে গেছে। তার পার্শ্বের এই লোকটিকে একমুহূর্ত্তে একান্ত মূল্যহীন বলে' মনে হোল! তার

দুটি বাহু পরম ঔৎসুক্যে কামনা করছিল একটি সুকোমল শাদা ও গোলাপী জামা পরা ক্ষুদে টুক্‌টুকে দেহ, দুটি তুল্‌তুলে পা ও একটি সুডৌল মাথাভরা সোনালি চুলের ঢেউ। এই লোকটিকে মনে হচ্ছিল বিদেশী—অপরিচিত। কিন্তু সে যে তার দেহের মাংস, বুকের হাড়! যৌবনের সমস্ত সুগন্ধ দিয়ে যে সে তাকে রচনা করেছে! অনাগত সুদূরবিস্তৃত ভবিষ্যতে তার কি হবে? যে মা তাকে নির্দ্দয় অনাত্মীয়দের হাতে ফেলে চলে' গেল সে মাকে কি ও ঘৃণা কর্‌বে না?

ঝির্ ঝির্ ঝির্—বাদল সমান তালে ঝ'রে চলেছে।

ওগো, কে যেন অস্ফুট পদধ্বনি তুলে তার কাছে ছুটে আস্‌তে চায়!

কোথা থেকে একটা জলচর পাখী চেঁচাতে সুরু করেছে। কাছের থেকে একটা লোক তীক্ষ্মস্বরে চেঁচাচ্ছিল—"পারে যাবার আর কে আছে?"

আবার চাঞ্চল্য সুরু হোল। ঘাটের কাছে ভিজা ছাতার তলায় আশ্রয় নেবার জন্য সবাই ছুটাছুটি ক'রে বেরুতে লাগ্‌ল। ম্লান মেঘ্‌লা আকাশের দিকে লক্ষ্য করে এখানে সেখানে কয়েকটি রুমাল উড়্‌তে লেগেছে যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের পাপ্‌ড়ি!

এবার জাহাজ ছাড়্‌বে। পাশের ছেলেটা তাড়াতাড়ি তার বাহু দিয়ে মেয়েটিকে বন্দী কর্‌ল। মেয়েটি ঘাড়ের ওপর তার নিশ্বাসের স্পর্শ পেল। ছেলেটি বিজয়গর্ব্বে বলে উঠ্‌ল—"এবার আমাদের ছুটি, নোরা ছুটি, ছুটি।"

তার তপ্ত তীব্র দৃষ্টি যেন মেয়েটির দুটি চোখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি তাকে জোর ক'রে ঠেলে সরিয়ে দিল। সে তাকে ঘৃণা করে—এই অচেনা বিদেশীকে।

"আমাকে যেতে দাও।" নোরা আকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠ্‌ল। ছেলেটি তাকে ধ'রে রাখবার জন্য চেষ্টা কর্‌তে যেতেই মেয়েটি তার সেই দুটি ব্যগ্র লোলুপ হাতে আঘাত কর্‌ল।

"পারে যাবার আর কে আছে?"

শেষ ডাক বেজে উঠ্‌ল আবার।

"হ্যাঁ, আর একজন।"

নিজের গলার স্বর সে নিজেই চিন্‌তে পার্‌ছিল না। সে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে চল্‌ল।

অবশেষে তার দুই উৎসুক পা যখন পারের মাটি স্পর্শ করল, তখন সমস্ত বৃষ্টি বিন্দুগুলি যেন একত্র হয়ে একসঙ্গে বলে উঠ্‌ল—"মা!"—*

শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

---

* লুইস্ হিলগার্স হইতে।

সপ্তর্ষি

[রামমোহন রায়]

সত্যজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, এ বিশ্বচৈতন্যজ্ঞান উদ্বোধিত ভারতের বুকে ;
সে জ্ঞান আছিল গুপ্ত শত শত শতাব্দীর অজ্ঞতার লাঞ্ছনার দুখে।
হে রাম, হে ধনুষ্পাণি, প্রজ্ঞা-অস্ত্রে করি' ভেদ যুগ-যুগ-সঞ্চিত জঞ্জাল,
লক্ষ মুগ্ধ আঁখি পরে উজলিয়া দেখাইলে সে জ্ঞানমাণিক্যরশ্মি জাল।
মূঢ়তা-নিশ্চল এই পাষাণী অহল্যা সম ভারতবর্ষেরে, তুমি রাম,
সঞ্জীবিলে স্পর্শে তব, আজো তব প্রাণাবেগ চিত্তে তার স্পন্দে অবিরাম।

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর]

আলসে বিলাসে নিরাশে যে-দেশ নতপ্রাণ
সেথায় শুদ্ধ পুণ্য যাগের বহ্নিমান
জ্বলিলে, হে বীর, আলস বিলাস ভস্ম ছাই !
দৃপ্ত কঠোর পার্থ অটল, তুলনা নাই।
পিতা তুমি নব বঙ্গের অধিনায়ক নেতা,
দুঃখদলন দুঃখহরণ শঙ্কা-জেতা।
কর্কশ বটে গিরি তবু বুকে প্রস্রবণ,
কর্ম্মকঠোর তব বুকে দয়া সঞ্জীবন।

[মধুসূদন দত্ত]

বিদ্রোহী তুমি, উদ্দাম তুমি শাসনজয়ী,
পদ্মা সমান প্রলয়ঙ্কর পরাণ বহি'
শৈবালদল-রুদ্ধ বঙ্গ-কাব্য-নদী
করিলে সবেগ, উত্তাল ছোটে সে নিরবধি।
গভীর রাত্রে বৈশাখ-মেঘে বজ্রসম
তব মেঘনাদে ছুটালে তন্দ্রা, নাশিলে তম।
বঙ্গের গৃহে নহ তুমি ধীর প্রদীপ-শিখা,
কক্ষে কক্ষে জ্বলিলে তাহার বিজলি-লিখা।

[রামকৃষ্ণ পরমহংস]

আত্মভোলা হে জ্ঞান-ঋষি, পাগল ভোলানাথ,
প্রেমের ডোরে বাঁধ্‌লে যারে কর্‌লে আঁখিপাত।
বাংলা দেশের হৃদয়-কোষে কতই মধু রয়,
তোমার অঝোর প্রেমের ধারায় তাহার পরিচয়।
শুষ্ক-ভারত-বক্ষে তুমি বন্যা দিলে প্রেম,
জ্ঞানের বাণী কর্‌লে সরস, সত্য সাথে ক্ষেম।

ধন্য হল গোটা ভারত, ধন্য ধরাখান।
নিমাই এল ? বুদ্ধ একি প্রেম-সুরভি-মান ?

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

গুপ্ত ছিল ভাষা-গঙ্গা বিস্মৃতি-মহেশ-জটাজালে ;
হে তপস্বী ভগীরথ, সাধনা-উজ্জ্বল টীকা ভালে
নিনাদিয়া শঙ্খ তুমি, সে গঙ্গারে মুক্ত করি' দিয়া
শুষ্ক-বঙ্গ-চিত্ত-ক্ষেত্র প্রাণাঙ্কুরে দিলে সঞ্জীবিয়া।
দিলে রস, দিলে গতি, দিলে হর্ষ, মন্ত্র ও সাধন ;—
একা পার্থ লক্ষজয়ী করে ধর্ম্মরাজ্যের স্থাপন।
না ছিল মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, প্রাসাদ বিরাট্।
সকলি রচিলে বলে, ছত্রদণ্ডে শোভিলে সম্রাট।

[স্বামী বিবেকানন্দ]

আচার-বন্ধন-পিষ্ট জর্জ্জরিত দেশে
দাঁড়ালে পিনাক-হস্ত ভৈরবের বেশে ;
ডাকা ও বিষাণ তব ফুকারি' ফুকারি'
শঙ্কা দিলে ভণ্ডে যত, যত অত্যাচারী।
গুহাগুপ্ত জ্ঞানভেরী—তারে তুলি' নিয়া
মন্ত্রিলে যে বাণী—মুগ্ধ প্রতীচ্যের হিয়া।
বৃদ্ধ ভারতের তুমি দৃপ্ত সিংহশিশু,
ধর্ম্মী কর্ম্মী অতুলন—শঙ্কর ও যীশু।

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

স্নেহকোমল ছায়াশীতল শস্যশ্যামল বঙ্গভূমি,
সে বঙ্গেরি চিত্তখানির মূর্ত্তি যেন জাগ্‌লে তুমি।
স্নেহ আছে, প্রেমও আছে, আছে ছায়া, শ্যামলতা,
কাব্যে তোমার মেঘের মায়া, পদ্মানদীর চপলতা,
ঝিঙের ধ্বনি, শিশুর হাসি, প্রিয়-প্রিয়ার গাঢ় চুমা ;
হাসাও তুমি, কাঁদাও তুমি, নাচাও, বলো—ঘুমা, ঘুমা।
দেশে দেশে সকল মানুষ একটি প্রেমের সূত্রে গাঁথা—
শিখিয়ে দিলে, ধন্য হল প্রেমগরবী বঙ্গমাতা।
মুগ্ধ জগৎ শুন্‌ছে তোমার প্রাণজুড়ানো মোহন বেণু,
সবার ব্যথা বাজ্‌ছে তাতে—আকাশ এবং ধূলিরেণু।
কবির শিরোমণি তুমি, বঙ্গ-ভালে দীপ্ত টীকা,
বিশ্বগেহের আঁধার হরে বঙ্গ-প্রদীপ স্নিগ্ধ-শিখা।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ *

এ বৎসরেও লক্ষ্ণৌয়ে গত বৎসরের মতনই ওস্তাদবৃন্দের সমাগমে নিখিল-ভারত-সঙ্গীত-সম্মেলন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। এবৎসরেও প্রত্যহ তিন বেলাই—সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা—গত বৎসরের মতনই নানাদেশ হ'তে শ্রোতৃবৃন্দ এসে সঙ্গীতমণ্ডপ জম্‌কে তুলেছিলেন। এবৎসরেও অধিকাংশ ওস্তাদই দূর দূর দেশ হ'তে অসাফল্যের তিলক পরবার জন্যে গত বৎসরের মতনই সাগ্রহে এসে হাজিরি দিয়েছিলেন। এবং শেষতঃ এবৎসরেও মাত্র মুষ্টিমেয় জনকয়েক গুণীই কেবল শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দ দেবার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিলেন।

কেবল এবৎসর যেন একটা নতুন উপলব্ধি ধীরে ধীরে আমাদেব মনে উঁকি মেরে একটা সংশয় জাগিয়েছিল। সেটা এই, যে বর্ত্তমান যুগে ঠিক্ এরূপ ভাবে আহূত সঙ্গীত-সম্মেলনের খুব বেশি কার্য্যকারিতা আছে কি না এবং ঠিক এরূপভাবে নির্ব্বাহিত সঙ্গীত-সম্মেলনের raison d'etre—প্রথম কয়েক বৎসর থাকলেও ক্রমশঃ ক'মে যেতে বাধ্য কিনা। কেন এ সংশয় জাগ্‌তে পারে সে সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান প্রবন্ধে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুচারটে কথা একটু খোলাখুলি আলোচনা করার ইচ্ছে আছে। কথাগুলি নিয়ে অনেকদিন থেকেই একটু বিশদ আলোচনা করবার ইচ্ছে ছিল, যাতে ক'রে এবিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতামত পাওয়া যায়; কিন্তু এতদিন ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা হয় নি ভেবেই চুপ ক'রে ব'সে থাকা গিয়েছিল। তবে যেহেতু আজ একটু ভরসা ক'রে বল্‌তে পারি যে ভারতবর্ষের প্রায় সব বড় বড় গায়ক গায়িকার ও যন্ত্রী তন্ত্রীর গানবাজনাই শোনা গেছে, যেহেতু এখন, এ মস্ত সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করলে অন্ততঃ আর যে অভিযোগেই অভিযুক্ত হই না কেন, বর্ত্তমান ওস্তাদিসঙ্গীতের সম্বন্ধে যথেষ্ট-খবর-না-রাখার কলঙ্ক রটবে না ব'লে আশা হয়। এইটুকু গৌরচন্দ্রিকা গেয়েই আরম্ভ করা যাক্।

১৯১৬ সালে বরোদায় নিখিল-ভারত-সঙ্গীত-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। তারপর সবশুদ্ধ আরও চারটি অধিবেশন হয়েছে। আমাদের উচ্চ সঙ্গীতের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে এ কয়টি অধিবেশনের প্রয়োজন ছিল ও তাছাড়া এ-সবের জন্য কার্য্যকারিতাও যে ছিল না এমন নয়। তবে সে-প্রসঙ্গ নিয়ে ইতিপূর্ব্বেই মাথা ঘামানো গেছে ব'লে আজ আর সে চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা অনাবশ্যক। †

---

* প্রবন্ধটি গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে পড়িয়ে শোনাই। সে প্রসঙ্গে তিনি যা যা ব'লেছিলেন আগামী আষাঢ়ের ভারতবর্ষে প্রকাশিত হ'বে।

† বর্ত্তমান লেখকের "ভ্রাম্যমাণের দিন পঞ্জিকা" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

আজ বিশেষ ক'রে অবতারণা করার ইচ্ছে আছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ বিকাশের ধারার প্রসঙ্গ। তদর্থে গোড়ায়ই সেই সংশয়টির উপর একটু জোর দেওয়া দরকার—যে সংশয়ের ছায়াপাতের কথা প্রথমেই গেয়ে রাখা গেছে। সংশয়টি এই, যে ভবিষ্যতে এরূপভাবে সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন আহূত করার প্রয়োজন ও কার্য্যকারিতা ক্রমেই কমে আস্‌তে থাক্‌বে কি না। কমে আস্‌বে মনে করলে দুঃখ হয়ই, কিন্তু তবু যিনিই গত কয়টি সম্মেলনের কীর্ত্তিকলাপ দেখেছেন ও আজকালকার ওস্তাদবৃন্দের মধ্যে সঙ্গীতে সত্য কলাকারু সম্বন্ধে অন্তর্দ্দৃষ্টির গভীর অভাব দেখে ব্যথিত হ'য়েছেন তিনিই বোধ হয় এ প্রশ্নসঙ্কটে প'ড়ে না গিয়েই পারেন না যে ততঃ কিম্‌?

কথাটা এই, যে আমাদের উচ্চসঙ্গীতের ধারার একটা মূলগত পরিবর্ত্তন আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েছে,—তা ওস্তাদি পন্থীরা তাতে যতই কেন না বিদ্রূপ ও আপত্তি ঘোষণা করুন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের উচ্চসঙ্গীতের শোচনীয় অবস্থা একটু পর্য্যালোচনা ক'রে দেখ্‌লে মনে এ খট্‌কা না জেগেই পারে না যে আমরা এযাবৎ কোথায় একটা মস্ত ভুলকে আঁকড়ে সঙ্গীতকলার বিকাশ সাধন করতে অগ্রসর হয়েছি, যার ফলে আমাদের অনুপম সম্পদের এরকম তছনছ-হওয়া সম্ভবপর হ'য়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের উচ্চসঙ্গীত যে দ্রুত রেটে রক্তহীন ও হীনপ্রভ হ'য়ে পড়ছে তাতে আশঙ্কা হয় যে ললিতকলাটির কোরকের কোথায় কীট প্রবেশ ক'রেছে সেটা অবিলম্বে ধরতে না পারলে এ অনবদ্য ফুলটি অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ শুকিয়ে চিরকালের মতন ঝ'রে যাবে। কোথায় যে আমরা মস্ত ভুলটি ক'রে ব'সে আছি সে সম্বন্ধে একটু গোড়া থেকে ভেবে দেখ্‌বার সময় এসেছে ; নইলে আমাদের ওস্তাদি সঙ্গীত উত্তরোত্তর আমাদের কাছে বিস্বাদ ঠেক্‌বেই ঠেক্‌বে, যেমন ইতিমধ্যেই শতকরা নিরানব্বই জন ওস্তাদের গান ঠেকে থাকে। এত বড় কথাটি প্রথম দৃষ্টিতে অনেকের কাছে অত্যুক্তি মনে হ'তে পারে, কিন্তু আজকালকার সঙ্গীত-সম্মেলন ও অন্যান্য আসর প্রভৃতিতে শতকরা নিরানব্বই জন ওস্তাদের লম্ফঝম্পে সাধারণের সম্পূর্ণ অসাড় পাথরের মতন ব'সে হাঁই-তোলার দৃশ্য যিনি দেখেছেন তিনি সম্ভবতঃ একথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। যাঁদের আমাদের ওস্তাদদের দ্বারে গান শেখ্‌বার জন্যে একটু আধটু "ধর্‌না দেওয়ার" অভিজ্ঞতা আছে তাঁদেরও নিশ্চয় মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করার সুযোগ হয়েছে যে আজকালকার শতকরা নিরানব্বই জন ওস্তাদের বস্তুতঃ কোনও ধারণাই নেই যে সঙ্গীত হ'তে মানুষের কি চাওয়া উচিত ও পাওয়া সম্ভবপর। কারণ তাঁরা গেয়ে যান শুধু অভ্যাসবশে, গতানুগতিকতার মাধ্যাকর্ষণের জোরে—আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নয়। একজন বিখ্যাত সঙ্গীতরসিক ব'লেছেন :—"On chante, quand on a besoin de chanter, quand it faut qu'on chante." * আজকালকার ওস্তাদেরা

* "মানুষ যেন গান করে কেবল তখনই যখন গান না ক'রে সে থকৃতে পারে না।"—Jean Christophe (L' Aube)—Romain Rolland.

এ কথার মহিমা উপলব্ধি করা দূরে থাকুক একথা শুনলে হেসেই উড়িয়ে দেবেন। কারণ এক স্বত-উৎসারিত হওয়ার মধ্যেই যে সঙ্গীতের পরম বাণী চরম ভাবে মূর্ত্তিমতী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে একথা কেবল তাঁদেরই কাছে বোধগম্য হ'তে পারে যাঁদের মনে সঙ্গীতের সে-বাণীর অনুরণন কখনও কখনও বেজে ওঠে। কিন্তু হায়, অধুনাতন হিন্দুস্থানী ওস্তাদবর্গের কণ্ঠে তৌর্য্যত্রিকের যে দেবতা অধিষ্ঠাত্রী হ'য়ে বিরাজ ক'রে থাকেন তাঁকে বীণাপাণির অমলধবল মূর্ত্তি ব'লে ভুল ক'রে বসার মতন সহজ বস্তু বোধ হয় সংসারে কমই আছে। অন্ততঃ যাঁরা অট্টধ্বনি মাত্রকেই পৌরুষের পরাকাষ্ঠা ব'লে মনে করতে অভ্যস্ত হ'য়েছেন, তাঁদের পক্ষে এ ভুল ক'রে বসা যে সন্দেশ খাওয়ার চেয়েও সহজ, বাস্তবের প্রতি একবার চোখ মেলে দেখ্‌লে একথা স্বীকার না ক'রেই গত্যন্তর নেই।

অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। তাই হয়ত বা দুএকজন ওস্তাদের মধ্যে সুকণ্ঠের আভাষ কখনও কদাচিৎ মেলে; হয়ত বা তাঁদের এক আধজনের মনের নিহিত প্রদেশে সঙ্গীতের যথার্থ বাণী সম্বন্ধে একটু আধটু অর্দ্ধস্ফুট চেতনার অর্দ্ধ-উন্মীলিত দৃষ্টিপাত দেখা যায়; হয়ত বা—যদিও নিতান্তই দু একজনার মধ্যে—উচ্চ সঙ্গীতের সুষ্ঠু ও সমাহিত বিকাশ সম্বন্ধে একটু আধটু প্রেরণার আলো ও সাধনার প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।—কিন্তু ললিত সঙ্গীতের সঙ্গে উচ্চতর সুষমার (harmony) দুশ্চ্ছেদ্য সম্বন্ধ; মনোহর স্বরবিন্যাসের আবেদনের সঙ্গে সত্য প্রেরণার যোগাযোগ; স্বত-উৎসারিত গীতি-উচ্ছ্বাসের ও সুষ্ঠু সৌকুমার্য্যের পরস্পর নির্ভরতা;—এক কথায় সঙ্গীত আমাদের হৃদয়ের যে কি বৃহৎ আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সাধন করতে পারে সে-সম্বন্ধে গোড়াকার কথা নিয়েও স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা আমাদের ওস্তাদদের নেই। তাঁরা আজকাল গান গেয়ে থাকেন—বুলবুলের মতন আত্মপ্রকাশের আগ্রহ-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নয়, কাকাতুয়ারই মতন শুনে শুনে। ফলে ওস্তাদি সঙ্গীত আজ তার চরম বাণী সম্বন্ধে কোনও আভাষ দিতেও অক্ষম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে (এক নিতান্ত দুএকজন বড় গুণীর ক্ষেত্রে ছাড়া—যাঁদের বরাবর ব্যতিক্রম ব'লে গণ্য করব)। কিন্তু হায়, সত্য সঙ্গীতানুরাগীর মনকে ওস্তাদি-সঙ্গীতের ব্যর্থ লালিকার (parody) স্তোকমহিমাকীর্ত্তনে কতদিন ভুলিয়ে রাখা যায়? তাই আজ সঙ্গীতানুরাগীর মন সর্ব্বত্রই বল্‌তে আরম্ভ ক'রেছে যে "নেতি, নেতি" (এ নয় এ নয়)। কারণ আজ আমাদের সহজ-অনুভূতির (intuition) আলোয় আমাদের মনে ক্রমশই এই বিশ্বাসটি দৃঢ় হ'য়ে উঠ্‌ছে যে সঙ্গীতকলার যথার্থ লীলানিকেতনটি কোথায় তা চিন্‌তে না পারার ফলেই আমরা আজ ভুল রাস্তা বেয়ে এমন কোনও লোকে এসে প'ড়েছি যেখানে সে সঙ্গীত-মেখলা পুরীর নিবিড়তম ঝঙ্কারের মাত্র দুএকটি পলাতক রেশ থেকে থেকে দেখা দিতে পারে। বস্তুত আমাদের দেশে উচ্চসঙ্গীত যে আজ মুমূর্ষু তার কারণ ওস্তাদবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা না-পাওয়াও নয়, জনসাধারণের বিবর্দ্ধমান ঔদাসীন্যও নয়। আমাদের সঙ্গীতের হতশ্রী হবার মূল

কারণ—সঙ্গীত সম্বন্ধে ভূতকালে আমাদের যে যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি ছিল তার লোপ পাওয়া। এই কথাটা আজ সাধ্যমত পরিষ্কার ক'রে বল্‌তে চেষ্টা পাব।

আসল কথা—সঙ্গীত সম্বন্ধে আবার নতুন ক'রে এই মূল প্রশ্নটি তোল্‌বার দরকার হয়েছে যে "সঙ্গীত হ'তে আমরা কি চাই ?"

প্রশ্নটি প্রথম দৃষ্টিতে একটু ছেলেমানুষি-রকম মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ এরকম প্রশ্ন শুন্‌লে প্রথমটায় মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে এ যেন হ'ল অনেকটা আমাদের চিরপরিচিত বুদ্ধি-অবতারের মতন যিনি সাতকাণ্ড রামায়ণ পাঠানন্তর সীতা কার পিতা প্রশ্নে তাঁর সেই উজ্জ্বল জিজ্ঞাসু মনটির পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লেই প্রতীয়মান হবে যে প্রশ্নটি বস্তুত এতটা হাস্যকর নয়। কারণ যখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে আজকালকার শতকরা নিরানব্বই জন ওস্তাদ-অবতার সঙ্গীত-রামায়ণ অধ্যয়ন করতে যাবার সময় পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি-অবতারের চেয়ে বিশেষ গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেন না, তখন তাঁদের সহস্র আপত্তি সত্ত্বেও কোনও না কোনও সময়ে আমাদের আপত্তি ক'রে বল্‌তেই হবে যে ওরূপভাবে সঙ্গীত-কল্পদ্রুমের পাতা উল্‌টোলে তাতে আর যাই মিলুক না কেন সঙ্গীতের মধ্যে নিহিত অমৃত-লোকটির উদ্দেশ যে মিল্‌তেই পারে না এটা ধ্রুব। সঙ্গীত-বারিধি তখনই তার চরম সুধার বাণীটি আমাদের দান করতে পারবে যখন আমরা "যথারীতি" তাকে মন্থন কর্‌তে শিখ্‌ব। নইলে অসুরদের পদাঙ্কানুসরণ ক'রে শব্দাব্ধিমন্থনে প্রবৃত্ত হ'লে ধ্বনিরূপ অমৃত না উঠে যে অট্টরূপ গরল উঠ্‌বার সম্ভাবনাই পনর আনা একথা অন্তত আজ বোধ হয় আর বেশি ক'রে বল্‌বার প্রয়োজন নেই। অন্ততঃ তাঁর কাছে ত নেই-ই যিনি অধুনাতন স্বরবীরগণের আশৈশবমন্থিত হৃৎস্তম্ভনকারী নাদসুধারসধারা বারেকের তরেই পান্‌ ক'রে নীলকণ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছেন।

মানসকণ্ঠে বেশ শুন্‌তে পাচ্ছি যে এরূপ কথায় ওস্তাদ সম্প্রদায়ের পক্ককেশ মুখপাত্র স্নিগ্ধ হেসে বল্‌ছেন " বাপু হে অমৃতং বালভাষিতং শাস্ত্রে ব'লেছে বটে, কিন্তু সব সময়ে নয়। বল্‌তে চাও কি যে তান্‌সেন, বৈজুবাওয়া, গোপাল নায়ক, আমীর খসরু, ওমরাও সদারঙ্গ, ভীমকায় বক্স, মহাকায় জঙ্গ্, হোমরাও সিং, চোমরাও খাঁ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়রা সব বাজে গান গাইতেন ?....আর তুমি...যে তোমাকে পক্ককেশ আমরা সেদিন জন্মাতে দেখ্‌লাম...যে তুমি পরশুদিন হামাগুড়ি দিতে...যে তোমার গণ্ডদেশ মন্থন করলে আজও বোধ হয় দুগ্ধ নিঃসৃত হয়....সেই তুমি কি না..."

এ অমোঘ যুক্তির উত্তরে অবশ্য আমাদের নতশিরে সলজ্জে স্বীকার কর্‌তেই হবে যে এত বড় বড় নামের বারিধি কল্লোলেও যদি বা আমাদের কণ্ঠস্বর একটু শোনা যেত, কিন্তু সেদিন জন্মগ্রহণ করার অমার্জ্জনীয় অপরাধ সম্বন্ধে তাঁদের মতন অনাদি অজন্মার অকাট্য সাক্ষ্যের

সাম্‌নে আমাদের সামান্য যুক্তিবাণ যে নম্রশীর্ষ হ'য়ে পড়বেই পড়বে তাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। অতএব তাঁদেরই জয়। কিন্তু হায়, মন অবুঝ। তাই তার সংশয়াচ্ছন্ন প্রদেশে একটা প্রশ্ন জাগে যে তানসেন সদারঙ্গ প্রমুখ মহা মহা রথীদেরও সে যুগে কেউ কেউ দেখে ফেলার দরুণ তাঁরা একদম মুষ্‌ড়ে গিয়াছিলেন কি না? তাছাড়া তাঁরা যে যশস্বী হয়েছিলেন সেটা কি শুধু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অকাট্য জরাবিজ্ঞতার গতানুগতিকতা প্রিয়তার দরুণ, না প্রতিভার আলোতে নূতন সত্য সৃষ্টির দরুণ? অর্থাৎ এককথায় আসল কীর্ত্তি কিসে—বুড়ো হওয়ায়, না প্রতিভার স্ফুরণে যুগে যুগে নূতন সত্য দর্শনে?

বস্তুতঃ তানসেন সদারঙ্গ প্রমুখ সঙ্গীতকারদের সঙ্গে তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের রচনার তুলনা করলে মনে হয় নাকি যে তাঁরা তাঁদের একটা বড় উপলব্ধি সঙ্গীতে মূর্ত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন,—তাঁদের যে অবদানটি আজ আমরা প্রায় খুইয়ে ব'সে আছি? তানসেন প্রমুখ ধ্রুপদীর বাহার, দরবারী, মিঞামল্লার প্রভৃতি রাগের অপূর্ব্ব সৃষ্টি; খসরু সদারঙ্গ প্রমুখ খেয়ালীর খেয়ালের মনোরম ধারাবিকাশের অপূর্ব্ব প্রেরণা, শোরী-হমদম প্রমুখ টপ্পাকারের ললিত স্বরলহরীলীলা-প্রবর্ত্তনের অনুপম দৃষ্টান্ত;—সবই সাক্ষ্য দেয় ললিতকলা জগতে একটি মস্ত সত্য উপলব্ধির। সেটি এই যে সে-সময়ে তাঁরা সঙ্গীতের গঙ্গোত্রীকে প্রবাহিত রেখেই তার সার্থকতা-সাধন ক'রেছিলেন, পুরাতনকেই কায়মনোবাক্যে আঁকড়ে ধ'রে নিশ্চিন্তভাবে ব'সে থাকেন নি। তাঁরা সঙ্গীতে একটা সত্য অবদান দিয়ে যেতে পেরেছিলেন এই জন্যে যে একদিকে যেমন শিল্পি-হৃদয়ের সবুজ প্রেরণাকে যথার্থভাবে গ্রহণ ক'রে তাকে নব নব প্রণালীতে চালিত করবার তাঁদের ক্ষমতা ছিল, অপর দিকে তেম্‌নি তাঁদের নূতন প্রাণের আমদানীতে স্বাগত সম্ভাষণ করবার সত্য দৃষ্টি ও উদারতাও ছিল। নূতনকে অভিনন্দন করার ও হৃদয়ের সৌন্দর্য্যানুভূতিকে সরস রাখ্‌বার যে একটা জীবন্ত শক্তি তখন আমাদের সভ্যতার মধ্যে ছিল সেটা আগেকার সংস্কৃত শাস্ত্রাদি থেকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বড় সুন্দর প্রমাণ ক'রেছেন।*

কিন্তু আজকালকার হোমরাও খাঁ ও চোমরাও বক্সের মধ্যে না আছে ভূত যুগের স্রষ্টা গুণীর অবিসংবাদিত প্রেরণা, না আছে তাঁদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি। থাক্‌বার মধ্যে আছে কেবল তাঁদের নামের দাপটটি মাত্র। কিন্তু ভূতযুগের এসব গুণীর গুণপণা না থাক্‌লে তাঁদের নজীর শিঙা বাজিয়ে জাহির করেও কিছু ফল হবে না, বা তাঁদের অভ্রান্ততাকে বেদীতে বসিয়ে পূজা করলেও চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে না। তাঁদের সৃষ্ট প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্‌তে হ'লে চাই—নম্রসাধনা, অট্ট হুহুঙ্কার নয়; চাই সত্য প্রেরণা, মাছিমারা অনুকরণ নয়; চাই নূতন স্বরবিন্যাসের মধ্যে সত্যকে স্বীকার করার নির্ভীকতা, তামসিকতার প্রণোদনায় সঙ্কীর্ণ

* তাঁর "The Modern Hindustani Raga System and the Simplest Method of Studying the same" নিবন্ধ দ্রষ্টব্য·········the Report of the 4th All India Music Conference.

গতানুগতিকতা নয়। কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জন ওস্তাদ আজ প্রেরণাহীন, চিন্তাহীন, অন্তর্দৃষ্টি-হীন। তাই তাঁদের দ্বারা আমাদের যুগ সঞ্চিত ও সাধনা-অর্জ্জিত সম্পদের আর শ্রীবৃদ্ধিসাধন সুদূর-পরাহত না হয়েই পারে না।*

একথায় অনেকে ক্ষুণ্ণ হ'তে পারেন। হয়ত অনেকে বল্‌তে পারেন যে আমাদের ওস্তাদদের প্রতি এতটা কঠোর রায় দেওয়াতে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। কিন্তু বস্তুত আমাদের ওস্তাদ সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণচিত্ততা যে কি বিস্ময়কর রকমের গভীর হ'তে পারে সে পরিচয় যে ভুক্তভোগীই একবার পেয়েছেন তিনিই স্বীকার কর্‌বেন যে জগতে সঙ্গীতের ন্যায় এমন একটা মহান্ ললিতকলার সাধক হবার পক্ষে এরূপ অনুপযুক্ত সেবায়েৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ অবধি আর কখনও সৃষ্ট হয় নি। অবশ্য একথায় কেউ যেন ভুল না বোঝেন। অধুনাতন ওস্তাদেরা যে আমাদের সঙ্গীতের চর্চ্চা রাখার দরুণই আজও তা বেঁচে আছে একথা ভুলে যাবার মতন অকৃতজ্ঞ যেন আমরা কখনও না হই। কিন্তু তাঁদের কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ থেকেও সত্যের খাতিরে বল্‌তেই হয় যে এ মহান্ উত্তরাধিকার সম্পদ বহন করার তাঁরা উপযুক্ত নন। কারণ এক কথায় তাঁরা আজ আর আগেকার মতন সৌন্দর্য্যের সাধক নেই, তাঁরা আজ সে ভূতগৌরবের নিস্তেজ পতাকাবাহী মাত্রে পর্য্যবসিত।

একথাটা স্পষ্ট ক'রে তোলার জন্যে একটু আলোচনা করা অবান্তর হবে না যে অধুনাতন ওস্তাদদের শতকরা নিরানব্বই জনের কালোয়াতির মধ্যে সঙ্গীতানুরাগী কি পেয়ে থাকেন।

(১) প্রথমতঃ পেয়ে থাকেন—তাঁদের ঢঙে নূতনত্বের একান্ত অভাব। একজন ওস্তাদের মুলতান আলাপকে আর দশজন ওস্তাদের মুলতানেরই প্রায় নকল বলা যেতে পারে। অথচ আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একটা মস্ত গৌরবই এইখানে (যে গৌরব য়ুরোপীয় সঙ্গীত এমন ভাবে করতে পারে না) যে প্রতি রাগের মধ্যে প্রতি শিল্পীর একটা অপূর্ব্ব স্বাধীনতা আছে—তাঁর ব্যক্তিত্বের পরশটি দেবার ও সুষমানুভূতি বিশেষ ক'রে ফুটিয়ে তুলবার। এককথায় আমাদের সঙ্গীত সীমার মধ্যে অসীমের বিকাশের এক মহিমময় দৃষ্টান্ত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আজকের সাধারণ ওস্তাদের মধ্যে সে অসীমের আকাঙ্ক্ষা কোথায়—যা নিত্য নিয়ত ললিতকলার মধ্যে সসীম হ'য়ে ধরা দেবে? জিজ্ঞাসা করি তাঁদের মধ্যে সে সবুজ অনুভূতি কোথায়—যা যুগে যুগে লোকে লোকে বর্ণে, ছন্দে, গানে নিতুই নব গরিমায় রঞ্জিত হ'য়ে বিকাশ পেয়ে থাকে? এক কথায় জিজ্ঞাসা করি তাঁদের মনে সে সবুজ প্রেরণা কোথায় যার অভাবে ললিতকলার রস-উৎসকে সঞ্জীবিত রাখা অসম্ভব? খেয়ালে যদি বা ওস্তাদদের মধ্যে

* অবশ্য (পূর্ব্বেই ব'লেছি) দুচারজন সত্য গুণীকে আমি ব্যতিক্রম হিসেবেই চোখের সাম্‌নে রেখে একথা বল্‌ছি। কেন তাঁদের ব্যতিক্রম ব'লে গণ্য করা চলে সে আলোচনা পরে কর্‌ব।

একটু আধটু বৈচিত্র্য দেখা যায়, কিন্তু আজকালকার ঠুংরি টপ্পা গজল যে কি অসম্ভব রকম একঘেয়ে তা অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন।

(২) অধুনাতন ওস্তাদি গানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—তাঁদের গানের অনন্ত পুনরুক্তি। অনুপম গায়ক আবদুল করিম বা গুণিশ্রেষ্ঠ বীণকার শেষণের মতন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রাগের মধ্যে নতুন নতুন বৈচিত্র্য আনার ক্ষমতা বা প্রেরণা ওস্তাদদের মধ্যে বোধ হয় 'লাখে না মিলল এক' বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কথা উঠতে পারে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর প্রতিভা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই বিরল। মানি—(যদিও পাশ্চাত্য জগতে আমাদের দেশের মতন বিরল নয়)—কিন্তু এখানে কি প্রশ্ন করা চলে না যে যার সে প্রতিভা নেই সে কেন সিদ্ধান্ত ক'রে বসে যে সে প্রতিভা তার আছে,— যার ফলে প্রতি ওস্তাদই একবার গান করতে আরম্ভ করলে অনন্তকাল ধ'রে গাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প ক'রে জমি নেন ও সে-ইচ্ছায় প্রশ্রয় পান? নিজেকে অবশ্য সকলেই কমবেশি বড় ক'রে দেখে থাকেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও অহমিকার হাস্যকরতারও ত একটা সীমা আছে। God's plenty কম গুণীর মধ্যেই থাকে সত্য, কিন্তু যার ভাগ্যে সে অপর্য্যাপ্ত সম্পদের পরিবর্ত্তে মা ভবানী অতি স্পষ্ট ভাবে আবির্ভূতা হ'য়ে থাকেন তার পক্ষে সে রিক্ততাকে নিয়ে আড়ম্বর করতে যাওয়া কি একটা মস্ত বিড়ম্বনা নয়? এক কথায় যার যেটুকু বল্‌বার আছে তার সেটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হবার শিক্ষা পাওয়া দরকার। আজকাল ওস্তাদি গানের এই সমাপ্তিহীন সুরতালের বাহ্বাস্ফোটনের দ্বারা যে ওস্তাদ সম্প্রদায় সুকুমার সঙ্গীতানুরাগীকে কতখানি প্রতিহত ক'রে থাকেন সেকথা কে না জানেন? নইলে অনেক ওস্তাদ আছেন যাঁদের গানে অন্ততঃ খানিকটা পরিচারু তৃপ্তি মিল্‌তে পারত। গুণী নিজের ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে সচেতন হ'লে তাতে জীবনে অনেক যন্ত্রণার লাঘব হয়—যেটা এই দুঃখবহুল জগতে বড় কম কথা নয়। নিজের সীমা বজায় রেখে আন্তরিক ভাবে গান করলে যে গান বেশ একটা সত্য তৃপ্তি দিতে পারে তার প্রমাণ অনেক সময় বালকবালিকার মুখে সাদাসিদা গানেও মেলে। কারণ শিশু বিনয়ের সঙ্গে গান করে ব'লে নিজে যা লোকের চোখে তার চেয়ে বড় ব'লে প্রতিভাত হবার প্রয়াস পায় না, যেখানে কালোয়াত বস্তুতঃ নিজের দীন পুঁজিকেই রং চং মাখিয়ে নানামূর্ত্তিতে জাহির করতে চেষ্টা পেয়ে বেমালুম ধরা প'ড়ে যান। ছদ্মবেশ অনভিজ্ঞকে প্রবঞ্চনা করতে পারে বটে কিন্তু বিশেষজ্ঞের কাছে তা অতি স্বচ্ছ না হ'য়েই পারে না। আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একটা প্রধান গরিমা—তার মধ্যে স্বর বিস্তারের অনুপম স্বাধীনতা। কিন্তু হায়, সত্য সম্পদ চিরবাঞ্ছিত ব'লেই তার অপব্যবহারের দৃশ্য একটা মস্ত বড় ট্রাজিডি। আমাদের সাধারণ ওস্তাদের অফুরন্ত তানের গোলক ধাঁধায় প'ড়ে যে ভুক্তভোগীর চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয় নি তিনি বুঝবেন না কত দুঃখে শরৎচন্দ্র একবার কোনও ওস্তাদের গান শুনতে অনুরুদ্ধ হ'য়ে

আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন ওস্তাদটি থামেন কিনা। লক্ষ্ণৌয়ে ওস্তাদের পর ওস্তাদ এসে যখন তাঁদের একঘেয়ে একটানা বিরক্তিকর তানের পর তান দিয়ে চ'লেছিলেন তখন তাঁদের প্রতি সত্য সহানুভূতি সমন্বিত শ্রোতারাও শেষটায় তাঁদের হাততালি দিয়ে উঠিয়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। অথচ আশ্চর্য্য এই যে এ-সব ওস্তাদদের অধিকাংশই বোঝেন না যে যথাসময়ে থামার আর্টটি জান্‌লে তাঁরা তাঁদের যথার্থ কৃতিত্বের অন্ততঃ প্রাপ্য সম্মানটিও পেতেন।

(৩) ওস্তাদি গানের তৃতীয় ত্রুটি—ওস্তাদদের সৌষ্ঠব বা সঙ্গতি জ্ঞানের অভাব। এ ত্রুটিটি শ্রেষ্ঠতম গুণীর মধ্যেও দেখা যায়, সাধারণ গুণীর কথা ত ছেড়েই দেওয়া যেতে পারে। অনেক গুণী আছেন যাঁরা গানটির প্রথম কয়েকটি তানালাপ হয়ত অতি পরিচারু ভাবে ক'রে থাকেন, কিন্তু তারপরই হঠাৎ এমন স্বরবিন্যাসের আমদানী ক'রে বসেন যার মধ্যে আর যাই থাকুক না কেন কলাকারু বা সত্য অনুভূতির যে নামগন্ধও থাকে না সেটা ধ্রুব। বিখ্যাত গুণী ফৈয়াস খাঁর মুখে ওয়াজিদ আলি শার সিংহাসনচ্যুত হবার সময় রচিত একটি প্রসিদ্ধ গান * শুন্‌তে শুন্‌তে একথা বড় বেশি ক'রে মনে হ'য়েছিল। স্থানে স্থানে তাঁর পদবিন্যাস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও তখন শ্রোতার সমগ্র মন তাঁর গুণপনার জন্য এক গভীর কৃতজ্ঞতারসে ভ'রে ওঠে। কিন্তু ঠিক যে সময়ে মনটি বিভোর হ'য়ে এসেছে সেই সময়ে ফৈয়াস খাঁ প্রভু হয়ত এমন এক বিরাট হুহুঙ্কার ছাড়লেন যার ফলে মুগ্ধ মনের স্নায়ুর মধ্য দিয়ে একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ বহে যায় বটে, কেবল তাকে ঠিক্ পুলক শিহরণ সংজ্ঞা দেওয়া চলে না এই যা দুঃখ। কারণ সুস্থ সবলকায় পুরুষকেও সে নাদ কস্‌রতে শিহরিত হ'তে দেখা গেছে—অবলা নারীর কথা ত ছেড়েই দেওয়া যাক্। এরূপ সময়ে মনে হয় এক রকম ট্রাজিডির কথা যে শ্রেণীর ট্রাজিডি মানুষ সৃষ্টি করতে পারে কেবল এক বিশেষ শ্রেণীর উন্মাদনার কবলে প'ড়ে—চিকিৎসাশাস্ত্রে যার নাম 'মনোম্যানিয়া'। অর্থাৎ সবই ছিল, কি না হ'তে পার্‌ত—এমন সময়ে মানুষ যেন হঠাৎ কি এক ভূতাবিষ্ট হ'য়ে স্বরোপিত ঘরবাড়ী বাগানে আগুন ধরিয়ে সব পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিল। যার কিছুই নেই, তার নিঃস্বতা বড় জোর করুণা উদ্রেক করতে পারে, কিন্তু যে বিধাতার কাছ থেকে যথার্থ সম্পৎ পেয়েও তা হেলায় হারায় তার জন্যে যে দুঃখ বোধ করা যায় সে দুঃখের তলস্পর্শ করা বোধ হয় একটু কঠিন। গানের রসটি বেশ সুন্দর ফুটে উঠেছে; শ্রোতার মন গুণীর মনের সঙ্গে একটা গভীর যোগসূত্র খুঁজে পেতে ব'সেছে; মনটা সবে মাত্র গুণগুণিয়ে উঠ্‌তে আরম্ভ ক'রেছে; হৃদয় যেন তার কোন্ এক বহুদিন-বাঞ্ছিতের পরশের আভাষটি মাত্র পেতে আরম্ভ ক'রেছে;—এমন সময়ে অট্টনাদ ও হুহুঙ্কারের প্রভঞ্জনে কোথায় বা গেল সেই স্নিগ্ধ সৌরভের দাক্ষিণ্য, কোথায় বা গেল সেই সুরকরোজ্জ্বল

* বাবুল মোরা নইয়ার ছুটা যায়—অর্থাৎ পিতা আমার সবই যেতে ব'সেছে রাগিণী ভৈরবী—পণ্ডিত ভাতখণ্ডের স্বরলিপি পুস্তক ২য় ভাগ দ্রষ্টব্য।

ক্ষণে-ক্ষণে-পরিবর্ত্তনশীল তৃপ্তিরস, আর কোথায় বা গেল সেই ধ্বনি-লহরীলীলার অনির্দ্দেশ্য নৃত্যবিভোর কিরণ-সম্পাত!

(৪) ওস্তাদি সঙ্গীতের চতুর্থ ত্রুটি—ওস্তাদদের কণ্ঠস্বরের উৎকর্ষ-সাধনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে একান্ত ঔদাসীন্য। এটি বস্তুতঃ বর্ত্তমান ওস্তাদি সঙ্গীতের একটা মস্ত ত্রুটি। তাই এ সম্বন্ধে দু'একটি কথা একটু বিশদ ক'রে বলা দরকার।

কথাটা এই যে আমাদের ওস্তাদদের মধ্যে খুব বেশির ভাগ গায়কের কণ্ঠস্বর যে অমিষ্ট এটা একটা নিতান্ত নৈমিত্তিক (accidental) ব্যাপার নয়। প্রতি জাতি ও সভ্যতার ললিতকলার বিকাশের মূল ধারাটি তার কলা সম্বন্ধে নিহিত মনোভাবেরই ফল। প্রতি সৃষ্টির জন্ম ও বিকাশ মূলতঃ স্রষ্টার প্রতিভার উপর নির্ভর করলেও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার আনুকূল্য বিনা তার বীজ সহজে ফসল ফলাতে পারে না। একজন বড় চিন্তাশীল ইংরাজ দার্শনিক ব'লেছেন যে আমেরিকার আবহাওয়া আর্টিষ্টের বিকাশের চেয়ে লক্ষপতির উদ্ভবের পক্ষে বেশি অনুকূল ব'লে সে দেশে আর্টিষ্টের চেয়ে লক্ষপতির জন্মই বেশি হচ্ছে; ও পক্ষান্তরে পেলোপলিসান যুদ্ধের আগে গ্রীসে ও রেনেসাঁসের সময়ে ইতালীতে কলাকারুর একটা নবজন্ম হওয়া সম্ভব হ'য়ে ছিল শুধু এই জন্যে যে তথাকার জনসাধারণ শিল্পীর আদর জান্‌ত। একথাটা সম্পূর্ণ সত্য হোক্ বা না হোক্ এটা ঠিক্ যে যে-দেশে যে-গুণের কদর বেশি সে-দেশে সে-গুণের বিকাশ সহজতর হ'য়ে ওঠে। এখন; আমাদের দেশে উচ্চ-সঙ্গীতের বর্ত্তমান অবনতির যুগে মধুরতার ও সত্য কলাকারুর আবেদনের চাইতে কালোয়াতির আদরই যে বেশি একথা প্রতি সঙ্গীতপিপাসু ভুক্তভোগীই জানেন। অনেকটা এই কারণেই আমাদের উচ্চ সঙ্গীতে উদাত্ত কণ্ঠস্বর ও মিষ্ট স্বরভঙ্গীর চেয়ে অশ্রান্ত একঘেয়ে লম্ফঝম্ফ ও বিস্ময়কর গলাবাজিরই প্রতিপত্তি বেশি হ'য়ে পড়েছে। আমি একাধিক ওস্তাদ জানি যাঁরা শুধু যে নিজেদের স্বাভাবিক সুকণ্ঠ গলাবাজির অতিচারে নষ্ট ক'রেছেন তাই নয়, তাঁদের শিষ্যবর্গকেও কণ্ঠস্বরের সৌকর্য্যসাধন করা সম্বন্ধে উদাসীন হ'তেই শিক্ষা দিয়ে থাকেন।*

কথা উঠ্‌তে পারে যে কণ্ঠস্বর মিষ্ট বা অমিষ্ট হওয়ার উপর ওস্তাদদের কোনও হাত নেই ব'লেই হয়ত তাঁরা এ বিষয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে কেবল সেই সব সঙ্গীত-নৈপুণ্য অর্জ্জন কর্‌বার প্রয়াস পান যা সাধনায় লব্ধব্য। এ যুক্তি যে ভিত্তিহীন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে একথা যদি সত্য হ'ত যে ওস্তাদরাও সুকণ্ঠের দাম দেন তা'হলে তাঁরা প্রায়ই বিধাতৃদত্ত সুকণ্ঠ পেলে অত্যধিক গলাবাজির ফলে তা নষ্ট ক'রে বস্‌তেন না। বস্তুতঃ আমাদের ওস্তাদ সম্প্রদায়ের নিহিত মনোভাবটিই হচ্ছে এই যে সত্যকার প্রশংসার জিনিষ মিষ্টত্ব বা আন্তরিকতা নয়,—

* মদীয় "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

রাগজ্ঞান ও বাহাদুরি। একজন ওস্তাদিপন্থী তাই একবার আমাকে আক্রমণ ক'রে এমন কথাও অম্লান বদনে লিখেছিলেন যে কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা বর্দ্ধন করবার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই, যেহেতু উচ্চসঙ্গীতে সুকণ্ঠের মূল্য চিন্তাশীল নিবন্ধে সুন্দর হস্তাক্ষরের চেয়ে বেশি নয়। এই মনোভাবটি আমাদের দেশের সমজদার মহলে অনেকটা চারিয়ে আছে বলেই আমরা কণ্ঠস্বর যে সাধনায় সুন্দরতর করা যায় সে সম্বন্ধে গোড়াকার তথ্যগুলিও জান্‌বার কখনও চেষ্টা করি নি। পক্ষান্তরে য়ুরোপে সুকণ্ঠ না হ'লে গায়ক গায়িকার প্রতিপত্তিলাভ অসম্ভব হ'য়ে পড়ার দরুণ য়ুরোপীয়েরা কণ্ঠসাধনা সম্বন্ধে বহুবর্ষব্যাপী যত্ন নেওয়াকেও পণ্ডশ্রম মনে করে না, একথা অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন।

বস্তুতঃ কণ্ঠস্বরের কমনীয়তা ও হৃদয়স্পর্শিতার অভাবে গানের ভিতরকার রসটি কখনই পরিচারুভাবে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না, যেমন চিত্রকলায় বাজে রঙের ব্যবহারে চিত্রের সৌন্দর্য্য চিত্রকরের আদর্শের কাছে পৌঁছতে পারে না। সঙ্গীতে আমরা এই উজ্জ্বল তৃপ্তি-রসটি পেতে চাই না বলেই সে রসও আমাদের কাছে ধরা দেয় না। কেন না ভাল জিনিষ শুধু যে না চাইলে পাওয়া যায় তাই নয়, পেতে হলে তার মূল্য দিতে শিখ্‌তে হয়। কণ্ঠস্বরের সৌন্দর্য্যের উত্তরোত্তর বিকাশ সাধন করা বা স্বাভাবিক সুকণ্ঠ পেলে তা বজায় রাখা সাধনা ও যত্নসাপেক্ষ—যে সাধনা ও যত্নের প্রতি ওস্তাদ সম্প্রদায় সচরাচর উদাসীন। কেন না তাঁরা গানে অন্য গুণপণাকেই বড় ক'রে দেখেন।

(৫) কিন্তু কণ্ঠস্বর অমিষ্ট হলে'ও--গানে অনেক সময় আনন্দ পাওয়া অসম্ভব নয় যদি তার মধ্যে আর্ট থাকে (যদিও সে আনন্দ সুসম্পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না)। অর্থাৎ অমিষ্ট কণ্ঠের ভাল গানেও সমজদার একটা সত্য রস পেয়ে থাকেন—একথা অস্বীকার করা চলে না। কারণ আপাতঃ শ্রুতিসুখকর আবেদনকে যে শিক্ষার ফলে একটু ছোট ক'রে দেখা যায় এই সাক্ষ্যই সমজদার ও অসমজদারের রসগ্রাহিতার প্রকৃতিভেদের মূল কারণ।* তাই যে ওস্তাদ সুকণ্ঠের যথেষ্ট দাম দেন না তাঁর মনোভাবটি দুর্ব্বোধ্য নয়। কিন্তু তাঁদের যে মনোভাবটির সদর্থ বোঝা সত্যিই দুরূহ সেটি হচ্ছে এই যে তাঁরা প্রায়ই মনে ক'রে ব'সে থাকেন যে গানের প্রাণবস্তুটি হচ্ছে--শুধু সুরকে নিয়ে লম্ফঝম্প ক'রে অসাধ্যসাধন করা। এক কথায় আজ কালকার ওস্তাদি সঙ্গীতের সব চেয়ে বড় ত্রুটি বোধ হয়—তাঁদের গানে আন্তরিকতার একান্ত অভাব। খুব কম ওস্তাদই খবর রাখেন যে গানের প্রাণবস্তুটি নিছক্ স্বরনৈপুণ্যের অতিরিক্ত। এই কথাটি একটু পরিষ্কার ক'রে বলবার চেষ্টা পাওয়া দরকার।

* কর্কশকণ্ঠের ওস্তাদি গানে সমজদার যে সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পান অসমজদার তা পান না এই জন্য যে সে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা কম বেশি শিক্ষা সাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি তাঁর "কেকাধ্বনি" প্রবন্ধে বড় সুন্দর দেখিয়েছেন।

সঙ্গীতে নিছক বাহাদুরিকে শ্রেষ্ঠ আর্ট ব'লে ভুল করার একটা প্রলোভন সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই সত্য কলাকারুর একটা মস্ত পরিপন্থী হ'য়ে এসেছে। অর্থাৎ দুঃসাধ্য সাধনের দ্বারা বাহবা পাবার লোভ শিল্পীকে অনেক সময়েই একটা মস্ত সত্যের প্রতি অন্ধ করে দেয় বা অবহেলা করতে শেখায়। সে সত্যটি এই যে শিল্পী সৃষ্টি করবার সময়ে যে পরিমাণে বাহবা পাবার বা বাহাদুরি দেখাবার লোভে আটক পড়েন তিনি সেই পরিমাণে নিজের অনুভূতির সত্য পরশ হ'তে বঞ্চিত হ'ল। কারণ ললিতকলার লক্ষ্য—আত্মপ্রকাশ, গুণপনা জাহির ক'রে ক'রে পেখম তুলে বেড়ানো নয়।*

এখন আত্মপ্রকাশ—self-expression—মানে কি? তার মানে এই যে শিল্পীর সমগ্র চৈতন্য তাঁকে বলে যে প্রেরণার অনুভূতির পবিত্র মুহূর্ত্তে তাঁর অন্তরলোকে যে বাণী জন্মপরিগ্রহ করে তাকে তাঁর সৃষ্ট শিল্পকলায় বিকশিত ক'রে তোলাই তাঁর বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য, এবং এই বাণীকে প্রকাশ করার নামই—শিল্পকলায় আত্মপ্রকাশ।

কিন্তু আমাদের অধুনাতন ওস্তাদদের গানে যেটা সব চেয়ে মনে আঘাত করে সেটা হচ্ছে এই যে তাঁদের কোনও বাণী থাকা ত দূরের কথা সঙ্গীতে বাণী বল্‌তে যে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে কোনও অর্দ্ধস্ফুট ধারণাও তাঁদের নেই। মাথা নেই তার মাথাব্যথা। যার কোনও সৌন্দর্য্য বা প্রেরণার অনুভূতিই হয় নি সে তার শিল্পে সত্য সৃষ্টি করবে কেমন ক'রে? সে পারতে পারে বড় জোর দু'চারটে কলের-মতন স্বরবিন্যাস জাহির ক'রে বিজ্ঞভাবে গুম্ফদেশে চাড়া দিতে ও সহজবিশ্বাসী ভক্তের চালকলারূপ নৈবেদ্য পেতে। বস্তুতঃ আজ শতকরা নিরানব্বই জন ওস্তাদ যা গান করেন তা যে অনুভব করা বিন্দুমাত্রও দরকার মনে করেন না সেটা তাঁদের কলের-মতন গান-করার দৃশ্যে কি অতি সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না? অথচ একই স্বরবিন্যাসের মধ্যে এই অনুভূতি-আন্তরিকতার ফলে যে আকাশ পাতাল তফাৎ হ'য়ে থাকে সে কথা কোন্ রসবেত্তা না জানেন? আর্ট হচ্ছে হৃদয়ের একটা গভীর আবেগের মনোজ্ঞ স্ফুরণ।† কাজেই যার মনে আবেগই হয়নি সে তার শিল্পে তাকে ফুটিয়ে তুল্‌বে কেমন ক'রে?

* সব দেশেই এই কথাটা শিল্পী ও সমজদার উভয়েই প্রায় ভুলে গিয়ে থাকেন, যেজন্য হার্ব্বার্ট স্পেন্সার আক্ষেপ ক'রে লিখেছেন: An extraordinary piece of vocalization or a display of marvellous gymnastics on the violin brings a round of applause.

—Purpose of Art—Facts and Comments.

† অবশ্য একথা বলার মানে নয় যে সব আবেগের বিকাশই আর্টের পর্য্যায়ে পড়তে বাধ্য। শিল্পকলা জগতে Æsthetics (রসবস্তু) ও Emotion (আবেগ) দুটি উপাদানকে আলাদা আলাদা সংজ্ঞা দেওয়া হ'য়েছে। তাই সব æsthetics অনুভূতির মধ্যে emotion এর অনুভূত থাকলেও সব emotion এর অনুভূতিই যে æsthetic হবেই হবে এমন কোনও কথা নেই।

এই আন্তরিকতার অভাবেই আমাদের অনুপম উচ্চসঙ্গীত আজ এত রসহীন ও বিস্বাদ হ'য়ে প'ড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজকের দিনে ওস্তাদি সঙ্গীতের ধারা এমনই গতানুগতিক ও বিশুদ্ধ বাহাদুরি-সর্ব্বস্ব হ'য়ে উঠেছে যে সহজে তার কোনও মূলগত পরিবর্ত্তন বা বাঞ্ছনীয় সংস্কারসাধন অত্যন্ত দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়েছে।

(৬) তা ছাড়া, অনেকগুলি ছোট খাট কারণেও ওস্তাদদের মধ্যে অধিকাংশের গানেই আজকাল একটা নিবিড় রস ফুটে উঠতে পারে না। যেমন হয়ত রস নিবিড় হ'য়ে ওঠে-ওঠে—এমন সময়ে ওস্তাদের হঠাৎ ধনুষ্টঙ্কার হ'ল; হয়ত সুরের কলধ্বনি সবে প্রেরণার জোয়ারে সাড়া দেয়-দেয়—এমন সময়ে ওস্তাদপ্রবর সশব্দে সমের মাথায় লাফিয়ে উঠ্‌লেন বা অদৃশ্য আততায়ীকে অনর্থক বিরাট ঘুষি মেরে বস্‌লেন; হয়ত সুরের দু একটী মূর্চ্ছনা-মলয়-পরশে মনের নিভৃত প্রদেশে ফুল ফোটে-ফোটে,—এমন সময়ে ওস্তাদজী তবলচির প্রতি অগ্নিময় ভ্রূভঙ্গী ক'রে সমস্ত আবহাওয়াটাকেই বদ্‌লে দিলেন, অথবা চপল বাহবা দিয়ে সব বরবাদ ক'রে দিলেন।

আগামীবারে সমাপ্য

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

আলো ও ছায়া

হাসির ধ্বনি, বাঁশীর ধ্বনি মা মেনকার ঘরে,
আজ্‌কে যে তাঁর প্রভাত হ'ল সারা বরষ পরে,
গৌরী ধনে পাবেন কোলে,
সে উল্লাসে হৃদয় দোলে,
তবু কিসের দুঃখে তাঁহার চক্ষে সলিল ঝরে?
—বিজয়ারই বিদায়-ব্যথায় মন যে কেমন করে।

স্নেহের রবির অমল আলো পেয়ে মায়ের বুকে
স্নিগ্ধ হাসির শুভ্র কমল ফুটল' উমার মুখে,
তবু যেন থাকি' থাকি'
খুঁজছে কারে কাতর আঁখি,
—গৌরী-হারা পাগল-পারা শঙ্করেরই দুখে
মেঘের ছায়া পড়ল' যে এই মিলন-আলোর সুখে।

হোথায় ভোলার দুয়ার খোলা, নাইক আঁটা-আঁটি,
ভৃঙ্গী বাটে, নন্দী ঘোঁটে সিদ্ধি বাটি-বাটি,
লক্ষ্মীছাড়ার ভাঁড়ার ঘরে
ময়ূর, ইঁদুর লড়াই করে,
রান্নাঘরে কান্নাহাটি, গৃহস্থালী মাটি,
—সে সব ভুলি' ভাবছে শূলী সুখের বিজয়াটি।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

খেয়ালী

৬

সুবোধের সহিত বিবাহে সীতার অসম্মতি জানিতে পারিয়া বীরেশও কম বিস্ময় অনুভব করে নাই। সীতার সম্মতি পাইলে নরেশের সম্মতি পাওয়া কঠিন হইত না। জোর করিয়া কোন কাজে কাহাকেও প্রবৃত্ত করান বীরেশের স্বভাব ছিল না, সুতরাং সীতাকে সে কিছুই বলিল না। ভাবিয়া ভাবিয়া অন্ধকারে আলোক পাত করিতে যাইয়া সে সীতার জন্য নিরতিশয় দুঃখিতই হইয়া উঠিল। এমনি করিয়া কিছু দিন গেল।

করুণা ৺শিবরাত্রি উপলক্ষে চন্দ্রনাথ দর্শনের আশা অনেক দিন হইতেই পোষণ করিতেছিলেন। সীতাও চন্দ্রনাথের সীতাকুণ্ড বা উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। বীরেশ ছুটি লইয়া করুণা ও সীতাকে লইয়া চন্দ্রনাথ দর্শনে রওনা হইল।

ট্রেণ সীতাকুণ্ড ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইতেই সীতা আনন্দে শিশুর মত চিৎকার দিয়া উঠিল, "পিসিমা, পিসিমা, অই দেখ, পাহাড়।"

করুণা চাহিয়া দেখিলেন, পাহাড় মেঘস্তরের মত সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উচ্চ শৃঙ্গগুলি নীলাকাশ আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া আছে। তিনি শ্বশুরের সঙ্গে অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন, সুতরাং পাহাড় দেখার প্রথম আনন্দে তিনি সীতার মত বিচলিত হইয়া উঠিলেন না। তবে গলায় আঁচল জড়াইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ৺চন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। নূতন তীর্থদর্শনের আনন্দে তাঁহার মনটিও ভরিয়া উঠিল।

বীরেশ ট্রেণ হইতে নামিতে না নামিতেই কয়েক জন পাণ্ডা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাকে লুফিয়া লইবার জন্য প্রত্যেকেই কলরব করিতে লাগিল। তীর্থ সম্বন্ধে বীরেশের অভিজ্ঞতা খুব বেশী ছিল না, পাণ্ডাদের কাণ্ডে সে বিব্রত হইয়া পড়িল। ষ্টেশনের একজন কর্ম্মচারী তাহার পরিচিত ছিল, সে তাহাকে একটা বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিতে লিখিয়াছিল। এমন সময়ে সেই কর্ম্মচারীটিকে দেখিতে পাইয়া সে যেন অকূলে কূল পাইল। কর্ম্মচারীটি বীরেশের জন্য একটি ছোট বাড়ী এবং একজন ভৃত্য পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল।

বীরেশ, করুণা ও সীতাকে সেই বাড়ীতে রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া স্নান করিতে গেল। স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সীতা ভৃত্যের সাহায্যে নূতন সংসারটি এক রকম গোছগাছ করিয়া তাহার জন্য কিছু জলযোগেরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। সে খাইতে বসিয়া বলিল, "সীতা মা যেন আমার অন্নপূর্ণা।" তারপর নূতন সংসারটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে অদূরে অহ্নিকরতা করুণাকে বলিল, "দিদি, তীর্থ করতে এসেছ বটে, কিন্তু সংসার ফেলে আসতে পারনি, সেও সঙ্গে এসেছে।"

রাত্রে আহারাদির পরে বীরেশ বলিল,-"সূর্য্যোদয়ের কিছু আগেই পাহাড়ে ওঠা সুরু করতে হবে। কিছু খেয়ে চন্দ্রনাথ দর্শনে যাত্রা করাই সঙ্গত। কাল শিবরাত্রি, দিদিকে নিশ্চয় কিছু খাওয়ান যাবে না। কিন্তু তোর আর আমার জন্যে কিছু খাবার করে রাখলে পারতিস মা।"

সীতা হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই, তোমার খাবার আছে। কিন্তু কাকা, আমি তো কাল খাব না, শিবরাত্রি ব্রত করব।"

"ওরে বাপরে! চব্বিশ ঘণ্টা তুই কিছু না খেয়ে বাঁচবিনে। আর, পাহাড়ে ওঠা কি ভয়ানক পরিশ্রম!"

"না খেয়ে পিসিমা যদি বাঁচেন, তবে আমিই বা মরব কেন? দেখে নিও, আমিও, বেঁচেই থাকব।"

জেদী মেয়েটার সঙ্গে তর্ক করা নিস্ফল জানিয়া বীরেশ চুপ করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার চেষ্টা সফল হইল, করুণাও ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু সীতার চোখে ঘুম আসিতে চাহিল না। মাঝে মাঝে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, আবার চমকিয়া সজাগ হইতে লাগিল; পাছে পাহাড়-যাত্রার সময়ের ব্যতিক্রম হয়। সে তিন চার বার উঠিয়া আলো জ্বালাইয়া ঘড়িও দেখিল। তারপর চারিটা বাজিয়া গেলে বীরেশ ও করুণাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিল।

বীরেশ চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে জড়িত কণ্ঠে বলিল, "এখনও যে ঢের রাত আছে।"

সীতা বলিল, "না, না, চারটা বেজে গেছে। উঠে দেখ, যাত্রীরা সব ব্যাসকুণ্ডে চান করতে যাচ্ছে। ওখানে চান করে তবে তো চন্দ্রনাথ দর্শন করতে যাবে।"

করুণা ইতিপূর্ব্বেই উঠিয়া বসিয়াছিলেন, সুতরাং বীরেশের আর বিলম্ব করা চলিল না।

দূরারোহ সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ। পথে পাশাপাশি দু'জন চলিবারও উপায় নাই। পথের একধারে অতল গভীর খাদ, অন্যধারে উচ্চ পর্ব্বত প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে ৺চন্দ্রনাথ দেবের মন্দির। অন্তহীন মনুষ্যশ্রেণী সেই পথে পর্ব্বত আরোহণ করিতেছিল। যেন একটা প্রবাহ পূর্ণ-আবেগে চন্দ্রশেখরের পাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। যাত্রীদিগের মধ্যে বৃদ্ধ বৃদ্ধা, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, যুবক যুবতী সকলই আছে; এমনকি, বালক বালিকারও অভাব নাই। যাত্রীরা মধ্যে মধ্যে প্রবল উৎসাহে চন্দ্রনাথের জয় ঘোষণা করিতেছিল।

মধ্যপথে খানিকটা সমতলভূমি বৃক্ষচ্ছায়ায় শীতল হইয়াছিল। বিশ্রাম করিবার জন্য অনেক যাত্রী সেখানে বসিয়া পড়িল। বীরেশও বসিল। বীরেশের পার্শ্বোপবিষ্ট একজন

সীতাকে লক্ষ্য করিয়া বীরেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটি আপনার কে?" প্রশ্নকর্তা শুক্লকেশ বৃদ্ধ। সুতরাং বীরেশ রাগ করিল না, বরং হাসিমুখে বলিল, "আমার মা।"

কৌতূহলী বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "অর্থাৎ?"

বীরেশ বলিল, "ভাইঝি।"

বৃদ্ধ সীতার প্রতি কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "এটিকে দেখলে মনে হয়, তপস্বিনী উমা শিব লাভের জন্যে চলেছেন।"

কথাগুলা মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত হইলেও সীতার কানে গেল। সে লজ্জা পাইয়া মুখ ফিরাইল। বৃদ্ধের কথা শুনিয়া বীরেশ সস্নেহে সীতার পানে চাহিল। সীতার পরণে চওড়া লাল পাড় তসরের শাড়ী, কপালে চন্দনের টিপ, রুক্ষ ভিজা চুলগুলি পিঠ ঢাকিয়া জানুর কাছে লুটাইতেছিল। রাত্রি জাগরণ এবং উপবাসের ক্লেশ তাহার অপরূপ সুন্দর মুখের উপর একটা ছায়াপাত করিয়া তাহাকে তপঃক্লিষ্টার মতই দেখাইতেছিল।

যাত্রীরা কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিল। বীরেশও করুণা ও সীতাকে লইয়া চলিল। কিছুকাল চলিয়া যাত্রীরা তাহাদের প্রার্থিত বস্তু লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। যে শৃঙ্গে চন্দ্রনাথ দেবের মন্দির, সেই শৃঙ্গে তাহারা উপস্থিত হইল। এতক্ষণ সীতা পার্ব্বত্য পথ চলিতে চলিতে দূরের নদীগুলা রজত ফিতার মত দেখিতেছিল, এখন চাহিয়া দেখিল, সেই নদী বঙ্গোপসাগরের অসীমতায় মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। দূরে—অতি দূরে যেন অসীম সাগর এবং অসীম আকাশ নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা অচিন্ত্যনীয় ভাবে, একটা গভীর আনন্দে সীতার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে সাগরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "কাকা, চেয়ে দেখ।"

করুণা স্মিতমুখে বলিলেন, "পাগলি, কাকা কি আজ নতুন সাগর দেখচে?"

সীতা বলিল, "আমিও তো আজ নতুন সাগর দেখিনি। আমি তো তোমার সঙ্গেই সাগর-সঙ্গমে গিয়েছিলাম। আজ এখানে এসে পাহাড়, জঙ্গল, গাছপালা, নদী, সাগর, মন্দির আমার কত যে ভাল লাগছে। কাকা, তোমার কি ভাল লাগছে না?"

সীতার মুখের বিকশিত আনন্দের একটি রেখাও বিলুপ্ত করিতে বীরেশের ইচ্ছা হইল না। সে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "লাগছে বৈকি মা।"

করুণা ঈষৎ উদ্বিগ্নস্বরে বলিলেন, "ভালতো লাগছে, কিন্তু মন্দিরে ঢুকব কেমন করে, তাই ভাবছি। যে ভয়ানক ভীড়।"

সত্যই মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে ভীষণ জনতা। সকলেই অগ্রে প্রবেশ করিবার জন্য অতি ব্যগ্র হওয়ায় সকলের প্রবেশই দুঃসাধ্য এবং বিলম্বিত হইতেছিল। 'দর্শন' করিয়া দিবালোক থাকিতে থাকিতেই সকল যাত্রীকে পর্ব্বত অবরোহণ করিতে হইবে। এখানে তো লোকালয়

নাই, এখানে শুধু পশুপতিই থাকেন। বীরেশ বহুকষ্টে সীতা ও করুণাকে লইয়া মন্দির দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল এবং পশ্চাৎবর্ত্তীদিগের ধাক্কা খাইতে খাইতে মন্দিরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। প্রবেশ-দ্বারে যেমন জনতা, মন্দির মধ্যে তত নয়। করুণা মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই, আঁচলে বাঁধা ফুল বেলপাতা লইয়া নত জানু হইয়া পূজা করিতে বসিয়া গেলেন। আরও কয়েকজন বসিয়া পূজা করিতেছিল। সীতা প্রণাম করিয়া বীরেশের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের পূজা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া মন্দির তলে পড়িয়া গেল।

এই আকস্মিক বিপদে করুণা চিৎকার করিয়া উঠিলেন, বীরেশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সীতার মূর্চ্ছায় মন্দিরের প্রায় সকলেই কলরব করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজন বিদ্যুদ্বেগে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সীতার নিঃসংজ্ঞ দেহ অবলীলাক্রমে এবং অসঙ্কোচে দুই হাতে তুলিয়া লইল। নহিলে তৎক্ষণাৎ সেই মূর্চ্ছাতুর দেহ লোকের পদতলে পিষ্ট হইয়া যাইত।

সে করুণা ও বীরেশের পানে চাহিয়া বলিল, "আপনারা আমার পেছনে পেছনে আসুন।" বলিয়াই সে সবলে জনতার মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিল, বীরেশ ও করুণা মূর্চ্ছিতের মত চলিলেন।

মন্দিরের এক কোণে একটুকরা জমি। তাহা মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে নিম্ন এবং প্রায় নির্জ্জন। সীতাকে সেখানে শোওয়াইয়া সে জলের সন্ধানে গেল। করুণা সীতার মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বীরেশ বিবর্ণ মুখে নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়া ব্যজন করিতে লাগিল।

লোকটি মন্দির প্রাঙ্গণের জলছত্র হইতে জল সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিল। চোখে, মুখে, মাথায় জল দিতে দিতে ক্রমে ক্রমে সীতার নিঃস্পন্দ দেহে চেতনার সঞ্চার হইল। সীতাকে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে দেখিয়া তাহার উদ্ধারকর্ত্তা ডাকিল, "রাণি!"

তাহার কণ্ঠোচ্চারিত ক্ষুদ্র শব্দটি আশ্চর্য্য উত্তেজক ভেষজের মত সীতার অসাড় দেহ মুহূর্ত্তে সবল করিয়া তুলিল। সে ত্রস্তে উঠিয়া বসিয়া বিশৃঙ্খল কাপড় ঠিক করিয়া লইল।

'রাণি' সম্বোধনে চমকিয়া করুণা ও বীরেশ এই সর্ব্বপ্রথম সম্বোধনকারীর মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া বিপুল হর্ষে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন।

৭

বীরেশ বলিল, "অজিত, তুমি আমাদের সঙ্গে চল। নইলে অসুস্থ সীতাকে নিয়ে আমি কি করে নামব?"

অজিত বলিল, "সে আমি যেতে পারি কাকা, কিন্তু এইখানে দাঁড়িয়ে বলুন, রাজডাঙ্গায় আমার খবর দেবেন না।"

"হাঁরে, অভিমানী ছেলে, তোমার বাবা তোমার নির্দ্দোষিতা জানতে পেরেছেন।"

"জানুন, আর না-ই জানুন, আমার তাতে কি ? আমার জীবনটা তাঁর কাছে মিথ্যা, বাইরের সাক্ষ্যটাই তাঁর কাছে বড়। বাইরের সাক্ষ্যে আমার ওপর বিশ্বাস হারাবেন, এবং বাইরের সাক্ষ্যে আমাকে বিশ্বাস করবেন। না কাকা, আমি আর তা চাইনে।"

"সে না চাও, আমাদের সঙ্গে আপাততঃ তোমার যাওয়া চাই-ই। রাজডাঙ্গায় খবর দেব না বললাম। এখন চল।"

অজিতের সবল বাহুর সাহায্যে সীতা একরকম বিনা কষ্টে পর্ব্বত অবরোহণ করিল।

বাসায় পৌঁছিয়া বীরেশ বলিল, "অজিত, এখানে তুমি কোথায় আছ ?"

অজিত বলিল, "আজ ভোরে এখানে পৌঁছেচি। কোথায় থাকব, তা এখনো ঠিক করিনি, এখন করব।"

অজিতের গৈরিকধারী সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিয়াই করুণার চোখে বার বার জল আসিতেছিল। সে জল গড়াইয়া কপোলে পড়িল। তিনি অজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "যে দু'দিন আমরা এখানে আছি, আমাদের সঙ্গেই তোকে থাকতে হবে; আমি তোকে আর কোথাও যেতে দেব না বাবা।" অজিত আর 'না' বলিতে পারিল না।

পরদিন বীরেশ করুণাকে লইয়া 'সহস্রধারা' দেখিতে গেল। অতখানি পথ হাঁটিয়া যাইতে কষ্ট হইবে বলিয়া সীতাকে কিছুতে সঙ্গে লইল না।

সীতা একলা বসিয়া রান্না করিতেছিল। চাকরটা কি কাজে বাহিরে গিয়াছিল। অজিত রান্না ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিল, "রাণি!"

সীতা বলিল, "কি ?"

"তোমার কি ফিটের ব্যামো আছে না কি ?"

"কৈ, আর কখনো হয়নি তো। আমি ভাবছিলাম, তুমি বুঝি ও-ঘরে বসে যোগবাশিষ্ট পড়ছ। তা এতক্ষণ বসে বুঝি ফিটের কথাই ভেবেছ ?"

"না—তা—বলছিলাম কি, কাল তোমার ফিট হলো কেন ?"

"কি জানি।"

"তীর্থ স্থানে মিথ্যা কথা।"

"আমি কি ডাক্তার নাকি যে সব অসুখের কারণ বলতে পারব ?"

"পিসিমা বললেন রাতজাগা, উপোস আর পাহাড়ে ওঠার পরিশ্রমের ওপর লোকের ভীড়ে ফিট হয়েছিল। কিন্তু তিনি জানেন না, আমি ঠিক জানি।"

"আচ্ছা, বল দেখি।"

"হাসলে কি হবে রাণি, ঠিক বলতে পারি। বলব ? রাগ করবি নাতো ?"

"বলনা, আমি রাগ করলেই বা কি ?"

"হাঁ, তা বৈকি। হয়তো সারাদিন মুখ ভার করে থাকবি, খেতেই দিবিনে।"

"তাতেই বা তোমার কি ? তুমি তো গৈরিকধারী সন্ন্যাসী।"

"আশ্রমের নিয়ম অনুসারে গেরুয়া পরি, কিন্তু সন্ন্যাসী নই। স্বামীজী তো আমাকে দীক্ষা দেননি এখনো।"

"কবে দীক্ষা দেবেন ?"

"যবে যোগ্য হব।"

"সন্ন্যাসের যোগ্য এখনো হওনি ? তিন চার বছর বসে তবে করলে কি ?"

"যাওয়া মাত্রই স্বামীজী কাউকে দীক্ষা দেননা। প্রথমে কিছুদিন লেখা পড়া ও সংযম শিক্ষা দেন। তারপর অধিকারী ভেদে কাউকে দু'বছরে, কাউকে চার বছরে, কাউকে বা পাঁচ বছর পরে দীক্ষা দেন। কাউকে আদপে দেনই না, ঘরে পাঠিয়ে দেন।"

"তোমার সম্বন্ধে স্বামীজী কি রকম ব্যবস্থা করলেন ? লেখা পড়া আর সংযম শিক্ষা, এ দু'টো তো তোমার ধাতে সয়ই না। স্বামীজী তা এতদিনে অবিশ্যি টের পেয়েছেন। তুমি কি এতদিন তোমার গুরুজীর গঞ্জিকা ও সিদ্ধি বিভাগেই নিযুক্ত ছিলে নাকি ?"

"তিনি ও-সবের ধার ধারেন না। সত্যি, তিনি মহাপণ্ডিত এবং ধার্ম্মিক।"

"তাতো তোমার মত শিষ্য দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

"রাণি, গুরুনিন্দা ক'রোনা বলছি। ছেলেবেলার কথা মনে আছে তো ?"

"তা আবার নেই ! চিরকাল তুমি আমাকে জ্বালালে। গুরু নিন্দা করলে কি করবে ? মারবে নাকি ?"

"সে আর এখন হয়না, অনেক ঢেঙ্গা হয়ে গেছ। এখন 'তুই' বলতেই বাধে যে।"

" 'আপনি' বলো তা হলে। তুমি কি এতদিন স্বামীজীর প্রয়াগের আশ্রমেই ছিলে ?"

"না। কাশী ও হরিদ্বারেও তাঁর আশ্রম আছে। প্রথম হরিদ্বারে যেয়ে তাঁর দেখা পাই। সেখান থেকে তাঁর সঙ্গে তিব্বত বেড়াতে যাই। ভারতের অনেক তীর্থই তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করেছি।"

"খুব করেছ। গুরুসঙ্গ ছেড়ে যে বড় চন্দ্রনাথে এলে ?"

"চন্দ্রনাথ ও কামাখ্যা তিনি দেখে গেছেন। তাই আর এলেন না, আমি একলাই এসেছি।"

"বেশ করেছ। এখন বল দেখি, আমার কেন ফিট হয়েছিল ?"

"ফিটের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে তোমার চোখোচোখি হয়েছিল।"

"তাই দুর্নিবার পুলকাবেগে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম ?"

"নিশ্চয় তাই।"

"তুমি ঠিক আগেরই মত দুষ্ট আছ দেখছি। তোমার সন্ন্যাস আর হলোনা। আচ্ছা, সেখানে কি তোমার বাড়ীর জন্যে মন কেমন করে না ?"

"বাড়ীর জন্যে ? তা বলতে পারিনে। তবে মা'র কথা কখনো ভুলতে পারিনি। আর —আর—"

"আর সেই মেয়েটির কথা, যার ফটো দেখেই ভালবেসে ফেলেছিলে। উচ্ছ্বাসের বশে ভাবী বধূটি অপরকে দান করে খুবই অনুতাপ করেছ এতদিন। খুব হয়েছে। এই তোমার যোগ্য শাস্তি ?"

সীতার কণ্ঠ স্বরে এবং বলিবার ভঙ্গিতে অজিত হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "উচ্ছ্বাসের বশে দান করেছি, অনুতাপ করেছি, সবই তো জান দেখছি। সর্ব্বজ্ঞ নাকি তুমি ?"

সীতা হাতা লইয়া ঘণ্ট নাড়িতে নাড়িতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্বজ্ঞ না হলেও তোমার সম্বন্ধে অজ্ঞ নই। ধীরার মুখে তোমার মা'র কথা শুনে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। এতবড় পাষাণ তুমি, সেই মাকে একটি কথা পর্য্যন্ত না বলে পালিয়ে এসে আমোদ করে বেড়াচ্ছ!"

"আমোদ! আমোদই বটে রাণি! মা'র কথা আমার চেয়ে বেশী কে জানে ? তবু তো আমার বাড়ী ফিরে যাবার উপায় নেই।" বলিয়াই সেই বলিষ্ঠ যুবক মা-হারা শিশুর মত কাঁদিয়া ফেলিল।

বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল। সীতা বুঝিল, বীরেশ ফিরিয়াছে। বীরেশ রান্না ঘরে উঠিয়া বলিল, "মা অন্নপূর্ণার অন্ন প্রস্তুত, এখন বসে গেলেই হয়। দেমা, ভাত দে। হেঁটে হেঁটে ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে।"

সীতা তাড়াতাড়ি ঠাঁই করিয়া ধীরেশ ও অজিতকে ভাত বাড়িয়া দিল। খাইতে খাইতে বীরেশ বলিল, "অজিত, তোমাকে তো কাশী যেতে হবে। তবে আমাদের সঙ্গে কালই চলনা। পথে তোমার সাহায্য পাব।"

অজিত বলিল, "আমি কামাখ্যা দেখে কাশী যাব।"

অজিতের কথা শুনিয়া করুণা সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "চল বীরু, আমরাও কামাখ্যা দর্শন করে আসি ?"

বীরেশ বলি, "আমার তো ছুটি নেই দিদি, কালই আমাকে যেতে হবে। ছুটি কি সাহেব দিতে চায় ? অনেক চেষ্টায় সাত দিনের ছুটি পেয়েছিলাম।"

আচ্ছা, তোর ছুটি না-ই থাকল। অজিত আমাকে কামাখ্যা দর্শন করিয়ে আনবে।

পিসিমার যখন ছেলে নেই, তখন অজিত কি আ র ছেলের এই কাজটা করবে না ?" বলিয়া করুণা অজিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

অজিতের মুখপানে আড়চোখে একবার চাহিয়া বীরেশ বলিল, "দিদি, অজিত যদি তোমাকে কামাখ্যা ঘুরিয়ে কলকাতা রেখে আসে, তা হলে আমার আপত্তি নেই।"

অজিত মুখ তুলিয়া চাহিতেই করুণার মুখে তাহার দৃষ্টি পড়িল। তীর্থ দর্শনের জন্য হিন্দু নারীর, বিশেষতঃ হিন্দু বিধবার ব্যাকুলতার কথা তাহার অবিদিত নাই। সে দেখিল, করুণা তাঁহার দৃষ্টিতে আশ্বাস, নির্ভরতা এবং ব্যাকুলতা ভরিয়া তাহারই পানে চাহিয়া আছেন। সে 'না' বলিলে করুণার বুকে কিরূপ লাগিবে, তাহা সে পলকে অনুভব করিয়া আর না' বলিতে পারিল না।

(৮)

দশবারোদিন পরে অজিত করুণা ও সীতাকে কামাখ্যা দর্শন করাইয়া করুণার প্রচুর আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

পরদিন—কাশী রওনা হইবার কিছু পূর্ব্বে—অজিত সীতাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া বলিল, "রাণি, আমি কাকার কাছে সুবোধ বাবুর কথা শুনেছি। তাকে প্রত্যাখ্যান করে সুবুদ্ধির কাজ করনি। এখনো সময় আছে, বিবেচনা করে—"

সীতা তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি তোমার উপদেশ চাইনে।"

অজিত স্থির স্বরে বলিল, "সে আমি জানি।" কিছুকাল থামিয়া আবার বলিল, "কাল কাকার কাছে তোমার অনেক কথাই শুনলাম। কাকার মত নয়, ঠিক তোমার বন্ধুর মত তিনি কত কথা বললেন। তাঁর বিশ্বাস, তোমার বিবাহে অনিচ্ছার হেতু নাকি আমি। এওকি সম্ভব ? কি করে তিনি এ ভাবতে পারলেন ? আমার মত মূর্খ, উচ্ছৃঙ্খল, কলঙ্কিতকে—"

"আমি তোমাকে কলঙ্কিত ভাবতে পেরেছি মুহূর্ত্তের জন্যেও ?" কান্নার বেগে সীতার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

"ভাবনি রাণি!" গভীর বিস্ময়ে অজিত অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। নারী চরিত্র একটা অত্যন্ত অদ্ভুত জিনিস এবং একান্ত দুর্জ্জ্ঞেয়। নহিলে ইহা সম্ভব হইল কেমন করিয়া ? আর তো অপেক্ষা করা চলে না। অজিত গাঢ়স্বরে বলিল, "রাণি, তুমি জান, মা বাবার দেওয়া কোন ভাল জিনিষই আমি গ্রহণ করতে পারিনি। তা যদি পারতাম, তাহলে তখন তোমাকেও পেতাম। এখন যে তা কত রকমে অসম্ভব, সে তুমিও জান। কাকা তোমাকে বড্ড বেশী ভালবাসেন তাঁকে দুঃখ দিওনা; ছেলে মানষি ছেড়ে দিয়ে সুবোধ বাবুর—"

"দোহাই তোমার! এসব উপদেশ আমায় দিতে এসনা। কাকার যদি তেমন বিশ্বাস হয়ে থাকে তো ভুল। তুমি যাও, যাও এখন" বলিয়াই সীতা কাঁদিয়া ফেলিল।

সীতার কান্নায় মুহূর্ত্তে একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল। সামীপ্য যাহা অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়া বুঝিতে দেয় নাই, দূরত্ব তাহাই অতি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। অতি দূর প্রবাসে যাইয়া অজিত অহরহ অনুভব করিয়াছে যে, তাহারই অজ্ঞাতসারে তাহার পরিপূর্ণ হৃদয় কিভাবে সীতাকে চাহিয়াছে। এই স্নেহের স্মৃতি তাহার প্রবাসের পরম সম্পদ। অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস। সীতা যখন নিতান্তই দুর্ল্লভ, তখনই সে পরম বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অজিতের অন্তরের উপলব্ধি আজ বাহিরে প্রকাশ করিবার কোন পথই তো নাই। যে জিহ্বা বলিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, তাহাকে অজিত ক্ষণকালের জন্যও বিশ্বাস করিতে সাহস করিল না। সে দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে দ্রুতপদেই নীচে নামিতেছিল। নামিতে নামিতেও সীতার চাপা কান্নার সুর যেন তাহার কানে পৌঁছিতে লাগিল। তিন চারটা সিঁড়ি বাকি থাকিতে অজিত হঠাৎ হুমড়ি খাইয়া ছিটকাইয়া নীচের বারান্দায় পড়িয়া গেল। পতন শব্দ শুনিতে পাইয়া সীতা ও করুণা ছুটিয়া আসিলেন। তখন অজিত উঠিয়া বসিয়াছে। করুণা ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুব কি লেগেছে বাবা? হাড় ভাঙ্গেনি তো?"

অজিত হাসিয়া বলিল, "আমার হাড় ভাঙ্গা কি অত সোজা ভেবেছ পিসিমা? পাঁজরে খানিকটা লেগেছে বটে।"

করুণা স্নেহ-করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "আহা, কত যেন লেগেছে! চল বাবা, ওপরে চল, কিছু মালিস টালিস করে দি।"

"ওপরে যেয়ে আর কি হবে পিসিমা? এখন ষ্টেশনে যাই।"

"সেকি অজিত, তাকি হতে পারে? আছাড় খেয়ে পড়ে গেলে, আজ তোমাকে আমি কিছুতে যেতে দেবনা। চল, ওপরে।" বলিয়া করুণা অজিতের হাত ধরিলেন। সেই স্নেহ স্পর্শে অজিত আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। করুণার সঙ্গে উপরে চলিয়া গেল।

অজিতের বেদনা তিন চার দিনে সারিল না, সুতরাং করুণা ও বীরেশের সনির্ব্বন্ধ সস্নেহ অনুরোধে অজিতকে থাকিতে হইল।

সীতা ছাদের এক কোণে টবে করিয়া কয়েকটা ফুল গাছ লাগাইয়া উদ্যান রচনার সাধ মিটাইতেছিল। এই ফুল গাছ ক'টির প্রতি সীতার যত্ন ও মমতার অন্ত ছিল না। কোন একটা নূতন গাছে কুঁড়ি ধরিলে সীতার আহ্লাদ উছলিয়া উঠিত এবং ব্যাকুল আগ্রহে ফুল ফুটিবার প্রতীক্ষা করিত।

সূর্য্যাস্তের রক্তরাগে ললাট রঞ্জিত করিয়া সন্ধ্যা যখন ধীরে ধীরে আসিতেছিল, সীতা তখন ফুল গাছের টব গুলিতে জল দিতেছিল। তাহার পরণে ছিল বাসন্তী রঙের সাড়ী। সাড়ীর সবুজ পাড়টি শিশির-ধোওয়া পাতার মত উজ্জ্বল দেখাইতেছিল।

অজিত আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল, "কিগো সন্ন্যাসী ঠাকুর, কি চাই?"

অজিতও হাসি মুখেই জবাব দিল, "কিচ্ছুনা। পিসিমা কিচ্ছুতে বেরুতে দিলেন না, ঘরে আর বদ্ধ হয়ে থাকতে ইচ্ছা হলোনা, তাই—"

"মুক্তির সন্ধানে ছাদে এসেছ?"

"তোর সন্ধানে এসেছি গল্প করবার জন্যে।"

"সৌভাগ্য আমার। কিন্তু গৃহীর সঙ্গে বেশী গল্প সল্প ভাল নয়। কি জানি, পাছে তোমার সাধনার ব্যাঘাত হয়।"

"আমি যে সিদ্ধ হয়ে গেছি, আর কি ব্যাঘাত হবে?"

"তবে আর কি? আজ সারা দুপুরটা তোমাতে, কাকাতে আর পিসিমাতে গল্প চলেছে। অতক্ষণ তোমাদের কি গল্প হলো?"

"নানা রকম। তারপর কাকা আর পিসিমা আমাকে আশ্রমে ফিরে যেতে বার বার বারণ করলেন। কাকার ইচ্ছা, কোন কায কর্ম্ম নিয়ে আমি এখানেই থাকি। আমার মত ছেলে নাকি জ্ঞানের চেয়ে কর্ম্মেরই বেশী যোগ্য।"

"তুমি কি বললে?"

"বলব আর কি? জ্ঞান বা কর্ম্ম কিছুরই আমি যোগ্য নই, সে তুমিও জান, আমিও জানি। কিন্তু কলকাতায় আমি থাকতে পারিনে। যেখানে বাবাকে কেউ জানে না, আমাকে কেউ চেনেনা, সেখানেই আমাকে থাকতে হবে। আশ্রয় আর কোথায় পাব? স্বামিজীর আশ্রম ছাড়া আমার আর উপায় নেই।"

বহুক্ষণ উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। ধীর বাতাস উভয়ের দেহে শীতল স্পর্শ বুলাইয়া দিতেছিল। নিম্নে মহানগরীর আলোকিত রাজপথে অবিশ্রান্ত জনস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। সীতা সহসা প্রশ্ন করিল, "আমি যদি তোমাকে যেতে না দেই?"

অজিত জবাব দিল, "তা হলেও আমার ফিরে যাবার উপায় থাকবে না রাণি, কিন্তু তুমি জান, মা-হারা হয়ে সংসারে থাকা আমার কতখানি দুঃসহ।" বলিয়াই সে পিছনে ফিরিয়া গাঢ় মনোযোগের সহিত একটা ফুটন্ত বেল ফুল দেখিতে লাগিল। কিন্তু তবু তাহার অজানা রহিল না যে সীতার চক্ষু দু'টি হইতে অবিরল জল পড়িতেছে। এই অশ্রু বর্ষণে অজিত তাহার সুখ বা দুঃখের পরিমাণ স্থির করিতে পারিল না। সে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিল। কি অদ্ভুত জিনিস নারীচিত্ত! ইহা সমুদ্রের মত সুগভীর, সমুদ্রের মতই বিচিত্ররহস্য-ময়, এখানে 'থই' পাওয়া যায় না। সমুখের এই যে আলোকোজ্জ্বল সম্পদপূর্ণ গৃহ, যাহাকে

সর্ব্বস্ব দান্ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, হয়তো এখনও আছে, তাহার পরিপূর্ণ হৃদয় কিনা এক স্বজন-পরিত্যক্ত হতভাগ্যকে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে!

সীতা কাঁদিয়া কিছু শান্ত হইয়াছে বুঝিয়া অজিত বলিল, "আমায় কবে বিদায় দেবে রাণি ?"

সীতা কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "তোমার পাঁজরের ব্যথা নেই আর ?"

"আজ তো টের পাচ্ছি নে।"

"তবে কালও রওনা হতে পার। দেরী করায় আর লাভ কি ? হয়তো স্বামীজী বিরক্ত হবেন।"

সীতার শান্ত কণ্ঠে অভিমানের লেশও ছিল না। অজিত অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। স্নেহাস্পদের কল্যাণের জন্য ইহারা এমনি অনায়াসে, এমনি নিঃশব্দে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইতে পারে!

সীতা মিনতির সুরে বলিল, "যেখানেই থাক, মাঝে মাঝে তোমার খবর আমাকে দিও।"

করুণার আহ্বান শুনিয়া সীতা নীচে নামিয়া গেল। অজিত আলিসায় হেলান দিয়া স্থির হইয়া সেই অন্ধকারেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রাত্রে আহারাদির পরে অজিত বিছানায় আসিয়া 'নারদ সূত্র' ও তাহার অনুবাদের খাতা খুলিয়া বসিল। স্বামীজীর আদেশ, সূত্রগুলির ইংরেজী অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা শীঘ্রই তাহাকে করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সে আজ তাহার বিক্ষিপ্ত মন কিছুতেই স্বামীজীর আদিষ্ট কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে পারিল না। সে আজ মনে মনে হাসিয়া স্বীকার করিল, স্বামীজী শুধু বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক নহেন, বুদ্ধিমানও। তাই তাহাকে এতদিনে দীক্ষা দেন নাই। সে যে শুধু সংসারের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য, অতীত জীবন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার জন্য এবং প্রত্যাবর্ত্তনের পথ চির রুদ্ধ করিবার জন্যই সন্ন্যাস চাহিয়াছিল, তাহার স্বভাবতো বৈরাগ্য কামনা করে নাই।

সমস্ত জগৎ যাহাই করুক না কেন, শৈলজা আর সীতা,—এই দু'টি নারীর হৃদয় ভরিয়া তাহার জন্য অবিচল স্নেহই সঞ্চিত হইয়া আছে। ওখানে ঘৃণা, অবিশ্বাস বা অবহেলার স্থান নাই। এই দু'টি হৃদয়ের স্মৃতি সম্বল লইয়াই তো তাহাকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এতদিন প্রবাসে শৈলজার মর্ম্মান্তিক রোদন অনুভব করিয়া অজিত এক এক সময়ে আনন্দে বেদনায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সীতা যে এমন হইবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। শৈশবের ধূলাখেলা ও মারিমারি এবং কৈশোরের কলহে যে বীজ সকলের অজ্ঞাতে উপ্ত হইয়াছিল, তরুণ জীবনের মায়াস্পর্শে তাহা যে এমন পুষ্পিত পল্লবিত হইয়া আপনাকে প্রকাশিত করিবে, তাহা কে ভাবিতে পারিয়াছিল ? না, না, আর দেরী

করা নয়। এই আবেষ্টনের মধ্যে সে আর আপনাকে রাখিবে না, কালই কাশী যাইবে। সে আজ শুধু মুক্তিই চাহিতে পারে, আরত কিছু না।

বীরেশ তাহার কোন বন্ধু-গৃহে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিল, তাহার ফিরিতে রাত্রি বারোটা বাজিল। সীতা তাহার অপেক্ষায় জাগিয়া বসিয়াছিল। বীরেশ আসিয়া শয়ন করিলে সীতা তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য বারান্দায় নামিয়া দেখিতে পাইল, অজিতের শয়ন কক্ষের দ্বার অর্দ্ধমুক্ত, কক্ষে আলো জ্বালিতেছে। অগ্রসর হইয়া চাহিয়া দেখিল, অজিত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার মশারী ফেলা হয় নাই। সীতা কিছুকাল ইতস্ততঃ করিয়া নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া মশারি ফেলিবার জন্য খাটের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অজিতের শিয়রে টেবিলে ল্যাম্ফ জ্বালিতেছিল। তাহার বুকের কাছে একখানা খাতা এবং নিদ্রাশিথিল হাতে একটা পেন্সিল। কৌতূহলী সীতা অতি ধীরে খাতাটা তুলিয়া লইয়া পড়িয়া দেখিল। 'ওঁ সা ন কামায় মানা নিরোধরূপাৎ' সূত্রটির ইংরেজী ব্যাখ্যা খানিকটা লিখিয়া হয়তো লিখিতব্য বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অজিত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দু'একটি সূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পড়িয়া লেখকের ভাষার উপর অবাধ অধিকার, রচনা-রীতির সৌন্দর্য্য এবং বুঝাইবার চমৎকার ক্ষমতা বুঝিতে সীতার বিলম্ব হইল না। আনন্দের বাষ্পে তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া গেল।

৯

কাল দোল পূর্ণিমা গিয়াছে। চিরদিনই রাজডাঙ্গার জমিদারের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা এই সকল পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব সাজে সজ্জিত হইয়া উঠে এবং ইহার অধিবাসীরা উৎসবের উল্লাস ও আড়ম্বর পূর্ণমাত্রায়ই উপভোগ করিয়া থাকে। আজিও সেই চিরন্তন নিয়মের একতিল ব্যতিক্রম হয় নাই। রন্ধনশালায় ব্রাহ্মণ-ভোজন এবং কাঙ্গালী-ভোজনের বিপুল আয়োজন চলিতেছিল। বাহিরে একদল যাত্রার আসর সাজাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাঙ্গণে ছেলেমেয়েরা লালে লাল হইয়া আবির লইয়া লাফালাফি ও মাতামাতি করিতেছিল। বয়স্কের দলও সেই রঙের খেলায় মাঝে মাঝে যোগ দিয়া ছেলেদের উৎসাহ ও কলরব বাড়াইয়া তুলিতেছিল।

এই উৎসবের কলকল্লোল হইতে আপনাকে দূরে দূরে রাখিবার জন্য শৈলজা ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সে জোর করিয়া বাহিরে ইহাতে যুক্ত হইতে চাহিলেও তাহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। উৎসবমত্ত এবং কর্ম্মরতদের কণ্ঠ হইতে যে কল্লোল উঠিতেছিল, তাহা করুণ রোদনের মতই আসিয়া শৈলজার কানে পৌছিতেছিল। সে তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িল।

গৃহিণীর এই অবস্থা। কর্ত্তাও প্রায় দুই মাস যাবত পীড়িত-শয্যাশায়ী। তবু

প্রত্যেক উৎসবই জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। শৈলজা অত্যন্ত মিনতি করিয়াই স্বামীকে বলিয়াছিল, "দোলে এবার যাত্রাগান না-ই বা হলো।" হরপ্রসাদ জবাব দিয়াছিলেন; "আমার অসুখ, সে তো তুচ্ছ কথা। আমি মরে গেলেই বা কি? আমার পিতৃপুরুষের কোন অনুষ্ঠান বন্ধ হ'তে পারে না" তাহাতে শৈলজা নিরুত্তর হইয়া রহিয়াছিল।

চার পাঁচ মাস পূর্ব্বে স্বামীর পরিশুষ্ক মুখ এবং শীর্ণ দেহপানে চাহিয়া শৈলজা একদিন বলিয়াছিল, "তোমার শরীর তো দিন দিনই খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখছি। চলনা আমরা একবার ঘুরে আসি। জল হাওয়ার পরিবর্ত্তনে শরীর ভাল হতে পারে।" হরপ্রসাদ স্থির কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "এখন তো আমার বাড়ী ছেড়ে যাবার উপায় নেই। দেওয়ানের শরীর ভাল নয়, তিনি তো কাজকর্ম্ম তেমন দেখতে শুনতে পারেন না, আমাকে প্রায় সব দেখতে হয় যে।" শৈলজা আর কথা কহিল না, স্বামীর কঠোরতায় সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। আশ্চর্য্য, যে অজিতের অদর্শনে শৈলজার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গিয়াছে, তাহা কিনা হরপ্রসাদকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। যতদিন অজিতের নির্দ্দোষিতার অকাট্য প্রমাণ না পাওয়া গিয়াছে, ততদিনই হরপ্রসাদকে মূর্খ লোকের মত দেখা গিয়াছে। প্রমাণ পাওয়া মাত্রই তিনি আগেকার মত হইয়া উঠিয়াছেন, যেন কিছুই হয় নাই। তিনি স্বামী নহেন, পিতা নহেন, একজন কঠোর বিচারক! তাঁহার কঠোর ন্যায়পরতা শৈলজা অনেক সময় সহ্য করিতে পারে না।

হৃদয়সর্ব্বস্ব অজিত তাঁহারই ভ্রান্তিতে গৃহহারা। না জানি সে কত ক্লেশে, কত বেদনায়, কোথায় পড়িয়া আছে। সেই অজিতেরই গৃহ যে কোন একটা উপলক্ষ পাইলেই উৎসব-কল্লোলে মুখর হইয়া উঠে। অজিতের জন্য তাহার পিতা কাহাকেও কিছুমাত্র বঞ্চিত করিতে চাহেন না, কিন্তু তাহার মায়ের হৃদয় যে নিত্য উপবাসী থাকিয়া যায়, তাহা তো তিনি একটি বারও ভাবিয়া দেখেন না। প্রত্যেক উৎসবের সকল আয়োজন কখন বা শৈলজার দীর্ণ ক্ষুধিত হৃদয়কে উপহাস করিত, কখন বা ইহার কলরব হাহাকারের মত তাহাকে পীড়িত করিত।

হরপ্রসাদের রোগ-শয্যা অনেকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকে, তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না। কখন শৈলজা, কখন ধীরা তাঁহার কাছে থাকিত। মণিভূষণ শ্বশুরের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া কিছু দিন হইল ধীরাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

ভোর বেলা ধীরা হরপ্রসাদের কাছে গিয়া বসিলে শৈলজা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। দ্বিতলের বারান্দার মুক্ত বাতাসে আসিয়া দাঁড়াইতেই ফাগ-উৎসবের মাতামাতি তাহার চোখে পড়িয়া গেল। তাই সে ছুটিয়া নিজের নিভৃত কক্ষে আসিল। সেখানে আসিয়া সে বেশীক্ষণ পড়িয়া থাকিতে পাইল না। হরপ্রসাদ ডাকিয়া পাঠাইলেন।

শৈলজা আসিয়া তাঁহার শয্যাপাশে দাঁড়াইলে তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি তো পড়েই আছি, তুমিও যদি শুয়ে থাক, তা হলে কাযকর্ম্ম দেখ্‌বে শুন্‌বে কে? এতগুলা লোক বাড়ীতে নিমন্ত্রিত।" শৈলজা মুহূর্ত্ত কাল স্থির থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি নীচে যাচ্ছি। ধীরা, তুই এখানেই থাকিস।" বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

কর্ত্তা ও গৃহিণীকে না দেখিয়া সত্যই ভৃত্য ও পরিচারিকাগণ কর্ম্মে শিথিল প্রযত্ন হইয়া পড়িতেছিল। শৈলজাকে দেখিয়া সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিল। ব্রাহ্মণ ভোজন প্রথমে হইয়া গেল, তারপর অন্যান্য নিমন্ত্রিতের ভোজন হইল। কাঙ্গালী ভোজন শেষ হইতে বেলাও শেষ হইয়া গেল। তিন চার বৎসর পরে আজ সহসা শৈলজাকে স্বহস্তে কাঙ্গালীদিগকে পরিবেষণ করিতে দেখিয়া ভৃত্যবর্গ বিস্মিত হইল। সকলের খাওয়া শেষে শৈলজা যখন স্নান করিয়া উপরে আসিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি সে কিছু খাইয়া স্বামীর কাছে আসিল।

পরদিন হরপ্রসাদের রোগের অবস্থা একটুখানি আশঙ্কাজনকই হইয়া উঠিল। রাত্রে রোগীর অভিপ্রায় অনুসারে কক্ষের আলোক স্তিমিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। হরপ্রসাদের অতি শীর্ণ দেহ প্রায় নিঃস্পন্দ হইয়া শয্যালগ্ন হইয়াছিল। কোন কালেই তিনি বেশী কথা বলিতে ভালবাসিতেন না। রোগশয্যা আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত পরিমিত ভাষীই হইয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত ছিল। কক্ষতলে কোমল গালিচা আস্তৃত থাকায় তিনি ধীরার গমন বা শৈলজার আগমন জানিতে পারিলেন না।

শৈলজা অতি ধীর মৃদু পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া হরপ্রসাদের শিয়রের নিকটস্থ একখানি চৌকিতে নিঃশব্দে বসিয়া তাঁহার মুখ পানে স্থির চক্ষে চাহিয়া রহিল। দুইমাস রোগে ভুগিয়াও তিনি মুখে একটি কাতর শব্দ উচ্চারণ করেন নাই; তথাপি তাঁহার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে যেন একটা অস্বস্তি আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিত। এটা শুধু দৈহিক অস্বস্তি নয়। ইহা গোপন করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অবধি ছিল না, কিন্তু শৈলজার সতর্ক দৃষ্টি ইহা ধরিয়া ফেলিত; অথবা শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য তিনি সচেষ্ট হইয়াও সফলকাম হইতে পারিতেন না। যখনই শৈলজা ইহা লক্ষ্য করিত, তখনই মর্ম্মে মর্ম্মে দারুণ আহত হইত, কিন্তু মুখে কিছু বলিত না। যিনি এতকাল তাহাকে রুদ্ধ হৃদয়ের বাহিরেই রাখিয়াছেন, আজ এই সময়ে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া বিব্রত করিয়া তোলায় তো কোন লাভ নাই।

চিকিৎসায় হরপ্রসাদের কোন উপকার হইতেছিল না। সুশিক্ষিত চিকিৎসকদিগের আন্তরিক চেষ্টা, স্ত্রী-কন্যার প্রাণপণ সেবা ধ্বংসমুখ হইতে তাঁহাকে একচুল নড়াইতে পারিতেছিল না। আমলা কর্ম্মচারী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন কাহারও অনুরোধে চিকিৎসা বা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি অন্যত্র যাইতে রাজি হন নাই। নির্ভীক প্রসন্নতার সহিত দির্ন

দিন তিনি ধ্বংসের মুখেই অগ্রসর হইতেছিলেন। মৃত্যুভয় যাঁহার নাই, তাঁহার কিসের এ অস্বস্তি ?

ডাক্তারের মুখ অপ্রসন্ন দেখিয়া শৈলজার বুক ভয়ে কাঁপিতেছিল। হরপ্রসাদকে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে দেখিয়া সে অধীর আগ্রহে আর্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু চাই তোমার ? এই বেদানার রস টুকু—"

হরপ্রসাদ বলিলেন, "না। তুমি কখন এলে ?"

"আধঘণ্টা হবে বোধ হয়।"

"সকলের খাওয়া দাওয়া হয়েছে ?"

"হাঁ, হয়েছে।"

"তুমি আমার কাছে এই বিছানার ওপর এসে বো'স। তোমায় কিছু বলব।"

শৈলজা উঠিয়া বিছানায় যাইয়া বসিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল। হরপ্রসাদ কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া নিমীলিত চক্ষে বলিলেন, "বোধ হয় এ রোগ থেকে আমার আর মুক্তি নেই। অজিতের সঙ্গে আর দেখা হলোনা।"

এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে হরপ্রসাদের কণ্ঠে দুইবার মাত্র অজিতের নাম উচ্চারিত হইল। যে দিন অজিতের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ স্বরূপ বিনোদিনীর মোকর্দ্দমার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল সেই দিন, আর আজ। হরপ্রসাদের কণ্ঠে এতখানি কোমলতা, এতখানি স্নিগ্ধতা লুকাইয়াছিল, কৈ, ইহার প্রমাণ তো শৈলজা তাহার বিবাহিত জীবনে একদিনও পায় নাই। আজ জীবন-মরণের সন্ধি-স্থলে তিনি কি তাঁহার সমগ্র জীবনের সঞ্চিত কোমলতা অজিতের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উজার করিয়া ঢালিয়া দিলেন!

শৈলজা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তুমি তো অজিতকে ভালবাসনি, তার সঙ্গে নাই বা দেখা হলো।" তারপর সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া স্বামীর বুকের একান্ত নিকটে মুখ আনিয়া বলিয়া ফেলিল, "আমি বুঝি, তুমি সর্ব্বদা কি একটা অশান্তি ভোগ কর। এই রোগ শয্যায় সে জন্যে কত কষ্ট পাচ্ছ, তাও বুঝি। কোন দিনই আমায় দুঃখের ভাগী করনি, কি করলে সুখী হও, তাও জানতে দাও নি। এই সময়ে তোমায় একটুখানি আরাম দানের অধিকার আমাকে দাও। বল, কি দুঃখ তোমার। বল, বল, আর আমাকে দূরে রেখনা।"

হরপ্রসাদ বিচলিতা স্ত্রীর হাত খানি নিজের ক্ষীণ দুর্ব্বল হাতে লইয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "আগাগোড়া সবই ভুল বুঝেছ তুমি। অজিত,—আমার জীবনের প্রার্থিত অজিত, অন্নপূর্ণার অংশ, তোমার প্রাণাধিক প্রিয়! সে যে আমার কি, সে শুধু আমার অন্তর ও অন্তর্য্যামীই জানেন। বংশের ভবিষ্যৎ জননী বলে তোমাকে আনা হয়েছিল, কিন্তু আগে এল অজিত। অন্নপূর্ণাও চলে গেল। অজিতের প্রতি তুমি নির্ম্মম না হও, অজিত মাতৃবিয়োগের দুঃখ না

পায়, এই হয়েছিল আমার ভয় ও ভাবনা। তাই নিজে দূরে থেকে তোমারি হাতে তাকে সমর্পণ করে দিয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নি, সে তোমার হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ স্থানই পেয়েছে। অজিতের চেয়ে তুমি কাউকে বেশী ভালবাসতে পারনি, তা আমি জানি; কিন্তু এই জানায় যে আমার কত সুখ, সেইটি শুধু তুমি জাননা। জানলে আজ তোমাকে দুঃখ পেতে হতো না। কোন দিনই আমি তোমাকে দূরে রাখিনি। যিনি আমার সকল সন্তানের মা, গৃহের গৃহিণী, তাঁকে দূরে রাখা যায়? তবে বাধ্য হয়ে তোমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। এই অসমযোগ তোমার পক্ষে সুখের কারণ হয় নি বলে আমি মাঝে মাঝে খুবই কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছি; তাই তোমার সকল প্রাপ্য তোমাকে দিতে পারিনি। কিন্তু সে ক্ষোভও আমার বেশী দিন থাকতে পায় নি। অজিতকে অবলম্বন করে তোমার মধ্যে যে মাতৃত্ব বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তাই বোধ হয় আমাদের সব ক্ষোভ, সব দৈন্য দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তোমার অজিতকে তোমার কাছে ফিরে আসতেই হবে। তাকে ব'লো, আমি তার ওপর নির্ম্মম ছিলাম না। আমার মনের মত তাকে গড়ে তুলতে পারিনি—হয়তো সে আমারি অযোগ্যতা – তাই তার ওপর রূঢ় হয়েছি। আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, সে সব রকমে মানুষ হোক্।"

হরপ্রসাদ একসঙ্গে অনেক কথা বলিয়া ক্লান্ত হইয়া চুপ করিলেন। শৈলজার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সেও কথা কহিতে পারিল না।

একটু খানি বিশ্রাম করিয়া হরপ্রসাদ আবার বলিলেন, "তোমার মত অজিতকে আমি চিনতে পারিনি। ভুল করে তাকে যে দণ্ড দিয়েছি, তার ফল আমার পক্ষে কি হয়েছে, তা আজ আমি বলতে চাইনে। কিন্তু তোমার আর অজিতের যে মর্ম্মান্তিক হয়েছে, তা আমি অহরহ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি।" এই বলিয়া হরপ্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শৈলজার মনে হইল, নিঃশ্বাসটা যেন তাঁহার অতি দুর্ব্বল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া গেল। সে চক্ষু মুছিয়া কোন মতে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "তোমার ভুলে মঙ্গলই হয়েছে। তোমার আশীর্ব্বাদ, তোমার ইচ্ছা অজিতকে নতুন করে গড়ে তুলেছে।"

হরপ্রসাদ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিস্ময়াপ্লুত স্বরে বলিলেন, "কি বলছ তুমি?" শৈলজা ডাক্তারের উপদেশ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "অজিত লেখাপড়া শিখেছে। পড়াশোনা করেনি বলেই তো তুমি তার ওপর বিরক্ত ছিলে। সে এখন—"

"কার কাছে তার খবর পেলে? কোথায় সে? সে আছে—সে বেঁচে আছে?" যে রোগীকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে সাহায্য করিতে হয়, তাঁহাকে পলকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া শৈলজা চকিতে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহার বেপমান দেহ জড়াইয়া ধরিল। ধীরা বারান্দায়ই ছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিছু-

কাল পরেই হরপ্রসাদ আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, "বল, বল, অজিতের সব কথা আমায় বল। শুনবার শক্তি হয়তো আর আমার বেশীক্ষণ থাকবে না।"

"অমন কথা বলোনা, শান্ত হও; আমি সব কথা বলছি" বলিয়া শৈলজা ধীরে এবং সংক্ষেপে অজিতের সব কথা বলিল।

"সে তবে এখনো কলকাতায় আছে?"

"না। যেদিন তার কাশী যাওয়ার কথা সেই দিন ধীরার চিঠিতে সীতা তোমার খবর পায়। খবর পেয়েই করুণা, বীরেশ আর সীতা তাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছে। কাল রাত্রে তারা এখানে পৌঁছেছে।"

হরপ্রসাদের মূর্চ্ছাতুর দেহ শৈলজার কোলের মধ্যে এলাইয়া পড়িল। শৈলজা সভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেই পাশের কক্ষ হইতে অজিত, অমিয় ও মণিভূষণ ছুটিয়া আসিল। অল্পক্ষণ শুশ্রূষার পরেই হরপ্রসাদের লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসিল। তাঁহার পায়ের উপর হাত রাখিয়া অজিত বসিয়াছিল। তাহার চক্ষু হইতে জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। তিনি নির্নিমেষ-নেত্রে অজিতের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর তাঁহার শুষ্ক চক্ষে প্রবল বন্যা নামিয়া আসিল। তিনি ব্যগ্র হাত দু'খানা বাড়াইয়া দিতেই অজিত তাঁহার কোলের কাছে সরিয়া আসিল। অন্নপূর্ণার মৃত্যুর পর আজ প্রথম তিনি অজিতকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। শৈলজা এবং ধীরা নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল। মণিভূষণ মুখ ফিরাইয়া লইল, অমিয়র চক্ষুও আর্দ্র হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ পরে হরপ্রসাদ শৈলজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সীতা কোথায়? আমি তাকে একবার দেখতে চাই।"

তৎক্ষণাৎ সীতার জন্য লোক প্রেরিত হইল। অবিলম্বে সীতা আসিয়া হরপ্রসাদকে প্রণাম করিল। হপ্রসাদ সস্নেহে সীতার শিরশ্চুম্বন করিলেন। তারপর অজিতের হাতখানা সীতার হাতের উপর রাখিয়া প্রগাঢ় স্বরে বলিলেন, "তোমার জন্যে অজিতকে ফিরে পেয়েছি মা, তোমাকেই দিলাম।"

(সমাপ্ত)

৺সরোজবাসিনী গুপ্তা

গদ্য কবিতা

(১)

আমার ক্ষুদ্রতার হীনতায় ও অক্ষমতার দীনতায় তোমার জন্ম, হে মনোহর! আর তুমি আমার হীনতার ক্ষোভ ও দীনতার ক্লেশ ঘুচাইয়া আমাকে অনন্যমনা কর ও মুগ্ধ কর। এই যে দৃষ্টি কৌতুহলের উদ্বেগে অফুরন্ত দূরে প্রসারিত হইতে গিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহার অবাধগতি রুধিয়া, উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ নীল বর্ণে আকাশের আবরণ রচিয়া তুমি প্রকাশিত হও, হে নয়নরঞ্জন! আর আমি তোমার ধ্যানে তোমার মোহে অসীমের আকাঙ্ক্ষা ভুলিয়া যাই। মানুষের প্রাণের তলায়,—তাহার কর্ম্মের উদ্দেশ্যের তলায়, তাহার গতির জননাস্পদের তলায়, আমার জিজ্ঞাসায় চঞ্চল বুদ্ধিকে ডুবুরি সাজাইয়া নামাইতে যাই, কিন্তু ঘাটের কূলের লহরী-লীলার উপর তোমাকে পাইয়া সেইখানেই সে সাঁতার কাটে। প্রেমের শৈত্যে ও হাসি-কান্নার দৌত্যে আমি তোমাকে জড়াইয়া ধরি, হে মনোহর! তাই অবগাহনে বিস্মৃতি ঘটে। মনোহর! তুমি কি দার্শনিকের ব্যাখ্যার সেই সৃষ্টির মায়া?

(২)

যে চিত্র ফুল্লতায় উদ্ভাসিত, আলোকে অনুরঞ্জিত, মহিমায় মহৎ, তাহা যখন অনুভবের অতীত লোকে লুকায় আর নিবিড় অন্ধকার অতি মসৃণ স্পর্শ বহিয়া আমাকে অধিকার করে, ও আমার চেতনা নিস্তরঙ্গ সাগরের তলায় বিজনতার মূক সম্ভাষণে স্তম্ভিত হয়, তখন তুমি—হে মনোহর, অন্ধকারের অভেদ্য গুহায় মসৃণতার আস্তরণে বসিয়া আমাকে স্পর্শ কর ও আমি সেই স্পর্শে উজ্জ্বল চিত্রের স্মৃতি ভুলিয়া তোমাকে সারা অঙ্গে জড়াইয়া ধরি। স্মৃতির রাজ্যের,—স্বপ্ন-রাজ্যের আলোকের ঢেউ ঊর্দ্ধে—ঊর্দ্ধে মিলাইয়া যায়।

(৩)

হে বিনোদ! তুমি কামনার উদ্বেগে, চিন্তার চঞ্চলতায়, কৌতুহলের গতিতে, নিষ্ফলতার নিশ্বাস-প্রবাহে, আমার হীনতা ও দীনতা হইতে ক্ষরিত সূক্ষ্ম সত্তায় জাগিয়া ওঠ, ও শেষে সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া আমার অনুভূতির ও ভোগের একমাত্র সম্পদ হইয়া দাঁড়াও। তুমি জীবনে আমার সহচর; মরণেও কি অনুচর হইবে? আমি, তুমি একই শিল্পীর রচনা, একই যাদুকরের মন্ত্র। এস মনোহর, আমি তোমার অবিচ্ছিন্ন প্রসারের মধ্যে আমাকে হারাইয়া ফেলি।

ছিটে-ফোঁটা

ধর্ম্ম

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" অর্থাৎ নিজের ধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যু ভাল, কিন্তু পরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিও না। পরধর্ম্ম ভয়ানক।

এই ধর্ম্ম বস্তুটী কি?

শুনা যায়, ধর্ম্ম শব্দ আসিয়াছে "ধৃ" ধাতু হইতে। "ধৃ" ধাতুর অর্থ ধারণ করা। যাহা সমাজকে ধারণ করে অর্থাৎ রক্ষা করে তাহা ধর্ম্ম। যথা, পরের ক্ষতি না করা, পরের দুঃখ দূর করা, ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি ত সকল সমাজ রক্ষার মূল। ইহার মধ্যে আবার স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম কি? যিনি পরের ক্ষতি করেন না, পরের দুঃখ দূর করেন, তিনি ধার্ম্মিক এমন কথা বলিতে পারি না। বলিলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ধার্ম্মিক বলিতে হয়। কিন্তু আমি জানি কোনও ধর্ম্মপন্থী তাঁহাকে নিজের দলে টানিতে চাহিবেন না। যিনি পরের ক্ষতি করেন, তিনি অধার্ম্মিক এমন কথাও বলিতে পারি না। বলিলে তারকেশ্বরের মহন্তদের অনেককে অধার্ম্মিক বলিতে হয়। এরূপ বলিবার সাহস আমার নাই। দেখা যাইতেছে সমাজস্থিতি মূলক নীতিবন্ধনের সহিত ভগবন্নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই।

ধর্ম্ম শব্দ "ধৃ" ধাতু হইতে আসিয়াছে সত্য। কিন্তু প্রত্যয়টি হইয়াছে কর্ম্মবাচ্যে। অর্থাৎ, যাহাকে ধারণ করিতে হয় তাহা ধর্ম্ম। যাহা করিতে হয় তাহা যেমন কর্ম্ম, তেমনি যাহাকে ধরিতে হয় তাহা ধর্ম্ম। (এইস্থানে বলিয়া রাখি যে এ প্রবন্ধের আলোচ্য ধর্ম্ম, ব্যাকরণ নহে। অতএব কেহ যদি এখন ব্যাকরণের সূত্র লইয়া বাগ বিতণ্ডা করিতে আসেন, আমরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিব না।)

আমার হস্তে একগাছি যষ্টি রহিয়াছে। ইহাকে কি ধর্ম্ম বলিব? না। কারণ যষ্টির শক্তি আছে নিজেকে নিজে ধারণ করিবার। আমি ছাড়িয়া দিলেই তাহা লোপ পায় না। আমরা ধরিয়া আছি বলিয়া যাহা আছে, আমরা ছাড়িয়া দিলেই যাহা "নিশার স্বপন সম" মিলাইয়া যাইবে তাহাই ধর্ম্ম।

ঈশ্বর ন্যায়পর। তিনি কখনও অন্যায় করেন না। তবে যদি জোর খোসামোদ করিতে পার ত যাহা করিতেছিলেন তাহা না করিয়া অন্যরূপ একটা কিছু করিবেন, সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি রাখিয়াও তোমার শত্রুদের উচ্ছেদ করিবেন। ঈশ্বর যাহাকে অন্ধ বা পঙ্গু করিয়া সৃজন করিয়াছেন তাহার প্রতি দয়া কর। করিলে তিনি প্রীত হইবেন। কিন্তু যে হতভাগ্য বিধাতার নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণ বুদ্ধির রসদ পায় নাই বলিয়া তাঁহার প্যায়গম্বরের বাণী বুঝিতে পারিল না, তাহার মাথা উড়াইয়া দাও, অমনি তিনি কোলে করিয়া তোমাকে

স্বর্গে তুলিয়া লইবেন। সর্ব্বব্যাপিনী মহামায়া কোনও এক বিশেষ স্থানের বিশেষ মন্দিরে বাস করিয়া জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিয়া থাকেন। কিন্তু আত্মরক্ষার বেলা লাঠিয়ালের শরণাপন্ন হয়েন। এই গুলিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা ধর্ম্ম। প্রাণপণে আঁকড়াইয়া না থাকিলে এই বিশ্বাস এক পলও টিকিতে পারিত না। নিজের দাঁড়াইবার শক্তি নাই বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ ধর্ম্মকে একপদ বৃষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্ম্ম আমাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ একপ্রকার জীবাণু। আমরা Hostরূপে ইহাকে ধারণ করি। এই মতবাদের প্রধান পাণ্ডা হইতেছেন Professor Rottschzeinskiff. শুনা যায় Rottschzeinskiff আজিও জন্মগ্রহণ করেন নাই। যাঁহারা তাঁহার জীবন চরিত লিখিবেন তাঁহারা ইহা লইয়া বাদানুবাদ করুন। আমরা কেবল তাঁহার মতটী উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"Religion is the most virulent pathological organism known to us. Once affected, a person is never free from its influence. A cure is rare, recurrence is the rule. * * * *

It is beyond the range of the microscope. And, inoculation experiments carried in the usual way have, so far, been unsuccessful. But inoculation through special culture media, *e. g.*, the water of the Jordan or the Ganges is well-known ; while transmission through germ cells, from generation to generation, is not only known, but notorious.

It produces characteristic Anatomical and Histological changes.

The Anatomical changes vary according to the strain of the organism. One variety will cause a tuft of hair to grow from a point midway between the parietal eminences, while another will make the beard grow at the expense of the hair and moustaches.

Of the Histological changes, the most important is a cloudy swelling of the Brain. This is manifested early, by a loss of reasoning power of the patient, associated with a sense of his own importance and infallibility and later on, by an aberration of the impulse of Love, which is deviated from normal channels, towards something unknown and unknowable. This explains the self-complacent cruelty of religious men.

The symptom last to appear, is a peculiar beadcounting tremor of the right-hand fingers and a muttering delirium which the patent designates "Prayer."

সকল দিক চিন্তা করিয়া Professor Röttschzinskiff এর কথাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন হিন্দুগণও হয়ত ধর্ম্মকে জীবাণু বলিয়া জানিতেন। তাই তাঁহারা বলিয়াছেন "বান্ধবা বিমুখা যান্তি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলং।" বাস্তবিক জীবাণু ব্যতীত আর কে ছিন্নকন্থাবিহারী ছারপোকার ন্যায় মৃতের সহিত এক চিতায় ভস্মসাৎ হইয়া একই পরলোকে প্রয়াণ করিতে পারে ?

এইবার ধর্ম্মসম্বন্ধে অপ্রচলিত দুইটী মতের আলোচনা করিব। ১ম ;—সমুদ্রমন্থনে যে বিষ

উদ্গীর্ণ হইয়াছিল তাহাই ধর্ম্মরূপে জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ মত অত্যন্ত অসার। কারণ আমরা জানি সমুদ্রমন্থনের পূর্ব্বেও সংসারে ধর্ম্ম ছিল! ধর্ম্ম না থাকিলে দেবাসুরের মধ্যে এত কাটাকাটি, লাঠালাঠি হইবে কেন? যখনি দেখি একবংশোদ্ভূত কয়েকজন নিজেদের দুইদলে ভাগ করিল, এবং ইহাদের এক দলের প্রত্যেকে প্রতিনিয়ত অপর দলের প্রত্যেকের মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল, তখনি বুঝিতে পারি ইহার মূলে ধর্ম্ম আছে। যে হিংসা অহেতুকী, যাহাতে ঐহিক লাভ কিছু নাই। তাহা নিশ্চয়ই পারত্রিক লাভের আশায়, অর্থাৎ ধর্ম্মসঞ্জাতা। এ ধর্ম্ম সমুদ্রমন্থনের পূর্ব্বেও ছিল।

২য়। "ধর্, মার্!" এই বাক্য সংক্ষিপ্ত হইয়া "ধর্ম্মাঃ" এই পদের সৃষ্টি করিয়াছে। এ কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ "ধর্ম্মাঃ" প্রাচীন সংস্কৃত পদ, এবং "ধর্ মার্" বাংলা। তবে পুরাকালে বঙ্গভাষার প্রচলন ছিল কিনা, এবং অন্যান্য প্রাকৃত শব্দের ন্যায় বাংলার দু একটা শব্দও সংস্কৃতে স্থান পাইয়াছে কি না, পণ্ডিতেরা বিচার করিবেন।

কতগুলা মতের সংখ্যা বাড়াইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। ধর্ম্মের স্বভাব কি আমাদের জানা আছে। এইবার তাহার অভাব না ঘটে সে বিষয়ে নজর রাখিতে হইবে। কারণ, যাঁহারা সমাজের নাড়ী ধরিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা বলিতেছেন "মকরধ্বজে যেমন স্বর্ণ, সেইরূপ জীবন ব্যাপারে ধর্ম্ম অপরিহার্য্য। জীবনের সহিত ইহার কোন প্রকার যোগ অসম্ভব। কিন্তু ইহাকে ছাড়িলে চলিবে না। ছাড়িলে লোকযাত্রা অসঙ্গত রকম সহজ হইয়া পড়িবে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।"

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

অকূল পাথার

ধরণীর যেথা যত রয়েছে গৌরব
সমস্ত ছাঁকিয়া গড়া তনু দেহখানি।
এক তনু তট তলে পাই আমি সব—
সুখের অজস্র হাসি, বেদনার গ্লানি।
আকাশ পড়েছে ভাঙি' নীল দুটি চোখে,
মুখে জাগে সমুদ্রের লাবণ্য জোয়ার;
উচ্ছ্বসিত আনন্দের অকুণ্ঠ কৌতুকে,
বক্ষে ডানা মেলিয়াছে পুষ্পিত পাহাড়।
কখনো মনের বনে ফোটে শতদল,
কভু সেথা নেচে উঠে মেঘের ময়ূর,
অধরে অরুণ হাস্য আঁখিভরা জল,
বসন্ত ও বরষার বিচিত্র সে সুর।
কে বলে সসীম দেহ—আমি দেখি তার
সীমা নাই—শেষ নাই—অকূল পাথার!

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

চিরন্তন

বিদায়ের দূত এল ঘনায়ে দুয়ারে
তুমি লিখিয়াছ লেখা সারা দেহময়;
তাইতো পড়িনি ভেঙে বেদনার ভারে,
জাগেনি মর্ম্মের মাঝে মৃত্যুর প্রলয়।
বৃথা বিদায়ের বাণী,—চকিত চঞ্চল
এ চোখে তোমারি দিঠি হানে শিহরণ,
কত সে কালের ছোঁয়া—হয়নি শীতল,
উত্তপ্ত তেমনি আছে উষ্ণ চুম্বন।
তোমারে বেসেছি ভালো—ভালোবাসি তাই
তোমার পরশে ছাওয়া এই তনু খানি,
এ তনুর তীরে তীরে কোথা তুমি নাই?—
তাইতো একান্ত মিথ্যা বিদায়ের বাণী।
ঐ তব স্পর্শ আর এই আলিঙ্গন—
আমার দেহের মাঝে তারা চিরন্তন।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

প্রতিধ্বনি

উনপঞ্চাশী

শান্ত, শিষ্ট, সুবুদ্ধি, রামমাণিক্য হাঁসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে। দাঙ্গার সময় তার যে মাথাটা ফেটেছিল, সেটা জোড়া লেগেছে, কিন্তু ভাঙ্গা মনটা তার আর জোড়া লাগতে চাইছে না! দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলুম—"কি রামমাণিক্য, আছ কেমন?" রামমাণিক্য একটু ম্লান হেসে বল্‌ল—"বেঁচে আছি। কিন্তু কি ভয়ানক লোক ওরা! হাঁসপাতালে যা দেখে এলুম তাতে আমার আক্কেল হয়ে গেছে। ওদের নিয়ে অহিংস অসহযোগ করতে যাওয়া যে কত বড় পাগলামি, তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি। ওদের খলিফাকে সিংহাসনে বসাতে হবে, লেগে গেলুম চাঁদা তুলতে; ঘুরতে ঘুরতে পায়ের গোছ ফুলে গেল। ওদের বাড়ী ঘর দোর রাজসাগীতে ডুবে গেছে; না খেয়ে না দেয়ে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে তাদের সেবা করেছি; ছেলে মেয়ে সবাই মিলে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়িয়েছি। মাদারিপুরে ওদের বাড়ি ঝড়ে উড়ে গেল কোন খিলাফতী স্যাঙ্গাৎ টুঁ শব্দটি করলে না; আমরা গিয়ে তাদের বাড়ীর চাল ছায়িয়ে দিয়ে এলুম। কিন্তু আজ যেই ভিতর থেকে কে কল টিপে দিলে, অমনি লাঠি এসে পোড়লো আগে আমার ঘাড়ে। আমি ওদের কখন ত কোন অনিষ্ট চিন্তা করিনি! উঃ—কি ভয়ানক লোক ওরা!"

আমি বল্লুম, "রামমাণিক্য হে! ক্ষমাই মহতের ধর্ম্ম। হিংসাকে অহিংসা দিয়ে, ক্রোধকে প্রেম দিয়ে জয় করাই হচ্ছে অসহযোগের বিধি। অতএব তুমি লাঠির ঘায়ের উপর প্রেমের প্রলেপ দিয়ে মাথাটাকে ঠাণ্ডা করে ফেলো।"

রামমাণিক্য বল্লে—"না, দাদা, তুমি ঠাট্টা কোরো না। আমার মনটা সত্যিই ভারি খারাপ হয়ে গেছে। এই দেখ, কাল বাড়ী থেকে কি চিঠি পেয়েছি। কলকাতা থেকে জনকতক কাঠ'মাল্লা গিয়ে ফতোয়া দিয়েছে যে কাফেরের সঙ্গে লড়াই করতে হবে; আর তিন দিনের মধ্যেই আমাদের কালীবাড়ীর ঠাকুর কে ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। এখন উপায় কি বল ত? এ রকম ভাবে ত আর এ দেশে বাস করা চলে না। একটা বোঝাপড়া হওয়াই চাই।"

আমি বল্লুম—"সাধু প্রস্তাব। কিন্তু যাবেই বা কোথা, আর বোঝাপড়ার রূপটাই বা কি রকম হবে?"

রামমাণিক্য বল্লে—"সেই কথাই ত ভাবছি। অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে নেতাঁরা কেউ হালে পানি পাচ্ছেন না। কেউ বলছেন দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে, কেউ বলছেন, ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলো যে এ রকম করলে দেশের ক্ষতি হবে। কেউ বলছেন, চাঁদা তুলে একটা Defence Fund খুলে ফেলো। কিন্তু বুঝিয়ে বলবারও ব্যবস্থা দেখছি নে, আত্মরক্ষারও ব্যবস্থা দেখছি নে। তা হলে কি পড়ে' পড়ে' মারই খেতে হবে?"

আমার ইচ্ছা হলো বলি যে, মহাত্মাজীকে লিখে পাঠাও যেন তিনি এসে তাঁর আলি ভাইদের সঙ্গে নিয়ে মসজিদে মসজিদে চরকা চালাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে যান। তাহলে হয়ত চরকার আধ্যাত্মিক প্রভাবে সব ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার পর মনে হোলো কথাটা বলা ভাল হবে না। কাজেই বল্লুম—"তাই ত, রামমাণিক্য, এ যে বিষম সমস্যায় পড়া গেলো। চল দেখি, একবার গোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করে আসি।"

গোঁসাইজীর ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি একখানা খপরের কাগজ মুখে চাপা দিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে আছেন

আমরা গিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করতেই তিনি ধড়মড় করে উঠে বসে বল্লেন—"এই যে এসেছ! তোমাদের কথাই ভাবছিলুম। মোহম্মদ আলি আর হুজু দাদা ভীমসেন সৌকত'আলির বক্তৃতাটা পড়েছ? কাফের-বধ মহাকাব্যের তাঁরা যে ভূমিকা লিখেছেন, তা অতি 'ক্লাষ্টো কেলাস' হয়েছে। খালিপেট-কোম্পানীর এখন যে রকম অর্থাভাব তাতে একটা রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে পদা ঘুরিয়ে এই রকম দু চারটে গরম গরম বক্তৃতা ঝাড়লে খালিপেট ভরে যেত। আহা বেচারাদের বরাতটা একবার দেখ। এতদিন ধরে যা-কিছু সংগ্রহ হলো, তা গেলো শেঠ ছোটানির গর্ভে। এখন খালিপেট ভরে কি করে? তাই ছোট ভাই ছাহেব নুটিস দিয়েছেন যে, মুসলমানেরা যদি চাঁদা করে' তাঁর হাতে কিঞ্চিৎ রজতখণ্ড তুলে দেন তা হলে তিনি মুসলমানদের দুঃখ কষ্ট ত ঘুচিয়ে দেবেনই; অধিকন্তু স্বরাজের একটা উর্দ্দু সংস্করণ গড়ে তুলতে পারবেন। আর দেখ, কামাল পাশাটার কি দুষ্ট বুদ্ধি! এতগুলো ভদ্র-সন্তান যা হোক একটা খালিপেট-উদ্ধারের ব্যবসা চালিয়ে নির্ব্বিঘ্নে দিন কাটাচ্ছিল, তা সে ব্যবসা ফেল করিয়ে দিলে! এখন একটা যাহোক ছোটখাট স্বদেশী খালিপেট-কোম্পানী খাড়া না করতে পারলে বেচারারা দাঁড়ায় কোথায়? এখন দুচারটা কাফের ঠেঙ্গাবার প্রস্তাব করে আসর জমিয়ে না নিলে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি হয় কি করে?"

রামমাণিক্য হাঁ করে গোঁসাইজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আমি বললুম—"খালিভাই-ছাহেবদের কথা ছেড়ে দিন। এখন রামমাণিক্যের ভাঙ্গা মাথা যদি জোড়া লাগলো, ত ওদের পৈতৃক কালী ঠাকরুণের মাথা খসে পড়লো। কে রাতারাতি এসে ঠাকুর ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। এর ব্যবস্থা কি তাই জানবার জন্যে আপনার কাছে এসেছি।"

গোঁসাইজী প্রচণ্ড একটা হাঁই তুলে বল্লেন—"যাক্, কালী ঠাকরুণের জন্যে আমার তত ভাবনা নেই। তিনি যখন নিজের মাথা নিজে কেটে ছিন্নমস্তা হন, তখন অপরের আর দোষ কি? কিন্তু খালিপেট কোম্পানীর পেট ভরাবার জন্যে রামমাণিক্যের মত অনেকগুলি গো-বেচারার রক্তপাত হচ্ছে, এইটা অবশ্য ভাববার কথা। কিন্তু মাথা কেটেও যদি চোক ফোটে ত তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই।"

রামমাণিক্য জিজ্ঞাসা করলে—তা হলে আপনি কি করতে বলেন? গোঁসাইজী বল্লেন—"এর ত কোন পেটেণ্ট দাওয়াই দেখতে পাচ্ছি নে—যা খাবামাত্র এতদিনের রোগটা সেরে যাবে। রোগটা হতেও অনেক দিন লেগেছে, আর সারতেও হয়ত অনেকদিন লাগবে। তবে ঠিক মতো ওষুধ পড়লে বাড়াবাড়িটা আপাততঃ কিছু কমতে পারে।"

আমরা গোঁসাইজীর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলুম। তিনি খপরের কাগজখানা ভাঁজ করতে করিতে বললেন—"আসল ব্যাপারটা হয়েছে কি জান—আমাদেরও যে দুর্গতি, ওদেরও তাই। ইংরেজী লেখা-পড়া যারা শিখেছে তাদের ত ওকালতী, ব্যারিষ্টারি, মাষ্টারী, ডাক্তারী আর কেরাণীগিরি ছাড়া গত্যন্তর নেই। তারা ব্যবসা করতে জানে না, চাষ করতেও পারবে না। এখন তারা খায় কি? হিন্দুদের ঘরেও হাজার হাজার ছেলে পাশ করে' ক্যা ক্যা করে' বেড়াচ্ছে, মুসলমানদেরও তাই হতে আরম্ভ করেছে। এত কষ্ট করে' পাশটাশ করছে, অথচ পয়সার বেলা অষ্টরম্ভা। এতে মানুষের রাগ হয় বৈ কি! তাই এদের ইংরেজীওয়ালা পণ্ডিতেরা ঠিক করেছেন যে যদি চাকরী-বাকরীগুলো হিন্দুদের সঙ্গে অন্ততঃ আধাআধি বখরা করে নিতে পারা যায় তা হলে কিছুদিন হয় ত এক রকম চলে যাবে। হিন্দুদের মধ্যেও ইংরেজীওয়ালা পণ্ডিতদের চাকরী ছাড়া গতি নেই। তাঁরা মুখের গ্রাসটা পরের হাতে তুলে দিতে নারাজ। কাজেই দু'দল চাকরীর উমেদারে ঠোকাঠুকি লাগছে।

এই দু'দলই হচ্ছেন ইংরেজী পড়ার ফলে politically-minded. কাজেই পেটের জ্বালাটা politicsএর রূপ নিয়ে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে' উঠছে। আমাদের দেশবন্ধু সেই কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন, তাই তাঁর প্যাক্টের আসল কথা হচ্চে—বেচারাদের গোটাকতক চাকরী দাও; পেট ঠাণ্ডা হলেই মাথা ঠাণ্ডা হবে।"

রামমাণিক্য বল্লে—"তা যেন হলো কিন্তু আবদার যে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে!"

গোঁসাইজী বল্লেন—"অমন অবস্থায় পড়লে সকলেরই তা হয়। এত লোকের পেটের জ্বালা ত শুধু চাকরীতে মেটে না, কাজে কাজেই চীৎকারের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আর চেঁচামেচিটা ক্রমে লাঠালাঠিতে দাঁড়াচ্চে।"

আমি বল্লুম—"আপনার থিওরীটা আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। পেটের জ্বালা ধরলো ইংরেজী-ওয়ালাদের, কিন্তু লাঠালাঠিটা চলছে মূর্খ গরীবদের ভিতর। তা কি রকম করে' হয়?"

গোঁসাইজী হেসে বল্লেন—"আরে ভাই, ওটুকুই হচ্চে রাজনীতির প্যাঁচ। লোকের কাছে ত আর বলা চলে না যে যেহেতু আমাদের পেট ভরছে না, অতএব তোমরা মাথা-কাটাকাটি করে' আমাদের একটু সুবিধা করে দাও। তাদের বল্‌তে গেলে আরও গোটাকতক ভাল ভাল কথা বানিয়ে বল্‌তে হয়। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় একজন মৌলবী সাহেবের বক্তৃতা শুনেছিলুম! তিনি আগে ছিলেন পুলিশের দারোগা। ঘুষ নেওয়ার অপরাধে তাঁর চাকরী যাবার পর তিনি স্থির করলেন যে ইংরেজের চাকরী একদম হারাম, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর অহিংস অসহযোগী হয়ে উঠলেন। প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও তাঁর বাড়তে লাগলো, আগে ছিলেন মোল্লা তিন মাসের মধ্যেই হয়ে উঠলেন মৌলভী; আর আজকাল শুনছি প্রোমোশন পেয়ে হয়েছেন মৌলানা। খলিফার রাজ্য গিয়ে মুসলমানদের যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে একদিন তিনি নিরক্ষর চাষাদের সেই কথা বোঝাচ্ছিলেন। মৌলভী সাহেব বললেন—'দেখ ভাইছাহেবসকল, আপনারা যে পাঁচ বকৃত নেমাজ করেন, সেগুলো খোদার দরবারে পৌঁছে দেয় কে?' চাষারা এই গভীর প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে মৌলবী সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মৌলবী সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মৌলবী সাহেব তখন অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"হদিশে লেখা আছে যে পরম্পরের হুকুম মতো রুমের যিনি সোলতান, আর মুসলমানদের যিনি খলিফা, তিনি মোসলমানদের নেমাজগুলি মুঠোর মধ্যে করে' খোদার দরবারে পৌঁছে দেন।' এখন বুঝুন কি সর্ব্বনাশ হলো। রুমের বাদশা গেছেন চলে, কাজেই মুসলমানদের আর খলিফা নাই। এখন নেমাজগুলি সব হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" এই ভীষণ আধ্যাত্মিক দুর্ঘটনার কথা শুনে, মুসলমানদের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। খিলাফতের জন্যে লড়াই যে চালাতেই হবে, এ বিষয়ে আর কারও সন্দেহ রইল না। দু'আনা চারআনা করে ১০৷১৫ টাকা চাঁদা ত তারা দিলেই; অধিকন্তু পাঁচ সাত জন জোয়ান লাঠি নিয়ে খাড়া হয়ে উঠলো এখনি তারা কাফেরের মাথা ভেঙ্গে দেবে। মৌলবী চাঁদার টাকাগুলি পকেটস্থ করে সেখান থেকে সরে পড়লেন। খলিফার জন্যে যে লাঠি উঠেছিল তা যে কার মাথায় পড়লো তা তিনি দেখে যান নি, কিন্তু আমরা এখন তা দেখতে পাচ্ছি। এখন ইংরেজীওয়ালা মুসলমান বাবুরা নাচাচ্ছেন মৌলভীদের, আর মৌলভীরা নাচাচ্ছে গরীব মূর্খদের। তার ফল চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ।"

রামমাণিক্য বল্লে—"দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এর প্রতিকার কি?"

গোঁসাইজী বললেন,—"বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখতে পার, কিন্তু যেখানে ভীষ্ম-দ্রোণ হালে পানি পাচ্ছেন না, সেখানে শল্য বাবাজী যে বিশেষ কিছু করে' উঠতে পারবেন বলে ত মনে হয় না। যেখানে মহাত্মা গান্ধী হার মেনে মৌন নিয়েছেন সেখানে আমার কথা-বলা ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কি জান, ব্রাহ্মণের ছেলে আমি, শাস্ত্রটা একটু

মানি। আমার মনে হয় গান্ধীজী শাস্ত্রটা না মেনে একটু ভুল করে' ফেলেছেন। নূতন পন্থা আবিষ্কার করতে না গিয়ে সনাতন শাস্ত্রে আমাদের মুর্গ বাবাজীদের জন্য যে ব্যবস্থা করে গেছেন, তা সোজাসুজি মেনে নিলে হয়ত এতদিন একটা কিছু হয়ে যেত।"

রামমাণিক্য মাথা চুলকুতে চুলকুতে বল্‌লে—"তাই ত, তাই ত!"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—ভারতী (বৈশাখ)

পুরাণ প্রসঙ্গ

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে পুরাণ শব্দের ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়। পুরা ভবম্ ইতি পুরাণম্। পুরা শব্দের উত্তর ট্যু প্রত্যয় হইয়া শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। পুরাণ শব্দের সাধারণ অর্থ পুর্ব্বতন। ইহার যৌগিক অর্থ প্রাচীন আখ্যায়িকাদিযুক্ত গ্রন্থবিশেষ। পুরাণের এইরূপ লক্ষণ করা হইয়া থাকে—"ব্যাসাদি মুনি প্রণীত বেদার্থবর্ণিত পঞ্চলক্ষণান্বিত শাস্ত্র।" এইজন্য অমরকোষে ইহার প্রতিশব্দ "পঞ্চলক্ষণম্" পাওয়া যায়। পুরাণের যে পাঁচটী লক্ষণ মৎস্য পুরাণে দেওয়া আছে তাহা এই—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।

সর্গ অর্থে সৃষ্টি, প্রতিসর্গ অর্থে পুনঃ পুনঃ লয় ও পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি, বংশ অর্থে প্রাচীন ঋষি প্রজাপতি ও রাজাদের বংশাবলী, মন্বন্তর অর্থে কোন্ কোন্ মনুর পর কোন্ কোন্ মনু প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন* এবং বর্ণনীয় পুরাণের কথা কোন্ মনুর সময় সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, এবং বংশানুচরিত অর্থে সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি বংশের রাজাদিগের চরিত্র—এই পাঁচটী বিষয় লইয়া যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই পুরাণ। তবে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে যদি কোন পুরাণে বৌদ্ধ যুগের ও তৎপরবর্ত্তী কালের কথা বা আধুনিক প্রসঙ্গ পাওয়া যায় তাহা হইলে সে অংশটীকে নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে হইবে।

পুরাণ ভিন্ন এই শ্রেণীর আরও কয়েক প্রকারের রচনা আছে তাহাদের ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ১৩২ অধ্যায়ে এই প্রকার উল্লেখ আছে,

* মন্বন্তর (১) স্বায়ম্ভুব (২) স্বারোচিষ (৩) ঔত্তমী (৪) তামস (৫) রৈবত (৬) চাক্ষুষ (৭) বৈবস্বত (অধুনা) (৮) সাবর্ণী (৯) দক্ষ-সাবর্ণী (১০) ব্রহ্ম-সাবর্ণী (১১) ধর্ম্ম-সাবর্ণী (১২) রুদ্র-সাবর্ণী (১৩) রৌচ্য (১৪) ভৌত্য—১৪টী মন্বন্তরে এক কল্প।

ইতিহাসো ভারতঞ্চ বাল্মীকং কাব্যমেবচ।
পঞ্চকং পঞ্চরাত্রাণাং কৃষ্ণ মাহাত্ম্যপূর্ব্বকম্॥
বাশিষ্ঠং নারদীয়ঞ্চ কাপিলং গৌতমীয়কম্।
পরং সনৎকুমারীয়ং পঞ্চরাত্রঞ্চ পঞ্চকম্॥
পঞ্চমাঃ সংহিতানাঞ্চ কৃষ্ণভক্তিসমন্বিতাঃ।
ব্রহ্মণশ্চ শিবস্যাপি প্রহ্লাদস্য তথৈব চ॥
গৌতমস্য কুমারস্য, সংহিতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্॥

অর্থাৎ ইতিহাস, মহাভারত, রামায়ণ, পঞ্চরাত্র ও সংহিতা নামক রচনা পাওয়া যায়। পাঁচখানি পঞ্চরাত্রের নাম বাশিষ্ঠ, নারদীয়, কাপিল, গৌতমীয় ও সনৎকুমারীয়। পাঁচখানি সংহিতার নাম ব্রহ্ম, শিব, প্রহ্লাদ, গৌতম ও কুমার। "অষ্টাদশ পুরাণানামেবমেবং বিদুর্বুধাঃ "—আঠারখানি পুরাণের নাম এই—(১) ব্রহ্মপুরাণ (২) পদ্ম পুরাণ (৩) বিষ্ণু পুরাণ (৪) শিব বা বায়ু পুরাণ (৫) শ্রীমদ্ভাগবত কিম্বা দেবী ভাগবত (৬) নারদ পুরাণ (৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৮) আগ্নেয় পুরাণ (৯) ভবিষ্য পুরাণ (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ (১১) লিঙ্গ পুরাণ (১২) বরাহ পুরাণ (১৩) স্কন্দ পুরাণ (১৪) বামন পুরাণ (১৫) কূর্ম্ম পুরাণ (১৬) মৎস্য পুরাণ (১৭) গরুড় পুরাণ (১৮) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

এই অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়, যথা বিষ্ণু পুরাণে,

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
প্রখ্যাতো ব্যাস শিষ্যোভূতৎ সূতো বৈ লোম হর্ষণঃ
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥

কোন বস্তু স্বয়ং দেখিয়া যদি তাহার বর্ণনা করা যায় তাহাকে আখ্যান বলে, যদি পরস্পরের নিকট শুনিয়া কোন বস্তুর বিবরণ দেওয়া যায় সেই বিবরণকে উপাখ্যান বলে। পিতৃগণ ও পরকাল বিষয়ক গীতের নাম গাথা। শ্রাদ্ধ কথা নির্ণয়কে কল্পশুদ্ধি বলে। পুরাণার্থবিশারদ ভগবান বেদব্যাস আখ্যান উপাখ্যান গাথা এবং কল্পশুদ্ধি সহিত সংহিতা রচনা করিলেন। তাহার সূত জাতীয় লোমহর্ষণ নামক এক শিষ্য ছিলেন, মহামুনি ব্যাস তাহাকে পুরাণ সংহিতা অর্পণ করিলেন; লোমহর্ষণের সুমতি, অগ্নিবর্চা, মিত্রয়ু, শংশপায়ন, অকৃত ব্রণ এবং সাবর্ণি নামক ছয় শিষ্য ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কাশ্যপবংশীয় অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শংশপায়ন লোমহর্ষণের নিকট পঠিত মূল সংহিতা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেকে এক একটী সংহিতা রচনা করিলেন। (বিষ্ণু পুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলেন, "এতেষাং সংহিতানাং

চতুষ্টয়েন সারোদ্ধাররূপমিদং বিষ্ণু পুরাণং। কেচিত্তু সংহিতানাং চতুষ্টয়েন ইদমাস্থং ব্রহ্মামুচ্যতে ইতি বদন্তি।" অর্থাৎ এই চারি সংহিতার সারোদ্ধার রূপ এই বিষ্ণু পুরাণ, এবং কেহ কেহ বলেন এই চারি সংহিতার সহায়তায় ব্রহ্ম পুরাণ রচিত হইয়াছে)। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে বেদ বিভক্ত, কিন্তু ব্রহ্ম-যজ্ঞ-প্রকরণে মন্ত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন ইতিহাস প্রভৃতি আরও কতকগুলি বেদভাগের উল্লেখ আছে, যেমন ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা, নারশংসী। তাহা হইলে কি ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদিও বেদের পৃথক্ পৃথক্ অংশ? এইরূপ হইতে পারে না, যেহেতু বিপ্র পরিব্রাজক ন্যায় অনুসারে (অর্থাৎ যেমন বিপ্র ও পরিব্রাজক পৃথক্‌ভাবে বর্ণিত হইলেও পরিব্রাজক বিপ্রের অন্তর্গত তদ্রূপ) ইতিহাস পুরাণ পৃথক্‌ভাবে বর্ণিত হইলেও ব্রাহ্মণও মন্ত্রভাগের অন্তর্ভুক্ত। "দেবতা অসুরগণ যুদ্ধে রত ছিল" এই বাক্যগুলি ইতিহাস। "এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না" এইরূপে জগতের পূর্ব্বাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিপ্রতিপাদক বাক্য সকল পুরাণ। অরুণ কেতুক চয়ন প্রকরণের কতকগুলি মন্ত্রকে কল্প বলে। ইহার পর যদি বলি প্রদান করা হয় তবে অগ্নিচয়নে যমগাথা গান করিবে এইরূপ বিহিত মন্ত্রবিশেষ গাথা। মনুষ্য বৃত্তান্ত প্রতিপাদক ঋক্ সকলের নাম নারশংসী। বেদের মন্ত্র ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত অপর ভাগ নাই। শিক্ষাদি ষড়ঙ্গের ন্যায় পুরাণাদিরও বেদার্থ জ্ঞানে উপযোগ দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে আছে, "পুরাণ,[১] ন্যায়,[২] মীমাংসা[৩] ধর্ম্মশাস্ত্র[৪] ও অঙ্গমিশ্রিত[১৪] বেদ সকলই বিদ্যা ও ধর্ম্মের চতুর্দ্দশ স্থান।

পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গ মিশ্রিত
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশঃ।

ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদ সমুপবৃংহিত (বলযুক্ত) করিবে। অল্পজ্ঞের নিকট বেদ "এ আমাকে মারিবে" বলিয়া ভয় পান - —

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপাবৃহংয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাৎ বেদো মাময়ং প্রহরেদিতি॥

অন্যত্রও স্মৃতিতে আছে—"ঐতরেয়তৈত্তিরীয় কঠাদি শাখায় উক্ত ধর্ম্ম ও ব্রহ্মরূপ অর্থবোধে উপযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নাচিকেতা ইত্যাদির উপাখ্যান সকল ইতিহাসাদিতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে। উপনিষদে কথিত সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি ব্রহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণবাদি পুরাণে স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পঞ্চলক্ষণ সৃষ্ট্যাদির পুরাণ প্রতিপাদিত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে।

অথর্ব্ববেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য তৈত্তিরীয়ারণ্যক, মহাভাষ্য, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে পুরাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণযজুষা সহ।
উচ্ছিষ্টা যজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতাঃ॥
অথর্ব ১১।৭।২৪॥

তথা সবৃহতীং দিশিমনুব্যচলৎ।
তমিতিহাসশ্চ পুরাণঞ্চ গাথাশ্চ নরেশংসীশ্চানুব্যচলন্। ১১
ইতিহাসস্য চ বৈ স পুরাণস্য চ গাথানাং চ নারশংসীনাঞ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ।
অথর্ব—কাঃ ১৯ অনু ১।৬।১২॥

যজ্ঞের উচ্ছিষ্টের দ্বারা ঈশ্বর যজুর্বেদ সহ ঋক্, সাম, ছন্দ এবং পুরাণ প্রকাশ করিলেন ।১১।৭।২৪॥ তাহা বহুদিক্ ব্যাপ্ত হইল, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা নারশংসী তাহার পশ্চাতে গমন করিল। ১১। যে এই কথা জানে সে ইতিহাস পুরাণগাথা ও নারশংসীর প্রিয়ধাম হয়।

গোপথ ব্রাহ্মণে আছে—

"এবমিমে সর্ব্বে বেদা নির্মিতাঃ সকল্পাঃ সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ সেতিহাসাঃ সান্বয়াখ্যাতাঃ সপুরাণাঃ সস্বরাঃ" ইত্যাদি। গোপথ পূর্ব্বভাগ ২ প্রঃ। এই প্রকারে কল্প রহস্য ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, ইতিহাস, বংশ ও পুরাণ সহ সমস্ত বেদ নির্ম্মিত হইল।

শত পথ ব্রাহ্মণে আছে—

"তানুপাদিশতি পুরাণং বেদঃ সোয়মিতি ইতি
কিঞ্চিৎ পুরাণ মাচক্ষীতৈব মেবাধ্বর্য্যুঃ সংপ্রেষ্যতি
ন প্রক্রমান্ জুহোতি।
অথ দশমহন্।" শ ১৩।৪।৩।১৩॥

(অধ্বর্য্যু শব্দের অর্থ—যজ্ঞ চারি জন ঋত্বিক দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, হোতা, উদ্গতা, ব্রহ্মা ও অধ্বর্য্যু। যে যজ্ঞ হইতেছে হোতা তাহার উপযোগী ঋক্ সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠ করেন, উদ্গাতা সামবেদ হইতে ঐ যজ্ঞের দেবতার স্তুতিবোধক স্তোত্র পাঠ করেন। অধ্বর্য্যু যজুর্ব্বেদের মন্ত্রপাঠ করিয়া যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেন, তিনিই যজ্ঞ নিষ্পাদক।—ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই সকলের কার্য্য নির্ভুল হইতেছে কিনা দেখিতে থাকেন ও যখন যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দান করেন। ব্রহ্মার কার্য্য মানসিক, অপর তিন জনের কার্য্য কায়িক ও বাচনিক।

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যে বচন উদ্ধৃত হইল তাহার অর্থ এই "অধ্বর্য্যু তাঁহাদিগকে পুরাণের উপদেশ দেন, ইহাই সেই বেদ এইরূপ বলিয়া কিঞ্চিৎ পুরাণ কীর্ত্তন করেন। যজ্ঞের দশম দিনে কিছু পুরাণ শুনিতে হয়।

বৃহদারণ্যক ও শত পথের অন্যস্থানেও লেখা আছে—

"এবং বা মরেহস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিত মেতৎ যৎ ঋগ্বেদঃ যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাদি রসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ" ইত্যাদি।

শত ১৪।৬।১০ বৃহদা ২।৪।১১।

আর্দ্র কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন অগ্নি হইতে যেমন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধূম নির্গত হয় সেইরূপ এই মহা ভূতের নিশ্বাস হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদাদি উৎপন্ন হইয়াছে। কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় নাই।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও আছে—

"সোঽবাচ ঋগ্বেদং ভগবোধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমথর্ব্বাণং চতুর্থমিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।" ছাঃ প্রঃ ৭ খঃ ১॥

অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ বেদের পঞ্চম বেদ।

শত পথ ব্রাহ্মণে ইতিহাস পুরাণের স্বাধ্যায় লিখিত হইয়াছে—

"এবং বিদ্বান্ বা কো বাক্যমিতিহাসঃ পুরাণমিত্যহরহং স্বাধ্যায়মধীতে ত এনস্তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সর্ব্বৈর্ভোগৈঃ।" শত ১১।৫।৭।৯।

যে বিদ্বান্ বাক্য, ইতিহাস, পুরাণ প্রতিদিন পাঠ করেন তাহার প্রতি দেবতারা তুষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া ও তাহাকে সমস্ত ভোগ দিয়া তৃপ্ত করেন।

এই সকল বৈদিক প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে পুরাণকেও বেদের ন্যায় নিত্য ও অপৌরুষের বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়। আমরা দেখিয়াছি যে পুরাণ বেদের অংশ ও বেদ হইতে অভিন্ন। প্রাচীনকালে পুরাণ সকলের বেদের ন্যায় আদর ছিল এবং পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সায়নাচার্য্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপক্রমে লিখিয়াছেন—

"দেবাসুরা সংযত্তা আসন্ ইত্যাদয় ইতিহাসাঃ ইদং বা অগ্রেনৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকং জগতঃ প্রাগবস্থানুপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্।"

বেদের অন্তর্গত দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনার নাম ইতিহাস এবং প্রথমে কিছুই ছিল না ইত্যাদি জগতের প্রথম অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ সূচক বাক্য সমষ্টির নাম পুরাণ।

শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

" ইতিহাস ইত্যর্ব্বশী পুরুরবসো সম্বাদাদিরুর্ব্বশী অপ্সরা ইত্যাদি ব্রাহ্মণমেব পুরাণমসদ্বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদি।"

উর্ব্বশী অপ্সরার কথোপকথনাদি স্বরূপ ব্রাহ্মণবাক্য ইতিহাস এবং সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র অসৎ ছিল ইত্যাদি সৃষ্টি প্রক্রিয়াঘটিত বিবরণের নাম পুরাণ।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া সংযুক্ত বিবরণমূলক পুরাণ বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। যে সময়ে পাণিনির মহাভাষ্য লিখিত হইয়াছিল সে সময়েও পুরাণ প্রচলিত ছিল যথা মহাভাষ্যে "বাকো ব্যাক্যমিতহাসঃ পুরাণম্" এই বলিয়া পুরাণের পৃথক্‌শব্দ প্রয়োগ গ্রহণ করা হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার উপনিষদ্ ভাষ্যে সৃষ্টিতত্ত্বই পুরাণের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া বুঝিতে হইবে না যে পুরাণে অন্য চারি লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলেও চলিত।

মহাভারতের আদিপর্ব্বের ২৩০ হইতে ২৪০ শ্লোক ও অন্যান্য স্থান হইতে জানা যায় যে মহাভারতের রচনার পূর্ব্বেও ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সম্পন্ন ভিন্ন কবি রচিত পুরাণ বিদ্যমান ছিল—

"ইমং বংশমহং পূর্ব্বং ভার্গবংতে মহা মুনে।
নিগদামি যথাযুক্তং পুরাণাশ্রয় সংযুতম্।"

অঃ পঃ ৫। শ্লোঃ ৬-৭

'যেষাং দিব্যানি কর্ম্মাণি বিক্রমস্ত্যাগ এব চ।"
মাহাত্ম্যমপি চাস্তিক্যং সত্যং শৌচং দযার্জ্জবম্॥
বিদ্বভিঃ কথ্যতে লোকে পুরাণে কবি সত্তমৈঃ॥

আঃ পঃ ২৩৯—৪০।

হে মহামুনে, এই উত্তম ভাগবত বংশের পুরাণাশ্রয় সংযুক্ত কথা আমি প্রথমে বলিব।

আঃ পঃ ৫। শ্লো ৬-৭

যাঁহারা দিব্য কর্ম্ম, পরাক্রম, দাতৃশক্তি, মহত্ত্ব, আস্তিক্য বুদ্ধি, সত্য, শুদ্ধতা, দয়া, আর্জব ইত্যাদি যুক্ত তাঁহাদের গুণের প্রশংসা বিদ্বানেরা এবং পুরাণের শ্রেষ্ঠ কবিরা করিয়া থাকেন।

আঃ পঃ ২৩৯—৪০।

অতএব বেশ বোঝা যাইতেছে যে পুরাণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান আছে। মুনি ঋষিরা পৃথক্ পৃথক্ সময়ে ইহার সংহিতা রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন "সকল পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের রচনা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা পরস্পর এত বিভিন্ন যে এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের এক এক অংশ পাঠ করিলে এই তিন গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রতীতি হওয়া দুষ্কর। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির সহিত মহাভারতের রচনার এত বিভিন্নতা যে যিনি বিষ্ণুপুরাণ কিম্বা ভাগবত অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচিত বোধ হয় না।"

মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে—

"পুরাণ মেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘা।
ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটি প্রবিস্তরম্‌ ॥
নির্দ্দগ্ধেষু চ লোকেষু বাজিরূপেন বৈ ময়া।
অঙ্গানি চতুরোবেদাঃ পুরাণং ন্যায় বিস্তরম্‌ ॥
মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ পরিগৃহ্য ময়াকৃতম্‌।
মৎস্যরূপেন চ পুনঃ কল্পাদাবুদকার্ণবে ॥

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে সর্ব্বপ্রথমে একখানি পুরাণই ছিল। তাহা হইতে ক্রমে ১৮ খানি পুরাণ উৎপন্ন হইয়াছে। এদেশের প্রচলিত মত এই যে ব্যাস এই সকল সংহিতা সংক্ষিপ্ত করিয়া স্থল বিশেষে নিজের রচনা যোগ করিয়া ১৮ খানি পুরাণের সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। ঋষি মুনিদের মত ও রচনা যেখানে যেরূপ পাইয়াছিলেন বেদব্যাস তাহা পরিবর্ত্তন না করিয়া অক্ষুন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই পুরাণগুলিতে এত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় এবং সেগুলি এক লেখনী নিঃসৃত বলিয়া বোধ হয় না।

মৎস্য পুরাণে আছে—

"ইহলোক হিতার্থায় সংক্ষিপ্তং পরমর্ষিণা।"

মৎস্য অঃ ৫৩। শ্লোক ৫৮।

এই লোকের হিতের জন্য ব্যাস ইহাদের সংক্ষেপ করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে—

"প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্‌।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতা।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে চারিটী সংহিতার সার সংকলন করিয়া বিষ্ণু পুরাণ রচিত হইয়াছে। কেহ কেহ শঙ্কা করেন যে প্রথমে এই চারি সংহিতাই ছিল। পরে শিষ্য প্রতি-শিষ্য ভেদে ১৮ পুরাণ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড, পদ্ম ইত্যাদি পুরাণের সৃষ্টি প্রকরণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে জানা যায় যে সমস্ত পুরাণে একই কথা বলা হইয়াছে। এমন কি অনেকগুলির শ্লোকে শ্লোকে মিল আছে। প্রভেদ এই যে কোনটীতে কম শ্লোক আছে কোনটীতে অধিক। যদি প্রথম হইতেই ইহাদের বিভিন্নতা থাকিত তাহা হইলে এরূপ শ্লোক-সাদৃশ্য থাকিত না। আদি সংহিতা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন উপাসকের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহা বলা বড় কঠিন যে কোন পুরাণের পর কোন কোন পুরাণ রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে বিষ্ণুপুরাণের সহিত অনেক পুরাণের মিল আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়

এই যে এক পুরাণে অন্য পুরাণের মত উদ্ধৃত হইয়াছে এবং এক পুরাণে অন্য পুরাণের বিষয় সূচি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। বামন পুরাণে আছে—

শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা কথামেতাং পুরাতনীম্।
প্রোক্তামাদি পুরাণেচ ব্রহ্মণাব্যক্ত রূপিণা॥

যে কথা অব্যক্ত ব্রহ্মা আদি পুরাণে বলিয়া গিয়াছেন তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুন। অতএব দেখা যাইতেছে যে বামন পুরাণ আদি পুরাণ হইতে সংগৃহীত।

এইরূপ বরাহ পুরাণেও আছে—

রবিং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা পুরাণং সূর্য্যভাষিতম্।
ভবিষ্য পুরাণমিতি খ্যাতং কৃত্বা পুনর্ণবম্॥

সেই ধর্ম্মাত্মা সূর্য্যভাষিত পুরাণের কথা সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই নূতন ভাবে ভবিষ্য পুরাণ নামে খ্যাত।

মৎস্য পুরাণের ৫৩ অধ্যায়ে ১৮ খানি পুরাণের বিষয় বর্ণিত আছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে লোমহর্ষণের সময়ে ১৮ খানি পুরাণের বিষয়ই বিদ্যমান ছিল। অনুমান হয় যে তখন সে গুলি এত বিস্তার লাভ করে নাই। পরে তাহার শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা ক্রমশঃ উহাদের বিস্তার হইয়াছে।

ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ—

মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খ লিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ॥

ইতি স্মৃতি।

হিন্দু ধর্ম্মে নানা সম্প্রদায় আছে। বেদ সকল সম্প্রদায়েরই প্রমাণ। এমন কি ব্রাহ্মরা ও আর্য্য সমাজভুক্তেরাও বেদকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগে স্থানে স্থানে ইতিহাস পুরাণ আছে। কিন্তু পুরাণে যেরূপ অসংখ্য উপাখ্যান বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বেদে তত পরিমাণে আখ্যান সংখ্যা নাই এবং যে গুলি আছে তাহা সেইরূপ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত নাই। বেদের উপাখ্যান সংখ্যা অতি অল্প এবং তাহাদের উল্লেখ অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া যায়। বেদে যে কথার সূচনা মাত্র আছে পুরাণে তাহা বিস্তৃত ও পরিণত হইয়াছে। যেমন কণিকামাত্র বট বীজ অঙ্কুরিত হইয়া প্রথমে সামান্য বৃক্ষরূপ ধারণ করে এবং পরে ক্রমশঃ শাখা পল্লবিত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, সেইরূপ বেদে যে উপাখ্যানের আভাষ মাত্র আছে সেই উপাখ্যানই হস্তান্তরিত হইতে শাখা প্রশাখা যুক্ত হইয়া অতি দীর্ঘ উপাখ্যানে পরিণত হইয়া পুরাণের বিষয়ীভূত হইয়াছে। বেদ হইতে

বীজ গ্রহণ করিয়া প্রথমে একখানি সংহিতা নির্ম্মিত হয়। সেই আদি সংহিতা হইতে আর তিনখানি সংহিতা রচিত হয়। এই চারিখানি মূল সংহিতা হইতেই পরে ১৮ খানি পুরাণ প্রস্তুত হয়। সেই জন্যই সকল পুরাণের সৃষ্টি তত্ত্বই প্রায় একরূপ। প্রাচীন উপাখ্যানগুলিও প্রায় একরূপ। কেবল দেবতা, মন্বন্তর, বংশ ও বংশানুচরিতের ভেদ দৃষ্ট হয়।

বেদসংহিতা ভিন্ন ভিন্ন ঋষিদ্বারা রচিত হইয়াছিল। অধিকাংশ ঋষিই বহুদেববাদী ছিলেন। বৈদিক দেবগণের সংখ্যা ৩৩, তন্মধ্যে ১১ জন দ্যুলোকে, ১১জন অন্তরীক্ষে ও ১১ জন পৃথিবীতে বাস করেন। যদিও ঋষিরা সাধারণতঃ বহু দেবতারই আরাধনা করিতেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দেবগণের একত্বও অনুভব করিয়াছিলেন। ঋক্‌বেদে (৩।৫৫) কয়েকটী ঋকের শেষভাগে "মহাদ্দেবানাম সুরত্বমেকম্" উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ দেবগণের মহৎ অসুরত্ব বা ক্ষমতা একই। যখন দেবগণের শক্তি ও প্রকৃতি একই প্রকারের তখন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন নহেন। তাঁহারা একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। যখন ঋষিরা দেবতার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে মুগ্ধ হইতেন তখন তাঁহারা সেই ভাবকে একএকটী পৃথক্ পৃথক্ দেবতা বলিয়া তাঁহার স্তুতি করিতেন। কখন ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলিয়াছেন। অগ্নিকে বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, অর্য্যমা, বিষ্ণু, ব্রহ্মণস্পতি, রুদ্র, পুষা, সবিতা, ভগ, অদিতি, ইলা, সরস্বতী বলা হইয়াছে। কখনও সবিতাকে, মহেন্দ্র, ধাতা, বিধর্ত্তা, বায়ু, অর্য্যমা, বরুণ, রুদ্র, মহাদেব, অগ্নি, সূর্য্য বলা হইয়াছে। অদিতিকে দ্যৌ, অন্তরীক্ষ, বিশ্বদেব বলা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে দেবতারা পরস্পর পরস্পর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলা হইয়াছে। বৈদিক ঋষিদের মধ্যে যেমন একদিকে কতকগুলি ঋষি দেবতাদের একত্বের অনুভব করিয়াছিলেন এবং এই একত্বের অনুভব হইতে অবশেষে উপনিষদগুলির সৃষ্টি হয়, তেমনই অপরদিকে অনেক ঋষি একত্ব হইতে বহুত্ব কিপ্রকারে আসিল তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বহুত্বের ভাব লইয়া পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছিল। বেদসংহিতায়, ও ব্রাহ্মণে ঋষিগণ দেবতাদের তুষ্টির জন্যই অধিকাংশস্থলে ব্যস্ত। বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য যজ্ঞ। যজ্ঞকার্য্য নিয়মানুসারে সম্পন্ন করিবার জন্য যজুর্ব্বেদের প্রয়োজন। যজ্ঞমন্ত্রের স্বরূপ জানিবার জন্য ঋগ্বেদের প্রয়োজন। যজ্ঞে দেবতার স্তুতিগান করিবার জন্য সামবেদের প্রয়োজন। অতএব বেদে মানব চরিত্রের উৎকর্ষের উদ্দেশ্যে নৈতিক উপদেশের ভাগ অল্প। কেবল এখানে সেখানে আভাষমাত্র আছে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগে প্রায়ই কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানযোগের কথা উপনিষদে আছে। নীতি ও ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্যই বেদের পুরাণাংশ বর্দ্ধিত হইয়া পরবর্ত্তী পুরাণে পরিণত হইয়াছে। এবং এই উদ্দেশ্যেই উপনিষদ যুগের পরে সূত্র যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি প্রণীত হইয়াছে।

ইহার কিছু পরেই জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শাক্যমুনির আবির্ভাব হয়। এপর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এক্ষণে বুদ্ধদেব তাহা ধর্ম্ম জাতিনির্ব্বিশেষে সাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। বৌদ্ধদের সমস্ত বল ব্রাহ্মণদের ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইল। বৌদ্ধেরা তাঁহাদিগের মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় অতি সরলভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাহা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইল। যে অধিকারে নিম্নস্তরের লোকেরা একাল পর্য্যন্ত বঞ্চিত ছিল সেই অধিকার সাধারণ লভ্য হওয়াতে, দেশে ধার্ম্মিক ও সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য তিরোহিত হইল। পূর্ব্বে আচার ব্যবহারের যে কাঠিন্য ছিল তাহা শিথিল হইয়া এক্ষণে স্বাধীনতায় পরিণত হইল। জাতিভেদ উঠিয়া গেল। যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেইরূপভাবে চলিতে লাগিল। বুদ্ধের উপালি নামক এক প্রধান শিষ্য ক্ষৌরকার জাতীয় ছিল। সকল জাতির লোকেই ভিক্ষু ও শ্রমণ হইতে পারিত। কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য কঠিন নিয়ম প্রণীত হইয়াছিল। পরে সে সকল নিয়মও উল্লঙ্ঘিত হইতে লাগিল ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে নানা ব্যাভিচার ঘটিতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্ম নিম্নস্তরের লোকের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় অনার্য্য আচার ব্যবহার ও কুসংস্কার অনেক পরিমাণে ইহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। শেষে বুদ্ধদেবের পবিত্র ধর্ম্ম ভীষণ আকার ধারণ করিল। এই সময়ে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কতিপয় মনস্বীর আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের চেষ্টায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। কিন্তু প্রাচীনকালের বৈদিক ধর্ম্ম আর ফিরিল না। বৌদ্ধযুগের প্রভাব ব্রাহ্মণদের উপর গৌণভাবে অনেক পরিমাণে পড়িয়াছিল। যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা আর বৈদিক ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইবার যোগ্য ছিল না। ইতিমধ্যে শক, হুণ ও অপরাপর নানা জাতীয় লোক ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়া ভারতবাসীদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। যে সমাজ গঠিত হইল তাহা ভারতের এই মিশ্রিত অধিবাসীদিগকে লইয়া। আর্য্য সভ্যতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য চরম চেষ্টা করিল। এই সময়ে প্রায় লুপ্ত শাস্ত্রাদির উদ্ধারের চেষ্টা হইল। মাগধী ও অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার ব্যবহারের হ্রাস হইয়া সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিত হইতে লাগিল। বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য অধিক কষ্ট পাইতে হইল না, কারণ ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই এমন সুন্দর নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল যে সহজেই ইহা সংঘটিত হইল। অন্যান্য শাস্ত্রের উদ্ধার এত সহজে হইল না। পুরাণ গুলি উদ্ধার করিতে অনেক চেষ্টা ও অনেক সময় লাগিয়াছিল। তাহার ফলে অনেক আধুনিক বিষয় পুরাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পরন্তু ইহা হইতে পুরাণের আধুনিকত্ব প্রমাণিত হয় না। উইলসন সাহেব তাঁহার বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদের উপোদ্ঘাতে এক একখানি পুরাণের রচনার সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

১। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত, কারণ ইহাতে উৎকলের জগন্নাথ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

২। পদ্মপুরাণ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত, কারণ ইহাতে বৌদ্ধ ও জৈনদের বর্ণন আছে এবং বৈষ্ণবদের চিহ্নাদি ধারণের কথা আছে। ইহার শেষ ভাগ পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত।

৩। বিষ্ণুপুরাণ একাদশ শতাব্দীতে রচিত, কারণ ইহাতে বৌদ্ধ ও জৈনদের উল্লেখ আছে এবং কল্যব্দ ৪২৪৩ বর্ষ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

৪। বায়ুপুরাণই সকল পুরাণ হইতে প্রাচীন এবং মূল পুরাণের সমস্ত লক্ষণ যুক্ত।

৫। শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত। কেহ কেহ ইহাকে বোপদেব রচিত বলেন।

৬। নারদীয় পুরাণ, ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত, কারণ ইহাতে গোঘাতক দেব নিন্দকের উল্লেখ আছে, ও বৈষ্ণব আচার বিধি বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

৭। মার্কণ্ডেয় পুরাণ নবম বা দশম শতাব্দীর সংগ্রহ।

৮। অগ্নিপুরাণ আধুনিক, কারণ ইহাতে তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতি আছে।

৯। ভবিষ্যপুরাণ আধুনিক, কারণ ইহাতে ব্রত পূজার কথা আছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে পুরাণের লক্ষণ নাই।

১১ লিঙ্গ পুরাণের অধিকাংশ আধুনিক। ইহা কর্ম্মগ্রন্থ।

১২ বারাহ পুরাণ রামানুজের সময়ের। ইহাও কর্ম্মগ্রন্থ।

১৩ স্কন্দপুরাণ ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর, কারণ ইহাতে জগন্নাথ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে

১৪ বামন পুরাণ তিন চারি শত বৎসর পুরাতন। ইহাকে পুরাণ বলা যায় না।

১৫ কূর্ম্মপুরাণ আধুনিক, কারণ ইহাতে ভৈরব, রাম, যামল তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ আছে।

১৬ মৎস্যপুরাণ অধিক পুরাতন নয়, কারণ ইহাতে উপপুরাণের বর্ণন আছে।

১৭ গরুড় পুরাণ—ইহার নাম মাত্র পুরাণ।

১৮ ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণ অতিপ্রাচীন। সম্ভবতঃ ইহা অপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ বায়ু পুরাণের অংশ।

ইহা যথার্থ যে পুরাণের পাঁচটী লক্ষণই সবগুলি পুরাণে পাওয়া যায় না, এবং বৌদ্ধ যুগের পরে সংগৃহীত হওয়াতে আধুনিক অনেক বিষয় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাই বলিয়া পুরাণ শাস্ত্রটী অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। অতএব এক্ষণে পুরাণের বহুল পরিমাণে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক পুরাণের অনেক হস্ত লিখিত পুঁথি সংগ্রহ করা আবশ্যক. এবং যত্ন সহকারে তাহাদের পাঠ মিলাইয়া দেখা উচিত যে তাহাতে পুরাণের পাঁচটী লক্ষণ বিদ্যমান আছে কি না। যে অংশে বৌদ্ধযুগের সময়ের বা পরের কথা আছে তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা উচিত। যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রণালীতে পাঠোদ্ধার না হইতেছে ততদিন পুরাণের প্রমাণ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

মুক্তিপূজা

শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয়, ও সমাগত ভদ্রমণ্ডলী—

মানুষের স্বাধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেক উৎসব অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বস্তিবাচন ও নান্দীপাঠ করবার ভার পড়েছে তার কবির উপর। কবির যে গান সেই গানই ত মুক্তির গান। আনন্দ উৎসবে, কল্যাণ কর্ম্মের উদ্বোধনে জয়যাত্রার শুভারম্ভে কবি গৌরবময় অতীত জাগ্রত বর্ত্তমান ও আসন্ন ভবিষ্যতের পুণ্য কল্পনায় আবহমান কাল থেকে অন্তরের গভীর অনুভূতি দিয়ে যে সঙ্গীত রচনা করে এসেছেন—সেই সঙ্গীতই ত চারণের সঙ্গীত। চারণ কবি তাঁর ছন্দে সুরে কথায় দেশ দেবতার চরণে পূজাপুষ্পের যে বিচিত্র মালাটি রচনা করেন—যুগে যুগে সেই মালাই ত বীরমণ্ডলীর বিজয় মাল্য হয়ে, নিখিল বিশ্বের অক্ষুন্ন শ্রদ্ধার সম্পদ হয়ে থাকে। সেই ভার পড়েছে আজিকার সভার কবিদের উপর। আমরা অতীত ইতিহাসের প্রাতঃস্মরণীয় চারণকবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আপনাদের স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছি—আজ বাঙলার চারণকবির যে গান—সে যে শতসহস্র নিপীড়িত দেশবাসীর মর্ম্মভেদী করুণ বেদনার গান—এই মুক্তি পূজার যে মন্ত্র—সে যে কোটি কোটি মূঢ় বিপন্ন জনগণের অন্তর থেকে উৎসারিত মুক্তি সংগ্রামের অভয়মন্ত্র।—এই অভয়মন্ত্র স্মরণ করেই আজ আমাদের মুক্তিপূজার উদ্বোধন করতে হ'বে।—বন্দে মাতরম্।—

দরিদ্র যে প্রতিদিন পলে পলে মরে'
আপন বুকের রক্ত রচিয়া সে আপনার করে
সুদীর্ঘ লিপিকাখানি তার,
জনে জনে পাঠাইয়া আশাপথ চাহি বারম্বার
দীর্ঘশ্বাস ফেলে অশ্রুজলে ;
বঞ্চিতের মুক্তদ্বার—বাঞ্ছিত যে এড়াইয়া চলে,।—
—পরিবর্ত্তে আসে দুঃখ, দুর্ভোগের অগ্রদূত সাথে
নবপ্রভাতের আলো নিঃশেষিয়া দুর্য্যোগের রাতে ;
ছড়াইয়া মৃত্যুভয়, লোকভয়, সর্ব্বনাশা আত্মপ্রবঞ্চনা,
একমুষ্টি অন্ন লাগি, ক্ষুধিতের অসহ গঞ্জনা,
মানুষের নিত্য অপমান।
তবু হৃদ্‌পিণ্ডি-ছিঁড়ি দীন রাখে অতিথি সম্মান।
দিন যায়, রাত্রি যায়, বর্ষ শেষে ঢলে পড়ে আয়ু,
স্তিমিত নিষ্প্রভ প্রাণবায়ু—

একভাবে চলিয়াছে হতভাগ্য পথিকের দল
উচ্ছিষ্ট কদন্ন লাগি' রাজপথে তুলি কোলাহল
শান্তিভঙ্গ অপরাধে সহি' দণ্ড ভীষণ দারুণ ;
শিশু বৃদ্ধ তরুণী তরুণ
জীবন ডালিয়া দেয় ভবিষ্যের অন্ধকার তলে,
সেথা হায় জ্বলে কিনা জ্বলে
অনির্ব্বাণ মণি দীপশিখা
আলোকি' আঁধার কারা, বন্দীভালে জয়-ললাটিকা
জানিবার নাহি অধিকার।
যুগের সঞ্চিত ধন যাহা ছিল একান্ত আমার
সকলই ফুরায়ে গেছে পাথরের প্রতিমা পূজায়।
যজ্ঞবেদী তলে মোরা, যূপকাষ্ঠে ছাগশিশু প্রায়
আর্ত্তস্বরে মাগি অনুগ্রহ,
অনুপায়ে রক্ত দিয়া তৃপ্ত করি' লোলুপ বিগ্রহ।
দেবালয় ? কোথা দেবালয় ?
দেবতারে দূরে ফেলি' গড়ে তারা প্রমোদ আলয়।
অম্লান পূজার ফুলে রচিয়াছে বসন্ত মালিকা,
পবিত্র সে অর্ঘ্যের থালিকা
ভরিয়া তুলিছে তারা কামনার সহস্র সম্ভারে।
দেবতার চিরমুক্ত দ্বারে
শান্ত্রী সৈন্য ফিরিছে কৌশলী,
মিথ্যার পূজার নিত্য বলি
রাশি রাশি বহি আনে দয়াহীন পাষণ্ডের দল,
দরিদ্রে বঞ্চিত করি' জীবনের সঞ্চিত সম্বল।
সবলের লীলা নিকেতন,
শিরে বহি' দস্যুতার গর্ব্বোদ্ধৃত বিজয় কেতন
সত্যেরে করিছে পরিহাস,
নিপীড়িত সহস্রের আর্ত্তনাদে করি অট্টহাস
ব্যক্ত করে নির্ম্মম বিধান,
মানব মিলন ক্ষেত্রে দানবের দীর্ঘ ব্যবধান।

দুঃখ শোক ক্ষোভ নিরন্তর
গ্লানি অবসাদে ভরা অসহায় ব্যথিত অন্তর,
মায়াহীন নিষ্ঠুর সংসারে
অত্যাচারে ক্ষিপ্তপ্রায়, কেবল দংশিয়া আপনারে
মৃত্যুমুখে মাগিয়াছে সর্ব্বশেষ আশ্রয় যাহার,
থুৎকারি' তাড়ায়ে সেই করিয়াছে অতিথি সৎকার ?
অকাতরে সহি নির্য্যাতন
বন্ধন শৃঙ্খল ঘায় আজি যারা করিছে রোদন,
মানুষের সত্যপথে ন্যায্য অধিকার
তারি তরে আজি যারা আর্ত্তস্বরে করিছে চীৎকার
তাহাদের দলি' পদতলে
অবজ্ঞার হাসি হেসে আজি যারা মদগর্ব্বে চলে,
মানুষের দেবতারে তারা করে নিত্য অপমান
বিপন্নের আর্ত্তনাদে পাষণ্ড শুনিছে স্তুতিগান—
—অন্ধদৃষ্টি দেখে না চাহিয়া
দুর্য্যোগ রাত্রির সন্ধ্যা পুঞ্জমেঘে আসে ঘনাইয়া।
অধিকার ?—কে তোমারে দেবে অধিকার ?
শক্তি যদি থাকে আপনার,
মনে প্রাণে দেহে সাধনায়
ঊর্দ্ধশির থাকি এ ধরায়
আপন অন্তর মাঝে যদি পাও নিজ পরিচয়
প্রেতের তাণ্ডব মাঝে সেইদিন জাগিবে অভয়।
জীবন মৃত্যুর পথে মুক্ত থাকে দিবস শর্ব্বরী
নিখিলের পানপাত্র ভরি'
ক্ষুধার অমৃত যদি বিলাইতে পারো কোনও মতে,
অবহেলা অপমান হ'তে
যদি পারো বাঁচাইতে মূঢ় মূক আপন স্বজনে
সে মাহেন্দ্রক্ষণে
নিজে পাবে নিজ অধিকার।
কৃপালব্ধ স্বর্ণমুষ্টি বাড়ায় যে দীন তার ভার

মানুষ হইয়া যারা মানুষের করে অপমান
মানব ধর্ম্মের বাধা, অপবিত্র তাহাদের দান।
কে ল'বে প্রসন্নমনে নিগ্রহের ফল অনুগ্রহ?
তাচ্ছিল্যের মৃদুহাসি সহ
বর্ব্বর প্রভুর হাতে দাসত্বের তুচ্ছ পুরস্কার?
দাবী যদি না থাকে তোমার--
দাক্ষিণ্যের সিংহাসন তলে
আপন মুক্তির দান মেগে ল'বে নয়নের জলে?
দেশের গভীর লজ্জা, জীবনের ঘোর অধোগতি
শিকল দেবীর পূজা—অনুপায়ে তাহার প্রণতি।
মুক্তি কিসে পেতে চাও? মুক্তি কারে কে দিয়েছে কবে?
সহস্র বন্ধন মাঝে নিজে যদি বন্দী হয়ে রবে,
শৃঙ্খল বাজায়ে যদি নান্দীপাঠ কর' দিনরাত
কারার প্রাচীর ভেদি, পশিবে না নির্ম্মল প্রভাত
আনন্দ আলোকে ঝলমল্।
জীবনের ফুল্ল শতদল
ম্লান হয়ে ঝরে যাবে, অকারণ শ্রান্ত অবেলায়—
বুকের সুগন্ধ তা'র মিশে যাবে ধরার ধূলায়।
জীবনে দুর্ভোগ সত্য, যন্ত্রণায় নবপরিণতি
কারার অর্গল সত্য, শৃঙ্খলের ক্ষয় সত্য অতি;
ততোধিক মৃত্যু সত্য—নবজীবনের অগ্রদূত
গলিত শবের দেহে আনে প্রাণ একান্ত অদ্ভুত।
মৃত্যুপণ?—সেই হবে পণ,
জীবন-যজ্ঞের মন্ত্র,—অমৃতের সাধনার ধন।
নিপীড়িত ভারতের বুকফাটা তীব্র বেদনায়
মৃত্যু আজি ডাকিছে তোমায়—
ভয়হীন দ্বিধাহীন সাহস বিস্তৃত বক্ষ মাঝে
নির্ব্বীর্য্য দাসের মোহ নিঃশেষে মরিয়া যাক লাজে;—
সোজা হয়ে দাঁড়াও সম্মুখে
কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা অচেতন তোমারি যে বুকে,

চোখে আছে বিদ্যুৎ-বিলাস,
অভিমন্ত্র ধ্বনি চায়, প্রলয় উল্লাস—
—নৃত্য, পদতলে স্তব্ধ গতিহারা ;
অন্তরে মানুষ যারা
বাহিরে ঘুমায়ে তারা মন্ত্রমুগ্ধ সিংহ শিশু প্রায়
তা'দের জাগায়ে তোল, যাত্রার যে লগ্ন বয়ে যায়।
বিস্মৃত চেতনা হতে দেবতা তোমারে আজ ডাকে,
বঞ্চনা করোনা আপনাকে
রচিয়া বালির গৃহ ছায়াহীন সমুদ্র বেলায়,
আকাশের ইন্দ্রধনু ক্ষণে আসে ক্ষণে চলে যায়।
জীবনে বারেক আসে দেবতার অমোঘ আহ্বান,
সাধনার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তুলে ধর আপনার প্রাণ ;
আলোহীন, আশাহীন, অভিশপ্ত কারাগৃহ মাঝে
হাতের শৃঙ্খল আজ ফুল হয়ে ঝরে যাক লাজে।
রুদ্ধ বাতায়নে তব জীবনের নবীন প্রভাত
মুহুর্মুহু—হানে করাঘাত,—
তারে দাও—অর্ঘ্য উপচার
মুক্তিপূজা মাঙ্গলিকে তোমার প্রথম নমস্কার।*

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দিনের আলোয়

(গল্প)

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

পাড়ার বুকে মস্ত বস্তী ......কয় ঘর গরিব গৃহস্থের বাস। কাজ-কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট সেখানে এখনো চোকে নাই! খাওয়া-দাওয়া, ঘর ধোওয়া, বাসন মাজার সঙ্গে সঙ্গে বেদনার কত কাহিনী, কলহের কত সাড়াই জাগিয়া উঠিতেছে! বস্তীর গায়ে মস্ত তেতলা বাড়ী—সে-বাড়ীর বৈঠকখানায় বাজনার সুরে গান চলিয়াছে—

* ২২ শে মে, ১৯২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে পঠিত।

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা......'

ভাগ্যে ঐ বাড়ীটায় অমনি আলো-গানের সমারোহ চলে...নহিলে সারাদিন দুঃখ-ধন্দা করিয়া শ্রান্তি-জর্জ্জর এই বস্তীর লোকগুলা চারিদিককার সুগভীর নৈরাশ্যের মাঝে বুঝি দম বন্ধ হইয়াই মারা যাইত। ঐ আলো আর গানের সুরে সে কোন্ স্বপ্নলোকের কুহক-মাধুরীর স্পর্শ তারা পায়।

ঘণ্টাখানেক পরে ওদিককার গানের সঙ্গে বস্তীর সাড়াশব্দও দীপের মত নিব-নিব হইয়া আসিল। দু'একটা বেদনার গুঞ্জন, বা শিশুর কান্না থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, কখনো-বা একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী বিপর্য্যয় শব্দে চারিদিককার স্তব্ধ সুষুপ্তির গায়ে ভারী রকমের আঁচড় টানিয়া ছুটিয়া চলে।

বস্তীর এক জীর্ণ ঘরের কোণে আঁচল প্যাতিয়া ঘরের তরুণী বধূ মূর্চ্ছিতার মত পড়িয়া ছিল। মাটীর দীপ তৈলের অভাবে তার জ্বলা শেষ করিয়া কখন্ নিবিয়া গিয়াছে। একধারে ছোট কাঁশি ঢাকা খাবার। বধূ তার প্রহরায় বসিয়া থাকিয়া ঘুমে ঢুলিয়া মেঝেয় কখন গড়াইয়া পড়িয়াছে। মুখে-চোখে বেদনার করুণ আভাস তার তরুণ রূপশ্রীকে এমনি ম্লানিমায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে···দেখিলে শ্রাবণের মেঘ-ভরা পূর্ণিমা-রাত্রির কথাই চট্ করিয়া মনে পড়ে।

ঘরের বাহিরে জুতার দুপ্-দাপ্ শব্দ হইল এবং সবলে দ্বার ঠেলিয়া দৈত্যের মত একটা পুরুষ ঘরে ঢুকিল, ঢুকিয়াই ডাকিল—বকুল.........কণ্ঠের স্বর যেমন কর্কশ, তেমনি ঝাঁজ তার মধ্যে!

বধূ ধড়মড়িয়া উঠিয়া আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া বসিল। পুরুষ হাঁকিল,— ঘর অন্ধকার! দিব্যি আরাম করে ঘুমোচ্ছিস্......এঁ্যা···

অপ্রতিভ হইয়া বধূ চাহিয়া দেখে, দীপ নিবিয়া গিয়াছে। উপায়? ঘরে একটিও দিয়াশলাই নাই! ওদিকে ওরাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! বধূ কাঠ হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

পুরুষ কহিল,—দাঁড়িয়ে রইলি যে......কথা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বকুলের হাত ধরিয়া সে প্রবল ঝাঁকানি দিল। সে-ঝাঁকানি বধূ সহিতে পারিল না; একধারে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

পুরুষ বলিল,—আলো জ্বালো দয়া ক'রে! খেতে-দেতে হবে আমায়।

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বধূ কহিল,—দেশলাই নেই। পিদিম নিবে গেছে!

—এই নাও দেশলাই—বলিয়া পকেট হইতে একটা দিয়াশলাই বাহির করিয়া সে বধূর গায়ে ছুড়িয়া দিল। বধূ দিয়াশলাই লইয়া দীপ জ্বালাইতে গিয়া দেখে, দীপে তেল নাই, দীপের বুকটা অবধি পুরিয়া গিয়াছে। পলিতা-পোড়া ছাই বিদ্রূপের হাসির মত দীপের বুকের উপর! সে শিহরিয়া উঠিল।

পুরুষ কহিল—নবাব-নন্দিনী দাঁড়িয়ে রইলেন তবু !

বধূ কহিল,—তেল নেই।

একে প্রমত্ত অবস্থা, তায় মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেকার আনন্দ ও নেশার রেশ তখনো প্রাণ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। ভাবিয়াছিল, ঘরে ফিরিয়া মুখে কিছু আহার গুঁজিয়া বিছানায় দেহভার গড়াইয়া আরামে ঘুমাইবে,.... ..কিন্তু এ কি দুগ্রহ !

বধূর হাত দুইটা সবলে ধরিয়া দেওয়ালে মাথাটা তার ঠুকিয়া দিয়া মনের ঝাল সে কতকটা মিটাইল; তবু বধূ কাঠের পুতুলের মত নির্জ্জীব দাঁড়াইয়া আছে। রাগ চড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পর হইতে যে তরল সুধা আকণ্ঠ পান করিয়াছে, সে-সুধা তখন তার কাজ সুরু করিয়া দিয়াছে। বধূর অঙ্গে প্রহারের জ্বালা সবলে বর্ষিত হইল। পড়িয়া মার খাইবে, তবু আলো জ্বালিয়া স্বামীর পরিচর্য্যায় মন দিবে না? ভালো আপদ! বধূর ঘাড় ধরিয়া পুরুষ-স্বামী তখন তাকে বাড়ীর বাহির করিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল; সঙ্গে সঙ্গে সগর্জ্জনে জানাইল,—যেখানে খুসী চলে যা......পা আছে, সামনে মস্ত পথ, এখানে আর ঠাঁই হবে না। স্বামীর মান রাখতে জানো না?

ঝড়ের নির্ম্মম আঘাতে তরুণ গাছ যেমন মাটীতে লুটাইয়া পড়ে, বধূ তেমনি পথের মাঝে লুন্ঠিত হইয়া পড়িল।

......কতক্ষণ !......

সহসা চেতনা পাইয়া বধূ উঠিয়া দেখে, নির্জ্জন পথ। একটু দূরে বড় রাস্তায় মোটরের ভেঁপু মাঝে মাঝে বাজিয়া যাইতেছে, তার পর চুপ চাপ! ঐ সেই তেতলা বাড়ীটা......উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে! পথে গ্যাসের আলো......নির্ব্বাক নেত্রে যেন তারি দুঃখ দেখিতেছে! বধূ উঠিয়া দ্বারে ধাক্কা দিল......এক বার, দুই বার, অনেক বার! ভিতর হইতে কাহারো সাড়া নাই। তখন নৈরাশ্য আর নিরুপায়তার কঠিন বাঁধন তাকে এমনি কষিয়া বাঁধিল যে তার চাপে নিশ্বাস বন্ধ হইবার জো!

বধূ ভাবিল, নিত্য এ অত্যাচার, লাঞ্ছনাও তো আর সহা যায় না! কেন? কি তার অপরাধ? মার কোল ছাড়িয়া একা এই ঘরে কিসের আশায় সে পড়িয়া আছে? স্বামী! একটি দিনের জন্য এতটুকু আদর বা একটা মিষ্ট কথাও তো দেয় নাই! কেবলি পীড়ন! কায়-মনে এই সেবা, এই পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছে—কলের মত কাজ চলিয়াছে, কোনো-কিছুর প্রত্যাশাও সে রাখে না। শুধু একটু আশ্রয়, ঐ জীর্ণ ঘরের কোণে এত-বড় বাহিরের অজানা রহস্যের অন্তরালে ঐ নিরাপদ জানা কোণটুকু....তা হইতেও আজ বঞ্চিত করিলে, পুরুষ! এ জীবন কেনই বা রাখা?...মরণই উপায়!

বেদনাহত নারীত্বের রুদ্ধ অভিমান তার চিত্তে দোলা দিয়া সাড়া তুলিল,—আর কেন বাঁচিয়া থাকা! মরাই ঠিক—মরণের কোলে যা-কিছু আরাম, মরণেই মুক্তি!

কোনো দিকে না চাহিয়া সে তখন বুক বাঁধিয়া ঐ নির্জ্জন পথকেই সম্বল করিয়া চলিল! কিন্তু কি এ ভয়……সর্ব্বাঙ্গ ছম্ ছম্ করিতেছে! প্রতি পদক্ষেপে কে যেন দুই পা চাপিয়া ধরিতেছে!

একজন পথিক নিজের খেয়ালে গান ধরিয়া আসিতেছে, এই দিকেই! চলার ভঙ্গী দেখিয়া বধূ শিহরিয়া উঠিল! এ চলার ভঙ্গী যে তার খুব চেনা! সহজ মানুষ এমন চলা চলে না! পা টলিতেছে...গতি চপল, সারা পথটাকে এধার হইতে ওধার অবধি মাড়াইয়া চলিতেছে! ভয়ে সে একটা গ্যাস-পোষ্টের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, দুনিয়ার পথে শুধু মাতালগুলাকেই ছাড়িয়া দিয়াছ, ভগবান!

নিজেকে প্রাণপণে খাড়া করিয়া মাতাল-পথিক কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, খুব মনোযোগী দৃষ্টিতে বধূকে লক্ষ্য করিয়া তারপর কহিল—কে বাবা, এই রাত্রে ভয় দেখাতে পথে বেরিয়েছ!

লজ্জায়, ভয়ে বধূ যেন মরিয়া গেল! সে আপনার ভীত কুণ্ঠিত দেহলতাটিকে যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া গ্যাস-পোষ্টটাকে নিরাপদ দুর্গের মত আঁকড়াইয়া ধরিল।

মাতাল আগাইয়া আসিল; তার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল—বধূর চোখে অসহায়তার কি আর্ত্ত বেদনা, কি মিনতি ফুটিয়া উঠিল! মাতালের তা দৃষ্টি এড়াইল না!

মাতাল বলিল—কাদের মেয়ে তুমি, বাছা?

এ স্বরে কতখানি দরদ! বধূ কাঁদিয়া জানাইল, সে অতি-অসহায়···এত-বড় বিশ্বে তার গৃহ নাই, কেহ নাই!

মাতাল কহিল—এত রাত্রে পথে বেরিয়েছো, বাছা! বিপদে পড়বে যে!

বধূ তার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। মাতাল কহিল,—কোথায় ঘর, বল তো মা, আমায়।

মা! এ সম্বোধনে কি আশ্বাস! বকুলের বেদনার্ত্ত চিত্তে যেন এক ঝলক স্নিগ্ধ হাওয়ার পরশ লাগিল!

বধূ কহিল—বাড়ী থেকে আমায় তাড়িয়ে দেছে……সে পাগলের মত কাঁদিয়া উঠিল।

মাতাল কহিল—কে এত-বড় হতভাগা বল তো মা···? স্বামী? আমি একবার তাকে দেখচি।

সর্ব্বনাশ! তার সঙ্গে পারিবার জো কি! বকুল তো জানে, কি প্রচণ্ড শক্তি তার দেহে! প্রহারের স্মৃতি যে তার সর্ব্বাঙ্গে জাগিয়া আছে……অহর্নিশি! বধূ চুপ করিয়া রহিল।

মাতাল কহিল—বেশ, আজ এত রাত্রে আর চেঁচামেচি করবো না। কাল দেখা যাবে···। তা আজ পথে থাকা তো চলবে না মা। আমার সঙ্গে এসো···

বধূ যন্ত্র-চালিতের মতই মাতালের সঙ্গে চলিল। মাতাল নীরব; বধূর মুখেও কোন কথা নাই। হঠাৎ মাতাল থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—তাইতো, আমার ঘরে যে আর কেউ নেই, আমি একা!···বলিয়া মাতাল থামিল, পরক্ষণেই কহিল—তাতে কি! তুই মা, আমি ছেলে—কি এসে যাবে! আর······নিজের মনেই মাতাল বকিল,—আমি নীচের ঘরে থাক্‌বো'খন······ মা আর ছেলে বৈ তো নয়।

ছোট্ট বাড়ীখানি, ভারী পরিপাটী··ছবির মত! আকাশে চাঁদের আলো...কি আরাম ও-আলোয়···সব বেদনা ভুলাইয়া দেয়! সেই রুদ্ধ ঘরের আঁধার কোণে চাঁদের এই আলোর একটা বিন্দুও যদি ঝরিত কোনো দিন! পৃথিবীতে এত আলোও ফোটে······ বধূর তা জানা ছিল না। জানিত, কিন্তু সে কথা কবে ভুলিয়া গিয়াছে!

দ্বারে কুলুপ আঁটা ছিল। মাতাল চাবি খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, বলিল,—আয় মা— কোনো ভয় নেই!

ভয়! যে-ভয় বুকের ভিতর ভরিয়া ছিল···প্রতি মুহূর্ত্তে ভয়ের কি বিভীষিকা!.......

বধূকে লইয়া মাতাল দোতলায় উঠিল; একটা ঘরের দ্বার খুলিয়া কহিল,—ঐ বিছানা রয়েছে—ঐখানে শোও মা। কোনো ভয় নেই। আমি নীচেই শোবো। ভয় পেলে চেঁচিয়ে ডেকো মা, 'ছেলে' বলে! আমার নাম কান্তি। তবে বয়সে বড়, নেহাৎ কান্তি বলে ডাকতে যদি না পারো, তাই বলছিলুম, ছেলে বলে ডেকো। কথাটা বলিয়া মাতাল প্রাণ খুলিয়া হাসিল।

বধূ তখনো কেমন নিস্পন্দ! ঘটনাগুলা ছায়ার মত মনের উপর ছুটাছুটি করিতেছিল,···এ কি সব সত্য, না স্বপ্ন!···

মাতাল নীচে নামিয়া গেল; একটু পরেই ঠোঙায় খাবার লইয়া আবার উপরে আসিয়া দেখে, তরুণী তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, ঘরের সামনে ছোট্ট বারান্দায়, কাঠের মত! জ্যোৎস্নার আলো তার সারা অঙ্গে ঝরিয়া পড়িয়াছে! মুখখানি ম্লান! চোখে কি দৈন্য, কি ব্যথা যে ফুটিয়া আছে!

কান্তি কহিল,—দাঁড়িয়ে কেন মা—শোও'গে। তবে শুয়ে পড়বার আগে এইটুকু খেয়ে নাও। উপোসী থাকা ঠিক নয়, সধবা মানুষ! ভেবে কি করবে? সকাল হোক, আমি সব ঠিক করে দেবো। কোনো ভয় নেই।

এত আদর, এমন সহানুভূতি······এর অমর্য্যাদা করা চলে না! বধূ মুখে কিছু দিয়া ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। বেদনায় শ্রান্তিতে সারা দেহ-মন কাতর, অবসন্ন!

তাছাড়া ভাবাও যায় না আর! কি-বা ভাবিবে? ভাবিয়া কি কোনো উপায় মিলিবে? না, ভাবনার কোনো কূল-কিনারা আছে?

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিয়া বধূ দেখে, খোলা জানলা দিয়া প্রথম প্রভাতের স্নিগ্ধ মৃদু আলোর উচ্ছ্বাস বহিয়াছে। চাঁদের আলো? না, চাঁদ....ঐ যে আকাশের এক কোণে জ্যোতিহীন পাণ্ডু মলিন মুখে হতাশের মত পড়িয়া আছে! পথে লোক চলিতেছে! বকুল আসিয়া জানলার ধারে দাঁড়াইল। ঐ সে বস্তী···এত কাছে! যে-বস্তীতে তার ঘর...ঐ উঠান।

বস্তীর একটু অংশ ঐ দেখা যাইতেছে। উঠানে কে ঝাঁট দিতেছে···ও? মধুর মা! বধূর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ঐ বস্তী, ঐ বস্তীর ঘর···উহারি সঙ্গে তার এ-জন্মের যা-কিছু সম্পর্ক, যত পরিচয়! বেদনার লাঞ্ছনার সহস্র স্মৃতিতে ঘেরা ঐ ঘরই তার সব! এখানে দুঃখ ভুলিয়া একরাত্রি মাত্র বড় আরামে ঘুমাইয়া বাঁচিয়াছে! কিন্তু···

ঐ···বস্তীতে ধীরে ধীরে কোলাহল জাগিতেছে!···স্বামী···? এই সকালে তার খোঁজ পড়িবে! সবাই বলিবে, কোথায় রে বকুল-বৌ? বাড়ীর সকলে তাকে বকুল-বৌ বলিয়া ডাকে। এমনি সময়েই ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানা ছাড়িয়া সে ওঠে, উঠিয়া ঘর-দ্বার ঝাঁট দেয়, উনুনে আগুন দিয়া তাড়াতাড়ি কলে গিয়া দু'কলসী জল আনিয়া তারপর রান্না চাপাইয়া দেয়। স্বামী কলে কাজ করে! সকালেই খাইয়া-দাইয়া বাহির হয়! আজো বাহির হইবে। কিন্তু আজ তাকে রাঁধিয়া দিবে কে? নিত্যকার সেই ছোট-বড় কাজ···! আজ সে-সব পড়িয়া রহিল।

এখনি ছুটিয়া সে চলিয়া যাইবে?

বধূ দ্বার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া নীচে নামিয়া আসিল। ঐ একটা ঘর···ঘরের সামনে আসিয়া দেখে, একটা তক্তাপোষে শয্যা বিছাইয়া কান্তি ঘুমাইতেছে! ডাকিয়া তাকে জাগাইবে? এই বেলা চলিয়া গেলেই ভালো হয়! এর বেশী বেলা বাড়িলে পাড়ার সকলে উঠিয়া পড়িবে। একটা কলরব উঠিবে! একজন অজানা পুরুষের সঙ্গে এই সকালে ফিরিতে দেখিলে সকলে যদি প্রশ্ন করে, কোথায় ছিলে রাত্রে···? বধূর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। মাথার ভিতর কেমন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল! সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া সিঁড়ির উপর সে বসিয়া পড়িল।

কাল রাত্রে এখানে বিছানায় নিরাপদ আশ্রয় পাইয়া সে ভাবিয়াছিল, ভারী বাঁচিয়া গিয়াছে! একটা রাত্রির মস্ত আরাম! তখন ভাবে নাই, এই একটি রাত্রি শেষ হইলে দিনের আলোয় কি নূতন শঙ্কা জাগিতে পারে! একটা অপর বাড়ীতে অজানা একজন পুরুষের আশ্রয়ে······সে যে নারী! নারীর শোচনীয় অসহায়তা কতখানি, তা সে জানে!! আরো জানে, কত বড় মন এই তার আশ্রয়-দাতার, কি দরাজ বুক! মানুষ এমন হয়, তা তার জানা ছিল না! কিন্তু স্বামী···বাড়ীর লোক···? তারা কি তা' বুঝিবে? কে

জানে। তারা জানে, নারী আর পুরুষ···মনের কোনো খোঁজও রাখেনা তারা। যদি কেহ এ কথা বিশ্বাস না করে ?···তার গতি কি হইবে ?

অত্যাচার, পীড়ন, এ কথা সে ভুলিয়া গেল—কাল রাত্রে মরণের পথ খুঁজিয়া মরিতেছিল, সে কথা মনেও পড়িল না। শুধু মনে জাগিতেছিল, এই নিরাপদ নীড়ে আশ্রয় না লইয়া যদি ঐ ঘরের দ্বারে পথের উপরই পড়িয়া থাকিত···তা হইলে দিনের আলোর সঙ্গে এই যে ভয় আর লজ্জা সাপের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, তা তো পারিত না। সহস্র লোকের বিদ্রূপ-ভরা দৃষ্টি কাঁটার মত তার মনটাকে বিঁধিয়া ধরিতেছিল! একটি রাত্রির আড়ালে দিনের এই স্নিগ্ধ মৃদু আলোর উচ্ছ্বাসে এত কালি, এত লজ্জাও মেশানো ছিল!···

নীচের ঘরে কান্তি অঘোরে ঘুমাইতেছে। বধূ রেলিঙ ধরিয়া সিঁড়ির উপর নিস্পন্দ বসিয়া! মাথার মধ্যে ধোঁয়ার মত কি সব কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে দুই চোখে যেন কে জলের ঝর্ণা খুলিয়া দিতেছে···আশেপাশে পল্লীর ঘরে ঘরে দিনের কোলাহল তার নির্ম্মম-প্রসারতায় ফাঁপিয়া ফুলিয়া চলিয়াছে!······

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কাণ্ডারী হুশিয়ার

(নজরুল ইস্‌লাম)

কোরাস্ :—
দুর্গমগিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছে জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

কোরাস্ :—
দুর্গমগিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার।

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান।
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে রঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার॥

কোরাস্ :— { দুর্গমগিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার !

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ !
"হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম্ ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র !

কোরাস্ :— { দুর্গমগিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার !

গিরি-শঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গরজায় গুরু বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ !
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথ মাঝ ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি নিয়াছ যে মহাভার !

কোরাস্ :— { দুর্গমগিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার !

যাত্রীরা ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যথা ক্লাইবের খঞ্জর।
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রঙ্গিয়া পুনর্ব্বার।

কোরাস্ :— { দুর্গমগিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার !

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুশিয়ার ! *

*কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে গীত।

জাপানের সামাজিক প্রথা

মাধ্যমিক শিক্ষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার বিদ্যালয়গুলির অবস্থান অর্থাৎ সহরের কোন অংশে কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাঝে উহারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহাদের গঠন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। এদেশে যেমন সহরের যে কোন পল্লীতে প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোন বাধা দেখি না—আমাদের দেশে এরূপ নহে। সেখানে সাধারণতঃ সহরের কোন নির্জ্জন অংশেই বিদ্যায়তনগুলি নির্ম্মিত হয় এবং এই বিদ্যামন্দিরের চারিধারে ছাত্রদের প্রলোভন জন্মাইতে পারে এরূপ কোন দোকান বা ব্যবসায় চালাইতে দেওয়া হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে—খাবারের দোকান, নাচঘর, থিয়েটার বা বায়স্কোপ স্কুলের সীমানায় থাকিতে পারিবে না।

জাপানে স্কুল বাড়ীর কম্পাউণ্ড বা সীমানা খুব বিস্তৃত হইয়া থাকে। 'সদর দরজা' (gate) দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখেই একটী বাগান দেখা যায়। এই বাগানটীতে নানাবিধ ফুলের গাছ ও দুই চারিটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনস্পতিও আছে; এবং সর্ব্বদাই এমন সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে যে দর্শনমাত্রই হৃদয় মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। এই পরিচ্ছন্নতা জাপানী বিদ্যালয়গুলির একটী মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য। সম্মুখের এই বাগানটীর দুইধার দিয়া দুইটী পথ স্কুলবাড়ীর ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সদর দরজার ঠিক সম্মুখে বাগানের পশ্চাতেই স্কুলের প্রথম বাড়ী। এই বাড়ীর ভিতর দিয়া অপর বাড়ীগুলিতে যাইবার যে পথ—সেটী ঠিক মাঝখানে। এই পথের দুইধারে বড় বড় ঘর। একধারের ঘরগুলি আপিস ও অধ্যাপকদের বিশ্রামাগার, আর একধারের ঘরগুলি অধ্যক্ষ ও অতিথির জন্য নির্দ্দিষ্ট। স্কুলের এই প্রথম বাড়ীখানি সাধারণতঃ একতলাই হইয়া থাকে। এই বাড়ীখানির ঠিক পশ্চাতে প্রকাণ্ড একটী একতলা হল ঘর। এখানে নিত্য-নৈমিত্তিক সভা-সঙ্গতের কাজ চলিয়া থাকে এবং বর্ষার দিনে সাময়িক ভাবে ইহা ছাত্রদের ব্যায়াম গৃহেও পরিণত হয়। এই 'সভাঘরের' ঠিক পশ্চাতে ছাত্রদের পড়াইবার উপযোগী দুই-তিনটী লম্বা লম্বা বাড়ী আছে। এই বাড়ীগুলি মাঝে কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখিয়া একটীর সম্মুখে আর একটী—এইভাবে পাশাপাশি সজ্জিত। বাড়ীগুলি প্রধানতঃ দু'তলা এবং কখনও কখনও তিন তলাও হইয়া থাকে। এইগুলি হইতে একটু দূরে ইহাদের পশ্চাতে বা পার্শ্বেই ছাত্রদের 'বোর্ডিং-হাউস' বা থাকিবার ও খাইবার বাড়ী। ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে ইহাদের কম-বেশী হইলেও প্রত্যেক স্কুলে অন্ততঃ দুই তিনটা বোর্ডিং-হাউস' থাকিবেই এবং প্রায়ই সবগুলি দোতলা। এই বাড়ীগুলির চারিধার ছোটখাট ফুলের গাছে,

লতাপাতায় ও বনস্পতিতে সুন্দর ভাবে সাজানো। এইসব বাড়ী ছাড়াও স্কুলের প্রকাণ্ড হাতার মধ্যে স্থানে স্থানে 'কেন্দ' 'জিউজুৎসু' প্রভৃতি আমাদের দেশীয় ব্যায়াম-পদ্ধতি শিখিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী এবং একটী প্রকাণ্ড 'গ্রন্থাগার'ও থাকে। এই গ্রন্থাগারটী এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত হয় যে, কোথাও আলো বাতাসের এতটুকু অভাব থাকে না। ইহা ছাড়া স্কুল-কম্পাউণ্ডের মধ্যে 'সদর দরজার' কাছে দুই-চারিখানি দোকানঘর থাকে। এখান হইতে ছাত্রদের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসগুলি সরবরাহ করা হয়, ইহা আপনাদের ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি।

ছাত্রজীবনের পক্ষে আর একটী বিশেষ দরকারী জিনিস হইতেছে খেলিবার মাঠ। খেলিবার এই মাঠগুলিও স্কুল কম্পাউণ্ডেরই মধ্যে, স্কুল বাড়ীর ঠিক পিছনে পাশে বা সম্মুখে থাকে। এই মাঠগুলিতে ছেলেরা সাধারণতঃ ফুটবল খেলে এবং মাঝে মাঝে নানাবিধ ক্রীড়ার (sports) আয়োজনও হয়। ইহা ছাড়া সামরিক ব্যায়াম-শিক্ষার জন্য স্কুলের সব শ্রেণীর ছাত্ররা এইখানেই প্রত্যহ মিলিত হয়। অবশ্য আশা করি, ইহা আপনারা জানেন যে, জাপানে ছাত্রদের পক্ষে সামরিক ব্যায়াম শিক্ষা বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেককেই সামরিক ব্যায়াম শিখিতে হয়। ছাত্র ও অধ্যাপকদের টেনিস খেলার জন্য প্রত্যেক স্কুলে ইহা ছাড়া আর দুই একটী ছোটখাট মাঠও থাকে। এগুলি প্রায়ই অফিস বা বোর্ডিং হাউসের ঠিক পার্শ্বে অবস্থিত।

স্কুলভেদে ছাত্র সংখ্যাও বিভিন্ন হইয়া থাকে। একটী মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ন্যূন পক্ষে ৬০০ ছয় শতর কম হয় না, আবার ঊর্দ্ধপক্ষে ৫০০০ পাঁচ হাজারও হইতে পারে। অবশ্য অধিকাংশ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রধানতঃ এক হাজার হইতে দেড় হাজারের মধ্যে। এই সব ছাত্রেরা সকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইলে 'হলঘরে' বা মাঠে সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়; তখন সমবেত কণ্ঠে একটী সঙ্গীত করিয়া পড়াশুনার কাজ আরম্ভ হয়।

এই গানগুলি প্রধানতঃ দেশপ্রীতি ও ছাত্রজীবনের উৎসাহ ও উদ্যমকে উদ্দীপিত করে। এবং এই উদ্দীপনা কেবল মৌখিক নহে,—রণবাদ্য শুনিয়া যুদ্ধযাত্রী সৈন্যেরা যেমন ঘরের কথা ভুলিয়া গিয়া উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া যায়, এই সঙ্গীত শুনিয়া ছাত্ররাও তেমনি আর সব বিস্মৃত হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে দেশের ও আপনার গৌরব বাড়াইবার জন্য মাতিয়া উঠে। এই গান কেবল যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদেরই গাহিতে হয়, তাহা নহে ; এমন কি উপলক্ষ ঘটিলে সাময়িক ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়েও ইহা গীত হইয়া থাকে। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার যে, গানগুলির মূল ভাব এক হইলেও স্কুল ও কলেজ-ভেদে উহার রচনা ভিন্ন হইয়া থাকে। আমাদের দেশের ভাষায় এই শ্রেণীর গানকে 'কৌ-কা' অর্থাৎ স্কুলের গান বলে।

স্কুল-বাড়ী সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি। ঠিক 'সদর দরজা'র (গেট) পাশে ছোট একটী 'আফিস-ঘর' আছে। সর্ব্বদা এখানে একজন দ্বাররক্ষী কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকেন। যদি কোন লোক কোন কাজে ভিতরে আসিতে চায়, তবে ইহার অনুমতি লইয়া আসিতে হয়; আবার ছাত্রাবাসের কোন ছাত্রকে বাহিরে যাইতে হইলেও ইহাকে বলিয়া যাইতে হয়। এইরূপ নিয়ম থাকায় বোর্ডিং-হাউসের কত নম্বর ঘরের কোন্ ছাত্র কখন ঘরে থাকিল কি বাহিরে গেল, তাহা সহজে জানা যায়। আমাদের দেশের ভাষায় এই কর্ম্মচারীটীর নাম হইল 'উকে-টুকে' অর্থাৎ একরকম 'ইন্‌কোয়ারি অফিসার'। এই কর্ম্মচারীটী কেবল উপরি-উক্ত কাজ করিয়াই বিশ্রাম পায় না, সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া স্কুলের ঘণ্টা বাজানোর কাজও ইহাকেই করিতে হয়। অবশ্য এই 'ঘণ্টা বাজানোর' কাজ আমাদের দেশে যে কিরূপ গুরু দায়িত্বপূর্ণ মনে করা হয়, তাহা আপনারা ধারণাও করিতে পারিবেন না। এদেশের ন্যায় আমাদের দেশে এই কাজটীকে নিম্ন শ্রেণীর বলিয়া মনে করা হয় না। ইহা ছাড়া ছাত্র ও অধ্যাপকদের বাহিরের সমস্ত চিঠি-পত্রও ইহার হাতে আসিয়াই বিলি হয়; এবং এই চিঠি-পত্রের মধ্যে যেগুলি বিশেষ দরকারী বলিয়া মনে হইবে, সেগুলি সরকারী খাতায় ইহাকে রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখিতে হয়। ইহাতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, একজন সামান্য দ্বার রক্ষীকেও আমাদের দেশে এদেশের তুলনায় কত অধিক ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে এখানে স্কুলের চাকর-বাকর সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চাই। একটী মাধ্যমিক স্কুলের চাকরের সংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচ ছয় জনের অধিক নহে। এই পাঁচ ছয় জন লোকের দ্বারাই অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সরকারী ও ব্যক্তিগত কাজ কর্ম্ম এবং স্কুলের বড় বড় বাড়ীগুলির ঝাড়া-ঝোড়ার কাজ চলিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বাহিরের বাগান ও মাঠগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র লোকের ব্যবস্থা আছে। এখানে আর একটী কথা আপনাদিগকে বিশেষভাবে বলিয়া রাখা দরকার যে, এই স্কুলবাড়ীর ঝাড়া-ঝোড়া কাজের কতকটা অংশ ছাত্রদিগকেও গ্রহণ করিতে হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে স্কুলের ছুটীর পর প্রত্যহ পালা করিয়া দুই তিনজনে নিজেদের শ্রেণীর চেয়ার টেবিলগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে হয়।

এইবার ছাত্রাবাস (বোর্ডিং) সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। স্কুলের নিকটে যাহাদের বাড়ী, সেই সব ছাত্র ও ছাত্রীরা নিজেদের বাড়ী হইতেই স্কুলে যাতায়াত করে; তাহাদিগকে বোর্ডিংএ থাকিতে হয় না। যাহাদের বাড়ী দূরে প্রত্যহ যাতায়াত করা যাহারা অসুবিধা বলিয়া মনে করে তাহারাই কেবল বোর্ডিংএ আসিয়া থাকে। ইহা ঠিক এদেশেরই মত। এক-একটী মাধ্যমিক স্কুলের বড় বড় বোর্ডিং আছে; এগুলি সব স্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যেই অবস্থিত—কোন বোর্ডিংই এদেশের মত স্কুল সীমানার বাহিরে থাকিতে পারিবে না, ইহা

পূর্ব্বে আপনাদিগকে বলিয়া আসিয়াছি। স্কুলভেদে বোর্ডিংএর ব্যবস্থা প্রণালীও বিভিন্ন হইয়া থাকে। এদেশের যেমন দেখিতে পাই ছাত্রদের যেটী শয়নকক্ষ, তাহারই একধারে চেয়ার টেবিল সাজাইয়া অধ্যয়নের স্থান করিয়া লওয়া হয়, আমাদের দেশে এরূপ নহে। সেখানে ছাত্রদের শুইবার ও পড়িবার ঘর প্রায়ই পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। এই হিসাবে এক একটী ছাত্রের জন্য অন্ততঃপক্ষে দুইটী করিয়া ঘর লাগে। অবশ্য এক ঘরে দুই অথবা তিন ঊর্দ্ধ-সংখ্যায় চারিজন পর্য্যন্ত ছাত্রের এক সঙ্গে শয়ন বা অধ্যয়ন চলিতে পারে বা সাধারণতঃ চলিয়াই থাকে। বোর্ডিংগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক ছাত্রকে নিজেদের থাকিবার ও পড়িবার ঘরগুলি প্রত্যহ বেশ করিয়া ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করিতে হয়; কেবল ঘরের বাহিরের অংশগুলি পরিচ্ছন্ন রাখিবার ভার চাকর-বাকরের উপর। এই নিয়ম যে সকল দিক দিয়াই কত বড় উপকারী তাহা নিজের চোখে এদেশের ও আমাদের দেশের ছাত্রাবাসগুলি দেখিয়া আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি। আশা করি সকল কথা খুলিয়া না বলিলেও পাঠকগণ আমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াছেন।

এক একটী বোর্ডিংএ একজন অথবা দুইজন করিয়া অধ্যক্ষ থাকেন। ইহাঁরা নিজেরা খুব চরিত্রবান্ এবং ছাত্রদিগের রক্ষণাবেক্ষণ কর্ম্মেও অত্যন্ত দক্ষ। এক একটী বোর্ডিংএ দুই-তিন শত ছাত্র থাকিলেও তাহাদের আহারের ব্যবস্থা একসঙ্গে একই সময় হইয়া থাকে। বোর্ডিংএ 'খাই-খরচ' হিসাবে প্রত্যেকের গড়ে মাসে ১২৲ বার টাকা করিয়া লাগে; ইহা ছাড়া থাকিবার জন্য 'ঘরভাড়া' হিসাবে কাহাকেও কিছু দিতে হয় না। বোর্ডিংএর বাকী সব নিয়ম কানুনগুলি প্রায় এদেশেরই মত; কেবল পড়া-শুনার পদ্ধতি সম্বন্ধে এদেশের তুলনায় সেখানে যে বৈচিত্র্যটুকু লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা আপনাদিগকে বলিতে চাই। সাধারণতঃ সকালে ও রাত্রে বোর্ডিংএ বসিয়া পড়াশুনার অবসর ছাত্রেরা পাইয়া থাকে। এই সময় একসঙ্গে বহু ছাত্র একত্র পড়াশুনা করিলেও একটী শব্দও শোনা যায় না—প্রত্যেকেই মৌনী থাকিয়া নিঃশব্দে আপন আপন কাজ করিয়া চলে; এদেশের মত অন্যের মনঃসংযোগে বাধা জন্মাইয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ্যাংশ আবৃত্তি করিবার রীতি সেখানে নাই।

সন্ধ্যার সময় ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে বাহিরে গিয়া বেড়াইয়া আসিতে পারে; কিন্তু রাত্রিতে বাহির হওয়া একান্তই নিষিদ্ধ। কারণ রাত্রি ৯টা বাজিলে স্কুলের 'সদর দরজা' সেদিনের মত একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। অবশ্য কোন বিশেষ প্রয়োজনে অধিক রাত্রে কাহারও বাহিরে যাইবার দরকার হইলে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে।

মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদিগের বেতন ও শিক্ষকদিগের মাহিয়ানা সম্বন্ধে এইস্থানে উল্লেখ করা উচিত ছিল; কিন্তু ইহা আমি আমার পরবর্ত্তী প্রবন্ধে উচ্চশিক্ষার প্রসঙ্গে একসঙ্গে বলিব।

শ্রীআর, কিমুরা

সোশিয়ালিজম্

১। সোশিয়ালিজম্ কাহাকে বলে।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ওয়েন্সের উৎসাহে একটি ইংরাজ শ্রমিক সভা গঠন সম্পর্কীয় বাদানুবাদে সেশিয়ালিজম্ কথাটি ইংলণ্ডে প্রথম ব্যবহৃত হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে প্রকাশিত একখানি পুস্তকে স্থানলাভ করিয়া ইহা অর্থনীতি-শাস্ত্রের পরিভাষায় প্রবেশ লাভ করে বলা যাইতে পারে। কথাটির সঠিক পরিচয় দেওয়া বড়ই কঠিন। কারণ ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিন দেশের তিনজন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ফরাসী পণ্ডিত জ্যালেট বলেন "যে মতানুসারে মানব সমাজে ধনবিভাগের বৈষম্য দূর করিবার জন্য স্থায়িভাবে ধনীদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া নির্ধনদিগকে দান করার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার রাষ্ট্রের আছে বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাকেই আমরা সেশিয়ালিজ্ম বলি।" সুবিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, "ধনোৎপাদনের উপায়ভূত যন্ত্রাদি সমাজের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া উৎপন্ন ধনের বিভাগ সমাজ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে রাষ্ট্র পরিচালকদিগের দ্বারা সম্পন্ন হওয়াই সেশিয়ালিজমের বৈশিষ্ট্য।" আমেরিকান প্রফেসর ইলাই বলেন যে, "কল্পিত শিল্পি-সমাজ ধনোৎপাদনের প্রধান উপকরণ-গুলিতে ব্যক্তিগত অধিকারের পরিবর্ত্তে যৌথ অধিকার স্থাপনকরতঃ ধনোৎপাদন কার্য্যে যৌথ কার্য্য পরিচালন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া সমাজের আয় সমাজের দ্বারা বিভাগ করিতে চাহে; কিন্তু এই আয়ের অধিকতর অংশে ব্যক্তিগত অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিতে চায়—তাহাকেই সোশিয়ালিজম বলা যাইতে পারে। এইরূপ সোশিয়ালিজম সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হইলেও আমরা ইহার মধ্যে তিনটি কথা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া দেখিতে পাই :—

(১) মূলধনাধিকারী-গত ধনোৎপাদন প্রথার ভিত্তিস্বরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূলোচ্ছেদ। বিগত কয়েক শতাব্দীর সামাজিক বিবর্ত্তনের ফলে বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লবের ধাক্কায় পশ্চিম য়ুরোপের সর্ব্বত্র সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি ভূমি এবং মূলধনের অধিকার হারাইয়া অপরের কাজ করিয়া তাহার নিকট প্রাপ্ত বেতনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছে। সোশিয়ালিষ্টগণ ধনোৎপাদনের এই দুইটি উপাদান সাক্ষাৎভাবে ব্যবহারের সুযোগের অভাবই মানবের অধিকাংশ অর্থনৈতিক দুঃখের প্রধান বলিয়া মনে করেন। এই অবস্থা প্রকৃত প্রস্তাবে অস্বাভাবিক। ইহা দূর করিবার জন্যই তাঁহারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার প্রথা উঠাইয়া দিতে চান। তাঁহারা অবশ্য বলেন না যে কোন সম্পত্তিতে

কাহারও কোনোরূপ ব্যক্তিগত অধিকার থাকা উচিত নহে। নিজের বস্ত্রাদি, গৃহসজ্জা, বই, টাকাকড়ি এবং হয়ত বসতবাটি ও তাহার সামিল একটুকরা জমিতেও তাঁহারা ব্যক্তিগত অধিকার রাখিতে চাহেন। কিন্তু সাধারণতঃ ভূমি, কলকারখানা, রেল প্রভৃতি বর্ত্তমান ধনিকগত ধনোৎপাদন ও ধনবিভাগের উপকরণসমূহ এবং যে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে বিনা উপার্জ্জনে মূল্যবৃদ্ধিজনিত মুফৎ লাভ (unearned increment) হইতে পারে সেই সমস্ত গুলিই ইঁহারা ব্যক্তির অধিকারের বহির্ভূত করিয়া দিতে চান।

(২) ধনোৎপাদন, ধনবিভাগ এবং ধনলাভের সর্ব্ববিধ উপকরণকে রাষ্ট্রের অধিকারে ও বশে আনয়নই সোশিয়ালিজমের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। ভূমির উপস্বত্ব এবং কল কারখানা পরিচালনের ও ধনবিভাগের সমস্ত লাভ ইঁহাদের মতে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি না রাখিয়া সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করাই শ্রেয়ঃ।

(৩) রাষ্ট্রভুক্ত ব্যক্তিমাত্রকেই প্রধানতঃ বা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী ধনোৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে বাধ্য করিয়া সমাজের ভরণপোষণের ভার বহনে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য এই কার্য্য নূতন করিয়া ভাগ করা সোশিয়ালিজমের তৃতীয় উদ্দেশ্য। এই নূতন বন্দোবস্তে অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের দেয় তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী ভিন্ন প্রকারের হইবে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি বা সৌন্দর্য্য বোধ শক্তির পরিচালন কাহারও কাহারও অংশে পড়িলেও প্রধানতঃ সকলেই শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত থাকিবেন। এই ব্যবস্থায় পৈত্রিক সম্পত্তিভোগী নিষ্কর্ম্মা বড়লোকের দল একেবারে লোপ পাইবে; জমির খাজনা বা টাকার সুদ বলিয়া কিছুই থাকিবে না; এবং সকলেই রাষ্ট্রের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইবে। সেইজন্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত বেতনই লোকের একমাত্র আয় হইবে। কিন্তু এই বেতন নির্দ্ধারণের মূল সূত্র কি হইবে এই প্রশ্ন লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সোশিয়ালিষ্টদিগের মধ্যে বিষম মতভেদ আছে। একান্ত আবশ্যক বলিয়া অবশ্য সকলেই এই প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। একদল এই সম্বন্ধে বলেন ব্যক্তির অভাব অনুযায়ী বেতন নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। আর একদলের মত পরিশ্রমের কঠোরতা অনুযায়ী বেতন নির্দ্ধারিত হওয়াই ন্যায্য। তৃতীয় দলের মতে শ্রমিকের কর্ম্মপটুতা (efficiency) অনুযায়ী বেতন নির্দ্ধারিত না হইলে আলস্য এবং অমনযোগিতার বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এই তিন দলের মধ্যে বর্ত্তমানকালে দ্বিতীয় দলের সংখ্যাই অধিক।

২। ইংলণ্ডে সোশিয়ালিজম্

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অন্তর ক্রমশঃ দূর হইতে দূরতর হইতেছিল। কি জাতীয় কি স্থানীয় কোন শাসন

সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদিগের কোন কথা চলিত না। দেশের এক ছটাক জমীতেও তাহাদের কোন প্রকার স্থায়ী স্বত্ব ছিল না। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা আদৌ ছিল না বলিলেও চলে। প্রত্যহ বহুক্ষণ কাজ করিয়াও ইহারা অতি সামান্য বেতন পাইত। সর্ব্বপ্রকারেই এই দুর্ভাগাদের জীবন বিষময় ছিল। মনিব ইহাদের ঘৃণা ও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন; সাধারণতঃ ইহাদের ভারবাহী পশুমাত্র মনে করিতেন। পশু মরিলে ক্ষতি আছে ও সবল সুস্থ পশু বিক্রয় করিলে বাজারে যথেষ্ট মূল্য পাওয়া যায় বলিয়া পশুগুলি বরং মনিবদিগের নিকট অপেক্ষাকৃত সদয় ব্যবহার পাইত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহারা নিজেদের সুবিধার জন্য সংঘবদ্ধ হইতেও পারিত না। দল বাঁধিলে জেলে যাইতে বা আইন অনুসারে বেত খাইতে হইত। অত্যাচার নিতান্ত অসহ্য হইলে ইহারা সময়ে সময়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করিত এবং কখনও কখনও গোপনে আপনাদের দুঃখের কারণ বলিয়া কল কারখানাগুলি ভাঙ্গিয়া দিত।

মনিবদিগের মধ্যে কোন কোন চিন্তাশীল সহৃদয় ব্যক্তি শ্রমিকদিগের এই ভীষণ দুর্দ্দশার ভীষণ পরিণামের কথা ভাবিয়া ইহার প্রতিকার কল্পে যত্নবান হইতেন। মহাত্মা ওয়েন ইহাঁদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত। উনিশ বৎসর বয়সে ইনি ম্যাঞ্চেষ্টারে একটি কাপড়ের কলে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই কলে ৫০০ শ্রমিক কাজ করিত। ইঁহার তত্ত্বাবধারণের গুণে কলটি সর্ব্বপ্রকারে দেশের আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইনি স্কট্ল্যাণ্ডে ক্লাইড নদীর তীরে নিউলেনার্ক (New Lanark) নামক কাপড়ের কলের অংশীদার হইয়া অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই কলে দুই সহস্রেরও অধিক লোক কাজ করিত। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৫০০ বালক বালিকা ছিল। ইহাদের অধিকাংশই ৫।৬ বৎসর বয়স্ক; এডিনবার্গ ও গ্লাসগো নগরের গরীবখানা হইতে আনীত। তখন আত্মসম্মান বোধ থাকিলে কেহ কারখানায় কাজ করিতে চাহিত না। চুরি, মাতলামি, ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ পাপ সেখানে সাধারণ ব্যাপার ছিল। কেহ শিক্ষা বা স্বাস্থ্য-বিধির নাম পর্য্যন্ত জানিত না। এই হতভাগ্য মজুরদের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য ওয়েন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় ইহারা স্বল্পকাল মধ্যেই সুস্থ শ্রমশীল সন্তুষ্ট, মিতব্যয়ী পরিচ্ছন্ন এবং নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া উঠিল। ইহার ফলে ওয়েনের যশ সমস্ত বৃটেন ও য়ুরোপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং নানা স্থান হইতে বিখ্যাত সমাজ সংস্কারকগণ তাঁহার কার্য্য দেখিতে উপস্থিত হন। কারখানায় স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, শ্রমিকদিগের বাসগৃহগুলি নূতন করিয়া গড়িয়া, তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া ও তাহাদের কার্য্যের সময় কমাইয়া এবং তাহাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার দ্বারাই প্রধানতঃ তিনি পূর্ব্বোক্ত সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রমিকরা যাহাতে ন্যায় দামে জিনিস পাইতে পারে তজ্জন্য তিনি একটি ভাণ্ডারেরও প্রতিষ্ঠা করেন এবং মদ্য বিক্রয় যতদূর সম্ভব হ্রাস করিয়া দেন।

শ্রীপঞ্চানন সিংহ

জ্যৈষ্ঠে

দাঙ্গার জের—যাহারা "কর্ম্মে কুমীর, মর্ম্মে ভূমির গর্ভে পোষা সাপ," তাহাদিগকে যে সমাজদ্রোহীরা ধর্ম্মের প্রহরী সাজাইয়াছে, তাহাদের বুঝিতে বাকি আছে যে, নিজে খাল কাটিয়া আনিলেও কুমীরেরা মিত্র হয় না ও গৃহে সসর্প বাস নিরাপদ নয়। কথাটা বুঝিতে বাকি আছে বলিয়াই পাপিষ্ঠেরা কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পাপকে নানা জেলার নানা পল্লীতে চালাইতেছে। নৃশংস কাপুরুষেরা কলিকাতার অলি-গলিতে গা ঢাকা দিয়া ফিরিত, আর এখন ঐ কাপুরুষ চোরেরা রাত্রে মন্দির লুঠিয়া ও ঠাকুর ভাঙ্গিয়া বেড়াইতেছে। সাবধান হও চালকের দল বা পাণ্ডার দল বা ভূতের ওঝার দল; মনে রাখিও, একবার ভুল মন্ত্র আওড়াইলেই ভূতেরা আগে ওঝার ঘাড় মট্‌কায়, কাহারও সাধ্য নাই পাপকে জয়যুক্ত করায়, তবে ইহা শোচনীয়। দাঙ্গার জের চলিয়াছে পাপের বৃদ্ধিতে।

দাঙ্গার অন্য একটি ফল হইয়াছে এই যে, উহার ঝড়ে হিন্দু-মুসলমানের ছদ্ম আবরণ উড়িয়া গিয়াছে। যে মুসলমানেরা স্বরাজের বড় বড় পাণ্ডা ছিলেন, তাঁহারা হিন্দুর সঙ্গে মিত্রতার নামে তোবা বলিয়াছেন, ও হিন্দুদিগকে প্রতিবেশী সহচর বা সহকর্ম্মী (brethren) বলিয়া স্বীকার করা পাপের কাজ মনে করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে যে উচ্চ ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধিজির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, তিনি মহাত্মাজিকে মুসলমান করিতে পারিলে সুখী হইবেন বলিয়াছেন। এসময়ে শুদ্ধিওয়ালারা যদি বলিতেন যে ঐ ব্যক্তিকে শুদ্ধি দেওয়া প্রার্থনীয়, তাহা হইলেই হয়ত একটা দাঙ্গার ঝড় বহিত। আপনার বেলায় আটি সাঁটি মন্দ নয়, তবে পরের বেলায় অন্যকে দাঁতের শোভা না দেখাইলেই ভাল হয়।

অন্যদের মধ্যে আপনাদের প্রসার না বাড়াইয়া সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতায় ডুবিলে যে ভীষণ দুর্গতি ঘটে,—সমাজতত্ত্বের এই অতি ক্ষুদ্র কথাও যাঁহাদের জানা নাই তাঁহারা সমাজ পরিচালনে অপটু, ও কাজেই তাঁহারা মুসলমান সমাজের শত্রু। যাঁহারা ইস্‌লামিয়া কলেজকে কেবল মুসলমান ছাত্রদের অধিকারে দিলেন, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন সরাসেনদের সভ্যতার যথার্থ গৌরবের দিনের কথা, যখন মুসলমানেরা জ্ঞানের মন্দিরে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেয় নাই। তাঁহারা এই জীবন্ত দৃষ্টান্তও ভুলিয়াছেন যে কি ভাবে স্যর্ সৈয়দ আহম্মদ আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অনেক মুসলমান এখন হিন্দুর উপর চটিয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছেন।

যে ধরণের আব্‌দারের জিদকে বেয়াড়া ছেলের আহ্লাদেপনা বলা যায়, অনেক মুসলমান সে আব্‌দারে সকল অমুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসব ও গান-বাজনা বন্ধ করিতে

চাহিতেছেন। একটা পাকা মুসলমান রাজ্যের মস্‌জিদের সমুখের আম্‌রাস্তায় অন্য দেশের অন্য ধর্ম্মের লোকের চলা-ফেরা বা কথা-কওয়া বন্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশ আইন শাসিত এই দেশে এ আব্‌দার চালাইবার যুক্তি পাওয়া যায় না। অমুসলমানেরা আপোষি ভাবে শিষ্টাচারের খাতিরে প্রতিবেশী মুসলমানের আব্‌দার রাখিতে পারেন, কিন্তু হক্‌ বা অধিকারের দাবিতে মুসলমানেরা কিছু করাইতে পারেন না। আম্‌রাস্তায় গাড়ি যায়, মানুষে চীৎকার করে, কুলিরা গান গাহিয়া কাজ করে; সেগুলিতে মুসলমানদের ধর্ম্মের বাধা হয় না, আর হইলেই বা শোনে কে; কিন্তু গানটা যদি শ্রমজীবির গলার না হইয়া একটা সম্প্রদায় বিশেষের লোকের হয়, অমনি ধর্ম্মের নাড়ীতে তপ্ত রক্ত ছোটে। মনে কর যদি আর্য্যসমাজের লোকেরা তাঁহাদের শোভাযাত্রা বন্ধ হইবার দরুণ হাইকোর্টে বিরোধীদের নামে এই মর্ম্মে Tort এ মোকদ্দমা করিতেন যে, তাঁহারা যথারীতি পাস্‌ পাইয়া আইনসঙ্গত অধিকারে আম্‌রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, আর মুসলমানেরা বাধা দেওয়ায় তাঁহাদের শোভাযাত্রা নষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে আদালতে প্রতিবাদীর এই উত্তর গৃহীত হইত কি, যে রাস্তার কোন লোক গলায় সুর বিশেষ ভাঁজিয়া যদি কোন ঠাকুরের বা পরমেশ্বরের নাম করে, তবে তাহা তাহার সহ্য হয় না, অথবা উহা তাহার বিবেচনায় ধর্ম্মের বাধাজনক মনে হয়? যে যাহার নিজের ধর্ম্মমতের বিশেষত্ব অপরের উপর চালাইতে পারে না, অথবা নিজের চামড়া ছন্‌-ছনে (sensitive) বলিয়া অন্যের আইন সঙ্গত অধিকারে বাধা দিতে পারে না। এ বিষয়ে কোন আইন পাস্‌ হইতে পারে না অথবা বিধিমতে সরকারি নিয়ম জারি হইতে পারে না; গোলমাল নিবারণের জন্য পুলিশের লোকে যে বিশেষ ব্যবস্থা করে, তাহা তাহারা না করিলেও পারে, আর কেহ কাহাকে ন্যায্য অধিকারে বাধা দিলে অপরাধীকে দণ্ডিত করিয়াই কাজ শেষ করিতে পারে। অর্থাৎ এবিষয়ে জিদ ও আব্‌দারে আইন করান যাইতে পারে না,—ভদ্রভাবে অন্যের শিষ্টাচার প্রার্থনা করাই একমাত্র উপায়। সেই মিত্রতার দিক যদি মুসলমানদের ঘৃণ্য হয়, তবে এ আব্‌দার কিছুতেই টিকিবে না।

* * * * *

সাম্প্রদায়িক শোভাযাত্রা—দাঙ্গার প্রকোপ প্রবল থাকিবার সময়ে শিখেরা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক শোভাযাত্রা চালাইতে অনুমতি পান্‌ নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেই সময়কার প্রতিশ্রুতি অনুসারে সম্প্রতি উহা চালাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন ও শিখেরা তাঁহাদের গ্রন্থ সাহেব প্রতিষ্ঠার উৎসব মহা সমারোহের শোভাযাত্রার শেষ করিয়াছেন। যেরূপ সংযমে ও গাম্ভীর্য্যে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় এই যাত্রার বাহিনী চলিয়াছিল, তাহা ইউরোপীয়দের চক্ষেও মনোরম হইয়াছিল। শিখদের সঙ্গে এই যাত্রায় যে বাঙ্গালীরা আনন্দে জুটিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা খুব নিপুণ হিসাবেও দশ হাজারের কম নয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এ

প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে সাধারণ শ্রেণীর বাঙ্গালীদের চড়ক পূজায় যাত্রার বাধা পাইবার কথা। সারা বৎসর ধরিয়া সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা বৎসরের একটা আনন্দের দিনের দিকে চাহিয়া থাকে; কাজেই সে আনন্দে বাধা পড়িলে লোকেরা বড় ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ হয়। উহাদের ঢাকের বাদ্য আমাদের কাছে তৃপ্তিকর নয়, কিন্তু দশ জনে বৎসরান্তে আনন্দলাভ করিতেছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হই। পূর্ব্বে কখনও কলিকাতা সহরে কেহ চড়কের অনুষ্ঠানে বাধা পায় নাই; সাধারণ লোকের মুখ চাহিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট সুব্যবস্থা করিতেন তবে উপদ্রবের সময়ে সাধারণ লোকের এ আনন্দলাভে বাধা হইত না।

* * * *

বিলাতী হাঙ্গামা—ব্রিটিশ যুক্ত-রাজ্যের শ্রমজীবিরা সম্প্রতি যে বিদ্রোহ বাধাইয়াছিলেন, তাহা হইতে আমাদের শিখিবার আছে অনেক; যাহাদের শ্রমে ও সাহায্যে মহাজনদের ধনভাণ্ডার ভরে, তাহারা মহাজনদের কৃপায় যাহা হউক কিছু ভৃতি পাইবে, ও তাহাতে তাহাদের পেট ভরিবে না, বিলাতী শ্রমজীবিরা তাহা সহিতে পারে না; তাহারা অন্যের কৃপায় বাঁচিয়া থাকিতে চায় না,—নিজের দাবিতে নিজের হক্ বজায় রাখিতে চায়। আমরা এদেশে আভিজাত্যের গৌরবে যাহাদিগকে অতি কুৎসিৎ নামে অভিহিত করিয়া depressed class এর লোক বলি, তাহারা সে অভিধায় ক্ষুণ্ণ হয় না, ও নিজের মনুষ্যত্বের দাবিতে নিজের প্রতিষ্ঠা না চাহিয়া উচ্চদের কাছে একটু উঁচুতে উঠিবার ব্যবস্থা চায়। আমাদের বেশির ভাগ আন্দোলন কৃপার ভিখারীদের নীচতাব্যঞ্জক চীৎকার।

গ্লাস্‌গো ও ডাণ্ডি হইতে ওয়েল্‌স্ প্রদেশের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত যেরূপ উদ্যোগে, তীব্রতায় ও দৃঢ়তায় এই বিদ্রোহ বাধিয়াছিল, তাহার সঙ্গে তুলনায় কলিকাতার কুৎসিৎ দাঙ্গার প্রসারকে অতি ক্ষুদ্র বলিতে হয়। কলিকাতার দাঙ্গায় ইংরেজেরা দুই তিন দিন ভাল মাংস খাইতে না পাওয়াতেই দাঙ্গার প্রকোপ একেবারে কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু শ্রমজীবিদের বিদ্রোহে ইংলণ্ডের কোন স্থানেই অনেক দিন ধরিয়াই খাদ্য পদার্থের আমদানি হইতে পারে নাই, ও বিদেশের জাহাজ ইংলণ্ডে কিছু পৌঁছায় নাই ও পৌঁছাইতে পারে নাই। অনেক স্থানে রেল গাড়ি চলিতে পারে নাই ও রেল মোটর প্রভৃতি সকল যান হইতেই জোর করিয়া বিদ্রোহীরা আরোহীদিগকে নামাইয়া দিয়াছিল। কাজেই চলা-ফেরা ও কেনা-বেচার কারবার একেবারে বন্ধ হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্ববারে বলিয়াছিলাম যে, স্বরাজপ্রার্থীদের দেশের বাহিরে ইউরোপেও এমন লোক অনেক আছে, যাহারা উত্তেজনায় মাতিয়া স্বদেশের স্বার্থ ভোলে ও নৃশংস আচরণ করে, আর এমন লোকও আছে যাহারা উত্তেজনার সময়ের গণ্ডগোলের সুবিধায় ষণ্ডামি করিয়া সুখী হয়। এই বিলাতী হাঙ্গামায় তাহারও অনেক পরিচয় মিলিয়াছে।

বিলাতী বিদ্রোহ নিবারণের জন্য ও দুঃস্থের সহায়তার জন্য যাঁহারা অতি প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা বহুসংখ্যক ভোলন্‌টিয়রের দল। ইংলণ্ডটা এদেশ নয়, কাজেই

ভোলনটিয়রেরা সৎকার্য্যে নামিবার পথে এমন বাধা বা এস্তাহার পায় নাই, যে তাহারা দু-পাঁচজন একসঙ্গে জুটিলেই দণ্ডিত হইবে। কলিকাতার বহুসংখ্যক যুবক যখন তিন-চারি-দিন ধরিয়া হাসি-মুখে ও কর্ম্মনিষ্ঠায় মেথর মুদ্দফরাসের কাজ করিল, তখন সরকার বাহাদুর দূরে থাকুন, ইংরেজী কাগজের সম্পানক ষ্টেট্স্‌মান্ ওরফে ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়াও তাহাদের কাজের কথা উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন; নিতান্ত শেষকালে ৩০শে এপ্রিলের এই ভারতবন্ধুর কাগজে একটা দূর প্রসঙ্গে ভোলনটির্‌দের কথা উল্লিখিত ছিল কিন্তু একটিও প্রশংসার কথা ছিল না। ইউরোপের ভোলণ্টিয়র্‌রা পাইতেছেন বাহবা ও সম্মান, আর হয়ত বা আমাদের ভোলণ্টিয়রদের কেহ কেহ পাইবেন নিগ্রহ ও দণ্ড। এদেশের লোকে আত্মসম্মান রক্ষায় ও দেশ রক্ষায় যে উপযোগী, ভোলণ্টিয়র্‌রা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন; কিন্তু দুদিনে সে কথা কর্ত্তৃপক্ষের লোকেরা ভুলিয়া যাইবেন।

ইংলণ্ডের দাঙ্গা সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। ঐ ভীষণ দাঙ্গায় যে সকল সভ্য ভদ্রলোক ধৃত হইয়াছেন তাঁহারা বেশির ভাগ গোটা পাঁচেক স্বর্ণমুদ্রা জরিমানা দিতে বাধ্য হইয়াছেন; আর একজনের এই বিবরণ পড়িয়াছি যে, তিনি প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিবার উত্তেজনা দিয়া বিদ্রোহের বক্তৃতা করিয়াছিলেন ও সেই ব্যক্তির কঠোর দণ্ড হইয়াছে তিন মাস জেল। পার্লামেণ্টের মেম্বর পার্শী সক্লৎওয়ালা সমাজদ্রোহের বক্তৃতা করিয়া দু'মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন। আমরা বলিনা যে আমাদের দেশের পাপিষ্ঠ অপরাধীরা লঘু দণ্ড ভোগ করুক, কিন্তু দেখিতেছি যে সেই শীতের দেশে ও গ্রীষ্মের দেশে ন্যায় বিচারের পদ্ধতি বড় স্বতন্ত্র। রুসের বিপ্লবপন্থীরা ব্রিটিশ বিদ্রোহীদের হাঙ্গামাকে নিজেদের বিপ্লবের অনুরূপ মনে করিয়া উহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রভূত অর্থসাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন; উচ্চমনা শ্রমজীবিদের নেতারা আপনাদের আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া ও রুসের লোককে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা বুঝাইয়া দিয়া সেই প্রভূত অর্থের চেক্‌খানি প্রেরকদিগকে ফেরৎ পাঠাইয়াছিলেন। এই বিষম বিদ্রোহের মধ্যেও ইংরেজেরা আপনাদের সংযম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন।

নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার ভারত সরকারের খাস আদেশে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, নারীরা সরকারি সকল শ্রেণীর ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত ও মনোনীত হইতে পারেন। এ আদেশের ফলে দলে দলে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবেন, তাহা নয়,—নারীরা সকল স্থলে ব্যবস্থাপক সভায় না থাকিলে যে কাজ চলে না তাহাও নয়, তবুও এ আদেশের প্রয়োজন ছিল; জাতীয় উন্নতি ও সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, স্ত্রীপুরুষ অভেদে, জাতি অভেদে, ধর্ম্ম অভেদে, সকলেই জ্ঞানের কর্ম্মের পথে তুল্য অধিকারী। যাঁহারা নারীকে শিক্ষা দিতে চান্ না, প্রকাশ্যস্থলে বিচরণ করিতে দিতে চান না তাঁহাদিগকে কেহ জোর করিয়া কোন কাজ করাইতে যাইবে না, আর যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় বা অন্য কোন কর্ম্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ দোষের মনে করেন, কেহ জোর করিয়া তাঁহাদের ঘরের মহিলা-দিগকে নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত করিতে যাইবে না; তবে পরের কথায় তাঁহাদের আপত্তি ও

কোলাহল কেন ? যাঁহারা নিজের স্বাধীন বুদ্ধিতে জ্ঞানের ও কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছেন, নীচ কাপুরুষেরাই তাঁহাদিগকে বাধা দিতে যায়।

* * * *

কোকো-মুক্তা এদেশে এই বিশ্বাস বহু প্রাচীন যে, হাতীর মাথায় মুক্তা জন্মে ; এই অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য গজমুক্তা সম্বন্ধে এই উক্তিটিও প্রাচীন যে ন মৌক্তিকং গজে গজে। মালয় দ্বীপপুঞ্জে ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্য অনেক দ্বীপে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে নারিকেলের মধ্যে মুক্তা জন্মে। ১৮৫০ অব্দ হইতে নানা সময়ে নানা বৈজ্ঞানিক উহার অনুসন্ধান করিয়াছেন, আর এখন একজন আমেরিকার বৈজ্ঞানিক উহা সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সম্প্রতি Nature পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে মালয় দ্বীপপুঞ্জে যে শ্রেণীর নারিকেলের মধ্যে গাছ অঙ্কুরিত হইবার নষ্ট হয়, অথচ নারিকেল ভাল থাকে, সেই নারিকেলের মধ্যে কোথাও কোথাও খুব ভাল মুক্তা পাওয়া গিয়াছে। ইহার নাম হইয়াছে cocoa-pearl ; আমাদের দেশে যাহারা নারিকেলের বাগান রাখেন অথবা ঘরে ঝুনা নারিকেল রাখেন তাঁহারা সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে তাঁহাদের ভাগ্যে সুমুক্তা মেলে কিনা।

* * * *

শোক সংবাদ



স্বর্গীয় হরেন্দ্রনাথ দত্ত—গত ১২ মে হাইকোর্টের জনপ্রিয় ও উদীয়মান উকীল হরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল পরলোক গমন করিয়াছেন। হরেন্দ্রনাথ অতি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, তাঁহার গান যেই শুনিত সেই মোহিত হইত। তাঁহার কয়েকটি গান রেকর্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সকল দেশহিতকর কার্য্যে হরেন্দ্রনাথের উৎসাহ দেখা যাইত। হাবড়ার স্বরাজ্যদলের তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং তাঁহার বাটীতেই তিনি মহিলাদিগের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। হরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে যিনি যখনই আসিয়াছেন তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে তিনি তখনই তাঁহার বন্ধুরূপে পরিণত হইয়াছেন। বৃদ্ধ পিতা, অল্পবয়স্কা স্ত্রী ও দুইটি শিশু সন্তান রাখিয়া হরেন্দ্রনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা এই শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

Printed by Satyakinkar Bandopadhyaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan [illegible] from the Bangabani Office, 77 [illegible] Road North, Bhowanipur Calcutta.

THE BANGAL...



বাঙ্গালীর সুগন্ধি

দেবভোগ্য সুগন্ধি—অগুরু

চিত্ত বিমোহিনী — কস্তুরী

—ছোট শিশি ৷৵০

—বড় „ ১৷০

ল্যাভেণ্ডার

ওয়াটার

১৷৵০ শিশি

উৎপল, রেবা, শিপ্রা, হোয়াইট্ রোজ্

রুমালে ব্যবহার করিবার মত এমন দেশী

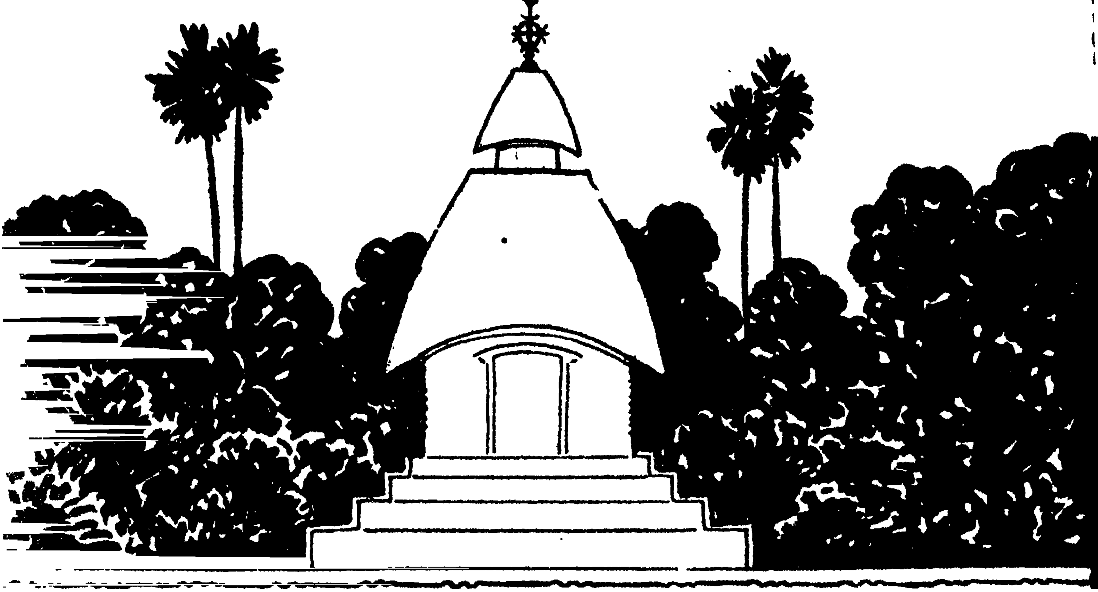
সুগন্ধি আর নাই। প্রতি শিশি ১।০।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

১৫, কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা

বঙ্গবাণী





" ভগীরথ "

শিল্পী :—শ্রীপ্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়

কর্ণকান্ত নির্ভট্টের সৌজন্যে

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৫ম বর্ষ
১৩৩২-'৩৩

আষাঢ়

প্রথমার্দ্ধ
৫ম সংখ্যা

জাত্যভিমান

"ভুলিওনা, নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। বল', মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"—বিবেকানন্দ।

আজ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির সংঘবদ্ধ হইবার কথা উঠিয়াছে। হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে আজ আন্তরিক (?) মিলন স্থাপন করিতে হইবে, আত্মরক্ষার জন্য দায়ে পড়িয়া, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। কোন' নিঃস্বার্থ প্রয়োজনে বিদ্বেষ দূর করিয়া জাতিতে জাতিতে মিলিবার প্রয়াস এই সভ্যতাগর্ব্বী হিন্দুজাতির মস্তিষ্কে এতদিন আসে নাই। সংকীর্ণতা ও অনুদারতার জন্য হিন্দুজাতি যে ক্রমে ধ্বংসপথের যাত্রী হইয়াছে এই নিষ্ঠুর সত্য আমাদের সমাজনেতাদিগকে সচেতন করে নাই,—মিথ্যাচার ও ভ্রান্ত জাত্যভিমান সভ্য বাঙ্গালীর অসহ্য হইয়া উঠে নাই—যুগজীর্ণ মিথ্যা সংস্কারগুলি তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলে নাই। সত্যদেবতার মুহুর্ম্মুহুঃ আহ্বানে তাহার মিলনবুদ্ধি আজো প্রবুদ্ধ হইল না—পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের সর্ব্বাঙ্গীন দাবি তাহাকে আজো চঞ্চল করিল না—সমাজ ও জাতিতন্ত্রের ব্যবস্থাপকগণ (যতই প্রাচীন হউন) অপেক্ষা বিশ্বনাথ যে ঢের বড় একথা সে বুঝিল না—তাঁহার ইঙ্গিত, নিদেশ ও অনুশাসন চিরকালই সে অবহেলা করিয়া চলিল। জগন্নাথের পুরীধামকে সে বড়

করিয়া দেখিল না,—জগন্নাথ তাহার গৃহদেবতা হইয়াই রহিলেন। স্বাভাবিক উদারতা ও সত্যনিষ্ঠা যদি হিন্দুর জাতিবর্ণসমূহে প্রীতিবন্ধন ঘটাইতে না পারে—তবে দায়ে পড়িয়া এ মিলনের অভিনয় তাহাকে সংঘবদ্ধ করিবে না। বন্যার সময় সমস্ত ঠাঁই ডুবিয়া গেলে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে যে উচ্চস্থলে সকলে একত্র হইয়া আত্মরক্ষা করে তাহাকে প্রকৃত মিলন বলে না—ঘরে আগুন লাগিলে অগ্নির বিরুদ্ধে সকলে মিলিয়া যে অভিযান করে—তাহাকেও স্থায়ি-মিলন বলা চলে না। দুর্ভিক্ষের সময় এক পাতা হইতে ব্রাহ্মণ শূদ্র একত্রে ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিতে পারে তাহাতেও আন্তরিক মিলন ঘটে না। পুরীধামে তীর্থযাত্রা করিয়াও ব্রাহ্মণশূদ্রে একপাত্রে ভোজন করিয়া আসে—বাড়ী ফিরিয়া ব্রাহ্মণ সেই শূদ্রেরই জলস্পর্শও করে না,—ঘৃণার সম্পর্ক সমানই থাকিয়া যায়। আজ দুর্দ্দিনে ব্রাহ্মণ বলিতে পারে—"ভাই কৈবর্ত্ত, তোমার বাড়ী এইবার হ'তে খাব তুমি কিন্তু আমার মন্দির বাঁচাবে—ভাই নমঃশূদ্র, তোমার জল এইবার হ'তে আমার পাদ্য হ'তে পারবে—তোমাকে কিন্তু প্রাণ দিয়ে আমার কন্যা-বধূর ইজ্জত রাখ্‌তে হবে।" এই যে চুক্তি, ইহার মূল্য কত খানি? এ চুক্তি কতটা বিশ্বাস জন্মাইবে? ইহা কতদিন স্থায়ী হইতে পারে? দুজন পুলিশ প্রহরী,—কিছু ধনবৃদ্ধি বা অন্য প্রকারে কিছু বলবৃদ্ধিই এ চুক্তি নষ্ট করিয়া দিতে পারে—আততায়িগণ যষ্টির মুষ্টি একটু শিথিল করিলেই হিন্দুর চুক্তিবন্ধনও শিথিল হইয়া যাইবে। দায়ে পড়িয়া বিপন্ন হইয়া মানুষ কোন কোন অধিকার ত্যাগ করিতে পারে—উদারতার ভান করিতে পারে—কিন্তু সুশিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত প্রেমভাব ও সত্যনিষ্ঠা জাগ্রত না হইলে—নরের মধ্যে যে নারায়ণ আছেন এ সত্যবোধের উন্মেষ না হইলে, সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার কথা স্বপ্ন মাত্র—সংঘবদ্ধ জাতিগঠনের আশাও সুদূরপরাহত।

আজ মন্দিরে মন্দিরে দারুময়, মৃন্ময়, শিলাময় বিগ্রহ সকল চূর্ণ হইতেছে। মন্দিরের এই মূর্ত্তি প্রতীকের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের মনোমন্দিরে সেই পতিতপাবন অগতির গতি, জগন্নাথ—সেই গুহকের মিতা, বিদুরের অতিথি, ব্রজের রাখাল, **সত্যনারায়ণের** রূপে জাগ্রত হন, তবেই আমাদের হিন্দু নাম সার্থক হইবে। অপর পক্ষের ধর্ম্মোন্মাদকে অসত্য জানিয়া যদি—মহামানবের সত্যধর্ম্মকে আমরা উপলব্ধি করি তবেই ধর্ম্মোন্মাদকে জয় করিতে পারিব। কোন জেহাদ কোন ক্রুসেডই জগতে শান্তি আনিতে পারে না—একমাত্র সত্যব্রহ্মের উপলব্ধিই বিশ্বকে শান্তিময় করিতে পারে।

হিন্দুর সংঘবদ্ধতার কথাপ্রসঙ্গে জাতিভেদের কথা উঠিতে বাধ্য। এই জাতিভেদের কঠোরতা যতদিন থাকিবে ততদিন—হিন্দুর সম্পূর্ণ সংঘবদ্ধতা সম্ভব হইবে না। কেহ কেহ বলেন, জাতিবিভাগ মিলের অন্তরায় নহে—জাত্যভিমান ও জাতিগত ঘৃণা বিদ্বেষই মিলের

অন্তরায় ; একথা কতকটা সত্য, কিন্তু জাতিভেদের কড়াকড় সংস্কার রক্ষা করিয়া ঐ অন্তরায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব কি না ভাবিয়া দেখা উচিত। কেহ কেহ বলেন, জাতিভেদই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ—জাতিভেদ না থাকিলে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকিবে না। এ প্রসঙ্গে আমার কতকগুলি প্রশ্ন আছে। হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ এই জাতিভেদ—না—বর্ণভেদ? এখনকার এই ৩৬ শত জাতির ভেদ—না পূর্ব্বের সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য-ভেদ? যদি চাতুর্ব্বর্ণ্যই হয় —তবে আজ সেই চতুর্ব্বর্ণভেদ কি বর্ত্তমান আছে? সেই চতুর্ব্বর্ণ ভেদ না থাকাতেও হিন্দুধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে কিনা? তার পর জিজ্ঞাস্য এই, প্রাণ জিনিসটা ভেদের উপর নির্ভর করে—না মিলনের উপর নির্ভর করে? উত্তর হইতে পারে, প্রাণের জন্য দেহের প্রত্যঙ্গ-ভেদের ন্যায় সমাজদেহেরও অঙ্গভেদের প্রয়োজন আছে এবং সেই সকল বিভিন্ন অঙ্গকগুলির অন্তরে অন্তরে একটা মিলনেরও প্রয়োজন আছে। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন এই, হিন্দুজাতির সেই মিলন-সূত্রটি কি? দ্বিজোত্তম হইতে শূদ্রাধমকে পর্য্যন্ত একই সমাজের অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া রাখিতে পারে কোন্ বন্ধন? একজন ব্রাহ্মণ একজন নীচ শূদ্রের স্পৃষ্ট গঙ্গাজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেনা—ছায়াস্পর্শ হইলে স্নান করিবে—অথচ গোমহিষাদির বিষ্ঠা পর্য্যন্ত পবিত্র বলিয়া মনে করিবে। কোন্ সেই মিলন-সূত্র যাহা পশ্বধমের (?) সহিত দ্বিজোত্তমকে এক হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? সন্ধান মিলিলে এখন সেই সূত্রটিকে যতদূর সম্ভব দৃঢ় করা উচিত। আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মের সহিত জাতিভেদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে সন্দেহ নাই —কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কি কেবল অনুষ্ঠানসর্ব্বস্ব? হিন্দুধর্ম্মের কি এমন কোন' স্তর নাই—এমন কি কোন' সার্ব্বজনীন চত্বর নাই—যেখানে জাতিভেদের প্রয়োজন নাই? যদি তাহা থাকে তবে সে চত্বরে সকলকে কি অবাধ প্রবেশ দেওয়া যায় না? ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজ কোন দিন আপন পরিসর বাড়াইতে চাহে নাই—আজিও চাহে না! এ সমাজ হইতে বাহিরে যাইবার সহস্র পথ, কিন্তু প্রবেশের বা ফিরিয়া আসিবার একটিও পথ নাই। হিন্দুসমাজ জনবলকে কখনো বলই মনে করে নাই—ক্ষত্রিয় জাতি ক্রমে লোপ পাইলেও ক্ষত্রিয়সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করে নাই—দেশের পরাধীনতার তাহাও একটি কারণ। শূদ্রজাতিকেও সমাজের বলবৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করে নাই—তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ গিরিচারী অরণ্যবিহারী অসভ্য জাতিকে শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া লইত। ভারতের গিরিবনের লক্ষ লক্ষ কোল, ভিল, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, নাগা, খাসী ইত্যাদি, আর্য্যজাতি ভারতে উপনিবেশের আগেও যেরূপ নগ্ন, মৃগয়াজীবী অর্দ্ধমনুষ্যরূপে বিচরণ করিত, আজ খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ঠিক এই অবস্থাতেই তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। হায়, "এমন মানব জমীন রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা।"

কেহ কেহ বলেন—"জাতিভেদ আছে বলিয়া এ জাতি আজও টিকিয়া আছে।" এ কথায় মনে পড়ে—সত্যনিষ্ঠ মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলালের রসিকতা,

"এখনো বাঙালী জগৎ সম্মুখে রাস্তাঘাট দিয়া নিয়ত—
চলিছে নির্ভয়ে একথা জগতে প্রচার করিয়া দিওত।
ভেবে দেখ সেই সত্যযুগ হতে—কলিযুগাবধি হেন সে
বরাবর বেঁচে এসেছে ত, তার বেশী আর পার্ব্বে কেন সে।
এত বিপদের আবর্ত্তের মাঝে এত বিজাতীয় শাসনে,
বরাবর টি ঁকে আছে ত, তাকিয়া ঠেসিয়া ফরাস আসনে।"

হিন্দুজাতি এখনো টিকিয়া আছে—এই শুধু টিকিয়া থাকাই একটা পরম গর্ব্ব। কিন্তু এ টেকা—এ বাঁচা কি ঠিক বাঁচার মত বাঁচা? সমগ্র জগতে মানুষজাতি যেমন করিয়া সগৌরবে বাঁচিয়া আছে, একি তেমনি করিয়া বাঁচা? হাঁপানীর রোগী ভুগিয়া ভুগিয়াও বহুদিন বাঁচে। 'শ্বাসগ্রহণই জীবন যদি, হাপর তবে প্রায় অমর।' একটা জাতি আজো বাঁচিয়া আছে ইহাই অধিক সত্য—না—একটা বলিষ্ঠ জীবন্ত জাতি আজ মুমূর্ষু, ইহাই অধিকতর সত্য? জাতিভেদের প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লইলেও জাত্যভিমান এবং তাহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ জাতিগত ঘৃণাদ্বেষের প্রয়োজনীয়তা আছে, আজিকার দুর্দ্দিনে অন্ততঃ তাহা মানিতে পারা যায় না। জাতিভেদের মধুটুকু লইয়া হুলটুকু বাদ দেওয়া যায় কিনা তাহাই এখন বিবেচ্য। যে দেশের উচ্চস্তরের অসংখ্য লোকের অযত্নলব্ধ আজন্মসিদ্ধ জাত্যভিমানই একমাত্র সম্বল, একমাত্র সম্পৎ এবং একমাত্র গৌরবের সামগ্রী—সে দেশে জাতির অহঙ্কার দূর করা বড়ই কঠিন। মানুষ অহঙ্কারের বস্তু ২।৪টী আরো পাইলে একটিকে ত্যাগ করিতে পারে। আর গর্ব্বের জন্য খাঁটী জিনিস পাইলেও তবে ভূয়ো জিনিসের গর্ব্ব ছাড়িতে পারে।

শুনিতে পাই শিক্ষিত সমাজে জাত্যভিমান অনেক কমিয়াছে—কিন্তু কার্য্যতঃ জাত্যভিমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ে ক্রমে বাড়িতেছে বলিয়াই মনে হয়। সদাচার, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও জাতিগত কর্ত্তব্যবোধ যত কমিতেছে, যতই বৃত্তিব্যবসায়ের বিপর্য্যয় ঘটিতেছে,—জাত্যভিমান ততই বাড়িতেছে। সকল জাতিরই শিক্ষিত সম্প্রদায় (যাহাদের মধ্যে কদাচারীর সংখ্যা খুব বেশী) উচ্চতর জাতিতে উন্নীত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন—এজন্য শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া শ্লোকরত্নের উদ্ধার করা হইতেছে জহুরীরা প্রয়োজন মত সে গুলিকে আপনাদের কুল-কিরীটের উপযোগী করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া লইতেছেন। মন্থনে অমৃত যতটুকু উঠিতেছে—বিষ তাহা হইতে ঢের বেশী উঠিয়া সমগ্র সমাজদেহে বিসর্পিত হইতেছে। উচ্চতর জাতির অভিমানে আঘাত লাগিতেছে, নিম্নতর জাতি হিংসায় জ্বলিতেছে। জাত্যভিমানের চিহ্ন

উপবীতের মূল্যও যৎসামান্য।—"পৈতে ত সিকি পয়সার সূতো।" বিনামূল্যে বিনা সাধনায় এ সংসারে আর কোনো গৌরব লাভ করিবার উপায় নাই।

কোন কোন নিম্নতর জাতির মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের চেষ্টায় প্রতিমাবহন, শবসৎকার ইত্যাদি অনেক জনহিতকর কার্য্য জাত্যভিমানের উপযোগী নহে বলিয়া বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ২।৪ জন নগরবাসী জাতিনায়কের প্ররোচনায় পল্লীগ্রামে যে উপকার-প্রত্যুপকারের আদান-প্রদানে জাতিতে জাতিতে হৃদ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। কোন কোন জাতির মধ্যে আহারব্যবহারের আবহমান কাল হইতে কোন বাধা ছিল না, এখন পরস্পরের অন্নগ্রহণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামে নিমন্ত্রণবাড়ীতে কোন কোন জাতির মধ্যে একপংক্তিতে ভোজনে আপত্তি ছিল না এখন ভিন্ন পংক্তির ব্যবস্থা করিতে হয়। নিমন্ত্রণসভায় নিম্নতর জাতিরা উচ্চতর জাতির সমান মর্য্যাদা দাবি করে—প্রত্যেক জাতির পৃথক পৃথক হুঁকার প্রবর্ত্তন হইয়াছে নমস্কার প্রণামাদি বিনিময় সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতিই এখন সতর্ক হইয়াছে। মনীষী চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—"বাল্যকালে বিজয়ার দিন চাষা বাড়ীতেও প্রণাম করিয়া আসিতাম।" আজ আর সে দিন নাই। কোন অভিভাবক আজ ছেলেপুলেকে ভিন্ন জাতির বয়োজ্যেষ্ঠকে প্রণাম করিতে দেয় না। তাহা ছাড়া, সরল শিশুগণের মনেও জাত্যভিমান জন্মিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থপ্রয়াস হইয়াছেন। পণ্ডিতসমাজ অনেক প্রকার 'উপমানবহুল' যুক্তি তর্কের দ্বারা সভা সমিতিতে অস্পৃশ্যতাকে সমর্থনই করিয়াছেন। প্যাটেল সাহেব ও ডাঃ গৌরের বিল উপস্থাপিত হইবামাত্র নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে তাহার বিরুদ্ধে সভাসমিতি হইয়াছে। অথচ সে বিলের দ্বারা জাত্যভিমান ক্ষুণ্ণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা কিছুই ছিল না। তারকেশ্বরে অব্রাহ্মণের কর্তৃত্ব অপেক্ষা মোহান্তের শাসনও হিন্দুসমাজ স্পৃহনীয় মনে করিয়াছেন। ব্রাহ্মণসমাজ অব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক—ব্রাহ্মণেতর জাতির কোন পণ্ডিত যাহাতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি না পা'ন সেজন্য তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি। সংস্কৃত কলেজে সাহেব-অধ্যক্ষ হউক তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু বৈদ্য যেন অধ্যক্ষ না হয়। সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত বিভাগে অধিকাংশ হিন্দুর প্রবেশাধিকার নাই। কৌন্সিলের নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বেও ভোটারগণ অন্যান্য কৃতিত্ব অপেক্ষা জাতিবৈশিষ্ট্যকেই প্রাধান্য দিতে চায়। চাকরীর বাজারে যাহাদের প্রভুত্ব আছে তাহারা আপনাদের স্বজাতীয়গণেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকে। এরূপ কত উদাহরণ দিব? কাগজে পড়িলাম—কোন এক গ্রামে অসংখ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি থাকা সত্ত্বেও তাহাদেরি পরামর্শে একটি ভাট ব্রাহ্মণের বালক (অন্য কোন স্বজাতির অভাবে) তাহার আত্মীয়ার মৃতদেহ দড়া বাঁধিয়া টানিয়া শ্মশান-ঘাটে লইয়া গিয়াছে—কেহই জাতিভয়ে মৃতদেহ স্পর্শ করে নাই। হায়, সমস্ত প্রেতলোক এজন্য নিশ্চয়ই

অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে—সে অশ্রুতে কি এজাতির মঙ্গল হইবে? সেদিন পূর্ব্ববঙ্গে একজন শিক্ষিত নমঃশূদ্র একজন পূজারীকে ছুঁইয়া ফেলায় যথোচিত লাঞ্ছিত হইয়াছে। নগরে বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে লোকে জাতিভেদের কঠোর শাসনের অধীন নহে—কাজেই নগরের লোক জানে না, জাত্যভিমানের জন্য দুর্ব্বল দরিদ্রগণ পল্লীগ্রামে প্রতিনিয়ত কিরূপ লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নির্য্যাতিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র, শৈলজানন্দ ইত্যাদি ঔপন্যাসিকগণ তাঁহাদের গ্রন্থে যে চিত্রগুলি দিয়াছেন—তাহা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। মানুষের আত্মা ও মানুষের হৃদয় অপেক্ষা তাহার রক্তই হিন্দুজাতির পক্ষে আজ বড়।

নগরে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আহার বিহারে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মেলামেশা দেখিয়া, ও হোটেল ও চাএর দোকানে ছত্রিশ জাতির একত্র ভোজন দেখিয়া অনেকে মনে করেন—জাত্যভিমান বুঝি ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। একথা সত্য নহে। নগরে নির্ব্বিচারে আহারবিহারে মেলামেশা জাত্যভিমানত্যাগের ফল নহে—উহা, সৌহার্দ্দ অন্তরঙ্গতার ফল—নতুবা আহার সম্বন্ধে তামসিকতার ফল। ইহা পল্লীগ্রামেও মাদকসেবন-সভায় দৃষ্ট হয়। মনুষ্যত্বের অধিকারসাম্য সম্বন্ধে উচ্চতর জ্ঞান হইতে সঞ্জাত উদারতার ফলে ঐ মিলন ঘটে নাই। স্কুল কলেজে একসঙ্গে পড়ার জন্য, একসঙ্গে চাকরী করার জন্য বা এক ব্রত অনুসরণ করার জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকের মধ্যে অন্তরের মিলন ঘটিয়াছে—উহা বিদেশী শিক্ষার ফল—ঐ মিলন ব্যক্তিগত—উহাতে এক জাতির সহিত অন্য জাতির মিলনের কোন সহায়তা হয় না। যাহারা আপনাদের বন্ধুবান্ধবের সহিত আহারে জাতিবিচার করে না—তাহারাই অন্যত্র জাত্যভিমান সমানই বজায় রাখিয়া চলে। তামসিক আহার বিহারের জন্য যাহারা জাতিবিচার করে না—তাহারাও সমাজে সমান জাত্যভিমানেরই দাবী করে—নিম্নতর জাতিকে সমানই ঘৃণার চক্ষে দেখে।

যে উচ্চতম শিক্ষার ফলে অসত্য ধারণা ও মিথ্যাচার অসহ্য হইয়া উঠে—মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে মানুষ চিনিতে পারে—সে শিক্ষা অতি অল্পলোকেরই ভাগ্যে ঘটিয়াছে—অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষার সাধারণতন্ত্রক্ষেত্রে জাত্যভিমানের দ্বারাই আত্ম-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে উন্মুখ—ফলে তাহারা আবার "মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ।"

প্রাচীন কুলপঞ্জিকা, ঘটককারিকা, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বাদিতেও যেটুকু উদারতা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা দৃষ্ট হয়—আজকাল তাঁহাও দেখা যায় না। আগে ছিল, বারো রাজপুতের বারো হাঁড়ী—এখনই হইয়াছে বরং বারো রাজপুতের তের হাঁড়ী। পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিত।—'ভরার মেয়ে'ও চলিয়াছে তার কথা আর নাই বলিলাম। রাঢ়দেশে বাউরি, কোটাল ও বাগ্দীজাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ চলিত, তাহার ফলে উহাদের সংখ্যা-বাহুল্য দেশের একটা বিপুল বল ছিল। বাগ্দী জাতি শুধু দেশের শ্রমিক

সমস্যারই সমাধান করে নাই, বাগ্দীর 'লাঠি' সমস্ত দেশকে দস্যুতস্করের হাত হইতে রক্ষা করিত। শিক্ষিত বাগ্দী-বামুনরা নিজেদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইয়া বিধবাবিবাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছে—তাহার ফলে জাতিটি ক্রমে ক্ষয়শীল হইয়া সমগ্র দেশকেই দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছে। নিম্নতম জাতি সমূহের মধ্যে যে রক্তমিশ্রণাদিতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহাও লোপ পাইতেছে। নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি জাতি নবজাগ্রত জাত্যভিমানের হুজুগে পড়িয়া জীবিকা অর্জ্জনের অনেক সুযোগ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, যেমন রাঢ়দেশের গোপজাতি আর ভার বহেনা, রঙ্গপুরের কোচজাতি পাল্কী বহা ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহাতে তাহাদের মধ্যে একটা জীবিকা-সমস্যাও ঘটিতেছে। ২।৪ জন জাত্যভিমানীর জন্য অসংখ্য লোকের অন্নদায় জন্মিতেছে, তাহারা উচ্চতর জাতির অনুগ্রহ হারাইতেছে, স্থলে স্থলে নিগৃহীত হইতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের সমাজ-শাসন-তন্ত্র তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল কাজেই শাস্ত্রের শাসন গণ্ডীর বাহিরে তাহাদের অনেকটা স্বাধীনতা ছিল—কিন্তু ইদানীং তাহারা গুরু পুরোহিতের কাছে সংকীর্ণতা শিখিতেছে। উচ্চ জাতির শিক্ষিত লোকেরা যে সকল সংকীর্ণ সংস্কার পরিহার করিবার চেষ্টা করিতেছে—সেই সকল সংকীর্ণ সংস্কার আজ নিম্নজাতিকে আশ্রয় করিতেছে। ব্যক্তিবিশেষ বিদ্বান হইয়াও জাতিগত হীনতার জন্য বিদ্বানের প্রাপ্য পূর্ণ মর্য্যাদা পায় না বলিয়া, আপন জাতিকে উচ্চতর সামাজিক স্তরের মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য আজ ব্যগ্র। উচ্চতর জাতির ঘৃণা হইতেই নিম্নতর জাতির মনে আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। অনেকে বলেন—"ইহা একপ্রকার ভালই, ইহাতে নিম্নতর জাতির শূদ্রমনোভাব বা তামসিক হীনতা-বোধ দূরীভূত হইতেছে এবং কালে উচ্চতর জাতির ঘৃণা হইতেও অব্যাহতি লাভ করিবে।" দূর ভবিষ্যতে, হয়ত, ইহার সুফল হইতে পারে—কিন্তু আপাততঃ চারিদিকে বিদ্বেষ-বিষেরই বিস্তার হইতেছে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে মতভেদে দলাদলি বাড়িতেছে, পদোন্নতি হইলেও স্তরে স্তরে ভেদ সমানই থাকিয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়া আমার মনে হয় ইহাতেও স্থলে স্থলে অসত্যকেই আশ্রয়—এবং ভ্রান্ত-সংস্কারকেই নূতন করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। জাত্যভিমান সমস্যার সমাধান, অর্থ, বাহুবল বা বিদ্যায় বলিষ্ঠ জাতি সমূহের বিদ্রোহের দ্বারা সম্ভব হইবেনা—সত্যনিষ্ঠা ও প্রেমের বলেই সম্ভব—এবং তাহা উচ্চতম জাতিরই সহৃদয় ও উদার চেষ্টা ব্যতীত কখনো ঘটিবে না।

নিম্নতর জাতিও উচ্চতর জাতিকে ঘৃণা করে। মানুষের সকল প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতা ও দুর্ব্বলতার জন্য তাহার জাতিকেই উচ্চ নীচ সকল বর্ণই দায়ী করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতি ঘৃণাপ্রকাশের জন্য পৃথক পৃথক ছড়া বচন আছে—প্রত্যেক জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে নিন্দার জন্য প্রবাদ প্রবচন রচিত হইয়াছে। উচ্চজাতির জন্য যেগুলি প্রযুক্ত

সেগুলি নিম্নজাতিরই রচিত। ঔদরিকতা, লুব্ধতা, স্বার্থপরতা, ক্রোধপরায়ণতা ও ভিক্ষায় লজ্জারাহিত্য ব্রাহ্মণজাতির চরিত্রের বিশিষ্টতা বলিয়া নিম্নতর জাতির লোকেরা উল্লেখ করিতে ছাড়েনা—প্রথাগত ভয় ও ভক্তির মধ্যেও তাহারা একটা বিদ্বেষ পোষণ করে।

যাত্রাকালে কোন কোন জাতির লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যাত্রা পণ্ড হইয়া যায় আমাদের সমাজে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। কোন কোন জাতিকে নির্ব্বোধ বলিয়া ঘৃণা করা হয়। যে তন্তুবায়জাতি একদিন সমগ্র বঙ্গের অঙ্গের লজ্জা দূর করিত—সেই জাতি নির্ব্বোধ—না—যাহারা তাহাদিগকে অন্নে বঞ্চিত করিয়া লজ্জানিবারণের জন্য মাঞ্চেষ্টারের পানে চাহিয়া আছে তাহারা নির্ব্বোধ? গোপ জাতি পুরুষানুক্রমে গোপালন করিয়া আমাদের 'গোদেবতা'কে বাঁচাইয়া আসিয়াছে—আমরা গোপের অর্জ্জিত দুগ্ধে বলবান হইয়া সাব্যস্ত করিয়াছি—গোপ নির্ব্বোধ। সংগোপ জাতিকে আমরা চাষা বলিয়া অবজ্ঞা করি এবং বলি 'চাষা কখনো সজ্জন হয় না।' চাষ করাও একটা অপরাধ। ইহাতে প্রকারান্তরে কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য কায়িক পরিশ্রমকেই আমরা ঘৃণা করি। যে সকল অলস লোক ভিক্ষা ও পরনির্ভরতাকেই উপজীবিকা মনে করে তাহারা কায়িক শ্রমকে ঘৃণা করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বাঙ্‌লার নিরীহ চাষীর মত সজ্জন যে কে,—আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তাহা খুঁজিয়া পাই না। সংগোপের যেমন অবজ্ঞাসূচক নাম আছে—তেমনি অন্যান্য জাতিরও অবজ্ঞাসূচক নাম আছে যেমন—কায়েত, নাপ্তে, বেনে, কেয়ট, আগুরি, গয়লা ইত্যাদি। অন্যান্য দেশে কারুশিল্পিগণের যথেষ্ট সমাদর। কিন্তু এ দেশে তাহাদিগকে আমরা অতি নিম্নস্তরে স্থান দিয়াছি,—যেমন স্বর্ণকার, মূর্ত্তিশিল্পী কুম্ভকার, দারুশিল্পী সূত্রধর, তন্তুবায়, ভাস্কর, শঙ্খকার, কাংস্যকার ইত্যাদির জাতিগত মর্য্যাদা অতি অল্প। কৃষিজীবিগণকে যেমন ঘৃণা করি—বাণিজ্যজীবী জাতিগুলিকেও তেমনি ঘৃণা করি অর্থাৎ বাণিজ্যের প্রতিও আমাদের বিতৃষ্ণা। তাহা না হইলে দেশের এ দুর্দ্দশা হইবে কেন? পরের দেওয়া বৃত্তিভোগ ও শ্ববৃত্তি অপেক্ষা বাণিজ্য যে ঢের সম্মানজনক তাহা ধারণায় আসেনা। কৃষকগণ অপেক্ষা বণিকগণ অপেক্ষাকৃত ধনী--তাহাদের নিকট প্রত্যক্ষভাবে আমরা অনেকটা ঋণী—সেজন্য 'চাষা' অপেক্ষা 'বেনে' আমাদের কাছে তবু সম্ভ্রাত। এক জাতির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী পরস্পর অবজ্ঞা করিয়া থাকে। সামাজিক প্রথা সংস্কার ও আচারের বৈষম্যের জন্য এক শ্রেণীর দ্বারা অন্য শ্রেণী নির্ম্মমভাবে নিন্দিত হয়। আবার কোন একই শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন উপাধিধারিগণের মধ্যেও অবজ্ঞা করার প্রথা আছে—সেজন্য ছড়াও আছে, যেমন—"দে দত্ত কর ধর, ঝাঁটা মেরে দূর কর।" রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে অন্যান্য উপাধ্যায়গণ চট্টোপাধ্যায়গণের নিকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য ছড়া রচনা করিয়াছে। এক শ্রেণীর মধ্যেই কুলীনগণ অকুলীনগণকে

রীতিমত ঘৃণা করেন—অকুলীনের সঙ্গে রক্তসম্পর্ক দূষণীয়—অনেকস্থলে কন্যা গ্রহণ করা হয় (স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি), কিন্তু কন্যাদান করা হয় না—কুলীন অকুলীনের অন্ন গ্রহণ করেন না, যদি করেন তবে সেজন্য অর্থমর্য্যাদা গ্রহণ করেন। সে ক্ষেত্রে জাত্যভিমানের মূল্য টাকার দ্বারাই পরিমিত হয়। অনেকস্থলে অকুলীনের সহিত একপংক্তিতে ভোজনও করেন না। অল্পদিন আগেও শুনা গিয়াছে একজন কুলীন বলিতেন—"এ আসরে মৌলিক কে আছ, উঠিয়া যাও—আমি বসিব।" দর্পান্ধের এমনি মর্য্যাদা যে অকুলীন ব্যক্তি বিনা প্রতিবাদে আসর ছাড়িয়া উঠিয়া যাইত। মৌলিকগণ কুলীনগণকে বিধাতার বরপুত্র মনে করিত। কুলীনগণও কুলরক্ষার জন্য কন্যাবলি দিতে প্রস্তুত - কিন্তু কুলগৌরব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। তবে যেখানে প্রচুর অর্থলাভের আশা আছে সেখানে স্বতন্ত্র কথা। শ্রেণীভাগ,—জাতিভেদের মধ্যে জাতিভেদ-- কৌলিন্যপ্রথা --আবার তাহার মধ্যেও উপজাতিভেদ। ইহার উপরে আবার শাক্ত-বৈষ্ণব সমস্যা আছে, ফলে কয়েকটি পরিবার লইয়াই এক এক জাতি গঠিত।

পল্লীগ্রামে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে 'ছোটলোক' বলা হয়। তাহারা অস্পৃশ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাদের সকল স্ত্রীলোক কিন্তু অস্পৃশ্য নয়—আবার এমনও দেখা গিয়াছে যে ভদ্রজাতীয় ব্যক্তি বাগ্দী বাড়ীতে বা বাউরিবাড়ীতে রাত্রিবাস করিয়া প্রাতঃকালে স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। পুরুষরাও সকল সময় সকলের অস্পৃশ্য নয়—শুঁড়িবাড়ীতে তাহাদের অস্পৃশ্যতা থাকেনা। শুঁড়িধাম পল্লীগ্রামের পুরীধাম। সখের যাত্রার দলে এক আসরেই তাহাদের সহিত গান-বাজনা চলে, কিন্তু অন্য সময়ে বৈঠকখানা ঘরে উঠিলেও হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। ভদ্রলোকের জলখাওয়ার প্রয়োজন হইলে ঐ "ছোট লোকদের", ঘরের দাওয়া হইতেও নামিয়া যাইতে হয়। আগুন লাগিলে অবশ্য ঐ ছোটলোকের জলেই সে ঘর বাঁচে। একই পরিবারের কাহারো কাহারো জাতি উহাদের ছোঁয়া সিদ্ধ চাউলেও বাঁচিয়া যায়, আবার কাহারো জাতি উহাদের ছোঁয়া বা তৈরী আতপ চাউলেও টিকেনা। কাহারো বা জাতি উহাদের ছোঁয়া বিছানায় গঙ্গাজল ছিটাইলেই বাঁচিয়া যায়—আবার কাহারো জাতি বজায় রাখিতে হইলে ঐ বিছানাকে পচাপুকুরে কাচিতে হয়। পল্লীগ্রামের জাতি কখনো ঘাতসহ, কখনো ভঙ্গুর।

তথাকথিত ছোট লোকদিগকে প্রায়ই 'তুমি' সম্বোধন করা হয় না, 'তুই' বলারই প্রথা। "এই বেটা, কি বিক্রী করতে যাচ্ছিস্—নামা না" "হারামজাদা বেটা,—ছুঁয়ে ফেল্বি নাকি—সর, সর, একেবারে রাশমারা দেখ্ছি।" ইত্যাদি ভাষাবিন্যাস সর্ব্বদাই শুনা যায়। উহাদিগকে উঠানে খাইতে দেওয়া হয়—জল খাইতে পিতলের গাড়ু দেওয়া হয়—পরিবেষণ করিয়া স্নান করা হয় এবং অম্লানবদনে উচ্ছিষ্ট খাইতে দেওয়া হয়। আমরা গাড়ী চড়ি, ঘোড়া কিংবা গোরুতে টানে। আমরা পাল্কী চড়ি—তাহারা কাঁধে করিয়া বয়।

কাজেই আমরা তাহাদের গোরু ঘোড়া হইতে পৃথক ভাবিনা। গোরুকে ত উহাদের চেয়ে ঢের বড়ই ভাবি। কিন্তু পাপপুণ্যের হিসাবে—মনুষ্যত্বের কষ্টি পাথরে সত্যের তুলাদণ্ডে ঐ "ছোট লোকরাই" বড়—আর "বড় লোকরাই" ছোট কিনা...তাহাই বা কে জানে ?

ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বাস করার জন্য একই জাতির মধ্যে জাতিমর্য্যাদার প্রভেদ ঘটে। এক পরগণার লোক অন্য পরগণার লোককে হীন মনে করে—মাঝখানে বড় নদী থাকিলে—মনের রাজ্যেও, জাতিকুলের ক্ষেত্রেও, বিস্তর ও দুস্তর ভেদ ঘটিয়া যায়। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ পরস্পরের জনসমাজের প্রতি যে ধারণা পোষণ করে তাহা কেবল মহাসিন্ধু ব্যবধানেই সম্ভব। আজকাল রেল ইষ্টিমারের সাহায্যে ভ্রান্তধারণা ও কূপমণ্ডুকতা কতকটা দূরীভূত হইয়াছে। তবু কলিকাতার লোক কলিকাতার বাহিরের লোককে এখনো 'বাঙ্গাল' বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গের লোক পূর্ব্ববঙ্গের লোককে এদেশের অন্নদস্যু মনে করে। 'রেঢ়োভূত' 'পাড়াগেঁয়েভূত', 'জেলাবিশেষের বাঙাল', 'ঘটিচোর' 'হট্টমালার দেশের লোক' 'পদ্মাপারী' 'বাহে' ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক অভিধার এখনো প্রচলন আছে। সমস্তেরই মূলে আছে জাত্যভিমান। সকলেই আমাদের পর—পরের দুর্দ্দশা লাঞ্ছনা দুঃখবিপত্তিতে আমাদের কিছুই যায় আসেনা।

যে জাতিগৌরবে আমরা স্ফীতবক্ষা তাহা ঐতিহাসিক জাতি নহে—ইহা পৌরাণিক কবিকল্পনা-প্রসূত।—কারণ ব্রাহ্মণরা গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্রহ্মার মুখ হইতে বাহির হইয়াছেন—আর শূদ্র পা হইতে। কিন্তু হিন্দু ছাড়া অন্য কোটি কোটি লোক ব্রহ্মার কোথা হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা বলেন না। বোধ হয় জগতের অন্যান্য জাতি ব্রহ্মার সৃষ্টই নয়—উহা শয়তানের সৃষ্টি। তারপর বলা হয় চাতুর্ব্বর্ণ্য ভগবানের সৃষ্টি—একথা ভগবান গীতায় বলিয়া গিয়াছেন। সমগ্র জগতের ভগবান সহসা আর্য্যবর্ত্তের ভগবান হইয়া ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির কয়েক জনকে অক্ষয় চাতুর্ব্বর্ণ্য দান করিলেন—আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে কোটি কোটি সন্তানের কথা ভাবিলেনও না। যাঁহারা জাতিভেদের এইরূপ একটা স্বপ্নময় নিদান নির্ণয় করিয়া রক্তগর্ব্বে নিশ্চিন্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে কিছুই বলিবার নাই। যাঁহারা জাতিভেদের ঐতিহাসিকতা মানেন, তাঁহাদের জাত্যভিমান ত্যাগ করা উচিত—ঐতিহাসিকদের মন্তব্য ও বক্তব্য তাঁহাদের শোনা উচিত। সত্যনিষ্ঠ অপক্ষপাত পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণেরও কর্ত্তব্য স্পষ্ট করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুজাতির ইতিহাস বিবৃতি করা। তাঁহারা বলুন পৌরাণিক বর্ণভেদ সাময়িক সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য মানুষেরই সৃষ্টি কিনা। এক সময় যাহা ইষ্টসাধন করিয়াছে—এখন তাহা অনিষ্টের মূল কিনা—যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তের সহিত—কালচক্রের আবর্ত্তনের সহিত সামাজিক নিয়ম পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে কিনা ? বৌদ্ধযুগে বর্ণভেদের ধারা ঠিক অক্ষুণ্ণ ছিল কিনা ? শক, হূন, লিচ্ছবি ইত্যাদি বিদেশীয়গণ

কোথায় লীন হইল ?—পঞ্চজন ব্রাহ্মণ হইতে বঙ্গে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ হইল— সেই অনুপাতে লক্ষ লক্ষ শকহূন বৌদ্ধ হইতে কত লক্ষ হিন্দু হইল ? ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে রক্তমিশ্রণ ও বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলিত ছিল কিনা ?—আদিশূরের সময়ের কয়জন ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইতে এত লক্ষ ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইল ?—এরূপ অভূতপুর্ব্ব বংশবৃদ্ধির কারণ কি ? বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই জাতি কোথায় গেল ? কৌলিন্যপ্রথায় সমাজ দেহের কোন' কোন' অংশের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা ? বহুকাল ধরিয়া মুসলমান শাসনে—ভোগবিলাসী ইন্দ্রিয়লোলুপ সুবাদারদের অত্যাচারে—বর্গীর হাঙ্গামায়— দুর্দ্দান্ত জমিদারের স্বেচ্ছাচারিতায়,— অতিবৃদ্ধগণের কিশোরী পরিণয়ে—বৈষ্ণব নেড়া নেড়ীদের প্রভাবে—কর্ত্তাভজা, কিশোরী ভজন, গুরুপূজা, সহজিয়া, আউলিয়া, বাউলিয়া, অবধূততন্ত্র, কৌলাচার, যোগিনীসঙ্গ, ভৈরবীচক্র ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের, ধর্ম্মের নামে স্বৈরাচারেও হিন্দুসমাজের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন আছে কিনা ? স্বেচ্ছাচারী রাজা, সমাজনায়ক, ধর্ম্মগুরু এবং পরাক্রান্ত ভূস্বামীর খেয়ালে, তোষে, রোষে কোন জাতির সমুন্নতি বা কোন জাতির অধোগতি হইয়াছে কিনা ? ম্লেচ্ছসংসর্গদুষ্ট নরনারীকে, প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া, পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা হইত কিনা ? এ সকল প্রশ্নের স্পষ্ট বিশদ অপক্ষপাত উত্তর শুনিলে বোধহয় জাত্যভিমান অনেক কমিয়া যাইতে পারে। তারপর জীবতত্ত্বজ্ঞ ভূতত্ত্বজ্ঞ মানবতত্ত্বজ্ঞ—বৈজ্ঞানিকগণের মন্তব্যেরও মূল্য আছে—দৈহিকগঠনে বর্ত্তমান হিন্দুজাতি সেই বৈদিক আর্য্যজাতির অবিমিশ্র ধারা কিনা তাঁহারা বলুন। কুলতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কুলপঞ্জী ঘটককারিকা ইত্যাদি অনুশীলন করিয়া বলুন, কুলের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন আছে কিনা ? জীবতত্ত্বজ্ঞেরা বলুন উত্তরাধিকার সূত্রে টাকাকড়ি বাড়ী গাড়ীর মতন আত্মার গুণাবলী, মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য ও 'নবধাকুল লক্ষণং' লাভ করা যায় কিনা ?

আমরা শাস্ত্রী মহাশয়, নগেন বসু মহাশয়, শশধর বাবু ও রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের নিকট ঐ সকল সত্য কথা শুনিতে চাই।

পাঠানযুগের স্মার্ত্তশার্দ্দুল রঘুনন্দন বিধান দিয়া গিয়াছেন—যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র—অন্য দুইবর্ণ নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কবে কিভাবে লোপ পাইয়াছে বা বৃষলত্বলাভ করিয়াছে—তাহা তিনি বলেন নাই—তবে বলিয়াছেন শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়া লোপাৎ তাহারা ভ্রষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়ালোপ কি কেবল ঐ দুই জাতিরই ঘটিয়াছে ? আজ যদি রঘুনন্দন ফিরিয়া আসেন তবে তাঁহাকে 'যুগে জঘন্যতরে একা জাতি' বলিতে বলিতে হইবে না কি ? রঘুনন্দনের মতে হিন্দু সমাজমন্দির তখন দুইটি স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া ছিল।—যাহা দুই স্তম্ভের উপর এতদিন ছিল, তাহা কি বিরাট একটি স্তম্ভের উপর দাঁড়াইতে পারেনা ? কলিযুগের একবর্ণতা সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহারও কি সময় হয় নাই ?

সুধীগণ বলেন—চাতুর্ব্বর্ণ্য কোন এক দেশের কতকগুলি লোকের মধ্যে চিরস্থায়ী বিভাগ

মাত্র নহে—ইহা একটি principle of classfication,—শ্রেণীবোধের Category. উহা সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বযৌগিক সত্য—এবং বিধাতারই সৃষ্টি—সত্বরজস্তমোগুণের ক্রমপ্রাধান্য অনুসারেই চতুর্ব্বর্ণভেদ। এই চাতুর্ব্বর্ণ্য চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকিবে। দেবতাগণের মধ্যেও আছে—পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদির মধ্যে-ও আছে। ইউরোপেও আছে—আমেরিকাতেও আছে, খৃষ্টানদের মধ্যে-ও আছে, মুসলমানদের মধ্যেও আছে। এ সত্য অনুসারে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেও যথেষ্ট শূদ্র আছে—শূদ্রের মধ্যেও অনেক ব্রাহ্মণ আছে। এক ব্যক্তির চারিপুত্র চারিবর্ণের হইতে পারে। মানুষের পক্ষে চাতুর্ব্বর্ণ্য আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এই আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত সম্পৎ--ইহা বংশগত হইতে পারে না। শোণিত ধারায় এই বৈশিষ্ট্যলাভের সম্ভাবনা অবশ্য যথেষ্ট থাকিতে পারে—কিন্তু প্রত্যেককেই সেই সম্ভাবনাকে সাধনার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু শোণিতসম্পর্ক সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা সত্বেও বহু ক্ষেত্রেই নানা আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক কারণে বংশধারায় ঐ সম্ভাবনা সংক্রমিত হয় না—সংক্রমিত হইলেও বেশী পুরুষ স্থায়ী হয়না অথবা ঐ সম্ভাবনা জীবনে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠেনা। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, জন্মের গ্রহনক্ষত্র, পিতামাতার স্বাস্থ্য—সাংসারিক অবস্থা, জন্মস্থান ও প্রতিপালন স্থানের জলবায়ু, গর্ভাধান কালে পিতামাতার মনের অবস্থা, শিক্ষা দীক্ষার প্রকৃতি, নানাজনের প্রভাব, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন, ব্যক্তিগত সাধনার তারতম্য ইত্যাদি ভৌতিক ও আত্মিক বহুবিধ উপাদানের বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের জন্য বংশপরম্পরাক্রমে কোন বৈশিষ্ট্যই অক্ষুন্ন ভাবে চলিতে পারেনা—বৈশিষ্ট্যলাভের প্রবণতাও সমান থাকে না।

বহুবিধ সতর্কতা সত্বেও একবর্ণের বংশপরম্পরায় বর্ণান্তরের উপযোগী গুণ, ধর্ম্ম ও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। পুরাণ ইতিহাসে যেমন অসংখ্য উদাহরণ আছে—বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষও আমরা তেমনিই দেখিতে পাই। স্মরণাতীত কালে যে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে বর্ণভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—আজিও তাহাদের বংশধরগণ যদি সেই আদিম বৈশিষ্ট্যের দাবি করেন তবে তাহাকে গলার জোর ছাড়া আর কি বলা যাইবে? আর্য্যগণের দৈহিক বর্ণের সহিত আধ্যাত্মিক বর্ণও যে রূপান্তর লাভ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে? একবর্ণের মধ্যে জন্মগত অধিকার সাম্য ও বর্ণান্তরের সহিত অধিকার বৈষম্যের বিশৃঙ্খলায় আমরা প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা প্রকৃত ক্ষত্রিয়কে হারাইয়া ফেলিতেছি।

ইতিহাস অনুশীলনে আমরা দেখি—আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে কিছুকাল বাসের পর আপনাদের নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজের শাসন ও পালনের সুবিধার জন্য গুণবৃত্তি অনুসারে আপনাদিগকে ত্রিবর্ণে (বা চতুর্ব্বর্ণে) ভাগ করিয়া লইয়াছিল। এই ত্রিবর্ণ এক আর্য্যশোণিত হইতেই উৎপন্ন—কেবল গুণবৃত্তি প্রভেদের জন্য তাহাদের তিনটী ভাগ হইয়াছিল, জন্মের জন্য নহে। মত্যান্তরে চতুর্থ বর্ণে কেবল বিজিত অনার্য্যগণের স্থান হইয়াছিল। আর্য্যদের

এই ত্রিবর্ণের গুণবৃত্তির উচ্চাবচতায় তাহাদের মধ্যে একটা উচ্চনীচতা স্বভাবতই জন্মিয়া গিয়াছিল—কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার সম্বন্ধ ছিলনা। উচ্চবর্ণ নীচবর্ণের কন্যা বিবাহ করিতেন এবং বৈধবিবাহজাত সন্তান পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইত—(যেন জাতঃ সএব সঃ)—অথবা নূতন জাতির সৃষ্টি করিত। এই সন্তান অনুলোমজ। নীচবর্ণও উচ্চবর্ণের কন্যা বিবাহ করিতেন—সে বিবাহকেও অবৈধ বলা হইত না—তবে তজ্জাত সন্তান প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর।—সে মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইত—অথবা নূতন জাতির সৃষ্টি করিত। ক্ষত্রিয়রাজগণ অনেকে ঋষিকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।* বহু ঋষি ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন—এবং ক্ষত্রিয়কন্যাজাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণই হইতেন। অষ্টপ্রকার বিবাহের মতন, দ্বাদশ প্রকার পুত্র ছিল—সকলে পিতৃধনভাগী না হইলেও সমাজে স্থান পাইত—গূঢ়োৎপন্ন পুত্রও পিতৃধনের অংশ পাইত। রমণী ঋতুমতী হইলে তাহার ঋতুরক্ষা ধর্ম্মের অন্তর্গত ছিল—স্বামী উপস্থিত না থাকিলে অন্যপুরুষের সাহায্যে গর্ভাধান করিয়া লইতে পারিত এ প্রসঙ্গে বেদপত্নী ও উতঙ্কের উপাখ্যান স্মরণীয়। ব্রাহ্মণত্ব অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তি মহত্তর বলিয়া স্বীকৃত হইত, তৎসম্বন্ধে পুরাণে অনেক উপাখ্যান আছে—অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসার উপাখ্যান—ভক্তজটিলের উপাখ্যান ইত্যাদি। নিম্ন জাতীয় নারীর সতীত্বও যে ব্রাহ্মণত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ এবং একজন ব্যাধও যে তপঃশীল ব্রাহ্মণের ধর্ম্মোপদেশক হইতে পারিত তৎসম্বন্ধে মহাভারতে ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান আছে। গুহক চণ্ডাল হইলেও রামচন্দ্রের আলিঙ্গন লাভ করিয়াছিলেন। একলব্য নিজসাধনার বলে ধনুর্ব্বিদ্যায় ক্ষত্র রাজকুমারদিগকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য তাহাকে শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া নির্ম্মম গুরুদক্ষিণা চাহিয়াছিলেন।

নিম্নতর বর্ণ সাধনার বলে ও ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে উচ্চতর বর্ণে উন্নীত হইতে পারিত অথবা উচ্চতর বর্ণের সমান মর্য্যাদা লাভ করিত। ঋষিগণ বহুচারিণী রমণীগণের গর্ভে সন্তান উৎপাদন

---

* জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাক্যাস্তু পরাশরঃ। বহবোহন্যেঽপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তাঃ বৈ পূর্ব্বমদ্বিজাঃ গণিকাগর্ভসম্ভূতো বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ। তপসা ব্রহ্মণোজাতঃ সংস্কারাস্তত্র কারণাঃ।

ঋষ্যশৃঙ্গ, অগস্ত্য, দুর্ব্বাসা, ঋচীক, জমদগ্নি, গার্গ্য, সৌভরি, চ্যবন ইত্যাদি ঋষিগণ ক্ষত্রকন্যা বিবাহ করিয়া জমদগ্নি, পরশুরাম, ইক্ষবাহ প্রমতি ইত্যাদি ঋষিগণ ক্ষত্রিয় রাজাদেরই দৌহিত্র। প্রমতি, গার্গ্য, কণ্বপুত্র কণ্ডু ইত্যাদি ছিলেন। ঋষিগণ ও পুরুরবা প্রভৃতি রাজগণ গণিকায় পুত্রোৎপাদন করেন। যযাতি, প্রদ্যুম্ন ইত্যাদি রাজন্যগণ দৈত্য, (অনার্য্য?) কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে ভরদ্বাজের জন্মদান করেন। দুষ্মন্ত মেনকাগর্ভসম্ভূতা শকুন্তলাকে এবং ঋষি সন্তান রুরু প্রমদ্বরা কে বিবাহ করেন। কপোত ঋষি রাণী তারাবতীর দাসীকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করেন। নারদ মনুষ্যজন্মে দাসীপুত্র। অন্ধক মুনির পত্নী ছিল শূদ্রবংশীয়া শক্তির পত্নী ছিল বৈশ্য কন্যা। দাসীপুত্র বিদুর ক্ষত্রিয় রাজকন্যা বিবাহ করেন। বীতহব্য ভৃগুর কৃপায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। বর্ণবিপর্য্যয়ের এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে।

করিতেন, জন্মদোষে ঋষিসন্তানগণ ব্রাহ্মণত্ব হারাইত না—ব্যাস, বশিষ্ঠ, জাবালি ইত্যাদির কথা স্মর্ত্তব্য। নরনারীর যৌনসংসর্গমাত্রকেই এক প্রকারের বিবাহ বলিয়া গণ্য করা হইত। বিধবার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্রলাভের নিয়ম বৈধই ছিল - কানীন ও জারজ সন্তানেরও গুণবলে সমাজে স্থান ছিল—এক পত্নীর পঞ্চস্বামীতেও আপত্তি ছিল না, মাতুলকন্যা বিবাহে দোষ ছিল না, বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল,—দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ অনেক স্থলে বৈধ ছিল। শ্বেতকেতুর সময় পর্য্যন্ত পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বা যৌনবিচারপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হয় নাই—যেমন শুক্রাচার্য্যের সুরার সহিত শিষ্যমাংস ভক্ষণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুরা ব্রাহ্মণের অপেয় ছিল না। অনুতপ্তা হইলে দ্বিচারিণী ক্ষমা পাইতে পারিত, সুতপুত্র বলিয়া সৌতি, দাসীপুত্র বলিয়া বিদুর কখনো অনাদৃত হ'ন নাই—মহত্ত্বের জন্য বরং পূজিতই হইয়াছেন, সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহাদের অধিকার ছিল। এই সকলের দ্বারা প্রমাণ হয়—জাতির তখন জীবন ছিল। জীবনের যাহা ধর্ম্ম,—মেধ্য, অমেধ্য সমস্ত খাদ্যপেয় হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া পরিপাক করা—তাহা সে পালন করিতে পারিত। জাতিভেদ থাকিলেও জন্মগৌরবের অনেক উপরে তখন গুণগৌরবের স্থান ছিল। ভারত তখন প্রথা বা সংস্কারের ক্রীতদাস ছিল না—সকল ক্ষেত্রেই, সকল জীবনযজ্ঞেই, সত্যকেই তাহারা অর্ঘ্যদান করিত,—জানিত, অঙ্গারেও হীরক জন্মে—জন্মের জন্য জাতক দায়ী নহে আপনার কর্ম্মফলের জন্যই সে দায়ী। ব্যক্তিগত সাধনায় তাই হীনজন্মা ব্যক্তিও লোকগুরু হইয়া উঠিতে পারিতেন, সমাজ তাহাতে বাধা দিতনা। মনুষ্যত্বের অধিকারবিচারে জন্মকে সমাজ এতই অকিঞ্চিৎকর মনে করিত যে—সীতা, অগস্ত্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, মৎস্যগন্ধা, ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা, ভগীরথ, সঙ্কর্ষণ, ঔর্ব্ব, দ্রোণ ইত্যাদির অস্বাভাবিক জন্মকথার মূলে কোন সত্যের সন্ধানেরও প্রয়োজন বোধ করে নাই। অনেক ঋষির জন্ম-ইতিহাস হইতে ও অসবর্ণ বিবাহ প্রথা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে উর্জ্জস্বল ঋষির দ্বারা বর্ণান্তরের শোণিত ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আর ব্রাহ্মণের রক্তের যদি জীববিজ্ঞানগত কিছু মূল্য থাকে তবে অসবর্ণ বিবাহের ফলে ও বৈবাহিক স্বাধীনতার জন্য অন্যান্য জাতির মধ্যে যে ব্রাহ্মণ-রক্ত প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও নিষ্ফল নয়—ব্রাহ্মণের তেজ ধৃতি ধী ও মহত্ত্ব শোণিত ধারায় তাহারাও পাইয়াছে—সাধনার বলে তাহারাও প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব নিজেদের মধ্যে জাগাইতে পারে।

বহু শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধ-শাসনে হিন্দুদের জাতির আলিবন্ধন অনেক স্থলেই ভাঙিয়া গিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন তখন শোণিতধারা অবাধে বর্ণ হইতে বর্ণান্তরে, জাতি হইতে জাত্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের রাজধর্ম্ম হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেও রাজন্যগণের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং জাতিতে জাতিতে রক্ত-মিশ্রণে বাধা ছিল না। কোন কোন রাজকুলে সহোদরাবিবাহ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধযুগে শক, হুন, লিচ্ছবি, দরদ, কুশান, পল্লব ইত্যাদি বিদেশীয়গণ এদেশে উপনিবেশ করেন—হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে পরিপাক করিয়া

লইয়াছে। বৌদ্ধযুগের শেষে হিন্দুসমাজের পুনর্গঠনের পর আর পূর্ব্বের শোণিতধারাকে অনেকস্থলেই অবিমিশ্রভাবে পাওয়া যায় নাই।

বাঙালী জাতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও মানবতত্ত্ববিদ্‌গণের মত এই যে, বর্ত্তমান বাঙালী জাতি আর্য্য, দ্রাবিড়, মোঙ্গলিয়ান বা টিবেটো বার্ম্মান ও এদেশের অনার্য্য অধিবাসিগণের মিলনে গঠিত এবং আর্য্যেতর শোণিতের প্রাবল্যের জন্য বাঙালী জাতির সভ্যতা, শিক্ষা, দীক্ষা, উপাসনা পদ্ধতি, পারিবারিক জীবন, রীতি-নীতি আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য জাতি হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহারা আরো বলেন—বাংলাদেশে পাঠানযুগে জাতিভেদের প্রতিকূল, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ও বিলয়ের জন্য এবং কতকগুলি জাতিভেদের ক্ষতিকর সামাজিক প্রথার প্রবর্ত্তনের জন্য একজাতি হইতে অন্য জাতিতে রক্তস্রোত অবাধে প্রবেশ করিয়াছে। এসম্বন্ধে ৺পাঁচকড়ি বাবু বঙ্গবাণীর ১ম বৎসরে যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন তাহাতে আরো অনেক সাংঘাতিক কথা আছে। কৌতূহলী পাঠক সেগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন।

এ সম্বন্ধে কেবল একটি কথা বলিতে চাই—তরল পদার্থের সকল ধর্ম্মই শোণিতের আছে,—জলধারার ন্যায় প্রবাহ আছে, তরঙ্গ আছে—জাতিকুলের কূলের বাঁধন তাহার যতই সুদৃঢ় থাকুক বন্যার সময় এক ধারার সঙ্গে অন্য ধারা একাকার হইয়া যাইতে পারে। একধারা অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারার দ্বারা পুষ্ট হইতে পারে। ভূপৃষ্ঠের উপর প্রকাশ্য সংযোগ না ঘটিলেও ভূমিতলের সুড়ঙ্গপথে ধারার সহিত ধারার সংযোগ কে নিবারণ করিবে? অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার প্রকৃতি, ধর্ম্ম ও ক্রিয়ার সন্ধান কয়জন রাখে? প্রকৃতির গতিরোধ কে করিতে পারে? একদিকের গতিরোধ করিলে অন্যদিকে প্রকৃতি তাহার স্বধর্ম্ম পালন করিবে।

সমাজ কর্ত্তাগণ ও স্মার্ত্তগণ জাত্যভিমানকে চিরদিন প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা ঢের বড় মানুষ যাঁহারা—অতিমানুষ যাঁহারা—তাঁহারা জাত্যভিমানকে পরম অধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগের ১ম অবস্থায় ক্ষত্রিয় বংশে মহাবীর ও শাক্যসিংহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরুদ্ধে জাতিভেদবর্জ্জিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধবিজয় করিয়া যে বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে জাত্যভিমানের স্থান নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত দণ্ডী সম্প্রদায় সকল জাতির বাহিরে। গার্হস্থ্যাশ্রমীর জন্য তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন—

"ন জাত্যা ব্রাহ্মণাশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব ন
ন শূদ্রো নচ বৈ ম্লেচ্ছো ভেদিতাঃ গুণকর্ম্মভিঃ॥"

তাহা ছাড়া তিনি জ্ঞানমার্গের সাধনাকে প্রাধান্য দিয়া বর্ণগুরুদের দায়িত্ব এত বেশী দুরূহ ও কঠোর করিয়া গিয়াছেন যে তাহাতে শুধু জাত্যভিমান কেন—কোন প্রকার অভিমানেরই

অবসর নাই। তারপর রামানন্দ, কবীর, নানক, গুরুগোরক্ষনাথ. স্বামীজী মহারাজ, নারায়ণ স্বামী ইত্যাদি মহাপুরুষেরা জাতিবর্ণের গণ্ডী ভাঙিয়া আপন আপন ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। দয়ানন্দ স্বামী যে বেদবিধির অনুসরণে আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে জাতিভেদ ত নাই-ই—বিধর্ম্মী সমাজে জাত ব্যক্তিগণেরও ঠাঁই আছে।

বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। শ্রীচৈতন্য নিজে সন্ন্যাসী বা দণ্ডী ছিলেন,—তিনি সকল জাতির বাহিরে। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে জাতিভেদের কোন মূল্যই নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত মার্গ,—ভক্তিমার্গ—তাহাতে "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ"—তাঁহার মতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব জাতিজন্মে নয়—ভক্তিতে ; রক্তশুদ্ধিতে নয়—চিত্তশুদ্ধিতে। তাঁহার ধর্ম্মের সাধারণতন্ত্রে হরিদাস, শিখর ভুঁইমালী হইতে প্রকাশানন্দ, সার্ব্বভৌম পর্য্যন্ত সকলেরই ঠাঁই ছিল। তাঁহার মতে আপামর সাধারণ আচণ্ডাল সকলেরই ধর্ম্মজগতে সমান অধিকার এবং জাত্যভিমান ত্যাগ করিয়া তৃণাদপি সুনীচ না হইলে এবং অমানীকে মান না দিলে কেহই প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে পারিবে না। কিন্তু এই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তনেও এদেশে জাত্যভিমান দূর হইল না। "জ্ঞানে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি। যেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল। যত ভট্টাচার্য্য একোজনা না দেখিল।" ভট্টাচার্য্যগণ জাত্যভিমানকে বাঁচাইয়া রাখিলেন।

শ্রীচৈতন্যের ভক্তপার্ষদগণ এক একজন মহাপুরুষ। তাঁহাদের অনেকেই জাতি মানিতেন না—বিভিন্নজাতীয় ভক্তগণের অন্নগ্রহণ করিতে বা তাঁহাদের সহিত একত্রে ভোজন করিতে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। নিত্যানন্দ প্রভু যে বৈষ্ণবসমাজের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাতে জাতিভেদ ছিল না—নানাজাতীয় লোক তাহার মধ্যে আশ্রয় লইয়া বৈবাহিক বন্ধনে সাংসারিক জীবন যাপন করিত। কিন্তু তাহাও হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রসার লাভ করিতে পাইল না—উক্ত বৈষ্ণবসমাজ এখন কৈবর্ত্ত, গোপের মত একটি বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে, ঐ জাতির লোকের বৃত্তি এখন নামকীর্ত্তন করিয়া ভিক্ষা করা অথবা গ্রাম্য মেলায় মণিহারীর জিনিস বিক্রয় করা। 'বৈষ্ণব প্রভাবে এক সময় অনেকে এতদূর জাত্যভিমান ত্যাগ করিয়াছিলেন, যে মহোৎসবে নানাজাতির উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণেও তাঁহাদের আপত্তি ছিল না—সংকীর্ত্তনে আচণ্ডালের পদধূলিতে গড়াগড়ি দিতেন—ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বৈষ্ণব মহাজনের মন্ত্রশিষ্য হইতেন—এবং অতি হীন জাতিকেও মন্ত্র দিতেন। এখন জাত্যভিমান আবার ফণা তুলিয়া উঠিয়াছে—ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব বংশের কাছে আর মন্ত্রগ্রহণ করেন না—নীচবর্ণকেও মন্ত্র দিতে চান না।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে সকল শাখা উপশাখা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সে গুলিতেও জাতিভেদ বা অন্নবিচার নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম রূপান্তর লাভ করিয়া বাংলাদেশে যে সকল ধর্ম্ম

সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল—বলা বাহুল্য, সে গুলির মধ্যে জাতির কোন কথাই নাই। সে গুলিতে সহজগুরু, কর্ত্তাভজনের কর্ত্তা মহাশয় ও বরাতি, সাঁই, দেয়াশিনী, ধর্ম্ম ঠাকুরের পুরোহিত, সাধন নায়ক, সাধন নায়িকা ইত্যাদি যে কোন জাতির লোকই হইতে পারিত, উচ্চবর্ণজ সাধকগণের তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না।—তাহারা হাড়ী পুরোহিতকেও মানিয়া আসিয়াছে। তান্ত্রিক, কৌলাচারী, অঘোরপন্থী সম্প্রদায়ের লোকেরা গুরু, সাধননায়ক, সাধননায়িকা, উত্তর সাধক, শিষ্য ইত্যাদি নির্ব্বাচনে জাতির প্রশ্নই তুলিত না। কৌলাচারীর সাধন নায়িকার মধ্যে চণ্ডালীই প্রশস্ত ছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের আজকাল পৃথক সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এ গুলি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে আত্মবিলোপ করিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে ক্রমে জাত্যভিমান জাগ্রত হইয়া সর্ব্ববর্ণসমন্বয়ের সাধারণতন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান গুলি ভাঙিয়া দিয়াছে।

রামমোহন জাতিগৌরবের উপর ব্যক্তিগত সাধনা ও জ্ঞান গৌরবের প্রাধান্য প্রচার করিলেন, কেশবচন্দ্র জাতিভেদের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, কিন্তু হিন্দু সমাজ তাহা গ্রহণ করে নাই। ফলে নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পরমহংসদেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মন্ত্র শুনিয়াও হিন্দুসমাজ জাত্যভিমান ত্যাগ করে নাই। বিবেকানন্দ জাতিভেদ ও জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে বজ্রবাণী ঘোষণা করিলেন, আচণ্ডাল সকলকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিলেন, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে জীবব্রহ্ম নারায়ণ জ্ঞানে সেবাধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিলেন, ফলে মঠে মঠে একটী পৃথক দণ্ডী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। সেবাধর্ম্মও পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইল কিন্তু হিন্দুসমাজ জাত্যভিমান ত্যাগ করিল না—আপামর সাধারণকে প্রাণ খুলিয়া ভাই বলিয়া ডাকিতে পারিল না।

উল্লিখিত সকল সম্প্রদায়কেই আমরা হিন্দু সমাজের অন্তর্গত মনে করি, জাতিভেদ না মানিলেও তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করি, তাহাদিগকে হিন্দু না বলিলে আমরা ক্রুদ্ধ হই অথচ নিজেদের জাতিভেদের কথা উঠিলেই বলি জাতি গেলেই হিন্দুত্ব যাইল—জাতিভেদ ও হিন্দুত্ব অভিন্ন।

রঘুনন্দন-ত ব্রাহ্মণেতর জাতিকে শূদ্র বলিয়া গেলেন—কিন্তু ব্রাহ্মণের অশূদ্রপ্রতিগ্রাহিতা কিরূপে রক্ষা পাইবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন না—বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন সকল ব্রাহ্মণই 'বুনো রামনাথের' মত জীবন-যাপন করিবে। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সে জীবন-যাপন করেন নাই, তাঁহাদিগকে সম্পন্ন গৃহীজীবনযাপনের জন্য ব্রাহ্মণেতর জাতির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে—এজন্য যতটুকু জাত্যহঙ্কার তাঁহাদের ত্যাগ করা উচিত ছিল তাহা তাঁহারা করেন নাই। কেহ কেহ মুসলমান রাজসরকারে চাকরী গ্রহণ করিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন এবং কেহ কেহ নানাভাবে ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিয়া দেশের প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী

হইয়া উঠিলেন। অনেকেই রীতিমত বৈশ্যের গুণবৃত্তি অনুসরণ করিলেন। এই সকল ধনশালী' ব্রাহ্মণগণের কিন্তু ব্রাহ্মণত্ববিরোধী বৃত্তি অবলম্বনের জন্য জাত্যহঙ্কার ত্যাগ করিবার কথা। কিন্তু তাহা হইল না—ধনের অহঙ্কার জাতির অহঙ্কারকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিল—এবং তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সমাজের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা হইয়া উঠিলেন—আচার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাঁহাদের বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে প্রয়োজনমত সমাজ শাসনে সাহায্য করিতেন।

কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মণকে অন্নার্জ্জনের জন্য ব্রাহ্মণেতর জাতির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে—চাকরী, গুরুগিরি, পৌরোহিত্য, প্রতিবেশিত্ব ইত্যাদি নানাসূত্রে আহার, বাসস্থান, ভূসম্পৎ, পরিধেয়, বৃত্তি, দক্ষিণা, প্রণামী, দান প্রভৃতি লাভ করিয়া বহু ব্রাহ্মণ পরিবার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং এখনো করিতেছেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণভোজন ও ব্রাহ্মণের জন্য উৎসর্গকেই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম মনে করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ ধর্ম্মানুষ্ঠানই প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণপ্রতিপালন। তাহারা ব্রাহ্মণকে সত্যনারায়ণ বা সত্যব্রহ্মের উপরেও স্থান দিয়াছে—স্বয়ং ভগবানের বদলেও ব্রাহ্মণের উপাসনা করিয়াছে। এরূপ একনিষ্ঠ সেবার কি মর্য্যাদা নাই? কেবল ব্রাহ্মণতাই বড়? দেবতা বড় না ভক্ত বড় তাহারই বা ঠিক কি? ব্রাহ্মণেতর জাতি অন্য নানা ভাবেও ব্রাহ্মণের সেবা করিয়াছে।—কত ব্রাহ্মণ অপরাধ করিয়া কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়াই অব্যাহতি পাইয়াছে, খাজানা মাপ পাইয়াছে—ঋণ ও ঋণের সুদ মাপ পাইয়াছে, শ্রমিকদের নিকট হইতে বেগার পাইয়াছে—অসংখ্য দায় হইতে মুক্তি পাইয়াছে,—সন্তানের শিক্ষার জন্য সাহায্য পাইয়াছে। এই প্রকার অসংখ্য প্রকারে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেতর জাতির নিকট ঋণী। ব্রাহ্মণ, বিনিময়ে আর যাই দিন্—না কেন, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে, তপস্যায়, তেজে, ব্রহ্মবলে দেশের শতকরা ৯৬ জন ব্রাহ্মণেতর জাতীয় লোককে বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, পরাধীনতা, দৈন্য, লাঞ্ছনা ও অসহায়তা হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণগণ যদি তাঁহাদের অন্নদাতা ভয়ত্রাতা ও একনিষ্ঠ সেবক-গণকে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মর্য্যাদাও দিতেন—তবে নিজেদের মর্য্যাদাও রক্ষিত হইত। তাহাদিগকে হেয় শূদ্র মনে করিয়া নিজেদেরও মর্য্যাদাহানি করিয়াছেন। দেবতা নিজ ভক্তকে যে সম্মান দিয়া থাকেন—ভূদেবতাগণ তাঁহাদের ভক্তগণকে সে মর্য্যাদাও দান করেন নাই। শাস্ত্র যেমন ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছে,—তেমনি যে সকল গুণের জন্য ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ,—সে সকল গুণেরও পৃথক পৃথক গুণগান করিয়াছে—সে সকল গুণের প্রায় সমস্তই জন্মনিরপেক্ষ। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে সেই সকল গুণের বিকাশ দেখিলে কেন যে ব্রাহ্মণত্বের সমান মর্য্যাদা দেওয়া হইবে না তাহা বুঝিতে পারি না। ত্যাগ, বদান্যতা, আত্মসংযম, ভগবদ্‌ভক্তি, আতিথেয়তা, আচারনিষ্ঠা, নারীর পাতিব্রত্য, সহিষ্ণুতা, নির্লোভতা, বৈরাগ্য

ইত্যাদি জন্মনিরপেক্ষ ধর্ম্ম বিশ্বজগতের সর্ব্বত্রই মানবের চরম সাধনার সামগ্রী। এগুলি ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেও যেমন আছে—ব্রাহ্মণেতর বহু জাতির মধ্যেও তেমনি আছে। রঘুনাথ, নরোত্তম, লালাবাবু, বিবেকানন্দ, অরবিন্দের ত্যাগ ও বৈরাগ্য, নফর কুণ্ডুর পরার্থে প্রাণোৎসর্গ, গৌরীসেন, রাণী স্বর্ণময়ী, কৃষ্ণপান্তী, রামদুলাল, রাণী রাসমণি, রাজেন্দ্র মল্লিক, মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র, রাসবিহারী, তারকনাথ, চিত্তরঞ্জন ইত্যাদির বদান্যতা, দেশের কল্যাণের জন্য অসংখ্য ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির দুঃখবরণ ব্রাহ্মণ সমাজেও অতি সুলভ নয়। কথা হইতে পারে—ব্যক্তিবিশেষের মহত্ত্বের জন্য তাহার জাতিকে মর্য্যাদা দিব কেন? ব্যক্তিবিশেষের মহত্ত্বের জন্য যাঁহারা নিজেদের সমগ্র জাতির মর্য্যাদা চাহেন, তাঁহাদের একথা বলা চলেনা—যে রত্নগর্ভা মাতা রত্ন প্রসব করিয়া থাকে তাহাকে মর্য্যাদা দেওয়ার প্রথা তাঁহাদের শাস্ত্রেই আছে। ব্রাহ্মণত্বের সুযোগ সুবিধা ও বংশপরম্পরাগত শিক্ষাদীক্ষার ধারা লাভ না করিয়াও যদি কোন জাতিমাতা ব্রাহ্মণোচিত গুণযুক্ত সুসন্তানের জন্ম দিতে পারে তবে তাহার পক্ষে যেমন শ্লাঘার কথা—ঐ সকল লাভ করিয়াও ব্রাহ্মণের জাতিমাতা কুসন্তান প্রসব করিলে তাঁহার পক্ষে তেমনি লজ্জার কথা।

ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু—তাঁহার দায়িত্ব অত্যন্ত কঠোর—দায়িত্বের কঠোরতা স্মরণ করিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে জাত্যহঙ্কার অস্বাভাবিক—কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে সর্ব্বদাই যাঁহাকে সশঙ্ক ও সতর্ক থাকিতে হইবে তাঁহার অভিমানের অবসর কোথা? ব্রাহ্মণগণ যদি তাঁহাদের জাতীয় সংসারের সকল পরিজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁহাদের বর্ত্তমান বৃত্তি, চরিত্র, প্রবৃত্তি, শিক্ষাদীক্ষা, আচার, দিনকৃত্য, ধর্ম্মবোধ ও জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ করেন তাহা হইলে তাঁহা-দিগকে জাত্যভিমান ত্যাগ করিয়া লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইতে হইবে। অন্য জাতির তুলনায় তাঁহাদের অধঃপতন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কারণ অন্য জাতির তুলনায় ব্রাহ্মণের দায়িত্ব অনেক বেশী—কৃত্য-কর্ত্তব্য কঠোরতর—ধর্ম্মানুশাসনের বিধি অধিকতর নিষ্করুণ। উচ্চতার সহিতই পতনের গুরুত্বের সম্বন্ধ। অন্যান্য জাতির অধঃপতনের জন্যও বর্ণগুরুই দায়ী। "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনাঃ"।

রঘুনন্দনের পাঁতিতে আর যাই থাক্ একটা বড় সত্যের ইঙ্গিত ছিল। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সব জাতিই যখন শূদ্র, তখন তাহারা একসঙ্গে মিলিবার যোগ্য। রঘুনন্দনের সে ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া যদি ব্রাহ্মণেতর জাতি এক হইয়া যাইত তাহা হইলে ব্রাহ্মণের বলিবার কিছু ছিল না—এবং তাহা হইলে দেশের ইতিহাস হয়ত অন্যরূপ দাঁড়াইত। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতি রঘুনন্দনকে মানিয়া লয় নাই—সকলেই আপনাদিগকে শূদ্র মনে করে নাই—অনেক ব্রাহ্মণ অবশ্য সেই হইতে সকল জাতিকেই শূদ্র মনে করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি আপনা-দিগকে শূদ্র মনে করিয়া একত্র মিলা দূরে থাকুক—নূতন নূতন উপজাতির সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রত্যেক উপজাতি এক একটি পৃথক পৃথক জাতি একা ব্রাহ্মণের মধ্যেই পরস্পরসম্পর্কশূন্য ৩৬ জাতি। এইরূপ প্রত্যেক জাতির মধ্যে বহু উপজাতি জন্মিয়াছে—একজাতির নাম সম্বলিত বিভিন্ন উপজাতি পরস্পরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি মনে করে।* কৌলিন্যের কুফলের কথা বাদ দিলেও প্রত্যেক উপজাতির 'কমঠতন্ত্রতার' জন্য হিন্দু সমাজের অত্যন্ত বল ক্ষয় হইয়াছে ও হইতেছে, বহু উপজাতি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া লোপ পাইয়াছে। অনেক গ্রামে স্বজাতীয় জনবলের অভাবে বহুপরিবার ক্রমে লাঞ্ছিত অনাদৃত হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—মুসলমান্ বহুল গ্রামে হিন্দুরা জাতিগত বৈষম্যের জন্য ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া একে একে সবল মুসলমানের কবলে আশ্রয় লইয়াছে—দশ বিশ ক্রোশের মধ্যে স্বজাতীয় বা স্ব শ্রেণীয় পরিবার না থাকায় অনেকের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদানের অসুবিধা ঘটিয়াছে এবং বংশলোপ হইয়া গিয়াছে।

পল্লীগ্রামে দেখা যায়—এক শ্রেণীর নব শায়কের মধ্যে—কন্যার এতই অভাব যে বহু পণ দিয়া কন্যা ক্রয় করিতে হয়—২বৎসরের কন্যারও বিবাহ হয়—একবার স্ত্রীবিয়োগ হইলে দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়না—বিধবা বিবাহ-ত প্রচলিত নাই-ই। অন্য শ্রেণীর মধ্যে আবার কন্যার সংখ্যাবাহুল্যহেতু বৃদ্ধ, চিররুগ্ণ, পঙ্গু, অক্ষম, কুষ্ঠীকেও কন্যা দান করিতে হয়—তাহাতে বিধবার সংখ্যা ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য কুফলের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে ফলে উভয় শ্রেণীই ধ্বংস পথের যাত্রী। বিধাতা বিশ্বময় পরিপূরক-পরিপূর্য্য সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন—মানুষ মাঝ খানে গণ্ডী টানিয়া মিলনের বাধার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। কেবলমাত্র বৃত্তির প্রভেদ ভিন্ন, চরিত্রে, শিক্ষাদীক্ষায় ধর্ম্মে নীতিতে সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে অনেক জাতির মধ্যে কোন পার্থক্যই দৃষ্ট হয় না—তবু তাহারা মিলিবার সুযোগ পায় নাই। উচ্চতর জাতির মধ্যে আবার বৃত্তিরও

* ক্রোরিয়ান গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী (মুকুটরাম) আরংজেবের সময় একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন—তিনি একবার ধনবলে ব্রাহ্মণের সকল শ্রেণী মিলাইতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন—নিজে বারেন্দ্র রাঢ়ীয় ও বৈদিক তিন শ্রেণীতেই বিবাহ করিয়াছিলেন—কিন্তু তারপর আর চলে নাই। চেষ্টার কৃত্রিমতার ফল হইবে কেন?

ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের ফলে একজাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ২।১টী বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে—কিন্তু তাহা ২।৪ ঘর ব্রাহ্মভাবাপন্ন অথবা ধনী পরিবারের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে—মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র পরিবার এখনো সাহস করে নাই। বাংলা দেশে যে জাতি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চশিক্ষিত সেই জাতিরই রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর মধ্যে—আজো ৫।৭টার বেশী করণ হয় নাই।—বাংলার সুবর্ণ বণিক জাতি, রূপে, গুণে, বিত্তে, চরিত্রে, বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রকৃত বৈশ্য। গন্ধবণিকগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইলে তাহাদের লাভ বই ক্ষতি নাই। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের কুপিত বিধানে এমনি ভ্রান্তসংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে গন্ধবণিকরাও তাহাদিগকে হেয় মনে করে। বরং কাসিমবাজারের মহারাজের চেষ্টায় তিলি জাতির দুই শ্রেণীর মধ্যে মিলন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে—ইহাতে উভয় শ্রেণীই বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন।

পার্থক্য নাই—বাস্তব পার্থক্য যেখানে বিন্দুমাত্র নাই, কাল্পনিক পার্থক্য সেখানে সব চেয়ে বেশী। অল্পদিন আগেও একজন কুলীন ব্রাহ্মণ ৫০টীও বিবাহ করিয়াছে—অকুলীন অর্থাভাবে একটিও বিবাহ করিতে পায় নাই। অগ্রদানী, গণক, ভাট ব্রাহ্মণরা ও বর্ণের ব্রাহ্মণরা কতক অনাদরে—কতক অন্নাভাবে কতক বা বৈবাহিক অসুবিধার ফলে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে রজপুত জাতির লোকসংখ্যা কম ছিল না, তাহারা রাঢ় দেশের বাহুবল বৃদ্ধি করিয়াছিল—কিন্তু তাহারা জলের বাহিরে মীনের মত ধ্বংস পাইতেছে। আমাদের গ্রামে ১২।১৪ ঘর বলিষ্ঠ রজপুত ছিল—দারিদ্র্যহেতু বিবাহ করিতে না পাইয়া প্রায় নির্ব্বংশ হইয়াছে। ১২।১৪ ঘর সবল সুশ্রী নিষ্ঠাবান কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ ছিল যতদিন আর্থিক অবস্থা তাহাদের ভাল ছিল, তত দিন বহু অনুসন্ধানে বহুব্যয়ে তাহারা পত্নী লাভ করিত—ক্রমে আর্থিক অবস্থার হীনতা ঘটায় পণ সংগ্রহ করিতে না পারায় প্রায় কোন পুরুষেরই বিবাহ হইল না। এদেশের কদাচারী ব্রাহ্মণও সদাচারী মিশ্র পাঁড়ে তেওয়ারীকে কন্যা দিলনা—যে কান্যকুব্জ পূর্ব্বনিবাস বলিয়া এদেশের ব্রাহ্মণ গৌরব করে—সেই কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণদিগকে কন্যা না দিয়া তাহারা চিররুগ্ণ ও বৃদ্ধের হাতেও কন্যা সমর্পণ করিল। বাংলাদেশে মছ্‌লী খাইয়া পশ্চিমা ব্রাহ্মণের কাছেও তাহারা হেয় হইয়া পড়িয়াছিল—তাহাদের সহিতও করণ-কারণ সম্ভব হয় নাই। কোন' বিশেষ বৃত্তি বা ব্যবসায়কে অবলম্বন করিয়া যে সকল জাতির সৃষ্টি হয় নাই, জীবন-সংগ্রামে তাহারা বিপন্ন ও বিতাড়িত হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে জীবিকার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে,—শেষে যূথভ্রষ্ট হইয়া এবং অন্নাভাবে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া লোপ পাইয়াছে। নিম্নতম শ্রেণীর বহু জাতি হিন্দুত্বের কোন অধিকার ও উচ্চতর জাতির সহানুভূতি না পাইয়া—অস্পৃশ্যতার অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া, দলেদলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে—জলকষ্টের দিনে, দুর্ভিক্ষের দিনে, পেটের দায়ে কত নীচ জাতি যে মুসলমান হইয়াছে তাহারি বা ইয়ত্তা কি? হিন্দুসমাজে যাহারা কুকুর শিয়াল অপেক্ষাও হেয়—তাহারা কল্‌মা পড়িলেই যদি সঙ্গে সঙ্গে শেখ সৈয়দের সমান অধিকার লাভ করিয়া মস্‌জিদে পাশাপাশি নমাজ করিতে পায়—তবে তাহাদিগকে বারণ করিবে কে? আজ্‌কে যে বাংলা দেশে শতকরা ৫৫ মুসলমান—শুধু জনবলে বলীয়ান হইয়াই হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করিতেছে তাহারা যে আজ শত শত বর্ষ ধরিয়া অধ্যুষিত হিন্দুর পুর জনপদ হইতে তাহাদিগকে বিতাড়ন করিতে উদ্যত—এর জন্য দায়ী কে? তাহাদের শতকরা পাঁচজনও ত ইরাণ তুরাণ আরব পারস্য হইতে আসে নাই। তাই আজি যোগীন বাবুর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—'হিন্দুর দুর্গতি মূলে হিন্দুর দুর্ম্মতি।' কিন্তু তিনি আরো বলিয়াছেন—

'প্রায়শ্চিত্ত অন্তে দুঃখ দৈন্য হবে দূর।' সমাজের অভিভাবকগণ, জাত্যভিমানিগণ, আজ সেই প্রায়শ্চিত্ত কর। অভিমানের মূলে যদি উপযুক্ত ক্ষমতা থাকে তবে—নব্যস্মৃতি

রচনা কর। চাতুর্ব্বর্ণ্য যদি হিন্দুসমাজের রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য হয় তবে চাতুর্ব্বর্ণ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর। এই বিরাট জাতিকে শত শত খণ্ডে কেন ভাগ করিয়া রাখিয়াছ?

যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর, খণ্ড খণ্ড করি তারে তরিবে সাগর?

ব্রাহ্মণ, সত্য-সত্যই ব্রাহ্মণ হও—ব্রাহ্মণের মুখোস পরিয়া জগৎ ও জগদীশ্বরকে প্রতারণা করিও না—যদি ব্রাহ্মণত্বের মর্য্যাদা রাখিতে না পারো—অপরকে ঘৃণা করিওনা। দেশে ক্ষত্রিয়ের বড় প্রয়োজন—ক্ষত্রিয়দের খুঁজিয়া বাহির কর। বৈশ্যবৃত্তিকদিগকে বৈশ্যের মর্য্যাদা দাও—বনচারী গিরিচারী প্রতিবেশিগণকে শূদ্রের গৌরবও অন্ততঃ দাও। বিশ্বকর্ম্মা তাহাদের পিতা—প্রকৃতি দেবী তাহাদের মাতা। পতিতপাবন রামচন্দ্রের চরণরেণুর জন্য ঐ সকল বন্যজাতি শবরীর মত প্রতীক্ষা করিতেছে। কত একলব্য তাহাদের মধ্যে সাধনায় নিরত আছে—কত গুহক তোমাদের জন্য অর্ঘ্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছে—তোমাদের নরনারায়ণের মন্দির তাঁহারা মৃগনাভি গন্ধে ভরিয়া দিবে।

৭।৮ শত বৎসরে দেশের জীবন ধারার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে—মুসলমান সংঘর্ষের পর রঘুনন্দন নবস্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন—দেবীবর মেল বন্ধন করিয়াছিলেন—খ্রীষ্টান সংঘর্ষের পর আবার স্মৃতিসংহিতা—ও কুলপঞ্জিকা, স্বার্থের মসীতে নয়, সত্যের শশিসুধায় যুগোপযোগী করিয়া পুনর্লিখিত হউক। "দেশ কালাবস্থাদিভেদেন ধর্ম্মাণাং বহুবিধত্বং", একথা মনে রাখিতে হইবে, এই দেশব্যাপী গোলামীর যুগের জন্য, রেলষ্টীমার চঞ্চল দেশের জন্য, অন্নদায়ে বিব্রত জাতির জন্য নূতন স্মার্ত্ত চাই। যাহারা পুরুষানুক্রমিক জড়তা, মূঢ়তা, উদরসর্ব্বস্বতা, হীন উঞ্ছবৃত্তি, অনাচার ব্যভিচার বা ম্লেচ্ছাচার ইত্যাদির জন্য স্বস্ব জাতিবর্ণ নির্দ্দিষ্টকর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে নূতন বিধানে তাহাদিগকে অথবা জাতিমর্য্যাদার বিড়ম্বনা ও উপহাসের হস্ত হইতে অব্যাহতি দাও। যুগপাবন ঋষিজীবন যাপন করিয়াও যদি মহাত্মা গান্ধি শূদ্রই থাকিয়া যান—আর চরিত্রহীন নিরক্ষর পাচক জনার্দ্দন মিশ্রের পক্ক অন্নকেই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র মনে কর—তবে হিন্দুগণের সংঘবদ্ধতা সুদূরপরাহত। অসত্যাচার ও অবিচার সকল মিলনবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেয়।

নবযুগের বর্ণবিচারে মনে রাখিতে হইবে—

"বিপ্রাঃ শূদ্রসমাস্তাবৎ বিজ্ঞেয়াস্তু বিচক্ষণৈঃ। যাবদ্বেদে ন জায়ন্তে দ্বিজা জ্ঞেয়াস্তু তৎপরং॥"

"ন কুলেন ন জাত্যা বা ক্রিয়াভির্ব্রাহ্মণোভবেৎ। চণ্ডালোঽপি হি বৃত্তস্থো ব্রাহ্মণঃ স যুধিষ্ঠির!"

মনে রাখিতে হইবে মনুর উক্তি—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।

ক্রিয়াগুণে শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে—ক্রিয়াবৈগুণ্যে ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া যায়। ব্রাহ্মণের লক্ষণগুলির কথাও মনে রাখিতে হইবে—

"যোগস্তপো দমোদানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা। বিদ্যাবিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণ লক্ষণং॥"

এ লক্ষণ যে কোন জাতির যে কোন ব্যক্তির মধ্যে থাকিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিয়া লইতে হইবে, কেননা—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত।

মনুর আর একটি কথা ও মনে রাখিতে হইবে। সত্যামৃত বা বাণিজ্য, প্রমৃত বা কৃষিকার্য্য,—শ্ববৃত্তি বা চাকুরী হইতে শ্রেষ্ঠতর জীবন যাত্রার উপায়। ব্রাহ্মণ ভিক্ষাও করিতে পারেন, কিন্তু কদাপি শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন না।

যুদ্ধের জন্য, ব্যবসায়বাণিজ্যের জন্য, উচ্চতর শিক্ষাদীক্ষার জন্য যাহারা সমুদ্র যাত্রা করিয়া বিধর্ম্মীর সংসর্গে বাস করিয়াছে জাতিস্তরে তাহাদের একটা স্থান নির্দ্দেশ কর—তাহাদিগকে আমরা ত্যাগ করিতে পারি না—তাহাদের মধ্যে অনেকেই দেশের গৌরব। যাহারা অন্য সমাজ হইতে হিন্দু সমাজে আসিতে চায়—নববিধানে তাহাদেরো যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ কর—তাহারা আমাদের বলবৃদ্ধি করিবে—তাহাদিগকেও আমরা চাই। যাহারা দেশের জন্য কারাবরণ করিয়াছে—দেশের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া প্রাচীন ব্রাহ্মণের মত দারিদ্র্য বরণ করিয়াছে—ভারতের প্রাচীন ত্যাগমহিমার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাঁহাদিগকে জাতিস্তরে কোথায় ঠাঁই দিবে? নূতন করিয়া উদ্বাহতত্ত্ব রচনা কর—নূতন প্রায়শ্চিত্তবিবেকও প্রণয়ন কর। তোমার শাস্ত্রে সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে—যুগবিপর্য্যয়ে নব নব অপরাধে আমরা অপরাধী—আমাদিগকে চিরদিন অপরাধের বোঝা বহিতে বাধ্য করিও না—আমরা শুদ্ধি চাই—কোন্ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত স্পষ্ট করিয়া বল।

এই দুর্দ্দিনে যাহারা প্রাণ দিয়া মন্দির রক্ষা করিবে—মন্দিরেও তাহাদিগকে প্রবেশের অধিকার দিতে হইবে—দয়া করিয়া নয়—দায়ে পড়িয়া নয়—তাহাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় মনে করিয়া। যাহারা তোমার কন্যাবধূর সতীমর্য্যাদা রক্ষা করিবে—বিপন্ন হইয়া যাহাদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে—তাহাদের অন্ন গ্রহণ কর,—দায়ে পড়িয়া নয়—তুচ্ছ কৃতজ্ঞতার জন্য নহে—তাহাদিগকে প্রকৃত 'বীরবর্ণ' মনে করিয়া। যাহাদের ত্যাগে, কৃচ্ছ্রব্রতে, কঠোর সাধনায় জ্ঞানপ্রভাবে দেশে নব চৈতন্য জাগ্রত হইয়াছে—ভ্রান্তসংস্কারের কুহেলিকা ভেদ করিয়া সত্যের উদয় হইতেছে—তাঁহাদের চরণে প্রণত হও—সুলভ ভক্তির অভিনয় করিতে নয়—তাহাদিগকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ মনে করিয়া। এই দরিদ্র দেশে যাহারা কঠিন সাধনায় ধনবল বৃদ্ধি করিতেছে

তাহাদিগকেও শ্রদ্ধা কর—কিছু প্রাপ্তির লোভে নহে—কাঞ্চনকৌলিন্যের জন্য নহে—প্রকৃত বৈশ্য বলিয়া। এমনি করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর।

সহস্র বৎসর পূর্ব্বের শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যদি তুমি জাত্যুন্মাদ চালাও, তবে মুসলমানের ধর্ম্মোন্মাদকেও তুমি নিন্দা করিতে পারোনা—তাহারাও সহস্র বৎসর পূর্ব্বের শাস্ত্রকেই অনুসরণ করিতেছে। যে কারণে উহাদের ধর্ম্মোন্মাদ যুগধর্ম্মোপযোগী নহে—ঠিক সেই কারণেই তোমারও জাত্যুন্মাদ যুগোপযোগী নহে। উহাদের ধর্ম্মোন্মাদে যদি অসত্য থাকে তোমাদের জাত্যুন্মাদেও অসত্য আছে। উহাদের স্বধর্ম্মীদের সহিত ব্যবহারে—যে উদারতা ও মনস্বিতা আছে—তাহা তোমার নাই—তাই তুমি দুর্ব্বল—তাহারা ঐক্য বন্ধনে সবল।

যুগে যুগে ভগবানের বাণী কবির কণ্ঠকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বে ঘোষিত হয়—এযুগের মহাকবির বাণীকেই ভগবানের অনুশাসন মনে করিতে হইবে—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

* * * *

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে,
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
শতেক শতাব্দী ধরে' নামে শিরে অসম্মান ভার
মানুষের নারায়ণে তবুও করনা নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।
দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে,
সবারে না যদি ডাক এখনো সরিয়া থাক
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যুমাঝে হবে শেষে চিতাভস্মে সবার সমান।"

শ্রীকালিদাস রায়

ভুলে গেছি প্রিয়া

ভুলে গেছি প্রিয়া।
স্মৃতির মর্ম্মর তাজ এতদিনে হোলো চুরমার,
চক্ষে আর নাই অশ্রু বক্ষে আর নাই হাহাকার,
দীর্ঘশ্বাস গিয়াছে থামিয়া।
নয়নের অবিশ্রান্ত ধারা
জীবনের মরুপথে কোন কালে হয়ে গেছে হারা।
নির্ব্বাপিত অন্তরের তলে
অগ্নিস্রাবী এট্‌নার অনল প্রবাহ আর নাহি চলে।

মনে হোতো আগে—
প্রেমের অম্লান জ্যোতি জন্মান্তেও হবেনা মলিন,
এ চির বিরহ ব্যথা প্রাণে লেগে রবে চিরদিন
চির প্রেম চির অনুরাগে!
ফুলে আর রবেনা সুরভি,
চাঁদ নিভে যাবে, আলো দেবেনাক আকাশের রবি,
বাতাস সে মরে যাবে কেঁদে,
সঙ্গীতের হবে কণ্ঠরোধ, ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি যাবে বেধে।

কতদিন সখি,
সোহাগে শপথ করি বলিয়াছি পড়িতেছে মনে—
তোমারি তোমারি আমি ভুলিব না জীবনে মরণে,
"এত প্রেম এতটা ভাল কি?"—
সকৌতুকে কয়েছিলে তুমি
তব মুগ্ধ প্রণয়ীর নিরুত্তর ওষ্ঠ দুটি চুমি।
সেই প্রেম কোথা গেল আজ?
প্রাণহীন প্রণয়ের বিশীর্ণ কঙ্কাল হানিতেছে লাজ।

কে জানিত হায়—
প্রেম শুধু দু দণ্ডের আলাপন—চকিতের নেশা,
ক্ষণিকের চিত্তভ্রান্তি—হাসি খেলা মেলা আর মেশা
যৌবনের সমুদ্র বেলায়!
অকস্মাৎ স্বপ্ন যায় টুটে,
নগ্ন মূর্ত্তি প্রণয়ের হি হি করে ব্যঙ্গ করে' উঠে
কয়—আমি চেয়ে দেখ দেখি
রূপের লালসা মাত্র—ইন্দ্রিয় বিকার—আগাগোড়া মেকি।

কি দারুণ কথা!
শিহরিয়া মরি ত্রাসে জীবনের ভিত্তি নড়ে ওঠে,
সৃষ্টির শিকড় ঘেঁসে পড়ে টান—থাকেনাক মোটে
ঈশ্বরে বিশ্বাস নির্ভরতা!
এ বিরাট জগতের মেলা
মনে হয় প্রহসন—জড়াণুর সমষ্টির খেলা;
যাহা কিছু করি অনুভব
—স্নায়ুর কম্পন মাত্র শুধু—দয়া মায়া স্নেহ প্রেম সব!

মর্ম্মস্থল থেকে
ক্ষুব্ধ অন্তরাত্মা মোর আশ্বাসিয়া আশ্বাসিয়া কয়—
ওরে ভীরু অবিশ্বাসী জানিসনে প্রেম মৃত্যুঞ্জয়?
বারে বারে বলে ডেকে ডেকে—
এ বিপুল জগতের হাটে
একটিও কাণা কড়ি মারা কভু যাবেনাক মাঠে!
মিছে কেন পাস তুই ভয়?—
ক্ষুব্ধ অন্তরাত্মা মোরে আশ্বাসিয়া আশ্বাসিয়া কয়!

ওগো মোর প্রিয়া,
প্রবোধ মানেনা মন স্তোকবাক্যে বৃথা সান্ত্বনার,
সন্দেহ-বিক্ষিপ্ত চিত্ত—মসীলিপ্ত গাঢ় অন্ধকার
হৃদয়ের সমস্ত ব্যাপিয়া।
তুমি আছ কিনা আছ—তাই
বুঝিতে পারি না, শুধু ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশে তাকাই।
সুদূর নক্ষত্র লোকে কোন্
পেতেছ খেলার ঘর হয়তো বা তুমি সম্পূর্ণ নূতন।

একবার কাছে
তেমনি হাসিটি হেসে ভালোবেসে এসো মোর প্রিয়া!
একবার দেখা দিয়ে দেখে যাও নিজ আঁখি দিয়া
কী বেদনা বুকে রহিয়াছে!
কই ব্যথা? কিছুই ত নাই!
আগুন সে নিভে গেছে—পড়ে আছে কেবলি যে ছাই!
বারে বারে ডাকিতেছি কারে?
আমার পূর্ণিমা চাঁদ সেকি ডুবে গেছে চির অন্ধকারে?

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট

—মারো মারো—

—আবার কি হোলো ?

—দেখ দেখ লোকটাকে মেরে ফেল্লে বুঝি !

—একটা মোছলমান শহীদ হোলো বোধ হয়।

গোলমাল শুনে ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে জান্‌তে পারলুম আমাদের কয়লা-ওয়ালাটাকে দাঁ-দের দরোয়ানেরা মেরে ফেল্লে। লোকটা নাকি আজ পনেরো বচ্ছর ধরে মুসলমানত্ব গোপন কোরে এ পাড়ায় কয়লা ফিরি কোরে বেড়াচ্ছিল। আজ সকালে হঠাৎ কি কোরে তার স্বরূপ প্রকাশ হোয়ে পড়ায় সঙ্গে-সঙ্গে তার বিচার ও সাজা হোয়ে গেল।

সকাল-বেলা উঠেই মেজাজটা খারাপ হোয়ে গেল। হাঙ্গামার আতঙ্কে সারারাত্রি ঘুম হয় না। রাত্রি তিনটে অবধি বাঁটুল হাতে ছাতে ঘুরে বাড়ী পাহারা দিই, দূরে গোলমাল শুন্‌তে পেলে সেই দিক লক্ষ্য কোরে কল্পিত শত্রুর উদ্দেশ্যে গুল্‌তি ছাড়ি। চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীতে বন্দী, দিনের-বেলাতেও বেরুবার যো নেই। কি জানি কোন্ গলি-ঘুঁজির মধ্যে ছোরা নিয়ে মুসলমান লুকিয়ে আছে। জান্‌তে পারবার আগেই হয়ত রপ্তানি হোয়ে যাব।

খবরের কাগজ ওল্টাতে লাগ্‌লুম। তিনজন হিন্দুস্থানী গ্যাঁড়াতলার পথ দিয়ে জাহান্নমে চলে গিয়েছে, সাতজন মুসলমান শহীদ হয়েছে। দু-জন মাড়োয়ারীর ঘৃতপুষ্ট ভুঁড়ির দফা কাবার। পা পিছ্‌লে পড়ে গিয়ে একজন বাঙালী বিশেষ আহত হয়েছে, তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—ইত্যাদি পড়তে-পড়তে মগজের মধ্যে যুদ্ধের বাজনা বেশ জমে উঠেছে এমন সময় মেয়ে আমার নাচ্‌তে-নাচ্‌তে এসে প্রশ্ন করলে—হ্যাঁ বাবা, ধনাঢ্য মানে নাকি মাড়োয়ারী ?

জিজ্ঞাসা করলুম—এ সন্ধানটী তোমায় দিলে কে ?

মেয়ে একটু অপ্রস্তুত হোয়ে বল্লে—কাকা।

দিন তিনেক আগে ভায়া আমাকে কেন যে 'কিণ্ডার গার্টেন' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিল এবার তার কারণ বুঝতে পারলুম। মেয়েকে বল্লুম—যা তোর বই নিয়ে আয়, দেখি কেমন পড়াশুনো হচ্ছে।

যাক্, তবু একটা কাজ পাওয়া গেল মনে কোরে মহা উৎসাহে মেয়েকে পড়াতে সুরু করলুম বটে কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলুম কাজটা মোটেই সুখকর নয়। কি কোরে নিজের রচিত এই ফাঁদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় তার উপায় উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করছি এমন সময় ছোট ভাই মণি মুখ শুকিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বল্লে—মেজ্‌দা, একটা মোচলমান তোমায় ডাক্‌ছে।

—এ্যাঁ মোচলমান!

—হ্যাঁ।

—কি রকম দেখতে, ষণ্ডা মতন লুঙ্গি পরা?

—না ইজের আচকান পরা।

—ছোরা-টোরা হাতে আছে দেখ্‌লি?

—না তা দেখি-নি, তবে আচকানের ভেতর কোমরের কাছে কি যেন একটা উঁচু হোয়ে আছে বলে মনে হোলো।

মেয়ে আমার এই অবসরে উঠে পালিয়েছিল তাই নিঃসঙ্কোচে বলে দিলুম—বলে দে বাড়ী নেই।

ভায়া একটু কাঁচুমাচু হোয়ে বল্লে—আমি যে তাকে বলেছি তুমি বাড়ীতে আছ। সে বৈঠকখানায় বসেছে।

—বেশ করেছ—এখন কি করা যায়!

আমায় চিন্তিত দেখে ভায়া প্রস্তাব করলে—গজেন-দার বাড়ী থেকে রিভলভারটা চেয়ে আন্‌ব?

ততক্ষণে আমি একটু সাহস সঞ্চয় কোরে নিয়েছিলুম। ভায়াকে আশ্বস্ত কোরে নীচে নেমে পড়লুম।

আমাদের পাড়াটাকে হিন্দু-কেল্লা বলা চলে। এখানে গাজী হবার আশায় কোনো মুসলমান এসে বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। ভরসা কোরে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি—আরে সখায়ৎ মিয়া যে! কি খবর?

সখায়ৎ বল্লে—মাণিকতলার বাজারে মুসলমানদের ঢুক্‌তে দিচ্ছে না, তাই তোমাদের পাড়ায় গোস্ত্‌ কিনতে এসেছিলুম। তোমার সঙ্গে দেখা কোরে গেলুম, ফুফা মিয়া তোমায় সেলাম জানিয়েছেন।

সখায়তের ফুফা মিয়া ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত বাজিয়ে। তাঁরা পশ্চিমে মুসলমান, আমরা তাঁর শিষ্য তিনি আমাদের ওস্তাদ। এই দুর্দ্দিনে ওস্তাদ কেন স্মরণ করেছেন বুঝতে পারলুম না। সখায়তকে বল্লুম—ওস্তাদকে আমার সেলাম্‌ জানিও, সুবিধা করতে পারলেই তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌ব।

দিন দুয়েক পরে সন্ধ্যার ঝোঁকে একদিন ওস্তাদজীকে গিয়ে সেলাম দেওয়া গেল। তাঁকে ঘিরে জনকয়েক সাক্‌রেদ বসে আছে, তারা সকলেই হিন্দু। নানারকম আলোচনা চল্‌ছে। জিজ্ঞাসা করলুম—ওস্তাদ কেমন আছেন?

খাঁ সাহেব বল্লেন—শরীর ভারি খারাপ। তোমায় ডেকেছিলুম একটা কাজের জন্য।

এই যে হিন্দুরা এমন কোরে মুসলমানদের মার্‌ছে, মসজিদ ভেঙে দিচ্ছে—খবরের কাগজে একটা চিঠি লিখে হিন্দুদের এই অত্যাচার থামিয়ে দিতে পার না।

কয়েকজন অপরিচিত লোকও সেখানে বসেছিল, তারা সম্ভ্রমের সঙ্গে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারা হয়ত মনে করলে যে, আমার একটু কলমের খোঁচার ওপর এত বড় হাঙ্গামাটা থামা না-থামা সব নির্ভর করছে।

গম্ভীরভাবে আসন নিয়ে বল্লুম—এখন চিঠি লিখ্‌লে কি আর হিন্দুরা মার থামাবে, মুসলমানেরা যে আগে মার সুরু করেছে, মন্দির ভেঙেছে আর এখনো মারছে।

খাঁ সাহেব তামাক টান্‌তে-টান্‌তে বল্লেন—আরে সে কথা ছেড়ে দাও। হিন্দুরা যে এই অন্যায় কর্‌ছে—

এই অবধি বলেই খাঁ সাহেব কাশতে আরম্ভ করলেন। কাশি থাম্‌লে একটু দম নিয়ে বল্লেন—কদিন খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচারে শরীরটা একদম গিয়েছে।

একজন শিষ্য বল্লেন—খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার কেন করেন? এখন একটু বুঝে চল্‌তে হয়—

খাঁ সাহেব একটু উত্তেজিত হোয়ে বল্লেন—তোমরা বুঝে চল্‌তে দিচ্ছ কোথায় বাপু? এই যে চারদিন বাজারে একেবারে গোস্ত্‌ পাওয়া গেল না—

আমি বল্লুম—ওস্তাদ, বাজারে মাছ তো পাওয়া যাচ্ছে—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে খাঁ সাহেব বল্লেন—মাছ! মছ্‌লি? লাহুল্লাল্লা। এই মাছ খেয়েই তো আমার এই অবস্থা হয়েছে। মাছ কি একটা খাবার জিনিষ?

মাছের মতন এমন নিরীহ জীবের ওপর এতখানি খাপ্পা হবার কি কারণ থাক্‌তে পারে আমরা তা অনুমান করতে পারলুম না। ইত্যবসরে ওস্তাদ গড়গড়ায় দুটি দম লাগিয়ে বলতে লাগ্‌লেন—তাজ্জব এই যে, হিন্দুরা এত লেখাপড়া শিখে লায়েক হয় কিন্তু আল্লার ইসারা তারা মোটেই বুঝতে পারে না। আরে এটা বুঝতে পারিস্‌ না যে, খোদা জমির ওপর এত জায়গা থাক্‌তে মাছের বাসস্থান নির্দ্দেশ করলেন কিনা জলের মধ্যে। মাছ অতি গরম জিনিষ, এত গরম যে মানুষের অখাদ্য। দেখ না দিনরাত তারা জলের মধ্যে বাস করে কিন্তু মাছের সর্দ্দি হোতে কেউ কখনো দেখেছ? হিন্দুরা সেই সাংঘাতিক জিনিষকে জল থেকে তুলে এনে তাতে রাজ্যের গরম মশলা দিয়ে রোজ খাবে। শুধু তাই নয়, এই মাছ নিয়ে হিন্দুরা একটা শাস্তর পর্য্যন্ত লিখেছে। এই সবের জন্যই-তো বেহেস্তে হিন্দুর স্থান নেই।

ওস্তাদকে ঘিরে আমরা যে ক'জন মাছ-খোর হিন্দু বসেছিলুম তাদের পক্ষে এটা

বিশেষ গুরুপাক বলে বোধ হোলো না। কিন্তু হিন্দুস্থানী সীতারাম কথাটা হজম করতে পারলে না। সে বল্লে— খাঁ সাহেব মাছের চেয়ে মাংস তো আরও বেশী গরম—

খাঁ সাহেব এবার নল্‌চে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন— কে বল্লে। এমন কথা কে বলে? আরে, সামান্য বুদ্ধি দিয়েই দেখ না—বক্‌রী, সে জমিনের ওপর চরে বেড়ায়, খাদ্য তার ঘাস। তার মাংস কখনো গরম হোতে পারে? এই জন্যই তো মাংস রাঁধ্‌তে এত গরম-গরম মশলার প্রয়োজন। একদিন মাংস শুধু সিদ্ধ কোরে খাও দিকি? দেখ্‌বে সর্দ্দিতে ফুসফুস ভরে উঠ্‌বে।

এমন অকাট্য যুক্তির কাছে সীতারামও হার মান্‌লে। খাঁ সাহেব পরম নিশ্চিন্তমনে তামাক টান্‌তে-টান্‌তে ক্ষিতীশকে বল্লেন—এই ক্ষতীস্ বাজাও।

ক্ষিতীশ কোণ থেকে সেতারটা নামিয়ে সুর বাঁধ্‌তে লাগ্‌ল। ঠিক সেই সময় বাইরে আবার গোল সুরু হোলো—মারো মারো—

আসরের সবাই উঠে দাঁড়াল। কেউ-কেউ ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। কেউ বা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গলাটা যতদূর সম্ভব লম্বা কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। খাঁ সাহেব কেয়া আফৎ—বলে চোখ দুটো বিস্ফারিত কোরে বসে রইলেন। একটু পরে শ্যাম এসে খবর দিলে—একজনকে ছুরি মেরেছে।

সকলে সমস্বরে প্রশ্ন—হিঁদু না মোচলমান?

—হিন্দু।

—এঁ্যা হিন্দুকে মার্‌লে পাড়ার ভেতরে!

খাঁ সাহেব সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন—আরে যানে দেও, জাহান্নমমে গিয়া।

কথাগুলো গুরুপাক হোলেও যারা মাছ খায় তারা কোনো রকমে হজম কোরে ফেল্লে কিন্তু নিরামিষাশী সীতারামের তা সহ্য হোলো না। সে একটু ঝাঁজের সঙ্গে বল্লে—হিন্দু মর্‌লেই জাহান্নম আর মুসলমান মর্‌লেই বেহেস্ত, কি বলেন ওস্তাদ?

ওস্তাদ বল্লেন—বেশখ্ অর্থাৎ নিশ্চয়ই, এ বিষয়ে কি কিছু সন্দেহ আছে।

সীতারাম বল্লে—বা রে বেশ মজার কথা তো?

খাঁ সাহেব বল্লেন—সীতারাম তুমি ছেলেমানুষ, এ সব কথা নিয়ে তর্ক কোরো না। এর পরীক্ষা হোয়ে গেছে, প্রমাণ হোয়ে গেছে। এ নিয়ে কোনো প্রশ্নই এখন আর উঠ্‌তে পারে না।

সীতারাম এটোয়ার ব্রাহ্মণ। তার শাস্ত্রে লেখে ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ বেহেস্তে যেতে পারে না। খাঁ সাহেবের বাড়ী থেকে ফিরে গিয়ে একঘণ্টা ধরে সে স্নান করে, সে অত সহজে ছাড়্‌বে কেন? সে বলে ফেল্লে—এ সব আপনার গা-জুরী কথা। এ আমি মানতে রাজী নই। খাঁ সাহেব একবার গলা খাঁক্‌রী দিয়ে বল্লেন—শুন্‌বে তবে?

আমরা সবাই বল্লুম—ওস্তাদ বলুন, শোনা যাক্।

হরিহর এতক্ষণ দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে আফিংয়ের মৌজে বেহেস্তের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, খাস বেহেস্তের কথা উঠ্‌তে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে এগিয়ে এসে বস্‌ল। খাঁ সাহেব একবার উঠে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলেন আশে-পাশে বেহেস্তের কোনো দালাল লুকিয়ে আছে কিনা। তারপর নিশ্চিন্ত হোয়ে স্থরু করলেন।

বেশী দিনের কথা নয়। কলকাতায় আসবার পাঁচ কি ছয় বছর আগে হবে—তখন আমরা লক্ষ্ণৌয়ে থাকি। গোমতীর ধারে আমাদের বাড়ী। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনে বাড়ী একেবারে জম্‌জম্। বাবার অনেক সাধু সন্ন্যাসী, ফকির বন্ধু ছিলেন। তাঁরা রোজ আসতেন, জল্‌সা হোতো। বেশ চল্‌ছিল, এমন সময় একদিন হিন্দু মুসলমানে লাগ্‌ল ফাটাফাটি। একদিন, ঠিক এই রকম আর কি! চারিদিকে দাঙ্গা চলেছে, আমাদের বৈঠকখানায় আমি আছি, বাবা আছেন, আর আছেন এক ফকির আর এক সাধু। ফকির সাহেব আর স্বামিজী দুজনেই সাধক, এক কথায় তাঁরা দুজনেই ছিলেন উঁচুদরের বজ্‌রুগ। আজ যেমন আমাদের তর্ক বেধেছে, সেদিনও এম্‌নিধারা বেহেস্তের কথা হোতে-হোতে স্বামিজী আর ফকির সাহেবে লেগে গেল তর্ক। ফকির সাহেব স্বামীজীকে বল্লেন—তুমি সাধক লোক তা আমি স্বীকার করছি, কিন্তু বেহেস্তে তোমার স্থান নেই।

দুইজনে এই নিয়ে তুমুল তর্ক। শেষকালে আমার বাবা বল্লেন—আপনারা ক্ষান্ত হোন, এ নিয়ে তর্ক কোরে কোন লাভ নেই, কারণ এ কথার প্রমাণ এখানে হোতে পারে না।

ফকির সাহেব বল্লেন—এখুনি এর পরীক্ষা হোয়ে যেতে পারে।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—কি কোরে?

ফকির সাহেব বল্লেন—আমরা দুজনে এখুনি এই দেহ ছেড়ে চলে যাব। যে বেহেস্ত থেকে সেখানকার প্রধান ফল আনার নিয়ে আস্‌তে পারবে, বুঝতে হবে সে-ই সেখানে গিয়েছিল।

ফকির সাহেবের প্রস্তাব শুনে আমি তো স্তম্ভিত। কিন্তু বাবা দেখলুম কিছুমাত্র ভড়্‌কালেন না। তিনি এ-সব ব্যাপার এর আগে ঢের দেখেছেন কিনা। তিনি বল্লেন—খয়ের্—এ অতি উত্তম প্রস্তাব।

ফকির সাহেব আর স্বামিজী দুজনে প্রস্তুত হলেন। সাধু আসনপিঁড়ি হোয়ে ধ্যানস্থ হলেন আর ফকির সাহেব একটি ছোট মাদুর পেতে সেখানে নেমাজী-বৈঠক স্থরু কোরে দিলেন। তারপরে——ইয়া বিস্‌মিল্লা!—এই বলে ওস্তাদজী বাঁ হাতের তাবিজটাকে ডান হাতের দুই আঙুল দিয়ে চেপে ধরে বিড়্-বিড়্ কোরে কি মন্ত্র আওড়াতে লাগ্‌লেন।

আমরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম—তারপর কি হোলো ওস্তাদ?

খাঁ সাহেব চক্ষু মেলে চারিদিকে চেয়ে অতি মৃদুভাবে বল্‌তে লাগ্‌লেন—তারপরে দেখতে

দেখতে ফকির আর সাধু দুজনের দেহ হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেল। যেখানে সাধু বসেছিলেন সেখানে শুধু তাঁর লেংটি আর ফকিরের মাদুরে তাঁর আলখাল্লাটি পড়ে রইল।

ব্যাপার দেখে আমরা বাপ-বেটায় জড়াজড়ি কোরে কোণ্‌ঠাসা হোয়ে বসে রইলুম। একঘণ্টা, দুঘণ্টা, তিন ঘণ্টা চলে গেল ফকির কিংবা সাধু কারুরই দেখা নেই। শেষকালে রাত যখন কাবার হয়-হয়, সেই সময় দেখা গেল সাধুর ন্যাঙট্ আর ফকিরের আলখাল্লা ভরে উঠ্‌ছে। দেখতে-দেখতে দুজনেই এসে হাজির হলেন, দুজনের হাতে দুই আনার। সে আনারের যেমন রং তেম্‌নি তার আকৃতি আর তেম্‌নি তার খোশ্‌বু। আমাদের সমস্ত মহল্লাটা আনারের খোশ্‌বুতে ভরপুর হোয়ে উঠ্‌ল। সাধু তাঁর আনারটি বাবার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন—খেয়ে দেখ খাঁ সাহেব।

বাবা সে আনার ভেঙে একটি কোরে দানা সবার হাতে দিলেন। আহা হা হা, শোভনাল্লা! কি তার আস্বাদন। জীবনে এমন আনার কখনো খাইনি। বাবা স্বামিজীর তারিফ কোরে বল্লেন—মাশাল্লা সাধুজী, আল্লা তোমার তন্ দুরস্ত্ রাখুন, আজ তুমি যা খাওয়ালে জীবনে ভুল্‌ব না।

তারপরে ফকির সাহেব তাঁর আনারটি বাবার হাতে তুলে দিলেন। এ আনারটি সাধুর আনারের চাইতে কিছু বড় হবে। তা হোক্, গাছের সব ফল আকারে সমান হয় না, তার জন্য কিছু আসে যায় না। বাবা আস্তে-আস্তে আনারটি ভাঙ্‌লেন। তোমাদের কি বল্‌ব, তোমরা সাকরেদ ছেলের মতন। কি বল্‌ব—হাজার মৃগনাভির ছাল একসঙ্গে ছাড়িয়ে ফেল্লে যে রকম গন্ধ বেরোয় সেই রকম গন্ধে বোধ হয় দশ মাইল জায়গা আমোদিত হোয়ে গেল। তারপরে একটি দানা মুখে দেওয়া গেল। সাধুর আনার সু-তার বটে কিন্তু এ আনারের তুলনা নেই। সাধুকে পর্য্যন্ত সে কথা স্বীকার করতে হোলো।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—সাধুজী এর অর্থ কি?

সাধুজী ঘাড় নীচু কোরে বসেছিলেন, তিনি মুখ তুলে বল্লেন—আপনাদের কি বল্‌ব, আমার এতকালের সাধনা সবই বৃথা হয়েছে। সত্য কথা বল্‌তে কি আমি যখন বেহেস্তের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম তারা আমায় ভেতরে ঢুক্‌তে দিলে না। তারা বল্লে—তুমি সাধু লোক, তুমি এখানে ঢুক্‌লে আমাদের সাজা হবে। আমি অনেক অনুনয় করলুম কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। মনের দুঃখে সেখান থেকে ফিরে আস্‌ছি এমন সময় পথে যেন কে আমার নাম ধরে ডাক্‌লে। ফিরে দেখি আমার ছেলেবেলাকার এক বন্ধু। ইহলোকে তার নাম ছিল আব্বাস। জিজ্ঞাসা করলুম—কি রে আব্বাস, কবে এলি এখানে, কি কচ্ছিস্ কেমন আছিস?

আব্বাস বল্লে—এসেছি তো প্রায় বিশ বছর। আমি বেশ আছি, বেহেস্তের গ্যাঁড়া-তলার সর্দ্দার হয়েছি। তারপর তুমি যে এখানে?

আব্বাসকে সব কথা খুলে বল্লুম। সে বল্লে—আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি আমি যদি কিছু করতে পারি।

আমাকে সেইখানে দাঁড় করিয়ে রেখে আব্বাস চলে গেল। তারপর কিছুক্ষণ বাদেই এই আনারটা সে আমায় এনে দিলে।

এই বলে সাধু কাঁদতে লাগ্‌লেন। ফকির বল্লেন—এ আনারও বেহেস্তেরই বটে কিন্তু সেখানে এই আনার গাছ দিয়ে বাগানের বেড়া দেওয়া হয়। বেড়ার আনারের চেয়ে খাস্ বাগানের আনার ভাল তো হবেই।

সাধুজী তখুনি হিন্দুয়ানীতে তোবা কোরে ফকির সাহেবের কাছে কল্‌মা পড়ে মুসলমান হোয়ে পড়লেন।

এই অবধি বলে খাঁ সাহেব তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তামাক টান্‌তে লাগ্‌লেন। হরিহর একটু এগিয়ে এসে বল্লে—খাঁ সাহেব, এর পরের ঘটনাটুকু আরও আশ্চর্য্য। আপনি জানেন না?

হরিহর ছিল সংসারত্যাগী। তার ওপরে সে হিপ্‌নটিজ্‌ম্ জান্‌ত। খাঁ সাহেব দু-একবার তার ক্রিয়া-কলাপ দেখে তার ভারী ভক্ত হোয়ে পড়েছিলেন এবং মনে-মনে তাকেও একজন উঁচুদরের বজ্‌রুগ বলে মনে করতেন। হরিহরের কথা শুনে তিনি বল্লেন—না, তারপরে কি হোলো তুমি জান নাকি?

হরিহর বল্লে—জানি, শুনুন তবে—

আপনাদের ওখানে যে মুসলমান হয়েছিল সে আমার গুরুভাই, আমরা এক ওস্তাদের সাক্‌রেদ। আমি তখন লক্ষ্ণৌ থেকে একটু দূরে নদীর ধারে এক নির্জ্জন জায়গায় ডেরা গেড়ে বসেছি। একদিন এক মুসলমান ফকির আমার আস্তানায় এসে দেখা দিলে। আমি তখন ধুনীর সামনে ধ্যানস্থ হোয়ে বসেছিলুম। ধ্যান ভাঙ্‌বার পর তার দিকে ভাল কোরে নজর কোরে দেখি—আরে তুই। তুই এমন আলখাল্লা পরেছিস্ কেন?

সে বল্লে—মুসলমান হয়েছি ভাই, ও তোর হিঁন্দুয়ানীতে কিছু নেই।

আমি বল্লুম—কেন। হিন্দুর শাস্ত্রেও তো মুরগী খাবার বিধান আছে—

আমার গুরুভাই কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—মুরগী নয় রে দাদা—আনার—আনার—

কোনো রকমে তাকে ঠাণ্ডা কোরে জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার কি বল দিকিন?

সে আমায় সমস্ত কথা খুলে বল্লে। তার কথা শুনে আমি বল্লুম—হতভাগা, গুরুর শিক্ষা একেবারে ভুলে গেছিস। বেহেস্তে তোকে ঢুক্‌তে দেবে কেন? সে যে আমাদের নরক রে। সেখানে কি সাধু সন্ন্যাসী যায়।

গুরুভাইয়ের এতক্ষণে দিব্যচক্ষু খুল্‌ল। সে বল্লে—তবে উপায়।

আমি বল্লুম—চল্ তোর সেই মুসলমান ফকিরের কাছে।

গুরুভাই আমায় সঙ্গে নিয়ে সেই ফকির সাহেবের কাছে গেল। ফকির সাহেব বড়

ভাল লোক, তিনি আমাদের খাতির কোরে বসালেন। আমি বল্লুম—ফকির সাহেব আমার বন্ধুকে সিঁধে লোক পেয়ে খুব দম্ লাগিয়েছ তো?

ফকির সাহেব বল্লেন—কেন?

আমি বল্লুম—বেহেস্ত যে আমাদের নরক, সেখানে তো সাধুকে ঢুক্‌তে দেবে না। আমাদের সাধুরা স্বর্গে যায়, নরকে তো যায় না। আর আনারের কথা কি বল্‌ছ সাহেব! আনার তো স্বর্গবাসীরা খায় না, অত বীচি যে ফলের সে ফল কি স্বর্গের লোকেরা খেতে পারে?

আনারের যুক্তিটা ফকির সাহেবের মনে লাগ্‌ল। বোঝ্‌দার লোক কিনা। তিনি বল্লেন—তবে বেহেস্তের আনার কি হয়?

আমি বল্লুম—হিন্দুদের বাড়ীতে যে সব গরু কষাইরাও কেনে না, একাদশী করতে-করতে মরে যায়, তারা সব স্বর্গে যায় কিনা, এই তাদের খাবারের জন্য বেহেস্তে আনারের চাষ হয়। কলকাতার লোকেদের জন্য যেমন ধাপার মাঠে তরকারীর চাষ হয়।

ফকির সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—তবে স্বর্গের ফল কি?

—অমৃত—আম। সেখানে এক রকম আঁটিহীন আম হয়, স্বর্গবাসীরা সেই আম খায়। আনার! আরে ছোঃ—!

ফকির বল্লেন—খাওয়াতে পার আমায় স্বর্গের অমৃত?

আমি বল্লুম—স্বর্গের আম তোমায় খাওয়াতে পারি, কিন্তু তার আগে তোমায় একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

ফকির জিজ্ঞাসা করলেন—কি প্রতিজ্ঞা?

স্বর্গের আম যদি বেহেস্তের আনারের চাইতে খেতে ভাল লাগে তা হোলে তোমায় হিন্দু হোতে হবে।

ফকির সাহেব বল্লেন—রাজী কিন্তু এখুনি প্রমাণ করতে হবে।

বেশ—বলে বন্ধুকে আবার আসনে বসিয়ে দেওয়া গেল। ঘণ্টাখানেক ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকার পর তিনি উঠে পড়লেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—কি হোলো?

তিনি বল্লেন—স্বর্গের দূতেরা বল্লে আলখাল্লা পরে ধ্যান করলে স্বর্গে ঢুক্‌তে দেবে না।

বন্ধু আলখাল্লা খুলে ফেলে লেংটি পরে আবার ধ্যানস্থ হলেন। এবার কিন্তু দেখতে দেখতে তাঁর দেহ হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল।

প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক পরে বন্ধু আমার একটি আম হাতে নিয়ে ফিরে এল। আহা হা হা! কি তার রূপ! খাঁ সাহেব এ তোমার তোব্‌ড়া-মুখো আনার নয়, এ একেবারে যৌবনের জোয়ারে পরিপূর্ণ, নিটোল। সে আমের রূপ দেখেই তো ফকিরের দশা লেগে

গেল। গুণী লোক কিনা, মাল দেখেই চিনে ফেলেছিল। তারপরে তাঁর চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে এনে একটি চাক্‌লা কেটে মুখে ফেলে দিলুম। ফকির তো খেয়ে একেবারে পাগল। বেহেস্তের আনার যে স্বর্গের গরুতে খায় এ সম্বন্ধে তাঁর আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না। সেই দিনই আমরা তাঁকে শুদ্ধি করিয়ে হিন্দু কোরে নিলুম। ফকির সাহেব প্রথমে আলখাল্লা ছেড়ে ন্যাঙ্‌ট পরতে রাজী হন্‌নি। অনেক বোঝানের পর আলখাল্লা ছাড়লেন বটে কিন্তু মুরগী হালাল করবার ছোরাটা আর কিছুতেই হাত-ছাড়া করতে রাজী হন্‌ না। শেষকালে তাঁকে হিন্দু চিম্‌টের ছুটো চারটে নিরুপদ্রব প্যাঁচ শিখিয়ে দিতে তিনি ছোরা ছেড়ে চিম্‌টেরই অনুরাগী হয়েছেন।

এই অবধি বলে হরিহর চুপ করলে। হিন্দুর অধিকার নিয়ে এই ঝগড়ার বাজারে হরিহর যে একজন মুসলমানকে শুদ্ধি করেছে সেজন্য তার প্রশংসায় আমাদের সবারই বুক ফুলে উঠ্‌ছিল কিন্তু অসৌজন্যের ভয়ে আমরা সবাই চুপ কোরে রইলুম।

হঠাৎ সেই স্তব্ধতা ভেদ কোরে খাঁ সাহেবের গড়গড়াটা একটি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালে—ঝুট্‌র্‌র্‌র্‌—বাৎ।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

সূর্য্য

জগৎ-জীবন, জগৎ-বিধাতা, প্রাণের উৎসসার,
দিনের দেবতা প্রাতঃসূর্য্য তোমারে নমস্কার।
যুগ-যুগ ধরি এমনি প্রভাতে আলোর খড়্গ নিয়া,
তমোদানবের বক্ষ-শোণিতে আকাশ সুরঞ্জিয়া
উদয়ের রথে তুমি উঠে আস বিজয়ী বীরের সম;
নিখিল ত্রাসের অন্তবিধাতা বার বার নমো নমঃ।

হে চিরনূতন, শঙ্কাহরণ দিনের অগ্রদূত!
অদ্ভুত তব লীলা কৌতুক! অদ্ভুত, অদ্ভুত!
রণ কি বিবাহ! চলেছ কোথায় সাতঘোড়া যোড়া রথে
পাখী গান গাওয়া, কুসুম ছড়ান, শিশির ছুলান পথে?
বুঝিতে না পারি, শুধু চেয়ে থাকি বিস্ময়ে মূক সম;
হে বীর, যোদ্ধা, বিচিত্রবাহু বার বার নমো নমঃ!

প্রভাতে তোমার প্রণয়মূর্ত্তি ওগো উষা সন্ধানী !
মধ্যন্দিনে পঞ্চবহ্নি তুমি মহাতপা জ্ঞানী ;
বেলা শেষ হলে তুমি সন্ন্যাসী গৈরিক বাস পরা,
কোথা হতে আস কেন চলে যাও কিছুই পড়ে না ধরা !
মহা সিন্ধুর বুক ছিঁড়ি আস, পুন তারি বুকে যাও ;
হে চির পথিক কারে খুঁজে ফের কোন হারানিধি চাও !

পদতলে তব বিপুলা ধরণী অরণ্য কুন্তলা,
সুজলা সুফলা, গীতিবিহ্বলা, চিরশ্যাম অঞ্চলা ;
জীবন মরণ জরা যৌবন দুঃখ সুখের গেহ,
লক্ষ যুগের প্রেম ভালবাসা, লক্ষ যুগের স্নেহ ;
তুমি তারি মাঝে প্রাণের উৎস, অমর অমৃতসার ;
হে দেব সবিতা, জগৎ-বিধাতা তোমারে নমস্কার !

তোমারে হেরেছে কবিকুলগুরু প্রথম তমসাকূলে,
তোমারে হেরেছে আফ্রিক কবি পিরামিড বেদীমূলে,
তোমারে হেরেছে লাল আমেরিক দূর নির্জ্জন বনে,
তোমারে হেরেছে কোরাণের ঋষি মরুভূমে গোচারণে।
হে নিখিল-স্তুত, পুণ্য পাবক, বিরাট, সত্ত্বসার,
দিনের দেবতা, প্রাতঃসূর্য্য তোমারে নমস্কার !

এস আজ প্রাতে—এখনও আঁধার হয়নি'ক অবসান,
তমোদৈত্যের বাহুবন্ধনে ধরণী ব্যথিত ম্লান,
আকাশ কাঁদিছে হুতাশে মেলিয়া লক্ষ নয়নতারা,
তোমার কমল মুদে আছে ওই ভয়ে লজ্জায় সারা।
এস নব বেশে হে প্রণয়ী বীর ! নির্ভয় বাণী কও ;
এস হে দিনেশ, দৈত্য বিঘাতা, ধরার প্রণাম লও।

ভাঙ-ভাঙ ঘুম—মরণের ছায়া—কর ভয় ভঞ্জন,
পাখী গেয়ে যাক্, নদী বহে যাক্ তুলি কল গুঞ্জন ;
প্রস্ফুট হ'ক রাতের কুঁড়িটি, পুষ্পিত হ'ক শাখী,
গৃহে কন্দরে যাহারা ঘুমায় লও তাহাদের ডাকি ;
জাগাও জগৎ, জাগাও জীবন হে নিখিল প্রাণসার !
দিনের দেবতা প্রাতঃসূর্য্য তোমারে নমস্কার !

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুস্থানী সঙ্গিতের ভবিষ্যৎ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ত্তমান ওস্তাদি-সঙ্গীতের আরও অনেক ত্রুটি আছে যেজন্য আমাদের উচ্চসঙ্গীতের আজ পদে পদে অঙ্গহানি হ'য়ে থাকে ও যেজন্য আমাদের সঙ্গীতকলার মধ্যে কোনও গভীর ও পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাবার আশা বহুদিন যাবৎ দুরাশায় পর্য্যবসিত হয়েছে। কিন্তু সে-সব ত্রুটি নিয়ে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করতে গেলে বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্যনিরূপণে perspective হারিয়ে বসবার ভয় আছে ব'লে আর ভূমিকা না ক'রে যেজন্য এ ত্রুটিগুলির আলোচনার অবতারণা সেই কথাটির অবতারণা করা দরকার মনে করছি।

কথাটা এই যে আমাদের ওস্তাদের গানে আজ যে কোনও সম্পূর্ণ ও সমাহিত রস পাওয়া যায় না তার কারণ এই যে তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে inevitabilityর (অনন্যসম্ভাবিতা) একটুও আমেজ থাকে না। এই কথাটা একটু বিশদ ক'রে বল্‌বার চেষ্টা করি।

সব মহান্ ললিত কলার মধ্যেই একটা inevitability থাক্‌তে বাধ্য। বড় শিল্পীর প্রেরণা যখন গভীরতম ব্যঞ্জনায় মহিমময় হ'য়ে ওঠে তখন তিনি সমগ্র চেতনা দিয়ে অনুভব না ক'রেই পারেন না যে তাঁর সৃষ্টির কোথাও অত্যুক্তি থাক্‌তে পারে না; কোথাও অসুন্দর থাক্‌তে পারে না —প্রেরণার পর প্রেরণার ঢেউ এমন সুসম্বদ্ধ ভাবে আস্‌তে বাধ্য যার একটু-আধটু নড়চড় হ'লেও রসের ব্যত্যয় হবেই হবে। অবশ্য খুব কম রস-সৃষ্টিই এ পরীক্ষায় পূরো নম্বর পেতে পারে মানি, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, যেহেতু বর্ত্তমানে আমরা উপলব্ধি জগতের লক্ষ্য বা আদর্শের কথাই বল্‌ছি—বাস্তব জগতে যা হয় বা ঘ'টে থাকে তার কথা বল্‌ছি না। অর্থাৎ, কলাকারু সৃষ্টি কোন্ দিকে বিকাশ লাভ করলে তা মহনীয় হ'য়ে ওঠে বর্ত্তমানে সেই আদর্শের কথাই বলা হচ্ছে। কালিদাসের মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথের তাজমহল, শেলির Epippsychidion মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিড গ্রীকদের ভিনাস ডি মিলো রাফেলের সিষ্টিন মাদনা ভারতের তাজমহল বীভোভ্‌নের নবম সিম্‌ফনি,—প্রভৃতি সব শ্রেষ্ঠ শিল্পকলাই কি সাক্ষ্য দেয় না বড় সৃষ্টি কি ভাবে inevitable হ'তে বাধ্য? বস্তুতঃ সৃষ্টি বড় হ'য়েছে কিনা তার কষ্টি পাথরই হচ্ছে এই যে তার পরিবর্ত্তন সাধন ক'রে তার গরিমা বর্দ্ধন করা যায় কি না। যে-পরিমাণে এ পরিবর্ত্তনে তার গরিমার বৃদ্ধি হয় সেই পরিমাণে সে শিল্পকলার আদর্শ হ'তে চ্যুত হয় বুঝতে হবে।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একথা অক্ষরে অক্ষরে খাটে, কেবল সেরূপ সঙ্গীতকার আজকাল একান্ত বিরল হ'য়ে উঠেছে ব'লে এ ক্ষেত্রে কথাটিকে তেমন ভাবে প্রমাণ করা কঠিন। তাই যেটা অনুধাবনীয় সেটা হচ্ছে এই যে বর্ত্তমান উচ্চসঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে একথার যাথার্থ্য প্রমাণ করা

আজ এত মুস্কিল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তার কারণ দৃষ্টান্তাভাব, সঙ্গীতকলার ধারার কোনও মূলগত বিকাশ পার্থক্য নয়। তবু এখনও এমন দু চারজন সত্যকার গুণী আছেন যেমন আবদুল করিম বা শেষণ বা জয়পুরের গহর বাই যাঁদের গুণপনা মূলতঃ এই inevitabilityর নীতিতে উদ্বুদ্ধ—কেবল তাঁরা সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নন ব'লে কার্য্যতঃ কমবেশি তাঁদের কলাকারুর হানি সাধন ক'রে থাকেন। তাই মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষার সঙ্গে প্রেরণার যোগাযোগে আমাদের উচ্চসঙ্গীতও ঢের বেশি inevitable হ'য়ে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে।

শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর শিল্পকে উত্তরোত্তর inevitable হ'য়ে উঠ্‌তেই হবে একথাটা প্র্যাক্টিক্যাল লোকের কাছে একটু বাড়াবাড়ি রকমের আদর্শপন্থী (idealistic) ও উদ্ভট (Utopian) মনে হ'তে পারে মানি। তাঁরা হয় ত বিজ্ঞভাবে বল্‌বেন: "বাপু হে, সংসারে দরকারী কাজের অভাব নেই। যথা—অর্থকরী বিদ্যা অর্জ্জন, দার পরিগ্রহ করা, পুন্নাম-নরক হ'তে রক্ষালাভ, কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার পাওয়া, পুত্রের জন্য সুপারিশ যোগাড় করা, তুড়ি দিয়ে হাঁই তুলে হরিনাম জপা, ও শেষতঃ কোনওমতে বেঁচে থেকে পিতৃনাম বজায় রাখা। এত কাজ ক'রে আর তোমাদের ও সৌখীন সৌরভ-বিলাসিতা নিয়ে মাথা ঘামাবার না থাকে সময় না আসে ইচ্ছে। এক কথায়, আমরা তোমাদের মতন 'খুঁৎখুঁতে' কলাভক্তদের শিল্পকলা সম্পর্কে তিলকে-তাল-করার না ধারি ধার না বুঝি মাথামুণ্ড। তাই তোমাদের এ-সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উৎকণ্ঠের বোঝা তোমরাই পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ।"

কথাটা সত্য। খুব কম লোকেই কি শিল্প জগতে, কি আদর্শের অনুসরণে, কি চিন্তা-গবেষণায়—এক কথায় কোন বড় অনুভব শক্তির বিকাশ সাধনের জন্যে মনেপ্রাণে সাড়া দেয়। গীতাকারও এই কথাই ঘোষণা ক'রে বলেছিলেন যে প্রতি হাজার করা লোকের মধ্যে একজন মাত্র সত্যকে খোঁজে, এবং হাজার করা এই রকম সত্যান্বেষুর মধ্যে একজন মাত্র তাকে পায়।*

(বলা বাহুল্য একথা যে শুধু অনুভব সাধনার ক্ষেত্রেই খাটে তা নয়, একথা শিল্পকলার সৃষ্টি সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য। কেননা ললিতকলার উদ্ভব সম্ভব হয় কেবল সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জগতে কোনও গভীর সত্যের পরশ পাওয়ার ফলে।)

অতএব একথাটা অস্বীকার করে ফল নেই যে জগতে কম লোকই শিল্পকলাকে নিখুঁত করবার জন্য বেশি মাথা ঘামানো দরকার মনে ক'রে থাকে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ শিল্পী যদি মনে প্রাণে শিল্পী হ'ন তাহ'লে তাঁর উত্তর এই যে বাস্তবের দৃশ্যতঃ অসারতার জন্য তাঁর উচ্চাশার ইতি হ'তে পারে না। শিল্পী যদি মনেপ্রাণে শিল্পী হ'ন তবে তিনি বল্‌বেনই বল্‌বেন যে তাঁর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির মহিমার তলস্পর্শ করাবার শক্তি সহস্রের

---

* মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ভগবদ্‌গীতা।

মধ্যে একজনের আছে না নয়শত নিরানব্বই জনের আছে সে মাথাব্যথা তাঁর নয়। কেননা তাঁর সৃষ্টির কতখানি সৌন্দর্য্য গ্রহীতা গ্রহণ করবেন সে দায়িত্ব গ্রহীতার। স্রষ্টার দায়িত্ব শুধু নিজের প্রেরণাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করার প্রতি সচেতন থাকা। তাঁর দায়িত্ব শুধু এইটুকু মাত্র জানা যে তাঁর সৃষ্টি যে পরিমাণে inevitable হ'য়ে উঠ্‌বে সেই পরিমাণেই তাঁর বাণী শরীরিণী হয়ে উঠবে। এইটুকু মাত্র তাঁর সাধনার বিষয়। সে বাণীর বীজ কবে কোন্ মাটিতে ফসল ফলাবে না ফলাবে সে বিচারের ভার তাঁর নয়—সে বিচারের ভার যিনি ফসল-ফলানোর কর্ত্তা তাঁর।

আমাদের বর্ত্তমান উচ্চসঙ্গীতের মধ্যে যে আজ একটা গভীর সুসমাহিত তৃপ্তি মেলা এত বিরল হ'য়ে উঠেছে তার কারণ প্রধানতঃ দুটি পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে। প্রথমতঃ অধুনাতন ওস্তাদ সম্প্রদায়ের মধ্যে শতকরা একজন ওস্তাদও সত্য আর্টিষ্ট কিনা সন্দেহ ও দ্বিতীয়তঃ, যে দুচারজন সত্য আর্টিষ্ট ভুলে এ সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ ক'রে বসেন তাঁরাও এ সঙ্কীর্ণ ওস্তাদি কচকচির আবহাওয়ায় নিজের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য প্রেরণার যথেষ্ট খোরাক সংগ্রহ করতে পারেন না। কারণ যদিও শিল্পসৃষ্টির সর্ত্ত হচ্ছে শিল্পীর মধ্যে সত্য প্রেরণার আবির্ভাব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্য একদম না থাকলেও আবার এ প্রেরণাকে পূর্ণ পরিণতি দান করাও সম্ভবপর হয় না। আমাদের হৃদয় শতদল প্রভাতরবির দিকে তার পাঁপড়িগুলি মেলবার আগ্রহে সদাই উন্মুখ হ'য়ে থাক্‌লেও সে কিরণ সম্পাতের পরশ না পেলে ত সে নিজেকে মেল্‌তে পারে না। সেইজন্য বিশেষ করে শিল্পীর ক্ষেত্রে সৌকুমার্য্য, সংশিক্ষা ও আনুকূল্যের আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার মূল্য একটু বেশি করে ধার্য্য না করেই পারা যায় না। ছোটখাট শিল্পী হওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষেও অল্পবিস্তর সম্ভবপর। কিন্তু মহান্ শিল্পকলার স্রষ্টা কেবল সেই হ'তে পারে যে শুধু শিল্পপ্রেরণায়ই বড় নয়—জীবনেও বড়। রোমা রোলাঁ তাঁর বীতোভন-জীবনীতে এই কথাই প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন ও ব'লেছেন যে যেখানে জীবন বড় নয় সেখানে শুধু যে বড় আর্টের জন্ম অসম্ভব তাই নয়, বড় কর্ম্ম, বড় দার্শনিক বা বড় রাজনীতিকের বিকাশও সম্ভবপর নয়। তাই মনে হয় যে আমাদের বুঝবার সময় এসেছে যে আমাদের সঙ্গীতচর্চ্চার বার আনা যে সম্প্রদায়ের হাতে ন্যস্ত তাদের কাছে আমাদের সঙ্গীতের কোনও মহনীয় বিকাশের আশা দুরাশা মাত্র—তা তাঁরা ওস্তাদিতে ও স্বরচালনা নৈপুণ্যে যত বড়ই হোন্ না কেন। কারণ তাঁরা স্বরমল্লযুদ্ধনৈপুণ্যে অনভিজ্ঞকে যতই স্তম্ভিত করে দিন না কেন—তাঁদের প্রদর্শিত প্রণালীতে যে উচ্চসঙ্গীতের উত্তরোত্তর বিকাশ সম্ভব একথা কেবল তাঁরাই মনে করতে পারেন যাঁরা গতানুগতিকতার অভ্যাসবশে খোলাটাকে শাঁস বলে ঠিকে-ভুল করে বসে থাকতে অভ্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন।

এক কথায়, অদূর ভবিষ্যতে সঙ্গীতের সাধককে জন্মগ্রহণ করতে হবে অশিক্ষিত ওস্তাদ

সম্প্রদায়ের বংশে নয়—সত্য-শিক্ষিত ও সুকুমার হৃদয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। নইলে আমাদের উচ্চসঙ্গীতের মুক্তির আশা করা বিড়ম্বনা। একথা আজ আমাদের জোর করে বলবার সময় এসেছে—আমাদের সঙ্গীতের যথার্থ পথনির্ণয়ের জন্য। একথায় অনেক ওস্তাদিপন্থীই রাগ করবেন জানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ নির্ভীকভাবে সত্যকথা বল্‌তেই হবে। কারণ উচ্চসঙ্গীত ওস্তাদগণের ব্যক্তিগত মানাপমানের চেয়ে অনেক বড়।

যথার্থ শিল্পীর হাতে পড়লে আমাদের সঙ্গীতের নবজন্ম যে কি রকম আশ্চর্য্য সহজ উপায়ে হবে তার অনেকটা আভাষ পাওয়া যায় আধুনিক যুগের দুটি ললিতকলার অপ্রত্যাশিত রকম দ্রুত অভ্যুদয়ের দৃষ্টান্ত থেকে ঃ—যথা (১) আধুনিক অভিনয়-কলা ও (২) চিত্রকলা।

(১) বর্ত্তমান সময়ে আগেকার সেই মামুলি যুগের অভিনয়ভঙ্গী যে ভিতরে ভিতরে অচল হয়ে পড়েছিল ও একটা সমৃদ্ধতর ভঙ্গীর প্রবর্ত্তন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল তার মস্ত প্রমাণ—শিশিরকুমার প্রমুখ নূতনপন্থী নটদলের আকস্মিক অভ্যুদয় ও অবিসংবাদিত সাফল্য। শিশিরকুমারকে পুরাতনপন্থীরা যতই কেন না গালাগালি দিন, বর্ত্তমান যুগে তাঁর অভিনয় ভঙ্গীর মধ্যে যে নবযুগের নাট্যামোদীদের একটা সত্য আকাঙ্ক্ষার পূরণ মিলেছে একথা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে। এবং গভীরতর পরিতৃপ্তি মেলার কারণ এই যে তাঁর অভিনয় চাতুর্য্য সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ না হ'লেও (জগতে কোন্ শিল্পী বল্‌তে পারেন যে তিনি নির্দ্দোষ?) তাঁর কলাকারুর মধ্যে একটা সুসমাহিত সৌকুমার্য্য, সঙ্গতিজ্ঞান, প্রয়োগনৈপুণ্য—এককথায় সত্য 'কাল্‌চারের' পরশ অভিনবভাবে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে যেটা আগেকার যুগের অভিনয়ের মধ্যে মিল্‌ত না।

(২) চিত্রকলার ক্ষেত্রেও ঐ কথা। অবনীন্দ্র-নাথের আবির্ভাবের আগের যুগে আমাদের চিত্রকলার অবস্থা এক্দিকে রবিবর্ম্মার অসার মৌলিকতা (?) ও অপরদিকে য়ুরোপীয় চিত্রকলার বাজে নকলে যে কি শোচনীয় হ'য়ে প'ড়েছিল তা কে না জানেন? জগতের কাছে আমাদের চিত্রকলার হেঁটমুখ হ'য়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। শুধু তাই নয় জনসাধারণ এই সব বাজে ছবিকেই সাদরে অভিনন্দন ক'রে গুম্ফদেশে চাড়া দিতেন—যেমন আগেকার যুগের অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর অভিনয়কে পুরাতন পন্থীরা উচ্চাঙ্গের অভিনয় ব'লে প্রচার করতেন। কিন্তু সত্যের অভ্যুদয়ে অসত্যকে যে কি আশ্চর্য্য রকম অল্প সময়ের মধ্যে বিবর্ণ হ'য়ে যেতে হয় সেটা ভারতীয় চিত্রকলার ও আধুনিক অভিনয় কলার নবজন্মের গরিমাময় দৃশ্য যেমন অকাট্যভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তেমন বোধ হয় আর কিছুই দেয় না।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ ধারা প্রবাহিত হবেই হবে ও তখন ঠিক্ সমান স্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হবে মামুলি ওস্তাদি ঢং বস্তুতঃ কতখানি প্রাণহীন ও বিস্বাদ। বর্ত্তমান

সময়ে সঙ্গীত সম্মেলনাদি গানের আসরে শ্রোতৃবৃন্দের কাতর সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যের-জন্য-ইব'সে-থাকা, প্রতি ওস্তাদের মুখপানে তাঁদের প্রার্থিত বস্তুটির জন্য সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থেকে নিরাশ হওয়া ও সর্ব্বোপরি নিরতিশয় অধ্যবসায় সহকারে হাঁই-তোলা—এ-সব যিনি দেখেছেন তিনি বোধ হয় অনুভব না ক'রেই পারেন না যে এযুগের উচ্চসঙ্গীতের পতাকাবাহীদের সঙ্গে সুকুমার হৃদয় সঙ্গীতানুরাগীদের ভূতপূর্ব্ব যোগসূত্রটি বেমালুম ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছে।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময় হচ্ছে আমাদের সঙ্গীতের নবজন্মের ঠিক পূর্ব্বেকার তেম্‌নি অবস্থা—অবনীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমারের অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে চিত্রকলার ও অভিনয়কলার অবস্থা যেমন ছিল। এবং বস্তুতঃ আমাদের উচ্চসঙ্গীতের এই স্রোতোহীন অবস্থার গভীরতম হেতু এ নয় (যে কথা অনেকে না ভেবে বলে থাকেন) যে ইংরাজরাজ মুসলমানরাজের মতন আমাদের ওস্তাদদের পৃষ্ঠপোষক নন। আমাদের উচ্চসঙ্গীতের পতনের গভীরতম হেতু এই যে সে সঙ্গীত বহুদিন যাবৎ যুগধর্ম্মকে মেনে চলে নি ও সঙ্গীতরাজ্যে নূতন প্রেরণা ও প্রাণের আমদানী করা আবশ্যক মনে করে নি। তাই আজ শতকরা নিরানব্বই জন তথাকথিত ওস্তাদের গানে সঙ্গীতানুরাগীরও কোনও গভীর তৃপ্তি মেলা সম্ভবপর হয় না। অথচ জীবনীশক্তি থাক্‌লে সে-সঙ্গীত আজও অনেককে সত্য আনন্দ দিতে পারে। তার প্রমাণ শুধু যে আবদুল করিম, শেষণ, উজীর খাঁ, আলাউদ্দীন প্রমুখ দুচারজন বড় পেশাদারী গুণীর কলাকারুতে মেলে তাই নয়,—তার প্রমাণ মেলে অনেক ভাল বাইজীর গানে * তার প্রমাণ মেলে বালক চন্দ্রশেখরের † ভজনে, তার প্রমাণ মেলে শিক্ষিত যুবক রঙনজন, করের গানে ‡ তার প্রমাণ মেলে বিখ্যাত গুণী বাংলার-গৌরব রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুরের টপ্‌খেয়ালে, এমন কি তার প্রমাণ মেলে অধুনাতন ভদ্রমহিলাদেরও দুচারজনের প্রাণবন্ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে।

এ-সব কারণে মনে করার হেতু আছে যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এখনও জীবন্ত হতে পারে যদি সে প্রকৃত শিল্পীর হাতে পড়ে। কিন্তু তা না হলে তা হয়ে পড়তে পারে কেবল ব্যর্থ অনুকরণ, গতানুগতিকতার ছায়াপাত ও মন্থরগতি দিনগত-পাপক্ষয়।

প্রবন্ধটির পরিসমাপ্তি টান্‌বার আগে দুচারটি কথা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার মনে করছি—নইলে হয়ত নিছক ওস্তাদি-বিরোধিগণ অযথা হৃষ্ট হয়ে উঠে মনে করে বস্‌তে পারেন যে আমরা তাঁদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বিমুখতারই সমর্থন করছি।

---

* যেমন জয়পুরের অনুপম গায়িকা গহর বাই, এলাহাবাদের জানকী বাই, বম্বের তারা বাই, লক্ষ্ণৌয়ের অচ্ছন বাই প্রভৃতি।

† এলাহাবাদের শিক্ষিত সঙ্গীতবিৎ সত্যানন্দ যোশীর ভাগিনেয়।

‡ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের তরুণ বিখ্যাত গুজরাটী ছাত্র।

(মদীয় "ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা" পুস্তক দ্রষ্টব্য)

যে কথাটি খুব জোর ক'রে বল্‌তে চাই সেটা এই যে যদিও আজ আমাদের উচ্চসঙ্গীত দুর্ভাগ্যবশতঃ মুমূর্ষু, কিন্তু সেটা এজন্য নয় যে তারমধ্যে প্রাণশক্তি একেবারে থাক্‌তেই পারে না। সেটা এইজন্য যে বর্ত্তমানযুগে নানা জটিল কারণে সঙ্গীতের যথার্থ দান ও বাণী যে কি সে-সম্বন্ধে আমরা আমাদের আগেকার-যুগের সে সহজ অন্তর্দ্দৃষ্টিটি হারিয়ে ব'সে আছি। তাই একথা যেন কেউ মনে না করেন যে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চ্চাবর্জ্জনেরই সমর্থন করা। কারণ তাই যদি আমার উদ্দেশ্য হ'তে তাহ'লে গত কয়বৎসর ধ'রে নিরন্তর সমগ্র ভারতবর্ষের ওস্তাদদের চর্চ্চা করার কি প্রয়োজন ছিল? * শেলি যথার্থই ব'লেছেন যে কাল যাকে ভুলে গেছে তার হীনতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করারও যে কোনও প্রয়োজন নেই, যেহেতু তাতেই তার সমাধিস্থানকে বিস্মৃতির কবল হ'তে বাঁচিয়ে রাখা হয়। † হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে নিয়ে আমার এত মাথাব্যথার কোনও সদর্থই থাক্‌ত না যদি এ বিশ্বাসের কোনও সঙ্গত কারণ না থাক্‌তে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আন্তরিক আলোচনার ফলে এই সঙ্গীতের ভিত্তির উপরই আবার নতুন ক'রে এক মহনীয় সঙ্গীতের গোড়াপত্তন হওয়া সম্ভব হবে। মানুষের সভ্যতার বিকাশের ধারা একটু পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তার প্রতি প্রচেষ্টাই যুগে যুগে অতিচার দোষ (overdoing) ক'রে বসে যার ফলে তার একরোখা পরিণতি অনেক সময়েই শেষটায় হাস্যকর না হ'য়ে পারে না। এক সময়ে আমাদের হিন্দুস্থাপত্য ভাস্কর্য্য এইরকমই অলঙ্কার-বাহুল্যের দ্বারা প্রপীড়িত হ'য়ে উঠেছিল, যার চরম পরিণতির সাক্ষ্য মেলে আবুর দিলওয়ারা মন্দিরের বিস্ময়কর কারুকার্য্যের অতিশয়-কাহিনীতে। কিন্তু তবু সেই অলঙ্কার-জড়িমার ধারার সঙ্গে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়েই তাজমহল, সিকান্দ্রা ও ফতেপুর-সিক্রির জন্ম হ'য়েছিল। ইতালীর রেনেসাঁসের যুগের পূর্ব্বে চিত্রকলায় অজস্র পরীমূর্ত্তির অত্যাচারের সাক্ষ্যও এই শিক্ষাই দেয়। অর্থাৎ তখন লোকে serap, angel, cherub, martyr প্রমুখ দেবদেবী ও দেবমানবের বাহুল্যে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল।' কিন্তু এ অতিচারের শিক্ষা ও সাবধান বাক্যের ফলেই হয়ত রাফেলের ও লিওনার্দোর নূতন ধারার চিত্রকলার মহিমা বেশি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। মানুষ কি বস্তুজগতে কি শিল্পকলায় বাড়াবাড়ি ক'রে বসে শুধু

* "ভ্রাম্যমানের দিন পঞ্জিকা" পুস্তকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

† Whatever talents a person may possess to amuse and instruct others, be they ever so inconsiderable, he is yet bound to exert them: if his attempt be ineffectual let the punishment of an unacomplished purpose have been sufficient; let none trouble themselves to heap the dust of oblivion upon his efforts; the pile they raise will betray his grave which might otherwise have been unknown —Preface to "Prometheus Unbound ......Percy Bissche Shelley.

সঙ্গতি, ও সৌষ্ঠব জ্ঞান সম্বন্ধে সমৃদ্ধতর অন্তর্দ্দৃষ্টি অর্জ্জন করার জন্যে। যতদিন এ অন্তর্দ্দৃষ্টি-লাভ তার না হয় ততদিন অবশ্য তার জড়তার দৃশ্য বিশেষ ভরসাপ্রদ হয় না, কিন্তু শিল্পকলার সাময়িক ও নৈমিত্তিক অবনতিকে বড় ক'রে দেখাটাই তার সৌন্দর্য্য বা গরিমার সবচেয়ে সত্য বিচারপদ্ধতি নয়। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমারের প্রতিভার বিকাশের ঠিক্ অব্যবহিত আগেকার যুগে বাংলার কাব্য-, চিত্র-, ও অভিনয়-কলার শোচনীয় অবস্থা স্মরণীয় সে-সময়ে অনেকে এজন্য বাংলাভাষার, ভারতীয় চিত্রকলার ও নাট্যকলার চর্চ্চা বর্জ্জনেরই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের মতানুসারে চল্‌লে কি আজ জগতের শিল্পসম্পদের একটা মস্ত ক্ষতি সাধিত হ'ত না? আজ ভারতীয় সঙ্গীতের অবস্থা অবিকল সেইরূপ। তাই এর জন্য কর্ত্তব্য—আমাদের পুনরায় সেই নষ্ট গৌরব উদ্ধার করার সাধনা। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মধ্যে মহত্ত্বের বীজ আছে, কেবল চাই তাকে যথাযথ মাটিতে বপন করবার অধ্যবসায় ও সেজন্য নির্ভীক সত্যদর্শনের ক্ষমতা-অর্জ্জন। স্মরণ রাখা দরকার যে এ নবজন্মের উপায় অতীতের শিল্পকলার ধারার যোগসূত্রটি খুইয়ে দেউলে হ'য়ে ব'সে থাকা নয়, এর উপায় হচ্ছে অতীতের আলোচনা থেকে সেই যোগসূত্রে বজায় রেখেই দেশীয় শিল্পকলার নবজন্ম দান করা। নূতনের অভ্যাগমের সঙ্গে অতীতের যোগসূত্রটি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অরবিন্দ তাঁর অনুপম "Essays on Gita"তে যা লিখেছেন সে কথাগুলি সঙ্গীতের নবজন্মা সম্বন্ধে এতই অক্ষরে অক্ষরে খাটে যে একটু দীর্ঘ হ'লেও তাঁর কথাগুলি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না:—"We of the coming day stand at the head of a new age of development which must lead to such a new and higher synthesis. We are not called upon to be orthodox……That would be to limit ourselves and to attempt to create our spiritual life out of the being, knowledge and nature of others, of the men of the past, instead of building it out of our own being and potentialities. We do not belong to the past dawns but to the noons of the future···But just as the past syntheses have taken those that preceded them as their starting-point, so also must that of the future, to be on firm ground, proceed from what the great bodies of realised spiritua thought and experience have given."

তাই আমাদের সঙ্গীতের যদি আজ পতন হ'য়েই থাকে তবে তার ঔষধ স্বদেশী সঙ্গীতের শিকড় উপড়ে ফেলে বিদেশী সঙ্গীতের বীজ অজস্র বপন করা নয়, তার প্রতিকার—নিজের দেশজ সঙ্গীতের বীজকেই নবযুগের উর্ব্বর মাটিতে নবযুগধর্ম্মের আলোয় নতুন ক'রে আবাদ করতে শেখা। নিছক য়ুরোপীয় সঙ্গীতের চর্চ্চা ক'রে আমাদের সঙ্গীতের সমৃদ্ধতর বিকাশ

হবে না—কারণ প্রতি ললিতকলার বিকাশ সত্য হবার জন্যে তৎপক্ষে প্রকৃতির ও পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্য চাই। সমূলে বিদেশী গাছ এনে স্বদেশের মাটিতে বপন করলেই যে রাতারাতি আমাদের বাগান বিলিতি উদ্যান-সম্পদ লাভ করবে, এ আশা দুরাশা। শিল্পে tradition একটা মস্ত জিনিষ। নিজের নিজের উত্তরাধিকারসূত্র বজায় রাখার সহজ প্রযত্ন প্রতি জাতির মগ্নচৈতন্যের (subconscious mind) মধ্যে উপ্ত আছে ব'লেই জগতে আজও একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে নি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে বড় করতে হ'লে সেজন্য তার tradition টিকে খুইয়ে বসাই শ্রেষ্ঠ পন্থা নয় ;—পন্থা হচ্ছে, নূতন সত্যের আলোকে সেই tradition টিকে অভিনব-রূপে গরীয়ান্ ক'রে তোলা। পুরাতন বস্তুতঃ পুরাতন নয়। তার মধ্যে সাময়িক যেটা সেটা সাময়িকতার কাজ ক'রেই লুপ্ত হয় বটে, কিন্তু চিরন্তন যেটা সেটা যুগে-যুগে নিতুই-নব রূপে নব নব জন্ম লাভ ক'রে থাকে নতুন নতুন দ্যোতনা নিয়ে। প্রাচীন গ্রীসের রাজনৈতিক বা সামাজিক অনেক সাময়িক উপলব্ধিই কালের সমুদ্রে বুদ্বুদের মতন বিলীন হ'য়ে গেছে সত্য। কিন্তু তার সাহিত্য, দর্শন, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত—গ্রীক সভ্যতা হ'তে রোমক সাম্রাজ্য, রোমক সাম্রাজ্য হ'তে ইতালীয়ান "রেনেসাঁস" ও ইতালীয়ান রেনেসাঁস হ'তে সমগ্র প্রতীচ্য সভ্যতাকে ছেয়ে ফেলেছে—প্রতি যুগে যুগধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ক'রে ফুটে ওঠার মধ্য দিয়ে। মানুষের জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশ ললিতকলার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। আমাদের চিত্রকলার উত্থান পতন ও পুনরুত্থানের ইতিহাস এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। আমাদের বর্ত্তমান চিত্রকলা বা বাগ অজন্তার বিকাশ ধারা যথাক্রমে রাজপুত কাংড়া মোগল চিত্রকলার মধ্য দিয়ে তার জের টেনে এনে বর্ত্তমান যুগে এক অভিনব ও সমৃদ্ধতর নবজন্ম লাভ ক'রেছে। কিন্তু এ সম্পর্কে যেটা বিশেষরূপে প্রণিধান-যোগ্য সেটা এই যে বর্ত্তমান ভারতীয় চিত্রকলার নবজন্মের দ্যুতির জন্য আমাদের প্রাচীন অজন্তাবাগের নিভন্ত স্ফুলিঙ্গ হ'তেই শক্তি সংগ্রহ করতে হ'য়েছে, য়ুরোপের রাফেল, টিসিয়ান, ভিন্‌চি, রেমব্রাণ্ডের জাজ্বল্যমান দীপশিখায় কিছু হয় নি।

আমাদের উচ্চসঙ্গীতের উত্থান-পতনের সম্পর্কেও একথা অক্ষরে অক্ষরে খাটে। প্রতি জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সময়ে সময়ে স্রোতোহীনতা ও জাড্য দেখা দেয়। কিন্তু যদি তার কোনও চিরন্তন বাণী দেবার থাকে তবে এ স্রোতোহীনতা ও জড়িমার কুয়াশা এক সময়ে না এক সময়ে কেটে যায়ই যায় ও সে তার চিরন্তন বাণীটি নবযুগের বিচিত্র আলোতে মূর্ত্ত করে তোলে। কারণ এই যে প্রকৃতির ধর্ম্ম। আমাদের মহিমময় সঙ্গীতকারদের উত্তরাধিকারিগণ আজ কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকায় অন্ধ, গতানুগতিকতার চাপে নিস্তেজ—এককথায়, জাতীয় তামসিকতার কবলে রক্তহীন। কিন্তু আশার কথা এই যে তা সত্ত্বেও উচ্চসঙ্গীতের মধ্যেকার গভীর সত্যের বাণী আজও প্রাণবন্ত। তাই সে-বাণী আবার নূতন যুগের উজ্জ্বলতর আলোক-

সম্পাতে সমৃদ্ধতর ও মহনীয়তর হয়ে উঠ্‌বে এমন আশা করা অসঙ্গত নয়। কেবল সেটা সম্ভবপর হতে হলে আমাদের অতীতের সঙ্গে যোগসূত্রটি বজায় রেখে তবে এ বিকাশ সাধনে অগ্রসর হতে হবে, নইলে সবই পণ্ডশ্রম হবার সম্ভাবনা। মহত্ত্ব ধূলিশায়ী হলেও তার অভ্রভেদিত্বটি উপলব্ধি করবার অন্তর্দৃষ্টি অর্জ্জন করা দরকার। নইলে সত্য মহত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের বহু-সাধনালব্ধ চেতনা হীনপ্রভ হ'তে হ'তে শেষটা লোপ পায়। প্রতি জাতির ও সভ্যতার উত্থান পতনের ইতিহাসে যদি সত্যকার আক্ষেপের বিষয় কিছু থাকে তবে সেটা হচ্ছে—মানুষের এই যুগসঞ্চিত সম্পদের মহিমা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হেলায় হারানো।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তৃপ্তি

(৩)

মিনতির বাবা অনেক টাকা রোজগার করিতেন। তাঁর বড় দুই মেয়ে সুমতি ও প্রণতির বেশ ভাল বিবাহ দিয়াছিলেন। বড় দুই ছেলেকেও বিবাহ দিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তারপর তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয় এবং কয়েক বৎসর পর মিনতির যখন তের বৎসর তখন তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর মিনতির দুই দাদা বিষম ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পিতা বিশেষ কিছু রাখিয়া যান নাই, ভাইদের রোজগার যৎসামান্য, তাহাতে কোনও মতে কষ্টে স্মৃষ্টে সংসার চলিতে লাগিল। কর্ত্তা থাকিতে দাসদাসীর বাহুল্য ছিল এখন সে পাঁঠ উঠিয়া গেল। দুই বউ দিনরাত খাটিয়া সংসারের কাজ করে, মিনতি স্কুলের পড়া করে আর দুই ভায়ের ছেলে পেলে রাখে। ছোট ছোট ছেলেপেলের উপর মিনতির বরাবরই টান ছিল। সে যখন খুব ছোট তখনি সে সুমতির ও প্রণতির ছেলেপিলেদের টানাটানি করিত। সাত বছরের মেয়ে, তার সাধ ছিল ছোট ছেলেটি লইয়া ঠিক দিদিদের মত বেড়াইবে, তাকে কোলে করিয়া দুধ খাওয়াইবে, ঘুম পাড়াইবে; এমনি সব পাকা পাকা কাজ করিবে। যখন তার নয় বছর বয়েস তখন তার বড়দির খোকা হয়; তখন সেই ছেলেটাকে সে একবারে দখল করিয়া বসিল। ছেলে একটু কাঁদিলে সে যেখানে থাকুক ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে শান্ত করে, যতক্ষণ বাড়িতে থাকে তাকে কোলে পিঠে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; পড়াশুনা করে, তাও খোকার পাশে বসিয়া। মিনতির কাণ্ড কারখানা দেখিয়া সকলেই হাসিত। বড় বৌ যদি কখনো ছেলেকে একটু ধমকাইতেন বা কাঁদাইতেন তবে অমনি মিনতি আসিয়া তাহাকে বকিতে আরম্ভ করিত এবং

প্রায়ই টানাটানি করিয়া ছেলে কাড়িয়া লইত। বড় বৌ হাসিয়া বলিতেন "এত সোহাগ দেখা যাবে; নিজের ছেলে হলে। তখন আর এত আদর থাকিবে না।"

মিনতি এ কথায় আগে বলিত "আচ্ছা দেখে নিও" কিন্তু যখন সে একটু বড় হইল তখন সে এ কথায় লজ্জা পাইয়া কেবল বৌ দিদিকে মারিতে যাইত।

এমনি করিয়া পর পর চারটি ছেলেকে সে মানুষ করিতে লাগিল। একটি কি দুইটি ছেলে সর্ব্বদাই তার সঙ্গে থাকিত। পাশের বাড়ীতে সে যখন তার বন্ধুর সঙ্গে খেলিতে যাইত তখন একটি তার কোলে, আর একটি তার হাত ধরিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতেছে, আর দুইটি সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করিয়া লাফাইয়া চলিতেছে। পাশের বাড়ীর গিন্নি বলিতেন মিনতি যেন সাক্ষাৎ মা ষষ্ঠী। যখন ছেলেরা বড় হইল তখন তাদের লেখাপড়ার শেখার ভারও অনেকটা মিনতির উপরই পড়িল। তার দাদারা অবশ্য কিছু দেখা শুনা করিতেন, কিন্তু ছেলেদের মিনতির কাছে পড়িয়া যত আনন্দ ছিল তত আনন্দ আর কিছুতেই হইত না। সে এই ছেলে চারটির ভার এমন সম্পূর্ণরূপে লইয়াছিল এবং ছেলেগুলিও তার এমন নেওটা হইয়াছিল যে মিনতির বিবাহের কথা উঠিলেই বড় বৌ ও মেজ বৌ এ কথা বলাবলি করিতেন যে সে শ্বশুরবাড়ীতে গেলে ছেলে কটিকে রাখাই দায় হইবে।

মিনতির মনে বরাবর বিবাহিত জীবনের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। সে অনেক সময় মনে মনে স্বামী পুত্র কন্যা পরিবৃত সংসারের কল্পনা করিয়া আনন্দ লাভ করিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাইপোদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিতে তার মনটা বড় খারাপ হইত।

কিন্তু মিনতির বিবাহ হইল না। তার দাদাদের বেশী গরজ ছিল না, কেন না মিনতি একটু বেশী পড়াশুনা করে এ বিষয়ে তাদের একটু আগ্রহ ছিল। কিন্তু যখন সতেরো বৎসর বয়সে মিনতি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হইল তখন আর তারা স্থির থাকিতে পারিল না। পাত্রের পর পাত্রের সন্ধান হইতে লাগিল কিন্তু মিনতির বিবাহ হইল না। মিনতির পড়াশুনায় বেশ ঝোঁক ছিল, কিন্তু বিবাহেও তার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তা ছাড়া তার বিবাহ লইয়া তাব দাদারা বেশ একটু উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন একথাও তার চিত্তকে একটু পীড়া দিত। যখন মেয়ে দেখিতে আসিয়া লোকে মুখ ভার করিয়া চলিয়া যাইত তখন তার মন লজ্জা ও অপমানে অস্থির হইয়া উঠিত।

ক্রমে কোনও বিবাহ সভায় যাইতে মিনতি কুণ্ঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তার চেয়ে ছোট ছোট মেয়েদের দলে দলে বিবাহ হইতে লাগিল অনেকের ছেলে পিলেও হইল একথা মনে করিতে তার মন বিষাদে আচ্ছন্ন হইত। তার ছোট এক খুড়তুত বোন একটি দিব্য ফুট্‌ ফুটে নাদুষ নুদুষ খুকী লইয়া তাদের বাড়ীতে আসিল, মিনতি ছুটিয়া গিয়া খুকীকে বুকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহাকে আদর করিয়া চুমো খাইয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

সে তার মেজ বৌদিকে বলিল "তোমরা কর কি? এমনি একটা মেয়ে তোমাদের হ'তে পারে না?"

মেজ বৌদি হাসিয়া নিজের পায়ের ধুলা মিনতির মাথায় রাখিয়া বলিল "আমি আশীর্ব্বাদ করছি ঠাকুর ঝি বছর না যেতে তোমার এমনি একটি খুকী হোক্।"

"তোমাদের আশীর্ব্বাদের ধক্ নেই বৌদি; তিন বছর আশীর্ব্বাদ করে একটি বর জোটাতে পারলে না, তার মেয়ে।"—মিনতি হাসিয়া কথাটা বলিল, কিন্তু মনের ভিতর সত্যই তাহার একটা দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়া উঠিতেছিল।

মেজ বৌ বলিল "পোড়ারমুখী বর বর ক'রে ক্ষেপে উঠিছিস একেবারে। লাজ লজ্জার মাথা খেয়েছিস্! বর আসবে লো, আসবে।"

"আর আসবে! বয়েসে যে ভাটি পড়ল। নাঃ, তোমাদের দ্বারা কিছু হবেনা। এইবার গৌরীর মত তপস্যা আরম্ভ ক'রব।"

"আর যাই করিস, ওই কর্ম্মটী করিস নে। তপস্যা ক'রলেই দেবতারা বড় চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন আর তাড়াতাড়ি একটা যা নয় তা ক'রে বসেন। এই দেখনা, গৌরী এত তপস্যা করলে, তার কপালে জুটলো একটা বুড়ো বর। আর আজ কাল যে ছেলে বিয়ের জন্য বড় বেশী ছট্‌ফটায় তারি ভাগ্যে জোটে এক এক কালপেঁচা।"

"সেই বুড়ো বরও তো তোমরা জুটিয়ে উঠতে পারছো না বউদি!"

"তোর বরের ভাবনা কি দিদি? তোর কি যেমন তেমন বর হ'লে চলবে? তাই বিধাতা পুরুষ নিজে ইস্তাফা দিয়ে, বিলেতে বর গড়াবার বায়না দিয়েছেন।"

যখন সে মেয়েটির মা মেয়েকে মিনতির কোল হইতে লইয়া চলিয়া গেল, তখন মিনতি মুখে কিছু বলিল না। চুপ করিয়া বই খুলিয়া পড়িতে বসিল। কিন্তু তার বুক ঠেলিয়া কান্না পাইতে লাগিল। সে বড় দাগা পাইয়া অনুভব করিল যে পরের ছেলেকে ভালবাসা কোনও কাজের কথা নয়। দুদিন সুধু তাদের নাড়াচাড়া করা যায়, তার পর যার ছেলে সে লইয়া যায়, পড়িয়া থাকে সুধু বেদনা।

তাই তার অন্তরে একটি নিজস্ব সন্তানের জন্য একটা অস্বাভাবিক বুভুক্ষা ছিল। আপাততঃ তার ছেলে পিলের বিশেষ কোনও অভাব ছিল না। কেন না, বৌদিদিদের ছেলেরা ঠিক প্রবল বন্যার মত না আসিলেও, বাড়ীতে ছোট ছেলের অভাবের বড় অবসর দিত না। মিনতি ইহাদের সব কটির মা হইয়া বেশ আনন্দেই থাকে—এবং মনের তলায় প্রতীক্ষা করে সেই দিনের জন্য যে দিন তার নিজস্ব একটি ছেলে হইবে। এক কথায়, মিনতি মা হইয়াই জন্মিয়াছিল। শৈশবেই শিশু সন্তানদের ভার পাইয়া তার এই স্বাভাবিক মাতৃত্ব পত্রে পুষ্পে শোভিত হইয়া উঠিয়াছিল।

(৪)

Hastings School দেখিয়া আসিয়া দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক করিল। তার ভাল মন্দ সব দিক লইয়া নানারকম আলোচনা হইল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শিশির দেখিল, ভালয় মন্দয় ইহার মত সুব্যবস্থা আর কোথাও হওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন দিলীপকে এখানেই পাঠান স্থির। তখন সেসন আরম্ভ হইতে চার মাস বাঁকী। স্থির হইল চার মাস পরেই দিলীপকে পাঠান হইবে।

মিনতির খাতা খানা শিশির সঙ্গে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। ইতি মধ্যে সে তার কয়েকটী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছিল। সেগুলি সে বিনোদকে দেখাইল। বিনোদ তাহা দেখিয়া চট্ করিয়া মিনতিকে ধরিয়া আনিল এবং তার সামনে সে অনুবাদ পাঠ করিল।

মিনতির মুখ আনন্দে প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু লজ্জায় সে মুখ নত করিল। শিশিরও মিনতির সামনে একটু সঙ্কোচ অনুভব করিল।

শিশির সঙ্কোচ কাটাইবার চেষ্টায় বলিল, "আপনি এমন সুন্দর কবিতা লেখেন—এগুলো ছাপান না কেন?"

বিনোদ চট্ করিয়া বলিল, "সে অপব্যয়টা যে মূর্খ ক'রবে ও সেই হতভাগ্যের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা ক'রছে।"

মালতী চটিয়া বলিল, "কেন মুখুজ্যেম'শায় আমার কবিতা কি এতই খারাপ যে তা' ছাপাবার যোগ্য নয়।"

বি। রাম বল, ছাপাবার অযোগ্য কি বাঙ্গালা দেশে কিছু আছে? কিন্তু ছাপলে বিক্রী হ'য়ে ছাপার খরচা উঠবে, এমন কবিতা বাঙ্গলায় আছে ব'লে আমার মনে হয় না। সেটা যে সব সময় কবিতা বা কবিরই দোষ তা নয়। আমাদের মত সব রসগ্রাহীর কল্যাণে রবি বাবুরও ভাতে ম'রতে হ'ত, যদি না তাঁর বাপ যথেষ্ট সম্পত্তি রেখে যেতেন এবং কতকটা সেই কারণে, যদি তিনি নোবেল প্রাইজ না পেতেন।

শিশির। আমার মনে হয় যে সেজন্যও বিশেষ কিছু ভাব্‌তে হয় না, যদি বইগুলি এমনি ক'রে বাঁধান হয় আর এমনি ক'রে অটোগ্রাফে ছাপান হয়।

বিনোদ। অর্থাৎ বই যে দামে বিক্রী হ'বে তার তিনগুণ দামে তাকে তৈরী করা হয়। তা' হ'লে বিয়ের সময় উপহার দেবার জন্য বিক্রী হ'তে পারে—তা' তার ভিতরে কিছু থাক বা না থাক।

শিশির। আচ্ছা ভাই তুমি একটা experiment করেই দেখ না। আমার বিশ্বাস, এতে লোকসান হ'বে না।

বিনোদ। না ভাই, আমি সে experimentটা আমার ভায়রা ভাইয়ের জন্যে রেখে দিয়েছি।

মিনতি একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া কৌতুকভরে বলিল, "কেন মুখুজ্জে ম'শায়? তার উপর আপনার এত অহেতুক শত্রুতা কেন বলুন দিকিনি?"

বি। অহেতুক? তার চেয়ে বড় শত্রু আমার যদি কেউ থাকে তবে—সে তোর দিদি।

মি। আমি দিদিকে ব'লে দেব।

বি। দোহাই মিনু, ঐটি করিস নে। ঠাট্টা বিষয়ে তোর দিদির গম্ভীরবেদিতা একটা মিউজিয়ামে রাখবার যোগ্য, তা জানিস তো।

মি। ও এটা তবে ঠাট্টা! মুখুজ্জে ম'শায় আপনার ঠাট্টাগুলোর গায় লেবেল মেরে দিলে ভাল হয়। নইলে আমরা সব সময় হেঁসে উঠতে পারি না।

বি। এই জন্যই শাস্ত্রকার ব'লে গেছেন "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং" ইত্যাদি।

শি। এ কোন শাস্ত্রে আছে বিনোদ?

মি। অভাগা শাস্ত্রে, না মুখুজ্জে ম'শায়?

বি। এমন একটা খাঁটি সত্য কথা—আর খাঁটি সংস্কৃত যদি শাস্ত্রে না থাকে তবে শাস্ত্রই অভাগা।

এমনি করিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। যখন শিশির উঠিয়া আসিল তখন তার মনের ভিতর ভীষণ তোলপাড় হইতেছে। তরঙ্গসমাকুল সাগর যেমন একটা ছোট ডিঙ্গিকে নাচাইয়া বেড়ায়, তার সমস্ত সত্তা আমূল আলোড়িত হইয়া তাকে লইয়া তেমনি একেবারে অসহায়ভাবে উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। সে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরিল।

সে চলিয়া গেলে বিনোদের স্ত্রী সুমতি আসিয়া বসিল।

স্বামীকে সে বলিল, "স্ত্রীর নিন্দাটা লোকের কাছে ক'রতে বড্ড মিষ্টি লাগে; না?"

বিনোদ। ও সর্ব্বনাশ, তুমি বুঝি আড়িপেতে শুনেছ? তা' কি জান, ওসব একটু ব'লতে হয়। যমের হাত থেকে মৃতবৎসার ছেলেকে বাঁচাতে গেলে তার নাম রাখতে হয় তিনকড়ি এককড়ি বা এমনি একটা কিছু। সৌভাগ্য জিনিষটা এমন ঠুনকো যে তাকে অভাগ্যের চোখ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে তাকে লোকের কাছে তুচ্ছ ক'রতে হয়।

মিনতি। আপনার বন্ধুটি বুঝি মূর্ত্তিমান অভাগ্য।

বিনোদ। হাঁ ভাই অভাগ্য ও। নইলে ওর অমন স্ত্রীটি মারা যায়।

সুমতি। তা' আর নয়! বিদ্যুৎ তো মানুষ ছিল না, সে ছিল এক দেবতা।

তারপর বিনোদ ও সুমতিতে মিলিয়া বিদ্যুতের কথার সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া গেল। বিদ্যুৎ কবে কোন কাজ করিয়াছিল কবে কি কথা বলিয়াছিল, তার হাসি কেমন, চলন কেমন,

চেহারা কেমন এই সব লইয়া তন্ময় হইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। তার কথা বলিতে বলিতে সুমতির চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

মিনতি আগ্রহের সহিত একাগ্রভাবে সব শুনিয়া গেল। একদিনমাত্র সে বিদ্যুৎকে দেখিয়াছিল। তার সঙ্গে কোনও কথা তার হয় নাই। কিন্তু তার কথা শুনিতে শুনিতে বিদ্যুতের স্বল্পদৃষ্ট মূর্ত্তি মিনতির চোখে সজীব হইয়া উঠিল। তার মন প্রশংসায় ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের তলায় কেমন একটা হিংসা যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। তার মনে হইল যে বিদ্যুতের ভিতর যে সব গুণের কথা ইঁহারা আলোচনা করিলেন তার নিজের ভিতর সে সব গুণই আছে আর তার চেয়ে বেশী আছে তার বিদ্যা। কিন্তু এমন সৌভাগ্য সে হয় তো কোনও দিনই পাইবে না। তার ভিতর যত গুণ আছে সে গুণ সব প্রকাশ করিবার কোনও সুযোগই তার হইবে না। কেন না বিদ্যুৎ সুন্দরী, আর সে কালো, কুৎসিৎ।

মিনতির নিজের রূপ সম্বন্ধে যা কিছু অভিমান ছিল তাহা বার বার নানা লোকের না-পছন্দের ফলে আপনার ভিতর পরিপূর্ণরূপে মুশড়াইয়া মরিয়া গিয়াছিল। বরং সে নিজেকে এত ভয়ানক কুৎসিৎ বলিয়া মনে করিতেছিল যে তাহা মোটেই সত্য নয়, কেন না, কালো হইলেও তার শ্রীর অভাব ছিল না। আর তার রূপের সকল অভাব আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল তার অপরূপ সুন্দর ঐ চক্ষু! কিন্তু সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া সে আপনাকে ভয়ানক খাটো করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আর সে ইহাও স্থির করিয়াছিল যে তার বিবাহ হইবে না। সুতরাং বিদ্যুতের মত স্বামীভাগ্যে ভাগ্যবতী হইয়া সে লোক সমাজে এমন একটা খ্যাতি কোনও দিনই রাখিয়া যাইতে পারিবে না। তার ব্যর্থ নারী জীবনের এই আশঙ্কা তার চিত্তকে প্রায়ই খোঁচা দিত; ভগ্নী ও ভগ্নীপতির মুখে বিদ্যুতের গুণ ও তার সুখ সৌভাগ্যের আলোচনায় তার মনের এ ভাব আজ খুব তীব্র হইয়া উঠিল। সে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

ইহার পর অনেকদিন তার মনে এ কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যুৎ জগতে অল্প কয়েক দিনে যে খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছে, সবার অন্তরে সে যে স্থায়ী ছাপ মারিয়া গিয়াছে সেটা তার কাছে পরম লোভনীয় পরিণতি বলিয়া মনে হইত। কিন্তু কত শত বিদ্যুৎ যে দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনে এ যশ ও সৌভাগ্য অর্জ্জনের সুযোগই পাইল না সে হিসাব কে করে? ধর সে নিজে। তার যে গুণ আছে তাতে বিদ্যুতের মত সুযোগ পাইলে সে বিদ্যুতের যশ ও প্রতিপত্তি অন্ধকার করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সে সুযোগ সে পাইলই না। যদি পাইত—যদি শিশিরের মত ধনবান সুচরিত্র প্রেমময় স্বামীর ঘরণী হইবার সৌভাগ্য তার হইত—তবে সে কি না করিতে পারিত? তার কল্পনার চোখে কত সম্ভাবনা খেলিয়া যাইত। অনেকক্ষণ সে এই সব কল্পনার উত্তেজনায় ও উপভোগের আনন্দে অধীর হইয়া থাকিত। কিন্তু

যখন বাস্তব জগৎ তার দারুণ সত্যনিষ্ঠা লইয়া তার কাছে উপস্থিত হইত তখন সে প্রাণের গোড়া হইতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া টেনিসন বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে মনোনিবেশ করিত।

সুমতি বলিল, "হাঁগো শিশির বাবু আর বিয়ে ক'রবে না।"

বিনোদ বলিল, "ক্ষেপেছ? ও কি বিয়ে ক'রবার লোক? কি ভালবাসতো ও বিদ্যুৎকে সে দেখেছো তো! তা ছাড়া ওর বয়স তো বোধ হয় তেতাল্লিশ হ'ল, আর বিয়ে ক'রবে কি?"

মিনতি ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, "তেতাল্লিশ! দেখে কিন্তু ওকে ত্রিশের বেশী মনে হয় না। না দিদি?"

সুমতি। তা' ঠিক। উনি যদি আজ আবার টোপর পরে' বে করতে বসেন তবে কেউ বুড়ো বর বলতে পারবে না। চেহারাখানা তো নয় যেন কার্ত্তিক!

বিনোদ। কি রকম? আমার সামনে ব'সে তুমি অম্লান বদনে অন্য লোকের চেহারার সুখ্যাত ক'রতে আরম্ভ ক'রলে? কেন আমার চেহারা মন্দ দেখলে কিসে?

সুমতি। শ্রীবিষ্ণু, তুমি তো শিশু কন্দর্প।

মিনতি। minus চুল plus বাঁধান দাঁত।

বিনোদ। অয়ি দুর্ব্বিনীতে, আমার চুয়াল্লিশ বছরের এমন অপমান করিস—কিনা একটু টাক প'ড়েছে আর গোটাচারেক দাঁত প'ড়েছে। আমি তোকে অভিসম্পাত ক'রছি তোর বরটি হবে আমার চেয়ে বুড়ো! এ অভিশাপ মিথ্যে হ'বে না।

মিনতি। তাতে দোষ কি মুখুজ্জে ম'শায়? তখন আমার বয়সও তো বছর চল্লিশেক হ'বে—তার আগে তো আমার বিয়ে হ'চ্ছে না।

সুমতি। পোড়ারমুখীর কথা শোন!

বিনোদ। না ভাই অতটা নির্ভরসা হ'স না। তোর কোনও চিন্তা নেই—আমি কথা দিচ্ছি, তোর বি.এ.র গেজেট বের হ'বার একমাস মধ্যে আমি নিজে তোর জন্যে একটা বুড়ো বর খরিদ ক'রে আনবো।

মিনতি। তাহ'লে বীণা হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়ুন দেবর্ষি। সময় বড় সঙ্কীর্ণ, বিরাট বিশ্ব পর্য্যটন ক'রতে হ'বে। কিন্তু মুখুজ্জে ম'শায় বুড়ো বর যে খুঁজে আনবেন, সে যদি স্বয়ং মহাদেব হ'য়ে বসে তবে আপনার কি উপায় হবে?

"দেখছো গো, বুড়ো বরের নাম শুনেই তোমার বোনটির নোলায় জল পড়ছে। তার মানে আমাকে ওর বড্ড মনে ধ'রেছে। এ অবস্থায় তোমার ওকে বঞ্চিত করাটা কি সঙ্গত?"

মিনতি। ইস্! আস্পর্দ্ধার আর সীমা নেই। দিদি খ্যাংরা গাছটা এনে দেবো? যাই নিয়ে আসি।

বলিয়া মিনতি পলায়ন করিল।

(৫)

ছোট্ট ছোট ব্যাপারের কি বড় বড় ফল হয় তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। বিদ্যুতের কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে মিনতি অন্তরের গোপন কন্দরে শিশিরকে বররূপে কল্পনা করিয়া তার জীবনের স্বপ্ন গড়িতে লাগিল তা সে নিজেই ভাল করিয়া জানিতে পারিল না। শিশিরের সুদর্শন মূর্ত্তি, তার সুমিষ্ট আলাপ, আর সর্ব্বোপরি তার প্রশংসার ভাষা মিনতিকে ধীরে ধীরে তার কাছে একেবারে অবনত করিয়া ফেলিল। সে শিশিরকে কায়মনোবাক্যে স্বামীরূপে কামনা করিতে লাগিল। ইহার পর আরও দুই একদিন শিশির বিনোদের বাড়ী আসিয়াছিল—কিন্তু আর একদিন মাত্র মিনতি তার সামনে গিয়াছিল। বেশী কিছু কথাবার্ত্তা হয় নাই। তার পর মিনতি নিজের বাড়ী চলিয়া গেল আর অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হইল না।

একদিন মিনতি হঠাৎ দেখিয়া অবাক হইল যে একখানা সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গলা মাসিকে তার কয়েকটা কবিতা তার নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে—তার একটা সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়! দেখিয়া তার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। শিশির সামান্য দুই চারিটি সংযত কথায় তার যে সুখ্যাতি করিয়াছেন তাহা তাহার অন্তরে মুক্তার মালার মত গাঁথা হইয়া গেল। সে সযত্নে কাগজখানা তার দেরাজের ভিতরে লুকাইল।

ইহার একমাস পর সে বিজ্ঞাপন দেখিল মিনতি দেবীর নূতন কাব্যগ্রন্থ "লেখা" বাহির হইয়াছে। সেই দিনই পরের ডাকে রেশমের উপর রঙ্গিন ছবিওয়ালা মলাটে সুন্দর করিয়া বাঁধান ছয়খানা বই তার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তার সঙ্গে ছিল একখানা চিঠি। শিশির লিখিয়াছেন—

"দেবি,

আপনার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া ধৃষ্টতা করিয়া ফেলিয়াছি। আশা করি ক্ষমা করিবেন। সাহিত্যের এমন অমূল্য রত্ন হইতে জগৎকে বঞ্চিত করিতে দুঃখ হইল বলিয়া বই ছাপিয়াছি।"

মিনতি বই পাইয়া পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে চিঠিখানা বারবার করিয়া পড়িল। যখন তাহা একেবারে মুখস্থ হইয়া গেল তখন সে তাহা তার দেরাজে তার হাতে-লেখা খাতার পাতায় যেখানে গোটা কয়েক প্যানজী ফুল চাপা দেওয়া ছিল সেখানটায় রাখিয়া দিল।

সেইদিন বৈকালে সে বিনোদের বাড়ী গেল। সন্ধ্যাবেলায় বিনোদ আফিস হইতে আসিলে সে বলিল, "মুখুজ্জে ম'শায় আমার একটা মোকদ্দমা ক'রতে হ'বে।"

"সে কিরে? কার সঙ্গে মামলা—ক্লাশের কেউ বুঝি তোর চেয়ে ভাল পোষাক ক'রেছে?"

"না গো কর্ত্তা তা নয়। মোকদ্দমা খাঁটি আইনের মোকদ্দমা—ব্যাপার চুরির সামিল। আপনার বন্ধু শিশির বাবু আমার বইখানা চুরী ক'রে ছাপিয়েছেন। আমি ড্যামেজ চাই।"

বিনোদ এ কথায় তার স্বভাবসুলভ রহস্যপ্রিয়তার সহিত উত্তর দিতে পারিল না। সে একটু থতমত খাইয়া বলিল, "হু তা কাজটা তার অন্যায় হ'য়েছে। কিন্তু এ নিয়ে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই।"

মিনতি একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। বিনোদ যে এ কথাটা গম্ভীরভাবে গ্রহণ করিয়া ফেলিল ইহাতে সে অপ্রস্তুত হইয়া গেল। তবু জোর করিয়া তার মুখরক্ষা করিবার চেষ্টায় সে বলিল, "এ দুপুরে ডাকাতি, মুখুজ্জে মশায়, এই দেখুন না—আর মলাটের ডিজাইন হুবহু আমার খাতা থেকে নেওয়া" বলিয়া আঁচলের তলা হইতে বইখানা বাহির করিয়া দেখাইল।

বিনোদ সেদিকে না চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি দেখেছি, শিশির আমাকে একখানা পাঠিয়েছে।"

মিনতি ভাবিল বিনোদ আজ প্রকৃতিস্থ নাই। তার উচিত ছিল একথা লইয়া খুব একটা হাসি-মস্করা করা, এবং সেই লোভেই সে আসিয়াছিল। কিন্তু ভগ্নীপতির এ অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য তাহার উৎসাহ একদম মাটি করিয়া দিল। সে সামান্য আর দুই একটা কথা বলিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া সুমতিকে আক্রমণ করিল।

সুমতির মুখের সামনে বইখানা ধরিয়া কৃত্রিম কোপ সহকারে সে বলিল, "দেখেছ দিদি, তোমাদের শিশিরবাবুর কাণ্ডখানা। কি অন্যায় বল দিকিনি।"

সুমতি মুখ ভার করিয়া বলিল, "দেখেছি দিদি। ভারি অন্যায় এ তাঁর। আমাদেরকে পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন নি। কে জানতো যে শিশিরবাবু এমন ক'রতে পারেন।"

মিনতি অবাক হইয়া গেল। ইহাদের কি হইয়াছে? এ ব্যাপারটাকে এরা এত ভয়ানক করিয়া তুলিতেছে কি জন্য? ভগ্নী ও ভগ্নীপতির উপর তার মন ভারি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে মুখে অন্যায় অন্যায় যতই বলুক, শিশির বাবুতো সত্য-সত্যই অন্যায় কিছু করেন নাই। যদিই বা অন্যায় কিছু হয় এ অন্যায় যে তার মাথার মাণিক। ইহার জন্য সে শিশির বাবুকে মাথায় করিয়া নাচিতে পারে। ইহারা না শিশিরবাবুর বন্ধু? তাঁর প্রতি এমন অন্যায় অবিচার ইহারা কেমন করিয়া করিতেছে?

মিনতি এ প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিল না। সে ভারী মনঃক্ষুন্ন হইয়া ফিরিল। দিদি ও মুখুজ্জে মশায়ের উপর সে রীতিমত চটিয়া গেল। তার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া তাই লইয়া তাঁরা যে শিশির বাবুর উপর এ অন্যায় রাগ করিলেন ইহাতে সে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হইল। বাড়ী ফিরিবার পথে সে গাড়ীতে একলা বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বাড়ীতে আসিয়া সে আর বই সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলিল না। বই কখানা তার দেরাজের ভিতর অনেকগুলি কাগজের তলায় লুকাইয়া ফেলিল। সে ভারী ক্ষুন্নমনে সমস্তদিন কাটাইল।

রাত্রে সকাল সকাল খাওয়া দাওয়ার পর সে নীরবে আপনার ঘরে শুইতে গেল। অনেকক্ষণ তাঁর ঘুম পাইল না। শেষে উঠিয়া সে জল খাইতে গেল। তার বড়দা'র ঘরের সামনে বারান্দায় কুঁজোয় জল থাকিত, সেখান হইতে সে জল গড়াইয়া খাইতে গেল। বড়দা'র ঘরের দরজা তখনও খোলা। সে শুনিতে পাইল বড়দা বড় বউদির সঙ্গে কথা বলিতেছেন।

বড়দা' বলিলেন, "বড় কঠিন সমস্যা বড় বউ। দোজবরে' বর, তাতে একটি ছেলে আছে বয়েসও বেশী। মিনতির মত মেয়েকে এমন বরে দিতে মন সরে না। অথচ এ ছাড়া উপায়ই বা কি? আজ চার বচ্ছর ধরে তো বিয়ের কথাবার্ত্তা চল্‌ছে—কত লোকেই তো দেখে গেল। কেউ তো দুদিন কথাও চালালে না।"

বউদি বলিলেন, "কিন্তু তাই ব'লে দোজবরে দেওয়া। তাও বুড়ো বর।"

"বুড়ো তাকে দেখে কেউ বলবে না। দিব্যি জামাইটির মত চেহারা তার। ওই ছেলেটা না থাকলে ও তিরিশ বছর ব'লে চলে যেত।"

"হাঁ তাও, ঐ সতীন বেটার ঘরে --আর সে বাপ তো ছেলে-অন্ত প্রাণ! আমার সাহস হয় না।"

"কিন্তু ঘরে বরে এমনটী পাবই বা কোথা? এক দোজবরে। নইলে অমন বরের সঙ্গে বিয়ে দিতে কে না চায়। ডেপুটি, তা'ছাড়া অবস্থা ভাল—সুন্দর সচ্চরিত্র যতদুর যা হ'তে হয়। আমরা যা দোনোমন ক'রছি। বাঙ্গলা দেশের হাজারো মেয়ের বাপ এ সম্বন্ধ পেলে নেচে উঠতো।"

"তা তো বটেই। মেয়ের বিয়ে যে শক্ত কাজ—শিশির বাবু বিয়ে ক'রতে চাইলে মিনতির মত 'দুশো' মেয়ের বাপ তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। তবু বাপ মা মরা মেয়ে আমাদের, তা'ছাড়া মেয়ে কিছু অবুঝ নয়—তাকে কি এমন স্থলে দিতে আছে। এতে বড় নিন্দে হ'বে।"

"মুখুজ্জে মশায় আর দিদি তো একবাক্যে মানা করলে এ কাজ ক'রতে।"

"দেখ তাঁরা অতবড় মুরুব্বী লোক, তাঁদের কথাই শোনা ভাল।"

"কিন্তু এও ভেবে দেখ, আমাদের যা অবস্থা তাতে মিনতিকে বড় জোর মানানসই রকম দুখানা গয়না দিয়ে দিতে পারি। তাও হয় তো তোমাদের দু' এক খানা গয়না দিলে তবে হবে। দশ বিশ হাজার টাকা কিছু ঢালতে পারবো না। যা পারবো তাতে ঐ কালো মেয়ে নিয়ে এর চেয়ে ভাল পাবই বা কোথায়?"

"ভগবান জুটিয়ে দিবেন। হ'ক কালো, তবু মিনতির মত মেয়ে হাজারে একটা মেলে না।"

"সে তো তোমার আমার মত, বড় বউ। কিন্তু বাইরের লোকে যে ওর কদর ক'রবে বড় তেমন তো মনে হ'চ্ছে না।"

মিনতি কর্ণময় হইয়া সমস্ত কথা শুনিল—তার বোধশক্তি প্রায় লোপ হইবার মত হইল। এই অসম্ভব ব্যাপার কি সত্য-সত্যই সম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে? শিশিরের সঙ্গে তার বিয়ে! আর দাদা বৌদি, বড়দি ও মুখুজ্জে ম'শায় তাঁরা এতে বিরোধী!

অনেকক্ষণ পর বড়দা' আবার কথা বলিলেন, "তা এখন শিশির বাবুকে কেমন করে' কথাটা লেখা যায়। তিনি উপযাচক হ'য়ে নিজে যখন প্রস্তাবটা উপস্থিত ক'রেছেন আমরা সাফ না বল্লে বড় অপমান বোধ হ'বে তাঁর। কি বলা যায় বল দেখি?"

বড় বউ একটু ভাবিয়া পরে বলিল, "লিখে দেও যে মেয়ের ইচ্ছে নেই। এতবড় মেয়ে, এ কথা বল্লে তাঁর এক রকম মান রক্ষে হ'বে।"

কি সর্ব্বনাশ! এতবড় একটা মিথ্যা কথা ইহারা বলিবে। মিনতির ভয়ানক রাগ হইল। এমনি যদি ইহারা লিখিয়া বসে তবে সে কি করিবে? সে কি বৌদির কাছে গিয়া বলিবে? না শিশির বাবুর কাছেই চিঠি লিখিবে?

বড়দা বলিল, "আচ্ছা, এক কাজ ক'রলে কি হয়? মিনতিকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রেই দেখ না।"

"জিজ্ঞেস ক'রতে চাও কর। কিন্তু তার কোনও দরকার আছে ব'লে তো মনে হয় না।"

"তবে যাও, এক্ষুণি যাও। সে ঘুমিয়েছে কি না দেখে এসো—যদি জেগে থাকে কথাটা পাড় গে।"

মিনতি বুঝিল যে বড় বউ খাট হইতে নামিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সে ছুট দিয়া আপন ঘরে পলাইল। তার জল খাওয়া হইল না।

একটু পরেই বড় বৌ আসিয়া তার ঘরে দেখা দিলেন। মিনতির বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। সে কোনও মতে আত্মসংযম করিয়া বসিয়া রহিল।

বড় বউ বলিলেন, "মিনু ঠাকুরঝি, একটা কথা জিগ্‌গেস ক'রবো, সত্যি তোর মনের কথা বলবি ভাই?"

কম্পিত হৃদয়ে মিনতি বলিল, "কি কথা বৌদি?"

বড় বউ মিনতির হাতে একখানা চিঠি দিলেন। ঘরের দুয়ারের পাশে লণ্ঠন ছিল, আনিয়া মিনতি পত্র পড়িল। পত্র লিখিয়াছে শিশির বিনোদকে।

শিশির লিখিয়াছে,—

"ভাই বিনোদ!

আজ তোমার কাছে ভারি একটা স্পর্দ্ধার কথা লিখ্‌ছি। জানি এর উত্তর কি হ'বে। আমার বুড়ো বয়সের ধাষ্টেমির যোগ্য পুরস্কার পাব, কিন্তু তবু না লিখে পারছি না।

তোমাদের মিনতিকে দেখে অবধি আমি তার রূপগুণে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি। আমি অনেক দিন আমার এ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছি। জানি এ অতি অসঙ্গত। বিদ্যুৎকে হারিয়েও যে আমি আবার অন্য নারীর দিকে চাইতে পারছি, এ আমার নীচতা। তা ছাড়া মিনতি ছেলেমানুষ, আমার যৌবন অতীত হ'য়ে গেছে। আমার তাকে পাওয়ার স্পর্দ্ধা করা ধৃষ্টতা। এই সব ভেবে চিন্তে অনেক দিন আপনাকে সামলে রেখেছি। কিন্তু আর পারছি না।

তোমার কাছ থেকে তার খাতাখানা এনেছিলুম, ফিরিয়ে দেবার আগে সব কবিতাগুলি নকল ক'রে রেখেছিলাম। তার বইখানা ছাপিয়ে আমি আমার পূজা সার্থক করবো এই স্থির করে তা' ছাপতে দিয়েছিলাম। আজ দপ্তরীর বাড়ী থেকে বইখানা এসেছে। দু'খানা তোমাকে পাঠালাম।

কিন্তু বইখানা পেয়ে আমার মনটা আরও অস্থির হ'য়ে উঠেছে। আমার মনে হ'চ্ছে যে, যার মধুর হৃদয়ের পরিচয় ও বইয়ের ছত্রে ছত্রে র'য়েছে তাকে না পেলে আমার জীবন অসার্থক হ'বে। অসার্থক হবেই জানি। কেন না, আমার মত দোজবরের হাতে তোমরা তাকে দেবে না, আর সেও আমার এ স্পর্দ্ধায় পদাঘাত ক'রবে। কিন্তু সে লাঞ্ছনাটা না পেয়ে আমার অশান্ত হৃদয় কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। তাই লিখছি, মিনতিরে তোমরা আমায় দেবে কি?

আমি জানি তুমি ও তোমার স্ত্রী এ চিঠি পড়ে' আমায় ঘৃণা করবে। মিনতিরও আমার উপর যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল তা' উপে যাবে। কিন্তু পতঙ্গ যেমন আগুনে মরবে জেনেও ছুটে যায় তেমনি আমি ছুটেছি। আমার পক্ষে আত্মসংবরণ অসম্ভব।

যদি পার তবে আমার এ ধৃষ্টতা ক্ষমা করো।

অভাগ্য, শিশির"

পত্র পড়িতে পড়িতে মিনতির চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। শিশিরের হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা ও তার ব্যথার করুণতা তাকে অভিভূত করিল। চিঠির-অক্ষরের ভিতর দিয়া মিনতি দেখিতে পাইল শিশিরের পীড়িত কুসুমকোমল চিত্তখানি। হায় রে! মিনতি যাকে কত রাত্রিদিন বসিয়া ধ্যান করিয়াছে, দুর্লভ রত্ন বোধে সে যাকে ভাল করিয়া কামনা করিতেও সাহস করে নাই—সে মিনতির জন্য ভিখারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও প্রত্যাখ্যানের ভয়ে ব্যাকুল। মিনতির চক্ষু ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িল। চিঠিখানা সে তিনবার পড়িয়া ভাঁজ করিয়া হাতের মুঠার ভিতর পুরিল। চট্ করিয়া কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

বড় বউ বলিলেন, "আমাদের ভুল বুঝে দুঃখ করো না ঠাকুরঝি। আমাদের কারও ইচ্ছে নেই এখানে তোমার বিয়ে দিতে। তোমার দাদা কেবল বল্লেন জবাবটা দেখার আগে তোমাকে একবার জিজ্ঞেস ক'রতে। তাই জিজ্ঞেস ক'রতে এলাম। নইলে—"

একটু হাসিয়া লজ্জিত ভাবে মিনতি বলিল, "না বৌদি তোমরা মিথ্যে ভয় করছো, আমি বিয়ে ক'রবো।"

"না ভাই, কোনও দরকার নেই, তুমি এমন কিছু গলার কাঁটা হওনি যে তোমার এমনি আপনাকে বলি দিতে হ'বে।"

"তুমি ভুল বুঝেছ বৌদি। আমি অনিচ্ছায় বলিনি। আমি সত্যই মনে করি যে এঁর সঙ্গে বিয়ে হওয়া আমার সৌভাগ্য।"

"কি বলিস তার ঠিক নেই। জানিস তুই শিশির বাবুকে?"

"দেখনি চিঠিতে, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল দিদির বাড়ীতে।"

"তা তো দেখছি—তার বয়েস জানিস?"

"হাঁ এই মুখুজ্জে ম'শায়ের বয়সী।"

"হাঁ, এই তাঁর চেয়ে দুই এক বছরের ছোট হ'বে। ঘরে একটা ছেলে আছে, তার বয়েস তের চৌদ্দ।"

"তাতে দোষ কি? এতদিন বিয়ে হ'লে তো আমার একটি ছেলে অন্ততঃ হোতই ও ছেলে তো আমার পাওনা।"

"ও তাই বল, তামাসা হ'চ্ছে। তুই যে দুষ্টু, তোর কোন কথা যে সত্যি কোনটা ঠাট্টা তা' আমরা মুখ্যু মানুষ, অত বুঝতে পারি না। ঠাট্টা রাখ ভাই, সত্যি বল। এ বিয়েতে তোর মত নেই।"

"সত্যি বলছি বৌদি আমার মত আছে।"

"ওই তেতাল্লিশ বছরের বুড়োর সঙ্গে?"

"আমার বয়েসটা হিসেব করে দেখেছ বৌদি? ঘটক ঘটকীর কাছে যতই ভাঁড়াও চিত্রগুপ্তের খাতায় পুরো বিশটি বছর লেখা হয়ে গেছে।"

বউদি তার হাত দুখানি ধরিয়া বলিলেন, "সত্যি করে বল ঠাকুরঝি, এই তবে ঠিক?"

"ঠিক বউ দি, আমি ওঁকে ছেলে সুদ্ধই বিয়ে করবো।"

বড় বউ তখন উঠিল। তারপর দুয়ারের কাছে গিয়া আবার ফিরিল। তার বিশ্বাস হইল না। আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমাকে ভাঁড়াস নে ভাই, সত্যি বল।"

"সত্যি বলছি বউদি আমি ওঁকে বিয়ে করবো, করবো, করবো। তিন সত্যি ক'রলাম। এখন সুখী হ'লে?"

"মর পোড়ারমুখী তোকে তিন সত্যি ক'রতে কে ব'লেছে?"

বড় বউ চলিয়া গেলেন। মিনতি চিঠিখানা বাহির করিয়া আবার পড়িল। তারপর চিঠিখানা বুকে চাপিয়া শুইয়া পড়িল। সে এখন অবাধে জাগ্রত অবস্থায় রাশি রাশি স্বপ্ন গড়িয়া গেল।

পরের দিন সকাল বেলায় বড়বউ মেজবউকে কথাটা বলিল। মেজবউ শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িল। অনেক ভাবিয়া সে বলিল, "ও কোনও কাজেরই কথা নয় দিদি। ঠাকুরঝি তোমাকে ভাঁড়িয়েছে। একে এতগুলো সম্বন্ধ এসে ফিরে গেল দেখে ওর ভারি অপমান বোধ হয়ে'ছে, তারপর ও দেখেছে এই নিয়ে ওর দাদারা মহা ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে। তাইতে ও এমনি ক'রে আপনাকে বিসর্জ্জন দিচ্ছে। এ হ'বে না। রস্যো আমি দেখি।"

মেজবউ ছিল মিনতির সমবয়সী, আর তার সঙ্গে মিনতির গলায় গলায় ভাব। সে ছুটিয়া মিনতিকে চাপিয়া ধরিল। বলিল, "বলি মুখপুড়ি এসব শুনছি কি? তুই নাকি তিনসত্যি ক'রেছিস্ ওই দোজবরে মিনসেকেই বিয়ে করবি?"

"কেন না ক'রবো? তোরাই বুঝি খালি বর নিয়ে ঘর করবি? আমার বুঝি আর সাধ যায় না?

"সাধ যায় তবে ও বুড়ো ঘাটের মড়ার সঙ্গে কেন? বাঙ্গালা দেশে তো ছোকরারা সব এখনো মরে নি?"

"যারা মরেনি তারা এঘাটে এসে ডুবে মরতে মোটেই রাজী নয় যে বৌদি। তোমার ঠাকুরঝি তো এমন কিছু পরীর বাচ্ছা নয়। তা'ছাড়া জানই তো বরাবরই আমার বুড়ো বরেরই সখ। তারজন্যে তপস্যা করবো ব'লেছিলাম মনে নেই?"

"দেখ, তোর শয়তানি আমার কাছে খাটবে না। ওসব চাল চালগে দিদির কাছে। তুই ভেবেছিস তোকে বিয়ে দিতে না পেরে তোর দাদারা ছটফটাচ্ছে, তাই তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে তুই এই কাণ্ড ক'রছিস। তা যদি ভেবে থাকিস তো সে একদম ভুল। তোর মেজদা বড়দা দুজনেই ব'লেছেন যে তোর যোগ্য বর নইলে তোকে বিয়ে দেবেনই না।"

"কিন্তু এ বরটি অযোগ্য কিসে? তুই দেখিস নি তাই বলছিস। যদি সে কার্ত্তিকের মত চেহারা দেখতিস তবে আমার সঙ্গে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিতিস্।

"মরণ আর কি? তেতাল্লিশ বছরের কার্ত্তিক"—

"আসল কার্ত্তিকের কথা ভেবে দেখ্, তার বয়েস প্রায় তেতাল্লিশ হাজার হ'তে চল্লো।"

"নে তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে বল। ঝুড়ি ঝুড়ি বই পড়ে তো কেবল কথার ঝুড়িই বেঁধেছিস্।"

"কি করি বল— তা ছাড়া তোর মত জ্যান্ত মানুষের কাছে তোতা পাখির মত শেখবার সুযোগ তো আমার নেই।"

"চুলোয় যাক, তুই সত্যি সত্যি আর ওই মিনসেকে বিয়ে ক'রতে যাচ্ছিস নে— কেমন ?"

"কেন ভাই ? সে বেচারার জীবন আমাকে ছাড়া একেবারে অসার্থক হ'য়ে যাবে লিখেছে, এই দেখ। তোর কি একটু দয়া মায়াও নেই ? আমার আছে।"

মেজবউ তখন মিনতির গলা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলকণ্ঠে বলিল, "লক্ষ্মী দিদি আমার, সত্যি ক'রে বল। সত্যি তোর মন চায় একে বিয়ে ক'রতে ?"

"হ্যাঁ ভাই সত্যি। যিনি আমাকে এমন সম্মান ক'রেছেন তিনি আমার জন্ম জন্মের দেবতা। তাঁকে আমি কোনও দিক দিয়ে ছোট ক'রে দেখতে পারিনে।" মিনতির চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

মেজ বউ তখন তাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "এর পরে আর আমার বলবার কিছু নেই ভাই। আশীর্ব্বাদ করি তোর উমার মত সৌভাগ্য হোক।"

মিনতি নত হইয়া ভ্রাতৃজায়ার পদধূলি লইয়া বলিল, "তোমার আশীর্ব্বাদ মাথায় তুলে নিলাম বউদি।"

ক্রমশঃ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

গোপন বাণী

না জানি সে কোন গূঢ় বাণী
কেহ যাহা প্রকাশিতে নারে।
প্রকাশের ব্যাকুল বাসনা
নিতি যার হেরি চারিধারে।
তরু ফুল ফলে থরে থরে
প্রকাশের আয়োজন করে,
তবু সেই অকথিত বাণী,
শাখাপুটে নারে ফুটাবারে,
হারাইয়া যায় হাহাকারে।
ছলছলি বহিছে তটিনী
কহিতে তা করে নানা ছলা।
সমীরণ করে বলি বলি
কিছুতে হয় না তার বলা।
বৃথা নিতি পাখীর কাকলী
গুণ গুণ গাহে বৃথা অলি
ঝিঁ ঝিঁ করে কাণ ঝালাপালা
কিছুতে না পারে ফুটাবারে
ফুটাতে যা চাহে বারে বারে।
কোন ছলে কোন ফাঁকে যদি
সে কথা জানিতে পারে কেউ,
গাছে তবে ফুটিবে না ফুল
নদী নদে উঠিবে না ঢেউ।
থেমে যাবে তটিনীর তান
মূক হবে কাননের গান,
বারে' যাবে সব সমারোহ।
কাজ নেই হয়ে' জানাজানি।
গোপনেই থাক সেই বাণী।

শ্রীফটিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

যৌবনের দিগ্বিজয় *

আপনারা চব্বিশ ঘণ্টা কাজের কথা এত শুনে থাকেন যে বাজে কথা কিছু শুন্‌লে মন্দ হয় না। শক্তি স্বাস্থ্যের কথা, যৌবনের কথা, কর্ম্ম দক্ষতার কথা, আরাম আয়াসের কথা ইত্যাদি কিছু কিছু বাজে কথা বল্‌ব।

তথাকথিত নিন্দা ও প্রশংসা

প্রথমেই একটা রগড়ের কথা শুনাচ্ছি। দিন দশ বারো ধরে নানা লোকের মুখে নানা কথা শুনছি। কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে—"হাঁরে তুই নাকি অমুক লোকের নিন্দা করিস? লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে নাকি নেতাদের অপমান করছিস্?" এই রকম ধরণের কথা আমাকে কমসে কম পাঁচ সাত জনে বলেছে। এ ভারি মজার কথা। নিন্দা অপমান করা হ'ল কখন? দেশে ফিরে এসে সেই বোম্বাই থেকে আরম্ভ করে এই ৬।৭ মাসের মধ্যে প্রায় দশ বারোটার উপর ইন্টারভিউ বা মোলাকাৎ খবরের কাগজে বেরিয়েছে। সব কাগজেই,—কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের বা জাতের কাগজে নয়। বক্তৃতাও বোধ হয় ৮।১০টা দিয়েছি যার শর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টে বিবরণ কমবেশী একটু আধটু কোন না কোন কাগজে বেরিয়েছে। ব্যস্। এখন অপমানটা করা হ'ল কোন ব্যক্তিকে, কোথায়?

নিন্দা করা অপমান করা এ হাড়ে জানে না। এই ৬।৭ মাস ধরে যা কিছু বলেছি বা করেছি তার একটা কথাও আমার নয়া নয়। বার বৎসর বিদেশে থাকবার সময় প্রায় আট দশ হাজার পৃষ্ঠার কাছাকাছি বাঙ্গলা, হিন্দি, ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মণ, এই পাঁচ ভাষাতে যা কিছু লিখেছি, আর এই ছমাস ধরে যা কিছু বলে যাচ্ছি সবের ধূয়াই এক। এর পূর্ব্বে সেই ১৯০৫-৭ থেকে ১৯১৪ পর্য্যন্ত ইংরেজি, বাঙ্গলা মাসিক দৈনিকে হাজার কয়েক পৃষ্ঠায় যা কিছু লিখেছি তার সঙ্গেও আজকার লেখা বা বক্তৃতার মূলতঃ অমিল নাই কোথায়ও। আপনাদের কাহারও কাহারও হয়ত অজানা নয় তা। এখন জিজ্ঞাসা হচ্ছে অপমানটা করা হল কোন যায়গায়—কাকে? হাঁ, আমার দেশটা আজকাল ইয়োরোমেরিকার চেয়ে খাটো একথা আমি প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করি,—লোকজনকে বলেও থাকি। কিন্তু তাতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে বেইজ্জৎ করা হয় কি করে'?

বরং লোকেরা আমাকে ঠিক উল্টো দোষের জন্য গালাগালি করে থাকে। আমেরিকায়, প্যারিসে, বার্লিনে থাকতে যখন যখন বিশ্ব বিদ্যালয়ের হোমড়া চোমড়া পণ্ডিতেরা তাঁদের

* বিগত ৩১শে মার্চ্চ বঙ্গীয় যুবক সমিতির উদ্যোগে আলবার্ট হলের এক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। তাহের উদ্দীন আহম্মদ কর্ত্তৃক লিখিত।

পরিষদে বক্তৃতা দিবার জন্য আবাহন করেছেন,—মায় সেই জগদ্বিখ্যাত ফরাসী আকাদেমীতে পর্য্যন্ত, সব পরিষদেই,—যুবক ভারতের জীবন কথাই প্রচার করেছি। অতীত তুনিঁয়া, বর্ত্তমান তুনিয়া, তুনিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যা কিছু ভেবেছি যা কিছু বলেছি বা লিখেছি সব তাতেই যুবক ভারত আমার আলোচ্য বস্তু হয়েছে। তার বৃত্তান্ত ওসব দেশের বড় বড় কাগজ পত্রেও ছাপা হয়েছে। একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, তখনকার দিনে সেই দূর বিদেশে আমার যাঁরা স্বদেশী ভায়া বন্ধু ব্যক্তি তাঁরা এই বলে আমাকে গাল দিতেন—"তোর মত আহম্মক আর কেউ নাই।" ভারতের কথা—যার মূল্য এক ছটাকও হবে না—তুই কিনা তাই আইনষ্টাইন, হাবার, ব্যর্গসঁ, ডুয়ী, গিলবার্ট মারে ইত্যাদির মতন বড় বড় মহারথীর সভায় লম্বা গলা করে বলে যাস! তোর এতটুকু লজ্জাও করে না?" কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মাপ কাঠিতে ভারত সম্বন্ধে যা কিছু উল্লেখযোগ্য পাই তা আমি উঁচু গলায় বলতে ছাড়িনি। তবুও তাকে ঠিক "প্রশংসা" করা বলা যায় কিনা সন্দেহ। কেননা,—আমার ব্যবসা হচ্ছে যথাসম্ভব খাঁটি তথ্য গুলার খতিয়ান করা, আমাদের দেশের তথ্য গুলাকে অন্যান্য দেশের তথ্যের দাঁড়ি পাল্লায় হাজির করা।

অতীতের কিস্মৎ

যাক এখন আজকের কথা বলা যাক। সকল কাজের ভিতরেই কিছু কিছু চিন্তা করবার জিনিষ, ধারণা করবার জিনিষ, মাথার জিনিষের প্রয়োজন আছে। আমি জিজ্ঞাসা করি,—আপনার জীবনে, আমার জীবনে কিম্বা অন্য কোন মানুষের জীবনে এমন কোন মুহূর্ত্ত আছে কি যে মুহূর্ত্তটা অতি মাত্রায় সুন্দর অতি মাত্রায় মধুর? যে মুহূর্ত্তকে আমরা বলতে পারি "রে মুহূর্ত্ত তুই অতি মধুর,' অতি সুন্দর, তোর মত মধুর আর কিছু নাই—তোর সমান সুন্দর আর কিছু হতে পারে না। তুই একবার দাঁড়া, তুই যেখানে আছিস সেইখানেই দাঁড়া, তোকে ভাল করে দেখে নিই, তোকে তলিয়ে মজিয়ে বুঝে নিই, তোর পশ্চিম পূর্ব্ব, উত্তর দক্ষিণ থেকে তোকে চেখে নিই।"

যদি আপনারা কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন "মানুষের জীবনে এমন কোনো মুহূর্ত্ত আছে কি? কারু জীবনে এ রকম মুহূর্ত্ত এসেছে কি?" এর উত্তরে আমি বলব—এ আসেনা—আসতে পারে না, কোনোদিন আসবে না—মানুষের জীবনে এ আসা উচিত নয়। যদি কোনদিন আমার জীবনে আসে আর আমি যদি বলি "রে মুহূর্ত্ত তুই আমার চির সহচর, তুই আমার জীবন-সাথী" তবে সেই মুহূর্ত্তই আমার মৃত্যুক্ষণ। যখন আমি বলছি অমুক মুহূর্ত্তের মত সুন্দর, মধুর আর কিছু হতে পারে না তখনই আমি নিজে নিজের বুকে ছুরি হেনে দিচ্ছি।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত এই হচ্ছে মানব জীবনের গতি,—সভ্যতার স্রোত। আপনারা হয়ত এ সত্য গ্রহণ করতে না পারেন—সেটা গ্রহণ করা না করা আপনাদের মর্জ্জি। আমার কাছে

কিন্তু এটা প্রথম স্বীকার্য্য। আমি বল্‌তে অভ্যস্ত, "রে অতীত। তুই আমার থুথু। তুই এসেছিলি,' তোর সাহায্যে আমার জীবনে হয়ত একটা বড় কিছু ঘটেছে, হয়ত সেটা অতি গৌরবময়। কিন্তু গৌরবের হলেও সেটা থুথু মাত্র। তা নিয়ে লাফালাফি করবার কিছু নাই।" এই গৌরবময় মুহূর্ত্ত হয়ত কোনদিন আমার জীবনকে উদ্বেলিত করে দিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে সেটাকে ধরে রাখতে হলে চিকিৎসকদের কথায় বলতে হয় "ওটা যে বিষ রে। থুথুটা ফেলে দিয়ে তুই তোর স্বাস্থ্য রক্ষা করেছিস। থুথুর দাম নেহাৎ কম নয়, কিন্তু এখন এই বিষ আবার তুলে নেওয়া যেমন, কোন গৌরবময় মুহূর্ত্তের সুখস্বপ্নে বিভোর থাকাও সেইরূপ।" আমার স্বতঃসিদ্ধটা আপনাদেরকে স্বীকার করতে বলছি না। আপনাদের যা বিশ্বাস তা আপনারা রাখতে সম্পূর্ণ অধিকারী, আমার যা তা আমি রাখতে সম্পূর্ণ অধিকারী।

এ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন এক শুভ মুহূর্ত্তে হয়ত বা কপালের জোরে কোন নবাব ছাহেবের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হয়েছিল। নবাব ছাহেব আমার সাথে হেসে কথা বলেছিলেন, এমন কি তাঁর আতর দেওয়া পানের খিলি পর্য্যন্ত আমাকে খাইয়ে ছিলেন। এই মুহূর্ত্তের স্মৃতি আমার মনে না হয় দু ঘণ্টা থাক বা তিন দিন থাক। কিন্তু ঐ নেশায় আমার মেজাজ শরিফ কতক্ষণ বা কতদিন থাকতে পারে বা থাকলে শোভন হয়? যদি আমি সেই শুভ মুহূর্ত্তের স্মৃতির রেশ নিয়ে তিন বৎসর কাটাতে চেষ্টা করি, নবাব ছাহেবের সেই ক্ষণিক বন্ধুত্বকে যদি জীবনে এক বড় পুঁজি বিবেচনা করে, প্রধান মূলধন বলে ভাবি তা হলে আপনারা আমার পাগলামি দেখে হাসবেন না কি? কতক্ষণ আপনারা আমার পাগলামি সইতে রাজি আছেন? যতই মধুর হোকনা কেন সেই মোলাকাৎ, পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে তাহা একদম কিম্মৎহীন।

অতীত সম্বন্ধে আগাগোড়া আমার এইরূপ ধারণা। এখন আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন "এই যদি অতীত হয় তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথা? এর উত্তরে আমি বল্‌তে চাই যে অতীত একটা প্রত্নতত্ত্ব মাত্র—আলমারীতে পুরে রাখবার জিনিষ। কবরে রাখবার জিনিষ। জীবনটা হচ্ছে বর্ত্তমান—বর্ত্তমানও নয়—ভবিষ্য দুনিয়াকে দখল করবার প্রবৃত্তি। এমন কোন কোন ক্ষণ হয়ত আসতে পারে যখন এই অতীতের আলোচনার ভাবে বিভোর হয়ে থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু দিনের পর দিন প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনকে গড়ে তোলাই, জীবনের স্রোত বাড়িয়ে দেওয়াই কাজের মত কাজ!

জীবন পূজার দেবতা,—যৌবন

যাঁদের সঙ্গে এই বিষয়ে আমার মিল নাই তাঁদেরকে আমি অসম্মান করিনা। কিন্তু আধ্যাত্মিক হিসাবে তাঁদের সঙ্গে আমার প্রথম হতেই আড়ি। বুঝতেই পারছেন যে আমার চিন্তার একমাত্র ধর্ম্ম হচ্ছে বর্ত্তমান-নিষ্ঠা, জীবন-পূজা। বস্তুতঃ আমার বিশ্বাস,—

" ধর্ম্ম নামক কোন বস্তু ছিলনা কোনো দিন দুনিয়ায়,
সংসারে বেঁচে থাকবার কলকে লোকে ধর্ম্ম বলে দুর্ব্বলের ভাষায়।"

আমার জীবন-পূজার একমাত্র দেবতা যৌবন। আর আমার এই দেবতার জন্য যদি কোনো পয়গম্বরের আবশ্যক হয় তবে কাকে আমি গয়গম্বর বিবেচনা করি? আমার সে পয়গম্বর মোহম্মদও নয়, যীশুও নয় বা শ্রীকৃষ্ণও নয়। সে হচ্ছে দুনিয়ার যৌবন শক্তি, যুবা মানুষ, যুবক দুনিয়া। তরুণ ব্যক্তি বা তরুণের দল এই আমার একমাত্র পয়গম্বর।

আমি আজকের কথা বলছিনা। বারো বৎসর আগেও যুবাই আমার পয়গম্বর ছিল। এই বারো বৎসরের মধ্যে যে কোন দেশেই আমি গিয়েছি,—ঈজিপ্ট, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান, চীন, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি ইত্যাদি—সব দেশেই আমার পয়গম্বর ঐ যুবক। যুবক ইংরেজ আমার দোস্ত, যুবক জাপানী, যুবক ফরাসী, যুবক চীনা, যুবক জার্ম্মাণ এরাই আমার পয়গম্বর। এটা একটু সোজাভাবে বলা যাক। দেশী বিদেশী হোমরা চোমরা অনেকের সঙ্গেই আমার দহরম মহরম চলেছে এবং চলে থাকে। কিন্তু আমি বল্‌তে চাই যে,—দুনিয়াটা এঁদের দ্বারা চলেনা। নামজাদাদেরকে আমি অশ্রদ্ধা করিনা। তাঁদের সঙ্গে আমার ভাব আছে কম নয়। কিন্তু তাঁরা আমাকে কোথায়ও তাতিয়ে তুলতে পারেন নি। কিছু হেঁয়ালী বোধ হচ্ছে বোধ হয়?

পয়গম্বর যুবা দুনিয়া

আরও খুলে বলি। আমার চেয়ে যে বয়সে বড় সে আমাকে কোন দিন কোন বিষয়ে এক কাঁচ্চাও শিখাতে পারেনি আর পার'বেও না। আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন "তবে কি যাদের সাথে বয়স হিসাবে তোমার সাম্য আছে যারা তোমার এক ক্লাসের ইয়ার তারাই কি তোমাকে শিখাতে পারে?" আমি বলব—না। তাও নয়। এ অতিবড় অহঙ্কারী দাম্ভিকের কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু দাম্ভিক আমি এক দম নই। যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন "বলি বাপুহে তবে তুমি কাকে সম্মান কর শুনি? কে তোমাকে শিখাতে পারে, কাকে তুমি গুরু বলে স্বীকার কর?" এর উত্তরে আমি বলব—যারা আমার চাইতে পাঁচ সাত বছরের ছোট এমন কি তারাও আমাকে শিখাতে পারেনা বা তাদেরকে আমি বড় সম্মান করিনা। খুব ভাল করে চেখে দেখেছি,—যে লোক আমার চেয়ে ৫।৭ বছরের ছোট তারা আমাকে শিখাতে পারেনা। কম্‌সে কম দশবছর পনর বছরের যারা ছোট এক মাত্র তারাই আমার পয়গম্বর, তারাই আমার গুরু।

ইংরেজ সমাজে, ফরাসী দেশে, সকল দেশেই বড় বড় দার্শনিক, কবি, ইঞ্জিনিয়ার, ঐতিহাসিক দেখেছি। তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বও আছে। তাঁরা আমার মত দশ বিশটাকে আলমারি আলমারি বই শিখিয়ে দিতে পারেন। মহা মহা দিগ্‌গজ সব। কিন্তু তাঁরা তাজা মানুষ জ্যান্ত

মানুষ নন্। দুনিয়াকে ভেঙ্গে চুরে টুকরো টুকরো করে নূতন করে গড়ে তুলতে পারে এমন সাধ্য তাঁদের নাই। কিন্তু দেখেছি ইংরেজ যুবাকে, ফরাসী যুবাকে জার্ম্মান যুবাকে। তারা আমার চেয়ে পনর বা বিশ বছরের ছোট। পাণ্ডিত্যের বৈঠকে হয়ত তাদের কোনই ইজ্জৎ নাই কিন্তু এরাই পারে বুড়া গুলারে ঢিট্ করতে। তাদেরকেই আমি দুনিয়ার পয়গম্বর বিবেচনা করি। এই গেল আমার যৌবন-বিজ্ঞানের সিঁড়ি, বিশ্বজয়ী যৌবনের বিজয়ে যাত্রার ধাপ-নির্দ্দেশ।

সেই ১৯০৫ থেকে আজ ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত আমার একমাত্র অভিজ্ঞতাই এই। এই বাঙ্গলা দেশে এই ভারতে আমাকে তিল তিল করে মানুষ করে তুলেছে কে? যাঁরা আমার চেয়ে বেশী বই পড়েছেন বা বেশী বিদ্যা শিখেছেন তাঁরা আমাকে শিখাতে পারেন নি। হাঁ তাঁদের কাছে বই মুখস্থ করেছি,—একথা অস্বীকার করিনা। কিন্তু আমাকে শিখায়েছে কে? যাঁদের নাম আপনারা কেউ জানেন না। এই আমাদের বাঙ্গলা দেশকে নূতন করে গড়ে তুলেছে কে? যাঁদের নাম খবরের কাগজে বেরোয় না। সে বি, এ, এম, এ পাশ করাও নয়। সে অজ্ঞাত কুলশীল ১৮।২২ বছরের যুবা। হয়ত দূর পল্লীর এক অজানা অখ্যাত কেরাণী অথবা চাষী কিম্বা চাষী-ঘেঁষা ভদ্রলোক। এরাই এই নবীন বাঙ্গলার জন্মদাতা। বাঙ্গলার যুবা নয়া বাঙ্গলাকে গড়ে তুলেছে। বুড়োরা একথা স্বীকার করবেন কিনা জানিনা। ছেলেদের ভিতর যারা বুড়িয়ে গেছে তারা একথা বুঝবে কিনা জানিনা। কিন্তু আমার নিকট এ হচ্ছে সনাতন সত্য।

যৌবনের স্রোত

এই যৌবন-বিজ্ঞানের নজির পাই সেই মান্ধাতার কালেও। যৌবনমদমত্ত যুবা একদিন বলেছিল

> "অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমি, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুমি, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এরা সবে,
> রবি শশী লতাপাতা পাথর দরিয়াও অগ্নিস্ফুলিঙ্গই ভবে।
> আনো চকমকি, লাগাও ঘষা, এখনি জ্বলিবে আগুন।" ইত্যাদি

এই আগুনের স্রোত ছুটিয়েছিল যুবক দুনিয়া। আমাদের ভারতে সেই যৌবনের গান শুনতে পাচ্ছি মধুচ্ছন্দার আগুন-ঋকে। ভারতই কেবল এই আগুনের গান গেয়েছে এমন নয়। চীন একদিন এই গানই গেয়েছিল। স্যুইজিন চীনাদের মধুচ্ছন্দা। পার্শীদের আবেস্তাও আগুনেরই গাথা। গ্রীকদের প্রমেথিয়স আমাদের মধুচ্ছন্দারই মাসতুত ভাই। মান্ধাতার আমলে এরা সবাই যৌবন-শক্তির অবতার, যুবক দুনিয়ার প্রতিনিধি।

কিন্তু অন্যান্য যুবারা দেখ্‌ল শুধু আগুনে চলেনা; ঘোড়া চরান, গরু চরান চাই, চাষ বাস চাই। তারা এসব সুরু করে দিলে। এই রকম আর আর যুবা দেখলে কেবল এ সবেও চলেনা। তারা ছুতোর মিস্ত্রির কাজ আরম্ভ করে দিলে। পাল্কী তৈরী আরম্ভ হল। গাড়ী

তৈয়ারী হল, ঢেঁকি তৈয়ারী হল, ঝাঁটা তৈয়ারী হল। দুনিয়া নানা প্রকার কিম্ভূত কিমাকার "নতুন-কিছু"তে ভরে যেতে লাগল। পুরাতনে কোনো যুবাই সন্তুষ্ট নয়। সবাই চেয়েছিল যৌবনের স্রোত বাড়াতে, জীবনকে অনির্দ্দিষ্টের পথে ঠেলে নিয়ে যেতে।

দেখতে দেখতে পল্লী গড়ে উঠল। এমন সময় আর একজন যুবক দেখলে শুধু পল্লীতে চলবেনা। "ভাঙ্গ পল্লী সহর গড়ে তোল।" পল্লীতে পল্লীতে জোড়া লাগান হল, এমনি করে সহরের সৃষ্টি হ'তে লাগল। আমাদের ভারতীয় যুবকরাও পল্লী ভেঙ্গে ফেলে সহরের পত্তন করতে ছুটেছিল। সহরেও ভারতবাসীর আধ্যাত্মিকতা আত্মপ্রকাশ করেছে। যে-সে রকম সহর নয় তার চৌহদ্দি ছিল ২১।২১॥ মাইল। এ আমাদের পাটলিপুত্র। যখন রোম নগরীর সীমানা ছিল মাত্র দশ মাইল। যাক বুঝা যাচ্ছে এই, পশ্চিমের যুবার আর পূবের যুবার আদর্শগত কোন তফাৎ ছিল না।

এই ভাবে যুবারা দুনিয়ার চাল চলন কত বিভিন্ন উপায়ে বদলে ফেলতে লাগল। রাজা প্রজার সম্বন্ধ দেখা দিল। জমিদারে রাইয়তে সংশ্রব সৃষ্ট হল। পল্লীতে পল্লীতে, শহরে শহরে, পল্লীতে শহরে রেশারেশি মূর্ত্তি পেল। কারিগরদের গিল্ড বা শ্রেণী জেঁকে উঠল। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই খানেই যুবারা ক্ষান্ত হয়নি—একেই চরম বলে স্বীকার করেনি। যুবক দুনিয়া কখনো বলেনি, "রে মুহূর্ত্ত তুই অতি সুন্দর তুই দাঁড়া"। সর্ব্বদা বলেছে "চাষ বাস মধুর বটে, কারিগরদের শ্রেণী-স্বরাজ সুন্দর বটে। গোপুরম, গথিক গির্জ্জা, গুম্বজ ওন্দা বটে। যা কিছু গড়ে তুলেছি সবই সুশ্রী বটে। কিন্তু এক মাত্র এই সবে সানাবে না। জীবনের পথ আবার নূতন করে গড়ে তুলতে হবে।"

এই খানে, দুনিয়ার বোমা ফুটল--বাষ্পযন্ত্র আর বাষ্পপোত এর ফলে দুই হাজার দশ হাজার বছরের সভ্যতা কোথায় চলে গেল! পয়দা হল উনবিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান জগৎ। মানবীয় যৌবন-শক্তির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সেই পুরাণা রাজা প্রজা উড়ে গেল,—পুরাণা পারিবারিক বন্ধন উড়ে গেল, পুরাণা ভাত কাপড়ের বিধান উড়ে গেল। পুরাণা জমিজমার বন্দোবস্ত, পুরাণা পল্লী শহর, পুরাণা চাষ-প্রধান সভ্যতা লোপ পেল।

দিগ্বিজয়ের মন্তর

জীবন ফুরাবার নয়। কোন যুগে কোন কেন্দ্রে, কোন ব্যক্তির জীবনে, কোন সমাজে ফুরাবার নয়। প্রত্যেক অতীত মুহূর্ত্তকে যুবা বলেছে "রে মুহূর্ত্ত তোকে আমি কলা দেখাচ্ছি।" মধুচ্ছন্দা, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য থেকে আরম্ভ করে হাজার হাজার ভারতীয় অভারতীয় ঋষিরা, মানব সভ্যতার প্রবর্ত্তকেরা বলে এসেছে,—"রে অতীত তোকে কলা দেখাচ্ছি, তুই চরে খা গিয়ে। তোকে রেখে দেব আলমারীর ভিতরে। তোকে

রাখব মিউজিয়ামে। ছেলেরা দেখবে। তুই ঠাকুর দাদাদের হাড়-গোড়ের মত থাকবি কবরে।" দিগ্বিজয়ী যৌবনের গানে এই হচ্ছে এক মাত্র "মুদ্দা"।

প্রতি মুহূর্ত্তে যুবা মানুষ ধরাখানাকে সরা জ্ঞান করে এসেছে। ধরিত্রীকে, ভূমিকে সর্ব্বদাই সে বলেছে :—

"অহমস্মি সহমান
উত্তরোনাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়্
আশামাশাং বিষাষহি" ॥—অথর্ব্ববেদ।

"আমি যৌবন। ক্ষমতার মূর্ত্তি—পরাক্রমের মূর্ত্তি। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামে লোকে জানে মোরে দুনিয়ায়। আমি উত্তম আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুনিয়াকে ভেঙ্গে চুরে তার উপর তাম্বি চালানো আমার স্বধর্ম্ম। আমি বিশ্বজয়ী,—দিকে দিকে বিজয় সাধন করা কর্ম্ম আমার।" এই যৌবন বিজ্ঞান সেই মধুচ্ছন্দার আমল থেকে হিণ্ডেনবুর্গ মার্শাল ফোশের সময় পর্য্যন্ত মানব জাতির স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। দিগ্বিজয়ই জীবনের, যৌবনের একমাত্র ধর্ম্ম। মানুষ জন্মেছে নূতন গড়ে তুলবার জন্মে। সকল যুবার মুখেই একবোল,—

"পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামে মোরে জানে লোকে ধরাতে,
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়কেতন উড়াতে।"

যুবক বঙ্গের দিগ্বিজয়

এই বিষয়ে এখন একটা নেহাৎ ঘরোয়া কথা হউক। অতীতকে থুথুর মত ফেলে দেওয়া অতীতকে কলা দেখানো ভারতবাসীর পক্ষে অতিমাত্রায় কঠিন জিনিষ নয়। বেশীদূর যেতে হবে না, এই যুবক ভারতের কৃতিত্বের ভিতরই গণ্ডা গণ্ডা নজির মিলে। কিন্তু নজিরগুলা দেখাতে গেলেই আপনারা আমার বিরুদ্ধে হয়ত একেবারে ক্ষেপে উঠবেন। কেননা খোলাখুলি দুএক জন লোকের নাম করতে চাই এই সূত্রে।

আপনারা সাধারণতঃ অতীত এবং মহা অতীত বিশ্লেষণ করে দর্শন নিংড়াতে অভ্যস্ত। কিন্তু দর্শন আমার কাছে প্রতিদিনের মামুলী কাজের মধ্যেই ধরা দেয়। আমি হাঁড়ী-কুঁড়ির ভিতর, আড্ডা-বৈঠক গল্প-গুজবের ভিতর ডাল-ভাতের মত অতি ছোট জিনিষের ভিতরও দর্শন দেখতে পাই। তাই বলছি যে,—এই যুবক ভারত, যুবক বাঙ্গলা, বাঙ্গলার যৌবন শক্তি প্রত্যেক দিনই দিকে দিকে বিজয় সাধন করেছে। যৌবনের দিগ্বিজয় বস্তুটা আমাদের আজকালকার বাঙ্গলায় নেহাৎ অপরিচিত মাল নয়। তবে এখানে আমার ভয় হচ্ছে। হয়ত আমি আজ যা বলে যাচ্ছি বাইরে লোকমুখে তার উল্টো ব্যাখ্যা ছড়িয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাদের দেশের বড় বড় লোকের ভিতরে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আর চিত্তরঞ্জন এই যে চারজন—এঁদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে কোনই গোলমাল হবার নয়। এঁরা প্রত্যেকেই বীর পুরুষ। এঁরা যে বীর একথা দিনের আলোর মত সত্য, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। যে কোনো দেশে যে কোনো যুগে যে কোনো সমাজে এই চার জন বীর লোকজনের পূজা পাবার উপযুক্ত। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এঁদেরকে বীর করে তুলেছে কে ?

আমরা এতই সংযম শিখেছি যে নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের ক্ষমতা, নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মশক্তি প্রচার করতে একেবারেই নারাজ। ভয় পাছে আমাদের আধ্যাত্মিকতার ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু আমার বিবেচনায় নিজ নিজ কৃতিত্ব ও কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাটা আধ্যাত্মিকতার অন্তরায় নয়। আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তির উপর শ্রদ্ধা, নিজ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে আস্থা রাখা এই সব চিজ কে দাম্ভিকতা অহঙ্কার ইত্যাদি বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। আমার মতে ঐগুলা দোষ নয়, গুণ। "অহঙ্কার"-ই হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতির বনিয়াদ। কাজেই যুবক ভারতকে আত্ম-চৈতন্যশীল, আত্মশক্তি পরায়ণ এবং আত্মকৃতিত্বে আস্থাবান দেখতে আমি ইচ্ছা করি। আমার সঙ্গে আপনারা একমত হবেন এরূপ আমি বিশ্বাস করি না। আমার মতে আপনাদেরকে টেনে আনা আমার মতলব নয়। তবে আমার বক্তব্য আওড়িয়ে যেতে আমি অধিকারী।

বঙ্কিম-স্রষ্টা ১৯০৫ সাল

বঙ্কিমচন্দ্র যুবক বাঙ্গলা সৃষ্টি করেন নি। যুবক বাঙ্গলাই বঙ্কিমকে গড়ে তুলেছে। বাঙ্গলায় যুবক শক্তি ১৯০৫ সালে কেমন করে জেগেছিল কেন জেগেছিল এসব প্রত্নতত্ত্বের খোঁজ করবার সম্প্রতি দরকার নাই। একদিন যুবক ভারত জেগে উঠে দেখল একটা জিনিষের তার অভাব। একটা মন্ত্র তার দরকার। এই মন্ত্র হচ্ছে "বন্দে মাতরম্।"

এটা ১৯০৫ সালে প্রথম ছাপা হয়নি। এটা ছাপা হয় আরও আগে সেই ১৮৮৫ কি ৮৬ সালে কিম্বা ঐ যুগের কোনো এক ক্ষণে। কিন্তু তখন বঙ্কিমকে কেউ বড় একটা পুছেনি। যখন বঙ্কিমচন্দ্র মরে ভূত হয়ে গিয়েছিলেন তারও অনেককাল পরে বঙ্কিমের তলব পড়েছিল। কে ডেকেছিল ? বুড়োরা নয়। যুবক ভারত, যুবক বাঙ্গলা বলে উঠল, "ঐ একটা লোক আছে, মানুষের মত মানুষ, ওকে খাড়া করে তুলতে হবে।" বঙ্কিমের যাঁরা চরম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি যে, যুবক ভারত, যুবক বাঙ্গলা একদিন বঙ্কিমকে অত উঁপরে আসন দেবে অতখানি মাথায় করে রাখবে।

বঙ্কিমচন্দ্র অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। তিনি বাঙ্গলার চিন্তা শক্তিকে খুব তাজা ও নিরেট করে রেখে গেছেন। তাঁর বেঁচে থাকাকালীন সাহিত্য সেবকগণ বঙ্কিমের সম্বন্ধে আলোচনা

করেছেন। কিন্তু কতটুকু করতেন, সেই সব আলোচনার দৌড় কতটা, এসব কথা পাঁজি দেখে বলা দরকার। তাঁর মরবার পরও তাঁর সম্বন্ধে অনেকে সমালোচনাও লিখেছিলেন একথা আমি অস্বীকার করিনা। ১৯০৫ সালের আগে বঙ্কিমের পশার বাংলা দেশে ছিলনা একথা কেউ বলবে না। ইস্কুল কলেজের ছেলেরা নভেল-পড়া মেয়েরা তার বই বালিশের নীচে লুকিয়ে রেখে পড়ত।

কিন্তু সেই বঙ্কিম আর ১৯০৫ সালের বঙ্কিম এক জিনিষ নয়। বন্দেমাতরম্ আগুনের স্রোতকে যুবক ভারত কোথায় নিয়ে ঠেকাবে তা আজও কেহ জানেনা। সেই বঙ্কিমী যুগের হোমরা চোমরারা তো কেউ ঠাহর করতেই পারেননি। বঙ্কিম তাঁর নিজের যুগে যুবা। প্রবীণরা এই নবীনকে বেশী বরদাস্ত করতে পারেন নি।

যুবক ভারত বাঙ্গলার যৌবনশক্তি বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙ্গলার মানুষের মধ্যে দুনিয়ার কাছে অদ্বিতীয় বীর বলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যুবক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বঙ্কিম-দর্শন দিগ্বিজয়ী বঙ্গীয় যৌবনের সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তিস্তম্ভ।

বিবেকানন্দের বাঘা চোখ

বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর বক্তৃতার ফলে মার্কিণ সমাজের কোন কোন মহলে ভারত সম্বন্ধে একটা সাড়া পড়ে যায়। সে ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫ সালের কথা। তার অনেকদিন পরে ১৯০২ সালে তিনি মারা যান—কিন্তু সে যুগের বাঙ্গালীরা বিবেকানন্দকে থোড়াই কেয়ার করত বললে মিথ্যা বলা হয় কি? তখনকার দিনে বড় জোর তার নামে দুই-একটা বোর্ডিং ঘর করা হত। আর সেখানকার ছেলেদের যদি জিজ্ঞাসা করা যেত "ওহে তোমরা কেমন আছ?" তারা উত্তর করত—"এখানে বিবেকানন্দ হয় কিনা জানিনা কিন্তু উদরানন্দ ত মোটেই হয়না!" যাঁকে একদিন অবতার বলে বাঙ্গালীর সমাজ পূজা করবে তাঁকে কতখানি ইজ্জত দিতে হয় তা ১৯০২ সালের যুগের বাঙ্গালী জানত না।

বিবেকানন্দের নামে সমিতি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান চলছে আজ বাংলার সর্ব্বত্র ডজনে ডজনে। বিবেকানন্দের সাহিত্য প্রায় প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙ্গালীই পাঠ করে থাকেন। বিবেকানন্দের "দরিদ্রনারায়ণ" বয়েৎ সেদিন মেয়ররূপে চিত্তরঞ্জন "মুন্সিপালাইজড" "অফি-সিয়ালাইজড" করে নগর শাসনের অন্যতম লক্ষ্যের মধ্যে খাড়া ক'রে দিয়েছেন। আমরা এই শব্দটা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচারিত করে ছেড়েছি।

আবার প্রশ্ন করছি,—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নামডাক কবে থেকে বাঙ্গালী সমাজে একটা জীবন-শক্তিরূপে দাঁড়াতে সুরু করেছে? "আশ্রম"গুলো ফুলে উঠতে সুরু করেছে কবে থেকে? ঠিক ১৯০৫ সালেও নয় আরও পরে। রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক বিবরণগুলো

ঘেঁটে অঙ্ক কষে বলে দেওয়া চলে। বোধ হয় ১৯১০ সালের এদিক ওদিক রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ আন্দোলনের জোয়ার ছুটতে আরম্ভ করেছে। এই আন্দোলন কে কে বাড়িয়েছে?

যুবক বাঙ্গলা একটা মানুষের মতন মানুষ খুঁজছিল। একটা মানুষ খাড়া করতে গেলে সে দর্শন জানে কিনা, ভাল সংস্কৃত তার দখলে আছে কিনা, লোকটা পণ্ডিত কিনা এসব দেখবার প্রয়োজন করেনা। বিবেকানন্দ দর্শন জানে কিনা যুবকবাঙ্গলা এ খবর নিতে যায় নি। দেখেছিল,,—তার ঐ বাঘা বাঘা চোখ দুটো—ব্যস্ আর কুছ পরোয়া নাই। তার ঐ সিংহের মতন পরাক্রম এই হলেই চলবে। এর বেশী কিছু দরকার নাই। যে মানুষটা বলবে,—

"পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামে মোরে জানে লোকে ধরাতে,
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়কেতন উড়াতে".

সে সংস্কৃত ফার্শী জানে কিনা তা ভাববার প্রয়োজন করেনা।

আমেরিকার খোলা আসরে দাঁড়িয়ে প্রথম যেদিন এক গোলামের বাচ্চা জোর গলায় সিংহ বিক্রমে বলেছিল "ভারত কারু চাইতে ছোট নয়, সেও একটা হাতী ঘোড়া কিছু করতে চায়—দুনিয়ায় একটা নতুন কিছু করে ছাড়বে"—দুনিয়া বুঝেছিল যে, জগতে যুগান্তর আসছে। তার অনেক কাল পরে ১৯০৫ সালের যুবক বাঙ্গলা দুনিয়ার আর সব জাতির সঙ্গে সমান অধিকারের দাবী নিয়ে দাঁড়াবার মতন দুঃসাহস দেখিয়েছিল। তাই বাঙ্গলার যৌবন-শক্তি এই অহঙ্কারী আত্মচৈতন্যশীল "দাম্ভিকতার" প্রতিমূর্ত্তি কর্ম্মবীর "বাপকা বেটা"কে নিজেরাই অবতার রূপে খুঁজে বের করেছে। বাঙ্গালী যৌবনের দিগ্বিজয়ে বিবেকানন্দ এক বিপুল কীর্ত্তিস্তম্ভ।

যৌবন-নিষ্ঠায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালীর আর এক "বাপের বেটা" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এখানে যত লোক উপস্থিত আছেন,—বাঙ্গলার অলিতে গলিতে যত উকিল দু-পয়সা রোজগার করছেন,—বাঙ্গালী সমাজে বি, এ ফেল, বি, এ পাশ,—গল্প লেখক, সাংবাদক, কেরাণী, মাষ্টার যত যা আছেন, তাদের অনেকেই আশুতোষের কাছে ঋণী। এই আশুতোষ বাঙ্গলার জন্য বাঙ্গালীর জন্য শিক্ষা সাহিত্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করে গেছেন পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে আর কোনো ব্যক্তি একলা তেমনটি করতে পারেন নি। এইরূপই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এঁকে গ্রীস পেরিক্লেয বা ফরাসী নেপোলিয়নের মতই জবরদস্ত হুঁদে কর্ম্মবীর রূপে জগতের "পূজাস্থান" বিবেচনা করি। এখন আবার প্রশ্ন হচ্ছে,—আশুতোষ আমাদের সৃষ্টি করে গেছেন, না, আমরা আশুতোষকে সৃষ্টি করেছি?

১৯০৫—১৯১০—১৯১৫ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর নিয়ে দেখুন। আজ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় "সজ্ঞানে"—ভারতে, এমন কি ইয়োরামেরিকায়ও,—বাঙ্গালীকে বড় করে তুলে ধরেছে, কমসে কম বড় করে তুলবার চেষ্টা করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় আজ বাঙ্গালী জাতের অতিবড় দুরাকাঙ্ক্ষা প্রচার করেছে। এই দুরাকাঙ্ক্ষার আসল এবং সকলের চেয়ে সেরা উৎস হচ্ছে আশুতোষ। কিন্তু এই যে বাঙ্গালীর দুরাকাঙ্ক্ষ হয়ে জগতের সামনে বের হয়ে পড়তে চেষ্টা—এ কবেকার কথা? অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষের কীর্ত্তিযুগ কতদিনকার জিনিষ?

আমার বিবেচনায় আশুতোষের যুগ মোটের উপর ১৯১৪-১৫ থেকে ১৯২৪-২৫ পর্য্যন্ত। একটুকু খুলে বলা দরকার। ১৯১৮ সালের কথা মনে পড়েছে। আমি তখন একদিন আমেরিকার নিউইয়র্কে পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে ইয়াঙ্কি, বিলাতি, ফরাসী, জার্ম্মাণ পত্রিকা ঘাঁটছিলাম। হঠাৎ ঐ সব বিদেশী পণ্ডিত পরিষদের মুখপত্রে বাঙ্গালীর লেখা আমার চোখে পড়ল। বাঙ্গালীর লেখা আমেরিকা ইংলণ্ডের কাগজে বেরিয়েছে—একথা ভয়ানক আশ্চর্য্য বোধ হল। তাও আবার একটা দুটা নয়। বছরের মধ্যে এই ধরণের গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রায় দশ বারটা। তখন দেখতে আরম্ভ করলাম, কোন তারিখের জিনিষ এসব। হিসেব করে দেখা গেল যে, মোটের উপর ১৯১৬—১৭ সালের পেছনে এ জিনিষ ঠেলে নেওয়া যায় না। ঐ সময় থেকে বাঙ্গলা দেশ জ্যান্ত ভাবে দুনিয়ার সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করতে চেয়েছে। এই যুগটা আশুতোষের যুগ। ১৯১৫ কি ১৬ তে এর পত্তন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলার কীর্ত্তিস্তম্ভ কিন্তু এ কীর্ত্তির স্থাপয়িতা কে? আশুতোষ?—না। আমি বলব, যুবক ভারত। যুবক বাঙ্গলা ১৯০৫ সালে জেগেই বলেছিল,—"চাই আমরা স্বরাজ, চাই আমরা স্বদেশী, চাই আমরা বয়কট আর চাই জাতীয় শিক্ষা।" এই "জাতীয় শিক্ষার" আন্দোলনটা কি চিজ? গোড়ার কথা হচ্ছে,—বাঙ্গলার যুবক শক্তি বুঝেছিল যে, প্রাচীন দুনিয়ায় প্রাচীন ভারতের ঠাঁই আবিষ্কার করতে হবে। এই শক্তি ইংরেজ জার্ম্মাণ ইত্যাদি পণ্ডিতের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিবার প্রতিজ্ঞা করেছিল। সেই আন্দোলনের দ্বিতীয় সাধনা ছিল বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান রসায়ন তড়িৎ পদার্থ-বিদ্যা ইত্যাদি সবই বাঙ্গালীর নিজের সজ্জায় এনে কৃষি-শিল্পের উন্নতি করা। আর শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলাকে বাঙ্গালীর তাঁবে আনা—এই ছিল যুবক বাঙ্গলার তৃতীয় সংকল্প ও স্বপ্ন।

১৯০৫-১০ সাল পর্য্যন্ত অসমসাহসিক যুবক বাঙ্গলা তুমুলভাবে আন্দোলন চালিয়েছিল। আশুতোষ তখন এ লাইনে কিছু করেছিলেন কি? করেন নি। তিনি তখন যুবক বাংলার অনেক পেছনে পড়েছিলেন। বাঙালী যৌবনের দিগ্বিজয় যে তাঁকে একদিন হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে, তা তখনও তিনি ঠাওরাতে পারেন নি।

কিন্তু ১৯০৫-১০ এই বছরগুলো আশুতোষের পক্ষে শিক্ষানবিশীর অবস্থা। বাঙ্গলার নাবালকদের কাণ্ডকারখানা তাঁকে নিবিড়ভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। এই যে যৌবন-শক্তির

প্রচেষ্টা এটা সম্ভব কি ? তাই ছিল ভাববার কথা। ১৯০৫ সালে তিনি আমাদের বিরোধী ছিলেন। অনেকেই এ কথা জানে। কারণগুলা আলোচনা করবার দরকার নাই। তা ভাবতে অনেক বছর কেটে গেল। আসল কথা হচ্ছে যুবক বাঙ্গলার কৃতিত্ব, দুরাকাঙ্ক্ষা, অসাধ্য সাধনের প্রয়াসই তাঁর মনের উপর কাজ কর্‌ছিল। যুবক বাংলাই তাঁকে সাধনার সিদ্ধি লাভের যন্ত্র আবিষ্কারের পথে চালিয়েছে,—আশুতোষকে সেনাপতি করে তুলেছে। এর ফলেই আজিকার বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়। যুবক ভারতের নিকট আশুতোষের পরাজয়টা আশুতোষের বীরত্বের ভিত্তি।

যুবক যা চিন্তা করে, বুড়োরা তা ভাবতে পারে না। নাবালক নায়কের পেছনে পেছনে থাকে বুড়োরা। ১৯০৫-৬ সালের "জাতীয় শিক্ষার" বাণী সেকালের বহু গণ্য-মান্য বাঙালীর নিকটই অতি চরম কিছু মনে হয়েছিল। কিন্তু ১৯০৫ সালে যুবক বাঙ্গলা শিক্ষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্পের আসরে যা কিছু চেয়েছিল তার প্রায় সবই আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মজুদ। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেকটা "জাতীয়" প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই আশুতোষের মহত্ব। অবশ্য আজ আবার এর অনেক দিকেই সংস্কার দরকার।

তবুও একটা "কিন্তু" আছে। যুবক বাংলার চরম কথা এখনো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই, কেন না সরকারের শাসন এখনো এই পাঠশালায় চল্‌ছে। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় হতে গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ একেবারে রহিত করে দিলেন না কেন ? এ বিষয়ে "অসহযোগের" যুগে,—১৯২২ সালে বোধ হয় চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে একবার তাঁর বচসা হয়। সে সব কথা আপনারা সকলেই জানেন। আমি তো বিদেশে বসেই অল্পবিস্তর শুনেছি। চিত্তরঞ্জন আশু-তোষকে বলেছিলেন, তুমি যদি গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ রহিত কর তবে কালই তোমার হাতে দু'চার কোটী টাকা তুলে দেব। আশুতোষ একথা বিশ্বাস করতে পারেন নি। আমি বলতে চাই বিশ্বাস না করাই ঠিক হয়েছিল,—কারণ তখন অত টাকা উঠত না। আর উঠ্‌লেও একমাত্র দুইকোটি চার কোটির জোরেই গোটা বাঙ্গলাদেশের জন্য জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা পাঁচ সাত দশটা তাজমহল গড়ার বরাৎ। যাক সে কথা। মোটের উপর বুঝা গেল যে, শেষ পর্য্যন্ত আশুতোষ যুবক বাংলার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে চলেছিলেন,—কেবল পারেন নি ঐ সম্বন্ধটা টুটাতে।

চিত্তরঞ্জনের গুরু যুবক বাঙ্গলা

এইবার চিত্তরঞ্জনের কথা। চিত্তরঞ্জন নামজাদা হয়ে পড়েছেন কবে থেকে ? ১৯০৫ সালে তাঁকে জানা যায় নি। ১৯১৫ সালেও তিনি বাইরে। লোকেরা তাঁকে চিন্‌ত না তা নয়। যুবাদের সঙ্গে তাঁর লেন-দেন ছিল না এ কথা বলছি না। বলছি এই যে, যুবক বাংলার সঙ্গে তিনি তখনও খোলামাঠে যোগ দিতে পারেন নি। যে চিত্তরঞ্জন

১৯২৪-২৫ সালে গোটা বাঙ্গলার গোটা ভারতে গোটা দুনিয়ায় এক অদ্বিতীয় বীর সাব্যস্ত হবে, কেল্লা ফতে করবে আর সেই কেল্লার মধ্যেই বিজয়-গৌরবের অধিষ্ঠান জীবন উৎসর্গ করবে সে চিত্তরঞ্জন তখনও বাইরে ছিলেন। অঙ্ক কষে বলে দেওয়া চলে চিত্তরঞ্জন কবে আসরে নেমেছেন বা নামতে বাধ্য হয়েছেন।

তখনও আবার আমি বিদেশে, ফ্রান্সে। একদিন কথা প্রসঙ্গে এক গুজরাতী বন্ধুর সঙ্গে বলেছিলাম, বাঙ্গলা থেকে তো কোন লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ বলে উঠ্‌লে,—"ক্যা, দাস বাবু কা নাম আপকা মালুম নাহি হ্যায়?" জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, দাস বাবু আবার কে? দাসতো বাঙ্গলায় কতই আছে। জবাব পাওয়া গেল,—দাস সাহেব, ব্যারিষ্টর থা উস্কা বহুৎ প্রাকটিস্ থা। অনেক আলোচনার পর বাহির হ'লো চিত্তরঞ্জনের নাম। চিত্তরঞ্জন জীবনের শেষ দিকে মাত্র দুই তিন বৎসর নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে দেশের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আবার মজার কথা। তিনি যখন আসরে নেমেছিলেন তাঁর বন্ধুরা প্রবীণ বিজ্ঞেরা তাঁর ছায়া মাড়িয়েছিলেন কি? মাড়ান নি। তিনি যুবার পাল্লায় পড়ে আসরে নেমেছিলেন,—শেষ পর্য্যন্ত যুবারাই তাঁকে অবতার করে রেখেছিল। তাঁর ডাইনে বাঁয়ে কেবল ১৮।২২ বছরের যুবা। নেতা হল ১৮।২২ বছরের যৌবন শক্তি। আর তারই পশ্চাতে থেকে—অথবা তারই মুখপাত হয়ে চিত্তরঞ্জন দেশ-বন্ধু দাঁড়িয়ে গেলেন। দিগ্বিজয়ী বঙ্গীয় যৌবনের এক শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ চিত্তরঞ্জন। যুবক ভারতের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আন্তরিক সাক্ষ্য চিত্তরঞ্জনের নিকট যত পাওয়া যেতে পারত, অত বোধ হয় আর কারুব কাছে নয়।

সর্ব্বত্রই দেখতে পাচ্ছি, যুবক ভারত প্রতিজ্ঞা করে, যে,—অসাধ্য সাধন করতে হবে। তারা নিজে খেটে নিজের জীবনে পরখ করে, নিজেরা ভুগে দেশকে দেখায়,—কাজটা করে তোলা নেহাৎ অসাধ্য নয়। তখন বড় লোকেরা এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। তখন এসে তাঁরা বলেন হাঁ কাজটা করতে হবে। এই হচ্ছে যৌবন-বিজ্ঞানের ধারা।

বৃহত্তর ভারতে রবীন্দ্রনাথ

যাক এসব তো মরা বাঘের কথা বললাম। এখন একটা জ্যান্ত মানুষের কথা বলা যাক। বলতে যদিও ভয় হচ্ছে, কেন না আপনাদের মেজাজ বুঝে উঠা কঠিন। রবি বাবুকে অনেক যুবক পছন্দ করেন না। তার কারণ অবশ্য আমি জানি না, বুঝতেও পারি না। কিন্তু আমার বিবেচনায় রবিবাবু একজন সেরা যুবা। যুবক বাঙ্গলার দিগ্‌বিজয়ে প্রথম কীর্ত্তিস্তম্ভ বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ বিবেকানন্দ, তৃতীয় আশুতোষ, চতুর্থ চিত্তরঞ্জন। তেমনি আর এক কীর্ত্তিস্তম্ভ

ঐ জ্যান্ত মানুষটা রবীন্দ্রনাথ। এই সম্বন্ধে বেশী কিছু বলব না। মাত্র দুএকটা কথা বলতে চাই। গত বৎসর এই রবীন্দ্রনাথ মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কোথায়? ভারতে নয়। এশিয়ায় নয়,— সেই সুদূর দক্ষিণ এমেরিকার পথে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের বুকের উপর। যদি ঐ রকম অবস্থায় ঘটনাচক্রে তাঁর মৃত্যু ঘট্‌ত,– মরলে ভাল হত বা সুখের হত তা বলছি না,— তা হলে বাঙ্গালী সমাজে যে একটা ৬৬ বছরের যুবা ছিল তা দুনিয়ার লোকে টের পেত। কিন্তু তিনি সৌভাগ্যক্রমে মরতে মরতে যমের দুয়ার হতে ফিরে এসেছেন। এই ৬৬ বছরের প্রবীণকে যুবা তাজা নবীন বলছি কেন? এঁকে যৌবন ধর্ম্মের বড় খুঁটা বিবেচনা করছি কেন?

সেই সুদূর আর্জ্জেন্টিনিয়া প্রদেশে তিনি যুবক ভারতের, যুবক বাঙ্গলার বাণী প্রচারিত কর্‌তে ছুটে যাচ্ছিলেন। কোথায় চীন, কোথায় সুইডেন সকলের সঙ্গেই বাঙ্গলার যৌবন শক্তির যোগাযোগ কায়েম করবার আন্দোলনে তিনি নিজকে সজাগভাবে মোতায়েন রেখেছেন।

এই কারবারে রবীন্দ্রনাথের বাহাদুরী কোথায়? তিনি যুবক ভারতের ডাকে সাড়া দিতে পেরেছেন বলে'। আর কোনো প্রবীণ ভারত-সন্তান তো তা এখনো পারেননি। এই-টাই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।

বিদেশে ভারতের প্রতিনিধি থাকা ভারতের পক্ষে ভারি দরকারী, এই কথা যুবক ভারত লম্বা গলা করে দেশের লোককে জানাচ্ছে আজ দশ পনর বছর ধরে। কৈ? লোকের কানেতো একথা গিয়ে পশ্‌ছে না। যুবক ভারতকে দুনিয়ার নেমন্তন্ন পাঠাচ্ছে, আহ্বান কর্‌ছে, "আয় তোরা আমাদের দেশে, তোদের প্রতিনিধি পাঠা, আমাদের দেশে ভারতীয় পরিষদ গড়ে তোল।" আমেরিকায় ভারতীয় প্রতিনিধি, ফ্রান্সে ভারতীয় প্রতিনিধি, ইংলণ্ডে ভারতীয় প্রতিনিধি, পাঠান অতি আবশ্যক। একথা নবীনেরা বল্‌ছে, প্রবীণেরা তো বুঝতে পার্‌ছে না। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণ, জাপান, ফ্রান্সের সঙ্গে মেলামেশা করে দেখাতে চাই যুবক ভারত বেঁচে রয়েছে। ভারতের বাইরে যে সব উড়নচণ্ডী যুবক পড়ে রয়েছে সেই সবকে দেশের লোক বোধ হয় "ভ্যাগাবণ্ড" বলে। কিন্তু এরা অনেকেই কাজের লোক। তারা "বৃহত্তর ভারত" গড়ে তুলেছে। তারা এ বিষয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে।

ওসব দেশে প্রতিনিধি রেখে আমরা একমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনই চালাবো একথা বলছি না। ইংরেজের প্রতিনিধি ফ্রান্সে বা ফ্রান্সের প্রতিনিধি আমেরিকায় আছে। তারা কি রাজনৈতিক আন্দোলন চালায়? এই ইংরেজ প্রতিনিধি ফ্রান্সে বসে বা ফ্রান্সের প্রতিনিধি আমেরিকায় বসে কোনো দেশের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে খবরের কাগজ চালায় না। অথচ তারা প্রত্যেকেই ধীরে সুস্থে দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা নিজ নিজ দেশের স্বার্থ পুষ্ট করেই চলেছে।

দুনিয়ার সর্ব্বত্র ইংরেজের প্রতিনিধি রয়েছে। তারা সে সকল দেশে যা কিছু করে

আমাদের প্রতিনিধিরাও ঠিক তাই করবে। এই রকম ভারতীয় প্রতিনিধি মার্সেইয়তে, ইয়োকোহামায়, হাম্বুর্গে, লণ্ডনে পাঠাতে হবে। দুনিয়ার প্রত্যেক বিদ্যার কেন্দ্রে এমনিতর ভারতীয় প্রতিনিধি থাকা চাইই চাই। এই আন্দোলনে আর কেউ যোগ দিতে পারেন নি। প্রবীণদের মধ্যে যদি কেউ যুবক ভারতের এই বৃহত্তর-ভারত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সমঝে থাকেন,—বিদেশে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ভারতীয় প্রতিনিধি রাখবার স্বার্থকতা, বিদেশীদের সাথে কর্ম্ম ও চিন্তার বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে থাকেন তবে সে এই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে এই জন্য যুবক ভারতের, যুবক দুনিয়ারই প্রতিনিধি বিবেচনা করছি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কোন প্রবীণকে সে ইজ্জৎ দিতে বড় শীঘ্র রাজি হব কি না সন্দেহ।

রক্ত কবরীতে যুবার ইজ্জৎ

রবিবাবু সম্বন্ধে আর একটা মাত্র কথা বল্‌তে চাই। বেশী সময় নেব না। তাঁর "রক্ত কবরীর" কথা বল্‌ছি। এইখানেও কবির উপর ভারতের যৌবনশক্তিরই জয় জয়কার দেখতে পাচ্ছি। যে-সে হাড়ে রক্তের লাল বেরোয় না। সে কেবল যৌবনের তাজা হাড়েই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যুবা, যুবার সেবক ও ভক্ত। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কীর্ত্তির চেয়ে তাঁহার যৌবনপ্রীতি এবং যৌবন-নিষ্ঠা ছোট করার নয়।

যুবা দুনিয়ার বাণী রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। জগতের যৌবনশক্তি ফরাসী কবিকে, জার্ম্মাণ কবিকে, ইতালিয়ান কবিকে, ইংরেজ কবিকে, রুশ কবিকে, মার্কিণ কবিকে, মানবজাতির পুনর্গঠন সম্বন্ধে নানা কথা শিখাচ্ছে। সেই সকল কথারই কিছু কিছু রবিবাবুর কানেও এসে পৌঁছেচে। আর কোনো বাঙ্গালী বা ভারতীয় প্রবীণের সাহিত্য রচনায় তা মূর্ত্তি পাচ্ছে কিনা সংপ্রতি আলোচনা করব না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মহত্বই এই যে, তিনি নিজ যৌবন-শক্তির অনুসরণে অভ্যস্ত এবং সুপটু। "রক্তকবরী" সৃষ্টি করে তিনি দুনিয়ার যুবক বাঙ্গলার ইজ্জৎ রক্ষা করেছেন। যৌবন-শক্তির দিগ্‌বিজয় বাঙ্গলার যে সব উচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভে আত্মপ্রকাশ করেছে তার ভিতর রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব অন্যতম।

নির্লজ্জ বেহায়ার মতন আমি অনেক বাজে বকে যাচ্ছি। এসব কথা আপনাদের কানে হয় ত বিতিগিচ্ছিরি লাগছে। কিন্তু আমার নিকট এসব কথা দু দুগুণে চারের মত প্রথম স্বতঃ-সিদ্ধ।

চাই তরুণের আত্মচৈতন্য

বাঙ্গলার যৌবনশক্তি বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মত মরা লোকগুলাকে জ্যান্ত করে তুলেছে। আর আশুতোষ-চিত্তরঞ্জনের মতন জ্যান্ত লোকেরা বাঙ্গলার যৌবনশক্তির প্রভাবেই যুবা হয়ে কাজ করেছেন। এঁরা সকলেই আজ এজগতে নাই। কিন্তু চোখের সামনে আমাদের যে

অদ্বিতীয় বঙ্গসন্তান হাটে বাজারে নেচে গেয়ে কবিতা রচে বেড়াচ্ছেন তিনিও যুবক বাঙ্গলারই এবং খানিকটা যুবক দুনিয়ারও সৃষ্টি। এই কয়জন বাঙ্গালী বীরদের সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হল আমার মতে কোনো মহাপুরুষের পক্ষে এর চেয়ে বেশী গৌরবের কথা আর কিছুই হতে পারে না। যে সকল লোককে যুবারা জ্যান্ত করে' রাখে অথবা যারা যুবাদের নিকট পরাজিত হবার মতন শক্তি ও সাহস রাখে তারাই দুনিয়ার আসল বীরপুরুষ।

আজ ১৯২৬ সাল। যুবক বাঙ্গলা ১৯০৫ গড়েছিল, ১৯১৫ গড়েছিল,—এইভাবে পর পর প্রত্যেক মুহূর্ত্তই গড়ে এসেছে। আজকেও তাকে আবার নূতন একটা কিছু গড়ে তুলতে হবে। প্রবীণেরা কোনোদিন নবীনকে গড়েনি। চিরকালই প্রবীণেরা নবীনদের পেছনে পেছনে ভয়ে ভয়ে এগিয়েছে। আজও তাই হবে।

এই আত্মচৈতন্য, এই অহঙ্কার, এই ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠাই আজ যুবক ভারতের দরকার। ১৯২৬ সালের যুবা সদর্পে বলুক,—"রে অতীত তুই আমার থুথু তুই চরে খা। রে ১৯০৫ থেকে '২৫, তোকে কলা দেখাচ্ছি। তোকে মিউজিয়ামে রেখে দেব তুই সেখানে আলমারীর কাচের মধ্যে সযত্নে তোলা থাকবি। রে ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে নূতন জীবন গড়ে তুলতে পারবো কিনা জানি না, তবে আমাদের কর্ত্তব্য অসাধ্যসাধন।"

প্রথমেই বলে রাখি,—১৯২৬ সালটা—১৯০৫ বা ১৯১৫এর মত অত সরল সহজ নয়। এটা অতি জটিলতাপূর্ণ। অনেক ভজকট এসে জুটেছে আমাদের জীবনে। আজ যুবার পক্ষে একটা কিছু করতে হলে অনেক কাঠখড়ি অনেক তেলনুন দরকার। এযুগে অসাধ্যসাধনের কল্পনা করা যারপরনাই কঠিন। এই জটিলতার দুএকটা কথা এখুনি আপনাদিগকে শুনাতে চাই। কিন্তু শুনলেই আপনারা বোধ হয় আমাকে একেবারে মেরেই ফেলবেন।

তথাকথিত ভারতীয় ঐক্য

প্রথম কথাটা হচ্ছে এই যে,—ভারতবর্ষ এক দেশ নয়। ভারতীয় ঐক্য একটা মিথ্যা কথা। ১৯০৫ সালের আগে এবং পরে আজ পর্য্যন্ত আমরা এই মিথ্যাটা মুখস্ত করে এসেছি। কিন্তু একটা নয়া সত্যের সঙ্গে ১৯২৬ সালের যুবক ভারতকে পরিচিত হতে হবে, এতে অভ্যস্ত হতে হবে। বাঙ্গালীর সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুরের একপ্রকার কোন মিল নাই। মারাঠীরা তেলেগু বোঝে না, বুঝতে পারে না। পাঞ্জাবীরা মান্দ্রাজীকে বোঝে না, বুঝতে পারে না। তাই বলব এই ঐক্য এই ভারতীয় ঐক্যের কথা একটা বোল মাত্র। আসল বস্তুনিষ্ঠার দিক দিয়ে এ সমস্যার দিকে অগ্রসর হ'লে বল্‌তে বাধ্য হব যে,—ইউরোপ যদি এক দেশ হয়, পর্ত্তুগাল যদি রুশিয়াকে ভাই ভাই রূপে আলিঙ্গন করতে পারে তবেই ভারতবর্ষের পক্ষেও একদেশরূপে বিবৃত হবার দাবী চল্‌তে পারে।

এতদিন দেশের জননায়কেরা দেশের লোককে যা শিখায়েছে তার গোড়ায় গলদ

ভারতবর্ষ এক দেশ নয় ভারতীয় ঐক্য মিথ্যা কথা। ১৯২৬ সালের এই তথ্যটা আজ যুবক ভারতকে বেমালুম হজম করে নিতে হবে। এই নিরেট তথ্যের সঙ্গে খাপ খায় এমন একটা নয়া যৌবন-বিজ্ঞান আজ নবীন ভারতকে গড়ে তুলতে হবে।

তথাকথিত প্রাদেশিক ঐক্য

১৯২৬ সালের দ্বিতীয় বাণীও এই সুরেই গাঁথা। গোটা ভারতে ঐক্য থাকা তো দূরের কথা এর এক একটা প্রদেশের মধ্যেও ঐক্য নাই। প্রাদেশিক ঐক্য বলে কোন জিনিষ কোনো প্রদেশেই দেখতে পাওয়া যায় না। ১৯০৫ সালে এই ঐক্যটা প্রথম স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নেওয়া হয়েছিল। মজুর-মনিব, জমিদার-রায়ত, বড়লোক-গরীব লোক, সবাই এক সঙ্গে নাচানাচি করবার ভান করেছিল। কিন্তু আজ সকলেই জানে যে এ দুয়ের মিলন কোনদিনই ঘটেনি, ঘটতে পারবে কিনা বলা মুস্কিল। সেদিন আমরা গেয়েছিলাম ঃ—

"ও আমার দেশের মাটী তোমার পরেই ঠেকাই মাথা,
তোমাতেই বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

কি রাজা, কি প্রজা, কি জমিদার, কি কিষাণ, কি মালিক, কি মজুর সকলে এক সাথে মিলে বাংলার বারোয়ারী তলায় দাঁড়িয়ে মাথা নত করে ১৯০৫ সালে এই গান গেয়েছিল।

আজ ১৯২৬ সাল। যুবক ভারতের চোখ খুলে গিয়েছে। একমাত্র "ভক্তিযোগে" আজকাল চলে না। বেশ মালুম হয়েছে যে, জমিদারে কিষাণে কোনরূপ দোস্তি দেখা যাচ্ছে না। যদি হয় তবে সে একটা অতিবড় আশ্চর্য্য রকমের জিনিষ হবে সন্দেহ নাই। তেমনি মজুর ও মালিকের মধ্যে কোন রফার সম্ভাবনাও দেখ্‌তে পাচ্ছি না। গান আজও গাই বটে, কিন্তু গানের "যুগ" আর নাই। কেঠো সত্যগুলা আমাদের দুয়ারে ঘা-মার্‌ছে।

এ ১৯০৫ সাল নয় এ রীতিমত ১৯২৬ সাল। মজুরদিগকে মনিবের খাস তালুকের প্রজা ভাববার, তাদের ভবিষ্যৎ মাফিক তৈরী করবার, খাসের অনুচর ভাববার দিন আর নাই। সে সব দিন চলে গেছে। যুবক ভারতকে, যুবক বাঙ্গলাকে এই পরিবর্ত্তিত রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে তার নয়া যৌবন-দর্শন গড়ে তুলতে হবে। আজ সজ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন জাতের, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের ইজ্জৎ ঘোষণা করবার দিন এসেছে। যে লোক তিন হাজার টাকার চাকরী করে সে কি আর ঐ ত্রিশ টাকার কেরাণীকে ভাই বলে ভাবতে পারবে? তার সাথে হাত মিলাতে সক্ষম হবে? ভক্তিযোগ আর গানের যুগে আমরা ভাবতাম এ সব সম্ভব। আজ জানি, সম্ভব নয়।

একতার পথ অনৈক্য

এইবার তৃতীয় জটিলতার কথা বলছি। সেটা এই যে,—একতা জিনিষটা অতি কিছু নয়। কথায় কথায় ঐক্য একতা নিয়ে লাফালাফি করা বেকুবি। ঐক্য অতি কিছু নয়। অনৈক্য দ্বারাও যথার্থ শক্তির সৃষ্টি হতে পারে। আর সেই শক্তিই অনৈক্যের ভিতর ঐক্য এনে দিতে পারে। যার সাথে যার মেলে না, কোন দিন মিলবার সম্ভাবনা আছে কিনা সন্দেহ—শুধু একটা কথার খাতিরে তাদের ঐক্য ফলানো বিড়ম্বনা মাত্র। বারো-য়ারী তলায় দাড়িয়ে হরিবোল বললে তাতে পোষাকী ঐক্য হতে পারে। হরির লুটটা কুড়িয়ে খাবার সময় পর্য্যন্ত সেই ঐক্য বজায় থাকে। কিন্তু আসল ঐক্য তাতে গজে না। কিষাণ জমিদার, মালিক মজুর, পয়সা ওয়ালা লোক আর গরীব নরনারী, এদের কারু স্বার্থ কারু সাথে কোনো দিন মিল খাবে কিনা কে জানে? কাজেই অমিলের উপরই দর্শন গড়ে তুলতে যারা সাহসী তারাই জীবনের দৌড় বাড়াতে সমর্থ। কথায় কথায় এদের মধ্যে জোর জবরদস্তি করে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা ঘোরতর আহম্মকী। আজ এই ১৯২৬ সালে সে ভাবপ্রবণতার দিন চলে গেছে। দুনিয়া বস্তুনিষ্ঠার দিক দিয়া প্রত্যেক বিষয়ের পানে অগ্রসর হচ্ছে। আজ যুবক ভারতকেও অনৈক্যই হজম করে নিতে হবে। আর অনৈক্যের ভিতরেই আসল শক্তির ঠাঁইগুলোকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

রাষ্ট্রনীতিই একমাত্র পদার্থ নয়

চতুর্থ কথা,—রাষ্ট্রনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম বিবেচনা করা যেতে পারে না। আমি একথা বলতে যাচ্ছি না যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে আপনারা থাকবেন না। বরং বলব যে,—রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আরও গভীর এবং নিবিড় ভাবে চলুক। পাঁচকোটী হিন্দু মুসলমানের বাংলার কথা দুচার দশবিশজন রাষ্ট্রিকের মাথায় থাকলে চলবে না। এই বাংলার বুকে অনেক রকম সম্প্রদায় আছে। বাংলার সাথে অনেক জাতির নানা বিভিন্ন লোকের সম্বন্ধ বিজড়িত আছে। এইসব গুলোকে এক সূতোর মধ্য দিয়ে পাশ করাতে গেলে গুলিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে তুমুল ভাবে দলাদলি চাই। নামজাদা কর্ম্মবীর নেতা বহুসংখ্যক নামা চাই। আর প্রত্যেক দলের পেছনেই স্বার্থত্যাগ কর্ম্মশক্তি, উৎসাহ আবেগ, যৌবনশক্তি সবই আবশ্যক। এই যে আজ ১৯২৬ সালে বিভিন্ন দল মাথা খাড়া করে উঠেছে এটা খুবই আশার কথা। ১৯০৫ সালে দল এক প্রকার ছিল না। তখন মাত্র দুইটা দলের উৎপত্তি হ'ব হ'ব হচ্ছিল। আজ তার যায়গায় পাঁচ সাতটা খাড়া হয়েছে। এ সবই ভাল কথা।

কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে,—বাংলার যৌবন-শক্তিকে একমাত্র রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে ডুবে যেতে দেওয়া কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। আরও হাজার আন্দোলন আছে। যবক

ভারতকে নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে নিতে হবে। চাই বৈচিত্র, চাই কর্ম্মদক্ষতার বিভিন্ন প্রয়াস-কেন্দ্র।

আর্থিক আন্দোলন

১৯২৬ সালের কাজের জন্য ১৯০৫ বা ১৫এর চাইতে গুণতিতে বেশী কর্ম্মবীর যৌবনবীর দরকার। একটা আন্দোলনের কথা মাত্র বলব। পাঁচলাখ নতুন "মজুর" গড়ে তুলতে হবে। পঞ্চাশহাজার মধ্যবিত্তের জন্য নতুন নতুন অন্ন সংস্থানের পথ করে দিতে হবে। তার জন্য মাথা ঘামানো চাই। দেশব্যাপী দারিদ্র্যের দাওয়াই কি? নতুন আয়ের পথ সৃষ্টি করতে হলে কেবল স্বার্থত্যাগ আধ্যাত্মিকতার বক্তৃতায় চলবে না। স্বার্থত্যাগের বক্তৃতা করা অতি সোজা। এ সকলেই পারে। স্বার্থত্যাগ করাও নেহাৎ কঠিন কিছু নয়। কিন্তু আয়ের পথ সৃষ্টি করতে পারে কে? যার ট্যাঁকে পুঁজি আছে যার কোমরে টাকার জোর আছে কেবল সেই পারে। খুব বড় বড় দার্শনিকের বুখনি আমাদের প্রায় সকলের মুখেই আছে। আমরা বাক্যবীর তো বটেই। কিন্তু আয়ের নতুন নতুন পথ সৃষ্টি করতে আমরা অপারগ। কঃ পন্থাঃ? এর জন্য পুঁজির দরকার যে। সেই বস্তু আমাদের কৈ?

পুঁজিওয়ালা লোক ভারতের বাইরে। যদি পুঁজিওয়ালা লোক কোথাও থাকে তবে সে ঐ ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্ম্মণীতে, আমেরিকায়। এঁদের গাঁটরীতে কিছু টাকা আছে। আজ এদেরকে বলা—"ভারত-ভূমিতে লোহার খনি আছে, কয়লার খাদ আছে, বনজঙ্গল আছে, আর আছে লোকজন। তোরা তোদের দেশ থেকে কোটী কোটী টাকা এনে আমাদের মাটীতে গেড়ে যা। বড় বড় কল কারখানা গড়ে তোল। বড় বড় ব্যাঙ্ক সৌধ প্রতিষ্ঠা কর। আমরাও খুদ কুড়িয়ে দুচার দশ বিশ লাখ টাকা তুলে তোদের সঙ্গে সঙ্গেই কাজ করে যাব।" তা হলেই হাজার হাজার মজুরের আর চাষীর অবস্থা বদলাতে আরম্ভ করবে। আর এদের আর্থিক উন্নতি সুরু হলেই মধ্যবিত্তও খেয়ে বাঁচবে। দেশের ভিতর যেখানে যেখানে টাকা আছে সব এসে স্বদেশী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে জমা হোক। তাতেও আমাদের উদ্দেশ্য খানিকটা পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু তার পরিমাণ এত কম যে বিদেশী পুঁজি ছাড়া বর্ত্তমানে কিছুকাল পর্য্যন্ত আমাদের আর উপায় নাই।

বিদেশী পুঁজি ও নবীন ভারতীয় সভ্যতা

বর্ত্তমান ভারত গড়ে তুলেছে কে? নবীন বাংলাকে গড়ে তুলেছে কে? কলিকাতাকে গড়ে তুলেছে কে? চোখের ঠুলি খুলে দেখলেই বুঝতে পারব যে,—আমাদের দৌলতে এসব ঘটেনি, এসব ইংলণ্ডের টাকায় গড়ে উঠেছে। আপনারা একথা শুনে আমাকে জবাই করে ফেলতে পারেন। কিন্তু আমি তবুও বলব যে ইংরেজের মূলধন এদেশে না খাটালে অথবা ঐ মূলধনের আশ্রয়ে ভারতীয় মূলধন পরিচালিত না হলে ঐ হাওড়া ষ্টেষন দিয়ে বেলেঘাটা

দিয়ে শিয়ালদহের পথে লাখ লাখ ডেলী প্যাসেঞ্জার রোজ যাতায়াত করত না। বাঙ্গালীর ক্ষমতা নাই, ভারতবাসীর ক্ষমতা 'নাই এত বড় বড় কারবার চালায়। কোনো কোনো খানে টাকা থাক্‌লেও আমাদের সাহস, যোগ্যতা এবং কর্ম্মশক্তি নাই। প্রায় সকল ভারত সন্তানেরই অবস্থা একরূপ।

আর একটা প্রশ্ন করছি,—কলিকাতার বুকে বড় বড় কারখানা চল্‌ছে, আর তাতে হাজার হাজার লোক প্রতিপালিত হচ্ছে। বাংলার কত শত মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্নসংস্থান হচ্ছে। এইসব কল-কারখানার কারবার, যেখানে হাজার হাজার বাঙ্গালীর রোজগারের পথ হয়েছে, এ সব কার টাকায় চলছে? ঐ ইংরেজের পুঁজিতে। ঐ সব বিদেশীর কল-কারখানায় বাঙ্গালী কাজ করে তার দরিদ্র সংসারকে প্রতিপালন কর্‌ছে। বর্ত্তমান বাঙালী জাতির ভাত কাপড় শিক্ষা-দীক্ষা সাহিত্য সংবাদপত্র, রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন, এই সমুদয়ের পশ্চাতে দেখছি এই বিদেশী পুঁজি অথবা বিদেশী নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় মূলধন।

আপনারা সজ্ঞানে বিচার করে দেখুন আজ এই ৫০ বছর ধরে বাংলার মধ্যবিত্ত হাজার হাজার পরিবারে অন্ন যোগাচ্ছে কে? বাংলার "ভদ্রলোক"-সমাজ এতদিন ধরে বিদেশীর মূলধন হজম করে মানুষ হয়ে আস্‌ছে না কি?

আমার মতে আরও বেশ কিছু কাল বিদেশীর পুঁজি আমাদেরকে হজম করতে হবে। তাতে আমাদের মাথা যতখানিই হেঁট হয়ে পড়ুকনা কেন। বিদেশীর মূলধন এদেশে থাকলে আমাদের দেশের ধনী বড় বড় লোকদের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটবে একথা জানি। কিন্তু আজ এর চাইতেও বড় কথা ভাবতে হবে। এই মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায় ছাড়া বাংলার লক্ষ লক্ষ নিরন্ন কুটীরবাসীর, আমার আপনার মত আধ-পেট-খাওয়া অসংখ্য মধ্যবিত্তের—কথা ভাবতে হবে। এর প্রধান উপায় বিদেশী মূলধন। এই বিদেশীর গাঁটরীর টাকাই বাংলাভূমিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করে তুলবে। ১৯২৬ সালের যুবক বাংলাকে বিদেশীর নিকট মাথা নুইয়ে নির্ম্মম কঠিন কঠোর ভাবে বাস্তব সত্যটা বরদাস্ত করতে হবে। পারবে কি? বুকের পাটা চাই।

স্বরাজ সাধনার নং১ সমস্যা

আজ দেশের আর্থিক উন্নতি করতে হলে দরিদ্র দেশের হাওয়া বদলাতে হ'লে ঐ বিদেশীর অর্থের পানে চাইতে হবে। ইংরেজের টাকা আনতে হবে। এতে গভর্ণমেণ্টকে কিছু শক্ত না করে চলার যো নাই। বিদেশী পুঁজিই আজকালকার অবস্থায় যুবক ভারতের মস্ত বড় উদ্ধারকর্ত্তা। নেহাৎ ঠোঁট-কাটার মতন এ কথাটা বলে যাচ্ছি। ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে আরও কিছুকাল যুবক ভারতের কুর্ণিশ করে চলতে হবে,—তাতে

ভারতের জাতীয় সম্মানে আঘাত পাক না কেন। শীঘ্র শীঘ্র স্বদেশী মূলধন যথোচিত পরিমাণে গড়ে তুলবার ক্ষমতা আমাদের দেখা যাচ্ছে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিদেশী মূলধন এদেশে রাখতে গেলে স্বরাজ আন্দোলনটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? স্বরাজ আন্দোলন তাহলে চল্‌বে কি? আমার তো বিশ্বাস এ দুইটা কিছু কিছু পরস্পর-বিরোধী জিনিষ। আবার কিছু কিছু পরস্পর সহায়কও বটে। এ বিষয়ে সম্প্রতি আর কিছু বলব না। কিন্তু ভারতের আর্থিক বনিয়াদের গাঁথনি শক্ত কর্‌তে চাইলে এর ভিতর যতখানি বিরোধ আছে সেটাকে এড়াতে গেলে চল্‌বে না। কথাটা খুব গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। দুনিয়া বড় সোজা চিজ নয়। এই সমস্ত বিরোধ এই সব কাঠিন্য বা দুর্গতির কথা নিরেট সত্যের তরফ থেকে আলোচনা করতে হবে। গভীরতম নৈরাশ্যকে হজম করে তার উপর আশার বাণী প্রতিষ্ঠিত করা চাই। গোঁজা-মিল রাখলেই ঠক্‌তে হবে।

চাই লাখ লাখ নতুন সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের অন্ন। মজুরদের পেটে ভাত জুট্‌লেই চাষীদের আর্থিক উন্নতি ঘট্‌তে থাক্‌বে। আর কেরাণী-কর্ম্মচারীদের অন্নসংস্থান ও মজুরদের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গেই জড়িত মজুরদের পেছন পেছন স্বরাজও ছুট্‌তে থাকবে। যুবক ভারত, ভাবো মজুর-সৃষ্টি ও মজুর-পুষ্টির কথা। মধ্যবিত্তের পথ আপনাআপনিই পরিষ্কার হয়ে আস্‌বে। আজ মজুরদের একমাত্র অথবা সর্ব্বপ্রধান অন্নদাতা বিদেশী মূলধন। এই বিদেশী মূলধনই ভারতে স্বরাজ এনে দেবে।

অন্ধের মতন নয়,—সজ্ঞানে খোলা চোখে এই সকল নিরানন্দময় বিষাদপূর্ণ কেঠো সত্যগুলা নিজ রক্তের সঙ্গে মিলিয়ে তবে যুবক ভারতকে নবীন দুনিয়া গড়বার সাহস দেখাতে হবে। ভারতীয় যৌবনের দিগ্বিজয়-ধারা ১৯২৬ সালের এই বিপুল সংশয়-পর্ব্বতকে লঙ্ঘন করতে পারবে কি? আগেকার দিনের মতন আজও আবার যুবক ভারত বলতে সাহস রাখে কি যে,—

"পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামে মোরে লোকে জানে ধরাতে,
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—
জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়কেতন উড়াতে।"

—তারই উপর নির্ভর কর্‌ছে ভারতের আগামী তিন বৎসর।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

হিন্দু-মুসলমান

মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে—পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নমাজের সুরে সুরে।
আহ্নিক হেথা সুরু হয়ে যায় আজান বেলার মাঝে,
মুয়াজ্জেনদের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে ;
জপে ঈদগাতে তসবী ফকির পূজারী মন্ত্র পড়ে,
সন্ধ্যা-উষায় বেদবাণী যায় মিশে কোরাণের স্বরে ;
সন্ন্যাসী আর পীর
মিলে গেছে হেথা,—মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির।

কে বলে হিন্দু বসিয়া রয়েছে একাকী ভারত ঝাঁকি' ?
—মুসলমানের হস্তে হিন্দু বেঁধেছে মিলন-রাখী ;
আরব মিশর তাতার তুর্কী ইরাণের চেয়ে মোরা
ওগো ভারতের মোসলেম দল,—তোমাদের বুক-জোড়া !
ইন্দ্রপ্রস্থ ভেঙেছি আমরা,—আর্য্যাবর্ত্ত ভাঙি'
গড়েছি নিখিল নতুন ভারত নতুন স্বপনে রাঙি' !
—নবীন প্রাণের সাড়া
আকাশে তুলিয়া ছুটিছে মুক্ত যুক্তবেণীর ধারা।

রুমের চেয়েও ভারত তোমার আপন,—তোমার প্রাণ।
—হেথায় তোমার ধর্ম্ম অর্থ,—হেথায় তোমার ত্রাণ ;
হেথায় তোমার আশান ভাই গো, হেথায় তোমার আশা ;
যুগযুগ ধরি এই ধূলিতলে বাঁধিয়াছ তুমি বাসা,
গড়িয়াছ ভাষা কল্লে কল্লে দরিয়ার তীরে বসি,'
চক্ষে তোমার ভারতের আলো,—ভারতের রবি, শশী
হে ভাই মুসলমান,
তোমাদের তরে কোল পেতে আছে ভারতের ভগবান।

এ ভারতভূমি নহেক' তোমার, নহেক আমার একা,
হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছাপ,—মুসলমানের রেখা ;
—হিন্দুমনীষা জেগেছে এখানে আদিম উষার ক্ষণে,
ইন্দ্রদ্যুম্নে উজ্জয়িনীতে মথুরা বৃন্দাবনে।
পাটলীপুত্র শ্রাবস্তী কাশী কোশল তক্ষশীলা
অজন্তা আর নালন্দা তার রচিছে কীর্ত্তিলীলা।
—ভারতী কমলাসীনা
কালের বুকেতে বাজায় তাহার নবপ্রতিভার বীণা।

এই ভারতের তখ্‌তে চড়িয়া শাহনশাহার দল
স্বপ্নের মণি-প্রদীপে গিয়েছে উজলি' আকাশতল!
—গিয়েছে তাহারা কল্পলোকের মুক্তার মালা গাঁথি,'
পরশে তাদের জেগেছে আরব-উপন্যাসের রাতি!
জেগেছে নবীন মোগল-দিল্লী,— লাহোর,—ফতেহ্‌পুর,
যমুনাজলের পুরাণো বাঁশীতে বেজেছে নবীন সুর!
নতুন প্রেমের রাগে
তাজমহলের তরুণিমা আজও উষার অরুণে জাগে!

জেগেছে হেথায় আকবরী আইন,— কালের নিকষ কোলে
বার বার যার উজ্জল সোণার পরশ উঠিছে জ্বলে'!
সেলিম,—সাজাহাঁ,—চোখের জলেতে এক্‌শা করিয়া তারা
গড়েছে মীনার মহলা স্তম্ভ কবর ও শাহদারা!
—ছড়ায়ে রয়েছে মোগল-ভারত,—কোটি সমাধির স্তূপ
তাকায়ে রয়েছে তন্দ্রাবিহীন,—অপলক, অপরূপ!
—যেন মায়াবীর তুড়ি
স্বপনের মোরে স্তব্ধ করিয়া রেখেছে কনকপুরী!

মোতিমহলের অযুত রাত্রি,—লক্ষদীপের ভাতি।
আজিও বুকের মেহেরাবে যেন জ্বালায়ে যেতেছে বাতি!
—আজিও অযুত বেগম-বাঁদীর শষ্পশয্যা ঘিরে'
অতীত রাতের চঞ্চলচোখ চকিতে যেতেছে ফিরে'!
দিকে দিকে আজো বেজে ওঠে কোন গজল-ইলাহী গান!
পথ-হারা কোন ফকিরের তানে কেঁদে উঠে সারা প্রাণ?
—নিখিল ভারতময়
মুসলমানের স্বপন-প্রেমের গরিমা জাগিয়া রয়!

এসেছিল যারা উষর ধূসর মরুগিরিপথ বেয়ে,'
একদা যাদের শিবিরে সৈন্যে ভারত গেছিল ছেয়ে,'
আজিকে তাহারা পড়শী মোদের,—মোদের বহিন ভাই;
—আমাদের বুকে বক্ষ তাদের,—আমাদের কোলে ঠাঁই।
'কাফের' 'যবন' টুটিয়া গিয়াছে,—ছুটিয়া গিয়াছে ঘৃণা,
মোসলেম বিনা ভারত বিকল,— বিফল হিন্দু বিনা;
—মহামৈত্রীর গান
বাজিছে আকাশে নব ভারতের গরিমায় গরীয়ান!

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

দিনের শেষে

নির্ম্মলকুমার যখন আপিসে যাইবেন এমন সময় স্ত্রী সুহাসিনী বলিলেন, 'আজকের দিনটা না হয় নাই গেলে, খুকীর জ্বরটা বড্ড বেড়েছে।' সকাল হইতে ঠিক এই কথাটিই থাকিয়া থাকিয়া নির্ম্মলকুমারের মনে হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে হইয়াছে, না গেলে চলিবে কি করিয়া, ছুটী যাহা কিছু পাওনা ছিল কিছুদিন পূর্ব্বে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সে সবই ফুরাইয়াছে, এখন ছুটী লইতে গেলেই মাহিয়ানা কাটা যাইবে, অথচ আয় ত মাত্র ত্রিশটী টাকা, তাহাতেই মাসের খরচ যোগাইতে হইবে, তাহার উপর পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কিছু দেনাও হইয়াছে। নির্ম্মলকুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'কি করি বল, না গেলেই যে মাইনে কাটা যাবে।' সুহাসিনী বলিলেন, 'তা হোক, কিন্তু মেয়ে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। এমন জ্বর ত কখন দেখিনি, গা' যেন পুড়ে যাচ্ছে।' নির্ম্মলকুমার একবার অচেতন কন্যার গায়ে হাত দিলেন, পরক্ষণেই ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন দশটা বাজে! আর ত অপেক্ষা করা চলে না! কন্যার রোগপাণ্ডুর মুখখানি সস্নেহে চুম্বন করিরা বলিলেন, 'না গেলে নয়, সুহাস, সময় মত ঔষধটা দিও। আমি সকাল করেই ফিরব। আসবার সময় না হয় ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।'

নির্ম্মলকুমার আফিসে গেলেন, কিন্তু প্রতিক্ষণেই রহিয়া রহিয়া তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল রোগশীর্ণা, স্নেহের পুতলি কন্যার বিবর্ণ মুখখানি। আজ সপ্তাহকাল তাহার জ্বর হইয়াছে, প্রথম দুইদিন সামান্য অসুখ ছিল, তেমন লক্ষ্য করেন নাই। তৃতীয় দিন জ্বর বাড়িল, সঙ্গতি অল্প, তবুও ডাক্তার আসিল, কিন্তু জ্বরের আর বিরাম নাই! কালও যখন আফিসে আসিয়াছিলেন কি মুস্কিল হইয়াছিল তাহাকে ভুলাইয়া আসিতে! দুর্ব্বল কোমল হাত দু'খানি তাঁহাকে দৃঢ়ভাবেই আকড়িয়া ধরিয়াছিল। তাঁহার মনে পড়িল বালিকার তখনকার সেই অভিমানভরা সজল আঁখি দু'টি, তাহার সেই ক্ষীণকণ্ঠের নিষেধবাণী! কিন্তু আজ? আজ সে একবার জানিতেও পারিল না, নিষ্ঠুর নির্ম্মম পিতা তাহার থাকিল কি চলিয়া গেল। একে একে কত কথাই না তাঁহার মনে পড়িল। কা'ল আফিস হইতে ফিরিবার সময় আঙ্গুর লইয়া গিয়াছিলেন, বালিকা তাহা স্পর্শও করে নাই। কিন্তু সপ্তাহ পূর্ব্বে আঙ্গুরের জন্য কি বায়নাই ধরিয়াছিল! সেদিন সে ক্ষুদ্র আবদারটুকু রক্ষা করা দূরের কথা, বালিকাকে তিনি কি তিরস্কারই না করিয়াছিলেন। হায়রে মূর্খ! তোরই না হয় অভাবের সংসার, নন্দন কাননের পারিজাত প্রসূন, স্বর্গের সুষমাজাত ক্ষুদ্র শিশুটি সে অভাবের কি বুঝিবে? আজ যদি সে অভিমান করে—নির্ম্মলকুমার শিহরিয়া উঠিলেন, অবাধ্য চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হইল।

এমন সময় বেয়ারা আসিয়া ডাকিল, 'বড়বাবু আপকো সেলাম দিয়া।' নির্ম্মলকুমারের চমক ভাঙ্গিল, ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিলেন প্রায় দুইটা বাজে।

বড়বাবুর ঘরে যাইয়া সেলাম করিতেই তিনি বলিলেন, "নির্ম্মল, কদিন হ'তেই তোমার কাজের বড় বিশৃঙ্খলা হচ্ছে। তিন চার বছর কাজ করছ—পুরোনো কর্ম্মচারী বলেই কিছু বলছিনা। এখন হতে একটু সাবধানে কাজকর্ম্ম কোরো। নাও, এই ফাইলটা আজই ক্লিয়ার করা চাই।"

নির্ম্মলকুমার অশ্রুসজলনয়নে কহিলেন, 'আজ ক'দিন মেয়েটার অসুখ—বড্ড বাড়াবাড়ি। আজকের দিনটা যদি আমায় ছেড়ে দিতেন—কা'ল তখন—'

'সে কি হে। এই ত' সেদিন পনের দিন কামাই করলে। এখনও যদি হাজরে সই করেই যাবে ত' আসা কেন?'

'কি করব, বড়বাবু, বাড়ীতে আর কেউ নাই। একা তার মা—'

বড়বাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন, 'বাড়ী দেখা আর আফিস করা দুই এক সঙ্গে চলেনা। যাও, কাজ করগে'।'

এ কথার উত্তর দিবার মত শক্তি বা সামর্থ্য নির্ম্মলের নাই। চাকুরী আছে, তাই মেয়েটার যাহোক চিকিৎসা চলিতেছে, নহিলে—

নির্ম্মলকুমার আপনার টেবিলে যাইয়া গণিতে লাগিলেন, পাঁচ তিন আট সাতে সতেরোর সাত—

* * * * *

দিনের শেষে আফিস হইতে ফিরিয়া বড়বাবু তাঁহার পাঁচ বৎসরের কন্যা রাণীকে ডাকিলেন, 'মা রাণু!' রাণী তাহার মায়ের নিকটে বসিয়া খেলা করিতেছিল, তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'রাণু আজ তোমার সঙ্গে আড়ি করেছে। সেই পাচটায় আসবার কথা ছিল—রাণু বসে বসে—কেমন রাণু?' বলিয়া তিনি সস্নেহে কন্যার মুখচুম্বন করিলেন।

'তাইত আমি দণ্ডস্বরূপ রাণুর জন্য এই—' তিনি পকেট হইতে বাহির করিয়া কন্যার হাতে একটি সেলুলয়েডের পুতুল দিলেন, 'আর রানুর মার জন্য '

পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তায় শোনা গেল, 'বোল্ হরি, হরিবোল!' বড়বাবু চমকিয়া গবাক্ষপথে উকি মারিলেন, সহসা তাঁহার সহিত উন্মাদ-আকৃতি নির্ম্মলকুমারের দৃষ্টি-বিনিময় হইল, নির্ম্মল বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিলেন, 'বোল্ হরি, হরিবোল্!' বড়বাবু সভয়ে দৃষ্টি ফিরাইলেন। বালিকা রাণী তাহার মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'বাবাকে আর আফিস যেতে দিওনা, মা, আফিস ভারী দুষ্টু, বাবাকে সকাল ক'রে ছেড়ে দেয় না।'

শ্রী-ফুল্লকুমার দাসগুপ্ত

গৌরীসেন ও নবাব খাঁ জেহান খাঁ

অন্ধভাবে পরের অর্থ ব্যয় বা দাতার অসাধারণ দান-প্রসঙ্গে গৌরী সেনের নাম এবং আড়ম্বর, ও নবাবির কথা-প্রসঙ্গে নবাব খাঁন্‌জা খাঁর কথা পশ্চিম বঙ্গের যত্র তত্র বহুদিন হইতে প্রবচনের মত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই দুই জন খ্যাতনামা ব্যক্তির বাস কোথায় ছিল এবং কিরূপে খ্যাত্যাপন্ন হইলেন, সে পরিচয় সম্বন্ধে বহু লোকেই অজ্ঞ। তাঁহাদের কথা যাহা জানা যায়, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিত হইতেছে।

গৌরীসেন

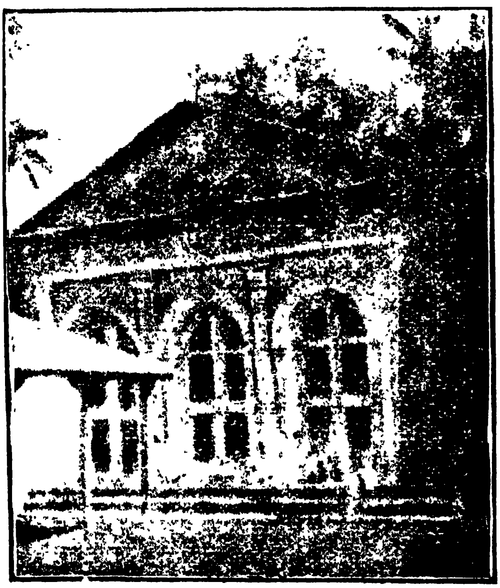
তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গলায় ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেই সময়ে গৌরী সেন হুগলীর অন্তর্গত বালি নামক পল্লীতে সেন পরিবারের বংশধর রূপে বসবাস করিতেন। তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না বা তাঁহার ঠিক নাম গৌরীপ্রসাদ, গৌরীচরণ অথবা গৌরীশঙ্কর ছিল তাহা জানিবারও কোন উপায় নাই। তিনি জাতিতে সুবর্ণবণিক ছিলেন এবং পিতার নাম হিল হরেকৃষ্ট মুরারিধর। "Hooghly Past and Present" গ্রন্থে লেখক ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়ন কালে বলিয়াছেন, সেন বংশের ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয় গৌরীসেন হইতে অধস্তন অষ্টমপুরুষ ছিলেন।

গৌরী সেন অসাধারণ সৌভাগ্য-সম্পদের অধীশ্বর ছিলেন, কিন্তু সে সৌভাগ্য লাভের উপলক্ষ তিনি নিজেই হইয়াছিলেন। পৈত্রিক সম্পত্তি বলিতে, উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু তিনি পান নাই। অতি সামান্য অবস্থা হইতে ব্যবসা দ্বারা নিজ চেষ্টায় প্রভূত ধনসঞ্চয়ে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রতি সৌভাগ্য দেবীর আকস্মিক কৃপা সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ। মেদিনী শঙ্কর পুরে (বর্ত্তমান মেদিনীপুর) ভৈরবচন্দ্র দত্ত নামে তাঁহার এক কায়স্থ বন্ধু বাস করিতেন। গৌরী সেন বিক্রয়ার্থ তাঁহার নিকট পণ্য প্রেরণ করিতেন। ক্রমে তাঁহার কাজ যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, কথিত আছে সেই সময় তিনি একবার সাত নৌকা দস্তা মেদিনীপুরে চালান করেন। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্য বশতঃ তাহা সমস্ত দৈবক্রমে বিশুদ্ধ রজতে পরিণত হয়। সেই সপ্ততরীর মধ্যে একখানিতে একজন অজ্ঞাতনামা সাধু ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই নৌকাগুলি মেদিনীপুরে পৌঁছিলে, তাঁহার বন্ধু দস্তার পরিবর্ত্তে উহা রৌপ্যপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হন। কিন্তু লোভশূন্য মনে সেই সাধু-সুহৃদ মহাশয় নৌকাগুলি সেইরূপ পণ্যপূর্ণ অবস্থায় হুগলীতে ফেরৎ পাঠাইয়া দেন।

যেদিন নৌকাগুলি হুগলীতে ফিরিয়া আইসে, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে গৌরীসেন স্বপ্নে দেখেন, যেন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই সৌভাগ্য লাভের কথা বলিতেছেন এবং তাঁহার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবার প্রত্যাদেশ করিতেছেন। সেন মহাশয় প্রাতঃকালে উঠিয়া ভাগীরথীতীরে গমনপূর্ব্বক এই অসম্ভাবিত ব্যাপার দর্শনে ভগবৎ-কৃপা উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। তিনি অচিরে সেই দেবাদিষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শিবস্থাপন করেন।

গৌরী সেন অকস্মাৎ এই প্রকার অপর্য্যাপ্ত ধনের অধিকারী হইয়া সংকল্প করিলেন, তাঁহার এই দৈবলব্ধ ধনরাশির তিনি সদ্ব্যবহার করিবেন। তিনি অকাতরে দুই হস্তে দীনদুঃখীদের সেই ধন দান করিতে লাগিলেন। যেখানেই কোন লোককে তিনি অর্থের জন্য বিপদগ্রস্ত দেখিতেন বা সাধারণের কোন হিতকর কার্য্য অর্থাভাবে সম্পন্ন হইতেছেনা দেখিতেন, সেখানেই তিনি অর্থসাহায্য করিতেন। এইরূপে দেশের চতুর্দ্দিকে তাঁহার দানশীলতার কথা শীঘ্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখন লোকের কোন কার্য্যে অগ্রসর হইয়া অর্থাভাব ঘটিলে, এমনই একটা ভরসা দাঁড়াইয়াছিল যে, অর্থের প্রয়োজন ঘটিলে গৌরী সেনের নিকট পাওয়া যাইবে। ইহা হইতেই — "লাগে লাখ টাকা দেবে গৌরী সেন" কথার সৃষ্টি হয়। সময় সময় লোকে তাঁহার দান-শীলতার সুযোগ লইয়া তাঁহার অর্থের অপব্যয়ও করিত।



গৌরী সেন প্রতিষ্ঠিত মন্দির

কেবল দান খয়রাৎ ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য সদ্ব্যয়ও যথেষ্ঠ ছিল। ক্রিয়াকলাপ এবং সুনাম ও যশাকাঙ্ক্ষায়ও তিনি যথেষ্ট ব্যয় করিতেন। একসময় তিনি হুগলী ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের তাঁহার স্বজাতিবৃন্দকে এমন এক বিরাট ভোজ ও উপহার দিয়াছিলেন যে, গঙ্গার এপারে আর তেমন কেহ করিতে পারেন নাই।

সেনমহাশয় স্বভাবতঃ ধীর ও বিনয়ী ছিলেন ; নিরহঙ্কারিতা তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও কাহারও অযথা গর্ব্বের তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। এক সময় বৈদ্য-বংশ-সম্ভূত বলরাম সেন নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি হাওদা হইতে অবতরণ না করিয়া উপর হইতেই নিমন্ত্রণ করেন। ইহাতে

সেনমহাশয় বলেন, যদি তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নিমন্ত্রণ না করেন তাহা হইলে সে নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিবেন না।

গৌরী সেনের বংশধর যাঁহারা এখন বর্ত্তমান আছেন, সুবর্ণবণিক সমাজে তাঁহাদের এখনও বিশেষ সম্ভ্রম থাকিলেও, পূর্ব্বের সে অর্থবল অনেকদিন লোপ পাইয়াছে। সেই মহাত্মার কীর্ত্তি সকলের এখন আর কিছুই নাই। আছে কেবল তৎপ্রতিষ্ঠিত দেবতা, তাঁহার পুরাতন মন্দির এবং যশোভূষিত তাঁহার পুণ্যময় নাম।

নবাব খাঁজেহান খাঁ

নবাব খাঁজেহান খাঁ, যিনি নবাব 'খান্‌জা খাঁ' নামে আপামর সাধারণের নিকট পরিচিত তিনিও হুগলীবাসী ছিলেন। পারস্য দেশের রাজধানী টিহার্ণ নগরে তাঁহার বাসস্থান, পিতার নাম সুজা কুলিখাঁ।* অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ মধ্যে কোন সময়ে তিনি এদেশে আইসেন এবং মোগল সম্রাটের কার্য্যে প্রবেশ করেন,—তাঁহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানা যায়। ঠিক কোন্ সময় আইসেন তাহা প্রকাশ নাই। তাঁহার পারদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য শীঘ্রই তাঁহার পদোন্নতি হয় এবং সম্রাট কর্ত্তৃক অচিরে তাঁহার উপর একটি জেলার ভার ন্যস্ত হয়। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে সময় বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন, প্রায় সেই সময়ে তিনি হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া ওমার বেগ্ খাঁর স্থানে আইসেন।

তাঁহার সুশাসন প্রভাবে তিনি অধিবাসীদের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিলেও, মহারাজ নন্দকুমার রায়ের উত্থানের সহিত তাঁহার স্বার্থসংযোগের জন্য তাঁহার কর্ম্মচ্যুতি ঘটে। আবার যখন নন্দকুমার তাঁহার কৃত কর্ম্মের ফলে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বলি দিতে বাধ্য হন, তৎপরে তিনি পুনরায় পূর্ব্বপদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যতদিন না লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্ত্তৃক ফৌজদারের পদ তুলিয়া দেওয়া হয়, ততদিন একক্রমে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই ফৌজদারী উঠিয়া যাওয়ার পর, তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

নবাব যখন ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন, তখন তিনি রাজোচিত জাঁকজমকে বাস করিতেন। সমস্ত সহরের মধ্যে তাঁহার বাসভবনের মত সুন্দর ও সুদৃশ্য অট্টালিকা আর কাহারও ছিল না। তাঁহার হস্তিশালা হস্তী ও অশ্বশালা অশ্বে পরিপূর্ণ থাকিত। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ষ্টাভোরিনাস্ (Stavorinus) যখন হুগলীতে আগমন করেন, তিনি এইস্থান দর্শনে বলিয়াছেন, এখানে ফৌজদারের প্রাসাদ ও হাতিশালা ভিন্ন দেখিবার মত আর কিছু নাই। নবাব হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া যখন ভ্রমণে বাহির হইতেন তখন একটি অতি সুন্দর মূল্যবান হাওদা ব্যবহার করিতেন। তিনি অতি মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত থাকিতেন এবং মূল্যবান আহারীয় ভোজন

* মতিঝিলে যেখানে নবাব খাঁজেহান খাঁর সমাধি আছে, তথাকার রক্ষক এক মুসলমানের নিকট হইতে নবাবের পিতার নাম শুনা যায়,—রজব আলি খাঁ। ইহা ঠিক কিনা জানি না।

করিতেন। তিনি দেখিতেও যেমন রাজপুত্রের মত ছিলেন, সেইরূপ সর্ব্ব রকমে একজন রাজপুত্রের মতই বাস করিতেন।

নবাবের বেতন প্রচুর ছিল, কিন্তু ইহাই তাঁহার আয়ের একমাত্র উৎস ছিল না। তাঁহার নিজস্ব ভূসম্পত্তি যথেষ্ট ছিল এবং তাঁহার আয়ও যথেষ্ট ছিল। বর্ত্তমান চন্দননগরের অন্তর্বর্ত্তী যে স্থানের নাম গোন্দলপাড়া, যেথায় দিনেমাররা শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে প্রথম ব্যবসা স্থাপন করেন,—উহা নবাবের তালুক ছিল। দিনেমাররা চিরদিনের তরে এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার পর নির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক হারে টাকা দিবার সর্ত্তে উহা ফরাসী কোম্পানিকে পত্তনি দেন। গোন্দলপাড়ার কতকটা অংশকে এখনও দিনেমারডাঙ্গা বলিয়া থাকে। সালবিলাড়া ও মাহামদামিনপুর নামে তাঁহার আর দুইটি অতি মূল্যবান তালুক ছিল। ইহা শেষে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে হস্তান্তরিত হয়। এতদ্ভিন্ন চন্দননগরের পশ্চিমদিকে বিলকুলি নামক স্থানটি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সম্পত্তিভুক্ত করিয়াছিলেন। এই জায়গীর পরে সরকার কর্ত্তৃক পুনর্গৃহীত হয় এবং উহা এক্ষণে হুগলী জেলার পঞ্চবিংশতি সংখ্যক খাসমহলের অন্যতম।

নবাবের সম্পদের সময় তাঁহার অন্তঃপুরে বহুসংখ্যক সুন্দরী রমণী থাকিত। তাহাদিগকে সাধারণতঃ বেগম বলা হইত। তাঁহার অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়েও ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে তিনি বাধ্য হইলেন, সুতরাং তখন একটি মাত্র রমণী লইয়াই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। এই রমণীই তাঁহার বিবাহিতা পত্নী।

বহুল ক্ষমতা ও আধিপত্যের অধিকারী থাকায় বাস্তবিকই নবাব তাঁহার সময়ে হুগলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও ভোগবিলাসরত ছিলেন। তাঁহার অর্থকৃচ্ছ্র ঘটাতেও তিনি বিলাসিতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য ক্রমেই দেনাগ্রস্ত হইতে থাকেন। তাঁহার এই বিলাসিতা হইতেই তদবধি নবাবির দৃষ্টান্ত-কথায় খাঁজেহান খাঁর নাম প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

মানুষের দিন কখন সমান যায় না। ফৌজদারী পদের লোপ প্রাপ্তির সহিত তাঁহার আর্থিক অস্বচ্ছলতা বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হইল। তিনি এই সময় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাত্র মাসিক আড়াইশত টাকা বৃত্তি পাইতেন। তিনি পূর্ব্বাপর বিলাসিতা ও আঢ্যতার মধ্যে থাকায় তাঁহার পক্ষে ব্যয় সঙ্কোচ করা অতীব কঠিন হইয়া উঠিল। সুতরাং অনতিবিলম্বেই তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া ক্রমে দেউলিয়া হইয়া পড়িলেন।

এই অবস্থাতেও তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট, হুগলীর শেষ ফৌজদার বলিয়া, তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চুঁচুড়ার মধ্যে ধরমপুর নামক পল্লীতে, সাহেবদের পুরাতন গোরস্থানের নিকট তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট উদ্যানভবন থাকিলেও তিনি বরাবর তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হুগলীতে মোগল দুর্গের মধ্যে বাস করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে হুগলীর কলেক্টরের ভবন, রোডশেস্ অফিস, ব্রান্স স্কুল ও পুরাতন কাছারি বাটি যে স্থানে আছে, সেই দুর্গ তথায় অবস্থিত ছিল। এখন আর তাহার কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু নবাবের উক্ত বাগানের যে সুবৃহৎ অষ্টকোণবিশিষ্ট বৈঠকখানা হইতে আটপলা বাগানের নাম খ্যাত হইয়াছিল, সেই অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ সমেত সেই বাগান এখনও আছে। উহা এখন ক্ষেত্রনাথ শীল মহাশয়ের বংশধরদিগের সম্পত্তি এবং এখনও লোকে উহাকে "নবাব বাগান" বলিয়া থাকে। প্রত্যেক বড় বড় দরবার ও সরকারী উৎসবাদি উপলক্ষে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিমন্ত্রণ দ্বারা সম্মানিত করিতেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট ভবনের যখন উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হয়, তখন তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড্ ওয়েলেসলি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নবাব সেই হীন অবস্থাতেও এই উৎসবে বহু রাজা মহারাজা নবাব প্রভৃতিদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।



মতি ঝিলে খাঁজেহান খাঁর সমাধি। (বাম দিকের সমাধি মন্দিরের সম্মুখে ঝোঁপের মধ্যে ভগ্ন সমাধি মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়।)

নবাবের শেষ জীবন অতি কষ্টেই অতিবাহিত হইয়াছিল এবং আকণ্ঠ ঋণে মগ্ন হইয়া দেউলিয়া অবস্থায় ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি তাঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে। তাঁহার নশ্বর দেহ তাঁহার ভ্রাতার মতিঝিল নামক উদ্যানে সমাধিস্থ করিয়া তদুপরি একটি সামান্য সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়। নবাবের মৃত্যুর পর বহু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্ত্রী



নবাব খাঁজেহান খাঁর উদ্যান মধ্যস্থ আটপলা বৈঠকখানার ধ্বংসাবশেষ

জীবিত ছিলেন এবং বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট মাসিক একশত টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। যে নবাব খাঁজেহান খাঁর নাম পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার নবাবিয়ানার জন্য আজিও লোকমুখে প্রবচনের মত চলিয়া আসিতেছে, তাঁহার স্মৃতির শেষ নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার সমাধি মন্দিরটি এই শত বৎসরের মধ্যেই নির্জ্জন প্রান্তরের লতাগুল্মের ভিতরে থাকিয়া প্রকৃতির সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ক্রমে লয়ের পথে চলিয়াছে।*

শ্রীহরিহর শেঠ

নিদাঘে

বনের বেদনা ফুটিছে আজিকে নিম্বের তিঁত ফুলে,
তরু-মর্ম্মের মর্ম্মর-সুরে ঘুঘুর কণ্ঠমূলে।
মধুমাস-স্মৃতি জাগায় এখনো ফুলহীন মালা-ডোর,
শ্লথ ভূষাবেশ, ফাগে-রাঙা কেশ, ভাঙা গলা, নেশা ঘোর
মুদিয়া আজিকে রজনীজাগররাগ-কষায়িত আঁখি,
ঢুলিয়া পড়েছে তরুণ তরুণী তরুমূলে শির রাখি'।

উদ্যানিকার কৈশোর গত—যৌবনে তনু ভরা,
মুকুলিতা লতা শ্রোণিভারনতা আজি বন-মনোহরা।
স্তনে সুধারস লভেছে আজিকে নারিকেলকুলবধূ,
হয়েছে শাখার মধু-ভাণ্ডার যা'ছিল বৃন্তমধু।
বর্ণ-ছটার বিলাসে লালসা ত্যজেছে কুসুম সতী,
রূপ চেয়ে যশে গৌরব, ভেবে, সৌরভে তার রতি,
এলাবাসভরা বেলাবাস পরা, মুখে গুঞ্জন ভাষা,
হাস্যে চামেলি, খোঁপায় মালতী – মিটায় নাসার আশা।
শুধু নাসা কেন ? পঞ্চেন্দ্রিয় খুশী হয় পলে পলে,
চম্পক করে মল্লিকা মধু-পরিবেষণের ফলে।

কাননিকা আজি প্রবালভূষায় তুষ্ট নহেক আর,
পরেছে রঙ্গে সকল অঙ্গে কনক অলঙ্কার।
মুকুলে লজ্জা ঘুচেনাক আর, দুকূলের প্রয়োজন,
বনভূমি ভরি বয়ন কলার তাই এত আয়োজন।

* শম্ভুচন্দ্র দে বি, এ; বি, এল্ মহাশয় কৃত Hooghly Past and Present নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

পেয়ারা কুসুম পশম যোগায়, বাবলা রেশম গুটী
শিরীষকেশর যোগায় তসর, বাকীটা শিমুল গুটী।
কিসলয়ে ছিল যে লঘু মাধুরী ছায়াতে তা' ঘনায়িত,
ডিম্বসুপ্ত সঙ্গীত আজি বনে বনে ঝঙ্কৃত।
মধুমাসে মধুমক্ষিকাগুলি মধু-উৎসবে মাতি',
মধুচক্রটি রচেনিক, মধু পিইয়াছে দিবা রাতি।
আজিকে তাদের চেতনা হয়েছে, নাই তাই অবসর,
সঞ্চয় তরে বকুল শাখায় রচে ভাণ্ডার ঘর।

ফুলবন ছেড়ে ফলবনে এসে রুচিকর সৌরভে,
মধুকর আজি মাধুকরী ত্যজি মেতেছে মহোৎসবে।
তালতরু দিতে পারে নাই ছায়া দেছে ঢের বেশী তার,
দিয়াছে বৃন্ত-ব্যজনীর সাথে অমৃত শস্যসার।
ঘনছায়া দিতে পারে নাই বলি খর্জ্জুরো নয় হেয়,
নারিকেল সম সেও দেয় আজ খাদ্যের সাথে পেয়।
'তর' করি প্রাণ করি 'মৌজ' দান তরমুজ মান পায়,
ফলরসে বেল তুষি' রসনায় ফুলে তুষে নাসিকায়।
রসালের রস-খণ্ডে, বিশাল পনস ভাণ্ডপুটে,
স্নেহদুগ্ধের ক্ষীর পূরি ধরা ধরিয়াছে দুই মুঠে।
বেণুবনে ঘেরা দীঘির সলিলে ছায়াগুলি নোয় মাথা,
আলস্যে নমিয়া আসে কালো চোখে যেন নয়নের পাতা।
দাহের গরলে সুনীল জম্বু ডুবে ডুবে তায় মরে,
সীমন্তিনীরা যেথায় ক্লান্তি বিরহের দাহ হরে।
বৎসল জলে প্রতিহিল্লোলে মা'র যেন পাই সাড়া,
পূর্ণ কুম্ভপয়োধরে ঝরে ঘরে ঘরে সুধাধারা।
ডান হাতে তব চামর ব্যজনী বামে ঘটভরা বারি।
নিদাঘের দিনে দেবী হয়ে তুমি এলে কল্যাণী নারী।
তৃষ্ণার ছল করি মা তোমার কাছে কাছে আমি রই,
সাধ যায় তব কুম্ভের মুখে আম্রের শাখা হই।

শ্রীকালিদাস রায়

আপেল

সোমবারের সকালবেলা উঠিয়াই ছয় বৎসরের ছেলে বুধা ঘুমন্ত পিতার কাণে কাণে কহিল, "বাবা আজ সোমবার—আজ আন্‌বে বাবা ?"

নটবর ছেঁড়া মাদুর খানার উপরে একবার পাশ মোড়া দিয়া নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে কহিল, "আন্‌ব।" বালকের সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহিরে গিয়া তাহার সমবয়সী বড়বাড়ীর ছেলে শ্রীকান্তকে ডাকিয়া কহিল, "আজ বাবা আন্‌বে বলেছে, দেখিস্ সন্ধ্যে বেলা।"

পিতা পুত্রের এই গোপন পরামর্শের বস্তু ছিল একটা আপেল। সেদিন শ্রীকান্ত রাস্তায় দাঁড়াইয়া যখন একটা রক্তবর্ণ ফলে মহা উৎসাহে দন্তবেধ করিতেছিল, বুধা অনেকক্ষণ ধরিয়া দরজার ছেঁড়া চটের আবরণের মধ্য দিয়া শ্রীকান্তের এই ভোজনলীলা দেখিল, তাহার পর যখন লোভ সামলানো দুঃসাধ্য হইল তখন বাহিরে আসিয়া শ্রীকান্তকে কহিল "কি খাচ্ছিস্ রে ছিরিকান্ত ?" শ্রীকান্ত নির্ব্বিকারচিত্তে কহিল, "আপেল"। বুধা কহিল, "আমাকে এক কামড় দেনা ভাই !"

শ্রীকান্ত ফলটির শেষ অবশেষটুকু তাড়াতাড়ি গালে পুরিয়া কহিল, "উঁহু !" তারপর চর্ব্বণ সমাপ্ত করিয়া কহিল "আমার বাবা এনে দিয়েছে, তোর বাবা কেন এনে দেয় না রে ?"

সাড়ে বাইশ টাকা মাহিনার কেরাণীর ছেলে পাঁচ শত টাকা মাহিনার পুত্রের এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। সে কাঁদ কাঁদ মুখে পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। নটবর তখন ছেঁড়া কামিজটির উপর পাট করা মলিন চাদরখানা জড়াইয়া ন'টার গাড়ী ধরিবার উদ্দেশে যাত্রা করিতেছিলেন, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বুধা কহিল, "বাবা আমাকে একটা আপেল এনে দিও।" "আচ্ছা" বলিয়া নটবর বাহির হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার গাড়ীতে নটবর যখন আপিস হইতে ফিরিতেছিলেন তখন রাস্তার মোড়ে বুধার সহিত দেখা হইল। অন্যদিন বুধার এতক্ষণ দুপুর রাত, আজ আপেলের লোভে আর সে ঘুমাইতে পারে নাই। মাতা জোর করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সন্ধ্যার গাড়ী যখন বাঁশীর শব্দ করিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল তখন সে নিদ্রার ভাণ ত্যাগ করিয়া রান্না ঘরের দিকে সভয়ে চাহিয়া একেবারে পথে গিয়া উপস্থিত হইল। পিতাকে দেখিয়াই ডান হাত খানি প্রসারিত করিয়া কহিল, "বাবা, আমার আপেল ?" নটবর কহিলেন, "ওঃ যাঃ ভুলে গেছিরে বুধা, কাল দেব।"

মুহূর্ত্তে বুধার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল, একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "আচ্ছা।" নটবর সত্য কথা বলে নাই। পথে যাইতে আপেলের দোকান দেখিয়া বুধার ফরমাইসের কথা মনে হইয়াছিল কিন্তু পকেটে একটি পয়সাও ছিল না। দারোয়ান্ রাম শরণ সিংহের কাছে চারি আনা পয়সা ধার চাহিয়াছিল কিন্তু পায় নাই। কাল কোথা হইতে চারি আনা জুটিবে তাহা নটবর জানিত না, শুধু নিরাশ পুত্রকে আশ্বাস দিবার জন্য আবার এই প্রতিজ্ঞা করিল।

তার'পর দিনও বুধা সমস্ত দিনমান সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় কাটাইল। আজ যে আপেল আসিবে তাহাতে তাহার সন্দেহ মাত্র ছিল না। বাহিরের দ্বারের পাশে সে দাঁড়াইয়াছিল, দূর হইতে পিতাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল "বাবা আপেল দাও।" নটবর ক্ষণিকের জন্য মুখ বিকৃত করিলেন তাহার পর পকেটে হাত দিয়াই বলিলেন, "এই রে! সেটা বুঝি পড়ে গেছে। হ্যাঁ তাই তো।" এ উপায় ছাড়া আজ আর শিশুকে প্রবোধ দেওয়ার অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু এই ছলনাটুকু করিতে নটবরের চোখ ফাটিয়া জল আসিল।

বুধা পিতার হাত ছাড়িয়া দিল। তারপর পিতার সঙ্গ ছাড়িয়া সম্মুখে গিয়া আবার ফিরিয়া কহিল, "হ্যাঁ বাবা, সেটা কত বড় ছিল?"

নটবর অঙ্গুলিগুলি বিস্তার করিয়া একটা কল্পিত পরিমাণ দেখাইয়া দিলেন।

বুধা কহিল, "উঃ খুব বড় ত বাবা! আচ্ছা বাবা আবার কাল্ আনবে?"

পরশু সোমবার মাহিনার দিন। নটবর কহিল, "কাল না বাবা, সোমবার আন্‌ব।"

বুধা প্রশ্ন করিল, "সোমবার কবে বাবা?"

"কালকের দিন বাদ সোমবার। দুটো এনে দেব।"

মহা উল্লাসে বুধা কহিল, "অমনি বড় আর লাল এনো, হ্যাঁ বাবা?"

নটবর কহিলেন, "আচ্ছা।"

বুধা নাচিতে নাচিতে বাড়ীর উঠানে গিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মা বাবা আমায় দুটো আপেল এনে দেবে, জানো? খুব বড়।"

রন্ধনশালা হইতে বুধার মাতা স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ্‌ছ? না পেতেই এই, পেলে যে কি করবে খোকা!"

বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়াইয়া এক কাবুলির দোকানে নটবর বাছিয়া বাছিয়া দুটি বড় আপেল পছন্দ করিয়া দাম স্থির করিয়া খাঁ সাহেবকে কহিলেন, "এ দুটো আলাদা ক'রে রেখে দিও ফিরবার পথে নিয়ে যাব।"

দোকানের সেরা আপেল দুটি। অনেক দিনের প্রার্থিত ফল দুটি পুত্রের হাতে দিলে

তাহার মুখে যে পুলকের হাসিটুকু দেখা দিবে, কল্পনায় তাহা দেখিয়া নটবর দত্তের শীর্ণ মুখখানি উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বেলা তিনটা বাজিতেই মাহিনার বিল লইতে নটবর উঠিয়া বড়বাবুর ঘরে গেলেন। বড়বাবু বিলখানি নটবরের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। বিল দেখিয়াই নটবরের বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল। বিলের পাশে কাজ সম্পূর্ণ না করিবার অজুহাতে নটবর দত্তের মাহিনা দেওয়া স্থগিত রাখিবার হুকুম লেখা ছিল। লাল পেন্সিলের এই ইংরাজী অক্ষর কয়টা যেন হাতুড়ী দিয়া তাহার বুকের পাঁজর কয়খানি একেবারে চূর্ণ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে নটবর কহিলেন, "বড়বাবু—"

বড়বাবু কহিলেন, "আমি কিছু করতে পারব না মশাই, সাহেব বড় কড়া লোক জানেন তো ? আপনি সাহেবের কাছে যান।" বিলখানি তুলিয়া লইয়া নটবর আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে বড় সাহেবের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। চাপরাশি খবর দিলে ভিতর হইতে হুকুম আসিল, "কম্ ইন্।"

নটবর সুদীর্ঘ প্রণতি করিয়া কহিল "হুজুর আমার মাহিনা—"

সাহেব তখন ওয়ালটেয়ারে তাঁহার পত্নীকে আগামী বড়দিনের উপহার পাঠাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, তাঁহার সকল কথা শুনিবার সময় ছিল না, ইংরাজিতে কহিলেন, "হবে না। কাজ ফাঁকী দিলে আমার কাছে কোনও মাফ নেই। যাও।"

নটবর কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন "হুজুর। কালই সারারাত খেটে সব শেষ করে দেব।"

সাহেব চিঠি হইতে কলম তুলিয়া কহিলেন, "তা হ'লে পরশু মাইনে পাবে।"

"হুজুর, একটি টাকা, অন্ততঃ আট আনা পয়সা দেওয়ার হুকুম— "

"নট এ ফার্দ্দিং ! যাও," বলিয়া ফলের দুইটি ঝুড়ি টেবিলের উপর তুলিয়া লেবেল আঁটিয়া দিলেন "ফর্ হ্যারি।" "ফর্ নেলী।" হ্যারি সাহেবের পুত্র, ও নেলী কন্যা; উভয়ে তখন মাতার সহিত স্বাস্থ্যাবাসে ছিল।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নটবর বাহির হইয়া আসিলেন এবং বিলখানি বড়বাবুর হাতে দিয়া কহিলেন "কিছু হোলো না।" একবার মনে হইল বড়বাবুর কাছে একটা টাকা ধার চাহিয়া লইবেন। কিন্তু হঠাৎ যেন সমস্ত জগৎটার উপর কেমন ঘৃণা জন্মিয়া গেল, ইচ্ছাটা কাজে পরিণত করিবার আর প্রবৃত্তি হইল না, সমস্ত পথ মনে পড়িতে লাগিল বুধার কথা। কাল রবিবার সমস্তটা দিন বুধা তাঁহাকে তাঁহার সোমবারের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করাইয়া দিয়াছে; সে বেচারা যে আজ সারাদিন তাঁহার প্রতীক্ষা করিবে তাহাতে আর তাঁহার সংশয় ছিল

না। এইক্ষণে নিশ্চয়ই সে ষ্টেশনের রাস্তার ধারে পিতার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিলেই আগ্রহে ছুটিয়া আসিবে—তাহার পর ?

ভাবিতে ভাবিতে নটবর যে বৌবাজারের মোড়ে আসিয়া পৌছিয়াছেন সে খেয়াল আদৌ ছিল না। হঠাৎ এক ঝাঁকা মুটের ধাক্কা খাইয়া তাঁহার চমক হইল। রাস্তার অপর ধারেই সেই আপেলের দোকান। ধীরে ধীরে রাস্তা পার হইয়া গিয়া দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নটবর সেই আপেল দুটির দিকে চাহিলেন। বুধার কথা মনে হইল; মনে হইল যেন একটি নগ্নকায় শিশু আগ্রহে হাত বাড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছে, "বাবা আপেল।"

আবিষ্টের মত নটবর আপেল দুটি তুলিয়া লইলেন।

পর মুহূর্ত্তেই কে আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই চোট্টা হ্যায়!" তাহার পর আর কিছু মনে ছিল না, যখন জ্ঞান হইল তখন নটবর থানার গারদ ঘরে।

(৪)

বেলা পাঁচটা হইতে বুধা ষ্টেশনের পথে দাঁড়াইয়াছিল। সাড়ে ছয়টায় যখন গাড়ী হুস্ হুস্ করিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল, তখন আনন্দে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর যখন যাত্রীরা পথ দিয়া চলিতে লাগিল তখন আর তাহার ধৈর্য্য রহিল না। প্রতি মুহূর্ত্তেই সে একবার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রত্যেক দূরের মানুষটিকেই পিতা বলিয়া মনে হইতেছিল, আগ্রহে অগ্রসর হইয়া পথচারীর মুখের দিকে চাহিয়া আবার সে ফিরিয়া আসিতেছিল। এমনি করিয়া একঘণ্টা কাটাইয়া যখন আর কেহ রাস্তায় চলিবার রহিল না। তখন শুষ্কমুখে সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বাবা আসে নি মা। বাবা এলে আমাকে ডাকবে হ্যাঁ, মা ?"

ইহার পরে ন'টার গাড়ী ছিল। আজ মাহিনার দিন; হয়তো জিনিষপত্র কিনিয়া আনিতে দেরী হইয়া গেছে ভাবিয়া হৈমবতী কহিলেন, "আচ্ছা, তুই ঘুমো এখন।"

রাত্রে যখন বুধা স্বপ্ন দেখিতেছিল যে তাহার ছেঁড়া জামার পকেট দুটি আপেলের ভারে ঝুলিয়া উঠিয়াছে তখন দারোগা রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া নটবর দত্তকে চুরী অপরাধে কোর্টে উপস্থিত করিবার অর্ডার লিখিতেছিলেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

অতিকায় প্রত্নমানব

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অবধারণ করিয়াছেন। কোথাও কোথাও ভূগর্ভে প্রত্নমানবের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই অস্থি দেখিয়া তাহার আকার প্রকার সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণাও করা হইয়া থাকে। ইয়োরোপে Homo Heidelbergenesis নামক প্রত্নমানবের চোয়ালের যে অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, তাহার আকার প্রকাণ্ড ছিল। আধুনিক মানবের আকারের তুলনায় তাহাকে একটা giant বা রাক্ষস বলা যাইতে পারিত।

ইয়োরোপে এই মানবের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেও প্রকাণ্ড আকারের মানব বিদ্যমান ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই জাতীয় মানব রাক্ষস, দৈত্য, দানব প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। অনেকে মনে করেন, রাক্ষস, দৈত্য-দানবের বর্ণনা কবি-কল্পনা-প্রসূত। সেই বর্ণনার মধ্যে যে কবি-কল্পনা নাই, তাহা বলি না ; কিন্তু কবি-কল্পনার মূলে কিছু বাস্তবতা বিদ্যমান থাকাও অসম্ভব নহে।

দক্ষিণাপথের মহারণ্য সমূহের মধ্যে রাক্ষস নামধেয় প্রকাণ্ড আকারের মানব বাস করিত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত, যখন দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বিরাধ ও কবন্ধ নামক ভয়ানক রাক্ষস দ্বয়ের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। জন স্থানেও খর দূষণ নামক রাক্ষস-রাজদ্বয়ের অধীনে সহস্র সহস্র রাক্ষস বাস করিত, এবং দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের মনে সর্ব্বদা সন্ত্রাস সমুৎপাদন করিত। দক্ষিণাপথ তাহাদের আদি বাসস্থান হইলেও, কেহ কেহ উত্তরাপথের অরণ্য সমূহের মধ্যেও বাস করিত। তাড়কা রাক্ষসী সিদ্ধাশ্রমের অনতিদূরে বাস করিত, এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রমও মারীচাদি রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা উপদ্রুত হইত।

মহাভারত পাঠেও জানা যায় যে, ভীমসেন হিড়িম্বা নাম্নী রাক্ষসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই হিড়িম্বার গর্ভে ভীমের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম ছিল ঘটোৎকচ। এই ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে পিতা ও পিতৃব্যগণের পক্ষে কুরুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

উত্তরাপথ বা আর্য্যাবর্ত্ত প্রধানতঃ আর্য্যগণেরই অধিকৃত ছিল, আর দক্ষিণাপথে অনার্য্য মানবগণ বাস করিত। এক পঞ্চনদ প্রদেশ ব্যতিরেকে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ ভূভাগই আধুনিক। কিন্তু দক্ষিণাপথ বহু প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান আছে। ভূতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, পুরাকালে দক্ষিণাপথ একটী মহাদেশের অন্তর্গত ছিল ;

সেই মহাদেশ পূর্ব্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল হইতে পশ্চিমদিকে আফ্রিকার উপকূল পর্য্যন্ত, এবং উত্তর দিকে হিমাচলের পাদমূলস্থিত গাঙ্গেয় সাগরের দক্ষিণ উপকূল হইতে অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে প্রত্নমানবগণ বাস করিত। তাহারা বহু শাখায় বিভক্ত ছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, কোল জাতীয় মানবগণ এই প্রত্নমানবের একটী শাখা, এবং দ্রাবিড় জাতীয় মানবগণ তাহার আর একটী শাখা। কিন্তু এই দুই শাখার মানবগণ দক্ষিণাপথের আদিম অধিবাসিগণের বংশধর কি না, তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে এই দুই জাতীয় মানবগণ প্রাচীনকালে অন্যদেশ হইতে আসিয়া দক্ষিণাপথে বাস করিয়াছিল এবং ইহাদের পূর্ব্বে প্রকাণ্ড আকার-বিশিষ্ট রাক্ষস-জাতীয় মানবগণ বাস করিত। দক্ষিণাপথে আর্য্য অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন মানব-জাতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। রামচন্দ্রের সময়েই ইহাদের সমুচ্ছেদ সাধন হয়। তাঁহার তিরোধানের পরেও যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও কালক্রমে বিনষ্ট হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা আমাদের অনুমান মাত্র। তৎসম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে দক্ষিণাপথে যে প্রকাণ্ড আকার বিশিষ্ট মানব জাতি বিদ্যমান ছিল, দুই এক স্থলে তাহার সামান্য সামান্য আভাস পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব।

আধুনিক রাজমহাল, বীরভূম, সাঁওতালপরগণা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা প্রাচীন দক্ষিণাপথের অন্তর্গত ছিল। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশ ইহাদের উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের এই অংশ হিমালয়ের পাদমূলস্থিত গাঙ্গেয়-সমুদ্রের অন্তর্গত ছিল। কালক্রমে পলিমাটী দ্বারা এই সমুদ্র পূরিত হইয়া উঠিলে, আর্য্যগণ পঞ্চনদপ্রদেশ হইতে ধীরে ধীরে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া এই নবোত্থিত উর্ব্বরাভূমি অধিকার করিয়া বসেন। তখন উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্য-পর্ব্বতমালা—এই দুই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী দেশ আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হয়।

বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি জেলা দক্ষিণাপথের অন্তর্ভুক্ত থাকায়, দক্ষিণাপথের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায়, এই প্রদেশেও প্রত্নমানবের অস্তিত্বের চিহ্ন বিদ্যমান থাকিতে পারে। ১৮৯২ কিম্বা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলায় এইরূপ একটী চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা রক্ষিত হয় নাই। ঐ বৎসর বাঁকুড়ায় ভূরি বৃষ্টিপাত হওয়ায় নদীসমূহে প্রবল বন্যা উপস্থিত হইয়াছিল। বাঁকুড়া সহরের দক্ষিণদিকে সাত আট ক্রোশ দূরে হাড়মাসড়া নামে একটী গণ্ডগ্রাম আছে। শিলাবতী বা শিলাই নদী

ইহার নিকটেই প্রবাহিত। শিলাবতীতে প্রবল বন্যা হইলে, তাহার উচ্ছলিত জলরাশি একটী নূতন খাত খনন করিয়া অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। বন্যার জল কমিয়া গেলে লোকে কৌতূহল পরবশ হইয়া নদীর এই নূতন খাতটি দেখিতে যায়। কিন্তু অনেকেই দেখিয়া বিস্মিত হয় যে, এই নূতন খাতের এক পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড নরকঙ্কাল পড়িয়া আছে। লোকে সেটিকে কোনও অসুর বা দৈত্যের কঙ্কাল মনে করিয়া হাড়মাসড়ার ভূম্যধিকারী বৈদ্যবংশীয় ৺নন্দারচাঁদ রায় মহাশয়কে সংবাদ দেয়। তিনিও তথায় গিয়া দেখেন যে, সত্যসত্যই তাহা একটী অতিকায় মানবের কঙ্কাল বটে। মাটীর মধ্যে তাহা প্রোথিত ছিল; কিন্তু বন্যার জলে মৃত্তিকা ধৌত হইয়া অপসারিত হওয়ায়, নদীর গর্ভে সেই কঙ্কালটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এতবড় নরকঙ্কাল তিনি কখনও দেখেন নাই; দড়ি ধরিয়া মাপিয়া দেখিলেন যে তাহা সাত হাত দীর্ঘ। পাছে নদীতে আবার বন্যা হইয়া সেই কঙ্কালটি বালি কিম্বা মাটী চাপা পড়ে, কিম্বা বন্যার জলে কোথাও ভাসিয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি লোক জনের সাহায্যে তাহা নদীর গর্ভ হইতে তীরে উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উত্তোলনের সময় কঙ্কালটি চূর্ণ হইয়া যায়। তথাপি তিনি বাঁকুড়ায় আসিয়া তদানীন্তন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ ব্যারো (Mr. Barrow) সাহেবকে এই অদ্ভুত কঙ্কালের কথা বলেন। আমি তখন বাঁকুড়ায় ওকালতী করিতাম। তিনি আমাদের বার-লাইব্রেরীতেও আসিয়া উক্ত অদ্ভুত কঙ্কালের কথা আমাদের সকলের সম্মুখে বলেন। ব্যারো সাহেব হাড়মাস্ড়া গ্রামে গিয়াছিলেন, বলিয়া শুনিয়াছি। তখন বাঁকুড়া সহরে আলোকচিত্র তুলিবার কোনও ক্যামেরা ছিল না। সুতরাং কঙ্কালের কোনও আলোক চিত্রও তোলা হয় নাই। এইরূপে একটী প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের অমূল্য নিদর্শনের কোনও সদ্ব্যবহার করা হয় নাই। আমরা রায় মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, কঙ্কালটি প্রকৃত প্রস্তাবে নরকঙ্কালই ছিল, কোনও অতিকায় জন্তুর কঙ্কাল ছিল না। আমি তখন "বাঁকুড়া-দর্পণে" এই সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হইতেছে।

এই ঘটনার প্রায় ২৫ বৎসর পরে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি আজিমগঞ্জে ছিলাম, সেই সময়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নলহাটী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের পার্শ্বে এইরূপ আর একটী সাত হাত (১০॥ ফীট্) দীর্ঘ নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হওয়ার সংবাদ শুনিয়াছিলাম। কাশীমবাজারের মহারাজের পক্ষে নলহাটীর পাহাড়ের নিকট প্রস্তর খনন করা হইতেছিল। প্রস্তর খননের ভার ছিল, আমার একটী বন্ধুর উপর। ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত হরিগুরু রুদ্র। ইনি Overseer ছিলেন। মধ্যে মধ্যে ইনি আজিমগঞ্জে আসিয়া আমার বাটীতে থাকিতেন।

একদিন তিনি আসিয়া বলিলেন "পাথর খনন করিতে করিতে সেদিন একখানা বড় পাথরের নীচে একটী ১০॥ ফীট্ দীর্ঘ নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মানুষের এতবড় কঙ্কাল আমি কখনও দেখি নাই। ফিতা দিয়া মাপিয়া দেখিলাম, তাহা সাড়ে দশ ফিট্ দীর্ঘ। কঙ্কালের সমস্ত অংশই বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তাহা গর্ত্ত হইতে তুলিয়া উপরে রাখিতে রাখিতে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। আমার নিকট ক্যামেরা ছিল না; নিকটে অন্য কাহারও ক্যামেরা ছিল না; কাজেই আমি রামপুর হাটে গিয়া তত্রত্য বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সংবাদ দিলাম, এবং তাঁহাকে এই নরকঙ্কালটি দেখিতে ও তাহার ফটো তোলাইবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি আমার কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন, এবং বলিলেন এত বড় কঙ্কাল মানুষের হইতেই পারে না, কোনও জানোয়ারের কঙ্কাল হইবে। রামপুর হাটের পরের ষ্টেশন নলহাটী; দুই চারি ঘণ্টার মধ্যে যাইয়া ফিরিয়া আসা যায়; তথাপি তিনি আমার সঙ্গে গেলেন না। দুই চারিদিন পরে কঙ্কালটি চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এখন তাহা চূর্ণ অস্থির একটী স্তূপ হইয়াছে।" আমি রুদ্র মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত নলহাটী যাইতে প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু তিনি বলিলেন "এখন গিয়া আর কি দেখিবেন? কঙ্কাল নাই। কতকগুলি চূর্ণ অস্থি এক স্থানে পড়িয়া আছে।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "এইরূপ একটী নরকঙ্কালের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য যে কত অধিক তাহা আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেও জানেন না। ইয়োরোপে এইরূপ একটী কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইলে সভ্য জগতে হুলস্থুল পড়িয়া যাইত। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই অদ্ভুত আবিষ্কারের সংবাদ সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইত। এবং আবিষ্কারেরাও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন।" পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়ার নিকট হাড়্মাস্ড়া গ্রামেও যে এইরূপ একটী নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা আমি তাঁহাকে বলিলাম। সেইটীও বিনষ্ট হইয়াছে, আর এইটীও বিনষ্ট হইল। কিন্তু যখন একই মাপের দুইটী নরকঙ্কাল বাঁকুড়া ও বীরভূমে (প্রায় ৬০ ক্রোশের ব্যবধানে) পাওয়া গেল, তখন স্থানে স্থানে যে এইরূপ নরকঙ্কাল প্রোথিত আছে, এবং দক্ষিণাপথে যে অতিকায় প্রত্নমানবগণ বাস করিত, তদ্বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ হইল না। নলহাটীতে যে কঙ্কালটি পাওয়া যায়, তাহা একখানা বড় পাথরের নীচে ছিল। সম্ভবতঃ মৃতদেহটি প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একখানা বড় পাথর চাপা দেওয়া হইয়াছিল। আমার মনে হয়, নলহাটীর পাহাড়ের নিকট যখন একটী অতিকায় মানবের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তখন ঐ স্থানে খনন করিলে, আরও ঐরূপ কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ খনন কার্য্য ব্যয়-সাপেক্ষ। গভর্ণমেণ্ট এইজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় না করিলে এবং এইরূপে খননকার্য্যের পরিদর্শন জন্য যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিলে কখনই আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারা যাইবে না।

অতিকায় মানবের কঙ্কালসম্বন্ধে যে দুইটী বিবরণ আমি শুনিয়াছিলাম, তাহা এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। বর্ত্তমান সময়ে ইহার কোনও মূল্য নাই, তাহা আমি জানি। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোথাও এইরূপ অতিকায় মানবের এইরূপ কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়, তখন এই বৃত্তান্তটি তাহার পরিপোষক প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

আমাদের হিন্দুপঞ্জিকায় দেখা যায়, কলিযুগে মানুষের পরমায়ু ১২০ বৎসর, এবং মানবদেহ সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত। দ্বাপরযুগে "নরাণাং সহস্রবর্ষ পরমায়ুঃ। সপ্তহস্ত পরিমিতো মানব দেহঃ।" ত্রেতাযুগে মানুষের পরমায়ু ছিল দশসহস্র বৎসর, আর দেহ ছিল চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত। আর সত্যযুগে ছিল, মানুষের পরমায়ু লক্ষবর্ষ, আর দেহ ছিল একবিংশতি হস্ত পরিমিত। ত্রেতাযুগে ঋগ্বেদের অধিকার ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ঋগ্বেদে দশসহস্র বৎসর পরমায়ুর কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না। ঋষিগণ শতবৎসর পরমায়ুর জন্যই প্রার্থনা করিতেন। সুতরাং মানবের সহস্র, দশসহস্র বা লক্ষ বৎসর পরমায়ু থাকার কথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। আর্য্যগণের দেহ চিরকালই সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা যখন দক্ষিণাপথে গমনাগমন করিয়া সপ্তহস্ত পরিমিত দেহ বিশিষ্ট অতিকায় মানব দেখিয়াছিলেন, তখন হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে আরও দীর্ঘতর মানব বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীর আদিম যুগে দীর্ঘাকার বিশিষ্ট সরীসৃপ (dinosaurs) হস্তী (mammoths) প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল, এবং তাহাদের কঙ্কালও স্থানে স্থানে লক্ষিত হইয়া থাকে। দীর্ঘাকার মানবও সেই প্রাচীন যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকিবে, সম্ভবতঃ এই অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রাচীন আর্য্যগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অতিকায় প্রত্নমানবের কল্পনা করিয়া থাকিবেন। সপ্তহস্ত পরিমিত দেহ বিশিষ্ট অতিকায় মানব তাঁহারা দক্ষিণাপথে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন; এই কারণে তাহা তাঁহাদের কল্পনার বিষয়ীভূত হয় নাই। সাত হাত দীর্ঘ মানবকঙ্কালের যে বৃত্তান্ত উপরে লিখিত হইল, তাহা সত্য হইলে, প্রাচীন আর্য্যগণ দক্ষিণাপথে অতিকায় প্রত্নমানববংশ যে দেখিয়াছিলেন, তাহা সুনিশ্চিত। সম্ভবতঃ এই মানবগণকেই তাঁহারা দৈত্য, দানব ও রাক্ষস বলিতেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস

সৌন্দর্য্য ও প্রেম

বিজন বনে হঠাৎ মৃদু মধুর সৌরভের আঘ্রাণ পাইয়া তাকাইয়া দেখি একটী সদ্যঃ প্রস্ফুটিত মল্লিকা কুসুম। সেই ক্ষুদ্রকায়া মল্লিকাটীর অনাবিল শুভ্র সৌন্দর্য্য হেরিয়া প্রাণমন বিমোহিত হইল; যেন কোন অজানা দেশের সন্ধান পাইলাম। মনে হইল এই ফুলটী বুঝি চাঁদের সুধা দিয়া গঠিত, অথবা সরল প্রেমের হাসি বুঝি মূর্ত্তিমান্ হইয়া এই কুসুমের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা যে কি তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল এই ফুলটীই বুঝি ফুলজগতের রাণী। কিন্তু একি! নিমেষের মধ্যেই এই ফুলরাণী যেন হৃদয়ের রাণী হইয়া উঠিল; সারা হৃদয়টী জয় করিয়া ইহার একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিল। সৌন্দর্য্যের সহিত পরিচয় প্রাপ্তি মাত্রেই বুঝি সৌন্দর্য্য এমনি নিজস্ব বস্তু হইয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বত্র সেই সৌন্দর্য্যকে ভোগের কারণে গ্রহণ করা মূঢ়ের কার্য্য। তাই কোন পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন সৌন্দর্য্যের প্রশংসাবাদ পর্য্যন্তই সঙ্গত,—উপভোগ সমীচীন নহে।

যাহা হউক এই শোভাসম্পৎসম্পন্ন সুরভি কুসুমটী নিরীক্ষণের পর হইতেই চিত্তে কত কথা উদিত হইতে লাগিল। ভাবিলাম কোন্ দিন কোথায় বুঝি কোন্ প্রাণ-মাতানো রাগিণী শুনিয়াছি; মনে হইল এই ফুলটীতে সেই রাগিণী যেন অবিরত ধ্বনিত হইতেছে। কোন রূপ কোন সৌন্দর্য্য দেখার নিমিত্ত বুঝি প্রাণ ব্যাকুল থাকে, কিন্তু আজিও দেখা হয় নাই, এই কুসুমের মধ্যে যেন সেই রূপ নিরীক্ষণ করিলাম। কি যেন কোন্ রাগিণী প্রাণের ভিতর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। যেন কোন পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি এই ফুলরাণী জাগাইয়া দিল। প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। কি যেন তৃপ্তির মধ্যেও একটা অতৃপ্তি মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিল। ইহাই বুঝি সৌন্দর্য্যের স্বভাব। যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সৌন্দর্য্যের অনুভূতি হওয়া মাত্রই যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাম শান্তি সুধায় সিক্ত হয়; প্রাণ পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু সেই তৃপ্তির মধ্যেও কি একটা অতৃপ্তি যেন বিরাজ করে। প্রাণের মধ্যে একটা 'আকুলি ব্যাকুলি'র অনুভব হয়। কবিবর চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন, 'সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ!'

'বল সখি সুখ কারে বলে'; বাস্তবিক সুখ কারে বলে তাহা ত জানি না; কখনও তাহা বুঝি নাই, কখনও সুখের সন্ধান পাই নাই। কিন্তু এই ফুলরাণীকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে হইতেছে, এই বন-শোভিনী মল্লিকাতেই যেন সুখ মূর্ত্তিমান্ হইয়া রহিয়াছে। জগতে সকলেই সুখ চায়। আর সৌন্দর্য্যেই বুঝি সুখের অবস্থিতি। সেই নিমিত্ত বুঝি সকলেই সৌন্দর্য্যের উপাসক। সৌন্দর্য্যই যে শ্রীভগবানের দেহ; তিনি 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'। আমার মনে হইতেছে, এই ফুলরাণীতেই আমি যেন সেই পরমসুন্দরের রূপের আভাস নিরীক্ষণ করিতেছি। বুঝি সেই রূপেরই এক কণা লইয়া এই শুভ্র সুরভি কুসুমের শোভা বিনির্ম্মিত হইয়াছে!

আনন্দের অন্যতর নাম রস। ভগবান্ সেই রস-স্বরূপ। শ্রুতি বলিতেছেন, 'রসো বৈ সঃ'। আমরা সেই রসের কণা হইয়াও যেন নীরস হইয়া রহিয়াছি। সৌন্দর্য্যের একটী কার্য্য এই দেখা যায়, ইহা যেন শ্রীভগবানের সহিত আমাদের মিলন সংঘটন করিয়া দেয়। এই সদ্যঃ প্রস্ফুটিত মল্লিকা কুসুম আমার চিত্তে কি এক আনন্দের উদ্বোধন করিয়া দিয়াছে। সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমানে আমি ত সেই পরমানন্দের সাগরে একটী জীবন্ত বুদ্‌বুদ্ রূপে রহিয়াছি। এই সুন্দরী ফুলরাণী আমার মানসে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে, যেন কত অভূতপূর্ব্ব ভাবমালা আমার চিত্তে তরঙ্গায়িত হইতেছে, যেন এক স্বপ্নের আবেশে মনঃপ্রাণ বিভোর হইয়াছে। তাই বুঝিতেছি সৌন্দর্য্যই ভাবের ক্রীড়াভূমি। এই সৌন্দর্য্যরূপ বেলা ভূমিকে আশ্রয় করিয়াই ভাব ঊর্ম্মিসমূহ আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকে, আর এই ভাবরাজ্যে বা স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশই প্রেমের প্রথম অঙ্কুর। ভাব আর কিছু নহে, প্রেমের প্রথমচ্ছবিই ভাব। রস শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, ভাব হইতেছে, 'প্রেম সূর্য্যাংশু সাম্যভাব।' অর্থাৎ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণই ভাব।

যাহা সুন্দর, তাহাকে আমরা নিমিষের মধ্যেই ভালবাসিয়া ফেলি। অন্য কথায় বলিতে গেলে, সৌন্দর্য্যই আমাদের ভালবাসার বা প্রেমের উদ্বোধক। প্রেম সকলের চিত্তেই রহিয়াছে। যে অতি বড় পৈশাচিক প্রকৃতির লোক, তাহার চিত্তেও প্রেম লুপ্ত হয় নাই। প্রায়ই দেখা যায়, প্রেম জীবের চিত্তে সুপ্তভাবে অবস্থান করে প্রেম নিত্য বস্তু। সৌন্দর্য্য সেই প্রেমকে জাগাইয়া দেয়। কিন্তু সৌন্দর্য্যকে প্রেমের উদ্বোধক মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইল না। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মধ্যে পরস্পর কার্য্যকারণ সম্বন্ধও রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যাহা সুন্দর তাহাকে আমরা ভালবাসিয়া থাকি ; এবং যাহা ভালবাসার বস্তু তাহা কুৎসিত হউক বা যেমনই হউক তাহাকে সুন্দর ভাবিয়া থাকি।

প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, ভালবাসা—একই বস্তু, পৃথক্ পৃথক্ নাম। তবে একটী কথা ভাবিবার আছে। প্রাকৃত প্রেম ও অপ্রাকৃত প্রেমের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন কাচ কাঞ্চনের মধ্যে বিভেদ। উভয় জাতীয় প্রেমের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ঐ সামঞ্জস্য ও বিরোধের নির্ণয় হইতে পারে মাত্র দুইটী বিষয়ের দ্বারা,—সেই বিষয় দুইটী হইতেছে ভোগ ও ত্যাগ। প্রাকৃত প্রেমে ভোগের প্রায় পূর্ণ রাজত্ব ; উচ্চ স্তরের প্রাকৃত প্রেমেও ত্যাগের অবস্থিতি লেশ মাত্র। কিন্তু অপ্রাকৃত প্রেমে ভোগের লেশ মাত্রও বিদ্যমান থাকিবে না। ভোগ লালসার পরিবর্জ্জন বা আত্মসুখ ত্যাগই অপ্রাকৃত প্রেমের বৈশিষ্ট্য।

প্রেম বস্তু কি প্রকার? ইহার উত্তর কিন্তু কেবল কথায় দেওয়া অসম্ভব। কারণ এসব যে অনুভব গম্য বিষয়। যাহা হউক পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় প্রেমের মধ্যে

তিনটী বস্তু রহিয়াছে। প্রথম বস্তুটী হইতেছে, এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বা আকুল পিয়াসা। প্রেমিক প্রেমিকার ক্ষণকাল মাত্র বিচ্ছেদও অসহনীয়। এমন কি চক্ষে যদি চন্দন লেপন করা হয়, সেই চন্দন লেপের ব্যবধানজনিত বিচ্ছেদও কষ্টকর হইয়া থাকে। 'হিয়ায় হিয়া লাগিবে লাগিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে।' কিন্তু যদি উভয়ের চির মিলনও থাকে তবুও এই আকুল পিয়াসার নিবৃত্তি হয় না ; তবুও মনে হইবে 'না মিটিল সাধ ভালবাসি।' এই আকুল পিয়াসার প্রাবল্য হেতুই মিলনের মধ্যেও বিরহের রোদন শুনিতে পাওয়া যায় ;—'যুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে কি যেন অভাব রহিয়াছে।'

দ্বিতীয় বস্তু হইতেছে, আত্মদানের প্রয়াস ; অর্থাৎ প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরে পরস্পরের নিকট আত্মদান করে, নিজকে বিলাইয়া দেয়। নিজের বলিয়া কিছু রাখে না ; আপনার বলিয়া যাহা কিছু থাকে, সব দিয়া ফেলে। 'আজি আমার যা কিছু আছে এনেছি তোমার কাছে তোমারে করিতে সব দান,' প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরের নিকট সব বিলাইয়া দিয়া পরম সুখে মরণও আলিঙ্গন করিতে পারে, 'সে মরণ স্বরগ সমান।'

তারপর তৃতীয় কথা হইতেছে, যাহাকে ভালবাসা যায় সে যেন অদ্বিতীয় বস্তু হইয়া পড়ে, তাহার আর তুলনা থাকে না। 'তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে। আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্ক-ছলে॥' ভালবাসার বস্তুকে ভালবাসিয়াই প্রাণের পরিতৃপ্তি হয়। প্রাণ আর কিছু চায় না। 'আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো। তোমা ছাড়া আর এজগতে মোর, কেহ নাই, কিছু নাই গো।'

প্রাকৃত প্রেমের বিষয় আলোচনা করিলে প্রেমের বিভিন্ন স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু মানব কেন, ইতর প্রাণীর মধ্যেও প্রণয় বা ভালবাসা পরিদৃষ্ট হয়। অতি নিম্নস্তরের ভালবাসায় অন্ধ ভোগলালসাই পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে। সে স্থানেও ত্যাগের আভাস যেন কথঞ্চিৎ বিদ্যমান থাকে বলিয়া বোধ হয় ; কারণ প্রেমিক আত্মদান করিতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু তাহা ত্যাগ নহে ; ভোগের নিমিত্ত ত্যাগের ভাণ মাত্র। সুতরাং উহা প্রেম নহে, কাম ; আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।

বিভিন্ন স্তরের প্রেমের পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সকল স্তরের প্রেমেই আকুল পিয়াসা বিদ্যমান থাকে। শ্রীরাধিকা বলিতেছেন, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল। সেই মধুর বোল শ্রবনহি শুনমু শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥ কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়নু না বুঝনু কৈছন কেলি। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥'

কিছু উচ্চ স্তরের প্রেমে ভোগের লেলিহান জিহ্বা থাকিলেও তথায় ত্যাগের কিছু স্থান রহিয়াছে। এই জড় প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও মনে হয় যেন এস্থলেও প্রেমের

পূর্ণ অভিনয় চলিতেছে। তরু ও লতিকা কেমন সুখে পরস্পরে আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছে; সুনির্ম্মল জোছনা জলধিকে কেমন চুম্বন করিতেছে; কুমুদিনী নাথের পানে চাহিয়া কেমন মধুর হাসি হাসিতেছে। এই সমুদয় প্রেমের ব্যাপারে ভোগের চিত্র বর্ত্তমান থাকিলেও বাস্তবিক পক্ষে এগুলি ত্যাগের উজ্জ্বল নিদর্শন। কারণ এসব দৃষ্টান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, ভালবাসার বস্তুকে ভালবাসা হইতেছে মাত্র; কেহ প্রতিদান চাহিতেছে না। ইহাই উচ্চস্তরের প্রেমের প্রকৃত লক্ষণ। কবি বলিতেছেন, 'হায় রে হায় প্রেমিক যে জন সে কেন চায় ভালবাসা। দিলে নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল প্রেম পিপাসা ॥'

জড় প্রকৃতি স্তব্ধভাবে যেমন প্রেম উপভোগ করে, পিপীলিকা শর্করার মধ্যে আত্মহারা হইয়া যেমন ডুবিয়া থাকে, প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যেও তেমনই উপভোগের আকাঙ্ক্ষা, তেমনই ডুবিয়া থাকার ইচ্ছা পরিদৃষ্ট হয়। 'আধ অলসে আধ ঘুমে, জোছনা যেমন ফুলটী চুমে, তেম্‌নি ক'রে ও চাঁদ মুখে মুখটী দিয়ে রই।' কিন্তু যখন প্রেমের পূর্ণ বিকাশ সংঘটিত হয়, তখন প্রেমিক প্রেমিকা ভাল বাসিয়াই সুখী থাকে; বিরহেও মিলনের সুখ অনুভব করে। কারণ তখন তন্ময় হইয়া যায়, এবং সর্ব্বত্র ভালবাসার বস্তুকেই নিরীক্ষণ করিতে থাকে। এই জন্যই রসশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, মিলন অপেক্ষা বিরহই শ্রেষ্ঠ; কারণ বিরহে সর্ব্বত্র প্রেমের বস্তুকে দর্শন হইয়া থাকে— 'বিরহে তন্ময়-ভূলোকম্‌,' এতাদৃক বিরহ অবস্থায় প্রেমিক প্রেমিকা বিভোর হইয়া যেন মিলন সুখই অনুভব করে। 'আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস, দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস। যদি আর কারে ভালবাস, যদি আর ফিরে নাহি আস, তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো।'

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই যে পাঁচ প্রকার রস রহিয়াছে, তৎসমুদয় প্রেমেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি। অবশ্য এই সমুদয় রসে প্রেমের বিভিন্ন রূপের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার জগতে শ্রদ্ধা, দয়া, সহানুভূতি, মাতৃত্ব আদি যে সব সদ্‌বৃত্তি দেখা যায়, তৎসমুদয়ও প্রেমের বিভিন্ন মূর্ত্তি। প্রেম নিত্যবস্তু; সুতরাং এই সমুদয় সদ্‌বৃত্তি ও নিত্যবস্তু, যেমন মাতৃত্ব। বলা বাহুল্য মাতৃত্ব বাৎসল্য রসেরই রূপ বিশেষ। নিঃসন্তানা রমণীও মাতৃভাবের প্রসারের দ্বারা জগতের মাতা হইতে পারেন। এই মাতৃত্ব বা মাতৃভাব প্রেমেরই মূর্ত্তি বিশেষ। এতজ্জাতীয় প্রেমের পরাকাষ্ঠায় তিনি জগদম্বা স্বরূপা হইতে পারেন।

যাহা হউক আমরা পদে পদে প্রাকৃত প্রেমের ত্রুটি অনুভব করিয়া থাকি। প্রেমের 'আকুলি ব্যাকুলি' দেখিয়া মনে হয়, কোন অন্ধ তমসার মধ্য দিয়া আমরা

কাহারও যেন অনুসন্ধান করিতেছি। সন্ধান মিলিতেছে না, সাধ মিটিতেছে না। এই প্রেমের তরঙ্গ যেন কোন এক মহাসাগরের প্রতি ধাবমান, সেথায় নিজেকে ঢালিয়া দিবে, আত্মদানের পরাকাষ্ঠা ঘটিবে, তৃপ্তির সাধ মিটিবে। তাই মনে হয়, প্রাকৃত প্রেমই যেন অঙ্গুলি সঙ্কেতে অপ্রাকৃত প্রেমকে দেখাইয়া দিতেছে। সেই পরমসুন্দর শ্রীভগবানের পদপ্রান্তে এই প্রেম উপহার ঢালিয়া দিলেই বুঝি আমাদের সকল কামনা পূর্ণ হইবে, আশা মিটিবে, প্রাণ জুড়াইবে।

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র

ছিটে-ফোঁটা

অনাদি আষাঢ়ে পুরাণ

[এই পুরাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে হয় হরপ্পায় নয় মহেঞ্জোদারোতে অনেক মাটির নীচে,—বহু যুগের আগেকার হিজি বিজি চিত্র লিপিতে ; উহার পাঠোদ্ধার হইয়াছে ইউরোপে, আর আমরা উহার বাঙ্গলা অনুবাদ দিতেছি।]

সৃষ্টি ও বেদ লেখা শেষ করিয়া ব্রহ্মা মানস-সরোবরে পদ্মাসনে শুইলেন ; তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল না। বিশ্বপালনের ভার ছিল বিষ্ণুর উপর ; বিষ্ণু দেখিলেন ঘড়ির কলের মত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড খাসা চলিতেছে,—তাঁহার কিছুই করিবার নাই। বিষ্ণু তখন সাগরের তলায় অনন্ত শয্যায় শুইলেন। সংহারের ভার ছিল শিবের হাতে ; তিনিও কয়েক দিন কাজ করিবার পর দেখিলেন, মানুষের মাথা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ধর্ম্ম নামে একটা ভাবের ধোঁয়া উঠিতেছে, ও সেই ধোঁয়া জমাট বাঁধিয়া মানুষে মানুষে ভেদের কোলাহল বাড়াইতেছে। শিব ঠাকুর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন,—বুঝিলেন যে সংহারের কাজটা তিনি না করিলেও অনায়াসে চলিতে থাকিবে। তখন তিনি আনন্দে ভগবতীকে সঙ্গে করিয়া নন্দীর পিঠে চড়িয়া নিভৃত কৈলাসে বাসা বাঁধিলেন। লক্ষ্মীর পক্ষে একা থাকা কষ্টকর হইল ; তিনি ছট্‌ফট্ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে হইলেন চঞ্চলা। সরস্বতী একা থাকার দুঃখ এড়াইবার জন্য বীণায় তার বাঁধিয়া আপন মনে গান গাহিতে লাগিলেন।

শিবঠাকুর নিভৃত কৈলাসে সিদ্ধি সেবা করিতেন, তবে তাঁহার নন্দী মাঝে মাঝে সৃষ্টির কূলে গিয়া দেখিয়া আসিত ঠাকুরের কাজ ধর্ম্মের হাতে কেমন চলিতেছে। নন্দী একদিন শিং নাড়িয়া লাঙ্গল দোলাইয়া ঠাকুরকে সংবাদ দিল যে তাঁহার সিদ্ধি ভোগে কোন বাধা হইবে না, কেননা ধর্ম্মের ভেল্কিতে কোন মানুষ বা প্রচার করিতেছে যে, সে স্বয়ং পরমেশ্বর ও কাজেই তাহার কথাই কেবল মান্য, কেহ বা জাহির করিতেছে যে সে পরমেশ্বরের পুত্র আর তাহার

হাতেই আছে শাসনের সকল ভার, আবার অন্য কেহ বা বলিতেছে সেই একা ভগবানের দূত ও সেই কেবল জানে স্বর্গের খাঁটি খবর; ইত্যাদি, ইত্যাদি। ঠাকুরের ত্রিনেত্রে আনন্দের জ্যোতি ফুটিল।

নন্দীর পত্নী সুরভির কৌতূহল হইল, সে একবার বিশ্বের ব্যাপারখানা দেখিয়া আসিবে। সে একাই গেল, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই ঊর্দ্ধ পুচ্ছে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কৈলাসে ফিরিয়া বলিল— কষ্টং ভো। ঠাকুরের নাকের গোড়ার চোখ কপালে উঠিল, কপালের চোখ মাথায় উঠিল; তিনি সুরভির পিঠে হাত দিয়া আতঙ্কের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরভি বলিল "ঠাকুর, ভারতে অজানা সৃষ্টিপুরের লোক আসিয়াছে,—তাহাদের ভাষা বুঝিলাম না, কিন্তু ভাব-গতিক দেখিয়া ভয়ে পলাইয়াছি; আমাকে দেখিয়া ছুরি হাতে করিয়া রুখিয়া আসিল, আর বলিল যে কোর্‌বানি করিবে। কোর্‌বানি কি জানি না, কিন্তু ছুরি দেখিয়া বুঝিলাম যে মতলবটা সুবিধার নয়।" ঠাকুর তখন আশ্বস্ত হইয়া কৈলাসের শিখরে চড়িয়া একবার ভবলীলা দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুর আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন—কি চমৎকার!

ভগবতী সিদ্ধি ঘোঁটা ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হইয়াছে ঠাকুর? ঠাকুর বলিলেন—"আমার ভয় ছিল যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী আমার কাজে বাধা না ঘটায়, কিন্তু সে ভয় আর নাই। লক্ষ্মী চারিদিকে লুট-তরাজের বহর দেখিয়া তাঁহার অলঙ্কার চুরির ভয়ে ছুটিয়া গিয়া বিষ্ণুর আশ্রয়ে সাগরে ডুবিয়াছেন, আর সরস্বতী ধর্ম্মের আড্ডার পাশ দিয়া বীণা বাজাইয়া যাইতেছিলেন, অমনি ধর্ম্মের রক্ষীরা ইট-পাটকেল ছুঁড়িয়া তাঁহার বীণা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।" ভগবতী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সরস্বতীর গায়ে আঘাত লাগে নাই ত?" ঠাকুর বলিলেন—"লাগে নাই আবার। ঐ দেখ সরস্বতী একেবারে এবেরেষ্টের চূড়ায় গিয়া গায়ে বরফ ঘসিতেছেন, আর ভাঙ্গা বীণা সারিতেছেন।

ভগবতী এবেরেষ্টের দিকে তাকাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঐ লোকগুলি কোথাকার, যাহারা মরণ পণে এবেরেষ্টের মাথায় চড়িবার চেষ্টা করিতেছে?" ঠাকুর বলিলেন— উহারা বিদেশী, সরস্বতী লাভ উহাদের ভাগ্যেই আছে। ভগবতীর উৎকণ্ঠা হইল; তিনি বলিলেন, "ঠাকুর, লক্ষ্মী ও সরস্বতী কি তোমাদের সৃষ্টির দেশে ফিরিবেন না?" ঠাকুর ব্যঙ্গভরে হাসিয়া বলিলেন—"ফিরাইবার মন্ত্র আছে বটে, যথা—যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর শিখরে; কিন্তু ভারতের লোকে সে কাজ করিল আর কি।"

ভগবতী বিষণ্ণ মুখে সিদ্ধি ঘুঁটিতে লাগিলেন। ঠাকুর আর একবার ভাল করিয়া বিশ্ব-লীলা দেখিয়া ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। নন্দী শিং নাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর আনন্দে বলিতেছিলেন—"আমার কাজ চমৎকার চলিয়াছে,—ক্রমাগত চলিয়াছে খটাখট্, কপাকপ্ আর দমাদম্।" নন্দী শিং তুলিয়া পুচ্ছ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইল— দমাদম্—দমাদম্।

যে শুনিবে এ পুরাণ দুঃখে আর শোকে,
সটাং চলিয়া সেই যাবে শিবলোকে।

পুস্তক-পরিচয়

ঝড়ের আলো—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি, এ, প্রণীত। এখানি একটি ছোটখাট উপন্যাস, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার ১৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

উপাখ্যানটি অতি কৌশলের সহিত বিবৃত হইয়াছে। গল্পভাগ মাঝের কোন একটা অংশ হইতে সুরু করা হইয়াছে, সুতরাং লেখক পাঠকের কৌতুহল সৃষ্টি করিয়া তাহার মন অনেক দূর পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছেন। ধীরে ধীরে তিনি নায়িকা গৌরীর জীবন রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহাতে গল্পের ক্রম-বিকাশটি বড় সুন্দর হইয়াছে।

পুস্তকখানির ভাষা ঝরণার জলের মত স্বচ্ছ ও প্রবাহশীল এবং লেখক বড় বড় কথা পরম স্বচ্ছন্দতার সহিত সহজবোধ্য করিবার কৌশল অর্জ্জন করিয়াছে। আজকালকার বহু উপন্যাসের মধ্যে এই বইখানি পড়িয়া সত্য সত্যই ভাল লাগিয়াছে। কারণ ইহার আদর্শ ভাল, ঘটনা সাজাইবার কৌশল ভাল, বিবৃতি-ভঙ্গী ভাল এবং বর্ণনীয় বিষয়গুলি স্বল্পায়তনে গুছাইয়া বলিবার কৌশল ভাল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

গীতালী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত,—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

শশীদাদা—শ্রীবীরেশ্বর বাগচী, বি, এ, প্রণীত,—৫৯ পৃষ্ঠা,—মূল্য চারি আনা,—প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট,—গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

এখানি একটী সত্যঘটনামূলক ছোট গল্প। কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"শশীদাদার জীবন নানা বিচিত্র ঘটনায় ভরপুর।......এর ভাষা ঝরঝরে, ভাব তরতরে এবং পরিকল্পনাও চমৎকার।" আমরাও কবির এই উক্তির সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

মমতার ফাঁসি—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত,—১১৮ পৃষ্ঠা,—উত্তম বাঁধান,—মূল্য একটাকা মাত্র।

এখানি একখানি উপন্যাস। নবীন লেখকের এই নূতন উদ্যম সবিশেষ আশাপ্রদ। লেখকের ভাষার পারিপাট্য ও বর্ণনা-শক্তি প্রশংসনীয়। কিন্তু আখ্যানবস্তুর মধ্যে কাঁচা হাত পরিস্ফুট রহিয়াছে। ঘটনা-বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য লেখক স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। সুপ্রভার আঙ্গুল কাটিয়া ফেলা বড় বাড়াবাড়ির পরিচয়; তাহার সহিত ডাক্তার সাহেবের কথোপকথনও অতিশয়োক্তি। দত্ত-গৃহিণীর চরিত্রের পরিণতির ক্রমগুলি পরিস্ফুট হয় নাই। এই সমস্ত খুঁটিনাটি ছাড়িয়া দিলে, পুস্তকখানি সুখপাঠ্য বলা যাইতে পারে।

অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস—(১ম খণ্ড) শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, পি, এইচ, ডি, প্রণীত,—১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ স্থিত বর্ম্মণ পাব্লিসিং হাউস্ হইতে প্রকাশিত,—১০২ পৃষ্ঠা,—মূল্য এক টাকা।

ভূতপূর্ব্ব "যুগান্তর"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বাঙ্গালার বিপ্লববাদের গুরুত্ব ও গুপ্ত তথ্যের পরিচয় দিবার জন্য আমরা এই ইতিহাস "বঙ্গবাণী"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

এক্ষণে ইহা "বঙ্গবাণী" হইতে পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের পাঠের সুবিধা হইল।

ছায়াপথ। কবিতার বই। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

কবিতাগুলি একটু নূতন ঢঙের। সাধারণতঃ গীতিকবিতা বা লিরিক যেরূপ হইয়া থাকে এগুলি সে ধরণের নহে ;—অথচ সনেট, এপিগ্রাম ধরণেরও নয়। কবি সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য ও অলঙ্কৃত সৌষ্ঠব বর্জ্জন করিয়া—২।৪টী বাছা বাছা কথায় এক একটি চরিত্র বা চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সর্ব্বত্রই যে কবি সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না—তবে তিনি যে নূতন রচনা রীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বহু ত্রুটিসত্বেও সেজন্ত তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা তাঁহাকে দিতেই হইবে। তাহা ছাড়া—বইখানিতে ছন্দের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও চাতুর্য্য, আছে, রচনায় তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা আছে—মাঝে মাঝে কৌতুক রসের উচ্ছল ফেনিলতাও আছে। 'অন্নীর জলসা' পর্য্যায়ের চরিত্রচিত্রগুলি আদৌ ফোটে নাই—দুনিয়ার চিড়িয়াখানার ব্যঙ্গ শব্দ চিত্রগুলি মূলচিত্র না দেখিলে একেবারেই বোঝা যায় না—কাজেই গ্রন্থস্থ না করিলেই ভাল হইত। পুস্তকের বহিরঙ্গ অনিন্দ্য। মূল্য ৸৹ আনা।

সাকী। কবিতার বই। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ৫৮ পৃষ্ঠা—মূল্য ১ টাকা।

পুস্তকের অধিকাংশ কবিতা যৌবনের মাদকতায় ফেনিল—তরুণ প্রণয়ের আকুল আনন্দে উচ্ছল—উদ্বেল ও ছন্দোঝঙ্কারের লীলায় চঞ্চল ও তরঙ্গায়িত। রচনায় চাতুর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের ভাগই বেশী। স্থলেস্থলে প্রণয়ের আধ্যাত্মিকতার ভান আছে কিন্তু দৈহিকতা ও সৌন্দর্য্য লালসাই অতিরিক্ত ফুটিয়াছে।

"পুষ্পকেতু (মীনকেতু ?) শরাসনে পরাইয়া গুণ—
ফুলশর হানে যেন বিবশে হিয়ায়।"

এই দুই পংক্তিতে কবি আপনার পরিচয় দিয়াছেন। "হৃদয়জয়"কে লইয়াও কবি বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়াছেন—যৌবনের রুদ্ধ রসোচ্ছ্বাস সহসা বাধামুক্ত হইলে যে দশা হয় কবি সেই দশায়।

প্রণয়কবিতা ছাড়া অন্ত ২।৮টি যে কবিতা আছে তাহাতে ভাবের উচ্চতা আছে কিন্তু ভাষার স্বচ্ছতা নাই। প্রসাদগুণের বড়ই অভাব। প্রণয় কবিতাগুলিতে সংযমের অভাব আছে কিন্তু এগুলি বেশ সংবতসংহত রচনা। এসকল ত্রুটিসত্বেও কবিতাগুলি সুরচিত—নেহাৎ গতানুগতিক শ্রেণীর নয়—প্রণয়ের বুলিও নেহাৎ মামুলী ঢঙের নয়। কবির গভীর রসানুভূতি আছে এবং সে অনুভূতিকে রূপ দেবার ক্ষমতাও আছে।

চিরকুমার সভা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

এই পুস্তকের পাঠ-পরিচয়ে প্রকাশ,—ইহা প্রথমে উপন্যাসরূপে "ভারতী" পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরে "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ" নামে ১৩১১ সালে ইহা "হিতবাদী" সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হয়। তাহার পরে ঐ নামেই ১৩১৪ সালে গদ্য গ্রন্থাবলীর ৮ম ভাগে উহা পুনর্মুদ্রিত হয়। পরে ১৩৩২ সালের বৈশাখ মাসে কবি ইহা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন। এই সময়ে ইহাতে উপন্যাসের কিয়দংশ বাদ পড়ে, কিন্তু অনেক অংশ নূতন করিয়া লিখিত হয় ও অনেকগুলি নূতন গানও সংযোজিত হয়। কিন্তু বিশ্বভারতীর এই সংস্করণে উপন্যাসের যে যে অংশ পূর্ব্বে নাটকে বাদ পড়িয়াছিল তাহার প্রায় সমস্তই যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহা চিরকুমার সভার একটি অভিনব সংস্করণ।

নববধূর প্রতি বর

(১)

এস এস প্রিয়তমে,
এতকাল তুমি ছিলে লুকাইয়া
কোনরূপে, নিরুপমে ?
এতকাল আমি রহিনু মজিয়া কিসের ঝোঁকে ?
ছায়ারে খুঁজিয়া মরিনু বুঝিয়া স্বপ্নলোকে !
আজিকে সহসা বিপুল পুলকে, দিব্যালোকে,
পলক ভুলে,
হেরিনু ভূলোকে, দ্যুলোকে, তোমার
নোলোক দুলে !
ঝিলিক তুলে !

(২)

এস কল্যাণি অয়ি,
জ্যৈষ্ঠের দাহে ক্লিষ্ট এ দেহ,
তুমি এস, রসময়ি।
আজি ধরিত্রী শিবরাত্রির হিন্দুনারী,—
তৃষায় ফাটিছে, জোটেনা তবুও বিন্দুবারি।
তুমি উর দেবি, হৃদয়ে,—অমৃত সিন্ধু তারি
উছলি উঠে,
মর্ম্ম তিতায়ে, ঘর্ম্ম আকারে
পড়ুক্ টুটে,
সাটিন স্ফুটে।

(৩)

এস এস, প্রিয়সখি,
জাগুক্ শিহরি মন শিলীমুখ
ও কমল মুখ লখি'।
আজি শর্ব্বরী খর্ব্বায়ু খর দিবস দাপে,
সংজ্ঞাবিহীন পঙ্গু পবন ; বিবশ তাপে ;—
তুমি এস ত্বরা, টেনে তোল' মোরে জীবনধাপে
দুবাহু ডোরে,
দোক্তা স্ফূর্ত্তি-মিশান-নিশাস
মদিরা ঘোরে
জীয়াও মোরে।

(৪)

এস এস সুন্দরি,
তরুণ হাতের পরশে আমারে
গড় গো নতুন করি।
আজি দিকে দিকে পাকে আম্ জাম্ হাটে ও বাটে,
নাকে, মুখে, চখে ব্রণ, বিস্ফোট পাকে ও ফাটে ;—
আজি যদি কোথা ধরে থাকে পাক কেশের পাটে,
ক্ষমিয়ো তা'কে।
ক্ষমা কোরে পৃথু সিঁথের বিথার
না যদি ঢাকে
টিকি ও টাকে।

(৫)

এস চলদঞ্চলে,
জীবনকুঞ্জ গুঞ্জরি তোল
ক'গাছি কাঁকন মলে।
চিত্ত জুড়িয়া নিত্য যাহারা করিত খেলা,
আজি তাহাদের করেছি বিদায়, করেছি হেলা।
বাইরণ, শেলি, গেটে ও শিলার, রহেছে মেলা,
কি তাহে কাজ ?
হাফেজ, হোমার, ট্যাসো, কালিদাস
মৌন আজ,—
পেয়েছে লাজ।

(৬)

তুমি এস এস, প্রিয়ে,
রাঙাইয়া তোল স্বর্গ, মর্ত্ত,
চরণালক্ত দিয়ে।
বুলাও তোমার মোহন তূলিকা জীবন পাতে,
মুছে দাও যত অতীত স্মৃতি নিপুণ হাতে,
জ্ঞান অঞ্জন লাগাও চক্ষে, বাসর রাতে,
সোহাগ ভরে ঃ—
সৌর জগত দেখিব খতিয়ে
নখের দরে,
দুদিন পরে।

(৭)

এস, অয়ি অনবদ্যে,
চুনে কঞ্জলে কর উজ্জ্বল
আমার গদ্যে পদ্যে।
এসগো " Cooke ", সিঁন্দুর শাঁখার মোহর আঁকা,
এসগো " luggage ", সাড়ী চাদরের বহর ঢাকা।
এস, জহরত-হিরণ-কিরণ-লহর জাঁকা
এসেন্স শিশি,
মাথা ও দাড়িতে, হাতা ও হাঁড়িতে
রহিব মিশি,
অহর্নিশি।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

হিন্দু

ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নাম প্রায় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হইতে হয়। বুদ্ধ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, যীশু খৃষ্ট হইতে খৃষ্টান ধর্ম্ম, মহম্মদ হইতে মুসলমান ধর্ম্ম। হিন্দু ধর্ম্ম—এই নাম কোথা হইতে আসিল?

হিন্দু শব্দ বেদে নাই, পুরাণে নাই, উপপুরাণে নাই, প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে, নাটকে, কোষে, অভিধানে নাই, অথচ হিন্দু বলিতে বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, শাক্ত, বৈষ্ণব, সকল ধর্ম্মই বুঝায়। এই নামকরণ কেমন করিয়া হইল?

জগতের অপর প্রধান ধর্ম্ম সমূহে ও হিন্দু ধর্ম্মে মৌলিক প্রভেদ এই যে অপর ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দু ধর্ম্ম কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় নাই। কোন বিশেষ অবতার বা কোন বিশেষ ঋষি এই ধর্ম্ম প্রচলন করেন নাই। বেদে দেবতা অনেক, ঋষিও বহুসংখ্যক। নানা মুনির নানা মত, পরস্পর বিরোধী মতের সমন্বয় এই হিন্দু ধর্ম্মে। পিতামহ বেদান্ত মতে অদ্বৈতবাদী, তাহার পুত্র যাজ্ঞিক বৈদিক, পৌত্র পৌরাণিক পৌত্তলিক, অথচ তিন পুরুষ একান্নে এক গৃহে বাস করে, কোনরূপ বিরোধ বা মনোমালিন্য নাই। বৃহস্পতির ন্যায় ঋষি বেদরচয়িতাদিগকে গালি দিতেন। গৌতম বলিতেন ঈশ্বর আছেন তাহার প্রমাণ নাই। চার্ব্বাক ঘোর নাস্তিক, কিন্তু ইঁহাদের কাহাকেও কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে বাহির করা হয় নাই। ধর্ম্মযজনের স্থানে গমন করিবারও কোন নিষেধ ছিল না। একঘরে করা আধুনিক প্রথা এবং উহা সমাজের শাসন। অতি প্রাচীন কালে আর্য্যদিগের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে কোন স্বতন্ত্র নাম ছিল এরূপ বিবেচনা হয় না। আর্য্য ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাম।

হিন্দু শব্দ আদৌ সংস্কৃত নয়। কোন সংস্কৃত ধাতু হইতে এই শব্দ উৎপন্ন হয় নাই। অভিধানে দেখিতে পাই হিব্রুভাষায় ভারতবর্ষের নাম হন্‌দ অর্থ গৌরবান্বিত রাজ্য। জেন্দ ভাষায় হিন্দব। গ্রীক ভাষায় হন্দ্‌কোশ, ইন্দিকোস্ (Indikos) ও ইণ্ডিওস্ (Indios)। পার্সীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বেণ্ডিডাডে (Vendidad) হপ্ত হিন্দুর (সপ্ত নদী) উল্লেখ আছে। এই প্রদেশ পঞ্জাব। এই প্রদেশ এককালে ইরানের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন পারস্য ভাষাতেও হিন্দব শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

পারসী (ফারসী) ভাষায় হিন্দু শব্দ অর্থে কৃষ্ণবর্ণ। মিসরের দক্ষিণে ইথিওপিয়া (Ethiopia), সে দেশের অধিবাসীরা কাফ্রী। হিন্দু বলিতে এককালে তাহাদেরও বুঝাইত। হাফিজের প্রসিদ্ধ গজলে আছে—

অগর আঁ তুর্ক শিরাজী বদস্তারদ্ দিলে মারা।
বখালে হিন্দ্ ওয়শ্ বক্‌সাম্ সমরকন্দো বোখোরা রা।

যদি শিরাজনগরবাসী ঐ তুর্কী তাহার হস্তে আমার হৃদয় গ্রহণ করে, (তাহা হইলে) তাহার চর্ম্মের কৃষ্ণ চিহ্নের (তিলের) বিনিময়ে আমি সমরকন্দ ও বোখারা নগরদ্বয় দখল করিব।

হিন্দুকুশ পর্ব্বত ফারসী ভাষায় হিন্দকোহ, হিন্দ অর্থে কালো, কোহ অর্থে পর্ব্বত, কৃষ্ণপর্ব্বত। হিন্দোস্তান, হিন্দুস্থান, যে দেশে হিন্দু নামক কৃষ্ণবর্ণ জাতি বাস করে। এইরূপ গুলীস্তান, ফুলের দেশ, তুর্কীস্তান, যে দেশে তুর্কীরা বাস করে, আরবীস্তান, যে দেশে আরব্য জাতি বাস করে, কুর্দ্দীস্তান, যে দেশে কুর্দ্দগণ বাস করে।

হিন্দু শব্দ ঘৃণাব্যঞ্জক। ইরাণী ও মোগলেরা গৌরবর্ণ, ভারতবাসী কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিত। ইংরাজীতে নিগর (nigger) শব্দের যে অর্থ, পারসীতে হিন্দু শব্দেরও প্রায় সেই অর্থ। কেহ আমাদিগকে নিগর বলিলে আমরা রাগ করি, কিন্তু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আমরা গৌরব অনুভব করি। হিন্দু শব্দে যে শ্লেষ, কালে তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। যে কালে আর্য্য জাতি ভারতে আগমন করেন সেকালে হিন্দু নামে কোন জাতি ছিল না, হিন্দু ধর্ম্ম নামে কোন ধর্ম্ম ছিল না, হিন্দু শব্দ কেহ জানিত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে হিন্দু শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। আর্য্য, অনার্য্য, শক, কোল, ভিল্ল, অনেক জাতির উল্লেখ আছে কিন্তু হিন্দু শব্দ কোথাও নাই। থাকিবার কথাও নয়, কেন না সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু শব্দ নাই। বিদ্যাপতি তাঁহার পদাবলীতে রাজা শিবসিংহকে "হিন্দুপতি" বলিয়াছেন। তখন মুসলমানী আমল, দেশের লোক হিন্দু মুসলমান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রতিধ্বনি

অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা*

(মসলিপত্তন)

শিল্পাচার্য্যের বিদায়

বিগত ২৭শে এপ্রিল, ১৯২৬, অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার ভারতীয়-শিল্প বিভাগের প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় শিল্পাচার্য্যের বিদায় উপলক্ষে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় শ্রেষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত সেবিজি হনুমন্ত রাও পস্তালু গারু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলাশালার ছাত্রগণ ও মসলিপত্তনের বহু গণ্যমান্য লোকের সমাগম হয়। সভাপতি মহাশয় প্রমোদ বাবুর গুণপণার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন, চারি বৎসরের কঠোর পরিশ্রম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায় প্রমোদ বাবু অন্ধ্র জাতীয় কলাশালাকে একটি সুগঠিত স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন। সেজন্য তিনি সমগ্র অন্ধ্র জাতির কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার পর অন্ধ্র দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মুটমুরী কৃষ্ণরাও গারু কলাশালার কর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কলাশালার অস্থায়ী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস রাও গারু প্রমোদ বাবুর প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতার উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর প্রমোদ বাবু উত্তরে যে অভিভাষণটি পাঠ করেন, আমরা তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পাঁচ বৎসরের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯১১ সালে কলিকাতার Government School of Art হইতে বাহির হইয়া যখন আমি স্বাধীনভাবে কার্য্য আরম্ভ করি, তখন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পিগণের পরিচালিত প্রাচ্য কলার প্রতি আমাদের কোন সহানুভূতি ছিল না। রাফেল প্রমুখ ইতালীয় শিল্পিগণের প্রতিই আমার কল্পনা ধাবিত হইত। অসীম উদ্যমের সহিত হৃদয়ে একটা আশা লইয়া আমি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। তাহার অল্প দিন পরেই আমার জীবনের আর একটি অধ্যায় আরম্ভ হইল। আধ্যাত্মিক বিপ্লব আসিয়া আমার ঐহিকের সকল সুখ ও উন্নতির আশাকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। তখন আমার মনে হইত, বর্ত্তমান কালের অনুভূতিকে বর্ণ ও রেখার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। র‍্যাফেলের পরিবর্ত্তে পরমহংসদেব আমার হৃদয়কে ছয় বৎসর কাল অধিকার করিয়াছিলেন।

"আমার জীবনের এই গভীর বিপ্লবের যুগে ১৯১৭ সালে আমি তিব্বত ভ্রমণে গমন করি। প্রায় সমুদয় হিমালয় রাজ্য অতিক্রম করিয়া তিব্বতে উপস্থিত হইলাম। সেখানকার প্রত্যেক দৃশ্য, প্রত্যেক মঠ, প্রত্যেক কারুমূর্ত্তির ভিতরে-বাহিরে কি একটা নিগূঢ় রহস্য আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহা আমার হৃদয়ে একটি নূতন আন্দোলন জাগরিত করিল। ইহার প্রভাব আমি অতিক্রম করিতে পারিলাম না। এই স্বপ্নই পরবর্ত্তী কালে আমার চক্ষুর সম্মুখে প্রাচ্যকলার মহিমা উপস্থাপিত করিয়াছিল। তিন মাস পরে যখন দেশে ফিরিয়া আসিলাম, তখন বুঝিলাম, ভারতীয় শিল্পকলাই আমার ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র হইবে। একদিন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের নিকট গিয়া Indian Society of Oriental Art এর Hall এ স্থানের জন্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি ছাত্র হিসাবে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। গভীর মনোযোগ ও নব উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

* চিত্রশিল্পের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বহুদিন হইতে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং পাশ্চাত্য পদ্ধতি মতে শিক্ষিত একজন শিল্পাচার্য্যের প্রাচ্য মত গ্রহণের ইতিহাস, আশাকরি, সুখপাঠ্য হইবে।——বঃ সঃ

আমার কয়েকখানি ছবি সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহাই আমার প্রাচ্যকলার কর্ম্মক্ষেত্রের প্রথম অধ্যায়।

"তারপর আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের সুপারিশে আপনাদের নব-প্রবর্ত্তিত জাতীয় কলাশালায় যখন আসিয়া প্রবেশ করি, তখন আমার আর একটি নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ হইল। এখানকার কর্ত্তৃপক্ষদের কথা প্রসঙ্গে এই কথা বুঝিলাম, কয়েকটি ছাত্রকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিয়া তোলাই আপনাদের ভিন্ন প্রদেশের শিল্পীকে নিযুক্ত করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি সেইভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলাম। এখানকার কর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলিবার নাই। শুধু এইটুকু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি যে, 'সারদা' পত্রিকার একখানি ছবিই ডাক্তার কজিন্‌স্ (cousins) কে এই শিল্পকলার অন্যতম বন্ধু করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সাহায্য এই কলাশালার উন্নতির অন্যতম কারণ।

"পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, এই চারি বৎসরের পরিশ্রমে এই যে কয়জন শিল্পী গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং আমি যাঁহাদের হস্তে কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া যাইতেছি আপনারা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। এখনকার কঠিন সংঘর্ষের দিনে ভিন্ন প্রদেশের প্রদর্শনীতে ছবি বিক্রয়ের আশা অতি দুরূহ; সুতরাং প্রাদেশিক প্রদর্শনী করিয়া এখানকার কর্ম্মী ও ছাত্রদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণও এই কথা মনে রাখিবেন যে, শুধু অর্থলাভকে মূল উদ্দেশ্য করিলে উচ্চশিল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহারাই শিল্পীদিগের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করুন। তাঁহারা যেন শিল্পের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করেন। গত মাসে ডাঃ কজিন্‌স্ আমাকে একখানি পত্রে যাহা জানাইয়াছেন তাহাতে আমি লজ্জিত হইলেও উহার একছত্র প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—

"উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসিগণকে তাঁহাদের নিজেদের শিল্প বুঝান ও আস্বাদন করান বড়ই কঠিন—যাহা হউক, আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে।"

সভার প্রত্যেকে একাগ্রচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। ছাত্রগণ গুরুদক্ষিণা স্বরূপ এই কলাশালার বয়ন বিভাগে নির্ম্মিত একখানি বহুমূল্য কার্পেট তাঁহাকে প্রদান করেন। পরদিন গান্ধী-আশ্রমের অধ্যক্ষ ও ছাত্রগণ বিদায় অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়া তাঁহাকে একটি মহীশূরে নির্ম্মিত বহুমূল্য চন্দনকাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি উপহার দেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা।
৩০শে বৈশাখ।

আষাঢ়ে

পুণ্যস্মৃতি—স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের সময়ে আমরা গভীর আন্তরিকতায় তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি। রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতা ও সামাজিক হিংসা-বিদ্বেষের প্রকোপের দিনে মনে পড়ে তাঁহাদেরই নেতৃত্বের কথা, যাঁহারা জ্ঞানে, দীপ্তিতে, চিন্তার গভীরতায়, সত্য প্রচারের নির্ভীকতায়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার দৃঢ়তায় ও চরিত্রের সাধুতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এই জন্যই একদিন কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ স্বাধীন মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রহরী মিল্টন্‌কে স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, Milton, thou shouldest be living at this hour, England hath

need of thee. এদেশে যাঁহার শিক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থায় যথার্থ জাতীয়ত্ব বিকাশের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, হিন্দু-মুসলমান অভেদে সকল জাতির অতীত জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইতেছিল, যিনি ক্ষমতাশালীদের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন, যিনি অসার লোকপ্রিয়তাকে তুচ্ছ করিয়া দেশের উদ্‌ভ্রান্ত আন্দোলনকে সংযত ও সুসম্বদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, আর যাঁহার ধীরতা ও কর্ম্মনিপুণতা প্রকৃতির শক্তির মত অটল ও অক্ষয় ছিল, আজ আমাদের দেশের এই দুর্দ্দিনে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া বলিতেছি—আশুতোষ, এদিনে আমরা তোমাকে চাই,—এদেশ আজ তোমার অভাবে দুঃস্থ।

* * *

মিলনের জোড়াতালি—আমরা যে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলে সমানে ভারতবাসী, আমাদের সকলের যে একই স্বার্থ, একই পথ, একই গতি, একথা যদি মুসলমানেরা ধর্ম্মমতের প্রভেদে ভুলিয়া যান,—তাঁহারা যদি কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাণের টানে সকলের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে না জোটেন, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে একটা জোড়া তালি দিয়া, একটা ফাঁকির Pact খাড়া করিয়া মুসলমানকে অ-মুসলমানের সঙ্গে মিলাইতে পারেন। যাঁহারা ধর্ম্মের বিসংবাদী প্রভেদকে বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া পৌরাণিকে ও কোরানিকে মিলাইতে চান্ তাঁহাদের বুদ্ধির অভাব অতি শোচনীয়। এদেশের মুসলমানেরা যে, তুর্কীর বা ইরাণের বা আরবের কেহ নন,—তাঁহারা যে ভারতের, একথা ডাক্তার কিচ্‌লু তাঁহার সম্প্রদায়ের লোককে বারে বারে বলিতেছেন, কিন্তু উত্তেজনার উদ্বেগে হয় ত অনেকেই তাহা বুঝিতেছেন না। হিন্দুর যে সাধ্য নাই মুসলমানকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়, মুসলমানের যে সাধ্য নাই যে গাজী সাজিয়া হিন্দু জাতিকে উচ্ছেদ করে, আর উভয়ে দেশের স্বার্থে মিলিয়া কাজ না করিলে যে উভয়েরই অনিষ্ট ঘটে, এ কথাও ডাক্তার কিচ্‌লু বলিতে বলিতে পরিশ্রান্ত। আমরা এবারে মুসলমান সুধীদের উক্তির উল্লেখ করিয়াই দেখাইব যে, মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান আন্দোলন তাঁহাদের নিজের সম্প্রদায়কেই দুঃস্থ করিবে।

Pactএর জোড়াতালির প্রস্তাবের প্রসঙ্গে কংগ্রেসের লোকেরা কৃষ্ণনগরে ও কলিকাতায় যে বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন, পাঠকেরা তাহা বহু সংবাদ পত্রে পড়িয়াছেন। মুসলমানকে যে মন্ত্রে প্রলুব্ধ করিবার জন্য Pact গড়া হইয়াছিল, সে মন্ত্রটি কি ভাবে শাসনকর্ত্তারা জপ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, Pactএর বজ্র বাঁধন অতি ফস্কা, তাহা বলিতে হইবে না। Pactএর নীতি ও সরকার বাহাদুরের প্রদত্ত অধিকতর মাত্রায় চাকুরি দিবার প্রতিশ্রুতি যে, মুসলমান সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর তাহা এদেশের কয়েক জন সুধী মুসলমান বুঝিয়াছেন। সেই কথাই এখানে বলিব।

গ্রীষ্মের উত্তাপ বাড়িবার মুখে কলিকাতায় যে দাঙ্গা ঘটিয়াছিল তাহার পূর্ব্বেই

ফাল্গুন মাসে মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজের একটি সভায় অধ্যাপক মৌলবী আবুল হুসেয়ন এম্‌-এ, বি-এল্‌, যে প্রবন্ধটি পড়িয়াছিলেন আমরা তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি।

"আপনাদের জানা আছে, সরকার সম্প্রতি আমাদের ভিক্ষার ঝুলিতে শতকরা ৪৫টি হিসাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন।...আমার মনে হয় সরকারের এই বিশেষ ব্যবস্থা (Concession) উঠাইয়া দিলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে একটু দৃষ্টি পড়িত এবং সত্যকার সাধনার দিন ফিরিয়া আসিত,......শতকরা পঁয়তাল্লিশের ব্যবস্থা এই, দৈন্য, নির্লজ্জতা, দারিদ্র্য, মানসিক দুর্ব্বলতাকে আরও প্রশ্রয় দিতে থাকিবে। শতকরা তেত্রিশ স্থলে শতকরা পঁয়তাল্লিশ হইল। এখন আবার শতকরা ষাটের জন্য কান্না সুরু হইয়াছে। তাহার পর শতকরা আশী এইরূপে নির্লজ্জতা এমন বিরাট হইয়া দাঁড়াইবে যে, যদি কোন দিন মুস্‌লিম রাষ্ট্র-নায়ক শতকে শত দাবি করিয়া বসেন তাহাতে আমি একটুও বিস্মিত হইব না। মুস্‌লিম রাষ্ট্রনায়কের আর কোন কাজই নাই, সরকারের নিকট হইতে চাকুরির সংখ্যা ভিক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র Programme; তাঁহার ধারণা শুধু চাকুরির সংখ্যা বাড়াইলেই মুস্‌লিম সমাজ উন্নত হইবে। হিন্দু শক্তির সঙ্গে কুলাইতে পারা অসম্ভব এই আশঙ্কা করিয়া তিনি সরকারের আশ্রয় ভিক্ষা করিতে ব্যস্ত। তিনি মনে করেন, চাকুরির সংখ্যা বাড়িলেই শক্তি বাড়িবে। বলা বাহুল্য এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দুঃখ ও লজ্জার সহিত বলিতে হইবে এ ভ্রান্ত ধারণা ক্রমশঃই মুস্‌লিম সমাজের প্রতি স্তরে বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে।

"একথা স্বীকার করিতে হইবে, শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু যুবকের সঙ্গে মুস্‌লিম যুবক আঁটিয়া উঠিতে পারে না। অগত্যা কর্ম্মক্ষেত্রে সরকার হাত বাড়াইয়া তাহাকে তুলিয়া ধরেন। যেখানে হিন্দু যুবক ষোল আনা কৃতিত্ব দেখায়, সেখানে মুস্‌লিম যুবক মাত্র দশ আনা কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। অথচ সরকার উভয়কে একই পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন।......তাই আজ আমাদের সমাজে প্রকৃত শক্তিশালী পুরুষের সংখ্যা অতীব বিরল, কেন না ষোল আনা কৃতিত্ব লাভ করিতে যে শক্তি ও সাধনা প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা আমরা কখনও প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনই বোধ করি নাই। সাধনা বিনা শক্তি অর্জ্জন করা যায় না। সে সাধনার জন্য চাই দুঃখ ও ত্যাগ।

"প্রতিযোগিতায় মুসলমান কোন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে সমর্থ না।.....তাহার কারণ; এ যাবৎ কোন মুসলমানই সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে নাই এবং তদনুসারে সাধনা করে নাই। এই প্রতিযোগিতা পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে মুস্‌লিম রাষ্ট্রনায়কগণ সরকারের নিকট হইতে minimum কৃতিত্বের জন্য maximum পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে মুস্‌লিম ছাত্রগণ সর্ব্বদা কোন গতিকে সেই minimum qualification (কৃতিত্ব) লাভের জন্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা চেষ্টা

করিতেন 'To be any how qualified for the post'. কিন্তু কিরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পুরস্কার লাভ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানিতেও চেষ্টা করিতেন না, শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, কঠোর সাধনা করা ত দূরের কথা।

"Concessionএর দুলাল মুস্‌লিম সম্প্রদায়ের ঠিক এই অবস্থা হইয়াছে যে, আজ মুস্‌লিম সমাজ হিন্দুকে সন্দেহ করিতে কুণ্ঠিত নয়; তাহার কৃতিত্বে হিংসা করিতে ছাড়ে না; তাহার শক্তিতে শঙ্কিত হইয়া ক্রমশঃ বেশি করিয়া অন্য শক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে উদাসীন, বর্ত্তমানের দুর্ব্বলতা তাহাকে অধিকতর কৃপার পাত্র, ঘৃণ্য করিয়া তুলিয়াছে।......কালক্রমে হিন্দু রাষ্ট্রনায়কগণের প্রচেষ্টা যখন "ভারতীয় স্বায়ত্তশাসনের" মুকুট পরিবে তখন কে আমাদের এই দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইবে? সে চিন্তা কি আমাদের হইবে না, সে শুভ বুদ্ধি কি আমাদের জাগিবে না?"

এই সুচিন্তিত উক্তিগুলি তুলিবার পর আমরা বলি, যাঁহারা Pact খাড়া রাখিতে চা'ন, তাঁহারা মুসলমানের শত্রু, হিন্দুর শত্রু, ভারতের শত্রু, স্বরাজ্যের শত্রু,—মনুষ্যত্বের শত্রু।

* * *

অ-মুসলমানের কথা—শাসন কর্ত্তারা বুঝিয়াছেন যে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্য কাহারও সহিত মিলিতে পারে না ও কাহাকেও সহিতে পারে না; তাই সে সম্প্রদায়কে তাহাদের বিশেষ নামে চিহ্নিত করিয়াছেন, আর অ-মুসলমান নামে বাদ বাকি সকলকে পরিচিত করিয়াছেন। আমরা হিন্দু, শিখ, জৈন, খৃষ্টান, কোল্-কন্দ্ প্রভৃতি সকলে পরস্পরকে সহিতে পারি, পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করিতে জানি; তাই আমরা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে অ-মুসলমান। এটা আমাদের প্রশংসার কথা। তবে আমরা সহিতে পারি বলিয়া সরকার বাহাদুর মুসলমানের আবদার রক্ষা করিতে গিয়া আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিতে থাকিবেন, সেটা সুখের কথা নয়। আমরা লাঞ্ছনা সহিতে পারি, নীরবে নির্য্যাতন ভুগিতে পারি; এই অজুহাতেই কি আমাদের গৌরব বাড়াইবার জন্য রাজ-রাজেশ্বরী শোভাযাত্রার সময় অন্যায় আদেশ প্রচারিত হইল? সরকারি নিয়ম মতে ঐ শোভা যাত্রা চলিলে সরকারের নিয়মে শাসিত কোন ব্যক্তি উহাতে বাধা দিতে পারিত এরূপ মনে হয় না, তবুও যখন গবর্ণর বাহাদুর শোভাযাত্রাদির সম্বন্ধে মুসলমানদের আবদার রাখিয়া নিয়ম গড়িলেন, তখন নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্বীকৃত হইল, যে তাঁহারা বিধিসঙ্গত নিয়মে বাধ্য করিয়া মুসলমানকে শাসন করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট যে মুসলমানদের ভয়ে ভীত তাহা প্রচারিত হওয়ায় কোন্ পক্ষের কতখানি উপকার হইবে তাহা এখন জানা যায় নাই।

এ প্রসঙ্গে কিন্তু একথা বলিতে পারি যে, মুসলমানদের জন্য শতকরা ৪৫জনের চাকুরির ব্যবস্থা হওয়ায় অমুসলমানদের ক্ষতি হইবে না। কেন, তাহা বলিতেছি। যাঁহারা আদম-সুমারির সকল খুঁটি-নাটির হিসাব টুকিতে জানেন, তাঁহারা বলেন যে, লেখাপড়া শিখিয়া একটু ভাল চাকুরি পাইবার যাহাদের যোগ্যতা আছে, তাহাদের সংখ্যা ধরিলে দেখা যায় যে মুসলমানদের মধ্যে যোগ্য লোকের সংখ্যা অ-মুসলমান যোগ্য পুরুষদের কুড়ি ভাগের একভাগ। একশ জনের মধ্যে ৫জন না ধরিয়া যদি যোগ্য মুসলমানের সংখ্যা দশজন ধরিয়া লওয়া যায়,

তবে দেখা যাইবে যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে গেলে শতকরা ৩৫জন অযোগ্যকে চাকুরি দিতে বাধ্য হইবেন। এই অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত ৩৫জন যখন কাজ করিতে পারিবে না তখন গবর্ণমেণ্ট শাসনের রথটানা বন্ধ না রাখিয়া অতিরিক্ত ৩৫জন অমুসলমানকে রথের দড়ি টানিতে নিযুক্ত করিবেন। তাহা হইলেই কাজ না করিয়া পেন্সন পাইবে ৩৫জন আর শতকরা নব্বই জন অ-মুসলমান যাহা হউক কিছু ভৃতি পাইয়া সরকারের চাকুরি করিতে পাইবে।

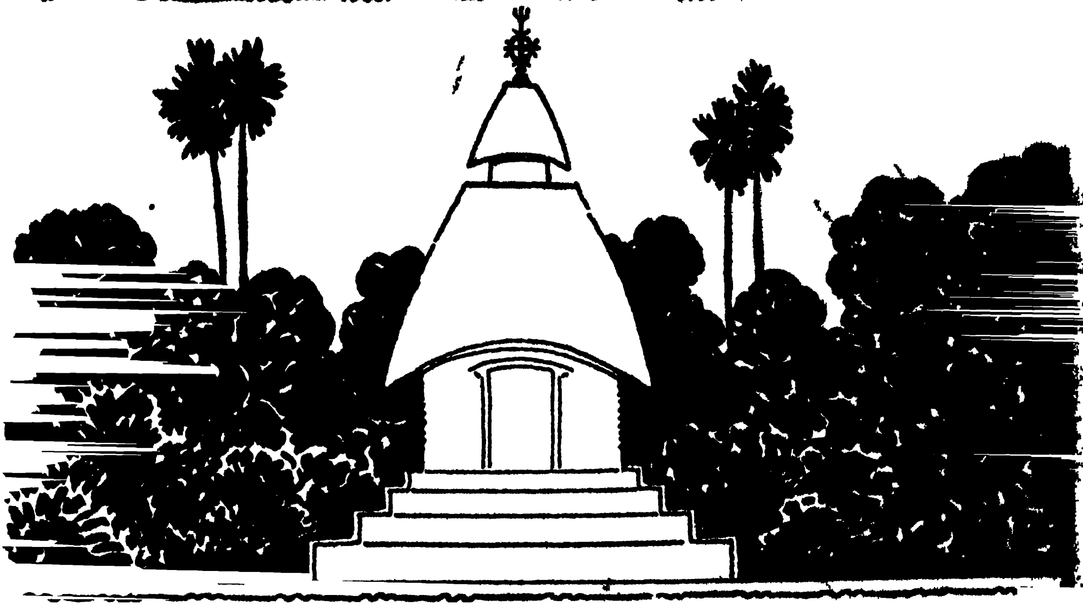
কয়েক জন মুসলমান নেতা হয়ত আমার দেওয়া হিসাবটিকে ভুল বলিবেন; হয়ত তাঁহারা বলিতে পারেন যে চাকুরির ক্ষেত্রে অ-মুসলমানেরা মুসলমানদের প্রবেশে বাধা দিতেছে বলিয়াই যোগ্য মুসলমানেরা চাকুরি পাইতেছেন না। যেখানে গবর্ণমেণ্টের দানের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের যোগ্যতায় কাজ করিতে হয় সে ক্ষেত্রে মুসলমানের সংখ্যা কত? উকিল, ডাক্তার, বে-সরকারি স্কুল-মাষ্টার ও সাহিত্যিক প্রভৃতিদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা কত? এই বঙ্গে ত মুসলমানেরা হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক; কাজেই ডাক্তার, উকিল সাহিত্যিক পুষিবার ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে অধিক; তবে সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের সংখ্যা এত কম কেন? মুসলমানেরা বলিবেন যে আমরা চাকুরি পাইবার পর উৎসাহিত হইয়া যোগ্যের সংখ্যা বাড়াইব; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি হিসাবে চাকুরির সংখ্যা সম্বন্ধে অদ্ভুত ব্যবস্থা করিলেন? এখানেও কি গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতেছেন যে তাঁহারা মুসলমানের ভয়ে বিশেষ ভীত, তাই নিজেদের কাজ চলুক আর নাই চলুক, একশত চাকুরির মধ্যে মুসলমানকে ৪৫টি চাকুরি দিবেনই দিবেন? যাহা হউক একথা লইয়া আমরা কোন বিবাদ তুলিব না; গবর্ণমেণ্টের কাছে আমাদের যে সহিবার ক্ষমতার প্রশংসা আছে সেই প্রশংসার সুখ্যাতি বজায় থাকুক। আমরা যে নানা অবস্থার সংঘর্ষণে গবর্ণমেণ্টের মানসিক অবস্থার পরিচয় পাইলাম, ইহা অল্প লাভের কথা নয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—এক বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশ-প্রেমিক সর্ব্বত্যাগী ও সর্ব্বজনপ্রিয় চিত্তরঞ্জনের বিয়োগে দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরা যেরূপ শোকপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা কেহ ভুলিতে পারিবে না। দেশবন্ধুর প্রতি এই অকৃত্রিম অনুরাগ ও ভক্তি এদেশে এখনও জীবন্ত। তাঁহার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিনে সকলে যদি আজ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত কর্ম্মের পথে অগ্রসর হ'ন্, তবে এসময়ে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক বিবাদ তিরোহিত হইতে পারে। আমরা সাগ্রহে সকল সম্প্রদায়ের লোককে তাঁহাদের অকপট বন্ধুর শ্রাদ্ধের দিনে মিলনের নূতন সঙ্কল্পে মিলিত হইতে অনুরোধ করিতেছি। দেশবন্ধুর স্থায়ী স্মৃতির জন্য যে সকল হিতকর অনুষ্ঠান হইতেছে ও হইয়াছে আমরা পূর্ব্বে তাহার বিবরণ দিয়াছি; এখন আমরা পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়া স্বদেশের সেবায় উজ্জীবিত হইয়া গৃহে গৃহে ও হৃদয়ে হৃদয়ে চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি স্থায়ী করিয়া ধন্য হই।

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.



বঙ্গবাণী





কলেজষ্ট্রীট মার্কেট



বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৫ম বর্ষ
১৩৩২-'৩৩

শ্রাবণ

প্রথমার্দ্ধ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাহিত্যে মৌলিকতা

মৌলিকতা যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটা প্রধান গুণ তাহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু সাহিত্যের প্রকারভেদ অনুসারে এই শব্দটির অর্থও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, একথা ভুলিলেও চলিবে না। সাধারণভাবে অভিনব বস্তু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাকে মৌলিকতা নামে সংজ্ঞিত করা যাইতে পারে। কিন্তু সাহিত্য বিশেষে এই 'বস্তু'টি আখ্যান-বস্তু হইতে পারে কিংবা ভাব-বস্তু হইতে পারে। কাব্য ও নাটকে যে মৌলিকতার আমরা সন্ধান করি তাহা বিষয়গত নহে ভাবগত; অর্থাৎ অখ্যান-বস্তু অভিনব না হইলেও মৌলিকতার হানি হয় না, যদি ভাব, রস ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকে। কালিদাস, সেক্সপীয়র প্রভৃতি মহাকবিদের কাব্যনাটকে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা রস-সৃষ্টির উপাদানের জন্য প্রায়ই পূর্ব্ব সূরিগণের নিকট ঋণী। সুতরাং তাঁহাদের মৌলিকতা বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ নহে, এমন কি বিষয়গত সৃষ্টিকে তাঁহারা তুচ্ছ বা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু পুরাতন মাল-মসলা লইয়া তাঁহারা যে অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ও জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই তাঁহাদিগকে অতুলনীয় মৌলিকতা দান করিয়াছে। গীতিকাব্য সম্বন্ধে উক্ত নিয়মের একটু ব্যতিক্রম বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিই; কারণ তাহা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি, যদিও নাটকে ও বর্ণনাত্মক কাব্যে পুরাণেতিহাসের অন্ধ অনুবর্ত্তন মৌলিকতার

হানিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে; বিশেষতঃ প্রতিভাহীন লেখকের পক্ষে। কিন্তু কোন বিশেষ ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা কিম্বদন্তীমূলক কাহিনীকে কবি যখন ভাব সঙ্গীতে সৌন্দর্য্যময়ী গীতিকবিতার আকার দান করেন তখন তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। গীতি-কবিতা প্রায়ই আখ্যান-বস্তুর অপেক্ষা রাখে না, কারণ তাহা ভাবরসঘন। বৈষ্ণব পদাবলী ও রবীন্দ্রনাথ, শেলী, কীট্‌স্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণের অসংখ্য কবিতা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কোন কোন কাব্য নাটকে বিষয় ও ভাবগত মৌলিকতা রক্ষিত হইলেও অনুকরণের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও সাহিত্য হিসাবে এই শ্রেণীর রচনা নিকৃষ্ট না হইতে পারে। সেক্সপীয়রের 'রিচার্ড দি সেকেণ্ড', মার্লোর 'এড্‌ওয়ার্ড দি সেকেণ্ড' নামক নাটকের অনুকরণে লিখিত। আমাদের দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহানের' উপর সেক্সপীয়রের 'কিং লিয়রের' ছায়া বিশেষরূপে পড়িয়াছে। কিন্তু অনুকরণের গন্ধ থাকিলেও 'রিচার্ড দি সেকেণ্ড' একখানি উৎকৃষ্ট নাটক; এবং 'সাজাহানের' মৌলিকতা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 'মেঘনাদবধ' ও 'বৃত্রসংহার' আমাদের ভাষায় দুইখানি আধুনিক মহাকাব্য এবং এই দুই মহাকাব্য যে বঙ্গ সাহিত্যের মুকুটমণি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুইখানি কাব্যই যে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের অনুকরণে রচিত তাহা অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাব দেশীয় ও বিদেশীয় কবিতার মধ্যে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার 'মদন ভস্মের পর' নামক অনুপম কবিতাটির মূলভাব কবি রাজশেখরের যে সংস্কৃত শ্লোকটী হইতে গৃহীত তাহা কবি কালিদাস রায় এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—

মীনকেতনে দহিয়া বিধি করেছ একি রঙ্গ!
মমতাহীন পেয়েছে সে যে ভুবনভরা অঙ্গ;
পঞ্চশর ভাঙ্গিয়া তার হয়েছে শর লক্ষ;
করিল প্রাণে কদম সম বিঁধিয়া দেহ বক্ষ।

এইরূপ 'সিন্ধুতীরে' শীর্ষক রূপক কবিতাটির সহিত Leonora নামক একটি জার্ম্মান গাথার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সার ওয়াল্‌টার স্কট্ এই গাথাটির William and Helen নাম দিয়া একটি ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই কবিতায় আমরা দেখি যে অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রোত্থিতা হেলেন তাহার গৃহসম্মুখে এক অশ্বারোহী পুরুষ দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে তাহার প্রণয়ী উইলিয়ম বলিয়া চিনিতে পারে, এবং তাহার নির্দ্দেশক্রমে সে সেই পুরুষেরই পার্শ্বে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে। তারপরে বিদ্যুদ্‌বেগে ঘোড়া ছুটিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহারা কত পথ অতিবাহন করিল, কত দেশ, কত বন, কত প্রান্তর,

অতিক্রম করিল ; কিন্তু পুরুষটি একটি কথাও কহিল না, এমনকি তাহার মুখ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। তারপর রাত্রিশেষে অশ্বারোহী একটি গির্জ্জার মধ্যে এক উন্মুক্ত কবরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেইখানে সেই পুরুষমূর্ত্তি প্রথম কথা কহিল এবং সে যে মৃত উইলিয়মের প্রেতাত্মা তাহা হেলেনকে জানাইয়া দিল। রবীন্দ্রনাথ এই গাথাটি হইতে যদি 'সিন্ধুতীরে' কবিতার প্রেরণা পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও বলিতে হইবে তিনি গৃহীত আখ্যানটিকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া ভাব রাজ্যের অতি উচ্চস্তরে বিচরণ করিয়াছেন। সুতরাং মিল্‌টনের Il Penserosoর সহিত ফ্লেচারের একটি ক্ষুদ্র কবিতার যে সম্বন্ধ রবীন্দ্রনাথেরও এইসকল কবিতার সহিত সাদৃশ্যমূলক অন্যান্য কবিতার সেই সম্বন্ধ। অনুসন্ধান করিলে হয়ত এরূপ সাদৃশ্য আরও অনেক বাহির করিতে পারা যায়। কিন্তু কবির শ্রেষ্ঠত্ব তাহাতে একটুও খর্ব্ব হয় না।

এইবার উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যের কথা বলি। এখানে মৌলিকতা শুধু ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে চলিবে না, আখ্যানগত হওয়াও চাই। যখন আমরা নূতন গল্প শুনিবার জন্য কোন উপন্যাস বা গল্প-পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত হই, তখন গল্পটি সত্যই নূতন হইবে ইহাই আশা করিয়া থাকি। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে প্লট বা আখ্যানাংশের মৌলিকতা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি। অবশ্য ইহারও ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, এমনকি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরও হাতে। যখন কোন লেখক সর্ব্বজনপরিচিত কোন নাটক বা কাব্যের নামানুসারে স্বরচিত গল্পের নামকরণ করিয়া থাকেন, তখন তিনি সকলকে জানাইয়াই দিতেছেন যে পূর্ব্বপরিচিত উপাখ্যানের সহিত তাঁহার বর্ণিত কাহিনীর একটা সাদৃশ্য থাকিবে। কিন্তু এরূপ সাদৃশ্য সত্ত্বেও পাকা শিল্পীর হাতে এই শ্রেণীর গল্পও যে খুব উপভোগ্য হয় তাঁহার উদাহরণ টুর্গেনিভের Lear of the Stepps ও ব্রেট হার্টের The Iliad of Sandy Bar. কিং লিয়রের গল্প যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং আধুনিক জগতেও এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে তাহাই টুর্গেনিভের গল্পে আমরা দেখিতে পাই। অপর গল্পটিতে যে কলহ বর্ণিত হইয়াছে তাহার উপর ইলিয়াডের ক্ষীণ ছায়া পড়িয়াছে।

আমাদের সাহিত্যের কোন কোন উৎকৃষ্ট উপন্যাস ও গল্পের উপর ইংরাজি উপন্যাস বিশেষের ছায়াপাত আমরা লক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু আর্টের দিক দিয়া সে বইগুলি এত সুন্দর যে মৌলিকতা হিসাবে সেগুলিতে কোন ত্রুটি আছে কিনা তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন আমাদের মনে হয় না। বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনীর' সহিত স্কটের 'আইভ্যানহো'র সাদৃশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে নাকি এসম্বন্ধে একবার প্রশ্নও করা হইয়াছিল। শোনা যায় তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিবার পূর্ব্বে তিনি স্কটের উক্ত উপন্যাসখানি পড়েন নাই। সে যাহাহউক বঙ্কিমবাবুর এই প্রথম উপন্যাস

খানির আখ্যানভাগ যথেষ্ট পরিমাণে মৌলিক না হইলেও ইহা যে আমাদের সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তাহা স্বীকার করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন কি ?

আরও একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব, উৎকৃষ্টতা হিসাবে যাহার স্থান 'দুর্গেশনন্দিনী'রও অনেক উপরে এবং যাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কোন প্রশ্ন উঠিয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি। ইহা হইতেছে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'। এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানির প্লট খুব ঘোরালো নয়। কিন্তু যেটুকু প্লট অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি প্রকটিত হইয়াছে প্রায় তাহার সমস্তটুকুই জর্জ্জ ইলিয়েটের ডেনিয়েল ডেরোণ্ডা (Daniel Deronda) নামক উপন্যাসটিতে দেখিতে পাই। ডেনিয়েল খ্রীষ্টান পরিবারে পালিত এবং নিজেকে খ্রীষ্টান বলিয়াই জানে ; কিন্তু তাহার জন্ম রহস্যাবৃত ছিল। সে গোরার ন্যায়ই স্বদেশপ্রেমিক ; সকল সৎকার্য্যেই সে অগ্রণী, একদিন সে নদীতে আত্মহত্যায় উদ্যতা এক সুন্দরী য়িহুদী যুবতীকে উদ্ধার করিয়া তাহার বন্ধুর বাড়ীতে তাহাকে রাখিয়া আসে। এই মেয়েটীর নাম মীরা। মীরা ডেনিয়েলের প্রেমে পড়িল। ক্রমে ডেনিয়েলও বুঝিতে পারে যে, সে মীরাকে ভালবাসে। দুইজনে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মনে করিয়া ডেনিয়েল যখন মীরাকে লাভ করিবার আশা বিসর্জ্জন দিয়াছিল তখন একদিন হঠাৎ সে জানিতে পারিল যে সে খ্রীষ্টান নয়, তাহার জন্ম এক য়িহুদী পরিবারে। তখন আর বিবাহের কোন বাধা রহিল না। প্লটের এই একই কাঠামো উভয় উপন্যাসে প্রতিভাবান শিল্পীর হাতে এমনই স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে যে গোরাকে ডেনিয়েল ডেরোণ্ডার অনুকরণ বলা ঘোর ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন ছোট গল্পেরও উপাদান পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে হয়ত গৃহীত হইয়াছে। টলষ্টয়ের Resurrection নামক উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ পড়িলে রবীন্দ্র নাথের 'বিচারক' গল্পটী মনে পড়িয়া যায়। ষ্ট্যাট্যুটারি সিভিলিয়ান মোহিতমোহন প্রথম যৌবনে ছাত্রাবস্থায় যে বালিকাটীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, বহুকাল পরে যখন তিনি 'বিচারক' পদে আসীন, তখন তাঁহারই এজলাসে সন্তান হত্যা ও আত্মহত্যা চেষ্টার অপরাধে সেই রমণীই অভিযুক্ত—রবীন্দ্রনাথের গল্পে অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর পরিহাস অভিনীত হইতে দেখি। টলষ্টয়ের উপন্যাসের সম্ভ্রান্তবংশীয় নায়ক বিচারালয়ে জুরিতে বসিয়া কাঠগড়ায় যে নারীকে অপরাধিনীরূপে দণ্ডায়মানা দেখিল, সেই সমাজ-পরিত্যক্তা নারী তাহারই প্রথম যৌবনের উদ্দাম অসংযমের সমস্ত শাস্তি, সমস্ত কলঙ্ক নিজ মস্তকে বহন করিয়া সেই মুহূর্ত্তে বিচারকের দণ্ডাজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট, কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' আমাদের গল্প সাহিত্যের একটী রত্ন। তাঁহার 'স্ত্রীর পত্র' ও ইব্‌সেনের 'Dolls House' এর মধ্যেও বেশ একটা ভাবসাম্য আছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যেও যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য তাঁহাদের উপন্যাসাবলিতেও সমগ্র ভাবে না হউক, ঘটনায় ঘটনায় বা চরিত্রে চরিত্রে বিলক্ষণ মিল লক্ষিত হয়। মোটের উপর ধরিতে গেলে হয়ত জর্জ্জ মেরিডিথের Ordeal of Richard Feveril ও টুর্গেনিভের Torrents of Spring নামক উপন্যাসদ্বয়ের মধ্যে আখ্যানগত বৈষম্যই বর্ত্তমান। কিন্তু তাহা হইলেও উভয় উপন্যাসেরই যেটি প্রধান ঘটনা তাহাতে প্রকৃতপক্ষে বিশেষ পার্থক্য নাই। উভয় উপন্যাসেরই নায়ক সচ্চরিত্র যুবক ; যখন তাহারা প্রেমে পড়িল তখন তাহাদের সেই প্রেম যেমনই গভীর তেমনই পবিত্র। রিচার্ড তাহার প্রণয়িনীকে স্বীয় পিতার ঘোর অসম্মতি সত্ত্বেও বিবাহ করিল ; অপর উপন্যাসের নায়ক তাহার প্রেয়সীকে আর একদিন পরেই গৃহলক্ষ্মী করিবে ; কিন্তু অভাবনীয় ঘটনাচক্রে পড়িয়া উভয়েই কুহকিনী নারীর প্রলোভনে একমুহূর্ত্তে প্রেম, ধর্ম্ম, সুখ সমস্ত বিসর্জ্জন দিল। বিভিন্ন সাহিত্যের দুইখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সর্ব্বপ্রধান ঘটনার এই মিল অনুধাবনযোগ্য নহে কি ?

কখনও কখনও এমনও দেখা যায় যে ঘটনার এরূপ সাদৃশ্য না থাকিলেও একটি উপন্যাসের কোন বিশেষ স্মরণীয় চরিত্র অন্য উপন্যাসে নিজের সমস্ত বিশেষত্ব লইয়া ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে। এইরূপ চারিত্রিক পুনর্জ্জন্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিনটী বিভিন্ন দেশের তিনখানি উপন্যাস হইতে দেওয়া যাইতে পারে। গেটের Wilhelm Meister নামক উপন্যাসের আনন্দোচ্ছ্বাসস্বরূপিনী লাস্যলীলাময়ী Mignon ভিক্টর হুগোর Notre Dameএ Ismerolda রূপে এবং স্কটের Peveril of the Peakএ ফেনেলা (Fenella) চরিত্রে নবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' এবং শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে'র মধ্যে ঘটনার পার্থক্যসত্ত্বেও একটী চরিত্রগত ঐক্যের ভাব চোখে পড়ে, অন্ততঃ এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে এইরূপ একটা তুলনামূলক সমালোচনার অবসর পাওয়া যায়। নিখিলেশের সহিত মহিমের এবং সন্দীপের সহিত সুরেশের তুলনা স্বতঃই মনে আসে। অচলা ঠিক বিমলা নয় বটে কিন্তু অবস্থার ক্রীড়নক এবং পরপুরুষে আসক্তারূপে এই দুই নায়িকা যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহাতেও একটী বেশ সাদৃশ্য আছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে বিমলাকে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত সন্দীপের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন ; কিন্তু এরূপ ভীষণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের লোলুপ গ্রাস হইতে দুর্ব্বলপ্রকৃতি নারী যে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না, বিশেষতঃ আদর্শচরিত্র স্বামী যদি তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, অচলার শোচনীয় পরিণামে শরৎচন্দ্র তাহাই দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে যাহা idealistic বা আদর্শসৃষ্টি, গৃহদাহে তাহাই realistic বা বাস্তবজগতের বিষয় হইয়াছে।

ঠিক এইরূপ একটা তুলনামূলক সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র মধ্যে চলিতে পারে। একদিকে গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণী ;

অপরদিকে মহেন্দ্রনাথ, আশা, বিনোদিনী। কিন্তু এখানেও একটা পার্থক্য আছে। বিনোদিনী মহেন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করিলেও রোহিণীর ন্যায় পাপিষ্ঠা নয়। ফলে, গোবিন্দলালের ভীষণ ট্রাজিডি মহেন্দ্রনাথের পক্ষে অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছে। 'বিষবৃক্ষে'র বিষও এই একই রূপজ মোহের প্রাবল্যের মধ্যে নিহিত। নগেন্দ্রনাথ মহেন্দ্রের ন্যায়ই দুর্ব্বলচিত্ত এবং ভাল-মন্দ বিচার ত্যাগ করিয়া রূপের আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিল। এইখানে একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা কথা বলিয়া রাখি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল উপন্যাসেই চরিত্রগুলিকে পাপের পঙ্কিলতা হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। 'নষ্টনীড়', 'ঘরে বাইরে', 'চোখের বালি' সর্ব্বত্রই এই একই চিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রে ও শরৎচন্দ্রে মানবচরিত্রের দুর্ব্বলতার দিকটা বেশী প্রকট হইয়াছে, ট্রাজিডিও গভীরতর হইয়াছে। গোবিন্দলাল ও রোহিণী, সুরেশ ও অচলা এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মহেন্দ্রনাথ ও বিনোদিনী বা সন্দীপ ও বিমলা হইতে স্বতন্ত্র।

উপরে যে কয়খানি উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রগত সাদৃশ্যের কথা বলা হইল, সেগুলির মধ্যে কোনটিরই যে মৌলিকতা অপর কোনটির সঙ্গে তুলনায় হীন তাহা মনে করিবার কারণ নাই। পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের পার্শ্বে উন্মত্ত লালসার বিষময়ফল প্রদর্শন যে অনেক উপন্যাসের আখ্যানভাগের বিষয়ীভূত হইয়াছে, তাহার কারণ ইহা নয় যে, একজন অপরের নিকট হইতে ইহার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার কারণ ইহাই যে, এরূপ ব্যাপার জগতে সর্ব্বত্র অত্যন্ত সাধারণ। তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেমন Ordeal of Richard Feveril বা Torrents of Spring (থ্যাকারের Vanity Fair জর্জ্জ ইলিয়টের Mill on the Flossএর স্থানবিশেষেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে), আমাদের সাহিত্যেও তেমনই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বা 'চোখের বালি'র মত উপন্যাস ঐ একই চিত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। আর যদিও বা কোন কোন ক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভাব বা প্রেরণার জন্য অপরের নিকট ঋণীই হন তাহা হইলেও সেই প্রতিভাবান লেখক পরস্বকে এমনইভাবে নিজস্ব করিয়া লইতে জানেন যে, পাঠক বা সমালোচক কাহারও নিকট সেই ঋণগ্রহণটী অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। শুধু কাব্যে ও নাটকেই নয়, মৌলিকতার দাবী যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সেই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম খাটে।

এপর্য্যন্ত আমরা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কথাই আলোচনা করিয়াছি। নিকৃষ্ট লেখকের হাতে মৌলিকতার অভাব যে অক্ষম অনুকরণের পরিচায়ক তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। সে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ হইতে আজ বিরত হইলাম।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

ধোঁয়া

হাঁক-ডাক বৃথা।

রাত্রে কে-ই বা শোনে, আর কে-ই বা আসে!

শুনিল হয়ত সকলেই, কিন্তু আসিতে কাহাকেও দেখা গেল না।

চৈত্রমাসের রাত্রি।

দিনের বেলা রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে,—চালের খড় শুকাইয়া ঝুনোট্ হইয়া থাকে।

তাহার উপর আগুন।

কিন্তু কেমন করিয়া লাগিল, এত রাত্রে কেই বা লাগাইয়া দিল—কেহ কিছুই ঠিক ঠাহর করিতে পারিল না।

প্যারী ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল। আগুনের আঁচে ঘরের ভিতর দাঁড়ায় কার সাধ্যি। ধোঁয়ায় চারিদিক গর্দ্দগোল।

ছেলে উঠিল, মেয়ে উঠিল, বৌ উঠিয়া চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিল। পাশের গোয়ালে তখন গরু-বাছুরগুলা ঝট্‌পট্ করিতেছে। ধলা বাছুরটা দড়ি ছিঁড়িয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঘরে গরু মরিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্যারী ছুটিয়া গিয়া গোয়ালের ভিতর ঢুকিল।

সর্ব্বনাশ!

পোড়া চামড়ার দুর্গন্ধে সেখানে টেঁকা ভার! গোয়ালের মাচানের উপর কাঠ তোলা ছিল, মাচানের দড়ি পুড়িয়া জ্বলন্ত কাঠগুলা নীচে নামিয়া আসিয়াছে।

বুড়ী গাইটা ছট্‌ফট্ করিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, কালো বাছুরটা যে কোথায় চাপা পড়িয়াছে—দেখাই যায় না।

প্যারী কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু কাঁদিলে আর উপায় নাই। চোখের জলে আগুন নিভে না।

চারিদিকে আগুন আর চীৎকার! আগুনের ক্ষুধিত জিহ্বা যেন লক্ লক্ করিয়া সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

উঠানেও আর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না। কিছু বাঁচাইবারও আর উপায় নাই, তাই সেই সর্ব্বনাশা আগুনের হাতেই সমস্ত সমর্পণ করিয়া দিয়া মেয়েছেলে লইয়া প্যারী ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল।

আগুন যেন লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। পাশাপাশি পাঁচখানা বড়-বড় মাটির কোঠাঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। গোবিন্দ চক্কোত্তির ধানের গোলায় তখন আগুন ধরিয়াছে,—দেখিতে দেখিতে বসন্ত মুখুজ্যের বড় বড় তিনটা খড়ের গাদা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

লোকজনের ছুটাছুটি হাঁকডাক কান্নাকাটিতে কিছুই কাজ হইল না। যাহা পুড়িবার তাহা পুড়িল। বাতাস বহিতেছিল উত্তর হইতে দক্ষিণে,—কাজেই পল্লীগ্রামের সঙ্কীর্ণ একটি রাস্তার পাশে উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি পঁচিশখানি ঘরের আর দুরবস্থার কিছু বাকি রহিল না।

পরদিন সকালে দেখা গেল, কালোরঙের চার পাট করিয়া পোড়া দেওয়াল খাড়া দাঁড়াইয়া আছে ; চারিদিকে পোড়া কাঠ-খড়ের জঞ্জাল।—আগুন তখনও ধোঁয়াইতেছিল।

ইহাদের মাঝখানে শিবের একটি মন্দির মাত্র অক্ষত রহিয়া গেছে,—বহুকালের পুরাতন ইট-পাথরের মন্দির। এবং এই মন্দিরটির প্রাঙ্গণে সকাল হইতে লোকজন আসিয়া জড় হইতেছিল।

শ্যামাদাস গাঙ্গুলি আসিয়াছিলেন অতি প্রত্যূষে। নেত্য বোরেগী তাঁহাকে তাহার দুরবস্থার কাহিনী শুনাইতেছিল।

যে-সব ঘর পুড়িয়াছে নেত্যর ঘর সেখান হইতে বেশি দূরে নয়। তবে তাহার ঘরখানি যে বাঁচিয়াছে, সে শুধু ওই বাবার কৃপায়।

মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ প্রস্তরমূর্ত্তি বাবার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নেত্য বলিল, "বাবার মাহাত্যি আছে গাঙ্গুলি, তবে যাবার মধ্যে গেল শুধু আমার একটি ছাগল। ও-বছর একটি, আর এ-বছর একটি।"

"হুঁ" বলিয়া শ্যামাদাস গাঙ্গুলি একবার মাথা নাড়িল।

নেত্য আবার বলিতে লাগিল, "আগুন আগুন রব উঠলো আর ছাগলটা গেল ঘর থেকে ছুটে' বেরিয়ে। ভাবলাম, যাক্, আবার আসবে। ওমা! সকালে শুনি—বসন্ত মুখুজ্যের খড়ের গাদায় পুড়ে' মরেছে। দুষ্টু লোকে দিয়েছে হয়ত 'ছুঁড়ে'—কিন্তু জান্‌তে কি আর বাকি রইলো গাঙ্গুলি, নেত্যর পেছনে চারটে চোখ—নেত্য সব দেখতে পায়।......আর বছর অমনি—ছাগলটার ঘাড় দুম্‌ড়ে, মট্‌কিয়ে দিলে ঘাড়টাকে ভেঙে, আর মুখে দিলে কুলের কাঁটা গুঁজে'। কেন? বলি, এত শত্তুতা কিসের?"

একটুখানি থামিয়া নেত্য একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিল। বলিল, "দিনে-দিনে করে পাপ সময় হলে ফলে। কেমন? হাড়ির দুগ্‌গতি হলো ত? বেহ্মাম্নিদের কি আর অম্‌নি-অম্‌নি সব ছারখার করে' দিলে?......ঘর বাড়ী কি আর অম্‌নি অম্‌নি পুড়ে কখনও; বহুৎ পাপ—"

"বলি ও নেত্যকালী, আবার কি পাপ করলি তুই?"

অম্বিকা অধিকারী চোখ টিপিয়া একবার হাসিয়াই খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গলায় তুলসীর মালা, হাতে হুঁকা। বহুদিন হইতে কাঁটা

ফুটিয়া অধিকারীর পায়ের তলায় 'কুল-আঁটি' হইয়াছিল,—মাটিতে ভাল করিয়া পা পড়ে না—খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলে।

নেত্যকালী আড়চোখে একবার তাহার দিকে তাকাইয়াই ফিক্ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আ-মর্! বুড়ো মিন্সের কথা শোনো!"

বলিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

লোকজন দেখিতে দেখিতে অনেকেই আসিয়া জুটিল।

ধ্বজু তিলি মন্দিরের ছায়ায় উবু হইয়া বসিয়া বসিয়া হেঁট্মুখে একটা কাঠি দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতেছিল। বলিল, "চোরে চুরি করা আজ্ঞে বহুত ভালো—আগুনে পুড়লে আর বাকি কিছুই থাকে না।"

অম্বিকা অধিকারী তখন প্যারীর পোড়া ঘরের পাশে বসিয়া জঞ্জাল সরাইয়া বাছিয়া বাছিয়া গস্গসে' আগুনের টুক্রো কলিকায় চড়াইতেছিল। হুঁকায় বার-কতক টান দিয়া ধোঁয়া বাহির করিয়া অধিকারী একবার প্যারীর ঘরের দিকে তাকাইয়া বলিল, "প্যারীর ঘরের মুড়নি-চাল্শাঙা কি শাল্কাঠের ছিল নাকি হে? চমৎকার আগুন ত'!"

দয়ারাম তখন সবেমাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বলিল, "বা বা বা বা, বুড়িয়ে ত' ঝানু হয়ে গেলে বাবা—এখনও আগুন চেনো না? শালকাঠের আগুন বুঝি ভালো হলো তোমার কাছে?……আগুন—কুলকাঠের। আর আগুন হচ্ছে—তেঁতুলের।"

ঘাড় নাড়িয়া ধ্বজু বলিল, "ঠিক বলেছ ঠাকুর! বলে কথায় আছে,—ধিকি-ধিকি জ্বল্ছে আমার কুলকাঠের আংরা। আমাদের সেই বুড়ো কুলগাছটা যখন——"

কিন্তু ওই বুড়া কুলগাছ পর্য্যন্তই হইয়া রহিল।

কেশব আড্ডিকে সকলেই একটুখানি সমীহ করিয়া চলে। আজ এই বিপদের দিনে গাড়ু ও গামছা হাতে লইয়াই ওপাড়া হইতে তিনি এ-পাড়ায় আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন।

"এই যে! সবাই এসেছ দেখছি! আহা, আমাদের ভজহরির ঘরটিও পুড়ে' গেছে দেখছি! আচ্ছা, কারণটা কেউ কিছু টের পেলে হে?—এই ঘর-পোড়ার?"

প্যারী তাহার ছোট ছেলেটাকে কোলে লইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উহুক্! বুঝতে ত' কিছুই পারা গেল না। ঘুম থেকে উঠেই হঠাৎ দেখি আগুন।"

কেশব আড্ডি বসিলেন না, গামছাটা বাঁ-কাঁধ হইতে ডান-কাঁধে ফেলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ। এ ঠিক কারও লাগিয়ে দেওয়া।"

অম্বিকা অধিকারী তামাক টানিতে টানিতে মন্দিরের পাশে একটা পাথরের উপর তখন বসিয়া পড়িয়াছিল, বলিল, "আমারও তাই মনে হয়। বুঝলে আড্ডি! ও ঠিক—"

বলিয়াই হুঁকায় টান।

"দাও একবার—।" বলিয়া হুঁকার জন্য হাত বাড়াইয়া দয়ারাম বলিল, "আমাদের পাড়ার দিকে বাতাস বইলেই হয়েছিল আর কি।"

শ্যামাদাস গাঙ্গুলির আফিং-খাওয়া ধাত, এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া তিনি ঝিমাইতে ছিলেন, এইবার মুখ তুলিয়া কহিলেন, "সব্বনাশ।—কই হে হুঁকোটা…"

বলিয়া আন্দাজি ডানদিকে একবার হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "আমার ওই এক বড়-ঘরেই খড় লাগে পাঁচ কাহন,—তার উপর আজকাল খড়ের যা দর। আঠাস্ টাকা—মেরেকেটে' না হয় ছাব্বিশ,—না, না, টিন লাগাও, টিন লাগাও, 'কুরুখুটে'র টিন—আচ্ছা করে' চারিদিক বেশ শক্ত করে' বেঁধে' দাও টিন পিটিয়ে। বাস্! জন্মের মতন খালাস্। আগুন-পানি ঝড়-বাদল…বাস্। নাক ডাকিয়ে লাগাও ঘুম।"

যাহাদের ঘর পুড়িয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্যারীই ছিল সেখানে উপস্থিত। গাঙ্গুলি মিট্ মিট্ করিয়া একবার তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "তাই কর, বুঝ্‌লে প্যারী, দাও টিনই পিটিয়ে দাও—সেই ভালো।"

অত্যন্ত দুঃখে মানুষের হাসি পায়। প্যারী তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কথা ত' ঠিক্—কিন্তু সব্বসান্ত হয়ে গেলাম যে।"

হুঁকাটা গাঙ্গুলির হাতে তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই, হাত বাড়াইয়া বলিল, "কে টান্‌ছিস্ কে—হুঁকো? হাতে পেলে যে আর…আচ্ছা-গুলিখোরের পাল্লায় পড়া গেছে দেখ্‌ছি…"

ছ্যাক্ করিয়া কলিকাটা কোন্ ফাঁকে তুলিয়া লইয়া ধ্বজু তিলি তাহার হাত দুইটি একত্রিত করিয়া তাহাই সে প্রাণপণে টানিয়া লইতেছিল, কলিকাটা সে ধীরে-ধীরে নামাইয়া দিয়া বলিল, "নাঃ, নেই আর কিছু এতে,—পুড়ে' গন্ধ উঠে গেছে।"

"গন্ধ উঠে গেছে ত' আন্ না রে বাপু, ঘর থেকে এককল্‌কে সেজেই নাহয়- আন্। আড্ডি-মশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, দে না খাইয়ে।"

আড্ডি-মশাই তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া বলিলেন, "না না আমার আর অবসর নেই,—চলি। এলাম—বলি একবার দেখেই যাই এই পথে…।"

বলিয়াই গামছায় গা মুছিতে মুছিতে একহাতে গাড়ুটা তুলিয়া লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সকলেই চুপচাপ্। কথা আর এগোয় না। কে যে কি বলিবে—কিছুই আর করিতে পারিতেছিল না।

যাহার জন্য তামাক সাজিতে যাওয়া—তিনি নিজেই চলিয়া গেলেন দেখিয়া ধ্বজু চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

শ্যামাদাস পোড়া কলিকাটা বার-কতক্ টানিয়া হুঁকা হইতে সেটা নামাইয়া দিয়া বলিলেন, "গেলিনে ধ্বজু? যা বাবা, যা—নিয়ে আয় এক-কল্‌কে' সেজে'···"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কলিকাটি হাতে লইয়া ধ্বজুকে উঠিতে হইল।

অম্বিকা অধিকারী বলিল, "ওপাড়ায় আগুনের কথা বলছিলি দয়া,—কিন্তু এ-পাড়ার আগুন ও-পাড়ায় যায় ত' আমি কান কেটে দিই।"

"কি রকম?"

অধিকারী বলিল, "চণ্ডীতলা পেরিয়ে আগুন যাবে? আগুনের বাপ্ লাগি!"

দয়ারাম বলিল, "তা বটে—।"

অবিনাশ মুখুজ্যে অশ্বত্থগাছের তলায় বসিয়াছিল। বলিল, "ও-বেটীর ঘর আর পুড়তে হয় না! সেবছর বাগাল মোড়লের খামারে লাগল আগুন—যতি স্যাক্‌রার ঘর পুড়লো; কই, পুড়েছিল চণ্ডীর ঘর? জাগ্‌গতো দ্যাব্‌তা বাবা!"

দয়ারাম বলিল, "আর একটি ঠাকুর ছিল এই গাঁয়ে—আমরা ছোটবেলায় দেখেছি। মাঝ-পাড়ার ওই পেসন্নর ঘরের পাশে ভিটেটা দেখছিস ত'—কুলগাছ ওয়ালা?"

অবিনাশ তাহাদের সকলের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হইলেও বলিল, "হুঁ, হুঁ, সেই নিকুঞ্জ ভট্‌চাজ, মাণিক ভট্‌চাজ্—একটু একটু মনে পড়ে, আমরা তখন ছেলেমানুষ।"

শ্যামাদাস গাঙ্গুলি ঝিমাইতে ঝিমাইতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ছেলেমানুষ বই-কি! তোদের আর বয়েস কত?"

দয়ারাম আবার বলিল, "হ্যাঁ, ওই ভট্‌চাজ্‌দের ঘরে,—ওদের তখন খুব জম্‌জমাট। রসিক ভট্‌চাজের ঘরে তখন মদনমোহন বিগ্রহ মূর্ত্তির সেবা চলতো। আহা মরি মরি, সে কি ঠাকুর রে! তেমন ঠাকুর তোরা চোখেও দেখিস্‌নিকো কোনোদিন। কালো 'শ্বেত-পাথরে'র তৈরী—এই এতবড়টি।"

হাত দুইটি উপর-নীচু করিয়া ঠাকুরের মূর্ত্তিটি যে কত বড় ছিল তাহাই তাহাকে একবার দেখাইয়া দিল।

বলিল, "ওই রসিকের ঘরে একবার আগুন লাগে। জিনিসপত্তর সামলাতে গিয়ে দেখে, মদনমোহনের সারা অঙ্গ বেয়ে তখন কল্-কল্ কল্-কল্ করে' ঘাম বেরোচ্ছে। সে কী ঘাম! মুছে' দেয়—আবার ঘামে! যতক্ষণ আগুন ছিল···কে বলে যে কলিকালে ঠাকুর-দেবতা মিছে! আছে—আছে—আছে বই-কি বাবা, তা নইলে আজ ওই ভট্‌চাজদের নাগাল পায় কে! কিন্তু যেমনি সব জমিজমা বিক্রি করে দিয়ে মদনমোহকে গাঁ-ছাড়া করেছে,—বাস্! সব ঢিপে-ঢাঁই! ঝাড়ে-বংশে কেউ রইলো না—ভিটেয় ঘুঘু চরছে আজকাল!"

মোটা-সোটা একটি লোক অনেকক্ষণ হইতেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বছর-চার

আগে সে নাকি সহরের একটা হোটেলে ভাত রাঁধিত, এখন আর ভাত তাহাকে রাঁধিতে হয় না, গলার আওয়াজ ভালো, গানও একটু-আধটু করিতে পারে,—ভাগবত পাঠ করিয়া গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়; গাঁয়ের লোক তাহাকে ভাগবৎ বলিয়া ডাকে।

দয়ারামের কথাটা শেষ হইবামাত্র সে তাহার বাজ্‌খাঁই গলায় বলিয়া উঠিল, "ভক্তের ভগমান। ভক্তি করে 'ডেকে' পেল্লাদ্ পেয়েছিল। আগুন যখন কাল আমার রান্নাঘরে লাগ্‌লো বুজেছ গাঙ্গুলি—"

শ্যামদাস মুখ তুলিয়া বলিল, "কে, ভাগবৎ?"

"হ্যাঁ, বুজেছ,—কাল তখন আমার রান্নাঘরটা ধূ ধূ করে' জ্বলছে, বল্লাম, থাক্, কান্নাকাটি করিস্ নে,—কিচ্ছু সরিয়ে কাজ নেই,—বলেই একেবারে ছুট্টে বেরিয়ে এলাম—রাস্তায়। দেখি, না তখন কালীঘর জ্বলছে। ডাকলাম—বেটিকে! বলি—মা! মা! মরেছিস্ নাকি?······ আগুন আর নেবে না! রাগ হলো। গলার পৈতেগাছটা দুহাত দিয়ে পট্ করে' ছিঁড়ে ফেলে' বল্লাম—নে তবে বেটি, নে আমার ব্রাহ্মণত্ব নে। আর জ্বালাবি ত জ্বালা,—এমুড়ো থেকে' গাঁয়ের ও-মুড়ো পর্য্যন্ত—সব ঘর জ্বালিয়ে ফেল্—নইলে এই দিলাম দিলাম—হত্যে দিলাম বেটির পায়ের তলায়।······শুন্‌লে আশ্চয্যি হবে,—গা আমার এখনও কাঁটা দিয়ে উঠছে।—দেখতে-না-দেখতে সব নিবে' গেল।···আবার আর একটি ভারি মজার ব্যাপার দেখে' এলাম আজ সকালে শোনো! কালীঘর পুড়েছে, কিন্তু মায়ের পাঁঠা-কাটা খুঁটোটা পুড়েনি। কাঠের হাড়িকাঠ ঘরের একটি কোণে নামানো ছিল ঠিক্ যেমনকার তেমনিটি রয়েছে এখনও।"

ধ্বজু কলিকা সাজিয়া আনিয়াছিল, বলিল, "মা ওইটি আশ্চয় করে' ছিলেন হয়ত'—তাতেই পুড়লো না। তা সে যে যা-ই বলুক্, আমাদের মা খুব জাগ্‌গতো মা!"

অবিনাশ বলিল, "আর একটি ব্যাপার এখনও কারও নজরে পড়েনি।—এই দেখ—দেখ—চেয়ে দেখ।"

সবিস্ময়ে সকলেই তাকাইয়া দেখিল, মন্দিরের সুমুখে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটি আগুনের আঁচ লাগিয়া একেবারে ঝলসিয়া গেছে—অথচ মন্দিরের মাথায় —মস্ত একটা ফাটলের ভিতর হইতে ছোট যে অশ্বত্থের চারাটি দিনে-দিনে বড় হইয়া উঠিতেছিল, তাহার গায়ে আগুনের এতটুকু আঁচ পর্য্যন্ত লাগে নাই।

শ্যামাদাস গাঙ্গুলি তখন তামাক টানিতেছিলেন। গম্ভীরভাবে বলিলেন, "অগ্নিদেব কখনও শিবালয় পর্শ করে না।—ওরে ও ধ্বজু, এ কী আগুন হলো বাবা? এত' বেশ জুৎসই হলো না দেখছি।"

হুঁকা হইতে ধীরে-ধীরে তিনি কলিকাটি নামাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ ত' অধিকারী-ভায়া, তোমার সেই শালকাঠের না কি-কাঠের আগুন বল্‌ছিলে,—চড়াও দেখিনি একবার।"

আগুন চড়াইতে গিয়া অধিকারী বলিল, "কিন্তু এ আগুন ত' এবার নিবোতে হয়েছে প্যারী, ঝড়-বাতাসে যদি ওড়ে একবার, তাহ'লে ত' দেবে সব ছারখার ক'রে।"

দয়ারামের পাশে বসিয়া প্যারী তখন হেঁটমুখে কি যেন চিন্তা করিতেছিল। কথাটা শুনিবামাত্র দয়ারাম তাহাকে এক ঠেলা দিয়া বলিয়া উঠিল, "বা হে! তুমি ত' দেখছি বেশ মানুষ! নিজের গেছে বলে' ভাবছ বুঝি সবারই যাক্!..."

গাঙ্গুলি বলিল, "ঠিক্ কথাই ত! ওঠো ওঠো—প্যারী তুমি ওঠো এখান থেকে—নিশ্চিন্ত বসে থেকো না। হাঁড়ি কলসি যা-হোক্ একটা কিছু এনে'......দাও দাও আগুন নিবিয়ে দাও আগে,—তারপর অন্য কাজ। ওঠো ওঠো।"

ভজহরি ভট্‌চাজের কষ্ট হইল সবার চেয়ে বেশি।

বেচারী একে মাগিয়া-যাচিয়া খায়, তাহার উপর আগুনে তাহার সর্ব্বস্ব গেল। ছেলেমানুষ বৌ তখনও আঁতুড়ে,—সাতদিনের একটি কচি ছেলে।

বলে, "মানুষ ত' বাঁচলো, কিন্তু ঘর-বার এক হয়ে গেল।"

পনরটি টাকা ছিল কাঁশার একটি ঘটির ভিতর—পুড়িয়া ঠিক ঢেলার মত ডাব বাঁধিয়া গেছে।

ভজহরি বলে, "এসো নাহয় দেখেই যাও।"

কিন্তু কে-ই বা দেখে!

"কি হলো ভট্‌চাজ?"

জিজ্ঞাসা করিলে ভজহরি কথা বলে না,—উর্দ্ধে আকাশের দিকে হাত তুলিয়া সে এক অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া হাসে।

সারা অঙ্গ তাহার আগুনে ঝল্‌সিয়া গেছে। রং ছিল ফর্সা, এখন হইয়াছে কালো। গায়ে এক-গা 'রোঁয়া' ছিল, এখন আর একটিও নাই। গোঁফ-দাড়ির খানিক্-খানিক্ পুড়িয়াছে।

কেউ কেউ বলে, "ভারি বিশ্রী দেখাচ্ছে ভট্‌চাজ, কামিয়ে ফেল।"

ভট্‌চাজ তাহার দুই হাতের বুড়া আঙুল দুইটা নাড়িয়া বলে, "লবোডঙ্গা! ভিক্ষেয় বেরিয়েছিলাম সকাল থেকে—মাগোনে। বলে, কোথাও কিচ্ছু নেই, গোঁসাই দেখসে! কোথা পাবে? তিনখানা গাঁ ঘুরে' এলাম,—এক পয়সা না। এক মুঠো মুষ্টি-ভিক্ষে দিলে না কেউ।"

কানে সে ভাল শুনিতেও পায় না।

গায়ে একটা গরম জামা। দুপুরের রোদ তখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। জামাটা খুলিয়া দেখায়। আঠার টাকার কোট্।

ভজহরি বলে, "এইটিকে বাঁচাতে গিয়েই ত'—এঁ, এয়্ দ্যাখ—".

বাঁপায়ের হাঁটুর উপর হইতে পরণের কাপড়টা তুলিতেই দেখা গেল,—রগ্‌রগে' একটা কাঁচা ঘা জাং হইতে বরাবর হাঁটু পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে।

বলে, "জামাটা তুমি রাখো শ্যামল, এসব তোমাদের মতন ছোকরার গায়েই সাজে ভালো। আমায় বরং একটা সরুমত পাৎলা জামাটামা দাও তোমার গায়ের—পুরনো-ঝুরনো ছেঁড়া-খোঁড়া যা থাকে।……এটা আর পরা চলে না। দেখ না,—খুব জোর নাহয় ছ'কোশ পথ চলেছি আজ সকালে ; এরই মধ্যে দেখ না—শালা কলদ্‌-ঘাম্‌ ছুটিয়ে দিলে সারা অঙ্গে।"

হাতের ইসারা করিয়া শ্যামল বলে, "দেখি যদি কিছু থাকে— ।"

ভট্‌চাজ বলে, "চাইতাম না। দেখেছ ত' তুমি—উদোম্‌-গায়েই মুলুক মারি,—জামা-টামার দরকার হয় না আমার। তবে এই আজকাল এ-গাঁ ও-গা বেড়াতে হচ্ছে কিনা, শালার ছেলেগুলো ভারি বজ্জাৎ হে! দেখে আর হাসে। পোড়া-ভট্‌চাজ ত' আমার ডাক-নাম হয়েছে আজকাল।"

বলিয়াই সে আবার হো হো করিয়া হাসে।

লোকে বলে, "শালা চোয়াড়্‌। মাগ্‌-ছেলে ঘরে হয়ত উপোস্‌—আর হাসছে দেখ ফ্যা ফ্যা করে'।"

ভজহরি বলে, "সব শুনেছি,—আজকাল সবই শুনতে পাই।…তা তোমরা যা-ই বল আর তা-ই বল—গোঁফ-দাড়ি কামাচ্ছি না বাবা!"

জবাব শুনিয়া সকলেই হাসে।

ভট্‌চাজ বলে, "ছেলেমানুষ তাই হাস্‌ছ। কেউ বিশ্বেস করে না—বলে, বেটার ঘর পুড়েছে না আরও-কিছু। তবু এইগুলো দেখেও যদি—"

আধ-পোড়া দাড়ির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে ভট্‌চাজ বলে, "নাঃ। নেহাৎ খারাপ দেখায়নি—কি বল?"

সকলেই একসঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া বলে, "না—"

ভট্‌চাজ আশ্বস্ত হইয়া বলে, "চলি আবার চান্‌ করতে হবে। চান্‌ করেই গোপালপুর।"

"গোপালপুর? সে যে দুকোশ পথ। এই রোদে?"

ভট্‌চাজ বলে, "খাই যে সেইখানে। হাজরাদের ঠাকুরবাড়ীতে।"

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ধর্ম্মে গোঁড়ামি ও ঋষি টলষ্টয়

ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় মানবজীবনের সত্যদ্রষ্টা, ধর্ম্ম ও সমাজের নিগূঢ়-তত্ত্ববেত্তা রাশিয়ার ঋষি টলষ্টয় ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির শত্রু ছিলেন। তিনি শেষ পর্য্যন্ত এই দুইটির বিরুদ্ধে ঘোর যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রাশিয়ার আভিজাত্য-গর্ব্বী "ডুমা" এবং স্বৈরবৃত্ত জারের কঠোর স্বেচ্ছাশাসন, অথবা স্বর্গ-নরকের কুঞ্চিকাধিকারী ধর্ম্মসম্রাট ও তাঁহার সমগ্র যাজক সমাজ সত্ত্বেও ঋষি স্বীয় জীবন ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির আবরণ-মুক্ত সত্যকেই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহই তাঁহার লেখনি বা মুখ বন্ধ করিতে পারেন নাই। রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্মজগতের ধুরন্ধরগণ যখন একদিকে চোখা-চোখা আয়ুধের রাশি, বৈদ্যুতিক তার, বারুদের স্তূপ আর বিশাল তোপখানা, এবং অন্যদিকে ক্রুশদণ্ড, বহিষ্কার মন্ত্র অথবা অগ্নিকুণ্ড, ফাঁসিকাষ্ঠ আর নির্ব্বাসনদণ্ড প্রভৃতি বহুবিধ সরঞ্জাম লইয়া বিরাটকায় রাশিয়ার বাহিরের আটঘাট আগলাইতে ছিলেন, তখন কুসুমকোমল বজ্রকঠোর ঋষি টলষ্টয় সমগ্র দেশের অন্তর-রাজ্যটি অগ্নিমন্ত্র এবং অলোহাস্ত্র প্রয়োগে জয় করিতেছিলেন। সেই মন্ত্রাগ্নির জ্বালা রাশিয়ায় প্রাচীন সংস্কার ইতিমধ্যেই কিভাবে কতটা ভস্মীভূত করিয়াছে এবং তাহার স্ফুলিঙ্গ য়ুরোপের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের মনোজগতে সংস্কারের মূলে পতিত হইয়া কিরূপ বিপ্লবাগ্নির সূচনা করিতেছে, তাহা চিন্তাশীল চক্ষুষ্মান নরনারীর অবিদিত নাই।

এই ঋষি ধর্ম্মগোঁড়াদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন ;—

"Orthodox religion brings to my mind only a lot of long-haired men, who are very arrogant, without instruction, clothed in silk and velvet decorated with ornaments and jewels, whom one calls archbishops, and metropolitans, and thousands of other men, with hair uncombed, who find themselves under the most servile domination of a few individuals who, under color of dispensing the sacraments, cheat and rob the people. How can I have faith in this church and believe, if to a man who ask from the bottom of his soul, it replies only by the most miserable deceptions, by inanities and affirms that no one has the right to make any other reply to these questions ? * * * I may choose the color of my trousers, I may take a wife according to my taste, but in other respects, in those in which I feel myself a man,

I must ask these imbecile people, these fools and deceivers. As a guide of my life in the innermost corner of my soul. I am to have the pastor, the priest of my parish, who has just come from the seminary, a shallow boy almost illiterate, or an aged drunkard whose only care is to acquire as many fowls and pigs as he can. If during prayer the deacon asks long life for the adulteress Catherine the second, or for Peter, that robber and assasin who blasphemed the Gospel. I must pray for that. Often these miserable wretches have asked that my brothers be burned or hanged, and I must cry 'Anathema !' These men declare that my brethren shall be cursed, and I must cry 'Anathema !' They insist tnat I shall drink wine in a little spoon, and assert that it is not wine, but the blood of the body of God, and I must do it. Oh but it is terrible !" *

অর্থাৎ "গোঁড়ামির ধর্ম্ম বলিলেই জনকয়েক দীর্ঘকেশ, রেশমী ও মখমল বস্ত্রাবৃত রত্নালঙ্কার-ভূষিত অতি দাম্ভিক অশিক্ষিত লোক—যাহাদের আর্চবিশপ বা মেট্রোপলিটান বলে,—আর যাহারা দীক্ষার নামে লোক ঠকাইয়া লুঠ করিয়া খায়, এমন মুষ্টিমেয় কতকগুলা লোকের ক্রীতদাসের ন্যায় আজ্ঞাধীন উস্কোখুস্কো-চুলে-মাথার আরও হাজার হাজার লোকের মূর্ত্তি আমার মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমি কেমন করিয়া এমন ধর্ম্মমতে আস্থা রাখি, আর অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে কেহ প্রশ্ন করিলে যাহারা তাহার অতি হীন ছলনাপূর্ণ অসার উত্তর দিয়া জোর করিয়া বলে যে সে সব প্রশ্নের অন্যরকম উত্তর দিবার অধিকার কাহারই নাই, তাহাদের কেমন করিয়াই বা বিশ্বাস করি। * * * আমি আমার পা-জামার রং পসন্দ করিয়া লইতে পারিব, আমি আমার পসন্দমত পত্নীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিব, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে,—যে সকলে আমি নিজেকে মানুষ বলিয়া বোধ করি, সেই সব বিষয়েই আমাকে এই সব আহাম্মুখ মূর্খ প্রবঞ্চকদের মত লইতে হইবে। আমার আধ্যাত্মিক জীবনের পথ দেখাইবেন কে? না আমার পাড়ার ধর্ম্মযাজক—আমার কুলপুরোহিত, যে হয় একজন সদ্য স্কুলছাড়া প্রায় বর্ণ-জ্ঞান-হীন অল্পমতি বালক মাত্র, অথবা কোন বৃদ্ধ সুরাপায়ী, খালি যতগুলি পারে শূকরমুর্গী আদায় করাই যাহার লক্ষ্য। উপাসনার সময় যাজক যদি স্বৈরিণী দ্বিতীয়া ক্যাথরীণ কিংবা ধর্ম্মদ্বেষী দস্যু ও খুনী পিটরের দীর্ঘজীবন কামনা করে, আমায় অমনি সে প্রার্থনায় যোগ দিতেই হইবে। অনেক সময় এই সব নীচ নরাধম বলিয়াছে যে আমার ভায়েদের পুড়াইয়া মারা হউক, বা ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হউক, আর আমি অভিসম্পাতের

* "What the Orthodox Religion Really Is"—*Revue de Paris.*

মন্ত্র পড়িতে থাকি। ইহারা স্পষ্টই বলে যে আমার ভায়েরা সব অভিশপ্ত হউক, আর আমি অভিশাপ মন্ত্র পড়ি। তাহারা আমায় একখানি ছোট চামচে করিয়া মদ খাইতে দিবে, আর নিশ্চয়বাক্যে বলিবে যে উহা মদ নহে, ঈশ্বরের গায়ের রক্ত আর তাহাই আমায় মানিতে হইবে—ওঃ কি ভয়ানক!”

এই মদটা যে রক্ত নয়, একথা পশ্চিমের অধিকাংশ লোক উভয় বস্তুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়া জানিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। যে কয়জন গোঁড়া, ধর্ম্ম যাইবার ভয়ে মানেন নাই, তাঁহারা এই খাঁটি সত্যটা জীবনে আর মানিতেই পারেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেষ্টাদের অতি গুহ্য বা আধ্যাত্মিক নামে প্রচলিত বা স্বীকৃত অবৈজ্ঞানিক মন-গড়া, রূপক-ভাঙ্গা ব্যাখ্যা তাঁহাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করিয়া দিয়াছে। প্রাচ্যে তান্ত্রিক সাধকদের মদ যে দুধ হইয়া যায় একথা, যাঁহারা তন্ত্রসাধক নহেন এমন অনেক গোঁড়াই বিশ্বাস করেন। যাঁহাদের সে বিশ্বাস নাই, তাঁহাদের বিশ্বাস করানও কঠিন; বিশেষ করিয়া যদি তাঁহারা ভিন্নতন্ত্রের গোঁড়া হন। ধর্ম্মান্ধেরা মদকে রক্ত কিংবা দুধ অপ্রতিপন্ন করাইবার বা না মানাইবার জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখাইয়া দিলেও তাহা মানিবে। বরং পাছে ভুল ভাঙ্গে, পাছে বিশ্বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তাহা পরীক্ষাতেই আনিবে না। কারণ বিশেষ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার জন্য শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানিয়া মদকে রক্ত কিংবা দুধ বলিতেই হইবে। শাস্ত্র-প্রমাণ ছাড়া এবং অনুশাসনের অননুকূল যে কোন যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন তাঁহাদের নিকট অরণ্যে রোদন। তাঁহাদের মানসিক এই অবস্থার নাম গোঁড়ামি। একতন্ত্রের গোঁড়া অন্যতন্ত্রের গোঁড়াকে অন্ধ বলেন, কখন কখন পাষণ্ডও বলেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ তাঁহাকে তাঁহার গোঁড়ামির জন্যই শ্রদ্ধা করেন। কারণ সেই গোঁড়ামিকেই তাঁহারা নিষ্ঠা বুঝেন।

যতই দিন যাইতেছে, এইসব বাহ্য অনুষ্ঠানের উপকরণ ও আড়ম্বরগুলা তর্ক-বিতর্কের হাঙ্গামায় ও স্বাধীন চিন্তার ফলে বিকল্প বিধান প্রণালীর ভিতর দিয়া ক্রমেই সংক্ষেপ করিয়া অচল হইতেছে। “মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ” ব্যবস্থা ক্রমে একান্তভাবে “দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতি—”নীতিতে পরিণত হইয়াছে। ক্রমে সুবিধা সুযোগের অভাবে এবং অপ্রয়োজন বোধে এ নীতিও বর্জ্জিত হইবে। ফুলটি মাথার উপর রাখিবার কথা। কিন্তু গোল মাথায় ফুল প্রায়ই থাকে না বলিয়া টিকিতে বাঁধা যাইতে পারে। এখন কিন্তু টিকি এমন ছোট হইয়া আসিতেছে, এমনকি উহা না-রাখার ঝোঁক যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে ফুলটি কানে রাখা যায় কিনা, তাহার মীমাংসার জন্য স্মৃতির টোলে দৌড়িতে হইবে। আজ কালকার নূতন নূতন ব্যবস্থা পুরাতন স্মৃতিতে কেমন করিয়া থাকিবে? সুতরাং পুরাতনের টীকাভাষ্য হইতে প্রাপ্ত উপসিদ্ধান্ত, মূল্যের দ্বারা শোধন

করিয়া, আর পুরাতনের সহিত নূতনকে সমঞ্জস করাইয়া বা খাপ খাওয়াইয়া "সনাতন" করিয়া লওয়া হইতেছে। এই পদ্ধতিতে ফুলটি কানে গোঁজা যাইতে পারে। কেন-না কানটা মাথায় ঠেকিয়া আছে। আর গন্ধহীন পুষ্পে যদি পূজা না হয়, তাহা হইলে চন্দনে ঠেকাইয়া লইলেই হইবে। তখন তাহা গন্ধ ও পুষ্প মনে না করিয়া ফুলটিকেই গন্ধপুষ্প বলিলে দোষ হইবে না। কেন-না গন্ধটা পুষ্পের অঙ্গে লিপ্ত করিয়া অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইল। এই প্রকার বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির যে কোন আধ্যাত্মিক হেতু থাক না কেন, কি সভ্য কি অসভ্য সমাজ, সকলের ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু সেই গুলির উপরেই এখন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই গুলি উড়িয়া গেলে সকল ধর্ম্মের একই কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িবে। তখন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন যেমন ভয় পাইয়া চাহিয়াছিলেন—যেরূপ দেখিতে তিনি অভ্যস্ত, সেই রূপেই তাঁহাকে দেখা দিতে,—তেমনি সকল ধর্ম্মের গোঁড়ারা তখন একইরূপ কঙ্কাল দেখিয়া আঁৎকিয়া উঠিবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে যাঁহারা একাকার দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেন, তাঁহারা এতদিন বৈষম্যই চাহিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অনেকের মানসিক অবস্থা ক্রমে নব্য শিক্ষা ও সংসর্গগুণে এমন হইয়া অসিয়াছে যে একাকারে তাঁহাদের আঁৎকানি স্থলে এখন নাক সিট্‌কানি টুকুই রহিয়া গিয়াছে। এটাও যাইবে। পরে এক-আকারই উন্নত খাঁটি অবস্থা বলিয়া মনে হইবে। শিক্ষার ও চিন্তার ধারা দেশ-কাল-পাত্র-বাঁধ ভাঙ্গিয়া সভ্য জগতে কেমন এক ছাঁচে ঢালা হইতেছে। অশিক্ষিত বন্য সমাজও শিক্ষার আলোকে ক্রমে সভ্যজগতের শিক্ষা ও ভাবধারার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ফলে শিক্ষিত সমাজের ধর্ম্ম মানবের স্বাভাবিক অহঙ্কার, ঈর্ষা ও স্বার্থের এবং সকল বৈষম্যের ভিতর দিয়াই অতি ধীরে এবং অজ্ঞাতসারেই এক আকার ধারণ করিতেছে। তাহার লক্ষণ নানা ভাবে দেখা দিতেছে। কলির শেষে এই অবস্থার চরম পরিণতিই ভবিষ্যপুরাণের কথাকে সত্য করিয়া সত্য-যুগরূপে দেখা দিবে। কলিযুগ আনিবার জন্য দ্বাপর যুগের অবতারগণ যেমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, সত্যযুগ আনিবার জন্য তেমনি কলি যুগের অবতারগণ চরম অবতার কল্কির আগমনের পথই পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইতেছেন, যাহাতে তাঁহাদের অসম্পূর্ণ কর্ম্ম তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া অতি সত্বর সমাধা করিতে পারেন।

এই কল্কিই কি "কালস্সা পরিণামি" (কালের পরিণতি) র পারিভাষিক শব্দ ?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

তৃপ্তি

(৬)

শিশির যেদিন সকাল বেলায় মিনতিকে শেষ দেখিয়া ফিরিল সেদিন তার সমস্ত অন্তর উদ্দামভাবে মিনতির সহিত নির্লজ্জ অভিসার করিতেছিল। তখন তার আর কোনও বাধা মনে উঠিল না, কোনও অন্যায়ের কথা সে ভাবিল না, সে সর্ব্বান্তঃকরণে মিনতিকে কামনা করিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিয়া তার মনটা বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। চুঁচুড়ার এ বাড়ীখানা আদ্যোপান্ত বিদ্যুতের স্মৃতিতে এত পরিপূর্ণরূপে ভরা ছিল, যে এখানে আসিয়া তার অপরাধী চিত্ত পদে পদে আপনাকে তিরস্কৃত বোধ করিল।

স্নান করিয়া আরসীর সামনে দাঁড়াইয়া চিরুণী বুরুষ দিয়া মাথা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে তার চক্ষু নিবদ্ধ হইল তার ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশের ভিতর গুটিকয়েক পাকা চুলের উপর। এই ক'গাছা পাকা চুল যেন তাকে উপহাস করিয়া উঠিল। বিগত-যৌবন প্রৌঢ় সে, সে কি স্পর্দ্ধায় ওই তরুণীললামকে কামনা করিবার স্পর্দ্ধা করে? একথা শুনিলে মিনতি কি হাসিয়া গড়াগড়ি যাইবে না? বিনোদ ও সুমতি তাকে কাণে ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে না? সে তাড়াতাড়ি মাথা আঁচড়াইয়া চিরুণী বুরুষ ফেলিয়া খাইতে গেল।

দিলীপ তখন রমেনকে লইয়া খাইতে বসিয়াছে। তাকে দেখিয়া শিশিরের মনটা চড়াৎ করিয়া উঠিল। বিদ্যুৎ তার ভালবাসার এই শেষ চিহ্নটি শিশিরের হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে, শিশিরের কর্ত্তব্য, নিঃশেষে ইহার সেবায় আত্মনিয়োগ করা। অথচ এই মিনতির সন্ধানে কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া সে ইহাকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তার হাসি পাইল। তের বছরের ছেলের সামনে সে কোন লজ্জায় টোপর পরিয়া বিবাহ করিতে যাইবে? একথা ভাবিতেও তার লজ্জা হইল। তা ছাড়া দিলীপের ঘাড়ে একটা সৎমা এবং তার স্নেহের অংশীদার বৈমাত্র ভাই চাপাইবার তার কি অধিকার আছে?

তবে—মিনতি সাধারণ মেয়ে নয়। সে কখনও দিলীপকে অবহেলা করিবে না। বরং মাতৃহীন দিলীপের স্নেহময়ী মা হইয়া বসিবে। উমার চেয়ে মিনতি তার অনেক বেশী যত্ন করিতে পারিবে—তাকে মানুষ করিতে পারিবে। তার নিজের ছেলে-পিলে হইলেও, দেবী সে, কখনও দিলীপকে তাহাদিগের হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিবে না, নিশ্চয়।

——তবু!——

যাই হোক এ বুড়ো বয়সে এমন করিয়া ধাষ্টেমো করাটা কিছু কাজের নয়। মিনতিকে

তো আর কিছু সত্য সত্যই পাওয়া যাইবে না। অমন সুন্দরী, অমন বিদুষী, অমন ভাল মেয়েকে তো আর তারা দোজবরে বিবাহ দিবে না। আর মিনতিও রাজী হইবে না; অতবড় মেয়েকে তো আর তার বিনা সম্মতিতে পোঁটলা বাঁধিয়া যার তার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারিবে না। সুতরাং এই সব বৃথা দিবা-স্বপ্নের আন্দোলন করিয়া শিশির মিছামিছি দিলীপের শিক্ষা ও আনন্দবিধানে অবহেলা করিবে না। সে সঙ্কল্প স্থির করিল আর সে মিনতির চিন্তা করিবে না—এমন কি বিনোদের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইবে না।

এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে আহারাদির পর কাছারী গেল। বৈকালে কাছারী হইতে ফিরিবার পথে দেখিল দূরে রমেন স্কুল হইতে ফিরিতেছে, তার মুখে একটি সিগারেট। তার প্রাণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই রমেন তো দিলীপের নিত্য সহচর, এক রকম ইহার হাতে দিলীপের আনন্দ বিধানের ভার ছাড়িয়া দিয়া তো শিশির ছুটি লইয়াছে।

তারপর দেখিল রমেনের ওপাশে দিলীপ, সে যেন পিতাকে দেখিয়া চট্ করিয়া কি একটা ফেলিয়া দিল—সিগারেট কি? তার মনটা হঠাৎ ভয়ানক অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। একটা অসম্ভব অন্যায় আকাঙ্ক্ষার মোহে মুগ্ধ হইয়া সে তার কর্ত্তব্যে এতটা অবহেলা করিয়া বসিয়াছে—দিলীপকে এমন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে যে ইহার মধ্যেই তার এতটা অবনতি ঘটিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ!

সেইদিন হইতে একমাস সে একাগ্রচিত্তে দিলীপকে লইয়া বসিল। দিলীপকে পড়ান, দিলীপের সঙ্গে খেলাধূলা গল্পসল্প করিয়া সে দিনের অনেকটা সময় কাটাইয়া দিল। আর রমেনকে খুব শক্ত শাসন করিল।

একমাস পর সে একদিন দিলীপকে লইয়া কলিকাতায় মিউজিয়ামে গেল। সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে তাকে নানা তথ্য শিখাইতে লাগিল, সমস্ত জিনিষ দেখিয়া তার সম্বন্ধে দিলীপের জানিবার আগ্রহ দেখিয়া পুলকিত হইল।

ফিরিবার সময় সে একবার বিনোদের বাড়ী গেল। সে বাড়ী যাইতে তার পা একটু কাঁপিয়া উঠিল, অন্তর একটু নাচিয়া উঠিল। মিনতির সঙ্গে হয়তো আজ আবার দেখা হইবে এই সম্ভাবনা স্মরণ করিতে তার চিত্তের সকল প্রতিজ্ঞার বাঁধন যেন ধাঁ করিয়া আলগা হইয়া গেল।

চা খাইয়া সে বিনোদের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইল, মিনতি আসিল না। তার কথা জিজ্ঞাসা করিতে শিশিরের ভয়ানক সঙ্কোচ বোধ হইল। অথচ তার কথা জানিবার জন্য তার মন ছটফট করিতেছিল। বিনোদও সেদিন কিছুতেই সে ধার দিয়া গেল না। তাই যখন শিশির উঠিল তখন সে তার মনটা ভারি বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পূর্ব্বে মনকে সে যতই ভাঁড়াক, এখন সে আপনার কাছে স্বীকার করিল যে প্রকাণ্ড আশা লইয়া সে আসিয়াছিল সে আশায় সে নিরাশ হইয়াছে।

দিলীপকে সুমতি বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়াছিল। দিলীপ রাস্তায় বাহির হইয়াই মাসিমার কথা জুড়িয়া দিল। মাসিমা কি কি বলিলেন সে সব কথা সে বলিয়া ফেলিল।

শিশির শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর ছোট মাসী কিছু বল্লে না?"

"ছোট মাসী কে?"

"কেন? তোর মাসিমার বোন?"

"না আর কেউ তো বাড়ীতে নেই।"

শিশির বুঝিল মিনতি তার বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছে। সুতরাং আজ তার বিনোদের বাড়ীতে আসিবার কোনও দরকার ছিল না। তার মনটা ভারি ক্ষেপিয়া উঠিল।

সে অপ্রসন্নচিত্তে বাড়ী ফিরিল। এখন মিনতি তবে তার সম্পূর্ণ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। এখন আর তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দটুকুও সে লাভ করিতে পারিবে না। এ কথা মনে হইয়া সে মিনতিকে আরও ব্যগ্রতার সহিত ধ্যান করিতে লাগিল। তার সেই মুখখানা, স্বর্গের সঙ্গীতময় তার কণ্ঠ; তার কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা; আর যুথিকার মত নির্ম্মল কোমল তার চিত্তের মনোহর প্রকাশ তার কবিতা—পাগল হইয়া শিশির এই সবের ধ্যান করিতে লাগিল।

তার টেবিলের একটা ড্রয়ারের ভিতর হইতে সে একখানা খাতা টানিয়া বাহির করিল। ইহার ভিতর সে মিনতির কবিতাগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিল। খাতাখানা বাহির করিয়া সে কবিতাগুলি পড়িতে লাগিল, আর সেই কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষর তার কাণে মিনতির সুমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। একটি কবিতা পড়িতে পড়িতে তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কবিতাটি এক মাতৃহারা শিশুর উদ্দেশ্যে লেখা। মা মরিয়া গিয়াছে শিশুটি তার বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতেছে। তারপর একজন আসিয়া তাকে মার বুক হইতে টানিয়া লইয়া গেল। শিশু করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া কবিতাটি লেখা। তার শেষে মিনতি লিখিয়াছে;—

জগৎ কাঁদিয়া মরে
　　　　শিশু সম মায়ের লাগিয়া।
করুণ রোদন তার
　　　　ওই কণ্ঠে উঠিল বাজিয়া।
বুকে মোর মার প্রাণ
　　　　অক্ষম সে মরিছে কাঁদিয়া
ক্ষুদ্র দুটি বাহু মোর,
　　　　এতটুকু মোর কোল দিয়া

পারিতাম যদি হায়
জগতের সব মাতৃহারা
শিশুদের বুকে নিতে
বিলাইতে মাতৃস্নেহ ধারা !
এত স্নেহ দিয়া বিধি
মার জাতি তুলেছ গড়িয়া
শক্তি কেন দেও নাই
ততখানি যত বড় হিয়া !

পড়িতে পড়িতে শিশিরের দুই চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল। এই কবিতার ভিতর দিয়া যেন মিনতির মাতৃত্বের আকুল আহ্বান. আসিয়া মাতৃহীন দিলীপকে তার স্নেহস্পর্শে অভিসিক্ত করিয়া ফেলিল। এমন মায়ের কোলে দিলীপ যদি স্থান পায় তবে কি তার জীবন সার্থক হইয়া যাইবে না !

কিন্তু বৃথা, বৃথা এ কল্পনা ! মিনতি তো শিশিরের হইবার নয় ! তবে কেন এ চিন্তা ?

খাতাখানা আদ্যোপান্ত পড়িয়া শিশির তুলিয়া রাখিল। আবার বাহির করিয়া সেখানা নাড়াচাড়া করিল। শেষে সে তাহা হইতে কয়েকটি কবিতা বাছিয়া নকল করিয়া একখানা মাসিকপত্রে পাঠাইয়া দিল। তার মনে হইল যে এমনি করিয়া মিনতির পূজা করিতে পারিলে তার প্রেম বুভুক্ষিত হৃদয় কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবে।

কবিতাগুলি ছাপা হইতে তিনমাস বিলম্ব হইয়া গেল। পত্রিকাখানা বাহির হইবামাত্র শিশির কম্পিতহস্তে তার মোড়ক খুলিয়া কবিতার অন্বেষণ করিল। দুই সংখ্যায় যখন বাহির হইল না তখন সে চটিয়া গেল। সে স্থির করিল বইখানা ছাপাইবে।

অনেক পয়সা খরচ করিয়া যথাসম্ভব সুন্দর করিয়া সে বইখানা ছাপাইল। তারপর সে বসিয়া বসিয়া মিনতির খাতায় যে সুন্দর সূচীকার্য্য ছিল তাহা স্মরণ করিয়া সেইরকম করিয়া একটি ছবি আঁকিল। মলাটে রঙ্গিন কালিতে সে ছবি ছাপা হইল।

বইগুলি সে যেদিন প্রথম পাইল সেদিন তার মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মাসিকপত্রে পূর্ব্বের কয়টি কবিতা ছাপা হইয়া গিয়াছিল। সে এখন সেই কাগজে এ বইয়ের বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দিল।

তারপর, এ বই কয়েকখানা মিনতিকে ও বিনোদকে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিল। এখন তার মনে একটা সঙ্কোচের ভাব আসিল। মিনতি ও বিনোদের অনুমতি না লইয়া সে এতটা করিয়া ফেলিয়া ভাল করে নাই। তার ভয় হইল ইহাতে তার মনের কথাটা বোধহয় প্রকাশ হইয়া যাইবে। তবেই তো সর্ব্বনাশ। একথা কোনওমতে বিনোদ সুমতি বা মিনতির সন্দেহ হইলেই তো সর্ব্বনাশের কথা। তখন তো তাহারা ভয়ানক চটিয়া যাইবে।

এই কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সে অনেকদিন বইগুলি তার সিন্দুকে বন্ধ রাখিল। আর গোপনে দুয়ারে খিল দিয়া সে সেগুলি বাহির করিয়া তাদের সঙ্গে এক অপূর্ব্ব অভিসার করিতে লাগিল। এই প্রক্রিয়াতেই তার চিত্তের অশান্ততায় যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। সে একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল।

শেষে সে বই ক'খানা পাঠাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনোদের কাছে চিঠি লিখিল।

চিঠি পাঠাইয়াই তার মন অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। ছি! ছি! বুড়ো বয়সে সে একি অপকার্য্য করিয়া বসিল! এখন তো কথাটা সব জানাজানি হইয়া যাইবে। আর তো তার লোকের কাছে মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। সে ভয়ানক ভয় পাইয়া গেল। সে সেই দিনই তাড়াতাড়ি কালেক্টারকে বলিয়া বিশেষ প্রয়োজনের ওজুহাতে ছুটি লইল এবং একমাস ছুটির দরখাস্ত পাঠাইয়া দিয়া মশুরী পাহাড়ে পলায়ন করিল।

সাতদিন পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিনোদের চিঠি তার কাছে মশুরীতে গিয়া উপস্থিত হইল। মোড়কের উপর বিনোদের পরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া তার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। খাম ছিঁড়িতে সহসা সাহস হইল না। অনেকক্ষণ পর কম্পিতহস্তে খাম ছিঁড়িয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে তার অন্তর প্রথমে স্তম্ভিত পরে পুলকে নাচিয়া উঠিল।

বিনোদ লিখিয়াছে, "তুমি অতি পাপিষ্ঠ! (কি সর্ব্বনাশ, বিনোদ ভারী রাগ করিয়াছে) আগে যদি জানতাম যে তোমার ভিতর এমন শয়তানি সম্ভব, তবে কি আমি খাল কাটিয়া কুমীর ঘরে আনি। (তাই তো কাজটা অতি গর্হিত হইয়া গিয়াছে। এখন আর দেশে ফেরা অসম্ভব, চাকরীতে ইস্তাফা দিয়া সে দিলীপকে লইয়া এদিকেই কোথাও পড়িয়া থাকিবে।) তুমি যে বইখানা চুরী করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার শ্যালীরত্নের মনটাও চুরি করিয়া পালিয়েছ এ সন্দেহ আমার বা আমার স্ত্রীর একদিনও হয়নি। (একি কথা!) কিন্তু এখন দেখছি ব্যাপার তাই দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা সবাই পরামর্শ ক'রে স্থির ক'রেছি যে তোমার ঘাড়ে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা চাপানই হ'চ্ছে এর উপযুক্ত শাস্তি। অতএব তোমাকে শমন দেওয়া যাচ্ছে যে জ্যৈষ্ঠমাসের পনেরই তারিখ এসে তুমি তোমার মূর্ত্তিমতী শাস্তি গ্রহণ ক'রে যাবে।

"কথাটা নিছক ঠাট্টা নয়। মিনতি তোমাকে বিয়ে ক'রতে চায়। কাজেই আমাদের রাজী না হ'য়ে উপায় নেই।"

এ কি সত্য! মিনতি তবে তার হইবে? শিশির আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। একদিন সে মশুরী পাহাড়ে অনর্থক লাফালাফি ছুটাছুটি করিয়া পরের দিন বাড়ী ফিরিল।

(৭)

চুঁচুড়ায় আসিয়া তার মাথাটা অনেক ঠাণ্ডা হইল। এখন তার মনে হইল কাজটা ভাল হইতেছে না—নিতান্তই স্বার্থপরের মত হইতেছে। প্রথমতঃ মিনতি তার

কাছে যতই কাম্য হইক, সে মিনতির কাছে সত্য সত্যই কাম্য হইতে পারে না। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, অনেকটা বয়স হইয়া গিয়াছে, বিবাহ হয় নাই, সেই জন্য বোধহয় সে বাড়ীতে গঞ্জনা পায়। সেই গঞ্জনার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সে শরৎবাবুর 'অরক্ষণীয়া'র মত আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। শিশিরের পক্ষে এই স্বার্থত্যাগের সুযোগ লইয়া তাকে বিবাহ করাটা অত্যন্ত স্বার্থপরের মত কাজ হইবে। বিশ বছরের যুবতীর চিত্ত আকৃষ্ট বা তার প্রেমাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার মত তার কিছুই আছে বলিয়া শিশিরের মনে হইল না।

তার পর সে তার অখণ্ড অক্ষত হৃদয় তো মিনতিকে দিতে পারিবে না। মিনতিকে সে যতই ভাল বাসুক, বিদ্যুতের স্মৃতি তার জীবনের পরতে পরতে ঢুকিয়া রহিয়াছে। আজ সেই বিদ্যুতের অগাধ প্রেমের প্রতি অবিশ্বাসী হইবার সঙ্কল্প করিতেই তার ভিতর সে অবজ্ঞাত প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। দেয়াল হইতে বিদ্যুতের ফটোগ্রাফ তাকে যেন তিরস্কার করিয়া উঠিল। তার মনে হইল যে তার জীবনের সারবস্তুকে বিদ্যুৎকে দিয়া বসিয়াছে। এখন তো মিনতিকে সে তার সেই প্রথম প্রেমের পবিত্র আবেগ লইয়া বরণ করিতে পরিবে না। তার মনের তলায় সে বিদ্যুতের স্মৃতি চিরদিনই পূজা করিবে। এমন হৃদয় লইয়া সে কেমন করিয়া মিনতির বিশ্বাসী অন্তরের সম্মুখে দাঁড়াইবে—কেমন করিয়া তাকে বঞ্চনা করিবে!

তা' ছাড়া, বিদ্যুৎ স্বর্গ হইতে তাকে দেখিয়া না জানি কি ভাবিতেছে? সে যে কতদিন বিদ্যুতের কাছে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছে যে যদি বিদ্যুৎকে হারাইবার দুর্ভাগ্য তার হয় তবে সে আর কোনও নারীকে তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না। আজ দুই বৎসর মাত্র পরে সে অনায়াসে অন্য নারীকে ধ্যান করিতেছে। কি হীন কৃতঘ্নতা তার! তা ছাড়া দিলীপ! তার সমস্ত স্নেহ সকল সম্পদের উপর দিলীপের অখণ্ড অধিকার সে হরণ করিতে বসিয়াছে। তার মাতৃ বিয়োগ দুঃখের উপর সে বিমাতার দুর্ভাগ্য চাপাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, মিনতির মত বিমাতা হওয়া দুর্ভাগ্য নহে। মিনতির সেই কবিতার কথা স্মরণ করিল। তার ভিতর তার মাতৃ হৃদয়ের যে আকুল স্নেহকাঙ্ক্ষা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে সে দিলীপকে অশেষ স্নেহের সহিত বরণ করিয়া লইবে নিশ্চয়। কিন্তু যদি না নেয়,—যদি কবিতা সুধু কাব্যের খাতিরেই লেখা হইয়া থাকে,—যদি ইহা মিনতির অন্তরের কথা না হয়? আর হইলেই বা কি? মিনতি ছেলে মানুষ। বিশ বছর বয়সে চিত্তের যে অসীম উদারতা থাকে সে যে কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে বাস্তব জীবনের সংঘাতে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে, তা তো সে নিজের জীবনেই দেখিয়াছে। বিদ্যুতের প্রতি তার যে সীমাশূন্য প্রেম অক্ষয় অব্যয় বলিয়া সে মনে করিয়াছিল, আজ সে নিজে সে প্রেম প্রায় ভুলিয়া আসিয়াছে। যখন কবিকল্পনার মাতৃহীন শিশু মিনতির সামনে

রক্ত মাংসে গঠিত সপত্নী-পুত্র-রূপে দেখা দিবে, বিশেষ যখন মিনতির নিজের কোলে একটি ছেলে আসিয়া তার সকল স্নেহ কাড়িয়া লইবে, তখন যে কাব্যের এ মাতৃত্ব তার ভিতর সপত্নী-পুত্রের প্রতি স্বাভাবিক হিংসার ভিতর বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না তার নিশ্চয়তা কি? অবশ্য শিশির নিজে চিরদিনই দিলীপকে স্নেহ করিবে। আর দিলীপও পাঁচসাত বৎসরের মধ্যেই মানুষ হইয়া উঠিবে—তখন আর তার বাপ মার স্নেহের কোনও প্রয়োজন থাকিবে না। তবু—

এমনি অশেষ সমস্যা ও সন্দেহ আসিয়া তার চিত্ত আকুলিত করিয়া তুলিল। চুঁচুড়ায় ফিরিয়াও সে পাঁচ সাত দিন এ সম্বন্ধে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। বিনোদের সঙ্গে সে দেখা করিতে গেল না, কোনও চিঠি লিখিতে পারিল না।

তার এখন খুব স্পষ্ট ভাবেই মনে হইল কাজটা অত্যন্ত গর্হিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতিকারের কথা ভাবিতে তার আরও ভয় হইল। মিনতিকে হাতে পাইয়া হারাইতে তার মন কিছুতেই সরিতেছিল না। তা' ছাড়া এখন সে কি করিয়াই বা পিছপা' হয়? সে মিনতিকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে—তারা সম্মত হইয়াছে—এখন আবার সে-প্রস্তাব ফিরাইয়া লওয়া যে দারুণ অপমানের কথা হইবে। সে কেমন করিয়া এমন কঠিন কাজ করিবে।

সাত আট দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রে ভাবিতে ভাবিতে অর্দ্ধোন্মত্ত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং বিনোদকে চিঠি লিখিল। পাঁচসাতখানা চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে শেষে লিখিল ঃ—

"আমি পাগল হয়েছিলাম। আমার এ বয়সে মিনতির মত মেয়েকে বিয়ে করবার ইচ্ছা নিতান্তই একটা স্পর্দ্ধার কথা। আমি এখন অনেক ভেবে দেখলাম এ অসম্ভব। মিনতিকে সুখী ক'রবার মত পুঁজী আমার কিছুই নেই। সে হয়তো নিজের মন ঠিক বুঝতে পারেনি কিম্বা মনের কোনও রকম গোপন দুঃখ বা অন্য কারণে সম্মত হ'য়েছে। আমি তাকে এমন ক'রে আত্ম-বিসর্জ্জন ক'রতে দিতে পারি না।

"তাই তোমাদের সবার এ অনুগ্রহ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার ক'রে আমার উন্মত্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি। আশা করি মিনতি যোগ্যবরের হাতে প'ড়ে সুখী হবে।"

পরদিন সকালে সে চিঠিখানা ডাকে পাঠাইয়া দিল। তারপর সারাদিন সে অপরিসীম বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া কাটাইল। হাতের মুঠায় স্বপ্নের অতীত সৌভাগ্য লাভ করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিয়া শিশিরের চিত্ত একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

বৈকালে কাছারী হইতে আসিয়া শিশির দেখিল বিনোদ বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে। শিশিরকে দেখিয়াই তার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। শিশির তার দৃষ্টির সম্মুখে একেবারে মুশড়াইয়া গেল।

কোনওমতে তুই একটা স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া শিশির উপরে গিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় ছাড়িল। তার মন দারুণ আশঙ্কায় পীড়িত হইল। না জানি বিনোদ তাকে কি বলিতে আসিয়াছে। বিনোদের কাছে যাইতে তার ভয় হইল, তবু একটা প্রবল মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে তার কাছেই ছুটিল।

চাকর রামধারী আসিয়া চা ও খাবার দিয়া গেল। শিশির অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সামান্য সামান্য কথা বলিতে লাগিল। আসল কথাটা পাড়িতে তার সাহস হইল না।

চা খাওয়া হইলে বিনোদ বলিল, "শিশির তুমি অতি পাষণ্ড।"

কথাটা পরিহাসের সুরে বলা হয় নাই। শুনিয়া শিশিরের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল; সে কোনও কথা বলিতে পারিল না।

"তুমি এত বড় ছেবলা একথা আমি স্বপ্নেও কোনও দিন ভাবিনি। তা' তুমি যাই হও, তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি যে একটা মেয়ের অদৃষ্ট নিয়ে এমনি ছেলেখেলা ক'রবে তা' আমি হ'তে দেবো না। তোমার এ চিঠির মানে কি? এতই যদি তোমার মনে ছিল তবে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব ক'রে লিখতে গিয়েছিলে কেন? তোমার সঙ্গে মিনতির বিয়ের প্রস্তাব করবার কথা আমাদের কারও মনে কোনও দিন আসে নি. আমরাও সে প্রস্তাব পেয়ে একেবারে তা' অগ্রাহ্য ক'রেছিলাম। কেবল মিনতির আগ্রহ দেখে আমরা অত্যন্ত অনিচ্ছায় সম্মত হ'য়েছিলাম। আর তুমি সে মেয়েটাকে এমনি ক'রে অপদস্থ ক'রে কি সাহসে তাকে এমনি অপমান করতে চাও।"

"অপদস্থ? কি বলছো বিনোদ?"

"তোমার এখনকার মত যদি ঠিক থাকে তবে মিনতির যা' অপমান হ'বে তাতে সে আর জন্মে কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। বাড়ীশুদ্ধ সব লোক এ বিয়ের বিরুদ্ধে ছিল—তার তুই বউদি তাকে বারণ করবার জন্য অনেক চেষ্টা ক'রেছে, কিন্তু মিনতি এক রকম সবার সঙ্গে লড়াই ক'রে ব'লেছে সে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। তারপর আজ যদি তোমার এ চিঠির কথা আমি প্রকাশ করি, তবে কি সে বেঁচে থাকবে মনে ক'রছো? বেঁচে যদি থাকে তবে সে হবে তার মরার বাড়া।"

এ কথা শুনিয়া শিশিরের সারা চিত্তে একটা অপূর্ব্ব পুলকের স্নিগ্ধ হিল্লোল বহিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার দারুণ লজ্জা হইল। সে অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বলিল,—"আমাকে ভুল বুঝো না ভাই, আমি কেবল মিনতির ভালর জন্যেই লিখেছিলাম।—তা ছাড়া এত আমি জানতাম না।"

শিশিরের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

বিনোদ তখনও কঠোরস্বরে বলিয়া উঠিল, "তবে তুমি তোমার শেষ চিঠি প্রত্যাহার করছো—বিয়ে তবে ঠিক।"

শিশির ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, তার মুখে কথা জুগাইল না।

বিনোদ বলিল, "যাক, একটা মস্ত বোঝা আমার মন থেকে নেমে গেল। তোমার চিঠি পাওয়ার পর থেকে আমার যে কি আত্মগ্লানি হ'য়েছিল তা' কি বলবো। কেননা মিনতির মনের এ ভাবের জন্য আমি কতকটা দায়ী। যাক, এখন সব মিটে গেল। কিন্তু তুমি যে অস্থিরচিত্ত তোমাকে আমার বিশ্বাস নাই। পনেরই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা ক'রতে রাজী নই। কাল একটা তারিখ আছে কালই তোমায় বিয়ে ক'রতে হবে।"

শিশির একবার বলিল, "এত তাড়াতাড়ি ?"

"তাছাড়া উপায় নেই। বল রাজী ?"

শিশির সম্মত হইল। বন্দোবস্ত হইল যে শিশির সেদিন সকাল বেলায় কলিকাতা যাইবে। বিনোদের বাড়ী হইতে গিয়া বিবাহ করিয়া পরের দিন চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিবে।

(৮)

শিশির ও বিনোদ বাহিরের ঘরে মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। কিন্তু দুয়ারের কাছে আড়ি পাতিয়া ছিল মালতী।

কথা শুনিতে শুনিতে মালতী রাগে ফুলিতে লাগিল। সে বিদ্যুতের অনেক কালের ঝি – বিদ্যুতের স্নেহের দাসী। বিদ্যুতের স্থানে যে আর একজন আসিয়া তারই বাড়ীতে রাণী হইয়া বসিবে এ চিন্তাও তার অসহ্য হইল। তাই যখন সে উৎকট আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া সে শেষে শুনিতে পাইল যে শিশির বিবাহে সম্মত, তখন সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দুয়ার ছাড়িয়া নিজের ঘরে পলাইল এবং সেখানে অস্ফুটস্বরে বিদ্যুতের নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তার দুঃখের আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সে উপরে কাজ করিতে গেল। সেখানে উমাকে দেখিয়া সে বলিল, "শুনেছ পিসীমা, বাবু বিয়ে ক'রছেন।" তার অশ্রুর বেগ আবার প্রবাহিত হইল।

"অ্যাঁ! বলিস কি ?" উমারও কথাটা ভাল লাগিল না। বিদ্যুৎ মরিয়া তার হাড় জুড়াইয়াছে, সে দাদার সংসারে কর্ত্রী হইয়া বসিয়াছে। আবার কোথা হইতে কে আসিয়া তার এ সৌভাগ্য কাড়িয়া লইবে তাহা তার সহ্য হইল না।

ক্রমে ক্রমে অনেক কান্নাকাটি, বিদ্যুৎকে উদ্দেশ করিয়া নানা আকুল ক্রন্দন সহকারে মালতী যাহা শুনিয়াছিল তাহা উমাকে জানাইল। উমার সঙ্গে মালতীর কোনও দিনই সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু ইহার পর দুজনে একপ্রাণ হইয়া শিশিরের এই অপকার্য্যের নিন্দাবাদ ও তাহাতে খেদ প্রকাশ করিতে লাগিল।

সেদিন আর কিছু হইল না। পরের দিন সকালে তাহারা আবার জটলা করিয়া বসিল; আবার কান্নাকাটি চলিল।

শিশির সেদিন খাইয়া আফিসে গেলে তারা আবার বসিল। তখন দিলীপ পিসীমার কাছে পয়সা চাহিতে আসিল।

পিসীমা সাশ্রুলোচনে দিলীপকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল "ও বৌদিদি গো, কোথায় গেলে গো।"

মালতীও সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরিল। দিলীপ একেবারে ভ্যাবাচেকা খাইয়া গেল। সে ছেলেমানুষ, উজ্জ্বল আনন্দে ভরা তার প্রাণ, তার মনে দুঃখ কোনও স্থায়ী আঁচড় কাটিতে পারে না। তাই সে এ দুই বছরের মধ্যে মায়ের মৃত্যুশোক এমন পরিপূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল যে তার কাছে এই সব শোকোচ্ছ্বাস অত্যন্ত বিসদৃশ অভিনয় বলিয়া মনে হইত। কিন্তু তাহাকে লইয়া এমন অভিনয় অনেক হইয়া গিয়াছে সে ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সে মোটের উপর বেশ গম্ভীরভাবে এ সব ব্যাপারে আপনার ভূমিকা অভিনয় করিয়া যায়। কিন্তু তবু এতদিন পরে হঠাৎ সেই পুরাতন শোকের পুনরুচ্ছ্বাসে তার গাম্ভীর্য্য রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। বিশেষ, তার এখন স্কুলে যাইবার তাড়া। তাই সে অল্পক্ষণ বাদেই বলিল, "পিসীমা, আমায় পয়সা দিন, স্কুলের বেলা হ'য়ে গেল।"

"আর বাছা স্কুলে যাবি কি? এদিকে যে তোর কপাল ভাঙ্গতে ব'সেছে," বলিয়া পিসীমা আর এক ছোট হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

দিলীপ ইহাতে চমকিত হইল। সে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন পিসীমা, কি হ'য়েছে?"

মালতী বলিল. "তোমার বাবা যে বিয়ে ক'রছে আবার খোকা বাবু!"

কথাটা দিলীপের মনে একটা প্রচণ্ড ঘা দিল। কি সর্ব্বনাশ! এও কি সম্ভব?" তার বাবা কি কখনও এমন অপকার্য্য করিতে পারেন? বিমাতা সম্বন্ধে তার আতঙ্ক বাঙ্গলা দেশের কোনও বালকের চেয়ে কম ছিল না। শিশুকালে যে দুয়োরাণী সুয়োরাণীর গল্প শুনিয়াছে, ডালিমকুমারের কথা পড়িয়াছে—রামচন্দ্রের প্রতি কৈকেয়ীর কঠোর নির্য্যাতনের কাহিনী শুনিয়াছে। কাজেই বিমাতা যে মহাশত্রু একথা তার মনে স্বতঃসিদ্ধরূপেই বরাবর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার বাবা যে তার উপর এতবড় শত্রুতা করিবেন, বাড়ীতে বিমাতা-শত্রুর আমদানী করিবেন একথা তার বিশ্বাস হইল না। একথা শুনিয়াই সে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু প্রথম আঘাতের বেগটা কাটিয়া গেলেই সে বলিল, "যাঃ মিথ্যা কথা! কে ব'লেছে? বাবা কক্ষনো বিয়ে করবেন না।"

মালতী বলিল, "হাঁ, খোকা সত্যি! আমি নিজে কানে শুনেছি। ঐ বিনোদ বাবু

এসেছিলেন সম্বন্ধ ঠিক ক'রতে, কথা পাকা হ'য়ে গেছে। শীগ্‌গিরই বিয়ে হ'বে। মা গো কোথায় তুমি মা! তোমার সোণার সংসার কি হ'তে চল্ল মা, তোমার ছেলের কি উপায় হ'বে তা' দেখছো না মা।" বলিয়া সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

স্তব্ধ বিমূঢ় হইয়া বালক দাঁড়াইয়া রহিল, তার পিতার উপর অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এই এক কথায় একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। পিতা তার দেবতা, তার প্রিয়তম সুহৃৎ তার সকল আনন্দের উৎস, সকল গর্ব্বের আশ্রয়! সেই পিতা তার এই? বন্ধু বান্ধব ও অন্য লোকের মুখে মুখে সে সদা সর্ব্বদা যে কথা শুনিয়াছে তাহাতে তার মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মাইয়া গিয়াছিল যে যারা দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ ক'রে, বিশেষতঃ পরিণত বয়সে, তারা পরম অশ্রদ্ধার পাত্র। এমন সব লোকের নামে কত কুৎসা সে শুনিয়াছে, সেও যে কত লোককে কত পরিহাস করিয়াছে। যে মুখে সে যোগেন মিত্তির ও নরেন দাসের নামে কুৎসা নানা রঙ ফলাইয়া বন্ধু মহলে পুনরাবৃত্তি করিয়াছে, সেই মুখ সে ইহার পর লোকের কাছে দেখাইবে কেমন করিয়া?

পিসীমা বলিলেন, "আহা বাছারে আমার, তোর কপালে কত দুঃখই ভগবান লিখেছেন। নইলে এমন মা তোর তোকে ফেলে চ'লে গেল! এমন বাপ, তার এমনি মতিচ্ছন্ন ধরলো।" তার পর কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর প্রবোধ লাভ করিয়া "শোন্ বাবা তুই এক কাজ কর্। আজ বিকেলে তোর বাবা আফিস থেকে এলে তুই বলিস্ যে তুমি যদি বিয়ে কর তবে আমি বিষ খাব, নয় বিবাগী হ'য়ে যাব। তা' হ'লে আর সে বিয়ে ক'রতে সাহস ক'রবে না।"

ইহার পর পিসীমা ও মালতীতে মিলিয়া এই ভাবের নানা কথাবার্ত্তা তাহাকে শিখাইতে লাগিলেন।

এসব কথা দিলীপের মনের কাছ দিয়াও গেল না। ছি! সে গিয়া তার বাপকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিবে! তাঁর করুণা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিবে! বাপমার সে একমাত্র ছেলে; চিরদিন আদরে-সোহাগে মানুষ হইয়াছে—সকল সমাদর তার অবশ্য প্রাপ্য বলিয়াই সে চিরদিন জানিয়াছে। আদর সে যাচিয়া লইবে! বাপ যদি তার মুখের দিকে না চান, তবে কি সে তাঁর কাছে দয়া ভিক্ষা করিবে! ছিঃ!

নিদারুণ অভিমানে তার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে পিতা যদি এমন কাজ সত্য সত্যই করেন তবে সে আর তাঁর মুখ দর্শন করিবে না। নিজের উপর কোনও অকথ্য নির্য্যাতন করিয়া সে পিতাকে শাস্তি দিবে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া একথা তাঁকে কোনও দিনই বলিবে না।

সে কোনও কথা না বলিয়া স্কুলে চলিয়া গেল। মালতী তার পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া তাঁকে পয়সা দিল সে তাহা হাতে লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ছাই পয়সা! তার পুত্রত্বের সমাদর যেখানে নাই, সেখান হইতে পয়সা সে লইবে না।

সেদিন স্কুলে দিলীপ কোনও পড়াই বলিতে পারিল না। সে ক্লাশের সব চেয়ে ভাল ছেলে। তার এ ত্রুটিতে মাষ্টার ভারি মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁর মনে হইল ছেলেটা খারাপ হইয়া যাইতেছে—সে সিগারেট খায় এমন একটা কথা মাষ্টারের কাণে উঠিয়াছিল। তাই তিনি দিলীপকে তিরস্কার করিলেন। দিলীপ কারও কাছে তিরস্কারে অভ্যস্ত নয়, তাতে আবার সেদিন তার সমস্ত অন্তরাত্মা সারা জগৎটার উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে চটাং চটাং কথা বলিয়া মাষ্টারের তিরস্কারের উত্তর দিল। মাষ্টার তাহাকে দাঁড়াইতে আদেশ দিলেন। দিলীপ দাঁড়াইল না। মাষ্টার বলিলেন, "বেঞ্চের উপর দাঁড়াও।"

দিলীপ চীৎকার করিয়া উঠিল "আপনার দরকার হয় আপনি দাঁড়ান—I don't care a fig—"

মাষ্টার ক্ষিপ্ত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। দিলীপের দুই কাণ ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিলেন।

দিলীপ ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করিয়া উঠিল। চট করিয়া মাথা ঘুরাইয়া সে মাষ্টারের হাতে খুব জোরে কামড় বসাইয়া দিল। মাষ্টার চীৎকার করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

দিলীপ উঠিয়া তার বই খাতা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দুয়ারের কাছে গিয়া বই খাতা ছড়াইয়া ফেলিয়া সে সোজা মাঠের দিকে ছুটিয়া পলাইল।

ঠিক সেই সময় ছুটির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সেদিন আর কিছু হইল না। কিন্তু দিলীপের এই অসমসাহসিকতা ও দুর্ব্বিনীত আচরণে সমস্ত স্কুল শুদ্ধ ছেলে একেবারে স্তব্ধ ও অবাক হইয়া গেল। কাল যে একটা ভয়ানক কাণ্ড হইবে, সে সম্বন্ধে কারও সন্দেহ রহিল না—নূতন হেড্ মাষ্টার ম'শায় যে ভয়ানক শক্ত লোক, ডেপুটির ছেলেই হউক আর যাই হউক, তার হাতে দিলীপ নিস্তার পাইবে না, সবাই এইরূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিল।

স্কুল ছাড়িয়া ছুটিতে ছুটিতে দিলীপ রেলওয়ে ষ্টেসনের দিকে চলিল। অনেক দূর গিয়া ক্লান্ত হইয়া নির্জ্জন পথে একটা বাগানের ভিতর ঢুকিয়া সে বসিয়া পড়িল। তখন তার বুক ঠেলিয়া দারুণ কান্না উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে অনেকক্ষণ পড়িয়া পড়িয়া সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া কাঁদিল।

* * * *

সেদিন শিশির খুব সকাল সকাল কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিল। একটা সুটকেসের ভিতর কিছু কাপড়-চোপড় লইয়া রামধারী খানসামার সঙ্গে তখনি সে কলিকাতা রওনা হইয়া গেল।

পিসীমা ও মালতী এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। ব্যাপার কি? আজই কি বিবাহ করিতে গেল নাকি? মালতী প্রথম এ সন্দেহ প্রকাশ করিল, কিন্তু পিশিমা খানিক

ভাবিয়া স্থির করিলেন, না, এ হয়না। কাল কথা হইল আজই বিবাহ, এ একটা কথাই নয়, বোধ হয় আশীর্ব্বাদ টাশীর্ব্বাদ কিছু হইবে। সুতরাং এখনো সময় আছে। হতভাগা ছেলেটা যদি আজ স্কুলে না যাইত তবে এখনি তো সে বাপকে চাপিয়া ধরিতে পারিত। যাক গে' এখনও সময় আছে। সুতরাং দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন কি রকম করিয়া বিবাহটা বন্ধ করা যায়।

ফন্দীটা ঠিক যখন পাকাপাকি হইয়া আসিল তখন তাঁরা দিলীপের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দিলীপকে খুব করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া তালিম দিয়া ঠিক করিতে হইবে। কিন্তু দিলীপটা যে ছাই আসে না। তার স্কুল কি আর মিটে না?

রমেন স্কুল হইতে আসিলে পিসীমা বলিলেন, "কিরে, তুই একা যে? খোকা কই?"

"কেন? সে আসে, নি? সে তো আমার আগে আগে ছুটে' এসেছে। আজ সে স্কুলে যা' কাণ্ড ক'রে এসেছে!"

"কি, কি ক'রেছে?"

রমেন সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। রমেন দিলীপের চেয়ে দুই বছরের বড় হইলেও সে দিলীপের সঙ্গেই সেকেণ্ড ক্লাশে পড়িত। সুতরাং সে সমস্ত অবস্থা অবগত ছিল।

সে বলিল, "শুনলাম হেড্‌মাষ্টার ব'লেছেন কালকে দিলীপকে হাত বেঁধে চাব্‌কে স্কুল থেকে রাষ্টিকেট ক'রে দেবেন।"

মালতীর প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, সে বলিল, "ও মা! কি সর্ব্বনাশ! বাছার কি হবে গো?"

উমা বলিলেন, "ঈস্! করলেই হল আর কি! কাল ওকে স্কুলে যেতে দিচ্ছি আর কি? আসুক দাদা তার পর দেখে নেবো সে কত বড় হেড্‌ মাষ্টার।"

রমেন বলিল, "না মা, এ হেড্‌ মাষ্টার বড় শক্ত লোক। আর এ নাকি ডিরেক্টারের খুব প্রিয় ছাত্র ছিল। তাই সে কাউকে ভয় করে না। প্রিন্সিপ্যালকে পর্য্যন্ত সেদিন ধমকে দিল।"

হেড্‌মাষ্টার সম্বন্ধে এমনি সব নানা উপন্যাস ছেলে মহলে চলিত ছিল।

"আচ্ছা দেখা যাবে কে কত বড় ডিরেক্টর ফিরেক্টর। দাদা তার ধুরধুড়ি নাড়িয়ে দেবে। তা, যাক, সে ছোঁড়া গেল কোথায়। তার বিলম্ব দেখিয়া ক্রমে তাহারা ভারী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে রমেন ও তিন চারটি চাকর চারিদিকে ছুটিল দিলীপের খোঁজ করিতে।"

যখন একটির পর একটি লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল যে দিলীপকে তারা খুঁজিয়া পায় নাই, এবং মালতী থাকিয়া থাকিয়া শেষে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, সেই সময় পেস্কার ললিতবাবু আসিয়া পিশিমার সাক্ষাৎ ভিক্ষা করিলেন।

ললিতবাবু পিসীমাকে নিদারুণ সংবাদ দিলেন। শিশির কলিকাতায় গিয়াছেন বিবাহ

করিতে। আজ রাত্রে বিয়ে কাল সন্ধ্যাবেলায় বাবু বউ লইয়া ফিরিবেন। বাবু কারও কাছে কথাটা প্রকাশ করেন নাই, কেবল ললিতবাবুকে গোপনে বলিয়া গিয়াছেন। উমা যেন কাল সন্ধ্যাবেলায় বউকে বরণ করিবার আয়োজন করিয়া রাখেন। কথা শুনিয়া উমা একেবারে বসিয়া পড়িল। একবার ভাবিল যে এখনও যদি ছেলেটা আসিয়া পড়িত তবে তাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া একটা হিল্লে করিবার চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু সে হতভাগা এই সময়েই এমন একটা কাণ্ড বাধাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যাক! আর কি উপায় করা যাইবে। এখন আর কান্নাকাটি করিয়া লাভ নাই। এখন উপস্থিত ক্ষেত্রে নূতন বউয়ের সঙ্গে ভাব করিয়া তাকে হাত করিবার চেষ্টাই একমাত্র উপায়। সুতরাং তিনি এই পথে তাঁর চেষ্টা ও শক্তি পরিচালনের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দশটার সময় দিলীপ ফিরিয়া আসিল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তখন তার অঙ্গ অবসন্ন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে চক্ষু ফুলাইয়াছে। সে নীরবে আসিয়া আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। পিসীমা আর তার খোঁজ করিলেন না; এখন তিনি নূতন ভ্রাতৃবধুর বরণের আয়োজনে ব্যস্ত।

দিলীপের প্রাণটা কেবল অক্ষম রোষে পাশবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন করিতেছিল। সে কিছুই করিতে পারে না, কারও কোনও ক্ষতি করিতে পারে না, পিতাকে শাস্তি দিতে পারে না, মাষ্টারকেও শাস্তি দিতে পারে না। যদি সে কোনও অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইতে পারিত, একটা মন্ত্র বা ইন্দ্রজালবলে সে হঠাৎ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারিত – তবে সে কি না করিত ?

এখন তার সম্মুখে চারিদিক অন্ধকার মনে হইল। তাহার পিতার বিবাহের চেয়ে আপাততঃ বড় হইয়া উঠিল তার স্কুলে কৃতকর্ম্ম। সে কোনও দোষ করে নাই, দোষ ষোল আনা মাষ্টারের এ বিষয়ে তার বিশ্বাস এক মুহূর্ত্তের জন্যও ক্ষীণ হয় নাই। তবু এখন তার একথা মনে হইল যে কাল তার এ কাজের ফল ভোগ করিতে হইবে। প্রথম প্রথম তার কৃতকর্ম্মে সে বেশ একটু পৌরুষের গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু যতই সময় যাইতে লাগিল ততই তার মন এ গর্ব্বটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, অবশ্যম্ভাবী শাস্তির নিদারুণ কল্পনায়। সে যাহা করিয়াছে এখনি হয়তো তাহা সর্ব্বত্র জানাজানি হইয়া গিয়াছে, হয়তো তাহা বাবার কাণেও গিয়াছে। বাবা যখন তাকে ডাকিয়া বলিবেন যে এ কাজ বড় অন্যায় হইয়াছে তখন তো সে মুখ লুকাইবার পথ পাইবে না। শিশির কখনও তাকে তিরস্কারও করেন না। কিন্তু সে কোনও অন্যায় করিলে যে তিরস্কারপূর্ণ করুণ দৃষ্টিতে তার দিকে চান তাহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। তাই সে পিতার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য চুপচাপ বাড়ীতে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। শুইয়া শুইয়া সে প্রতিমুহূর্ত্তে পিতার আহ্বানের আশঙ্কা করিতেছিল। 'আর ভাবিতেছিল কাল কি হইবে। কাল হেড্‌মাষ্টারের সামনে তার

যে লাঞ্ছনা হইবে তার বিস্তারিত বিবরণ কল্পনার চক্ষে দেখিয়া গেল—তার অন্তর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ এমনি ভাবে পড়িয়া থাকিবার পর মালতী সন্ধান পাইয়া তার কছে আসিয়া খাইতে ডাকিল। সে নীরবে উঠিয়া খাইতে গেল। তাড়াতাড়ি খাইয়া সে আবার আপনার ঘরে আসিল। মালতী পিছু পিছু আসিল।

মালতী বলিল, "আজ স্কুলে কি কাণ্ড করে এসেছ খোকা বাবু?"

"আমার যা ইচ্ছে তাই ক'রেছি তাতে তোর কি?"

"আমার নয় কিছু নাই হ'ল। তা যা'ক যা ক'রেছ ক'রেছ। কাল আর তোমার ইস্কুলে গিয়ে কাজ নেই। হেট্‌মাষ্টার কাল তোমাকে ভারি শাস্তি দেবে বলেছে।"

দিলীপের মনটা একথায় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু প্রকাশ্যে সে বলিল, "আচ্ছা সে দেখে নেবো, তোর সেজন্য ভাবতে হ'বে না।"

তারপর আস্তে আস্তে বলিল, "হাঁ মালতীদি, বাবা শুনেছেন?"

গম্ভীরভাবে মালতী বলিল, "না।"

"বাবা শুয়েছেন কি?"

"আ পোড়াকপাল! বাবা কোথায় তোমার যে শোবে?" মালতী কাঁদিয়া ফেলিল।

দারুণ আশঙ্কায় দিলীপ বলিল, "কেন কি হ'য়েছে?"

"আর কি হ'য়েছে। সে পোড়ারমুখো আজ রাত্রে বিয়ে ক'রতে গেছে।" বলিয়া মালতী চোখের জল মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দিলীপ ধপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তার ভাবনা চিন্তা সব ভয়ানক এলোমেলো হইয়া গেল। একবার তার নিদারুণ ক্রোধ হইল, পরক্ষণেই দারুণ দুঃখের স্রোতে তার সব ক্রোধ ধুইয়া গেল। আবার দুর্জ্জয় অভিমান গর্জ্জিয়া উঠিল—সে এ অবিচার—এ হীনাচারের প্রতিকারের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। অসম্ভব অসম্ভব প্রতিকারের কল্পনা তার মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনটাই তার কাছে অসম্ভব মনে হইল না।

সারারাত্রি সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিস ভিজাইল, নিদারুণ ক্ষোভে জর্জ্জরিত হইয়া তার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। শেষরাত্রে সে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বঙ্কিম-সাহিত্যে সন্ন্যাস

বাঙ্গলা দেশ চিরদিনই আর্য্য সভ্যতার প্রত্যন্তভাগ বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। স্বাধ্যায় বা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড কখনই দীর্ঘকাল ধরিয়া দৃঢ়মূল বনস্পতির মত শাখা পল্লব পুষ্প ফলে সমৃদ্ধ হইয়া এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাই অতীতে এ প্রদেশের স্বাতন্ত্র্যের চাপে যখনই শ্রৌত সাধনা মুষড়িয়া পড়িবার মত হইয়াছে—তখনই আর্য্যাবর্ত্তের মর্ম্মস্থল হইতে জ্ঞান-গরিষ্ঠ ও তপস্যা-প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আমন্ত্রণ করিয়া সেই শ্রুতিমূল মহাদ্রুমকে সঞ্জীবিত করিতে হইয়াছে। বৈদিক অগ্নিস্থাপনা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ন্যায় বৈদিক সন্ন্যাসও এদেশে কঙ্করাকীর্ণ ভূমিতে কৃষির মত শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পীতবাস ও তান্ত্রিক সাধকগণের রক্তাম্বরই বাঙ্গলায় বৈরাগ্যের বৈজয়ন্তী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুস্থানের কেন্দ্রস্থল সমূহের সহিত ভাববিনিময় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হওয়ায় গৈরিক আসিয়া আবার নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বাঙ্গলার নগরে ও জনপদে বহুসংখ্যক মঠ ও আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। বহু যুবক আনন্দান্ত নাম গ্রহণ করিয়া নূতন ধরণের সন্ন্যাস-ব্রতের উন্মাদনায় সাংসারিক আশা বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া গৃহত্যাগ করিতেছে।

আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের স্রষ্টা, প্রতিভার মূর্ত্ত অবতার বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা বাঙ্গালীর জাতীয় সত্তাকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সকল সম্মিলিত চেষ্টা ও জাতীয় অনুষ্ঠান দেখিতে পাই তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটীরই বীজ বাঙ্গলায় নবযুগের প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যান ও কল্পনায় নিহিত। এদেশের আধুনিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বঙ্কিম-লেখনীর প্রভাব ইহাদের উপরও বহুল পরিমাণে অনুভূত হয়। বঙ্কিম সাহিত্যে সন্ন্যাসের আলোচনায় এই তত্ত্বই পরিস্ফুট হইবে।

সন্ন্যাসের যে ধারণা উপনিষদ্‌গ্রন্থে পাওয়া যায় –বঙ্কিমচন্দ্র-চিত্রিত অল্পাধিক বিরক্ত পুরুষে তাহা ঠিক সঙ্গত হয় না। তথাপি সাধারণভাবে উহাদিগের সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কোনও আখ্যা উপযোগী নহে। 'রজনী' উপন্যাসে যে তন্ত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীর বর্ণনা আছে, তাঁহার সম্বন্ধে একস্থানে লিখিত হইয়াছে—

"আমাদের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিত। কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধূত। * * * তিনি যাই হউন, বালকেরা তাঁহাকে সন্ন্যাসী মহাশয় বলিত বলিয়া আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিব।"

বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্ন্যাস শব্দও সেইভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সন্ন্যাসী এই সাধারণ নামে অভিহিত হইলেও বঙ্কিম চিত্রিত এই প্রকার চরিত্রের মধ্যে নানা শ্রেণী, নানা স্তর আছে। ইহাদের মধ্যে নিম্নতম স্তরটীকে আপৎ সন্ন্যাস বা

বিধুর সন্ন্যাসের স্তর বলা যাইতে পারে। তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত—একটী দুর্গেশনন্দিনীতে, অপরটী কৃষ্ণকান্তের উইলে। নিজ অপকর্ম্মের ফলে, অনুতাপের বশে কিম্বা আত্মরক্ষার উদ্দেশে যে গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ ঘটে তাহাকে আপৎ সন্ন্যাস বা বিধুর সন্ন্যাস নামে অভিহিত করা বোধ করি অসঙ্গত হইবে না। অভিরাম স্বামী এই জাতীয় সন্ন্যাসী। অভিরাম স্বামী ওরফে শশিশেখর ভট্টাচার্য্য যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র ছিলেন। পরে, বোধ করি, নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া ইনি সন্ন্যাস অবলম্বন এবং তাহার সহিত পরমহংস আখ্যা গ্রহণ করেন। সম্পর্কে তিলোত্তমা ইহার দৌহিত্রী—বিমলা কন্যা। সন্ন্যাসাবস্থাতেও উহাদিগের মায়া কাটাইতে পারেন নাই—বরং উহাদিগের হিতার্থে পরামর্শ ও সাহায্যদানের জন্য অভিভাবকরূপে উহাদিগেরই সন্নিকটে বাস করিতেন। গড় মান্দারণে পিতা কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়া তিনি দেশত্যাগী হয়েন। কাশীধামে যাইয়া কোন সর্ব্ববিং দণ্ডীর নিকট অধ্যয়ন করিয়া দর্শনাদিতে সুপটু, জ্যোতিষে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অধ্যয়নে স্বভাব-দোষ যায় না। তজ্জন্য অধ্যাপক কর্ত্তৃক পুনরায় লাঞ্ছিত হইলেন। এহেন ব্যক্তি সন্ন্যাসের বাহ্যাড়ম্বর অবলম্বন করিলেও অন্তরে যে সাংসারিক বন্ধনে জড়িত থাকিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাই বীরেন্দ্রসিংহের বধ্যভূমিতে—তিনি বিমলার পার্শ্বে উপস্থিত। জগৎসিংহ তিলোত্তমার সম্মিলন ঘটাইতে তিনিই উদ্যোগী, সে উদ্যোগ যখন সফল হইল, তখন আনন্দে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। "রাজকুমার জগৎসিংহকে আলিঙ্গন করিবার ব্যগ্রতায় পূতির উপর যে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাহার জ্ঞান নাই।"

"কৃষ্ণকান্তের উইলের" নায়ক গোবিন্দলাল স্বহস্তে রোহিণীকে হত্যা করিয়া এবং নিষ্ঠুরাচরণে ভ্রমরের মৃত্যুর কারণ হইয়া দ্বাদশবর্ষ অজ্ঞাতবাসে রহিলেন। পরে কোথা হইতে সহসা একদিন সন্ন্যাসীর বেশে আবির্ভূত হইয়া হরিদ্রাগ্রামে ভ্রমরের উদ্দেশে নির্ম্মিত মন্দিরদ্বারে দেখা দিলেন। মন্দিরের ভিতর সুবর্ণময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি দেখিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র শচীকান্তকে বলিলেন—"এই ভ্রমর আমার ছিল।" শচীকান্ত তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত হইলেন। শচীকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?" গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি। তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

রাজদণ্ড এড়াইবার উদ্দেশে বা উৎকট আত্মগ্লানির ফলে সন্ন্যাস-গ্রহণের দৃষ্টান্ত আজকাল বিরল নহে। কখনও কখনও ইহার পরিণামে যে জীবনের ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত না হয় এমতও নহে। কেহ বা পূর্ব্বসংস্কার ও বন্ধন হইতে মুক্তি পায়। আবার কাহারও জীবনে "কমলী নাহি ছোড়তা" এই কথাই সত্য রহিয়া যায়। গোবিন্দলাল ও অভিরামস্বামী তাহারই দৃষ্টান্ত।

বঙ্কিম বর্ণিত সন্ন্যাসের দ্বিতীয় স্তরে কয়েকটী মামুলীধরণের সন্ন্যাসী ও সাধকের অপূর্ণায়তন চিত্র পরিদৃষ্ট হয়। এই চিত্রগুলি আবশ্যকীয় সকল রেখাপাতে পূর্ণভাবে অঙ্কিত হইয়া পাঠকের মানসনেত্রে স্পষ্ট আকার ধারণ করে না—ইহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্যক্ যত্ন-প্রয়োগ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ইহারা আখ্যায়িকাগুলিতে গৌণ চরিত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে মাত্র। বাঙ্গলার হিন্দু সমাজভুক্ত বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রতিকৃতি বা প্রতিনিধি হিসাবে ইহারা শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীশিল্পের সমগ্রতা বিধান করিতেছে।

"সীতারামে" এই শ্রেণীর এক সন্ন্যাসী দেখিতে পাই। জয়ন্তীর সঙ্গে "শ্রী"ও সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছে। গৈরিক, রুদ্রাক্ষ বিভূতিতে অঙ্গ ভূষিত করিয়া উভয়ে "সঞ্চারিণী দীপশিখা"দ্বয়ের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রের পথ আলো করিয়া চলিয়াছে। পথে ললিতগিরির পদতলে বিরূপাতীরে পর্ব্বতগাত্রে হস্তিগুম্ফায় **পরমযোগী** মহাত্মা **গঙ্গাধর স্বামী** বাস করেন। স্বামী সংস্কৃতে কথা কহেন—প্রত্যূষে ধ্যানভঙ্গ হইলে বিরূপার স্রোতে স্নান করেন। দিবসের প্রায় সময়ই ধ্যানস্থ থাকেন – তখন দর্শনার্থীদিগকে গুহার বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয়। করকোষ্ঠীতে সিদ্ধবিদ্য। জয়ন্তী তাঁহাকে শ্রী'র হাত দেখাইল। স্বামী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।" পুনরপি গণনা করিয়া বলিলেন, প্রিয়-প্রাণহন্ত্রীত্ব যোগ আছে -- তবে এক পুণ্য সময় আসিবে যখন স্বামী-সন্দর্শন ঘটিবে।

"বিষবৃক্ষ" বর্ণিত **ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ শর্ম্মা**ও এই পর্য্যায়ভুক্ত। বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়া নগেন্দ্র দত্ত পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখীকে পায়ে ঠেলিলেন, অভিমানিনী তখন নিরুপায় হইয়া গৃহত্যাগ করিল। পথক্লেশে, অনাহারে, মনোব্যথায় তাহার দেহ জীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া পড়িল। অবশেষে এক দুর্দ্দিনের সায়াহ্নে সূর্য্যমুখী মুমূর্ষু অবস্থায় পথিপার্শ্ব আশ্রয় করিল। ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মচারী পথ দিয়া যাইতেছিলেন। শিবপ্রসাদ শর্ম্মা সংসার ত্যাগী—গৈরিক বসন, গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে চন্দনের রেখা– জটার আড়ম্বর নাই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ। কতক শ্বেতবর্ণ। ভিজিতে ভিজিতে পথ চলিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর অস্ফুট কাতরোক্তি শুনিয়া নিকটে আসিলেন। তাহার অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে শিশুসন্তানবৎ কোলে তুলিয়া অন্ধকারে দুর্গম মাঠের পথ ভাঙ্গিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। লোকালয়ে পৌঁছাইয়া তাহার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। সূর্য্যমুখী আবার প্রাণ পাইল। ইঁহার পত্র হইতেই সূর্য্যমুখীর সন্ধান পাইয়া নগেন্দ্র দত্ত রাণীগঞ্জের পথে মধুপুর গ্রাম হইতে নিজ ভার্য্যাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন।

শৈবলিনী গৃহত্যাগিনী হইলে চন্দ্রশেখর নিজ বহু-যত্ন-সঞ্চিত পুঁথিগুলির অগ্নিসৎকার করিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। পরে ব্রহ্মচারীবেশে নবাব রাজধানী মুঙ্গেরের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। সহরের উপকণ্ঠে কোন মঠে তাঁহার গুরু ও উপদেষ্টা **রমানন্দ স্বামী**

পরমহংস বাস করেন। রমানন্দ স্বামী সিদ্ধ পুরুষ—প্রবাদ, ভারতের লুপ্ত দর্শন বিজ্ঞানের তিনি আধার। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বময় উপদেশাবলি শুনিতে শুনিতে চন্দ্রশেখর বিস্মিত, মোহিত, কণ্টকিত হইয়া উঠেন। ইঁহারই নিকট সম্মোহন বিদ্যা লাভ করিয়া চন্দ্রশেখর নিজ পত্নীর মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিলেন। নবাব ও ইংরাজে যখন যুদ্ধ বাধিল সিদ্ধ পুরুষ হইলেও রমানন্দ স্বামী তখন স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনিও রণক্ষেত্রে প্রতাপ চন্দ্রশেখরের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৈবলিনীর গার্হস্থ্য-সুখ-বিধানের জন্য প্রতাপ মৃত্যু বরণ করিল। তাহার মুখে শৈবলিনীর প্রতি অসীম ভালবাসা ও অপূর্ব্ব আত্ম-বিসর্জ্জনের কাহিনী শুনিতে শুনিতে রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল। আর কেহ কখনও রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই।

"রজনী" উপন্যাসে যে **অবধূত তান্ত্রিকের** চিত্র আছে পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পরিধানে গৈরিক বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে, রক্তচন্দনের ছোট রকমের ফোঁটা। চন্দন কাষ্ঠের খড়ম। তাহাতে হাতীর দাঁতের বৌল। বড় একটা ধূলা কাদার ঘটা নাই। সন্ন্যাসী জাতির মধ্যে ইনি একটু বাবু। সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানী, যে ভাষায় কথা কহিত, তাহার চৌদ্দ আনা নিভাঁজ সংস্কৃত—এক আনা হিন্দী, এক আনা বাঙ্গালা। সন্ন্যাসী ঔষধ বিলায়, হাত গণিয়া ভবিষ্যৎ বলে, যাগ হোমাদিও করিয়া থাকে, নল চালে, চোর বলিয়া দেয়, বন্ধ্যার প্রতীকার করে। প্রথম প্রথম শচীন্দ্রনাথ অবিশ্বাস করিয়া ইহার কার্য্যাবলিকে ভণ্ডামি বলিত। সন্ন্যাসী তর্কে পটু - বলিতেছেন, "তোমাদের একটী ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, ইংরাজেরা যাহা জানে তাহা সত্য, ইংরাজেরা যাহা জানেনা তাহা অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। ইংরাজেরা যাহা জানেন, ঋষিরা তাহা জানিতেন না, ঋষিরা যাহা জানিতেন ইংরাজেরা এপর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। সেই সকল আর্য্যবিদ্যা লুপ্ত হইয়াছে।" শচীন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করাইবার জন্য কিছু প্রত্যক্ষও দেখাইলেন—তাঁহারই ক্রিয়ার ফলে শচীন্দ্রনাথ তাহার প্রেমিকা কাণা ফুলওয়ালীকে স্বপ্নে দেখিল। আবার ইঁহার তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের ফলেই অভাবনীয়রূপে জন্মান্ধ রজনী চক্ষু ফিরিয়া পাইল।

কপালকুণ্ডলার **কাপালিক**ও এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। শুনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জীবনে এইরূপ তান্ত্রিক সাধুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা হইতেই এই কাপালিক চরিত্রের উদ্ভব। সমুদ্রতটে সঙ্গিগণ-পরিত্যক্ত নবকুমার দেখিল এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে—তৎপ্রভায় শিখরাসীন ব্যক্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় মনে হইল। বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বৎসর। কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রু-জটা-পরিবেষ্টিত। 'জটাকারী এক ছিন্নশীর্ষ

গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। সম্মুখে নরকপাল। তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রবপদার্থ—চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড। নবকুমারকে পাইয়া কাপালিকের নরবলি দিবার সংকল্প হইল। শরীরে অমানুষিক বল—নবকুমার সজোরে তাহার হস্ত হইতে নিজ প্রকোষ্ঠ ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়া দেখিল—কাপালিকের অঙ্গমাত্রও হেলিল না—নিজ অস্থি-গ্রন্থিসকল যেন ভগ্ন হইয়া গেল। সেই ভীষণ রাত্রিতে কপালকুণ্ডলাকর্তৃক অপহৃত খড়্গের অন্বেষণে কাপালিক এক উচ্চ বালিয়াড়ি শিখর হইতে পড়িয়া গেল—মনে হইল মহিষ যেন পর্ব্বতশিখরচ্যুত হইল। কাপালিক পঙ্গু হইল, কিন্তু সংকল্প ত্যাগ করিল না। বলি অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিতে প্রতিহিংসা আসিয়া যোগ দিল! ফলে কাপালিক প্রত্যাখ্যাত মতিবিবির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কপালকুণ্ডলাকে অবিশ্বাসিনী প্রমাণ করাইয়া স্বামী-হস্তে তাহার বধের আয়োজন করিল। গঙ্গার খরস্রোতে সহসা আড়রি ধ্বসিয়া যাওয়ায় কপালকুণ্ডলা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল—নবকুমার তাহার অনুগমন করিল। কাপালিকের হিংস্র সংকল্প অপ্রত্যাশিতভাবে সফল হইল। এই কাপালিক চরিত্র বাঙ্গলায় সম্পূর্ণ বাস্তবানুগত—ইহা এদেশের তান্ত্রিক সাধনার একটা নিখুঁত ছবি। কিন্তু ইহাতে উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিকতার, উদার ধর্ম্মপ্রাণতার সমাবেশ নাই।

চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈরাগী ও বাবাজির দল বঙ্কিম-সাহিত্যে একরূপ বাদ পড়িয়াছে বলিলেই হয়। কেবল "বিবিধ প্রবন্ধের" তিনটী ছোট নক্সায় গৌরদাস বাবাজির অপূর্ব্ব চরিত্রটী তাঁহার কথাবার্ত্তা ও কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়া এই অপবাদের আংশিক নিরাকরণ করিতেছে। বাবাজিতে মামুলী ধরণের কিছুই নাই। এটী একটী সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ছবি—সম্পূর্ণ গোড়ামি-বর্জ্জিত। সেইজন্য বঙ্কিম-চিত্রিত সন্ন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মাঝে ইহার উপযুক্ত স্থান। বাবাজি তর্কে পটু—রূপক বুঝাইতে সুদক্ষ। তাঁহার সরস জবাব ও চতুর সমাধানগুলি মর্ম্ম স্পর্শ করে। বাবাজি চিত্তশুদ্ধিকেই ধর্ম্মের সার বুঝিয়াছেন। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে বাবাজি রমাবল্লভ বাবুকে বুঝাইতেছেন—"বৈকুণ্ঠ বাহিরে নাই, ভিতরে আছে—মনের ভিতরে। যখন ইহজগতে আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবে না—যখন সকলেই বৈরাগ্য, সকলেই সমান সুখ, তুমি তখন বৈকুণ্ঠে। কুণ্ঠাশূন্য নির্ব্বিকার যে চিত্ত—বিষ্ণু সেইখানে বাস করেন।" সেখানে লক্ষ্মী সরস্বতী তাঁহার পত্নী। "লক্ষ্মী অর্থে সৌন্দর্য্য। সরস্বতী জ্ঞান। বিষ্ণু সৎ, সরস্বতী চিৎ, আর লক্ষ্মী আনন্দ।" ব্যাখ্যাশেষে বৈষ্ণবদ্বেষী রমাবল্লভ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"অতএব রে মূর্খ! এই সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মকে প্রণাম কর।" হাতে হাতে বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি পূরিল। বাবু দ্বারবান্‌কে হুকুম দিলেন "মারো বদজাত্‌কো।" নবমী পূজার দিন চেলা হরিদাস বৈরাগী বাবাজির সন্ধান করিতে করিতে

দেখিল তিনি পূজা বাড়ীতে ভোজনে বসিয়া আছেন—দেখিল, বৈষ্ণব হইয়া শাক্তের প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছেন। ক্ষুধার বশে বাবাজীর এই উদারতা বৃদ্ধি দেখিয়া সে অসন্তুষ্ট—মর্ম্মাহত হইল। তখন বাবাজি তাহাকে শক্তিরহস্য বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন—"সংহারকারিতার আদর্শই রুদ্রের মূর্ত্তি। রুদ্রানী রুদ্রের শক্তি। কিন্তু বিষ্ণুই রুদ্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ তিনই এক—হিন্দুধর্ম্মে এক ঈশ্বর ভিন্ন তিন ঈশ্বর নাই।" শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" কথাবার্ত্তায় অন্যমনা হইয়া চেলা দেখে নাই, বাবাজি ইতিমধ্যে একরাশি ছাগমাংস উদরসাৎ করিয়া দ্বিতীয় তৈমুরলঙ্গের ন্যায় অস্থির স্তূপ সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দেখিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইল। তখন তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বাবাজি বলিতে লাগিলেন—"পদ্মপুরাণ খোল, দেখিবে যে মাংস দিয়া বিষ্ণুর ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে। অহিংসা যথার্থ বৈষ্ণব-কন্যা বটে—কিন্তু কুলত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ঘরে গিয়া জাত হারাইয়াছে। এখন বাবাজির উদারতার উৎস উন্মুক্ত হইয়াছে—কে তাহার রোধ করে? বাবাজি বলিতেছেন—"কল্পনা করিয়াছি আগামী বৎসর কছিমদ্দী সেখকে পরামর্শ দিয়া দুর্গোৎসব করাইব।" হিন্দু-মুসলমানে তাঁহার সমজ্ঞান—প্রহ্লাদের কথা উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—সমত্ব মারাধন অচ্যুতস্য। সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা। "এই সমদর্শিতা থাকিলে বিষ্ণু নাম জানুক আর না জানুক যথার্থ বৈষ্ণব হইল। যখন সর্ব্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তখন হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি ও বড় জাতি এরূপ ভেদ জ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদজ্ঞান করে সে বৈষ্ণব নহে।"

এই গৌরদাস বাবাজি কমলাকান্তেরই দোসর—তাহার পাশে দাঁড়াইবার উপযুক্ত। তফাৎ, কমলাকান্ত পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র—গৌরদাস বাবাজি হ্রস্বায়তন রেখাঙ্কন।

"দেবী চৌধুরাণী," "আনন্দমঠ" ও "সীতারামে" বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটী পূর্ণায়তন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিম-চিত্রিত সন্ন্যাসচিত্ররাজির ইহারাই সার—ভগবদ্গীতোপদিষ্ট নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুশীলনে এ সকল চরিত্রের মূল রহস্য। ইহাদের লইয়াই বঙ্কিম-সাহিত্যের তৃতীয় স্তর। ইহাদের মধ্যে দেবী চৌধুরাণী বা মহেন্দ্র-ভবানন্দ-জীবানন্দের সন্ন্যাস—নৈমিত্তিক—সাময়িক। এই সাময়িক সংসার পরিহারকে সন্ন্যাস অপেক্ষা বরং ব্রহ্মচর্য্য বলাই উচিত। 'কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেহ ও মনের সকল শক্তির যে সঞ্চয় ও কেন্দ্রীকরণ তাহা সংযম, তাহা যোগ—কর্ম্মী মাত্রেই তাহা অভ্যাস করিয়া থাকে। নিয়ন্ত্রিত হইলেও ইহাদের অন্তরে রিপুর তাড়না আছে—পাপপুণ্যের সংঘর্ষ আছে—ভাল-মন্দের বিপরীত স্রোতে ইতস্ততঃ চিত্তবিক্ষেপ আছে। ইহাদিগকে তৃতীয় স্তর অপেক্ষা প্রথম স্তরে স্থান দেওয়াই, বোধ হয়, অধিকতর সঙ্গত।

ভবানী পাঠক ডাকাইতের সর্দ্দার অথচ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ইঁহার নিকট প্রফুল্ল গুরফে

দেবী চৌধুরাণীর সন্ন্যাস-শিক্ষা। পাঁচ বৎসর সকল শাস্ত্রের কিছু কিছু অভ্যাস করিয়া পরিশেষে যোগ, ব্যায়াম ও গীতাধ্যয়নে প্রফুল্লের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল। তখন কুলনারীর পরিবর্ত্তে দস্যুদলের রাণীর উদ্ভব হইল। দেবী চৌধুরাণী সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া ডাকাতি করিতে লাগিল। কিন্তু পরিণামে স্বামিসঙ্গের সোনার কাঠির পরশে তাহাকে পুনর্মূষিক হইতে হইল। "রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়" বলিয়া দেবী চৌধুরাণী পুনরায় অন্তঃপুর-চারিণী হইল। ইহাকে Romance বা রমন্যাসের সন্ন্যাসীর বেশী কি বলিব ?

আনন্দমঠের **মহেন্দ্র, ভবানন্দ, জীবানন্দ**ও এই পর্য্যায়ভুক্ত। জীবানন্দ-শান্তির আসিধার ব্রত রূপকথার সন্ন্যাস। পত্নীনাশের ধারণায় মহেন্দ্রের সন্তান ধর্ম্ম গ্রহণ ও পুনরায় স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ, কল্যাণীকে দেখিয়া ভবানন্দের চিত্তবিকার ও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে মৃত্যুপণে রণপ্রবেশ, শান্তির নবীনানন্দ স্বামীরূপে ছদ্মবেশ গ্রহণ—এ সকল কাল্পনিক সন্ন্যাসের দৃষ্টান্ত মাত্র।

তবে ভবানন্দ-জীবানন্দের পাশে **ধীরানন্দ, সত্যানন্দ**ও আছেন। সন্তান সেনার নেতা সত্যানন্দ দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক—হিন্দুরাজ্য স্থাপন তাহার জাগ্রতে ধ্যান, নিদ্রায় স্বপন—সেই ধ্যানে পাগল হইয়া সত্যানন্দ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে—মৃত্যু পণ করিয়াছে। আধুনিক বাংলায় স্বদেশ সেবাব্রতী যে সকল নব্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দেখা যায় আনন্দমঠের সত্যানন্দ তাহাদের মূল ও আদর্শ। সন্তান দ্বিবিধ—দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত তাহারা সংসারী বা ভিখারী—যুদ্ধের সময় উপস্থিত হয়—লুঠের ভাগ বা অন্য পুরস্কার লইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত তাহারা সর্ব্বত্যাগী—তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। ঠিক যেন বৌদ্ধসঙ্ঘের ভিতর উপাসক ও ভিক্ষুর বিভাগ। সন্তানেরা বৈষ্ণব—অথচ শত্রুরক্তপাতে অপরাঙ্মুখ। সত্যানন্দ বলিতেছেন—"চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন তিনি অনন্ত শক্তিময়। সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। বিষ্ণুই সংসারের পালন কর্ত্তা। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন।" দৈব নির্ব্বন্ধে সত্যানন্দের সাধনা সিদ্ধ হইল না। হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইল না—অরাজক দেশে শান্তি স্থাপিত হইল মাত্র। মাতৃভক্ত সত্যানন্দকে যুদ্ধে বিরত করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য মহাপুরুষ আসিয়া হিমালয় শিখরে মাতৃমন্দিরে লইয়া গেলেন—বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল। Theosophistগণ বিশ্বাস করেন—হিমালয়ের তুষারাবৃত কোন নিভৃত শিখরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগদ্‌বরেণ্য মহাত্মাগণ যুগেযুগে বিশ্বের আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিধান করিতেছেন—মানব ইতিহাসের গতি নিয়মিত করিতেছেন। মনে হয় বঙ্কিমের মানসপুত্র সত্যানন্দও এই সঙ্ঘমধ্যে স্থান পাইয়াছে, এবং তুষারাদ্রির সেই অলক্ষ্য শিখরদেশ হইতে বিভ্রান্ত ভারতবাসীর চিত্তে সন্তানগণের

আরাধিতা, অবিরাম "বন্দে মাতরং" মন্ত্রে অভিষ্টুতা সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তির উদ্বোধ করাইতেছে।

"সীতারামের" নায়িকা শ্রী ও তাহার আদর্শ জয়ন্তী এই তৃতীয় স্তরের সন্ন্যাসের চরম নিদর্শন। বিবাহের মাসেক পরে একজন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ শ্রীর নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার ও বিচার করিয়া বলিল, সে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবে। "স্ত্রীলোকের প্রিয় বলিলে স্বামীকেই বুঝায়।" সুতরাং পতিবধ কোষ্ঠীর ফল জানিয়া পূর্ণ যৌবন ও অটুট সৌন্দর্য্য লইয়া শ্রী গৃহত্যাগিনী হইল। যেখানে অতিদূরে উদয়গিরি ও ললিতগিরির বিশাল নীল কলেবর আকাশ প্রান্তে শয়ান দেখা যায়, সেই স্থলে শ্রীক্ষেত্রের পথে বৈতরণীর তীরে ভগ্নহৃদয়া শ্রী'র সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ। পথে দুই সন্ন্যাসিনীতে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। শ্রীর মুখ হইতে তাহার অপরিমেয় অপূর্ণ পতিপ্রেমের কাহিনী উৎসারিত হইল। শ্রী বলিল—"ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া কখনও মনে হয় নাই যে ঠাকুর প্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। এহেন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। বলিতে বলিতে শ্রীর চক্ষু উচ্ছসিত অশ্রুধারায় ভাসিয়া গেল।" "জয়ন্তীরও চক্ষু ছল ছল করিল। এমন সন্ন্যাসিনী কি সন্ন্যাসিনী?" জয়ন্তী উপদেশ দিলেন "ঈশ্বর চিন্তাই মনঃস্থির করিবার উপায়।" শ্রী জয়ন্তীর শিষ্যা হইল—ভৈরবীবেশ গ্রহণ করিল। তখন স্বামীর প্রতি সেই অগাধ অতৃপ্ত ভালবাসা মরুভূমিতে ফল্গু-স্রোতের মত শুখাইয়া লুপ্ত হইয়া গেল। মনোভাব একেবারে উল্টাইয়া গেল। শ্রী বলিতেছে—"কে কাহাকে মারে বহিন? মারিবার কর্ত্তা একজন—যে মরিবে তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন।" যে শ্রীকে ফিরাইবার জন্য সীতারাম ডাকাডাকি করিয়াছিলেন—সে শ্রী আর নাই—জয়ন্তীর হাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। জয়ন্তীর নিকট দীক্ষা পাইয়া শ্রী আপন জীবনযৌবন, সুখদুঃখ লজ্জাভয় কৃষ্ণপাদপদ্মে উৎসর্গ করিল। পতিপ্রেমের কুসুম পেলবমূর্ত্তি উদাসিনী ভৈরবীর বজ্রকঠিন আকার ধারণ করিল। ইহার পর হইতে শ্রী ও জয়ন্তী সীতারামের ভাগ্যাকাশে দুর্গ্রহযুগলের ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল; তাহার রাজ্যসম্পদ্, সুখৈশ্বর্য্য, লোকবল, অমাত্যবান্ধব নাশের নিমিত্ত হইল। সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সীতারাম চিত্তবিশ্রামে দিবারাত্র আবদ্ধ হইলেন। ইন্দ্রিয়বশ্য রাজা আত্মহারা হইয়া ভৈরবীর নিকট প্রেম প্রতিদানের আশায় কি ভাবে একে একে সর্ব্বস্ব খোয়াইলেন—বঙ্কিমচন্দ্রের নিপুণ তুলিকায় তাহারই করুণ, মর্ম্মস্পর্শী চিত্র—সীতারাম। ভারতের চিরবিশ্রুত, সর্ব্বংসহ, সর্ব্বত্যাগী, নিরহঙ্কার, পরহিতব্রত বৈরাগ্যের আদর্শ জয়ন্তী ও শ্রীতে যেমন নিখুঁত ভাবে ফুটিয়াছে—বঙ্কিম-সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই—অন্যত্র আছে কিনা জানিনা। শ্রীর বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন—"শ্রীর প্রকৃতি মূর্ত্তিমতী শোভা। চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দ্রিয় ক্ষোভশূন্য, চিন্তাশূন্য, বাসনাশূন্য, ভক্তিময়, প্রীতিময়, দয়াময়, কাযেই সৌন্দর্য্যের বিকার নাই—কোথাও এতটুকু দুঃখের রেখা নাই।" এই সৌন্দর্য্যে

বিভ্রান্ত হইয়া লালসার জ্বালায় সীতারাম যখন প্রায় কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইলেন—শ্রী তখন ভৈরবীধর্ম্মভ্রংশের আশঙ্কায় অন্তর্হিত হইল। জয়ন্তীই সকল অনর্থের মূল ভাবিয়া রাজা বিবস্ত্র করিয়া তাহাকে বেত্রাঘাতের দণ্ডবিধান করিলেন। এই বেত্রাঘাত দৃশ্যই জয়ন্তীর ভৈরবী ধর্ম্মের অগ্নিপরীক্ষা। এই দৃশ্যে ফরাসীদেশের Joan of Arcএর কথা মনে পড়ে। শ্রীর শেষ পরীক্ষা এখনও বাকী—রাজার উদ্ধারের জন্য তাহাকে বিরক্ত হৃদয়ের সকল বাধা দমন করিয়া নিষ্কামভাবে স্বামিসেবা করিতে হইবে। অনাসক্ত, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত অনুষ্ঠানই যে প্রকৃত কর্ম্মত্যাগ তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। ইহাতেও সম্মত হইয়া শ্রী আপনাকে জয়ন্তীর উপযুক্ত শিষ্যা প্রমাণিত করিল। অবশেষে স্বামিহস্তে যখন ভ্রাতার মৃত্যু হইল—প্রিয়প্রাণহন্ত্রীত্বযোগ সত্য হইল, তখন এই কঠোর সন্ন্যাসিনী হৃদয়ও বিচলিত না হইয়া পারিলনা। ক্ষণেকের জন্য সহোদরের প্রতি দুস্ত্যজ মমতাবশে ভৈরবীর চোখে জল আসিল। ইহাতে সন্ন্যাস বিভ্রংশ হইল বলিতে হয় বলুন—বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু শ্রী'র কথায় সায় দিয়া বলিতেছেন—"ইহাতে সন্ন্যাস ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়না। সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে।"

এই শ্রী-জয়ন্তী ঘটিত আখ্যায়িকার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটী বিবৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "অনুশীলনে" লিখিতেছেন—"পূর্ব্বগামী হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ—কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস-গ্রহণ। গীতার উপদেশ —কর্ম্ম এমন চিত্তে কর যে তাহাতেই সন্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস— সন্ন্যাসে আবার বেশী কি আছে? বেশীর মধ্যে আছে, নিষ্প্রয়োজনীয় দুঃখ।" "ইংরাজেরা যাহাকে Asceticism বলেন, বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না। এই পরম পবিত্র ধর্ম্মে সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে।" "এক নিষ্কামবাদের দ্বারা সমুদয় মনুষ্যজীবন শাসিত এবং নীতি ও ধর্ম্মের সকল উচ্চতত্ত্ব একতাপ্রাপ্ত হইয়া পবিত্র হইতেছে। কাম্যকর্ম্মের ত্যাগই সন্ন্যাস। নিষ্কাম কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম কর্ম্ম একত্র হইবে, সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সন্ন্যাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা এবং মতবাদের মধ্যে একটী সুন্দর সঙ্গতি আছে। তাঁহার লেখনী যে সকল বিরক্ত বা অর্দ্ধবিরক্ত নরনারীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, তাহারা সাংসারিক পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করিতে পারে নাই। প্রকারান্তরে সংসারের কল্যাণ, দেশের সেবা, লোক-স্থিতির আনুকূল্যেই তাহারা ব্যাপৃত আছে। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র যে বাঙ্গলার প্রতিনিধি এবং মর্ম্মোদ্ঘাটক তাহাই প্রমাণিত হয়। চলিত কথায় বাঙ্গালী "ঘরমুখো" জাতি। এক হিসাবে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ইহাই প্রধান গৌরবের বস্তু। স্নেহে ও স্বার্থত্যাগে, সেবা ও সহানুভূতিতে, ভক্তি এবং

ভালবাসায়, কারুণ্যে এবং কোমলতায়, পবিত্রতা এবং মাধুর্য্যে সরস ও সজীব হইয়া যে গার্হস্থ্য-জীবন বাহ্য সকল দুঃখ দৈন্য অভাব ভুলাইয়া বাঙ্গালীকে আপন পৈতৃক ভিটায় চিরদিন আকৃষ্ট ও আবদ্ধ রাখিয়াছে সেই গার্হস্থ্য জীবনের ছবি নানা বর্ণে আঁকিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যখন বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের আলেখ্য রচনায় উদ্যত হইলেন তখনও তাঁহার তুলিকা হইতে সেই সকল মনোরম বর্ণচ্ছটা মুছিয়া যায় নাই। যে গৈরিক বর্ণে তিনি তাঁহার কল্পিত সন্ন্যাসীগণের চীর বাস রঞ্জিত করিয়াছেন তাহাতে মমতার, স্নেহ ভালবাসার রক্ত-আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশ আর্য্যসভ্যতার প্রত্যন্তভাগ, সত্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই গার্হস্থ্য পক্ষপাত একেবারে সনাতন আর্য্য সভ্যতার বিরুদ্ধ নহে। প্রাচীনতম সংহিতাগুলি হইতে একাধিক বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে চতুরাশ্রমের মধ্যে দ্বিতীয়টীই আর্য্যঋষিগণ কর্ত্তৃক লোক-স্থিতির ভিত্তি এবং আশ্রয় বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছে। এমনকি, আধুনিক কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে চতুর্থ আশ্রম বা সন্ন্যাস আর্য্যগণ ভারতের আদিম যাযাবর ভিক্ষুদলের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের প্রবর্ত্তিত জীবনযাত্রাপ্রণালীর মধ্যে স্থান দিয়াছেন। সে যাহা হউক, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রৌত সন্ন্যাসের প্রকৃত মহিমা ও গৌরবে অনুপ্রাণিত হন নাই। পৃথিবীর অন্যত্র অতুলনীয় যে তীব্র বৈরাগ্য উপনিষদ্-গ্রথিত পরাবিদ্যার জ্বলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত—তত্ত্ববিদ্যার যে বিপুল সৌধ শুক সনন্দ শঙ্কর চৈতন্য হইতে সেদিনের বিশুদ্ধানন্দ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি যুগে যুগে আবির্ভূত মহাপুরুষ শ্রেণীকে স্ফটিকস্তম্ভস্বরূপ আশ্রয় করিয়া উচ্চশির হইয়া ভারতের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য দিতেছে সে তীব্র বৈরাগ্য ও তত্ত্ববিদ্যা যথাযথভাবে তাঁহার রচনায় চিত্রিত হয় নাই। শ্রুতিস্মৃতিমূলক প্রব্রজ্যা ও সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য দেশকালপরিচ্ছিন্ন সসীম জীব হইয়াও মানুষ যাহাতে ভূমার সহিত, অসীম বিশ্বাত্মার সহিত আপনার সাযুজ্য উপলব্ধি করিতে পারে—অন্তরের ক্ষুধা ও রসবোধকে মৃত্যুর এপারেই মিটাইতে পারে এবং ফলে হর্ষ শোক দ্বন্দ্ব মোহের অতীত হইয়া ব্যক্তিগত জীবনকে শান্ত ও সার্থক করিতে পারে। এই আদর্শের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকল্যাণনিষ্ঠা নিহিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সমর্থন না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে পরোপকার, সমাজ ও দেশের সেবাকে তদপেক্ষা উচ্চস্থান দিয়াছেন। তাঁহার "অনুশীলন তত্ত্ব", "কৃষ্ণচরিত্র" এবং গীতা ব্যাখ্যার মধ্যে স্পষ্টভাবে হিতবাদ বা utility জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে। "বিবিধ প্রবন্ধে"র একস্থলে তিনি লিখিতেছেন—

"পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই। যখন আপনি যেমন, পর তেমন এই কথা বুঝিবে, যখন আপনার সুখ যেমন খুঁজিব, পরের সুখও তেমনি খুঁজিব, যখন আপনা হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনা অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, যখন ক্রমশঃ আপনাকে

ভুলিয়া পরকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতে পারিব, যখন পরেতে আপনাকে নিমজ্জিত করিতে পারিব, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি হইবে। তাহা না হইলে ডোর কৌপীন ধারণ করিয়া সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া ফিরিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে, রাজসিংহাসনে হীরক মণ্ডিত হইয়া বসিয়াও যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রজার দুঃখ আপনার মত ভাবে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। যে ঋষি বিশ্বামিত্রকে একটী গাভী দান করিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। যে রাজা অঙ্কগত কপোতের বিনিময়ে আপনার মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল।"

সন্ন্যাস আশ্রম সম্বন্ধে আধুনিক বঙ্গদেশ তাঁহার এই উক্তিকেই সার সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাই বর্ত্তমান বাঙ্গলায় সন্ন্যাসের লক্ষ্য—নরনারায়ণের সেবা—শুষ্ক বৈরাগ্য বা ভাবোন্মাদ নহে। জ্ঞান, কর্ম্ম বা ভক্তির প্রাধান্য অনুসারে সন্ন্যাস ত্রিবিধ আকার ধারণ করে। শুদ্ধ জ্ঞান বা শুদ্ধ ভক্তিমূলক সন্ন্যাসের পূর্ণায়তন চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নাই। কর্ম্মকেই মূল করিয়া তিনি তাহার সহিত কোথাও জ্ঞান, কোথাও বা ভক্তির সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থা শুধু যে তাঁহার অসাধারণ মনুষ্য-চরিত্রজ্ঞানের পরিচায়ক তাহা নহে—অধিকন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্যের সহিতও সঙ্গত। কর্ম্মবিহীন মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই ভ্রষ্ট সন্ন্যাসের প্রসূতি বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। যে জীবনযাত্রা-প্রণালীতে জীবিকা অনায়াসলভ্য—উপজীব্য শুষ্ক জ্ঞান চর্চ্চা, অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মচিন্তা বা নিরন্তর মধুর রসাস্বাদ—তাহাতে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ সর্ব্বত্র ঘটে না চিত্তবিকার অনেক স্থলে ঘটিয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—

> কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
> ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—হিন্দু পুরাণেতিহাসে ঋষিদিগের সম্বন্ধে ভূরি ভূরি রহস্যোপন্যাস আছে। এই সকল উপন্যাস হইতে আমরা এই একটী চমৎকার শিক্ষাপ্রাপ্ত হই যে যোগে বা তপস্যায় ইন্দ্রিয় সংযম পাওয়া যায় না। কার্য্যক্ষেত্রেই, সংসারধর্ম্মেই ইন্দ্রিয় সংযমলাভ করা যায়। প্রত্যহ অরণ্যে বাস করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপাদান সকল হইতে দূরে থাকিয়া সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া মনে করা যায় বটে যে আমি ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়াছি। কিন্তু যে মৃৎপাত্র অগ্নি সংস্কৃত হয় নাই, সে যেমন স্পর্শমাত্রে টিকে না, এই ইন্দ্রিয় সংযমও তেমনি লোভের স্পর্শ মাত্রে টিকে না। যে প্রত্যহ ইন্দ্রিয় চরিতার্থের উপযোগী উপাদান সমূহের সংসর্গে আসিয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী, কখন বিজিত হইয়াছে, সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয়

করিতে পারিয়াছে। বিশ্বামিত্র বা পরাশর ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারে নাই, ভীষ্ম বা লক্ষ্মণ পারিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে, কর্ম্ম-সন্ন্যাসে, সেবাব্রত সংশ্লিষ্ট বৈরাগ্যে সন্ন্যাস-জীবনের এই চিরন্তন সমস্যার সমাধান হইবে কিনা কে বলিতে পারে? তবে কর্ম্মহীন বৈরাগ্য অপেক্ষা ইহাতে যে চিত্ত বিভ্রংশের সম্ভাবনা অল্প তাহা অনুমান করা যায়। এই কারণেই বাঙ্গলার নব্য সন্ন্যাস সম্প্রদায়গুলি রোগীর চিকিৎসা, দুঃস্থের সান্ত্বনা, বিপন্নের সাহায্যকে আপনাদিগের নিত্য কর্ত্তব্য মধ্যে মুখ্য স্থান দিয়াছে। রঘুনন্দন ও শূলপানির বিধানের তৌলদণ্ডে নব্যধরণের এই সন্ন্যাস সাধনার মূল্য কিরূপ নির্ণীত হইবে জানি না কিম্বা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার নিকষে পরীক্ষা করিলে এ সকলে কত পরিমাণ খাদ ও কত পরিমাণ খাঁটী সোণা মিলিবে—তাহাও যাচাই করিবার এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইতেছে না। এ সকল ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণ যথাসময়ে নিজ কর্ত্তব্য বিবেচনায় সম্পাদন করিবেন।*

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য

লাভ ক্ষতি

তুমি দাঁড়াইবে আমার দুয়ারে
করুণা পূরিত আঁখি—
আপনা হারা'য়ে আমি নিরখিব
কপাটের আড়ে থাকি',—
নয়নের জলে ধোয়াইব তব
চরণ-ধূলির রেখা
বিবেচনা করি' বল প্রিয়তম!
লাভ কি আমারি একা?

হৃদয় কমল শতদল মেলি'
ছড়াইয়া সৌরভ—
পথ চাহে তাহে কবে পরশিবে
চরণ পদ্ম তব।
সৌরভ-ভার শোভা যত তার
ঝরে' পড়ে' যায় যদি,—
বিলম্বে তব মরে যদি ফুল
একা কি আমারি ক্ষতি?

শ্রীসুশীলাসুন্দরী দেবী

* কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলনীর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পঠিত।

লালন ফকীর

লালনের জীবন কথা জানা সহজ না হইলেও অসম্ভব নয়। কারণ এখনও বহু বৃদ্ধ জীবিত আছেন যাঁহারা লালনের সম্বন্ধে অনেক খবরই রাখেন।

এ দেশের অন্যান্য সাধুপুরুষদিগের জীবন অপেক্ষা লালনের জীবন-কথা জানা আরও সহজ এই জন্য যে, তাঁহাদের জীবনে যেমন নানারূপ অসম্ভব অলৌকিক কাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ লালনের জীবন-কথা তেমন নহে। তাঁর শিষ্যেরা যদিও তাঁহাকে খুব ভক্তি করে কিন্তু তাঁহাকে খোদা বলিয়া জানে না। তাই লালনের জন্মস্থান বাপ মা বাড়ী ঘর তাহাদের ভক্তির উচ্ছ্বাসে দ্বিতীয় নবদ্বীপ হইয়া উঠে নাই। এমন কি লালন কোন্ জাতির ছেলে,—কোথায় তার বাড়ী ঘর—ইহা ও তাহারা ভাল করিয়া বলিতে পারে না। তাহারা পাইয়াছে লালনের অসংখ্য গান—সুখে দুঃখে একতারার সুরে সুরে সুর মিশাইয়া তাই লইয়া তাহারা সারাটী জীবন কাটাইয়া দেয়।

লালনের মৃত্যুর পর কুমারখালির হিতকরী পত্রিকায় লালনের সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে লালনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এইরূপ :—

"সাধারণে প্রকাশ লালন ফকীর জাতিতে কায়স্থ। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইহাদের জাতি। ইহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থ গমন কালে পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। পথে মুমূর্ষু অবস্থায় একটী মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবন লাভ করিয়া ফকির হন। ইঁহার মুখে বসন্তের দাগ বিদ্যমান ছিল।"

সম্প্রতি গত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে বাবু বসন্তকুমার পাল মহোদয় তাঁর সম্বন্ধে যে সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতেও এই বৃত্তান্তের অনুসরণ করা হইয়াছে। এমন কি তিনি লালনের পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা কিন্তু লালনের গ্রামের কাহারও কাছে এরূপ বৃত্তান্ত শুনি নাই। তাহার বাড়ীর পূর্ব্ব-পার্শ্বের এক বৃদ্ধ তাঁতীর কাছে আমরা লালনের জন্ম বিবরণ এইরূপ শুনিয়াছি,—

তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলে বেলায় তাঁর মা তাঁকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ করিতে নবদ্বীপে যান। সেখানে লালন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলে অভাগিনী জননী তাঁকে নদীর ধারে ফেলিয়া আসেন। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় যখন শিশুর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন প্রভাত হইয়াছে। একটী মুসলমান মেয়ে জল আনিতে নদীতে যাইয়া অতটুকু ছেলেকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে তুলিয়া বাড়ীতে লইয়া আসেন। তাঁহারই সেবায় যত্নে এই শিশু দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠেন। উক্ত স্ত্রীলোকটীর গুরু ছিলেন যশোরের উলুবেড়িয়া গ্রামের সীরাজ সাঁই। শিশুটী একটু বড় হইলে সীরাজ সাঁই তাহাকে চাহিয়া

লন এবং তাঁহারই শিক্ষার গুণে লালনের লেখা-পড়া ও ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়; এবং কালক্রমে লালন মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

বড় হইয়া তিনি নাকি তাঁর ব্রাহ্মণ মায়ের সাথে দেখা করেন। সমাজের ভয়ে দুঃখিনী মাতা চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাঁকে বলেন, "বাছা তুই যখন মুসলমান হয়েছিস তখন সেই খানেই থাক। কেবল মাঝে মাঝে আমাকে দেখা দিস।" সেই মাতা যতদিন জীবিত ছিলেন লালন তাঁহাকে মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিতেন। লালনের শিষ্য ভোলাই সাঁর নিকট আমরা দুইটী ঘটনাই বলিলে, তিনি বলিলেন, "অনেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে বটে কিন্তু কেউ প্রকৃত ঘটনা জানে না।" যাহা হউক আর কিছুদিন পরে লালন সম্বন্ধে কিছু জানা বিশেষ কষ্টকর হইবে জানিয়াই আমরা উপরোক্ত ঘটনাটী বর্ণনা করিলাম। কারণ, যেসব বৃদ্ধ আজও লালনের সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন তাঁহারা বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিবেন না। এই ঘটনাটী বিশ্বাস করিবার একটী কারণ আছে এই যে, লালনের সমস্ত গান পড়িয়া দেখিলে তাহাতে হিন্দু প্রভাব হইতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব বেশী পাওয়া যায়। সম্প্রতি আমরা লালনের স্বহস্তলিখিত একখানা হাকিমী বই এবং মুসলমানী দোয়া কালাম লেখা একখানা খাতা পাইয়াছি। তাহা পড়িয়া মনে হয় লালন ফারসী কিম্বা আরবী জানিতেন। তার কোন কোন গানে কোরাণ সরীফের অনেক আয়াতের অংশ বিশেষ পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় তিনি কোরাণ সরীফ পড়িতে পারিতেন। এখন লালন যদি পরিণত বয়সে মুসলমান হইয়া থাকেন তবে, যে সব অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে তিনি থাকিতেন, তাহাতে অত বয়সে মুসলমান শাস্ত্র এতটা যে তিনি কিরূপে আয়ত্ত করিয়া লইলেন সেটা ভাবিবার বিষয়। আর প্রবাসীর লেখক মহোদয় বলিয়াছেন, লালনের হিন্দু স্ত্রী তাঁহার অনুগামিনী হইতে নিতান্ত উৎসুক ছিলেন, কিন্তু আত্মীয় স্বজন তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেন নাই। আমরা লালনের শিষ্য ভোলাইর নিকট শুনিয়াছি লালন প্রসিদ্ধ যোনকার বংশে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব ধর্ম্মের স্ত্রীর কথা তাঁরা কিছুই জানেন না।

লালন যখন তাঁর গানে ও জীবনের মহিমায় চারি দিকে বেশ নাম করিয়া তুলিলেন তখন কুষ্টিয়ার সিঁউড়ে গ্রামের অনেকেই তাঁর ভক্ত হইয়া পড়িল। একবার এখানে আসিলে এখানকার তাঁতিরা তাঁকে গ্রামের মধ্যে একখানা ছোট ঘর বাঁধিয়া দিল এবং সেই খানেই তিনি বাস করিতে লাগিলেন। পরে যশোরের উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের জমীর খোনকারের কন্যা বিশোকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সিঁউড়ে গ্রামের একটী বৃদ্ধের কাছে শুনিয়াছি লালনের দুই স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ভোলাই সাঁর মতে লালনের এক স্ত্রী এবং লালনের কবরের পাশেই তাঁর কবর দেওয়া হইয়াছে। বিশোকা অতি বিনয়ী ছিলেন এবং লালনের ভক্তদের তিনি অতি যত্ন করিতেন।

এই সময়ে বহুলোক টাকা পয়সা ও ফলমূল আনিয়া তাঁহাকে উপহার দিত। বৎসরে ফাল্গুনমাসে তিনি একটি ভাণ্ডরা করিতেন। পাঁচ সাত হাজার লোক এখানে আসিয়া আহার করিত এবং গান গাহিত। এখানে এই ভাণ্ডারার একটি বিবরণ দিই। ইহার আর এক নাম সাধুসেবা। আজও বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বিশেষ করিয়া নদীয়া যশোর ও পাবনার অংশ বিশেষে এই সাধুসেবা হয়। ইহাতে প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের ফকীরেরা নিমন্ত্রিত হন। সাধারণতঃ ফকীর ছাড়া আর কারও বাড়ীতে সাধুসেবা হয় না, তবে কোন ফকীরের শিষ্য হইলে কেহ সাধুসেবা করিতে পারেন।

সাধারণতঃ আম কাঠালের বাগানের ভিতর একটি বিস্তীর্ণ স্থান পরিষ্কার করা হয়। তাহাতে সারি বাঁধিয়া ছোট ছোট বিছানা করিয়া দেওয়া হয়। মাদুরের উপর কাঁথা ও বালিস এই বিছানার সরঞ্জাম। ইহাকে 'গদী' কহে। এই গদীর উপরে সাধুরা তাঁহাদের শিষ্যগণের সহিত বসিয়া ধর্ম্মালাপ ও গান গাহিয়া থাকেন। সাধারণতঃ বৈকাল বেলায়ই সাধুসেবা আরম্ভ হয়। এক এক দল সাধু ভিন্ন গ্রাম হইতে সভায় আসিয়া সমস্বরে "আলেক্" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ, আল্লা এক। তারপর তাঁহারা যোগ্যতানুসারে সকলকে প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করেন। সন্ধ্যা বেলা 'চাইলপাণী' খাইয়া সাধুরা গান করিতে আরম্ভ করেন। যদিও বিভিন্ন দলে বিভিন্ন বিভিন্ন গান হইয়া থাকে কিন্তু সকল গানের ভিতরই একটা ধারাবাহিকতা আছে। এক ভাবের গানই সকলকে গাহিতে হয়। যাঁহার গান আর সকলের গানের সহিত মিলিবে না তাঁহাকে আর গাহিতে দেওয়া হয় না। এই সব গানের মধ্যে সময় সময় পাল্লাও লাগিয়া যায়। আজকাল কুষ্ঠিয়া জেলায় পঞ্জুসা'র শিষ্যদের সহিত লালনের শিষ্যদের প্রায়ই পাল্লা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ইহারা স্ব স্ব গুরুর গানই গাহিয়া থাকে। আর ইহাদের গানগুলি এরূপ ভাবে তৈরী যে একজনের গান দিয়া আরেকজনের প্রত্যেকটি গানের উত্তর দেওয়া যায়। এইরূপ গান গাহিতে গাহিতে যখন প্রায় রাত্র দুইটা বাজে তখন একটি লোকে 'আলেক্' এই শব্দ উচ্চারণ করে, আর সমস্ত গান বাদ্যযন্ত্রের মত থামিয়া যায়। তখন ফকীরেরা আহার করিয়া আপনা-আপন গদীতে ঘুমাইয়া থাকে।

পরদিন সকালে গোষ্ঠ গান আরম্ভ হয়। তারপর সকলে বাল্যভোজন সমাপ্ত করিয়া গান আরম্ভ করে। মধ্যাহ্ন আহারের পর ফকীরেরা যোগ্যতা অনুসারে কিছু কিছু ভিক্ষা পায়।

লালন যে সব সাধুসেবা করিতেন তাহাতে তখনকার দিনেও তাঁর তিন চার শত টাকা ব্যয় হইত।

গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে সবিশেষ ভক্তি করিত। তাদের সুখে দুঃখে তিনি চির সঙ্গী ছিলেন। তিন-চার খানা গ্রামের মধ্যে কারও অসুখ হইলে তিনি ঔষধ দিয়া এবং মন্ত্র

প্রয়োগ করিয়া তাহার উপশম করিতেন। এইজন্যই বুঝি তিনি সার-কৌমুদী বলিয়া একখানা কবিরাজী সংগ্রহ-পুস্তক লিখিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি গ্রামের লোকদের তাবিজ ও কবচ দিতেন। লালনের স্বহস্তে লেখা একটুকরা কাগজের একটী মাদুলী আমরা পাইয়াছি। তাঁর সচ্চরিত্র ও নম্র ব্যবহার কি ধনী কি নির্ধন সকলকেই আকর্ষণ করিত। তিনি জীবনে অতি সংযমী ছিলেন। যদিও তিনি আশ্রমে সস্ত্রীক বাস করিতেন তথাপি স্বামী স্ত্রীতে কোনওরূপ দৈহিক সম্বন্ধ ছিলনা বলিয়া শুনা যায়।

"আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন। সম্প্রদায়ের মতানুসারে তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই।"—হিতকরী

শিষ্যদিগকে তিনি খুব ভালবাসিতেন। তাঁরাও তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানারূপ সেবার কার্য্যদ্বারা তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার দুইটী প্রকাণ্ড ঘোড়া ছিল। লালন তাহাতে চড়িয়া নানাস্থানে বেড়াইতেন। তাঁহার শিষ্য ভোলাইসার নিকট শুনিয়াছি তাহারা পালাক্রমে এই ঘোড়ার ঘাস কাটিতেন। লালনের শিষ্যদের সম্বন্ধে হিতকরী বলিতেছেন,—

"আখড়ায় ১৫।১৬ জনের বেশী শিষ্য নাই। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। অন্যান্য শিষ্যদেরও তিনি কম ভাল-বাসিতেন না। অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার বিশেষ কোন তারতম্য থাকা সহজে প্রতীয়মান হইত না। লালনের এইরূপ ভালবাসা পাইয়া ও সদ্‌গুরুর শিক্ষারগুণে শিষ্যেরাও প্রকৃত সত্যকার ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন।"

সেই সময়ের বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ অশ্লীলতা ও দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু লালনের জীবনের যে প্রভাব তাঁর শিষ্যদিগের উপর পড়িয়াছিল তাহারই মহিমায় তাহারা সেই যুগের সমস্ত পাপকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এসম্বন্ধে হিতকরী বলিলেন,—

"এই সম্প্রদায়ে (লালনের) এতাদৃশ ব্যাভিচার নাই। পরদার ইহাদের পক্ষে মহা পাপ ......বাউল সাধু সেবা ও লালনের মতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে কোন শ্রেণীতে একটী গুহ্য ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে লালনের দলে ইহাই প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সন্তান জননের পথ একেবারে রুদ্ধ।"

লালনের শিষ্যদের সম্বন্ধে এত বড় সার্টিফিকেট এখনও প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে যদিও সন্দেহ আছে তবু তার শিষ্য ভোলাই সাকে দেখিয়া ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। তাঁর সৎস্বভাবের এবং সুব্যবহারের প্রশংসা সকল গ্রামের লোকই করিয়া থাকে। লালনের শিষ্য ৺শীতলসার একটী পুত্র আছে। এই ছেলেটীকে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে যে আদর করেন তাহা দেখিয়া বুক ভরিয়া যায়। লালনের শিষ্যদের যে সন্তান হইত না একথাটা হিতকরী

সম্ভবতঃ সত্য বলেন নাই। কারণ হিতকরীর মতে লালনের ৪৮৫ হাজার শিষ্য ছিল। এতগুলি লোকের অনেকে বিবাহিত থাকা সত্ত্বেও কাহারও সন্তান হয় নাই—এ কথাটি একেবারে অসম্ভব। আর লালনের বর্ত্তমান প্রধান শিষ্য ভোলাইএর পিতামাতা লালনের শিষ্য ছিলেন।

লালনের ধর্ম্মমত সম্বন্ধ হিতকরী বলেন—"বাস্তবিক ধর্ম্ম সাধনে অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্ম্মের সার তত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন ফকীর নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। অথচ সকল ধর্ম্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমান-দিগের সহিত তাঁহার আহার ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত। বৈষ্ণবধর্ম্মের মত পোষণ করিতেন বলিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই। কারণ ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন।"

লালনকে যেমন ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই তেমনি হিন্দু কিম্বা মুসলমান বলিবারও উপায় নাই। কারণ কোন ধর্ম্মমতকেই তিনি একেবারে গ্রহণ করেন নাই। আবার কোন ধর্ম্মমতকেই তিনি একেবারে বর্জ্জন করেন নাই। বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণের লীলার অনেক গান তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

"বলরে বলাই তোদের ধারণ কেমন হারে
তোরা ঈশ্বর বলিস যারে কান্ধে চড়িস তারে
বল কোন বিচারে?"

ব্রজরাখালের এই সহজ সুন্দর সারল্যে তিনি বিভোর হইয়া গিয়াছেন। আজও পল্লীরাখালেরা গোধূলীলগ্নে গোখুর ধূলায় স্নান করিতে করিতে আকাবাঁকা গ্রাম্যপথে গরুর গলার ঘণ্টা বাজার তালে তালে গাহিয়া যায়

আমি পথের পদ চিহ্ন পাই।
কোন বনে গেলিরে কানাই? ও তুই দাঁড়ারে।—
তোর মা দুখিনী কেন্দে ছাড়ে হাঁই
দিবসে অন্ধকার হৈল কানাই ঘরে নাই
ও তুই দাড়ারে।—

এগুলি শুনিয়া এখনও অনেক বৈষ্ণবের চোখে জল আসে। কিন্তু ধর্ম্মের ঔদার্য্যের যে স্পর্শ তিনি পাইয়াছিলেন আপন জীবনে তাহার প্রভাব তাঁকে ব্রজের ধুলায়ই আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। সেখানেও তিনি সেই বাঁধনহারা সীমাহারা অনাদি অনন্ত ব্রহ্মের সন্ধান করিতে যাইয়া গাহিয়াছেন—

অনাদি আদি শ্রীকৃষ্ণ নিধি
তার কি আছে কভু গোষ্ঠ লীলা
ব্রহ্মরূপে সে অটলে বসে
লীলাকারী তারই অংশ কলা
সত্য সত্যশরণ বেদাগমে কয়
চিদানন্দরূপ পূর্ণ ব্রহ্মময়
জন্মমৃত্যু তার নাহি ভবের পরে
তবে সাঁই স্বয়ং পাই নন্দলালায়।

এই অসীম অনন্তকে তবে কেমন করিয়া পাইব? লালন সে পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

দরবেশের দেলদরিয়া অন্ধাই
অজান খবর সেহি জানতে পায়
ভজ দরবেশ পাবে উপদেশ
লাল বলে তার উজল হৃদ কমলা

এই 'উজল হৃদ্-কমলা' যাঁর তাঁকে গুরু করিয়া ভজনা করিলে সেই অনাদিকে পাওয়া যাইবে। এই গুরুকে ভজন করিতে যাইয়া লালন মুসলমান সাধনধারার 'পীর-ভক্তিকে' ছাড়াইয়া গিয়াছেন। এখানে আসিয়া বৈষ্ণব 'সহজিয়া' সম্প্রদায়ের গুরুবাদকে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই মানুষ ভজনের সাধন পদ্ধতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে মুসলমানী কেতাব হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া ইহাকে তিনি আরও লোকপ্রিয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি তাঁর যে আন্তরিক একটী টান ছিল তাহা বুঝা যায়। কারণ নিজের ধর্ম্মমতকে তিনি মুসলমান ধর্ম্মের সাথে মিলাইয়া লইতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

শুনতে পাই চাইর কারেন্ন আগে
সাঁই—আশ্রয় করেছিলেন রাগে
এবে লে অটল রূপ ঢেকে
মানুষ রূপ লীলা জগতে দেখায়।
লামে আলেক লুকায় যেমন
মানুষে সাঁই আছেন তেমন
তা নইলে কি সব নুরীতন
আদম তনের 'সেজদা সালাম' জানায়।

সৃষ্টির প্রথমে সমস্ত ফেরেস্তারা আদমকে সেজদা ও সালাম করিয়াছিল। আজাজিল

'মানুষকে তুচ্ছজ্ঞানে 'সেজদা' করিল না তাই তার সব জপতপ বৃথা গেল। শয়তান হইয়া সমস্ত বিশ্বের অভিসম্পাৎ সে কুড়াইতে লাগিল। তাই মানুষকে না ভজিলে খোদাকে পাওয়া যাবে না। কারণ—

স্বয়ং রূপ দর্পণে ধরে মানব রূপ সৃষ্টি করেছে
দিব্য জ্ঞানী যারা ভাবে বোঝে তারা
মানুষ—ধ'রে কার্য্য সিদ্ধ কার লয়।

কিন্তু মানুষকে ধরিলেই কি খোদাকে পাওয়া যাইবে? মানুষ ভজিতে যাইয়া সীমার মধ্যেই ত ডুবিয়া যাইব। সেই 'অনাদি অনন্ত'কে ধরিব কেমন করিয়া? লালন কেমন জলের মত প্রশ্নটীর উত্তর দিতেছেন। শুনুন—

যেমন, মূল হ'তে হয় ডালের সৃজন
ডাল হ'তে পায় মূল অন্বেষণ হে
তেমনি রূপ হ'তে স্বরূপ
তারে ভেবে রূপ
অধীন লালন সদা নিরূপ ধরতে চায়।

ধরিতে গেলে, "সীমার মাঝে অসীম তুমি" বলিতে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে এই মানুষ ভজনের রীতি লালনই নূতন বলেন নাই। ইহার পূর্ব্বে লুই সীদ্ধাই হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডীদাস পর্য্যন্ত অনেকেই এই মানুষ ভজনের বীজ বাংলার মাটীতে বপন করিয়া গিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস কহে শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ ভজন তাহার উপরে নাই।

তাই লালনের এই মত মুসলমান সমাজের ধর্ম্ম নীতির সাথে খাপ্ না খাইলেও বাংলার মাটীতে ইহা অসহ্য হইল না।

যদিও লালন তার মানুষ ভজনের পদ্ধতি মুসলমান পৌরাণিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মতের সাথে মেলে না, মুসলমান শাস্ত্রের এমন বচন সকলের তিনি প্রতিবাদ করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার যুগে নিজের মত এরূপ নির্ভীকভাবে প্রচার করা কম সাহসের কাজ নয়। তাহার জন্য লালনকে কম সংগ্রাম করিতে হয় নাই। সে কথা পরে বলিতেছি।

এই মানবদেহই যখন সবার চাইতে তাঁর কাছে বড় বলিয়া মনে হইল তখন বাহিরের মক্কা মদিনায় যাইয়া তাঁর কোন্ প্রয়োজন?—

আছে আদ্‌মক্কা এই মানবদেহে
দেখনারে মন ভেয়ে
দেশ দেশান্তর দৌড়িয়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে

করে অতি আজব ভাকা
গ'ঠেছে সাই মানুষ মাক্কা ॥

আর একটী গানে এই মক্কা সম্বন্ধে লালন বলিতেছেন,—

গুপ্তপুরে হজ হতেছে
ষোলজন গুণরী আছে
দ্বারয়ানে চার জনে।

এই মক্কায় হজ করিবার সত্যকার সন্ধানটী লালন পাইয়াছিলেন।—

কুরমানের ময়দানে যাও
নিজেকে কুরমানী দাও
নবিজীর কয় মানে
তবে তুই হবি হাজি
আল্লাজী হবে রাজী
খোদে খেদ বলে।

বহুদিন পূর্ব্বেই লালন কোরবানী সম্বন্ধে যেরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন এরূপ কোরবানী বা বলিদান হিন্দু বা মুসলমান সকলেরই শাস্ত্রসঙ্গত।

রোজা নামাজ যা নাকি মুসলমানদের অবশ্য কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে লালন কি বলিতেছেন শুনুন,—

না পড়িলে দায়মী নামাজ
সেকি রাজি হয়
কোথায় খোদা কোথায় সেজদা
করি সদায়।
মাস্তা আহদ কাস্তা রাহু
বুঝিতে হয় বোঝ কেহু
দিন বয়ে যায়
এক আয়াত কয় তঙ্কাক করণ
বোঝ তার মাতেন কেমন
কলুর বলদের মত ঘুরার কাজ নয়।

অর্থাৎ খোদাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিয়া তবে নামাজ পড়িতে হইবে। এখন এই সাক্ষাৎ ভাবে সেই অসীম অনন্তকে কিরূপে জানিব? সুতরাং তাহাকে সাক্ষাৎ না জানিয়া সাধারণে যে নামাজ পড়ে উহাতে খোদাকে পাওয়া যাইবে না।

এমন কি লালন হজরৎ মহম্মদকেও (দঃ) আসল মহম্মদ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তাঁর মতে খোদার নুরে মহম্মদের সৃষ্টি হইল আর মহম্মদের নুরে জগৎসংসারের সৃষ্টি

হইল। অতএব সৃষ্টি তাঁর কাছে সন্তানতুল্য। জন্মগ্রহণ করিয়া সেই মহম্মদ (দঃ) আপন সন্ততিকে বিবাহ করিলেন কেমন করিয়া? তবে আসল মহম্মদ কে? (দঃ)

আসমান জমীন জলাদি পবন
যে নবির নূরে হয় সৃজন
কি সে ছিল সেই নবির আসন
নবি পুরুষ কি প্রকৃতি ছিল ততক্ষণে।

তবে এই নবিই কি মহম্মদ (দঃ) হইয়া মদিনায় আসিয়াছিলেন? লালন বলিতেছেন—

যে নবি পারের কাণ্ডার
জেন্দা সে চাইর কারের উপর
হায়াতল মোর ছলিম নাম তার
সেই জন্যে কয়।

তাই মদিনার মহম্মদ (দঃ) আসল মহম্মদ (দঃ) নয়। কেননা সত্যকার নবি চার কারের * উপরেও জীবিত আছেন। তাঁর মরণ নাই। তাই লালন দুই নবিকে পৃথক করিয়া দেখাইতেছেন—

কোন্ নবি হ'লো উফাৎ
কোন নবি বান্দার হয়াৎ
নিহাস করে জানলে নেহাস
যাবে সংশয়।

সেই সত্যকার নবি তবে কোথায় আছেন? লালন তাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন।—

যে নবি অঙ্গে তোরো
চিনে তার দাওন ধর
লালন বলে পারের কারও
সাধ যদি হয়।

ফল কথা এই দেহের মধ্যেই লালন তাঁর সকল খুঁজিয়া পাইয়াছেন। খোদাকে তালাস করিতেও লালন বাহিরে ঘুরিবেন না—

যারে আকাশ পাতাল খুঁজে মরিস
এই দেহে সে রয়।

এইসব কারণে মুসলমান মৌলবীরা লালনকে বড় একটা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই মাঝে মাঝে লালনের সাথে তাঁহাদের বাদপ্রতিবাদ চলিত। কুমারখালির মধ্যে চড়ুইখালির বাদলসা ফকীরের বাড়ীতে তীরাম মুন্সী ও পেটরা নামে দুইজন মুসলমান মৌলবীর সাথে

---

* অন্ধকার, নৈরাকার, ধন্দকার, কুয়াকার

একবার লালন, ফকিরী-তত্ত্ব লইয়া বিচার করেন। কথিত আছে যে লালনের সাথে তাঁহারা তর্কে পারিয়া উঠেন নাই।

লালনের সাথে এইরূপ তর্ক-বিতর্ক অনেক জায়গায়ই হইয়া গিয়াছে। তার সবগুলির বিবরণ জানিতে পারা যায় না। তবে পাবনার অন্তর্গত রাধানগর কেছু নেওয়ারীর বাড়ীতে মুসলমান মৌলবীদের সাথে যে সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহা খুব প্রসিদ্ধ। লালন যখন অন্য কোন জায়গায় যাইতেন তখন ৫০।৬০ জন লোক প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। কেছু নেওয়ারীর বাড়ীতে লালন গেলে সেখানকার মৌলবীরা প্রায় একশত লোক জুটিয়া লালনের সাথে বিচার করিতে অগ্রসর হইল। বলা বাহুল্য যে এই সব লোক কেবল বাক্-যুদ্ধ করিতেই আসিয়াছিল না। তাহারা লাঠি সড়কি লইয়া সংগ্রামের অপেক্ষায় প্রস্তুতও হইতেছিল। এইসব লোক দেখিয়া হয়ত লালনের কিঞ্চিৎ ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। মৌলবীরা প্রথমে মিষ্টি ভাষায় ফকীরকে আহ্বান করিল। ফকীরের দুই চারিটী মিষ্টকথা শুনিয়াই তারা ধন্য হইতে চায় এইরূপ অনেক কথা বলিল। লালন কিন্তু ঘর হইতে বাহিরই হইলেন না।

ইতিমধ্যে কেছু গ্রামের জমীদার মন্মথবাবুকে যাইয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল। মন্মথবাবু কেছুকে অভয় দিয়া দুইটী লোক থানায় প্রেরণ করিলেন এবং বহু লোকজন লইয়া কেছুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে গ্রামের গোপাল ডাক্তার কিশোরী বাবু প্রভৃতি আসিয়া ফকীরকে অভয় দিলেন এবং মুসলমান মৌলবীদের সাথে ফকীরকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তখন লালন আসিয়া সকলের মধ্যে উপবেশন করিলেন। মৌলবীদের মধ্যে কি এক খোন্‌কার ফকীরের সাথে একটী কথা লইয়া তর্ক করিতেছেন এমন সময় গোপাল ডাক্তার উঠিয়া বলিলেন, শোন খোন্‌কার সাহেব! তুমি এসেছ ফকীরে সাথে বাহের্জ করতে! মাসের মধ্যে তিনবার আমি চিকিৎসা করি তোমার গর্ম্মীর ব্যায়ারাম। এই কথা শুনিয়া খোনকার সাহেবের মুখ ত চূণ হইয়া গেল। তখন মন্মথবাবু উঠিয়া বলিলেন, "তোমরা ফকীরেব সাথে বিচার করিতে আসিয়াছ তবে লাঠী ঢাল আনিয়াছ কেন? কেউ যদি ফকীরের গায়ে হাত তুলবে ত তার মাথা থাকবে না।" এমন সময় থানা হইতে ৫।৭ জন পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাদের দেখিয়া মৌলবীদের লোক সকল এদিকওদিক সরিয়া পড়িল। খোন্‌কার সাহেবও তাদের সহিত চম্পট দিলেন।

তখন লালন আপনার স্বরচিত গান সকল গাহিতে লাগিলেন। গ্রামের জমীদার ও প্রজা একসঙ্গে সেই গান শুনিয়া ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। এইখানে বলিয়া রাখি যে উপরোক্ত দুইটী ঘটনা ভোলাইসার নিকট আমরা শুনিয়াছি।

লালনকে হতভাগা পল্লীকবি বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বস্তুতঃ লালন নিভৃত পল্লীক্রোড়ে যশের যে সিংহাসনখানি গড়িয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকের কাছেই লোভনীয়।

বলিতে গেলে সারা বঙ্গদেশে এমন গ্রাম নাই যেখানে লালনের গান জানা একটী লোক না আছে। মাঠে ধান কাটিতে কাটিতে, মাঠ হইতে গরু লইয়া ঘরে আসিতে আসিতে কৃষাণ-কণ্ঠে লালনের এই গান যখন সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়ে তখন নিশ্চয়ই পরপার হইতে এই পল্লীকবি একটা বিরাট তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীজলধর সেন তাঁর কাঙাল হরিনাথের জীবনীতে লিখিয়াছেন, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে শিলাইদহের কাছারীতে লালনকে আহ্বান করিয়া তার গান শুনিয়াছেন। একবার তিনি প্রবাসী পত্রিকায় লালনের কতকগুলি গান ছাপাইয়াছিলেন। গত ১৩৩২এর শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু লিখিতেছেন "বঙ্গের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এমনকি স্বর্গীয় মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিলাইদহে নৌকায় লইয়া ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।" কুমারখালির কাঙাল হরিনাথ মাঝে মাঝে লালনকে লইয়া ৬।৭ দিন তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া বিবিধ ধর্ম্মালাপ করিয়াছেন। এমনকি যে সুপ্রসিদ্ধ ফিকিরচান্দের বাউল সম্প্রদায় একসময়ে সমস্ত বঙ্গদেশকে ভাব-বন্যায় ডুবাইয়াছিল, লালনের গানের প্রভাব হইতেই যে তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল একথাটী শ্রদ্ধেয় জলধরবাবু তাঁর কাঙাল হরিনাথের জীবনীতে বেশ স্পষ্টভাবেই বলিয়া গিয়াছেন। এই সব হইতে বোঝা যায় লালন, শুধু অশিক্ষিত সমাজেই আদর লাভ করেন নাই। বস্তুতঃ শিক্ষিত সমাজেও তাঁর প্রভাব কম ছিল না।

১১৬ বৎসর বয়সে লালন দেহত্যাগ করেন; তাঁহার বাড়ীতেই তাঁহার দেহ কবরস্থ করা হয়। মরিবার পূর্ব্বে মুসলমান মোল্লা ডাকিয়া তাঁহার 'জানাজা' করিতে লালন তাঁর শিষ্যদিগকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। তাই লালনেরই কোন ফকীর শিষ্য বাউল সম্প্রদায়ের মতে তাঁহার মৃত দেহের সৎকার করেন। কিছুদিন হইল ভোলাই সাঁ এই কবরের উপর একখানা ছোট্ট কুঠরী করিয়া দিয়াছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে আলো দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে দূর হইতে ভক্ত শিষ্যেরা আসিয়া এই কবরের সামনে বসিয়া গান গাহে।

লালনের গানগুলি পড়িয়া দেখিলে তাহার মধ্যে কবিত্ব খুব কমই পাওয়া যায়। তার কারণ তিনি সেই সব গানে কেবল তত্ত্ব-কথা বলিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। লালনের আবাসের চারিদিকে অগণিত বাঁশের ঝাড়। তাহা দেখিয়া লালন বুঝিয়াছেন—

চন্দন কাষ্ঠের সকলি সার
শুধু সার জানা বাঁশের সার হয়না।

পূর্ব্ব বঙ্গের অন্যান্য কবিদের গানে যেমন কবিত্বের প্রাচুর্য্য দেখা যায় লালনের গানে তাহার বড় অভাব।

নিশার শোভা শশীরে শশীর শোভা তারা
তারার শোভা সৌদামিনী গগনে হায় হারা (বারমাসী)

এরূপ পদ যদি কেহ লালনের গানে আশা করেন তবে তাঁহাকে নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে। পূর্ব্ব বঙ্গের ভাব-জগতের ঠাকুর শানালের সম্প্রদায়কে লালন বড় একটা ভাল চোখে দেখিতেন না। তাঁহাদের ভাবের উচ্ছ্বাস ও দরগাতলায় গড়াগড়ীকে লালন অনেক ঠাট্টা করিয়াছেন।

অথবা

"যদি ভজবিরে লাসরি কালা
কেনে ঘুরে বেড়াও কালকে তলা
বুঝি খাবিরে নৈবিদ্যি কলা
করছাও এইডা ফিকিরী।"

অথবা

যার দরগাতলা মন মজেছে
সেকি ভাবের ভাব পায়াছে

বস্তুতঃ ভাবকে সংযমে আনিয়া সাধনের স্তর হইতে স্তরে উঠাই লালনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তার জন্য শুধু নাকি কান্না করিলে চলিবে না। একান্তে বসিয়া নিভৃত সাধনা চাই। তার গানগুলি ভরিয়া এই সাধন পথের বর্ণনাই লালন করিয়া গিয়াছেন।

যে পথে সাই চলে ফেরে
তার অন্বেষণ কে করে
বিষম কালনাগিনীর ভয়
অমনি উঠে ছোঁ মারে

এই পথে চলিবার জন্য বাউল সম্প্রদায়ে যেসব গোপনীয় সাধন-প্রণালী আছে, তাহা কেবল আত্মসংযম ব্যতীত আর কিছু নহে। এক কথায় ইহাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের সেই—

জলেতে নামিবে জল না ছুঁইবে

উপদেশটী লালন পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এক সময়ে নারীকে বাদ দিয়া সাধনের পথ এ দেশের সাধু মহাজনেরা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু নরনারীর মিলন, মানব প্রকৃতির এই চিরন্তন সত্যটীকে অতিক্রম করিবার শক্তি যে মানুষের নাই এ কথাটীকে তাঁহারা অনেক আত্ম-লাঞ্ছনায় অনুভব করিয়াছিলেন। লালনের সাধনের পথ তাই—

"রসিকের তেমনি করণী
মারে মৎস্য না ছোয় পানি
ও সে আকর্ষণে আনে টানি
ক্ষীরোদ শশী"

তাই যাদের—

মন মাতঙ্গ মদন রসে
সদাই ফেরে সেই আবেশে

তাদের,—

"লালন বলে শুদ্ধ মিছে
লবলবানি প্রেমতলা।"

যদিও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি লালনের গান রচনার উদ্দেশ্য ছিল তত্ত্বকথার প্রচার করা, কবিত্ব ফুটাইয়া তুলা নয়, তবুও মাঝে মাঝে এই কঠোর তত্ত্বকথার ফাঁক্ দিয়া কবিতাসুন্দরী তাঁর স্বর্ণকমলের শতদল মেলিয়া ধরিয়াছেন।

যেমন—

এক নিরিখে দেখ ধনী
সূর্য্যজগৎ কমলিনী
দিনে বিভাসিত তেমনি
নিশীতে মুদিত রহে

অথবা—

লীলা দেখে লাগে ভয়
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই
ডেঙ্গা বয়ে যায়

* * *

ফুল ফোটে তার গঙ্গাজলে
ফল ধরে তার অচীন দলে
যুক্ত হয় সে ফুলে ফলে
তাতে কয় কথা।

প্রভৃতি পদে যদিও মানুষের জন্মতত্ত্ব প্রচার করা হইয়াছে তবুও বাহির হইতে ইহার কবিত্ব আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

বাংলার একটী শ্রেষ্ঠ রত্ন, তাঁর জীবনের অনেক মহিমা অনেক প্রভাব লইয়া নিভৃত পল্লী-ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন তাঁর জীবনের বহু শিক্ষাপূর্ণ ঘটনা, বহু সঙ্গীত আজও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সেগুলি যে আমাদের জাতীয় জীবনের একটী শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাম্য গান সংগ্রহ করিতে লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। এদিকেও কি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি না ?*

শ্রীজসিম উদ্দিন

* এই প্রবন্ধের মালমসলা সংগ্রহ করিতে ফরিদপুর সাহিত্যসমিতি আমাকে ৬৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন এবং উক্ত সমিতির শ্রদ্ধেয় সম্পাদক বাবু অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী এবং বাবু কিরণচন্দ্র ঘোষ মহোদয় আমাকে নানা দিক্ দিয়া উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

"মেঘের ভগবান্"

(মৌলিক "বউ কথা কও" ছন্দ)

১

রাত্ আঁধিয়ার !
আস্- মানে মেঘ !
হয় সুভীষণ
ঝড় জলে বেগ !
আজ বুঝি, হায়,
পায় ধরা লোপ !
ওই পড়ে বাজ !
হায়, একি কোপ !

২

এই অসময়,
ছয় বছরের,
চায় ছেলে মোর,
দেব্- তা মেঘের !
তাই তারে কই,
"ঘুম্ যা এখন !
দেখ- তে পাবিই,
বুঝ্- বি যখন !

৩

মান্- তে কি চায় ?
বল্- ছে আবার,
"দেখ্- বো মেঘের
দেব্- তা আমার !
কোন্- খানে রয় ?
কও, বাবা, আজ !
মুখ তুলে চাও !
থাক্ পড়ে' কাজ !

৪

"কই ! কেন তায়
দেখ্- তে না পাই !
এক্- টু দেখাও !
ঘুম্ তবে যাই !"
"চুপ করে' থাক্ !
ওই পড়ে বাজ !
দেব্- তা মেঘের,
ধম্- কালো আজ !"

৫

রয় ছেলে চুপ ;
শয্যাতে মোর
মন্- খানি তার
আজ দুখে ভোর !
মুখ ঢেকে ঢের্
কান্না- আতুর !
পাই- নি তো টের্,
ঘোর চাপা সুর !

৬

তার ফোঁপানির
হাল্- কা আওয়াজ
উৎ- লালো ঢেউ
মোর হিয়া মাঝ !
তায় পুছি, "বাপ !
কান্না কিসের !
কও, বাবা মোর !
রাত হোলো ঢের্ !"

৭

"ওই আকাশের
দেব্- তা কেমন!
কই দ্যাখা দ্যায়্
দেখ্- বো এখন!"
অশ্রুতে তার
বিস্মিত হই;
মোর চোখে জল,
চুপ করে'রই।

৮

কান্না ব্যাটার
থাম্- লো না আর!
ঠোঁট ফুলায়েই
কাঁদ্- ছে আবার!
লই কোলে তায়,
যাই কাছে মা'র;
খান তিনি চুম্
গণ্ডে তাহার।

৯

হায়, ভগবান্!
কার্ ছেলে এই!
বাপ যে হবার
যোগ্যতা নেই!
এই বয়সেই
হায়, কবে আর,
সাধ হোলো মোর
দেব্- তা দ্যাখার!

১০

মা'র 'দাদু ভাই',
মোর বাছাধন,
ফুঁপ্- ছিল তাঁর
স্কন্ধে তখন!
তাই তিনি তায়
গল্প শুনান্;
চেষ্টা করেই
কষ্টে চুপান্!

১১

এর মতো প্রাণ
রয় যদি মোর,
বয় যদি ঘোর
অশ্রু অঝোর্;
হায়, ভগবান্!
পাই যে তোমায়!
জন্ম মরণ
সব ঘুচে' যায়!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য.

কর্ম্মে দীক্ষা

[টাঙ্গাইল ছাত্র সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।]

এই ছাত্র সম্মিলনী যে আদর্শ লইয়া এই কয়েক বৎসর জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন তাহা প্রশংসনীয়। যে কয়েকটি স্থূল কথা উপস্থিত কর্ম্মক্ষেত্রে তোমাদের কাজে লাগিতে পারে তাহারই অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি।

সম্মিলনীর সদস্যগণের কর্ত্তব্য স্থূলতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা:— ব্যক্তিগত, সামাজিক, পল্লী বা নগর-সংক্রান্ত এবং সম্মিলনী সংক্রান্ত। অবশ্য কর্ত্তব্যের ধারা কেহ কখনও নিশ্চিতভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, তথাপি আপাততঃ এই শ্রেণী বিভাগে আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

মানুষের জীবন যে কত রহস্যময় তাহা তোমাদের এখন জানা সম্ভব নয়, কিন্তু জীবন পথে যত চলিতে থাকিবে দেখিবে আবরণের পর আবরণ যতই উন্মুক্ত হইতে থাকিবে জীবনের প্রহেলিকা ক্রমে ততই ঘনীভূত হইতে থাকিবে। ক্রমে দেখিবে যে অন্তর্মুখীন জীবন ভিন্ন আর অন্য কোনো বস্তুর মূল্য নাই, দেখিবে 'বাহিরের ভিক্ষা ভরা থালি' দিয়া অন্তরাত্মার জীবিকানির্ব্বাহ সম্পন্ন হয় না। জীবনে যাহা কিছু স্নিগ্ধ ও সুন্দর সব আহরণ করা যায় সেই সময় যখন মানুষ উন্নত অন্তর্মুখীন জীবন সাধনা করিতে প্রয়াসী হয়। এই সাধনার প্রথম কথা নীতি। যেখানে নীতি দৃঢ় নয় সেখানে উন্নত ধর্ম্মজীবন বা উন্নত কর্ম্মজীবন সম্ভব বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। রাজনীতি ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এই নীতির গৌরবের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই জন্য তোমাদের সকলকে এ বিষয় বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ তোমরা অনেক স্থলে দেখিয়া থাকিতে পার এবং ভবিষ্যতেও দেখিবে যে রাজনীতি ক্ষেত্রে তেজের আদর অধিক; যাহার তেজ এবং প্রতিভা যত, তাহার প্রতিষ্ঠা তত অধিক এবং সে সময়ে কেহ নীতির কথা মনে স্থান দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না। ইহার ফলে ভয় হয় যে তোমাদের মধ্যে এই ধারণা হইতে পারে যে রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনের নীতির প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ ভ্রান্ত ধারণাকে মনে স্থান দিওনা, কারণ নীতিহীন লোকের দেশের প্রকৃত সেবা করিতে পারা অসম্ভব কথা।

অন্তর্মুখীন জীবনের দ্বিতীয় কথা আড়ম্বরহীনতা। বাহিরের আড়ম্বর আমাদের একটী পরম শত্রু। যে প্রকৃত জীবন যাপন করিতে অভিলাষী তাহাকে সাবধান হইতে হইবে যে বাহিরের চাকচিক্য যেন কোনোভাবে তাহাকে বাধা না দেয়। যখনই যে কার্য্যে অনর্থক আড়ম্বর দেখা যায়, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে সে কার্য্যের শক্তি সেই অনুপাতে হ্রাস পাইয়াছে। স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য কেহ যদি তাহাতে

নানা প্রকার সুন্দর ও সুগন্ধবিশিষ্ট ফুল ফলের বৃক্ষ রোপণ করে তাহা যেমন ঐ ক্ষেত্রের পক্ষে অনিষ্টকর, সেইরূপ যে শান্ত সতেজ জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক তাহার পক্ষে বাহিরের আড়ম্বর ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত ক্ষতিকর। যে আড়ম্বর ভিন্ন কর্ম্ম করিতে পারে না, তাহার কর্ম্মের মূল্য অতি অল্প, এই সত্য তোমাদের হৃদয়ে চিরদিনের মত অঙ্কিত করিয়া রাখিলে জীবনে অগ্রসর হইতে পারিবে, এই আমার বিশ্বাস।

সমাজিক জীবনে সম্মিলনীর সদস্যগণ কি ভাবে কর্ত্তব্যপালন করিতে পারেন তাহা এখন বিবেচনা করা যাইতে পারে। সমাজে পরস্পরের পরস্পরের সহিত যোগ, চিরাগত কতকগুলি প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া যান। একভাবে দেখিতে গেলে ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা এই শ্রেণীর কর্ত্তব্য অধিকতর কঠিন, কারণ এক্ষেত্রে মানুষ একেলা নহে, অন্যের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক, অতীতের সহিত তাহার বন্ধন। এখন ভাবিয়া দেখ এক্ষেত্রে তোমাদের কর্ত্তব্য কিছু আছে কি না। যে সকল প্রথা সমাজে এখন দেখিতেছ, যে সকল সামাজিক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, সেগুলি কি নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে তোমরা প্রস্তুত? যদি তাহা থাক, তবে এ বিষয়ে তোমাদের কর্ত্তব্য প্রায় কিছুই নাই; কিন্তু যদি এমন কোন প্রথা বা রীতি থাকে যাহা সমাজের, দেশের অথবা জাতীয় উন্নতির পক্ষে হানিকর বলিয়া মনে কর, তবে তোমরা অলস হইয়া থাকিতে পার না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি, এই যে অস্পৃশ্যতা দোষ সামাজিক ব্যবস্থা হইতে তুলিয়া দেওয়ার আন্দোলন দেশময় চলিতেছে, ইহার সম্বন্ধে তোমাদের কি কোনো কর্ত্তব্য নাই? এই অল্পদিন হইল এই স্থানে দেশের ও সমাজের বহু নেতা একত্র হইয়া অস্পৃশ্যতা দোষ রহিত করিবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। তোমরাও অনেকে হয়ত সে সময় উপস্থিত থাকিয়া এই শুভসঙ্কল্পে সহায়তা করিয়াছিলে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কার্য্যতঃ তাহা করিয়াছ কি? যাহাদিগকে সমাজ এতদিন ধরিয়া অন্যায়ভাবে অস্পৃশ্য পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে তোমার অন্ন ও পানীয় স্পর্শ করিবার অধিকার দিয়াছ কি? তোমাদের গৃহে গৃহে সে ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে কি? তাহাদের বুঝিতে দিয়াছ কি যে তোমরা ও তাহারা এক পর্য্যায়, এক মানব পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত? এই অঞ্চলে মাসাবধি কাল বাস করিয়া আমার গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে এই শুভসঙ্কল্পের স্থান এখানে হইবে কি না। তাই বলি সে সকলে এখনও সাবধান হও, সামাজিক কুপ্রকার বিরুদ্ধে দাঁড়াও। মনে করিও না যে কেবল ব্যবস্থা দান করিলেই রোগ দূর হইল; সে ব্যবস্থা পালন করিতে প্রয়াসী হইতে হইবে। আবার এ কথা মনে করিও না যে কেবল অস্পৃশ্যতা দোষ দূর করিলেই তোমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে, কারণ ক্রমে ক্রমে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে, যাহাতে সকল জাতি মিলিয়া এক জাতি গঠিত হয়, যাহাতে এই গঠনে সমগ্র জাতি এক অপ্রতিহত শক্তি লাভ করে।

'সম্মিলনীর' সদস্যগণকে আবার স্মরণ করাইয়া দিই যে, আজ তোমরা যুবক, কাল তোমরা সমাজের নেতা হইবে, সুতরাং এখন যদি তোমরা কোনো কারণে সামাজিক জীবনের উন্নত আদর্শ পালন করিতে সমর্থ না হও, নিরাশ হইও না; দৃঢ়চিত্ত হইয়া আদর্শ হৃদয়ে ধারণ কর, অপসৃত হইতে দিও না, যাহাতে ভবিষ্যতে কার্য্যতঃ তাহার প্রমাণ জীবনে দিতে পার। কত দেখা যায় যে যিনি এক সময়ে যৌবনে ঘোর সমাজবিপ্লববাদী ছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে বয়সের অনুপাতে শান্ত স্থবিরত্ব লাভ করিয়া এবং রক্ষণশীল ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া সমাজের উন্নতির পথ অবরোধ করিয়াছেন। এ দৃশ্য অতি সুলভ। দেখ, বরপণের বিরুদ্ধে কতদিন হইতে আন্দোলন চলিতেছে, অথচ এখনও এ কুপ্রথা গেল না। ইহাতে কি এই বুঝা যায় না যে যাঁহারা যৌবনে ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, প্রবীণ হইয়া তাঁহারাই সে আদর্শ বিস্মৃত হইয়া এই কুপ্রথার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন? কিন্তু তোমাদের কর্ত্তব্য এই কুপ্রথার মূল উচ্ছেদ করা। আরও কত দোষ ত্রুটী আমাদের সমাজে রহিয়াছে, এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে সে সকলের উল্লেখ করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমার অনুরোধ এই যে এ চেষ্টা কখনও তোমার ছাড়িও না, এ আদর্শ কখনও তোমারা বিস্মৃত হইও না।

আমাদের তৃতীয় বিভাগ—পল্লী ও নগর সম্পর্কে 'সম্মিলনী'র সদস্যগণের কর্ত্তব্য। এই 'সম্মিলনীর' অধিকাংশ সদস্যই পল্লীবাসী, সুতরাং পল্লী সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যের বিষয়ে আলোচনা তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ঘটনাচক্রে চিরকালই আমাকে নগরে বাস করিতে হইয়াছে, কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রামে বাস করিয়া গ্রাম্যজীবনের পরিচয় লাভ করিয়াছি এবং ইহার সুবিধা ও অসুবিধা কি জানিতে পারিয়াছি। আজকাল পল্লীর দিকে সমস্ত দেশের দৃষ্টি পড়িয়াছে, যাহাতে পল্লীবাসীর জীবন আরও সহজ এবং সুব্যবস্থিত হয় সে সম্বন্ধে দেশব্যাপী চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা অতি শুভ লক্ষণ এবং আশার কথা সন্দেহ নাই। এই মহাব্রতে সকলেরই যোগ দিতে হইবে এবং যথাসাধ্য এ বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে। 'সম্মিলনীর' সদস্যগণ যে এই ব্রত উদযাপনে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইবেন ইহাই স্বাভাবিক এবং সেই জন্যই এ বিষয় উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক মনে না করিয়া দু-একটী কথা উপস্থিত করিতেছি।

আমাদের এ অঞ্চলের পল্লীগুলি দেখিয়া আমার স্বতঃই মনে হইয়াছে যে এই গ্রামগুলি যেন অত্যন্ত সহায়হীন। গ্রামগুলি এমনভাবে স্থাপিত, বাসস্থানগুলি এমনভাবে অবস্থিত, কুটীরগুলি এমনভাবে নির্ম্মিত যে অত্যাচারী শত্রুর আক্রমণ হইতে অধিবাসিগণকে রক্ষা করার কোনো উপায় নাই; অধিকন্তু অধিকাংশ গৃহস্থের বাসস্থানগুলির মধ্যে সহজে যাওয়া আসার ব্যবস্থা নাই। যে অরাজকতার তাণ্ডব নৃত্য কলিকাতা নগরীর বক্ষে হইয়া গেল, তাহার দশাংশের একাংশ এখানে হইলে এই নিঃসহায় গ্রামগুলিকে রক্ষা করা অসম্ভব। এখন সম্মিলনীর সদস্যগণকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন? গ্রামগুলি

রক্ষা করিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন কি ? এ কাজ উদ্যোগী যুবকগণের সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না; কেবল সাহায্য কেন, এ বিষয়ে আয়োজন, উদ্যোগ, কষ্টস্বীকার, স্বার্থত্যাগ, সব তাহাদেরই করিতে হইবে এবং এখনই করিতে হইবে। অরাজকতার ঔষধ শান্তিপ্রিয়গণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টা প্রধানতঃ যুবকগণের নিকট দেশ আশা করে। প্রতিগ্রামে গ্রামরক্ষা সমিতি স্থাপন, সমিতির সদস্যগণের কার্য্যোপযোগী লাঠিখেলা শিক্ষা, কার্য্যকালের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া রাখা, গ্রামের সকল স্থানে সহজে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা, বিপদকালে গ্রামস্থ সকল নারী ও শিশুদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় দেওয়া, গ্রামগুলির পরস্পরের মধ্যে সহজ যোগ স্থাপন,—এই প্রকার সকল কার্য্যের জন্য দেশ যুবকদের প্রতি নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। এ বিষয়ে এক মুহূর্ত্তও আর বিলম্ব করা উচিত নহে। 'সম্মিলনী' এ অঞ্চলের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতাগণের সহিত একযোগ হইয়া এখনই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন, যাহাতে সমস্ত টাঙ্গাইল মহকুমা জুড়িয়া গ্রামরক্ষণসমিতির শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া, এ অঞ্চলের অরাজকতা দমন করিতে পারে।

গ্রাম্যজীবনের আর একটী বিষয়ের দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। জীবনের প্রকৃত মূল্য প্রতি জীবনের উদ্দেশ্য দিয়া বুঝিতে হয়; 'নন্দলালের' মতন কষ্টেসৃষ্টে কেবল বাঁচিয়া থাকিলেই জীবন ধারণ করা হয় না। এই জন্য সকল অবস্থায় এবং সকল সময়ে প্রত্যেকের জীবনের কোনো একটী উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন। গ্রামে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারাও এ নিয়মের বহির্ভূত নহেন, তাঁহাদিগকেও এক একটী উদ্দেশ্য বা আদর্শ বরণ ধরিয়া লইতে হইবে। সে আদর্শ সেবা, সাধন অথবা জ্ঞানের উৎকর্ষ, ইংরাজীতে যাহাকে culture বলে। কোনো অবস্থায়, অথবা কোনো বয়সে মানুষ এই তিনটীকে অতিক্রম করিতে পারে না। তাহাকে ইহার অন্ততঃ একটীকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবেই। 'সম্মিলনী' এ বিষয়েও ক্রমে মনোযোগী হইতে পারেন এবং যাহাতে গ্রামবাসীরা উদ্দেশ্যহীন গ্রাম্য জীবনের জড় অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া সচেষ্ট সতেজ উন্নত জীবন লাভ করিতে সমর্থ হন সে বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। সত্য কথা বলিতে, যখন দেখি যে পল্লীতে বা নগরে অধিকাংশেরই আহার, বিশ্রাম, উপার্জ্জন ও গ্রাম্যকথা ভিন্ন অন্য কোনো সেবা, সাধন বা চর্চ্চা নাই, তখন এ দৃশ্যে প্রাণে বড়ই নিরাশা উপস্থিত হয়। এরূপ জীবন জাতীয় শক্তির অনুকূল একেবারেই নয় এবং যদি গ্রামে আবার সকলকে ফিরাইয়া আনিতে হয়, তবে জীবনের এই ধারা পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে কেহ পল্লীজীবনে আগ্রহ বা আকর্ষণ বোধ করিবে না। এ কাজ অত্যন্ত কঠিন, ইহা সত্য, কিন্তু ইহা আরম্ভ করিতে সম্মিলনীকে প্রস্তুত হইতে হইবে এবং পল্লীবাসিগণকে সেবা সাধন ও জ্ঞানচর্চ্চার উপাদান যোগাইতে হইবে।

শিক্ষিত গ্রামবাসিগণের জ্ঞানচর্চ্চার উপাদান যোগাইবার একটী উপায় প্রতিগ্রামে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র পাঠাগার স্থাপন। ঐ পাঠাগারে যেমন কিছু কিছু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্র ও পত্রিকাদি আসিবে, সেই সঙ্গে সাহিত্য, ইতিহাস এবং দেশ সম্বন্ধীয় সহজ এবং উপযোগী পুস্তকাবলীও রাখিতে হইবে। কিন্তু পাঠাগার স্থাপনের প্রধান অন্তরায় দুইটী, যথা, পত্রিকাদির ব্যয়বহন এবং নূতন পুস্তকের ব্যবস্থা করা। নূতন পুস্তক নিয়মিত ভাবে পাঠাগারে না আসিতে থাকিলে পাঠকদের আগ্রহ হ্রাস হওয়া স্বাভাবিক ও তাহার ফলে ক্রমে পাঠাগার লোপ পাওয়াও অবশ্যম্ভাবী। প্রথম অন্তরায়ের প্রতিবিধান গ্রামবাসীদের অর্থসাহায্য; তাহা ছাড়া কখনও পাঠাগার চলিতে পারে না। দ্বিতীয় অন্তরায় দূর করিতে হইলে Circulating Libraryর অনুকরণে একটী ব্যবস্থা, সম্মিলনী হইতে করা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে "সম্মিলনী" এক একবারে কিছু কিছু নূতন পুস্তক ক্রয় করিয়া এক এক প্রস্থ পুস্তক তাঁহাদের সহিত যুক্ত বিভিন্ন শাখায় যথাক্রমে প্রেরণ করিবেন। প্রতি গ্রামে নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত পুস্তকগুলি থাকিবে এবং তাহার পরে অন্য গ্রামে প্রেরিত হইবে। এই ব্যবস্থার জন্য প্রতি শাখাকেন্দ্রস্থ "সম্মিলনীতে" মাসিক অথবা বাৎসরিক উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য করিবেন এবং প্রতি শাখা তাঁহাদের ব্যবহারকালে পুস্তকগুলির জন্য দায়ী থাকিবেন। আমার ধারণা যে এইভাবে ব্যবস্থা করিলে গ্রামের পাঠাগারগুলি গ্রামবাসীর আকর্ষণের বস্তু হইবে।

যেসকল শিক্ষিত ভদ্রলোক পল্লীগ্রামে বাস করেন তাঁহাদের সেবা যত প্রয়োজনীয় হউক না কেন, সাধারণ অশিক্ষিত বা সামান্যভাবে শিক্ষিত দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবিগণ সম্বন্ধে সে কর্ত্তব্য অধিকতর গুরুতর। অবশ্য উচ্চাঙ্গের জ্ঞানচর্চ্চা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না, অথচ এমন উপায় চাই যাহাতে সেই ফল অন্ততঃ কিছু পরিমাণে জনসাধারণের জীবনে ও চরিত্রে প্রস্ফুটিত হয়। এই কার্য্যের একটী সুন্দর উপায় আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে—সেটী 'কথকতা'। সর্ব্বসাধারণের সুশিক্ষার এমন সহজ উপায় যখন বর্ত্তমান, তখন দেশের কাজে ইহারই সদ্ব্যবহার করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং ইহারই সাহায্যে নানা তথ্য ও তত্ত্বের বহুল প্রচার করা প্রয়োজন। কিন্তু পুরাতন চিরাগত প্রথা অনুসারে ইহার ব্যবহার না করিয়া নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে এবং এই পদ্ধতি যাহাতে কার্য্যকরী হয় তাহার আয়োজন 'সম্মিলনী' আরম্ভ করিতে পারেন। এই নূতন পদ্ধতির জন্য একটী নূতন পঞ্জিকার প্রয়োজন। যেমন সকল পঞ্জিকায় তিথি নক্ষত্র, দেবদেবীর পূজা, শুভ ও অশুভ দিন ক্ষণের বিধি নির্দ্দেশ থাকে, সেইরূপে এই নূতন পঞ্জিকায় সকল দেশের সকল মহাপুরুষগণের, সকল সাধু ভক্ত পণ্ডিত, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, বীর ও দেশহিতৈষিগণের জন্মমৃত্যুর দিন থাকিবে। জগতে যত প্রকার আশ্চর্য্য আবিষ্কার এপর্য্যন্ত হইয়াছে সে সকলগুলিরই আবিষ্কারকগণের নাম জন্মমৃত্যুর দিনের সহিত উল্লিখিত থাকিবে। স্বদেশ বিদেশের কোনো পার্থক্য বা প্রভেদ এ পঞ্জিকায় থাকিবে না। দেশকাল ভেদের কোন

চিহ্ন ইহাতে স্থান পাইবে না। যে দেশে, যে কালে যাহা কিছু সত্য, শিব, সুন্দর মানুষের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই নূতন পঞ্জিকায় স্থান পাইবে। বিজ্ঞানের অদ্ভুত রহস্য, দর্শনের গভীর তত্ত্ব, মহাপুরুষগণের জীবনে বিধাতার বিশেষ লীলা। বিশেষ বিশেষ জাতির ইতিহাসে বিশ্বশক্তির বিশেষ প্রকাশ,—এ সকলই জীবনী ও ঘটনার দিন অনুসারে এই পঞ্জিকায় সন্নিবিষ্ট থাকিবে। 'সম্মিলনী'-প্রমুখ উপযুক্ত ব্যক্তিগণ এই পঞ্জিকা অবলম্বনে সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে, 'কথকতা' যোগে, এইসকল বিষয়ের সকল তত্ত্ব জনসাধারণের নিকট মনোরমভাবে উপস্থিত করিবেন। এরূপ ব্যবস্থায় বিষয়ের নূতনত্ব আশা করা যাইতে পারে এবং ক্রমে জগৎ ও ইতিহাস সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা সুস্পষ্ট হইতে পারে। জনশিক্ষার ইহা একটী প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া আমার মনে হয়।

'সম্মিলনীর সদস্যগণের কর্ত্তব্যের যে চারিটী ধারার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে, এখন তাহার শেষটীর, অর্থাৎ সদস্যগণের সমিতি সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যের বিষয়ে কিছু বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব। এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান তোমাদের শিক্ষার একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান তাহা বলা বাহুল্য। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার শিক্ষার অভাবই আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ, সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যাঁহারা যুক্ত তাঁহাদের পক্ষে ইহা একটী সুন্দর শিক্ষাক্ষেত্র এবং যে সকল যুবক ইহাতে এখনও যোগ দেন নাই তাঁহাদের এই উপলক্ষে বিশেষ ভাবে আহ্বান করা যাইতে পারে, যেন এ সুযোগ তাঁহারা না হারান। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মের বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান উপকরণ পরস্পরের বশ্যতা স্বীকার। এই বশ্যতা স্বীকার না করিলে কখনও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। তোমরা অনেক স্থলে স্বাধীন-চিত্ততার প্রশংসাবাদ অবশ্যই শুনিয়াছ, বহুস্থলে পাঠ করিয়াছ, কিন্তু আজ আমি এই অবসরে অধীনতার গুণকীর্ত্তন করিব। প্রকৃত কথা বলিতে ব্যক্তিগতভাবে জগতে আমরা কেহই স্বাধীন নয়, সকলেই আমরা অধীন। স্বাধীনবৃত্তি বলিয়া সাধারণতঃ যে কয়েকটী উপজীবিকার উপায় আমরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, সেগুলিও একেবারেই স্বাধীন নহে, অতি নিগূঢ়ভাবে পরাধীন, কারণ সকল অবস্থাতেই পরস্পরের কৃপা, দয়া, অনুগ্রহ, অনুকম্পা, প্রয়োজন প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের চলিতে হয়। যে মনে করে সে কাহারও অধীন হইবে না, সে সর্ব্বনাশের পথে চলিয়াছে; যেমন প্রাকৃতিক জগতে আমরা কেহই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারি না, তেমনই সমাজ বা জাতির ব্যবস্থানে আমরা কেহই সমাজ বা জাতির অন্তর্নিহিত নিয়ম হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে পারিনা। প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়াই প্রকৃতিকে জয় করিতে হয়, সেইরূপে পরস্পরের বশ্যতা ও অধীনতা সাধনেই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয়। এই কারণে আমি অধীনতার একান্ত পক্ষপাতী এবং সেই জন্যই তোমাদের আজ পরামর্শ দিতেছি যে যদি দেশের বা জনসাধারণের প্রকৃত সেবা করিতে চাও, যদি সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় এই 'সম্মিলনীকে' সতেজ ও

জীবন্ত করিতে চাও, তবে তোমরা পরস্পরের বশ্যতা স্বীকার কর, পরস্পরের অধীনতা সাধন কর। স্বাধীনচিন্ততা-সাধন অপেক্ষা, দেখিবে, এই সাধন কত কঠিন। পরস্পরের বশ্যতা স্বীকার না করিলে কেহ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে পারে না; আবার সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে জাতীয় শক্তি কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। যদি 'সম্মিলনীর' উদ্দেশ্য সফল করিতে চাও তবে এই অধীনতার ব্রত সাধন কর।

'সম্মিলনী' সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় পরামর্শ যে কেবল মহৎ আদর্শ যথেষ্ট নহে, আদর্শ সাধ্য ও শক্তি অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের শক্তি অত্যন্ত অল্প, সুতরাং যদি কর্ম্মক্ষেত্র অতিরিক্তভাবে বিস্তৃত করি তবে কোন কাজ হয় না, বরং শক্তির অপচয় হয়। অতএব কর্ম্মক্ষেত্র সংযত করা একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। কর্ম্মক্ষেত্রের আদর্শ বৃহৎ রাখিতে অবশ্য কোনো দোষ নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে অল্প কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঐকান্তিক চেষ্টা সেই দিকে প্রয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে হয়, কারণ শক্তির অতিরিক্ত কার্য্যে যে হস্তক্ষেপ করে সে মূর্খতার পরিচয় দেয়।

এই সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে প্রতি গ্রামে 'সম্মিলনীর' একটী স্থায়ী শাখা হওয়া উচিত এবং কেন্দ্রস্থ সম্মিলনীর সহিত শাখাগুলির জীবন্ত যোগ থাকা প্রয়োজন। এই সূত্রে পূর্ব্বেই কিছু কিছু বলিয়াছি, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন দেখি না।

'সম্মিলনী'র পক্ষ হইতে যখন প্রথমে আমাকে আজিকার প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে বলা হয়, তখন তোমাদের কাছে কি কথা বলিব ভাবিয়া পাই নাই, কিন্তু ভাবিতে আরম্ভ করিয়া দেখি, অনেক কথা বলিবার আছে, কিছুই যেন বলা হইল না। কিন্তু প্রসঙ্গ আর দীর্ঘ করিয়া তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন করিতে চাই না, কেবল এইটুকুই বলিয়া শেষ করিতে চাই যে কর্ম্মজগতের সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় অতি অল্প, সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা হইয়াছে। জীবনের অধিকাংশ পথ উত্তীর্ণ হইয়াছি; জীবনের যে অংশ এখন তোমাদের সম্মুখে, তাহা আজ আমার পশ্চাতে। এই বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে কত মায়ামরীচিকার ভিতর দিয়া আসিয়াছি, কর্ম্মজগতের কত সুখস্বপ্ন ক্রমে ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। এই কারণে কর্ম্মজগতের বিফলতা লইয়া তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রথমে সাহসী হই নাই। কিন্তু বিফলতারও বোধ হয় কিছু মূল্য আছে। এই সূত্রে ইংলণ্ডের একটী বিখ্যাত লেখিকার একটী উপাখ্যান মনে পড়িল; এই উপাখ্যান বিবৃত করিয়া আজ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

সুন্দর স্নিগ্ধ প্রভাতে এক পথিক সুদূরের অন্বেষণে চলিয়াছেন। চারিদিকে ফুলের কি শোভা, পথিকের মুখ কি প্রফুল্ল। ক্রমে পথ বন্ধুর হইয়া আসিল, সূর্য্য কিরণও বিশেষ কষ্টদায়ক হইল; তবুও পথিক দৃঢ়চিত্তে চলিয়াছেন। সন্ধ্যা আসিল, পথ আরও বন্ধুর, বিরাট

পর্ব্বতশ্রেণী পথ অবরোধ করিয়াছে ; পথিক মনে করিতেছেন যে ঐ পর্ব্বতচূড়ায় তাঁহার ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিবেন, তাই প্রাণ পণ করিয়া, সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া, রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছেন। শরীরে আর শক্তি নাই, পদদ্বয় ক্লান্ত, যষ্টির সাহায্যে পার্ব্বত্য পথ বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন। যখন রাত্রির মহা অন্ধকার তাঁহাকে ঘিরিয়াছে সেই সময়ে একটী ক্ষীণ আলোকরশ্মি তাঁহার দৃষ্টিগত হইল। নূতন উৎসাহে এবং ঈপ্সিত বস্তু লাভের নূতন আশায় পথিক সেইদিকে চলিলেন। ঘন তুষারপাত পথ অবরোধ করিতে লাগিল। বহুকষ্টে পথিক একটী ক্ষুদ্র মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন। তখন প্রশান্তললাট এক বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন, "পথিক, ভুল পথে তুমি আসিয়াছ, এখানে তো তোমার ঈপ্সিত বস্তু নাই। যদি লাভ করিতে চাও অন্য পথে তোমাকে যাইতে হইবে।" পথিক বলিলেন, "আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত ; আর অন্যপথে যাইবার আমার শক্তি নাই। আপনি অনুমতি দিন, বিফলমনোরথ হইয়াই আমি অবশিষ্ট দিনগুলি এখানে যাপন করি।" কিন্তু সেই বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "তাহা তো হইতে পারে না ; এখানে তোমার থাকিবার স্থান হইবে না। তোমর জীবন বিফল হইয়াছে, এ কথা সত্য, কিন্তু যাহাতে এই ভ্রান্তপথে আসিয়া কাহারও জীবন বিফল না হয়, তাহার জন্য অন্ততঃ তোমার স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং সকলকে বলিতে হইবে যাহাতে এ পথে ভুল করিয়া আর কেহ না আসে।"

তাই অনধিকারচর্চ্চা হইলেও দূর হইতে কর্ম্মজগতের কয়েকটী সন্ধান যাহা জানিতে পারিয়াছি তোমাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। সমগ্র জীবন তোমাদের সম্মুখে ; শান্ত সংযত হইয়া উৎসাহসহকারে জীবনপথে ও কর্ম্মজগতে যাত্রা আরম্ভ কর। নিরুৎসাহ হইও না, শক্তির অন্বেষণ কর—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া। দুর্গম পথস্তৎ কবয়োঃ বদন্তি।

শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী

বনফুল

নীলশাটী পরিপাটী পরিয়াছে ফুল,
পাতার মঞ্জরী, ঘিরেছে কবরী, অলক দোদুল।
বুকে লেখা, শ্যাম রেখা প্রিয় নাম খানি,
সরস উরস, পিয়ে নাম রস, তুহারে বাখানি॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

পারের কড়ি

পদ্মপুরের জমিদার মিত্তির বাবুদের ছোট-বৌ যেদিন তার পাঁচ বছরের ছেলেটিকে জন্মের মত হারিয়ে বড় জায়ের ছেলে ননীকে বুকে চেপে চুপ করে পড়ে রইল,—সমস্ত গ্রামখানি যখন তার কান্নার শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল না, বা ঘন ঘন ফিট্ হওয়ার জন্য বাড়ীর কাকেও ব্যস্ত হতে হল না, তখন সকলেই ছোট-বৌএর এই নীরবতাকে একটী মস্ত বড় ‍দুর্লক্ষণ বলে মনে করল।

ষষ্ঠীতলার পিসি বল্লেন,—মাগো, চোখের সাম্নে ছেলেটী ধড়ফড় করে মরে গেল, মায়ের চোখ দিয়ে একফোঁটা জল এল না। আমার তিনকুড়ি এক বয়েস হল কিন্তু এমন মা কোথাও দেখিনি।

রাঙ্গাদিদি, পিসির কথা শুনে হেসে বল্লেন,—মোক্ষদা যে কি বলে তার ঠিক্ নেই। বলে মা! মা কেন হবে—ডান! দেখ্লি না, সেই যে ছোট-বৌ বাছার বিছানায় বস্ল, এ তিন দিনের মধ্যে নিজেও নড়ল না, সেখানে কাউকে যেতেও দিলে না, একেবারে শেষ করে তবে উঠ্ল।

ভাঙ্গা কাঁসার বাটি ঠোকার শব্দের মত এই কথাগুলি পাশের ঘরে ছোট-বৌয়ের কানে এসে পৌঁছালে, সে ননীকে দুই হাত দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে তার মাথার উপর মুখ চেপে রইল।

পাড়ার মেয়েদের কাছে কিছুক্ষণ সুর করে চীৎকার করবার পর যখন জমিদার গৃহিণীর মনে পড়ে গেল ঘণ্টাখানেক তাঁর দোক্তা খাওয়া হয় নি, তখন তিনি ঝি চাকরের তাঁর প্রতি এই অবহেলার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে নিজেই দোক্তার সন্ধানে চল্লেন। ছোট-বৌয়ের ঘরের সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় যেন কিছু বীভৎস কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে বলে উঠ্লেন—বলি ছোট বৌমা, এ তোমার কি আক্কেল?

ছোট-বৌ মাথার কাপড় টেনে দিয়ে তার স্বাভাবিক নম্রস্বরে বল্ল—কি মা?

—'কি মা'—যেন কিছু জানেন না,—নেকা! আজ তুমি ননীকে অমন করে নিয়ে শুয়ে আছ কেন? ওটিকেও না শেষ করে কি আর তোমার পেটের আগুন নিববে না?

ছোটবৌ আস্তে আস্তে ননীর ছোট হাত দুটি নিজের গলা হতে খুলে খাটের উপর শুইয়ে দিল। ননী জেগে উঠে বায়না ধরল আমি কাকীমার কাছে শোব।

জমিদার গৃহিণী মুখভার করে চলে যাবার সময় বলে গেলেন—হয়েছে। ও-টীরও এবার দফাসারা। একেই বলে ডাইনে মায়া।

সোমবার দিন সন্ধ্যাবেলা নলিন যখন চুপি চুপি বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল, ছোটবৌ জিজ্ঞেস্ করলেন, তুই এরি মধ্যে শুলি যে নলিন, পড়বি না? নলিন ভয়ে ভয়ে উত্তর করল,

বড্ড জ্বর হয়েছে মা। ছোটবৌ ছেলের মাথায় বুকে হাত দিয়ে বল্‌ল—ওমা তাইত। গা যে পুড়ে যাচ্ছে।

শেষরাত্রে নলিন বড় ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌ল। ছোটবৌ ভয় পেয়ে শাশুড়ীর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্‌ল—মা। অনেক ডাকাডাকির পর যখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গল, তিনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—কি হয়েছে? একটু ঘুমাতেও কি দেবে মা? সারাদিন খেটে খুটে রাতে চোখের পাতা ছুটি এক করব, তারও জো নাই। কি জ্বালাতনে পড়েছি।

ছোট-বৌ বল্‌ল,—নলিনের বড় জ্বর হয়েছে মা। সে কেমন করছে।

শাশুড়ী গায়ের ওপর একখানা মট্‌কার চাদর টেনে নিয়ে বল্‌লেন, জ্বর হয়েছে তার আমি কি করব? আমি কি ডাক্তার?

আর কোন কথা না বলে ছোট-বৌ ঘরে এসে ছেলের কপালে অডিকলোনের পটি দিতে লাগল।

সকালে ডাক্তার অবস্থা দেখে মুখ একটু বিকৃত করে যখন বল্‌লেন,—বড় ভাল বুঝছি না, ছোট-বৌ তখন সমস্ত লজ্জা দূরে ফেলে ডাক্তারবাবুর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বল্‌ল—ওকে বাঁচিয়ে দিন।

কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় নলিন জননীর কোল শূন্য করে জগৎজননীর কোলে আশ্রয় নেবার জন্য প্রস্তুত হল। তখন বাড়ীর পুরাতন সরকার রমানাথের হাত ছুটি ধরে ছোট-বৌ বল্‌ল—একবার তাঁকে এইবেলা নিয়ে এস রমানাথ দা। নলিনকে বুঝি আর ধরে রাখতে পারলাম না। বৃদ্ধ রমানাথ ছোট ছেলের মত কেঁদে বল্‌ল,—এই চল্‌লাম দিদি। যেমন করে পারি তাকে আনবই। হায় ভগবান, এই সমস্ত দেখবার জন্যই কি কর্ত্তা আমায় রেখে গেছেন!

সেদিন রাত্রে তবলার ঠেকার সঙ্গে পেশোয়াজের রুনু ঝুনু শব্দ উঠে বাগানবাড়ীর চারিদিকে যেন স্বপ্নের জাল বুন্‌ছিল। রমানাথ ছুই হাত বুকে জুড়ে বল্‌ল,—ভগবান, একি তোমার লীলা। ছেলে বাড়ীতে মরছে, আর বাপ……। ফটকের কাছে এসে দরোয়ানকে রমানাথ বল্‌ল—আমি ছোটবাবুকে নিতে এসেছি, দরজা খোল, ভিতরে যাব। উত্তরে দরওয়ানজী বেশ মোলায়েম করেই বল্‌ল—হুকুম নেহি, ভাগো হিয়াসে উল্লু।

রমানাথ বারবার মিনতি করেও যখন দরওয়ানজীর গালাগালি ছাড়া আর কিছুই পেল না, তখন তার হাতের ছোট লাঠি গাছটি এমন একটি উপায় করে দিল যে তার বাগানের ভিতর আসতে আধমিনিটের বেশি সময় লাগল না।

নূরীবিবি তখন গান ধরেছে:—

সেঁইয়া যাও যাও নেহি বোল জবান
এতনা বাতসে মোরি জান।

রমানাথ একেবারে ঘরের ভিতরে এসে ডাক্‌ল্—ছোটবাবু। নূরীবিবির পায়ের নূপুর বেসুরো বেজে উঠ্‌ল ;—তবলাদারের তেহাইয়ে ভুল হয়ে গেল,—হারমোনিয়মের নাকি সুর থেমে গিয়ে চারিদিক হতে চীৎকার উঠল—এঃ, সব মাটি করে দিল রাস্কেল। নিকালো হিঁয়াসে। হাজার টাকার নেশা বেটা একেবারে মাটি করে দিলে।

রমানাথ হাত জোড় করে বল্‌ল,—কর্ত্তারা বেশি ব্যস্ত হবেন না, আমি এখুনি চলে যাব। তারপর ছোটবাবুর কাছে সরে এসে বল্‌ল,—বাড়ী চল। ছোটবাবুর নেশা তখন সপ্তমে চড়ে উঠেছিল। বন্ধুদের সামনে সামান্য একজন চাকরে তাঁকে অমন করে হুকুম করল। তিনি কিছুতেই তা সহ্য করতে পারলেন না। পা থেকে জুতা খুলে রমানাথকে ছুঁড়ে মারলেন। রমানাথ হেঁট হয়ে জুতাটি কুড়িয়ে নিয়ে, বাবুর পায়ে পরিয়ে দিতে দিতে বল্‌ল,—ছোটবাবু, তুমি ছেলেবেলায় আমায় অনেক জুতা লাথি মেরেছ, এটিকেও আমি তার সামিল মনে করব। কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।

ছোটবাবুর নেশার ঘোর হঠাৎ যেন কেটে গেল। তিনি সোফা থেকে উঠে বল্‌লেন, কি বল্‌ছ ? কোথায় যেতে হবে আমায় ? ভাল করে বুঝিয়ে বল্‌লে না, দেখ ত, তোমায় মেরে বস্‌লাম।

রমানাথ হেসে বল্‌ল,—তুমি আমায় বুঝিয়ে বল্‌বার সময় দিলে কৈ ছোটবাবু ? সে যাক্—কিন্তু আর দেরি করা চল্‌বে না, এখুনি যেতে হবে নইলে......। সে আর কথা শেষ করতে পারল না।

ছোটবাবু বল্‌লেন,—নইলে কি রমানাথ দা ?—নইলে আর তাকে দেখ্‌তে পাবে না।

ছোটবাবুর মুখ সাদা হয়ে গেল। তিনি বলে উঠ্‌লেন,—কাকে ?

উত্তরে রমানাথ শুধু বল্‌ল—চল।

গভীর রাত্রে চোরের মত জমিদার বীরেন্দ্রনাথ যখন তাঁর নিজের ঘরের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন, তখন নলিনের দেহ তারা নিয়ে গেছে। ঘরের ভিতর কেমন একটা বিশৃঙ্খল ভাব, দেখ্‌লেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মেঝের ওপর উপুড় হয়ে কে পড়ে আছে। ছোট বৌ তাঁর পায়ের শব্দ পেয়ে উঠে বসে বল্‌ল,—ওরা কিছুতেই আর তাকে রাখ্‌তে দিলে না। জোর করে কেড়ে নিয়ে গেল। একবার তোমাকে দেখাতেও পারলাম না। এখন আমি......। তার কথা আর শেষ হল না। মূর্চ্ছা এসে ছোট বৌএর পীড়িত দেহমন তার স্নিগ্ধ কোলে টেনে নিল।

নলিনের মৃত্যুর পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। এ কয়দিন ছোটবাবু আর বাড়ীর ভিতর আসেন নি। বাইরের একটি ঘরে থাকতেন। সেদিন মা 'ডাইনী-বৌএর মুখের উদ্দেশে অভিশাপের অগ্নিসংযোগ করে ছেলের কাছে যখন আর একটি বিয়ের প্রস্তাব করলেন,—বিরক্ত

হয়ে ছোটবাবু বল্লেন,—মা আমি একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাই। ছেলের মুখের অবস্থা দেখে তাঁর আর কথা বল্বার সাহস হল না।

সন্ধ্যাবেলা ছোটবাবু একা বসে ভাবছিলেন,—নলিনের জন্য শোক করা বুঝি তাঁর অধিকারের বাইরে। তিনি মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে বল্লেন,—আমি দয়া চাই না ভগবান, শুধু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের একটা উপায় করে দাও।

রমানাথ ঘরে ঢুকে ডাক্‌ল—ছোটদাদা।

—কে রমানাথ দা ?

ছোটবাবুর গলার স্বরে রমানাথের বুঝতে বাকি রইল না যে তিনি কাঁদছিলেন। সে তাঁর কাছে বসে, ছেলেবেলায় যেমন করে তাকে কোলে করে নিত, তেমনি করে দুই হাত দিয়ে ছোটবাবুর মাথাটি বুকে চেপে বল্‌ল—দাদা, শাস্তির বুঝি এখনও কিছু বাকি আছে। সারাজীবন হয়ত কেঁদেই কাটাতে হবে। তুমি ছোটদিদির কাছে একবার কি গিয়েছিলে ?

ছোটবাবু বল্লেন,—না।

—বড় অন্যায় হয়ে গেছে দাদা। আমারই দোষ, অতটা খেয়াল করি নি। যে দিন দেখ্‌লাম তিনি ননীকে বুকে নিয়ে আদর কর্‌ছেন, সেদিন মনে করেছিলাম তিনি শোকটা বুঝি সাম্‌লে নিয়েছেন। তখন কি জানতাম ভিতরে ভিতরে এমন সর্ব্বনাশ করছেন।

ভয় পেয়ে ছোটবাবু বল্লেন,—কি করেছেন ?

—যদি তুমি একবার তার কাছে যেতে দাদা তাহলে বোধ হয় এমন হতে পারত না।

ছোটবাবুর সমস্ত শরীরে যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠ্‌লেন,—এই অপবিত্র দেহটি নিয়ে যাব তার কাছে ?......

রমানাথ বল্‌ল—ঐত ভুল করলে দাদা। এক ফোঁটা গঙ্গাজলে সহস্র পাপ ধুয়ে যায় তা কি জান না ? আর দেরি কোরো না ভাই। সেইদিন থেকে দিদি আমার জলস্পর্শ করেন নি। তার ওপর কি নির্য্যাতনই না গিয়েছে।

ছোটবাবু যখন স্ত্রীর বিছানায় এসে বস্‌লেন,—ছোট বৌ তখন সুখদুঃখের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে। তার মুখের কাছে মুখ এনে ছোটবাবু বল্লেন, সুধা, আমার সমস্ত অত্যাচার, অপরাধ এতকাল নীরবে সহ্য করলে, তারপর আমি নিজে যখন আমার ভুল বুঝতে পারলাম, তখন যে আমার কোনও উপায় রাখ্‌লে না।

ছোট বৌ তার একখানি হাত স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিতে গেল; কিন্তু দুর্ব্বলতার জন্য অতদূর পৌঁছাল না। অনেক চেষ্টার পর তার গলা দিয়ে অতি ক্ষীণ কথা বেরুল,—তোমার মুখটি একবার আমার চোখের সামনে ধরোনা গো। ভাল করে যে দেখ্‌তে চাই।

ছোটবাবু স্ত্রীর মুখখানি চোখের জলে ধুয়ে বল্লেন,—আমি নলিনকে হারিয়েও মনে

করেছিলাম, তুমি তোমার পুণ্যে আমার সকল কালি মুছে নেবে। আজ যে তোমার সঙ্গেই আমার সে আশার ক্ষীণ আলোকটিও নিব্‌তে চল্‌ল সুধা। ছোট বৌ ইঙ্গিতে স্বামীকে বালিশের নীচে হতে কিছু বার করে নিতে বল্‌ল। ছোটবাবু একটুকরা কাগজ পেলেন। ছোট বৌ বল্‌ল,—এ কদিন ঐটুকু বুকে করে আমি বেঁচেছিলাম। ছোটবাবু সেটিকে বাতির কাছে ধরে দেখ্‌লেন তাতে আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা আছে—বাবাকে ভালবাসি আর মাকে ভালবাসি আর......। এইখানেই কাগজটি ছিঁড়ে গেছে।

ছোটবাবু আকুল হয়ে কেঁদে বল্‌লেন,—বাপ আমার মাণিক আমার, এই ঢের, এতেই হবে। তোর এই হাতে লেখা চিঠি, আমার ভাঙ্গাবুকে চেপে বেঁচে থাক্‌ব। এই আমার জীবনপথের সম্বল, আমার পারের কড়ি। তিনি স্ত্রীর বুকের উপর মূর্চ্ছিতের মত নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলেন। কিন্তু তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ছোট বৌ তার স্নিগ্ধ হাতখানি আর বাড়িয়ে দিল না।

৺গোকুলচন্দ্র নাগ।

বউ কথা কও

পতিব্রতার দেশ যে এটা, পতিসেবাই কর্ম্ম ;
পতি ভিন্ন কয়না কথা, সেটাই তা'দের ধর্ম্ম।
'পতিরেকোগুরুঃস্ত্রীণাম্' জান্‌তে যদি পাখী,
'বউ কথা কও' সুরে কি আর কর্‌তে ডাকাডাকি ?

ঘরের কোণে বৌরা থাকে আপন ভাবনা ল'য়ে,
কারুর সাথে কয়না কথা, রইছে সকল স'য়ে।
প্রবাস্‌গত পতির তরে সদাই যা'রা মগ্ন,
তোমার ডাকে আর হবেনা তা'দের ধেয়ান্ ভগ্ন।

সাধ্বী নারী কেউ চলেনা পর্ পুরুষের মতে ;
সুরের সুরধুনী বৃথা বহাও আকাশ পথে।
উদাস্-করা ওই রাগিণী গাইছ করুণ প্রাণে ;
অন্তরে বৌ বহুৎ দূরে, বাজ্‌বে কি আর কাণে ?
'প্রোষিতভর্ত্তৃকাধর্ম্ম' জান্‌লেনা ভাই পাখী!
মিছাই গলা ভাঙ্‌ছ তুমি 'বউ কথা কও' ডাকি।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

রোমে স্ত্রী স্বাধীনতার সুফল ও কুফল

শিক্ষা ও সংযমের উপর যে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা নহে, সে স্বাধীনতা কখনও সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে না। রোমের নারী স্বাধীনতার পথে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন নিজদিগকে শিক্ষিতাও করিয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু সে শিক্ষা সাধারণতঃ চরিত্র গঠনে সহায়তা করে নাই—মনে সংযম আনে নাই। তবে সকল নারীরই যে শিক্ষা বিফল হইয়াছিল একথা বলিলে ইতিহাসকে ভুল বুঝা হইবে। পরদেশ-লুণ্ঠনজাত ঐশ্বর্য্যের ফলেই নারী তাহার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। আবার ঐ ঐশ্বর্য্যের বলেই তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রথম যুগে রোমে বালিকাদের চিত্রবিদ্যা ও বয়নবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। সাধারণ গৃহস্থের শিশু কন্যারা সকালে উঠিয়া গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িতে যাইত, সেখানে বালক-বালিকাদিগকে এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হইত। এসময়ে ছেলে মেয়েদের বয়স সাত আট বৎসর হইত। গ্রন্থ পাঠ করিয়া লাটিন ও গ্রীকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই বালিকা উচ্চশিক্ষিতা বলিয়া গণ্য হইত। নৃত্য-গীতও মেয়েরা কিছু কিছু শিখিত। অনেক রমণীই বীণা-বাদ্যে পটীয়সী ছিলেন।

কিন্তু রোমে যখন নূতন যুগ আসিল—নারী যখন ক্রমে ক্রমে তাহার অধিকারের ভূমিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হইল, তখন তাহার পক্ষে বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর সুযোগ উপস্থিত হইল। ঐশ্বর্য্যের ফলে তাহার যথেষ্ট অবসর হইল। আর সেই সময়েই গ্রীক-সভ্যতা প্লাবনের ন্যায় আসিয়া রোমান সভ্যতাকে ডুবাইয়া দিতেছিল। রোমে পুরুষের ন্যায় নারীরাও গ্রীক-সভ্যতার অমৃত আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিতে উৎসুক হইলেন। বিদ্যামন্দিরে তখন গ্রীক কাব্য নাটকেরই আদর। গ্রীক শিক্ষকেরাই রেমের স্ত্রী পুরুষের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিয়া রোমানগণ আরও সুমার্জ্জিত-রুচি-সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম শতাব্দীর হাস্যরসিক জুভেনাল দেশবাসীকে এইরূপে গ্রীকভাবাপন্ন দেখিয়া অত্যন্ত হাস্যবিদ্রুপ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত এমনভাবে গ্রীক বনিয়া গিয়াছিল যে "ওগো তোমায় আমি ভালবাসি" একথাটাও গ্রীক ভাষায় তাহারা তাহাদিগের প্রণয়ীকে বলিতেন। যাহা হউক ইহার দ্বারা এই বুঝা যায় যে নারীরা তখন গ্রীকভাষা বেশ আয়ত্ত করিয়াছেন।

সম্রাট আগষ্টাসের প্রাসাদে সাহিত্যের যে আসর বসিত, তাহাতে নারীরাও যোগ দিতেন। তাঁহার ভগিনী অক্টাভিয়ার নামে একখানি দর্শনগ্রন্থ উৎসর্গীকৃত আছে; ভার্জ্জিল ইনিড নামক মহাকাব্যের ষষ্ঠ অধ্যায় সম্রাটকে ও তাঁহার ভগিনীকে পড়াইয়া শুনাইয়াছিলেন। বিয়োগান্ত নাট্যকার ভারিয়াসের স্ত্রী অত্যন্ত বিদুষী ছিলেন। ওভিডের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর

কন্যা পিরিলা কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সম্রাট নীরোর মাতা আগ্রিপিনা এক খানি নিজের জীবন-স্মৃতি লিখিয়াছেন ; তাহা হইতে টাসিটাস্, প্লিনি প্রভৃতি ঐতিহাসিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এমন অনেক শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন যাঁহারা নিজে কিছু না লিখিলেও স্বামী বা বন্ধুর লেখায় সাহায্য করিতেন ও উৎসাহ দিতেন। ছোট প্লিনির স্ত্রীর বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে রোমের স্ত্রী-স্বাধীনতার তিনি একটী সুমধুর ফল। ছোটপ্লিনি বলেন যে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার লেখা বইগুলি বারংবার পড়িতেন এমন কি মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন। যখন স্বামী আদালতে ওকালতী করিতে যাইতেন, তখন স্ত্রী সংবাদ লইতেন যে কিরূপ বক্তৃতা হইতেছে। প্লিনির কবিতাগুলিও তিনি সুর বসাইয়া নিজে গান করিতেন। অনেক নারী স্বামীদের নিকট ও বন্ধু বান্ধবের নিকট এমন সুন্দর সুন্দর পত্র লিখিতেন, যে তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। প্লিনি তাঁহার এক বন্ধুর পত্নীর পত্র শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে এগুলি প্লেটাস বা টিরেন্সের লেখার তুল্য। বহু নারী কবি-যশের প্রার্থিনী হইতেন। তাঁহারা সকলেই ছোটখাট সাফো হইতে ইচ্ছা করিতেন। যাঁহারা কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না তাঁহারা সমালোচনা করিতেন। জুভেনাল নারীর এরূপ কাব্যদর্শনাদি চর্চ্চা করাকে বোধহয় মেয়ে-জ্যাঠামী মনে করিতেন, তাই তাঁহার Sixth Satireএ বলিতেছেন যে ভোজের জায়গায় পাঁচমিনিট যাইতে না যাইতেই মহিলারা হোমার ভার্জ্জিল প্রভৃতি সম্বন্ধে উচ্চ রসচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিতেন---আর কাহাকেও কথা বলিতে পর্য্যন্ত দিতেন না। তাঁহারা নিজের বিদ্যা জাহির করার জন্য বড়ই ব্যগ্র—কথায় কথায় প্রাচীন গ্রন্থকারের লেখা উদ্ধার করিয়া নিজের উক্তির সমর্থন করেন—সে সব গ্রন্থকারের নামও হয়তো পুরুষবন্ধুরা জানেন না। পুরুষবন্ধুদের একটু ব্যাকরণ ভুল হইলে আর রক্ষা নাই। মার্শিয়ালও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিয়াছেন যে তাঁহাকে যেন বিদুষী স্ত্রী বিবাহ করিতে না হয়। মার্শিয়াল, জুভেনাল প্রভৃতি কবিগণ রোমের প্রাচীন রীতির উপাসক ছিলেন।

রোমের যে সকল নারী দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিতে চাহিতেন তাঁহাদের অনেক সামাজিক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত। সেনেকার ন্যায় দার্শনিকও তাঁহার স্ত্রীকে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র লেখাপড়া করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে আর ঘরে থাকিবেনা—পুরুষদের সহিত তর্ক করিয়া বেড়াইবে। কিন্তু ক্রমে পুরুষদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞ তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার সুফল বুঝিতে পারিলেন। তাই প্লুটার্ক বলিয়াছিলেন যে নারীকেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আর মেয়েরা যদি নীতি ও দর্শন শাস্ত্র না অধ্যয়ন করে, তবে কেমন করিয়া তাহাদের সতীত্ব রক্ষা করিবে? অনেক রমণী দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন। তবে হোরাস্ তাঁহার বিদ্রুপাত্মক কবিতায় বলিয়াছেন যে অনেক মেয়ে দর্শন লইয়া খেলা করিতেন মাত্র। প্লেটোর রিপাব্লিকে নারীর অধিকার সম্বন্ধে অনেক

কথা আছে'। রোমে অনেক নারী শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া দেশ-সেবায় নিজ নিজ শক্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন। সুশিক্ষার ফলে তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাসমূহ চিন্তা করিতে পারিতেন। তাঁহাদের পতিপুত্রকে তাঁহাদের মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া রাষ্ট্রীয় সংস্কারের চেষ্টা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রসংস্কারক গ্রাকাই ভ্রাতৃদ্বয় মাতা কর্ণেলিয়ার নিকট হইতেই সংস্কার-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

কর্ণেলিয়া পুত্রদ্বয়কে যখন সংস্কারের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, তখন অনেকে বলিতে লাগিল যে এরূপ কার্য্য করিতে গেলে তাঁহাদের প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কর্ণেলিয়া ভাবিতেন দেশকে সুপথে পরিচালনা করিতে যাইয়া মৃত্যুলাভ শ্রেয়ঃ। তাই তিনি কিছুমাত্র ভীতা না হইয়া পুত্রদ্বয়কে ঐ কার্য্যে আরও প্ররোচিত করিলেন। যখন পুত্রদ্বয় সত্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন তখন তিনি ধীরভাবে সে দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। যে স্থানে পুত্রদ্বয়কে হত্যা করা হইয়াছিল, সে স্থানটী পবিত্র ছিল বলিয়া তিনি আরও পুত্রভাগ্যে ভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলেন। কর্ণেলিয়ার বন্ধুবান্ধব ছিলেন অনেক। তাঁহার দ্বার তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বড় বড় গ্রীক পণ্ডিতদের সহিত তিনি সমানভাবে আলাপ করিতেন। এই সকল কথাবার্ত্তার মধ্যে নিজের মৃত পুত্রদ্বয় সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেও তিনি সঙ্কুচিতা হইতেন না। জুলিয়াস সিজারের মাতা অরেলিয়াও এইরূপ একজন প্রসিদ্ধা রমণী ছিলেন। তিনি শিক্ষিতা হইয়াও কিন্তু নিজের যশের জন্য ব্যস্ত হইতেন না, পুত্রের উন্নতিরই চেষ্টা করিতেন। সিজার যে অত বড় হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ তাঁহার মাতা অরেলিয়া। পম্পের সহিত যখন জুলিয়াস্ সিজারের অত্যন্ত মনোমালিন্য চলিতেছিল তখন সিজারের কন্যা ও পম্পের পত্নী জুলিয়াই তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। দেশ যাহাতে গৃহবিবাদে উচ্ছন্ন না যায় সেইজন্য তিনি সর্ব্বদা উভয়কে বন্ধুভাবে চলিতে পরামর্শ দিতেন। অ্যাণ্টনির স্ত্রী অক্টেভিয়া রাজকার্য্য পরিচালনে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

কিন্তু এইরূপে দেশ ও সমাজের মঙ্গলার্থে রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন এরূপ নারীর সংখ্যা খুবই কম হইতেছিল। নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য বা লোকের প্রশংসা পাইবার জন্য অধিকাংশ নারী রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। রোমের কয়েকটী নারী ক্যাটেলিনিয়ান ষড়যন্ত্রের সহিত লিপ্ত ছিলেন। ঐ ষড়যন্ত্র দুশ্চরিত্র লোকদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। একজন দুশ্চরিত্রা নারী পুরস্কারের আশায় এই ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিয়াছিল। তাহাতেই ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সাজা দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বক্তা সিসেরো তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি গৃহস্থালীর কোন খোঁজখবর না রাখিয়া কেবলমাত্র রাজনৈতিক চর্চ্চা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। সিসেরো যখন অন্য একজন নারীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি সিসেরোর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর

সহিত পরিণয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হন। রোমের অনেক সম্রাট তাঁহাদের পত্নীর হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। আগষ্টাসের ন্যায় বিজ্ঞ ও সুচতুর সম্রাটও তাঁহার পত্নীর উপদেশ ব্যতীত কোন গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না বলিয়া কথিত আছে। যখন তিনি পত্নীর সাহায্য পাইতেন না, তখন পত্নীকে দেখাইবার জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কথোপকথন সংক্ষেপ করিয়া স্ত্রীকে আনিয়া দিতেন। সাম্রাজ্যের যুগে নারী তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য অনেক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন। মেসালিনা ষড়যন্ত্র করিয়া সম্রাটের জীবন নাশ করিয়া, তাঁহার স্বামীর পদচ্যুতির জন্য গুপ্ত পরামর্শ করিয়াছিলেন। নীরোর মাতা আগ্রিপানা রাজক্ষমতা স্বহস্তে রাখিবার জন্য প্রথমে বহু হত্যাকার্য্যে হস্ত কলঙ্কিত করেন। পরে যখন নীরো বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং ক্ষমতা পরিচালনা করিতে লাগিলেন, তখন আগ্রিপানা পুত্রের উপর অধিকার স্থাপনের জন্য মাতার কর্ত্তব্য ও পদমর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে যুবতী রমণী ও উৎকৃষ্ট মদ দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া নিজে রাজ্যশাসন করিবার প্রচেষ্টা করেন। তাহাতেও যখন নীরো নিজে ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না, তখন বলিতেও দুঃখ ও লজ্জায় মুখ ম্লান হয়—আগ্রিপানা নীরোর মদোন্মত্ত অবস্থায় সম্মুখে যাইয়া নিজের দেহকে পুত্রের উপভোগের জন্য প্রদান করিতে চাহিলেন। একথা ট্যাসিটাস তাঁহার Annalsএর ত্রয়োদশ খণ্ডে বলিয়াছেন। যেখানে এরূপ লোমহর্ষণ অমানুষিক ব্যভিচার (incist) চলিতে পারে, সেখানে ধ্বংসের দেবতা যে তাঁহার উদ্যত অশনি লইয়া বসিয়া থাকিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রোমান সাম্রাজ্যে বন্ধু আত্মীয় বা পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য নারীর বিষ-প্রয়োগের শত শত উদাহরণ রহিয়াছে। কিন্তু এগুলিকে রোমে নারী স্বাধীনতার ফল বলিয়া বুঝিলে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িতে হইবে। মোগল সাম্রাজ্যের মেয়েদের কঠোর অবরোধের মধ্যে থাকিতে হইত, কিন্তু সে স্থানেও তাঁহারা কি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে নিজেদের হস্ত কলুষিত করেন নাই? স্বেচ্ছাচারতন্ত্র যে সাম্রাজ্যের মূলমন্ত্র হইবে—সেইখানেই গুপ্ত ষড়যন্ত্র দেখা দিবে,—ইহাই ঐতিহাসিক নিয়ম।

রোমের নারী স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াছিল, ইহা দেখাইবার জন্য এক শ্রেণীর লেখক বলিয়া থাকেন যে রোমের নারী যেমন দুশ্চরিত্রা হইয়াছিলেন এরূপ দুশ্চরিত্রা অদ্যাবধি জগতের আর কোন স্থানের রমণী হয় নাই। ইহার উত্তরে দুইটা কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ, দুশ্চরিত্রতা সম্বন্ধে যতটা শোনা যায়, তাহার সবই যে সত্য তাহা নহে। রোমের লোকেরা সাধারণতঃ প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন—নারীর বিদ্যাচর্চ্চা, পুরুষের সহিত সমানভাবে তাহার ব্যবহার তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতেন না। ঈর্ষা বা কুসংস্কার বশতঃ স্বাধীনা নারীর সম্বন্ধে তাঁহারা মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর লোকের কথা সর্ব্বথা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। জুভেনাল, মার্শিয়াল, লুসিয়ান ইহারা সকলেই বিদ্রূপাত্মক

কবিতা লিখিতেন। Satireএর একটী প্রধান নিয়মই হইতেছে এই যে অল্প দোষকে বেশী করিয় বলিয়া সমাজকে কশাঘাত করা ও তাহার দ্বারা সংশোধন করা। সুতরাং ইঁহারা নারী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই তাহার পর St. Zerome, St. Augustine শ্রেণীর খৃষ্টান সাধুগণ রোমের নারীচরিত্রের প্রতি যথেষ্ট কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁরা অখৃষ্টান সম্প্রদায়ের জাগতিক ভাব দেখিয়া এতই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন যে, ইহাঁদের পক্ষে দুই চারিটা বেফাঁস কথা বলা অসম্ভব নহে।

তবে রোমের নারী যে নৈতিক পথভ্রষ্টা হন নাই একথা বলিবার উপায় নাই। ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের প্রথমযুগে একটী আইন করা হইয়াছিল, কিন্তু সে আইন চলে নাই।

একবার একব্যক্তি কেবলমাত্র যে সকল পরিবার রোমের উচ্চতম শাসনকর্ত্তার পদ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পান যে তিন সহস্র নারী ব্যভিচারিণী। সামান্য একটী গণ্ডীর মধ্যে যখন এত ব্যভিচার, তখন সমাজের মধ্যে যে ব্যভিচার ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। আর ঐতিহাসিক লিভি ও ট্যাসিটাসও নারীর দুশ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এখন আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে যে ঐ ব্যভিচার কি নারী-স্বাধীনতার ফল? নারী সমাজ-দেহের অর্দ্ধাংশ মাত্র। পুরুষ অপরার্দ্ধ। এখন যদি একার্দ্ধ পূতিগন্ধময় কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হয়, তবে অপরার্দ্ধ কি তাহারই আনুষঙ্গিকভাবে রোগাক্রান্ত হইবে না? রোমের পুরুষ রোমের চরম শত্রু কার্থেজের ধ্বংস সাধন করিয়া ও সিসিলি, গ্রীস, ম্যাসিডন, স্পেন প্রভৃতি বহুদেশ জয় করিয়া একেবারে বিলাসিতা ও ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। রোমের সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য তখন মানব কল্পনার অতীত—পৃথিবীর যুগযুগান্তর-সঞ্চিত অর্থ আসিয়া রোমের কোষাগার পূর্ণ করিয়াছে। অগ্নি না হইলে যেমন জীবন ধারণ করা চলেনা, অথচ সেই অগ্নিই যদি প্রবল হয়, তাহা হইলে সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলে, তেমনি অর্থ না হইলেও লোকের চলে না. কিন্তু সেই অর্থই যদি অগাধ পরিমাণে বিনা আয়াসে আসিতে থাকে তবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। রোমেও ঠিক তাহাই হইল। রোমের অর্থ রোমের জনশক্তির নৈতিক চরিত্রকে ডুবাইয়া দিল। পুরুষ যখন নিত্য নূতন ব্যভিচারে নিমগ্ন তখন নারী কি কতকগুলা শুষ্ক নীতির কথা স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিবে।

চোখের উপরে সে তাহার স্বামীর উদ্দাম কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা দেখিয়া সে রক্তমাংসের শরীর লইয়া কেমন করিয়া সংযত থাকিবে? সমাজে পুরুষ যদি প্রকাশ্যে নির্লজ্জের মতন ব্যভিচার করে, তবে নারী শত উপদেশ সত্ত্বেও ভ্রষ্টা হইবেই। নীতিকথা অপেক্ষা দৃষ্টান্তের মূল্য বড়, একথা এক্ষেত্রেই ভুলিলে চলিবে না। নারীর চরিত্র রক্ষা করিতে হইলে পুরুষকে আগে চরিত্রবান হইতে হইবে। কিন্তু রোমে আমরা কি দেখি? প্লুটার্ক একজন

নব বিবাহিতা বধূকে উপদেশ দিতেছেন যে, তাঁহার স্বামী দাসীদের সহিত প্রণয় করিতেছেন,—এ যদি কোনদিন চোখে পড়ে তবে স্বামীর সহিত যেন ঝগড়া না করেন। কেননা স্ত্রী হইতেছেন সম্মানার্হা—শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্রী—আর দাসী সে নীচ—সুতরাং তাহার উপরই পুরুষ তাঁহার নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন। হায় সকল নারী কি এমন পূজা পাইয়া সেই অপূর্ব্ব পূজাশীল স্বামীর চরণ পদ্ম ধ্যান করিয়া থাকিতে পারে? সে কি পাষাণী?

রোমের অগাধ ঐশ্বর্য্যই যে তাহার নর ও নারীর চরিত্রহীনতার কারণ, তাহা সেই উচ্ছৃঙ্খলতার যুগেও রোমের চিন্তাশীল মনীষিগণ বুঝিয়াছিলেন। তাই কবি জুভেনাল বলিতেছেন—"বন্ধু! অর্থ যতদিন দেশে প্রচুর না ছিল, ততদিন রোমের মহিলারা সতী ছিলেন, দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন।"

সমাজের একস্তরে যদি অর্থ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে অন্য স্তরের লোক না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু অর্থের প্রচুর সমাগম যে সর্ব্বথা প্রার্থনীয় নহে, তাহা রোমের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে সেখানে স্তূপীকৃত অর্থই পুরুষের চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল করিয়াছিল ও তাহার দেখাদেখি নারী চরিত্রহীনা হইয়াছিল। রোমের স্বাধীনা নারীদের সম্মুখে নানা প্রলোভন উপস্থিত হইয়াছিল; তাঁহারা সেগুলি জয় করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ রোমে এত বেশী ক্রীতদাস-দাসীর আমদানী হইয়াছিল যে নারীকে গৃহকর্ম্ম করিতে হইত না। নারীর কর্ত্তব্যের কেন্দ্র হইতেছে গৃহ—সেইস্থানে যদি তাহাকে কোন কর্ত্তব্য করিতে না দেওয়া হয় তবে নারী সমাজের পরগাছাস্বরূপ হইয়া সমাজদেহের রস শোষণ করে মাত্র। রোমের ধনী গৃহিণীরা সন্তানকে স্তন্য দান পর্য্যন্ত করিতেন না—সেকাজও ধাত্রী করিত। সুতরাং সময় অতিবাহিত করিবার জন্য রোমের নারীকে নানারূপ আমোদ আহ্লাদ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত। তাহার পর পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে রোমের পুরুষেরা ক্রীতদাসী লইয়া প্রণয়ের খেলা খেলিতেন। তাই দেখিয়া নারীও তাহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। সুন্দর ক্রীতদাস কিশোরের মূল্য রোমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। নারী ক্রীতদাসের দ্বারা কাজ করাইতে করাইতে নির্দ্দয়-হৃদয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের কাজে বিন্দুমাত্র ক্রুটী পাইলে কঠোরভাবে কশাঘাত করিতেন। হতভাগ্য হতভাগিনীদের দেহ রুধিরে রঞ্জিত হইয়া যাইত, আর গৃহস্বামিনী পরম আনন্দভরে তাহা লক্ষ্য করিতেন। হ্যাভলকইলিস-এর বর্ণিত Sadistic Spirit রোমের রমণীদের মধ্যে আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রমণী আনন্দ চাহিত—রোমে আনন্দের অভাব নাই। রোমে তখন সার্কাস, থিয়েটার, মল্লযুদ্ধ লাগিয়া আছে। এসকল স্থানে নারীর অব্যাহত গতি। থিয়েটার ও মল্লযুদ্ধ দেখিবার স্থান নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক ছিল। কিন্তু সার্কাসে স্ত্রীপুরুষ একত্রে বসিয়া ক্রীড়া-কৌতুক দর্শন করিতেন।

ওভিড বলিয়াছেন নারী সেখানে শুধু দেখিতে যাইত না, দেখাইতে যাইত। সার্কাসে যাইবার সময় তাহার আর বেশভূষার পারিপাট্যের সীমা পরিসীমা ছিলনা। কোন রমণী অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অবস্থার হইলে তিনি প্রতিবেশীর নিকট হইতে ধার করিয়া পোষাক পরিতেন। যুবতীরা সার্কাস দেখিতে যান বলিয়া যুবকেরা সেখানে যাইতেন। একত্রে গলাগলি করিয়া নরনারী সার্কাস দেখিতে দেখিতে জীবনের নব নব সম্বন্ধের বন্ধনে বদ্ধ হইতেন। রোমের অনেক বিবাহের ঘটকালী সার্কাসেই হইত। রোমের নারী যে শুধু খেলাই দেখিতেন তাহা নহে, খেলোয়ারদের প্রতিও তাঁহার আসক্তি কম ছিলনা। মল্লযোদ্ধা, অভিনেতা, চিত্রকর, কবি — ইঁহারা রোমের রমণী সমাজে পরমাদরে অভ্যর্থিত হইতেন। রোমের ধনীদের গৃহে ভোজ উৎসব লাগিয়াই ছিল। সে সকল উৎসব যুবক যুবতীর অবাধ মিলনের প্রকৃষ্ট স্থল। পূর্ব্বে রোমে নিয়ম ছিল যে নারী মদ্য স্পর্শ করিতেও পাইবেন না। যদি কোন নারী গোপনেও এরূপ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। কিন্তু এই বিলাসিতার যুগে, উচ্ছৃঙ্খলতার পঙ্কিল আবর্ত্তে সে সুন্দর সংযত নিয়মগুলি কোথায় ভাসিয়া গেল। রোমের সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণীগণ স্বাধীনতার চরম অপব্যবহার করিয়া—মদিরার ফেনিল স্রোতে লজ্জা সংযমকে বিসর্জ্জন দিলেন।

পূর্ব্বে আরও নিয়ম ছিল যে পুরুষ কোচের উপর শুইয়া আরামে আহার করিতে পারিবেন, কিন্তু নারীকে বসিয়াই খাইতে হইবে। কিন্তু এখন সে নিয়মও চলিয়া গেল—নর ও নারী সমভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া দ্বিপ্রহর রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে উত্তেজক মদ্যমাংস পানাহার করিতে লাগিলেন। ইহার স্বাভাবিক ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। রোমের নারী স্বাধীনতা পাইয়া বিদেশের নূতন নূতন দেবদেবী রোমে আমদানী করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি যে খুব বেশী ছিল বলিয়া এরূপ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তবে বিদেশী দেবদেবীর পূজার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি তাঁহাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই সকল দেবদেবীর পূজা প্রায়ই গভীর নিশীথে সম্পন্ন হইত। অনেক পূজা কেবলমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার উপর একটা স্থূল আবরণ দিবার জন্য অনুষ্ঠিত হইত। নরনারী এখানে লজ্জা ও শ্লীলতাকে দূরে নির্ব্বাসিত করিয়া কামোন্মত্ত পশুর ন্যায় ব্যবহার করিত। সমসাময়িক কবি জুভেনাল তাহার ষষ্ঠ Satireটীতে ইহার একটি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। নারী যখন এরূপ ভ্রষ্টা হইয়া গিয়াছে তখন স্বামী যে তাহাকে সংযত করিবে সে উপায়ও নাই। স্ত্রী অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী—তাহাকে চটাইলে অনেক ক্ষতি। তাই স্ত্রী যাহা করেন, স্বামীকে তাহাতেই সায় দিয়াই যাইতে হয়। অনেক রমণী তাঁহাদের স্বামীদের উপর রীতিমত অত্যাচার করিতেন। স্বামীবেচারাকে সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইত। জুভেনাল বলিয়াছেন যে এক নারী ক্রীতদাসের সহিত ব্যভিচার করিতেছেন—এমন সময় স্বামী তাঁহাকে দেখিতে পান।

নারী অমনি রাগিয়া বলিলেন—"তুমি যা ইচ্ছা তাই করিবে, আর আমি বুঝি তাই চুপ করিয়া বসিয়া দেখিব? আমরাও তো রক্তমাংসের শরীর?" ব্যাস সব চুপ।

এই জন্যই জুভেনাল তাঁহার বিবাহকামী বন্ধুকে উপদেশ দিতেছেন যে জগতে আফিমের অভাব নাই—উঁচু দালানের—দড়িকলসীর কিছুরই তো অভাব নাই—তবে কেন তিনি এত থাকিতে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন? রোমের সর্ব্বশ্রেণীর নারীর চরিত্র ভ্রষ্ট হইয়াছিল ইহাই জুভেনালের বিশ্বাস।

যে সমাজে ব্যভিচার এত প্রবল, সে সমাজ তখনই ধ্বংস হইয়া গেল না কেন? কোন শক্তিতে সে চারি পাঁচ শত বৎসর জগতের উপর প্রভুত্ব করিল? সমাজের মধ্যে তখন এক নূতন ভাবের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। Stoicism নামক দার্শনিকবাদ চিন্তাশীল নরনারী মাত্রেই গ্রহণ করিতেছিলেন। ইহাতে জগতের সুখদুঃখের প্রতি তাঁহারা উদাসীন হইতে শিক্ষা করিতেছিলেন।

প্লিনির বর্ণিত আরিয়া নাম্নী মহিলার জীবনী হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে কোন শক্তি রক্ষা করিয়াছিল। আরিয়া সিসিনাপিটার্সের পত্নী। পিটার্স রোগ শয্যায় কাতর—তাহাতে ছেলেটীও মুমূর্ষু। সেই সুন্দর ছেলেটী মারা গেল। তখন আরিয়া এমন ভাবে পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন যে স্বামী সন্তানের মৃত্যু সংবাদ বিন্দুমাত্র জানিতে পারিলেন না। যখনই স্ত্রী স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিতেন তখনই এমন ভাব দেখাইতেন যে ছেলে যেন জীবিত আছে। পিটার্স বার বার ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন—আরিয়া বলিতেন "খোকা বেশ ভাল হয়ে উঠেছে—আজ বেশ খেতে পেরেছে"—এমনি করিয়া স্বামীকে ভুলাইতে হতভাগিনীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। তখন ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া প্রাণ খুলিয়া তিনি কাঁদিয়া আসিতেন। ইতিমধ্যে সম্রাট ক্লাডিয়ান কোন কারণ বশতঃ পিটার্সকে আত্মহত্যা করিতে আদেশ দিলেন। পিটার্স ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু আরিয়া একখানি তরবারী নিজের বক্ষস্থলে আমূল বিদ্ধ করিয়া বলিলেন "এই দেখ এতে কিছু ব্যথা লাগেনা"। সতী এমনি করিয়া স্বামীর মরণের ভয় দূর করিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে বরণ করিলেন। Stoicism এমনই ধৈর্য্য সংযম তখন শিক্ষা দিতেছিল। এদিকে আবার তখন খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক রোমান নরনারী হৃদয়ে শান্তি পাইলেন। নারীর অবস্থার উপর খৃষ্টান ধর্ম্ম কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বলিব।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

দাবানল

পর পর দুটো বছর অনাবৃষ্টি হয়ে গোলার যা' কিছু ধান খরচ হয়ে গিয়েছে, চারিদিকে দারুণ অভাব আর অভিযোগে উন্মত্তপ্রায় মাধু ঠিক করে ফেল্‌লে— জমিদারের খাজনা কিছুতেই দেবেনা সে। আশে পাশে দু'চার জন চাষা, ঠিক তারই মতন অন্নাভাবে তিল তিল করে মর্ত্তে বসেছিল—তারাও বেঁকে দাঁড়ালো। জমীদার নীলরতন বাবু প্রাচীন লোক,—পাকা মাথা তাঁর—তার ওপর আবার অসীম ক্ষমতা। সুতরাং বিদ্রোহীদের অবস্থা যে কি হবে—তা' অনেকেই ভেবে নিতে পার্‌লে।

জমিদার সরকার রামপ্রাণবাবু গজেন্দ্র গমনে মাধুর কাছে এসে বল্লেন, "হারে, তোরা কচ্ছিস্ কি? জমীদারের খাজ্‌না দিবিনে?"

মাধু সম্মুখের মাঠটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে উত্তর কল্লে, "কি আর করব ঠাকুর? দেখ্‌ছেন মাঠটা? ওতেই সেবার তিন গোলা ধান জমেছিল!" মাধুর চোখ দুটো সজল হয়ে উঠ্‌লো। সম্মুখের সেই ক্ষেতটা মরুভূমির মত ধূ ধূ কর্চ্ছে, আর দুপুরের অগ্নিবর্ষী রোদে তার নীরস কঠিন বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে এক ফোঁটা জলের জন্যে আকাশের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে।......

রামপ্রাণবাবু স্বরটা একটু নামিয়ে বল্লেন, "দেখ্, মাধু! তোর কাছে অনেক পাই থুই—তাই এতটা দরদ! আমি না হয় চেষ্টা করে দেখ্‌বো—যদি এবছরের খাজ্‌নাটা মাপ করাতে পারি। তা' ছ্যাখ্—যদি তিন্‌পো দুধ দিতে পারিস্—"

মাধু উদাসভাবে নিজের বাড়ীর দিকে দেখিয়ে বল্লে, "দুধ, ঠাকুর? ঘরে গিয়ে দেখুন এক ফোঁটা দুধের ছেলে ক্ষেপা এতটুকু দুধের জন্য মর্ত্তে বসেছে, আর রুগ্ন আলাপী এক ফোঁটা ঐ দুধের জন্যেই কাত্‌রে কাত্‌রে মর্চ্ছে—"

"মেধো! দুধ না হয় নাই দিলি, জমীদারের খাজ্‌না ত আর অসুখ বিসুখ মান্‌বে না,—তাই হয় দে, নয় বল—"

"কি কর্ব্বেন, ঠাকুর?—অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, ঘুঁষ দিয়ে দিয়ে নিজেকে সর্ব্বস্বান্ত করেছি,—আজ আর নয়। হাজতে গেলেও দু'মুঠো দুবেলা খেতে পাবো—"

"তাই খাস্ বেটা! হাজতের ভাত না খেলে আর তোরা টিট্ হবিনে!" রামপ্রাণবাবু গজ্‌ড়াতে গজড়াতে কাছারীর দিকে চলে গেলেন।—

জমিদারের একমাত্র পুত্র কিশোর—বয়স তার বারোর বেশী হবে না। সে ফির্চ্ছিলো সেই পথদিয়ে—হাতে একগোছা ফুল নিয়ে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে মাধুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে, "রামকাকা তোমাকে বক্‌ছিলেন কেন, মাধু?" মাধু এতটুকু মিষ্টস্বরে একেবারে গলে গিয়ে

গভীর গলায় উত্তর কর্ল্ল "এস্নি এস্নি রাজাবাবু! আপ্‌নি রাজা হলে কেউ আর আমাদের বক্‌বে না!"

উত্তরে কিশোর কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিলো,—সঙ্গের দরওয়ান তাকে বাধা দিয়ে নিয়ে গেল। মাধু আর একবার সেই ক্ষেতটার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে ঘরের দিকে চলে গেল।

জমীদারের বাড়ী থেকে মাধুর চালাঘর খুব বেশী দূর নয়। তিনটে জীর্ণ চালা কোন রকমে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে; চাল থেকে খড়গুলো খসে খসে পড়ে মাঝে মাঝে এক একটা বড় বড় ফাঁকের সৃষ্টি করেছে। মাধু ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা কর্ল্ল "কেমন আছিস্, মা?"

"ভাল আছি, বাবা!—তবে—"

মাধুর শ্রান্ত ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে আলাপীর কথাটা আর শেষ কর্ত্তে সাহস হ'ল না।

"তবে কিরে আলাপী?"

"না! কিচ্ছু না। জালায় ছুমুঠো চাল ছিল সেদ্ধ করে রেখেছি; ঐ ওখেনে ঢাকা আছে,—খেয়ে এস, বাবা?"

"খাবো'খুনি মা!—ক্ষেপা কেমন আছে?"

"জ্বর এখনও ছাড়ে নি!—"

"ছাড়বেও না!" মাধু একটা নিঃশ্বেস ফেলে তামাক সাজ্‌তে বস্‌লো।—

রামবাবু জমীদারের ঘরে ঢুকে দেখ্‌লেন, নীলরতনবাবু একটা সোফায় বসে 'গুড়গুড়ি'তে তামাক টান্‌ছেন। তাঁকে দেখেই একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বল্লেন "বসহে রাম! তারপর ওদের ওখেনে গিছ্‌লে?"

"গিছ্‌লাম হুজুর! আপ্‌নার কৃপায় মাথাটা ধড়ের ওপর নিয়েই ফির্ত্তে পেরেছি। ব্যাটারা বলে কিনা—জমীদারের যে'লোক আস্‌বে তার মাথা নেব!"

"বটে,—কে বলে?"

"ঐ মাধু বেটাই হুজুর!"

"হুঁ ব্যাটারা তবে নরমে নরমে খাজ্‌না দেবেনা, না?—আচ্ছা!" তারপর পাকা মাথাটা একটু হেলিয়ে অস্ফুটস্বরে কি একটা বলেই দুজনে হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন।—

রাত তখন এগারোটা বেজে গিয়েছে। বাইরের ঘন অন্ধকারের দিকে চেয়ে মাধু তখন উদাস ভাবে ভাবছিল,—কি একটা সময় এসেছে তার! ঘরে চাল নেই, পরণে কাপড় নেই, মাঠে ধান নেই; তার উপর আবার রোগ আর রোগ!—সেত একরকম অনাহারেই মরে গেল।

মৃত পত্নীর উদ্দেশ্যে মাধুর চোখ থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়্‌ল। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে আলাপী সভয়ে ডেকে উঠ্‌লো, " বাবা।"

মাধু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে জিজ্ঞাসা কর্ল্ল, " কি হলরে আলাপী ?" বলতে বলতে সে আলাপীর ঘরে ঢুকে পড়্‌ল। আলাপী উত্তেজনায়, ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল, ভয়ে ভয়ে উত্তর কর্‌লে " ঘরের পাশে চুপি চুপি কারা কথা বলছিল, বাবা "।

" বটে। " হাতের লাঠিটা জোর করে ধরে মাধু বার হয়ে পড়্‌ল। সমস্ত আশ পাশটা খুঁজে এসে বল্‌লে " কই, কেউ নেই ত আলাপী ? "

"তবে বোধ হয় পালিয়ে গিয়েছে, বাবা ! "

"মনের ভুল মা, আর জেগে থাকিস্‌ নে, ঘুমো।" তার পর ক্ষেপার দিকে দেখিয়ে বল্ল " ওটা কেমন আছে রে ? "

" ভালো আছে। " মাধু নিজের ঘরে ফিরে এসে খানিকটা ভেবে ভেবে শেষ রাত্রির স্নিগ্ধ বায়ুর স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

" বাবা ! ও বাবা !! বাবা !!! " আলাপীর ভয়ার্ত্ত কণ্ঠস্বর সহসা সমস্ত বাড়ীখানা কাঁপিয়ে তুল্ল। মাধু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে দেখে,—চারিদিকে আগুনের লোল জিহ্বা সমস্ত বাড়ীখানা গ্রাস কর্ত্তে চলেছে!—প্রভাতের রক্তিম গগন যেন সেই আলোর লালরঙে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। আগুনের এক একটা বড় হল্‌কা তার ঝল্‌সান রৌদ্রে পোড়া দেহটাকে নতুন করে ঝল্‌সে দিতে লাগ্‌লো। সে এক মুহূর্ত্তে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এল। সেখেনে কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছে, আর কতকগুলো "জল্‌ জল্‌" করে চিৎকার সুরু করে দিয়েছে।—"আলাপী, আলাপী।" মাধুর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আকাশেই মিলিয়ে গেল। পাশের একটা লোক জিজ্ঞাসা কর্‌লে " আলাপী ! আলাপী বাইরে আসে নি ?"

" না—কই না।"

" আসেনি ?"

মাধু ফ্যাল ফ্যাল করে বক্তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। লোকটা এক লাফে দাওয়ায় উঠে গেল। আগুন তখন বেশ জ্বলে উঠেছে, ধোঁয়ায় সমস্ত জায়গাটা আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। সেই আগুনের মধ্যে থেকে আলাপীর ঝল্‌সানো হতচৈতন্য দেহটাকে বাইরে আন্‌তেই চালাখানা 'মড় মড়' করে ভেঙে পড়লো। মাধু শুধু আলাপীকে দেখে হতাশভাবে বলে উঠ্‌লো —"ক্ষেপা ?"

"ক্ষেপাও ছিল নাকি। তবে গিয়েছে।"

"রঘুয়া—"

"চুপ কর মাধু। অমন কাতর হলে চল্‌বে না। শোধ নিবিনে?"

"নেব রঘুয়া। জানি কেমন করে আগুন লাগ্‌লো।" সে উন্মাদের মত একটা কাছের লোকের লাঠিটা টেনে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে জমীদারের বাড়ীর দিকে ছুটে গেল।

বাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে কিশোর সভয়ে অদূরের অগ্নিকাণ্ডের দিকে চেয়ে ছিল, আর দরজার কাছে একটা প্রহরী আপন মনে ভৈরবী ভাঁজছিল। মাধু একবার কিশোরের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে বলে উঠ্‌লো, "খুব মজা লাগ্‌ছে, না?" হাতের লাঠিটা জোর করে উঁচু করে ধরে বল্ল "শয়তানের বাচ্চা, খুব মজা লাগ্‌ছে?" তার সবল হাতের লাঠিটা সশব্দে পড়্‌তেই কিশোর একটা আর্ত্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে বল্‌ল—"মাধু!"

"মাধু! সাপের বাচ্চা—উ্যাপ!" তার পুনরুত্তোলিত লাঠিটা আর একবার সজোরে পড়্‌ল। কিশোরের গভীর আর্ত্তনাদে প্রহরীটীর চমক ভেঙে গিছ্‌লো, সে চিৎকার করে আরও দুএকজন জুটিয়ে মাধুকে বীরদন্তে বেঁধে ফেল্লো।

মাধুর দৃষ্টি তখন কিশোরের দিকে। তাহা উদ্‌ভ্রান্ত। সে একবার বিহ্বলভাবে তার কৃতকর্ম্মের দিকে চেয়ে বল্ল "আঃ, রাজাবাবু! তোমাকেই মার্ল্লাম শেষে!"

চাষার দুটো চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে খানিকটে জল ঝরে পড়্‌লো। ঘরের আগুন তখন তিন্‌টে চালা ভূমিসাৎ করে অনেকটা নিভে গিয়েছে।

"অজানা"

ভারতবর্ষ

জাগিয়াছে শুভ্র উষা,—পুণ্য-বেদবতী
প্রাচীমঞ্চে, ভারতের উদয়-গগনে;
কোন এক আদি মহাতপস্যার ক্ষণে
বাজিয়াছে আমাদের মঙ্গল আরতি!
মধুমান্ সূর্য্যসোম ঢালিয়াছে জ্যোতি
আমাদের নদী গিরি নির্ঝর কাননে;
অর্পিয়াছে শান্তি স্বস্তি নিখিলের মনে
আমাদের কাব্যকলা,—মোদের ভারতী।
মৃত্যুর সাগর মন্থি' অমৃতের তরে
যুগে যুগে ছুটে গেছে মোদের সন্তান!
অসুর আবাসে ভস্ম-শ্মশানের পরে
গেয়েছে তিমিরাতীত আদিত্যের গান!
বিতরি' প্রেমের চরু সর্ব্ব চরাচরে
মাগিয়াছে পরাবিদ্যা,—চরম কল্যাণ!

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

আত্মঘাতী মোহ

কতকগুলা সোজা কথা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিবার সময় আসিয়াছে। লোকের মনে নানা রকমের সন্দেহ জাগিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সেই সন্দেহগুলাকে গলা টিপিয়া মারাই ভদ্রতাসঙ্গত প্রথা। সেই সন্দেহের কথা মুখ ফুটিয়া বাহির করিলেই সবাই মুখ চাপিয়া ধরেন, আর বলেন, "চুপ্, চুপ্! ওকথা বলিতে নাই।" কিন্তু এ পোষাকী লোক-দেখান ভদ্রতা লইয়া আর বেশীদিন ঘর করা চলিবে না। কথাটা এই, "রাজনৈতিক ব্যাপারে এ দেশে মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের সম্বন্ধটা কি?" প্রশ্নটা তুলিলেই জনকতক লোক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন—"আরে থাম, থাম! এটা কি আবার একটা জিজ্ঞাসা করিবার মত কথা? সবাই ত জানে মুসলমান আমাদের ভাই; আমরা এক মায়ের দুই ছেলে, এক সুন্দরীর দুটি নয়নতারা, এক মাতৃস্তন-প্রস্রুত দুই ক্ষীরধারা! একথা ত বড় বড় অনেক পূজনীয় নেতাই বলিয়া গিয়াছেন। আজ আবার একথা তুলিবার সার্থকতা কি?"

কথাটা তুলিবার সার্থকতা এই যে আমরা যত জোর করিয়া গায়ে পড়িয়া কবিত্ব-মাখা সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য ব্যস্ত, মুসলমানেরা আদৌ তত ব্যস্ত নয়। কংগ্রেসের গোড়ায় গোড়ায় কংগ্রেসী নেতারা নিজেদের দলে এক আধজন মুসলমানকে পাইলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইতেন; কেমন করিয়া ঢাক ঢোল পিটাইয়া তাঁহাদের নেতৃত্বপদ কায়েমী করিবেন সেই চিন্তাতেই বিভোর হইয়া থাকিতেন। কিন্তু তেল সিঁদুর দিয়া ভবীর মন পাওয়া যায় নাই। পাছে কংগ্রেসে মিশিলে তাঁহাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় না থাকে এই ভয়টা তাঁহাদের বরাবরই ছিল। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও দুই একজন ভিন্ন কোন মুসলমানই সে আন্দোলনে যোগ দেন নাই। স্বনামধন্য মৌলানা মহম্মদ আলিও তখন স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। বাঙ্গলা দেশ বা বাঙ্গালী জাতির অবস্থা যাই হো'ক, পূর্ব্ববঙ্গে একটা মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইবে এই আনন্দেই তাঁহারা নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯২০ সালের পূর্ব্বে খুব অল্পসংখ্যক মুসলমান নেতাই কংগ্রেসে যোগ দিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। ১৯২০ সালে যে মুসলমানেরা কংগ্রেসে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন তাহা স্বরাজের খাতিরে নয়, খিলাফতের খাতিরে—খিলাফৎ রক্ষাই মূল উদ্দেশ্য, স্বরাজ লাভ তার উপায় মাত্র। হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া যে কংগ্রেসকে এতদিন তাঁহারা পাশ কাটাইয়া আসিয়াছিলেন সেই কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের কারণ নির্দ্দেশ করিবার সময় আগে নাম করিলেন খিলাফতের, কিন্তু তবুও মুসলমানেরা স্বতন্ত্র খিলাফৎ সভা স্থাপন করিতে ছাড়িলেন না। খিলাফৎ নষ্ট হইলে কি যে ভীষণ অনর্থ ঘটিবে তাহা হিন্দুরা বুঝুক না বুঝুক, মুসলমানদিগকে নিজেদের সঙ্গে পাওয়ার আনন্দেই অনেকে কাঁদিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। খিলাফতের জন্য যাহাদের প্রাণটা অতটা

কাঁদিয়া উঠে নাই, তাহারাও কতকটা দেখাদেখি, কতকটা মহাত্মা গান্ধীর ভয়ে দুই একফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল। কিন্তু যেদিন কামাল পাশার কল্যাণে খিলাফৎ প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল, সেদিন আর হিন্দুর সহিত মিশিয়া স্বরাজ্যলাভের জন্য বিশেষ একটা আগ্রহ মুসলমানদের মধ্যে দেখা গেল না। খিলাফৎকে লক্ষ্য করিয়া ছোট বড় মৌলানা মৌলভী মুসলমানদের মধ্যে যে তীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধ ও গোঁড়ামি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন সেইটুকুই দেশের ভাগ্যে রহিয়া গেল। স্বরাজ কথাটা বাঁচিয়া রহিল, কিন্তু মুসলমানদের মনে তাহার অর্থ হইল খিলাফতী স্বরাজ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানকে মিলাইবার জন্য যত চেষ্টা হইয়াছে—তিলক মহারাজের লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট, মহাত্মাজীর খিলাফতী ক্রন্দন, দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট, দিল্লীর ইউনিটী কন্‌ফারেন্স—আজ মনে হয় সবই ভস্মে ঘি ঢালা হইয়াছে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের মনে দেশাত্মবোধ অপেক্ষা নিজ সমাজের স্বাতন্ত্র্যবোধ এত প্রবল যে এক উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থা লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে যাওয়া একরূপ অসম্ভব। খিলাফৎ সভার গত অধিবেশনে মৌলানা মহম্মদ আলি প্রমুখ নেতৃবর্গের মুখে একথা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বাহির হইয়াছে।

কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে অনেকেই যেন কতকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে একথাটা অনেকেই স্বতঃসিদ্ধবৎ মানিয়া লইয়াছেন যে দেশের স্বাধীনতা লাভে অহিংস পথটাই প্রশস্ত। খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করিয়া আমলাতন্ত্রকে অচল করিয়া দেওয়ার হুমকিটা মাঝে মাঝে কোন কোন নেতার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা সম্ভবপর করিয়া তুলিতে হইলেও, হিন্দু-মুসলমানে একযোগে কাজ করা চাই। সুতরাং ঐ সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স কথাটাই যাঁহাদের রাজনৈতিক মূলধন, ঐটাকে ভাঙ্গাইয়াই যাঁহাদের রাজনীতির ব্যবসা চালাইতে হয়, তাঁহারা মনে মনে যাই বুঝুন, বাহিরে হিন্দু-মুসলমানের একতার ভড়ং তাঁহাদের বজায় রাখিতেই হয়। যাঁহারা মনে মনে বুঝিয়া রাখিয়াছেন যে ইংরেজকে কাবু করিবার জন্য আমাদের চীৎকার মাত্রই সম্বল, তাঁহারা নিজেদের সুরের সঙ্গে মুসলমানের সুর মিলাইতে পারিলেই কৃতার্থ হন; কাজেই মুসলমানদের পিঠে হাত চাপড়াইয়া, অত্যাচার দেখিলে চোঁখ বুজিয়া, ভাল ভাল ফাঁকা কথায় হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচার করিয়া তাঁহাদের দুই কুড়ি সাতের খেলা বজায় রাখিতে হয়। সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হয় আজকালকার কংগ্রেসী নেতাদের অধিকাংশই এই দলে।

হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধিলে আমরা হয় মুসলমানদের গালি পাড়ি, না হয় মিলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গোটাকতক সদুপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু কেন যে মিলন হয় না, এ কথাটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করি না। আমি ধরিয়া লই যে যাহারা মারামারি করে তাহারা গুণ্ডা, যাহারা ভেদ প্রচার করে তাহারা হয় পাজি, নয় ইংরেজের খয়েরখাঁ; তাহার সঙ্গে

সঙ্গে প্রচার করিতে লাগিয়া যাই যে ঐ ইংরেজ বেটারাই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া দিতেছে। ইংরেজ রাজত্বের প্রভাবে যে হিন্দু-মুসলমানের একটা পাকা বোঝাপড়ার দেরী হইয়া যাইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, আর হিন্দু-মুসলমানের ভেদের সহিত ইংরেজের শাসননীতির যে কোন সম্বন্ধ নাই, একথাও বলা চলে না। কিন্তু সব দোষটা ইংরেজের ঘাড়ে চাপাইলে যে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হয়, তাহাও মনে হয় না। শুধু ইংরেজের খয়েরখাঁ গুলিই যদি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইত তাহা হইলে ওকথা বলা চলিত; কিন্তু খিলাফতের যাঁহারা বড় বড় পাণ্ডা, ইংরেজকে তাড়াইয়া দেশকে স্বাধীন করিতে যাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প, তাঁহারাও ইসলামী প্রাধান্য স্থাপন করিতে না পারিলে হিন্দুর সহিত মিলিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতে পরাঙ্মুখ। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের মিলন কেন হয় না একথা বুঝিতে গেলে শুধু ইংরেজের ভেদনীতির উপর দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। গোড়ার কথাটা বলিতে গেলে বোধ হয় মুসলমান ধর্ম্ম লইয়াই টানাটানি করিতে হয়।

মুসলমানেরা অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে, বিশেষতঃ মূর্ত্তিপূজক হিন্দুকে একেবারে কাফের বলিয়াই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের মতে পারলৌকিক সদ্গতির পথ হিন্দুর কাছে একেবারেই রুদ্ধ। সমস্ত জগৎই যে এককালে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, আর বিধর্ম্মীকে এই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে যে পরম পুণ্য সঞ্চয় হয়, এ বিশ্বাস অধিকাংশ মুসলমানের মনেই বর্ত্তমান। তাহার উপর মুসলমান ধর্ম্মটা এদেশের জিনিষ নয়; বিদেশ হইতে বিজেতাকর্ত্তৃক আনীত। পাঠান মোগলেরা এদেশ জয় করিয়াছিল বলিয়া মোগল পাঠানের বংশধরেরা, এমন কি যাহারা নিজেদের ধর্ম্ম ছাড়িয়া মোগলপাঠানের নিকট হইতে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারাও, ধর্ম্মবিষয়ে ও পরাক্রমে হিন্দুদিগকে আপনাদের অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করে। পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে মুসলমানেরা যে প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ভোগ করিত, ইংরেজ রাজত্বকালেও সে প্রাধান্য ভোগ করিবার ইচ্ছা মুসলমানদের মন হইতে যায় নাই। কাজেকাজেই পূর্ব্ব গৌরবের দোহাই দিয়াই হোক, আর নিজেদের বিশেষত্ব বজায় রাখিবার দোহাই দিয়াই হোক, তাহারা অপর সকলের অপেক্ষা কিছু বেশী বেশী অধিকার পাইবার আব্দার প্রায়ই করিয়া থাকে। যেখানে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য সেখানে ব্যবস্থাপক ও স্থানীয় সভায় সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি ও রাজসরকারে চাকরী দেওয়া হোক; যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম সেখানে আর সংখ্যার অনুপাতের কথা তোলা হয় না; সেখানে বলা হয়, প্রতিনিধির সংখ্যা এমন হোক মুসলমানেরা যেন নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা করিলে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেদের উপর যে অবিচার করা হয় তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত মনোভাব মুসলমানের নয়। সব বিষয়ে এরূপ একটা বাঁধাধরা ভাগাভাগি থাকিলে যে কস্মিনকালে এদেশে জাতীয়তা গড়িয়া উঠিবে না,

সেদিকেও তাহাদের লক্ষ্য নাই। অপরের যাই হোক, মুসলমানের প্রাধান্য বজায় থাকা চাই-ই চাই।

এরূপ মনোভাবের আরও একটা প্রচ্ছন্ন কারণ আছে। দেশে হিন্দুর সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতেছে, মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে তাহার বেশী পরিমাণে। সেইজন্য মুসলমানদের মনে আশা আছে যে একদিন না একদিন এদেশ মুসলমানপ্রধান হইয়া উঠিবে। তাহার উপর তাহারা মনে করে যে যদি একটু জোর করিয়া উঠিয়া পড়িয়া প্রচার কার্য্যটা চালান যায় তাহা হইলে হয়ত অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দুস্থানকে মুসলমানের দেশ করিয়া তোলা যাইতে পারে। এ কল্পনাটা যে অসম্ভব নয় তাহা পঞ্জাব, বাংলা, সিন্ধু, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের দিকে চাহিলেই বুঝা যায়। ওসব দেশেই এককালে হিন্দুর সংখ্যা বেশী ছিল। কেমন করিয়া হিন্দুর সংখ্যা কমিয়া গেল বা লোপ পাইল তাহা পাবনার দিকে চাহিলেই বুঝিতে বিলম্ব হয় না। মেয়ে চুরি, হিন্দু স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার, গুণ্ডার দাঙ্গা প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ আমরা রোজ রোজ খপরের কাগজে পড়ি সে সবই হিন্দুস্থানকে মুসলমানের দেশে পরিণত করিবার একএকটি উপায়। নারী-নির্য্যাতনই বলুন, আর গুণ্ডার অত্যাচারই বলুন কোন জিনিষটাকে কখনও মুসলমান নেতারা প্রকাশ্যভাবে নিন্দাবাদ করিয়া দমন করিবার চেষ্টা করেন না। একটা না একটা অজুহাতে তাঁহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে মুসলমানদের খুব বেশী দোষ নাই—হিন্দুরা এমন একটা কিছু করিয়াছিল যাহার ফলে মুসলমানেরা ক্রুদ্ধ হইয়া অপকর্ম্মটা করিয়া ফেলিয়াছে। মুসলমান নেতাদের এটা একেবারে বাঁধাধরা পলিসি। এ ব্যাপারটা হিন্দু নেতাদের কাহারও কাহারও চোখে পড়িয়াছে। সেইজন্য তাঁহারা হিন্দু সংগঠন ও শুদ্ধির উপর জোর দিয়াছেন। সংগঠনের অর্থ হিন্দু সমাজের অবান্তরভেদ দূর করিয়া সমাজটাকে সবল ও আত্মরক্ষাসমর্থ করিয়া গড়িয়া তোলা; আর শুদ্ধির অর্থ যাহারা হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে পুনরায় তাহাদের হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া লওয়া। একবার যাহাদের যেন-তেন-প্রকারেণ মুসলমান করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহাদের যদি আবার হিন্দু সমাজে ফিরিয়া লইবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে মুসলমানদের বড় আশায় ছাই পড়ে। সেইজন্য তাঁহারা শুদ্ধিব্যাপারটার উপর একেবারে হাড়ে হাড়ে চটা। মারধোর করিয়া ভয় দেখাইয়া যদি শুদ্ধি ব্যাপারটাকে থামাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতের পথ খোলা থাকে। মৌলানা মহম্মদ আলি-ই বল, আর ডাঃ কিচলু-ই বল, সকলকারই মনের ভাব এইরূপ। খোঁজ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে আজমীর হইতে আরম্ভ করিয়া পাবনা পর্য্যন্ত যে সমস্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়াছে তাহার মূলে ঐ এক চেষ্টা। এখন প্রশ্ন এই—মুসলমানেরা যদি মনে করেন যে ভারতবর্ষের বাহিরের মুসলমানেরা এদেশের হিন্দুর চেয়ে তাঁহাদের বেশী আত্মীয়, ভারতবর্ষে মুসলমান-প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য

তাঁহারা হিন্দুদের অপেক্ষা বেশী রাজনৈতিক অধিকার না পাইলে যদি সন্তুষ্ট না হন আর সেই প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা দল পাকাইয়া মারামারির জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন, তাহা হইলে হিন্দুদের কর্ত্তব্য কি? শুদ্ধি ও সংঘঠন দ্বারা আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার, না একতার নামে আত্মঘাতী গোঁজামিল?

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সোমপায়ীর গান

(ঋগ্বেদ)

আমি করেছি কি সোমপান?
মনে হয়, যত হয় আর গবী
আমি একা যেন সমুদয় লভি—
কেন হেন অভিমান!
আমি করেছি কি সোমপান?

যেন গো আমারে বায়ুতে উড়ায়,
আমি যেন রথ, মোরে নিয়ে যায়
তুরগেরা বেগবান!
আমি করেছি কি সোমপান?

ধেনু-মাতা যথা বৎসের পাশে
দূর হ'তে হেরি' দ্রুত ছুটে আসে—
ছন্দ আজিকে মন্ত্রে আমার
তেমনি যে ধাবমান!
আমি করেছি কি সোমপান?

ছুতার যেমন রথের ধুরায়
গড়িবার কালে কেবলি ঘুরায়,
মনে মনে আমি ঘুরাই তেমনি—
গান করি নির্ম্মাণ,
আমি করেছি কি সোমপান?

পাঁচ-গোষ্ঠীর কাহারেও আজ
মনে হয় না যে কিছু করি লাজ!
—কারে করি সম্মান?

দ্যাবাপৃথিবীর চেয়ে বড় আমি—
স্বর্গ-মর্ত্ত্য কোথা গেছে নামি'!
কেন হেন অভিমান?
আমি করেছি কি সোমপান?

এই ধরাখানা, হাতটা ঘুরায়ে—
হেথা হ'তে হোথা দিব কি সরা'য়ে?
—করিব কি খান্ খান্?
আমি করেছি কি সোমপান?

মোর আধখানা আকাশেতে মেশে,
বাকি আধখানা নীচে কোন দেশে—
নাই তার সন্ধান!
মোর চেয়ে বড় কেহ কোথা নাই,
কেন হেন অভিমান?
আমি করেছি কি সোমপান?

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পাহাড়পুরের স্তূপ

পাহাড়পুরের স্তূপ ঐতিহাসিক জগতে সুপরিচিত হইয়া উঠিতেছে। কিয়ৎকাল বন্ধ থাকিয়া এবৎসর ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পুনরায় ইহার খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বিগত ১৪ই চৈত্র রাত্রিতে আমরা এই স্তূপ দর্শনে যাত্রা করি। সে যাত্রায় যে আমরা আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না। শুক্লা চতুর্দ্দশীর রাত্রি। শুভ্র জ্যোৎস্নার অন্তহীন রশ্মিজালে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত। বসন্তের মৃদুমন্দ সমীরণ চারিদিকের উন্মুক্ত প্রান্তরে অবাধগতিতে বহিয়া যাইতেছিল। আর তাহার মধ্য দিয়া আমরা ছুটিয়া চলিতেছিলাম।

প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্তূপটীকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। তখন খননের কোন প্রস্তাবই উপস্থিত হয় নাই। তাহার খননকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দের শীতকালে আর একবার সেখানে গিয়াছিলাম। এখনও এই স্তূপটীর ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। দিঘাপাতিয়ার বিদ্যোৎসাহী কুমার শরৎকুমার রায়ের অর্থে ও যত্নে বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সর্ব্বপ্রথম এই স্তূপের ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন, এবং তদবধি বরেন্দ্রভূমবাসী অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি এদিকে পড়ে।

বগুড়া সহর হইতে বি, এস্, বি, রেলওয়ে যোগে সান্তাহার জংসনে যাইয়া তথা হইতে উত্তর দিকে তিলকপুর ষ্টেসন পার হইলেই আক্কেলপুর ষ্টেসন। তাহার পর জামালগঞ্জ ষ্টেসন। তথায় রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সোজা পশ্চিমে প্রায় ৪ মাইল পদব্রজে গমন করিলেই এস্থানে যাওয়া যায়। আবার, বগুড়া সহর হইতে মোটরযোগে দিনাজপুর রাস্তা দিয়া ক্ষেতলাল পুলিস ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া গেলে জামালগঞ্জ রেলষ্টেসন ও তথা হইতে পাহাড়পুর— মোট ৩৪ মাইল পথ; ২।৩ ঘণ্টায় অনায়াসে যাওয়া যাইতে পারে। আমরা মোটরে গিয়াছিলাম, ও রাত্রে যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতে ৮॥ টার সময় পাহাড়পুরের পাদদেশে পৌঁছিলাম।

সেদিন রবিবার। স্তূপের খনন কার্য্যাদি বন্ধ। ছোট বড় অনেকগুলি বস্ত্রাবাসে খননের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারিগণ বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। একটি বস্ত্রাবাসে শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য (?) নামক একজন ভদ্রলোকের দর্শন পাইলাম। তিনি বলিলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রখ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত কর্ম্মচারিগণ আমাদিগের সহিত যথোচিত ভদ্রব্যবহার ও সৌজন্য প্রকাশ করিলেন; এবং শ্রীনিবাসবাবু স্বয়ং আমাদিগকে লইয়া খনিত স্থানগুলি ও আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি অত্যন্ত যত্নের সহিত দেখাইতে লাগিলেন। এবার মূল স্তূপটির সম্মুখভাগের খননকার্য্য চলিয়াছে এবং খননের ফলে স্তূপ পরিষ্কৃত হওয়ায় একটি সুবৃহৎ ত্রিতল মন্দিরের সম্মুখভাগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। মন্দিরটির নিম্নতল অনেকখানি মাটির নীচে বসিয়া

গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নানা জীবের মূর্ত্তিবিশিষ্ট ইষ্টকমালা দ্বারা মন্দিরটি বিনির্ম্মিত। মন্দিরটি উত্তরমুখী। হংস, বচ্ছপ, মৎস্য, কুক্কুট, নর, বানর, সিংহ, হস্তী, কীর্ত্তিমুখ প্রভৃতি নানা প্রকার মূর্ত্তির ছাঁচে মৃত্তিকার কর্দ্দম ঢালিয়া যে ইষ্টক প্রস্তুত হইত তাহাই পোড়াইয়া মন্দিরের ইষ্টকগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল। মন্দিরের পাদদেশের বেড় প্রায় ১২৫০ ফিট ও উচ্চতা প্রায় ৬৫ ফিট। চতুর্দ্দিকে পরিখার চিহ্ন বিদ্যমান। সম্মুখে যে সমতলভূমি দৃষ্ট হয় তাহার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর খাত এবং পার্শ্বে একটি পাতকুয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মন্দিরের উত্তরদিকের বেষ্টনী খনন করায় ইষ্টক নির্ম্মিত তোরণের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যমুনা নদী হইতে একটি শাখা বাহির হইয়া স্তূপ-বেষ্টনীর পূর্ব্বধার দিয়া প্রবাহিত হইত; তাহার খাত এখনও সুস্পষ্ট। স্তূপটি যে গ্রামে অবস্থিত ঐ গ্রামটির নাম পাহাড়পুর। ইহা সরকার পিঞ্জরার অন্তর্গত ফতেজঙ্গপুর পরগণায় অবস্থিত। ইহার উত্তরপশ্চিমে সংলগ্ন 'গোয়ালভিটা' নামক গ্রাম। খৃঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মিঃ বুকানন এই স্থান সর্ব্বপ্রথম পরিদর্শন করেন। তৎপর দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর ওয়েষ্ট মেকট সাহেব ইহা পরিদর্শন করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটি জার্ণালের ৪৪ ভলিউমে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বুকানন ও ওয়েষ্ট মেকট উভয়েই ইহাকে বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। জেনারল কানিংহাম কিন্তু এখানে তৎকালে কোন বৌদ্ধ নিদর্শন দেখিতে না পাইয়া ইহাকে বেদপন্থী হিন্দুগণের মন্দির বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই স্থান মহাস্থানগড় হইতে প্রায় ২৯ মাইল পশ্চিমে এবং হরগৌরীর গরুড়স্তম্ভ হইতে প্রায় ২০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। কানিংহাম এই স্তূপের উচ্চতা মাপিয়া পাদদেশ হইতে ৭০ ফিট ও সমতলভূমি হইতে ৮০ ফিট পাইয়াছিলেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে দিঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় এই পাহাড়পুরের স্তূপ খননের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিলে ভারতগবর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট অর্থদ্বারা ইহার বহির্ব্বেষ্টনীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব ধারের কতকাংশের খনন কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। এই খননের সময় তথায় ২১টি প্রকাণ্ড কক্ষের নিদর্শন বাহির হইয়া পড়ে; এতদ্ব্যতীত এই স্থান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধস্তূপ ২১৩টি, নানা আদর্শের ভগ্ন মৃৎপাত্র, চিত্রসম্বলিত ইষ্টকসমূহ ও খিলানের নিদর্শন এবং বেষ্টনীর বাহিরে উত্তরপূর্ব্বধারে একটি উচ্চস্থান খনন করায় একটি প্রস্তর নির্ম্মিত বাঁধা ঘাটের ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কুমার শরৎকুমার রায় ও গবর্ণমেণ্টের অর্থে মূলস্তূপটির একাংশের খননকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই খননের ফলে যাহা বাহির হইয়াছে তাহাকে একটি সুবৃহৎ ত্রিতল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিতে হয়। খননকার্য্য সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনায় বিরত রহিলাম। কিন্তু এই সুবিশাল ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যে

যুগে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, সে যুগের বাঙ্গালীর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য, অনন্য-সাধারণ প্রতিভা, প্রভূত অধ্যবসায় ও অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রত্যক্ষ না করিলে ইহার সম্যক্ ধারণা করা সম্ভব নহে।

স্থানীয় লোকে এই স্তূপকে 'মইদল রাজার বাড়ী' বলিয়া থাকে। বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এইস্থান হইতে যে স্তম্ভলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে এই কথাগুলি প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে খোদিত আছে—

"রত্নত্রয় প্রমোদেণ সত্ত্বানাং হিত কাম্যয়া।
শ্রীদশবলগর্ভেণ স্তম্ভোঽয়ং কারিতো ববঃ॥

অর্থাৎ [বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ] এই ত্রিরত্নের আনন্দের জন্য এবং প্রাণিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া শ্রীদশবলগর্ভ [নামক ব্যক্তি] এই শ্রেষ্ঠ স্তম্ভটি করাইয়াছিলেন।" এই প্রস্তর লিপিখানি এক্ষণে 'বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র সম্পত্তি। বর্ত্তমান খননের ফলে আরও দুইখানি প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই। ইহাদের মধ্যে একখানিতে "শ্রীমহেন্দ্রপাল দেবরাজ্যে" এইরূপ একপংক্তি পাঠ করিলাম। তবে কি মহেন্দ্রপাল দেবের রাজ্য সুদূর বরেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল? মহেন্দ্রপালদেব কান্যকুব্জের প্রতীহার বংশীয় একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি। ইহারা মূলে গুর্জ্জর জাতীয়। এই প্রতীহার কুলোদ্ভব দ্বিতীয় নাগভট্ট ৮৭২ সংবতে (৮১৫ খৃঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেব, কান্যকুব্জপতি চক্রায়ুধ ও রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দ একত্র হইয়া ইঁহাকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পর (৮১৪ খৃঃ) নাগভট্ট (২য়) কান্যকুব্জ ও উত্তরাপথ জয় করেন, এবং তাঁহার মহাসামন্ত বাহুকধবল গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালকে পরাজিত করেন। ধর্ম্মপালের পর তৎপুত্র দেবপাল গুর্জ্জরনাথের দর্প খর্ব্ব করিয়াছিলেন বলিয়া হরগৌরীর গরুড়স্তম্ভ লিপিতে উল্লেখ আছে। তৎকালে নাগভটের পুত্র রামভদ্র সম্ভবতঃ কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৮৪০ খৃষ্টাব্দে রামভদ্রের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মিহিরভোজ সমগ্র উত্তরাপথ জয় করিয়া কান্যকুব্জে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। দেবপালের পর শূরপাল গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। এই সময় গুর্জ্জরগণ মিহিরভোজের অধীনে আরও প্রবল হইয়া উঠে এবং পালাধিকার গ্রাসে অগ্রসর হইয়া মগধ অধিকারে সমর্থ হয় এবং 'বৃহৎ বঙ্গান' [দিগকে] পরাস্ত করে। শূরপালের পর প্রথম বিগ্রহপাল গৌড়েশ্বর হন। এই সময় মিহিরভোজের মহাসামন্ত কক্ক গৌড় আক্রমণ করেন মহারাজ মিহিরভোজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহেন্দ্রপাল সমগ্র উত্তরাপথের অধীশ্বর হন এবং পিতার অপেক্ষাও অধিকতর পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। এইসময় গৌড়ের সিংহাসনে বিগ্রহপাল (১ম) দেবের পুত্র নারায়ণপালদেব অধিষ্ঠিত হন। মহেন্দ্রপাল দেবের অষ্টম রাজ্যাঙ্কে গয়ার নিকট ফল্গুনদীর অপর পারে রামগয়ায় সহদেব নামক একব্যক্তি বিষ্ণুর দশাবতারের

একটি প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গয়া জেলার গুনেরিয়া নামক গ্রামে মহেন্দ্রপাল দেবের নবম ও উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত দুইটি প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্দারা ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে মহেন্দ্রপাল গৌড়েশ্বর নারায়ণপালদেবের আধিপত্য বিনষ্ট করিয়া মগধে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অনুরূপ তর্কপ্রণালী অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে যে পাহাড়পুরের পূর্ব্বোক্ত শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে বরেন্দ্রীমণ্ডলও কিয়ৎকালের জন্য মহেন্দ্রপালদেবের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। আমাদের দেশে অদ্যাপি "জুজুর ভয়" কথাটি প্রচলিত আছে। গুর্জ্জরগণকেই সেকালে সাধারণ লোকে 'জুজার' বা 'জুজু' বলিত। যাহাহউক, লিপিখানির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা চলে না।

পাহাড়পুরের মন্দিরটি বেদপন্থী হিন্দুগণের কি বৌদ্ধপন্থী হিন্দুগণের, তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই হয় নাই। বরেন্দ্রী অনুসন্ধান সমিতিতে রক্ষিত শিলালিপি দ্বারা ইহাকে বৌদ্ধ মন্দির বলিয়াই মনে হয়। বরেন্দ্রী অনুসন্ধান সমিতির ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে পাহাড়পুর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"Paharpur (Rajshahi Dist.), 3 miles west of Jamalgunj E. B. R. Excavations which are in progress here have revealed a huge Buddhist temple decorated with dados of terra-cotta plaques bearing various interesting figures. Inscribed stone pillars and other important relics also have been found. We eagerly await an account of these finds in the reports of the Archeological department who are in charge of the present operations. Two similar plaques and part of a stone pillar bearing an inscription of a Buddhist named Dasabalagarbha from Paharpur are in our Museum."

এখানে এবার যে সমস্ত প্রাচীন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে একটি স্ফটিক, একটি পিত্তল নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি, একটি পিতলের ক্ষুদ্র ঘণ্টা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাহাড়পুরের পূর্ব্বদিকে পরগণে সন্তনার অন্তর্গত মালঞ্চা গ্রাম। এই গ্রামে সত্যপীরের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। পাহাড়পুরের অনতিদূরে 'নমুজ' নামক গ্রামে একটী রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে।

পাহাড়পুর গ্রাম পূর্ব্বে বগুড়া জেলার (তৎকালিক) নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইহা রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহাকুমার অন্তর্গত বদলগাছি থানার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বলীহারের জমিদার মহাশয় এক্ষণে এই গ্রামের পত্তনীদার।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মণ

ভারতের লোকসংখ্যা বনাম দারিদ্র্য

আমার কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মুখে অনেক দিন হয় শুনিয়াছিলাম যে তাঁহার বিলাত যাত্রার পথে তাঁহার কোনও সহযাত্রী ইংরাজ সিভিলিয়ান তাঁহাকে ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে নাকি বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের 'প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধিই' তাহার এই বর্ত্তমান দারিদ্র্যের প্রধানতম কারণ। বন্ধুবর এই অপবাদ নাকি ইতিপূর্ব্বে স্থানে স্থানে শুনিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে তখন এমন কোনও প্রমাণ ছিল না যাহাদ্বারা তিনি এই অপবাদ হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে পারেন। কাজেই তিনি নিরুত্তর রহিয়া গেলেন এবং সিভিলিয়ান-প্রবর মুক্তির উপায় বলিয়া দিতে লাগিলেন। "প্রজা-বৃদ্ধি রহিত করিবার চেষ্টা কর," এই ছিল সেই মুক্তির মন্ত্র। এ স্থলে বলিয়া রাখা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে তাঁহার সহযাত্রী ইংরাজ সিভিলিয়ানটী প্রৌঢ় বয়স্ক এবং অবিবাহিত ছিলেন।

কথাটা এতই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছে যে এসম্বন্ধে একটু আলোচনা হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে অথচ তাহাদের অন্ন সংস্থানের জন্য তাহাদের নিজেদের কোনও চেষ্টা নাই, এ অবস্থায় দারিদ্র্যের পীড়ন অবশ্যম্ভাবী। এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের কতখানি সম্পর্ক এবং কতখানিই বা অসম্পর্ক তাহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে এতৎ সম্পর্কীয় অন্যান্য কথাও মোটামুটি ভাবে আলোচিত হইবে।

'দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যদ্রব্য বাড়েনা' এই নিয়মটী 'ম্যালথাস' নামে জনৈক প্রসিদ্ধ ইংরাজ অর্থনীতিবিৎ আবিষ্কার করিয়াছেন। অর্থনীতিতে 'ইহাকে 'ম্যালথাসের নিয়ম' বলে। কথাটী খুবই খাঁটী।' তিনি দেখাইয়াছেন যে বিধাতার সৃষ্টি ও সংহারলীলা আশ্চর্য্য রকমে সামঞ্জস্য রাখিয়া পৃথিবীস্থ মানবগণের মরণ-বাঁচন প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিতেছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জল-প্লাবন, যুদ্ধ, জাহাজডুবি, নৌকাডুবি, রেলওয়ে সংঘর্ষণ ইত্যাদি সকলই এই মরণ-বাঁচন রহস্য লইয়া। তবু এই দারিদ্র্যের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মানব-সমূহকে সর্ব্বদা নিজের চেষ্টাদ্বারা নানা উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। এই উপলক্ষে নানা পন্থা খুঁজিতে যাইয়া তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধ করিতে এবং জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া সংসারী লোকের পক্ষে সংযম অভ্যাস করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। পরিপূর্ণ জীবন ও পরিপূর্ণ সমাজ লইয়া বাঁচাই প্রকৃত বাঁচিয়া থাকা। এইভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জীবনের পূর্ণতার দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেহ এবং মন উভয়কেই শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। সোণার পাতে মোড়া জিনিষ এবং নিরেট সোণার জিনিষ উভয়েরই বহিরবয়ব একপ্রকারের কিন্তু ওজন করিলেই উভয়ের প্রকৃত মূল্য ধরা পড়ে। সেইরূপ মানব

সমাজ 'প্রকৃত মানুষের' সমাজ হইলেই তাহার যথার্থ সার্থকতা হয়। ধনে, সম্পদে, মনের শক্তিতে সকল দিক দিয়াই সে যথার্থ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। কথাটী চিরন্তন সত্য। সকল দেশ ও সকল জাতির পক্ষেই এ সত্যটী তুল্য মূল্যবান। কিন্তু আক্ষেপ এই যে শুধু ভারতবর্ষ লইয়াই যত কথা উঠিতেছে অন্যদেশ লইয়া তত নয়। এ জাতের যেন কোনও দায়িত্ব বোধ নাই,—এই হইতেছে যত বিদেশীয় পণ্ডিতবর্গের দুঃখ।

এবারে এই সম্বন্ধে একটু হিসাব নিকাশ করিয়া দেখা যাক্। ১৯০১ সনে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৯৪,৩৬১,০৫৬ ছিল। ১৯১১ সনে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ৩১৫,১৫৬,০০০তে এবং ১৯২১ সনে ৩১৮,৯৪২,০০০তে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং প্রথমোক্ত দশবৎসরে এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৭ এবং শেষোক্ত দশবৎসরে মাত্র ১.১এ উঠিয়াছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় যে এই বাড়্‌তি একান্তই নগণ্য তাহা একটু হিসাব করিলেই দেখা যাইতে পারে। ঐ শেষোক্ত দশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে শতকরা ৪.৮ এবং আমেরিকাতে ১৪.৯ জন করিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানে ১৮৯৬-১৯২০, এই ২৪ বৎসরে শতকরা ৮৩ জন এবং রুসিয়াতে ১৮৯০-১৯১৪, এই ২৪ বৎসরে শতকরা ৫০ জন করিয়া লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাদের তুলনায় ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার এত অস্বাভাবিক রকমে কম যে ইহার এইটুকু বৃদ্ধির জন্য আশঙ্কান্বিত না হইয়া এই ক্রমশঃ ক্ষয়ের জন্য প্রত্যেক ভারত-হিতার্থীর চিন্তিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক এক বর্গমাইল প্রতি বেলজিয়ামে ৬৫৮, ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে ৬৪৯, হলাণ্ড ৫৩৬, ইটালীতে ৩১৬, জার্ম্মাণীতে ৩১১, জাপানে ৩২০, সুইজারল্যাণ্ডে ২৩৬ এবং ভারতবর্ষে ১৭৭জন লোকের বাস। দেশের আয়তন, লোকসংখ্যা এবং উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যাদির পরিমাণ তুলনা করিলে এক ভারতবর্ষ ব্যতীত ইহাদের প্রত্যেক দেশকে লোকসংখ্যা-ভার-প্রপীড়িত দেশ বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ড এবং ওয়েলস নিজেদের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য যোগাড় করিতে পারে তাহার তুলনায় তাহাদের লোকসংখ্যা অসম্ভব রকম বেশী। তাহাদের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যে তাহাদের মাত্র তিনমাস চলিয়া যাইতে পারে। এক রকম সম্পূর্ণ ভাবেই বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া তাহাদের এই লোকসংখ্যা প্রতিপালন করিতে হয়। এই সব সত্ত্বেও কোনও কোন ইংরাজ লেখক চীন ও ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছেন।*

কলকারখানার প্রবর্ত্তনে জগতের অন্যান্য জাতি যখন ধীরে ধীরে তাহাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়া যুগের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল, ভারতবর্ষ তখন বিদেশজাত সুলভ পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রতি পদে পদে আহত হইয়া নিতান্ত অসহায়ের মত সাহায্য খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। এই সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত বাণিজ্যনীতি অসহায়

* Masterman—England after war.

ভারতীয় বাণিজ্যকে আরও অসহায় অবস্থায় ফেলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তৈয়ারী দ্রব্যাদি রপ্তানি করিবার পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষ শুধু কাঁচামাল রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। হাজার হাজার কারিকর অভ্যস্থ কাজ ছাড়িয়া পেটের দায়ে গ্রামে গ্রামে অন্ন সংস্থানের জন্য নানা পন্থা অবলম্বনের চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল। দেশের সর্ব্বত্র আয়ব্যয়ের হিসাবে একটা অসম্ভব গোলমাল হইয়া গেল। মহামতি রাণাড়ে দেশের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই ভারতে ইংরাজ বাণিজ্যনীতির ব্যভিচারের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে শতকরা ৯.৫জন ইংলণ্ডে ৭৮ জন, আমেরিকাতে ৫১.৪জন, ফ্রান্সে ৪২.২জন এবং জার্ম্মেণীতে ৪৫.৬ জন লোক সহরে বাস করে। ইহা হইতেই ভারতবর্ষের লোক যে প্রায় সবই গ্রামে বাস করে তাহা বেশ বোঝা যায়। ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৩০,০০০ হাজার গ্রাম আছে। ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সাথে হয়তঃ ক্রমে ক্রমে দেশে সহরবাসী লোকের সংখ্যা বাড়িতে পারে কিন্তু তাহা এত মন্থর গতিতে চলিয়াছে যে ভারতবর্ষকে গ্রাম-প্রধান বা কৃষিপ্রধান দেশ বলিলে একটুও অতিরিক্ত বলা হয় না। এদেশের লোকের ভিতরে শতকরা ৭২.৪৪ জন লোক শুধু জোতজমি নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে। ফ্রান্স, আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে যথাক্রমে ঐ স্থলে শতকরা ৪২, ৪৪, এবং ১০ জন লোক শুধু চাষবাস করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। ভারতবর্ষে ব্যাবসাবাণিজ্য লইয়া শতকরা ১৮.৫৬ জন, ফ্রান্সে ৪৪, আমেরিকাতে ৩৬ এবং ইংলণ্ডে ৭৪জন লোক নিযুক্ত আছে। চাকুরী এবং অন্যান্য ব্যবসায় ইত্যাদি লইয়া ভারতবর্ষে শতকরা ৯, ফ্রান্সে ১৪, আমেরিকাতে ২০, এবং ইংলণ্ডে ১৬জন লোক খাইয়া পরিয়া আছে। অবশ্য কার্য্যোপযুক্ত লোকের হিসাবই শুধু উপরোক্ত তালিকায় ধরা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ভারতবর্ষ কৃষি লইয়াই বাঁচিয়া আছে। কৃষিকার্য্য এবং তল্লিষ্ট অন্যান্য উপজীবিকার পন্থার উন্নতি ও অবনতির উপর ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভারতবর্ষের আয়তন ১,৭৭৩,০০০ হাজার বর্গমাইল। আয়তনে ইহাকে একটা মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯১৯—২০ সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে এই বিস্তৃত আয়তনের মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগ বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ, ২৩ ভাগ চাষ আবাদের যোগ্য হইলেও নানা কারণে পরিত্যক্ত; ১৮ ভাগ চাষ আবাদের উপযুক্ত অথচ পতিত, ৯ ভাগ আবাদ হইয়াও পড়িয়া আছে এবং অবশিষ্ট শতকরা ৩৬ ভাগ জমিতে মাত্র চাষ আবাদ হইয়া ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বনজঙ্গলাবৃত স্থানসমূহ বাদ দিলেও আরও শতকরা ২৭ ভাগ জমিতে অনায়াসে ফসলাদি উৎপন্ন করা যায়। তাহা হইলে ফসলী জমি শতকরা ৩৬ ভাগ হইতে বাড়িয়া ৬৩ ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষকে খাওয়াইয়া বাঁচাইবার পক্ষে এই পরিমিত জমি অত্যন্ত অতিরিক্ত। ইহার উপর ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায় জমিতে সার ইত্যাদি দ্বারা বেশী ফসল উৎপাদন ব্যাপারে নিতান্ত উদাসীন ও অনভিজ্ঞ। তাঁহারা শুধু জমির পর জমি চাষ করিয়া যাইতেছে অথচ পরিশ্রম

হিসাবে অর্থলাভ করিতে পারিতেছে না। ভারতবর্ষের এক একর জমিতে যে পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হয়, জাপানে সেই পরিমাণ জমিতে তাহার ৬ গুণ পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রতি একরে ১২৫০ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয়, তৎস্থলে ঠিক ঐ পরিমাণ জমিতে ইংলণ্ডে ১৯৭৩ এবং সুইজারল্যাণ্ডের মত পাহাড়ের দেশেও ১৮৫৪ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের প্রতি একরে ১৩০০ পাউণ্ড বার্লি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইংলণ্ডে সেইস্থলে ২১০৫, বেলজিয়মে ২৯৩৫ এবং সুইজারল্যাণ্ডে ২১৯৮ পাউণ্ড উৎপন্ন হয়। আমাদের এক একরে এক টন, জাভায় ৪ টন এবং হাউইতে ৪½ টন চিনি প্রস্তুত হয়। ঐ সব দেশের মৃত্তিকার অবস্থার উন্নতি এবং ফসল উৎপন্ন করিতে কৃষকদের যে কি পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হয় ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এতৎসঙ্গে আমাদের দেশের জমির অস্বাভাবিক উর্ব্বরতা এবং কৃষকদের কৃষিবিজ্ঞানে বিপুল অনভিজ্ঞতা মনে পড়িয়া অত্যন্ত দুঃখ হয়। রাজা ও প্রজার সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যাদি বিশেষ কষ্ট না করিয়া বর্ত্তমান পরিমাণের দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ করা যাইতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে এই দেশের অনেক জমি এখনও বিনা চাষে পড়িয়া আছে অথচ তাহাতে চাষের কোনই বাধা বিঘ্ন নাই। বিশেষজ্ঞদের মতে শুধু সেইটুকু জমি চাষে আনিলেও ভারতবর্ষ তাহার বর্ত্তমান লোকসংখ্যার ত্রিগুণ লোককে খাওয়াইয়া এবং বাঁচাইয়া রাখিতে পারে।

জমির কৃষিকার্য্য ব্যতীত মাছের ব্যবসা, কাঠের ব্যবসা, খনির কাজ ইত্যাদিতে এখনও যথেষ্ট লোকের স্থান আছে। ভারতীয় রয়েল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশন এইসব আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে "দেশে জমিজমার চাষ আবাদ ছাড়া আরও অসংখ্য লাভবান ব্যবসা পড়িয়া আছে। দেশের মহাজন সম্প্রদায় এসম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। বিদেশীয় মহাজনদের অর্থে এইসব ব্যবসা পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। ভারতবর্ষ শুধু কাঁচামাল সরবরাহ লইয়াই পড়িয়া আছে। সেই সব মালে তৈয়ারী জিনিবই আবার উচ্চমূল্যে এদেশে বিক্রীত হইবার জন্য চলিয়া আসে।" ব্যবসায় ও চাকরীতে মোট শতকরা ৫জন ভারতবাসী নিযুক্ত আছে। এস্থলেও আরও অধিক সংখ্যক ভারতবাসীর এখনও সংস্থান হইতে পারে। এইরকমভাবে একটু তলাইয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে ভারতের বর্ত্তমান লোকসংখ্যার তুলনায় তাহার তাহা প্রতিপালনের সংস্থান প্রচুর পরিমাণে আছে।

১৯২২ সনের ভারতীয় ফিস্কাল কমিশন তদন্ত করিয়া বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে ধান্য ও গম রপ্তানি হইয়া থাকে। বিদেশীয় বণিকগণ বৎসর বৎসর এইসব মাল কিনিয়া লইয়া যায়। দেশে খাদ্যদ্রব্যের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য আছে কিন্তু ভারতের লোক দরিদ্র বলিয়া অন্নসংস্থান করিতে পারে না। যদি দেশে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয় কিন্তু দরিদ্রতা বশতঃ লোকে তাহা ক্রয় করিতে অসমর্থ হয়, তবে সেই অবস্থায় তাহাকে

লোক-ভার-প্রপীড়িত দেশ কোনমতেই বলা যাইতে পারেনা। কেননা লোকসংখ্যা কমাইয়া দিলেও যদি দেশের দারিদ্র্য না ঘুচান যায় তাহা হইলে দেশের অবস্থা ঐ একইভাবে আসিয়া দাঁড়াইবে। ইংলণ্ডে লোকসংখ্যার তুলনায় দেশোৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের একান্ত অভাব, কিন্তু সেখানের অধিবাসিবৃন্দ যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন।* তাই বিদেশ হইতে খাবার কিনিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে আপনাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে ইংলণ্ডকে কোনও সুধীব্যক্তি লোক-ভার-নিপীড়িত দেশ বলিয়া আখ্যা দিবেননা। দেশে যথেষ্ট খাবার আছে কিন্তু তাহা কিনিবার মত অর্থ নাই এ বড়ই ক্ষোভের বিষয়। এই বিরাট ভারতীয় দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান এবং তাহা মোচনের চেষ্টা না করিয়া তাহার লোক বাঁচাইবার জন্য তাহাকে লোকসংখ্যা কমাইবার যুক্তি দেওয়া যেমন ধৃষ্টতা পরিপূর্ণ তেমনই নির্ব্বোধের সরলতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ব্রিটিশ ভারতের বাৎসরিক আয় ১৯১৩-১৪ সনের রিপোর্ট অনুসারে মোট ১,২১০,২৭,৯৭,০১০, টাকা। ইহা হইতে প্রতিবৎসর নানাভাবে ১২৩,০০,০০,০০০, টাকা বিদেশে চলিয়া যায়—যাহার পরিবর্ত্তে একরকম কোনই উল্লেখযোগ্য উপকার ভারতবর্ষ পাইতেছেনা। আয় হইতে ঐ টাকা বাদ দিলে সমগ্র ভারতের বাৎসরিক আয় ১,০৮৭,২৭,৯৭,০১০ তে আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯১১ সালে ভারতবর্ষে যে লোকসংখ্যা ছিল তাহাদের মধ্যে এই আয় বণ্টন করিয়া দিলে মাথা পিছু প্রত্যেক ভারতবাসীর বৎসরে গড়ে ৪৪৲ অথবা মাসে ৩৷৶৮ পাই করিয়া পড়ে (২ পাঃ ১৯ শিঃ ১ পে)। অন্যান্য দেশের তুলনায় দেখা যায় আমেরিকায় মাথা পিছু প্রত্যেক বৎসরে গড়ে ৭২ পাউণ্ড, ইংলণ্ডে ৫০, অষ্ট্রেলিয়াতে ৫৪, কানাডায় ৪০, ফ্রান্সে ৩৮, জার্ম্মেণীতে ৩০, ইটালীতে ২৩, স্পেনে ১১ এবং জাপানে ৬ পাউণ্ড আয় করে। এইখানে দেখিতে পাই যে আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের লোকের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় আমাদের দেশের লোকের আয় অপেক্ষা যথাক্রমে প্রায় [illegible] এবং ১৬ গুণ বেশী। ইহা দ্বারাই আমাদের দেশের দারিদ্র্যের বিরাট পরিমাণ সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভারতবাসীর গড়পড়তা মাথাপিছু যাহা আয় তাহা দ্বারা যদি শুধু খাদ্যদ্রব্যই কেনা হয় তবে তাহাতে জেলের কয়েদীদের যাহা খাইতে দেওয়া হয় তাহারও শতকরা ৮১ ভাগ মাত্র খাদ্য ঐ আয়ে ক্রয় করা যায়। বাড়ী ভাড়া, কাপড়, জামা, এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষ কিনিবার মত কোনও অর্থ তাহার অতিরিক্ত থাকিতে পারে না। এ অবস্থায় প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ খাটাইয়া আয় বৃদ্ধি না করার অপবাদ আবার বিদ্রূপের মতই প্রাণে আঘাত করে।

দেশময় এই দারিদ্র্যের সাথে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক যে আদৌই নাই একথা বোধহয় আমরা এখন নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, বড় বড় ব্যাঙ্ক প্রায় সমস্তই বিদেশীয় মূলধনে পরিচালিত। কাজেই তাহাদের টাকা সবই বৎসর বৎসর

বিদেশে চলিয়া যায়। ইহারও যেমন প্রতীকার আবশ্যক, গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য নীতিরও তেমন পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কম বলিয়া যে জমির উৎপাদিকা শক্তি কম তাহা নহে। উপযুক্ত অর্থ, পরিশ্রম, উপদেশ, সার, ভালবীজ, কৃষি যন্ত্রাদি, উপযুক্ত পরিমাণ জল ইত্যাদির অভাবে জমির উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ ব্যবহার আমরা করিতে পারিতেছিনা। তারপর যতখানি জমি অনায়াসে ইচ্ছামত চাষে আনা যাইতে পারে তাহার অর্দ্ধেকে মাত্র চাষ ও ফসল উৎপন্ন হইতেছে। যাহা উৎপন্ন হইতেছে তাহাও দেশে রাখিবার মত অর্থ নাই। ভারতীয় কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যেরও যথেষ্ট প্রসার অত্যাবশ্যক। তাহা না হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করিয়া ভারতবর্ষ ক্রমশঃই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে। এই স্থলে ইংরাজশক্তি এবং প্রজাশক্তির উভয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পূর্ণ সহানুভূতি চাই। এই দায়িত্ব-বোধই আমাদের সমস্ত প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ করিয়া দারিদ্র্যের বন্ধন হইতে মুক্তি দিবে।

আমাদের জন্ম ও মৃত্যুর হারের সহিত ইংলণ্ড এবং আমেরিকার জন্ম ও মৃত্যুর হারের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে হাজারে আমেরিকায় মৃত্যুর উপর জন্মসংখ্যা ১৭·৭ এবং ইংলণ্ডে ১০ বেশী। সেইস্থলে ভারতবর্ষে মাত্র ৫·৪ বেশী। এইরূপে যতরকম ভাবেই আলোচনা করা যায় 'লোকসংখ্যা প্রপীড়িত ভারত' বলিয়া যে অখ্যাতি রটিয়াছে তাহার কোনও ভিত্তি পাওয়া যায় না।

ল্যাপটন তাহার 'সুখী ভারত' (Happy India) নামক পুস্তকে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার যে উজ্জ্বল চিত্র সম্মুখে ধরিয়াছেন মিঃ হিণ্ডম্যান তাহার 'দেউলে ভারত' (Bankruptcy of India) নামক পুস্তকে ঠিক তাহার বিপরীত চিত্র আঁকিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ বাদানুবাদ না করিয়া পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ মিঃ দাদাভাই নৌরজী এই অতিরিক্ত লোকসংখ্যার অপবাদ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন সেইটুকু মাত্র বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি বলিয়াছেন (Condition of India—Correspondence with the Secretary of State for India) "ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া একটা মামুলি তর্ক অনেকদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ব্রিটিশ রাজত্বে শাসন সুশৃঙ্খলায় দেশে লোক বাড়িতেছে সত্য বটে কিন্তু আবার দেশ যে কি পরিমাণ নিঃস্ব হইয়া যাইতেছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত ইংরাজের শাসন ও বাণিজ্যনীতি দেশ যেটুকু উৎপন্ন করিতে সমর্থ তাহা উৎপন্ন করিবার সুযোগ দিতেছে না; যতদিন পর্য্যন্ত দেশের লোক যতটুকু উৎপন্ন করিতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছে না; ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই দেশে লোক বাড়িতেছে কিম্বা বাড়িতেছে না তাহা আলোচনা করিবার কোনও অধিকার নাই। বস্তুতঃ দেশের অর্থ, সুযোগ, সুবিধা ইত্যাদি সকল হইতে দেশকে

অল্পাধিক পরিমাণে বঞ্চিত করিয়া এই দেশকে তাহার আপনার লোকদিগকে খাওয়াইবার সামর্থ্য নাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা বড়ই মর্ম্মন্তুদ। ভারতবর্ষ যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন করে বা করিতে পারে তাহা তাহাকে রাখিতে ও করিতে দাও, তাহার পরই শুধু তোমাদের এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার জন্মিবে। ইংলণ্ড শুধু ভারতের অর্থলালসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াক্, তারপর এই অপবাদের বিচার হইবে! বর্ত্তমানের অপবাদ শুধু অন্যায় আঘাতের উপর আরও অপমান করা মাত্র। 'কোনও মানুষের হস্তদ্বয় কর্ত্তন করিয়া ফেলিয়া তাহার পর তাহাকে সে নিজকে খাওয়াইয়া রাখিতে পারে না বা তাহার হাত নাড়িবার শক্তি নাই বলিয়া বিদ্রূপ করাও যতদূর যুক্তিসঙ্গত, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন ও বাণিজ্যনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাকে "লোক-সংখ্যা নিপীড়িত ভারত" বলিয়া অপবাদ দেওয়াও ঠিক ততদূরই যুক্তিযুক্ত।"*

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

সদয় বালিকা

(গী দে মোপা সাঁ)

প্রতিদিন সকালবেলা এগারটার সময় নিয়মিতভাবে সে এসে দাঁড়াত সেই প্রাঙ্গণটার মধ্যখানে। তারপর মাথার কোমল টুপীটা পায়ের কাছে ফেলে রেখে বেহালাখানায় ছড়ের দুই একটা ঘা মেরেই একটা গাথা গাইতে আরম্ভ করে দিত—কি সুন্দর মধুর কণ্ঠে। তৎক্ষণাৎ ব্যারাকের মত কোঠা বাড়ীটার চারিদিককার জানালা যেত খুলে, আর তাতে এসে দাঁড়াত কতগুলো বালিকা। কেউ সুন্দর গাউন পরা, কারু গায়ে জ্যাকেট। প্রায় সকলেরই বুক আর হাত খোলা। এইমাত্র শয্যা হতে তারা উঠেছে—হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো কোন রকমে তাড়াতাড়ি জড়ান, হঠাৎ সূর্য্যালোকে বেরিয়ে আসায় চোখ বুঁজে এসেছে, মুখের রং ফ্যাকাসে, ঘুমের অভাবে চোখের পাতা ভারি।

তালে তালে মাথা দুলিয়ে তারা গান শোনে, আর ফেলে দেয় গায়কের টুপীটার মধ্যে টাকা পয়সা—টুপ্‌টাপ্ টুপ্‌টাপ্। তাদের সঙ্গে সঙ্গে তারাও গায়কের কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত বুঝি! কি কিন্নরকণ্ঠ গায়ক! তার সুর যেন ডেকে ডেকে বল্‌ছে, "এস, এস আমার

* এই প্রবন্ধের Facts এবং Figures এর জন্য অধিকাংশ স্থলে Wadia এবং Joshia "Wealth of India" Visweshauriar 'Reconstructing India' এবং A. R. H. Moncrieff এর 'The world of today' Vol 1 এর উপর নির্ভর করিয়াছি।

আবাসে এস গো— সে আবাস যে স্বর্ণস্ফটিকের রাজপ্রাসাদ, সেখানকার মালা যে চির অম্লান, সেখানকার সুখ ও ভালবাসা কখনও যে ঝরে যায় না।"

ছোটবেলায় এই সব গাথার কথাবস্তুকে তারা সত্য বলেই বিশ্বাস করত। তাই সেই পুরাতন গাথার গানগুলিতে, তার অর্থহীন বাক্যঝঙ্কারে তারা এমনিতর কথাই যেন শুনতে পেত,—এমনিতর কথা, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। তা শুনবে না কেন, বল? বালিকা বৈ ত নয়। হাঁ, হাঁ তারা বালিকাই। ঐ টাট্‌কা-গোলাপ গাল, ঐ যে রহস্যময় নৈশ আলোর মত কোমল প্রভা চোখে উদ্ভাসিত—ওসব বালিকা ছাড়া আর কার হতে পারে? বালিকা, বালিকা সত্য সত্যই তার বালিকা—বেড়ে গিয়েছে তাড়াতাড়ি হায়রে হায়। ব্যবসায়ের উপযোগী বার্দ্ধক্য পেয়ে বসেছে অকালেই—হয়ে দাঁড়িয়েছে ভালবাসার পশারিণী। যে ভালবাসা কড়ি দিয়ে কেনা যায়, তারি খোঁজে তারা রাতদিন ব্যস্ত!

এমন হয়েছিল বলেই যে মুহূর্ত্তে গায়ক তার গাথা শেষ করেছে, অমনি তাদের চোখে জ্বলে উঠল লালসার কি দীপ্ত বহ্নি! ডুবে গেল তাদের শিশুস্মৃতির কুজ্ঝটিকায় দেখা সেই স্বপ্নের মাঝি, সেই উপকথার জলদেবতা! প্রকাশ হয়ে পড়ল তৎস্থানে গায়ক তার প্রকৃত মূর্ত্তিতে—ঐ গায়ক, ঐ পেশাদার ভবঘুরে গায়ক, তাছাড়া আর কেউ নয়। আবার তার উপর টাকাকড়ি বৃষ্টি হতে লাগল—আবার চারিদিক হতে চলতে লাগল অপাঙ্গ দৃষ্টি, সুমধুর হাস্যধ্বনি। তারপর শোনা গেল একটা ফিস্ ফিস্—যেন সেই কোঠাবাড়ীটা একখানা মস্ত খাঁচা আর তার মধ্যে কিচির মিচির করছে কতগুলা পাখী। কেউ কেউ বা উচ্চ গলায় বলে উঠল, "কি সুন্দর ঐ মানুষটি, আহা মরি কি সুন্দর!"

বাস্তবিক গায়কটি ছিল খুবই সুন্দর। বাদামের মত বড় বড় শান্ত দুইটি তার চোখ, গ্রীসীয় তার নাক, ধনুকের মত বাঁকানো তার মুখভঙ্গিমা। তার উপর ঝুঁকে পড়েছে একজোড়া গোঁপ, মাথায় লম্বা কালো কোঁকড়ান চুল। এক কথায় সে যেন মনোহারী দোকানের জানালার দাঁড়িয়ে থাকবার উপযোগী। অথবা হয়ত তার সেই গীতগাথা পুস্তকের প্রচ্ছদপটে তাকে বসিয়ে রাখলেই মানায় বেশী। তার সেই চেহারাখানি সুন্দর হবার আরও এক কারণ হয়ত তার গভীর ঔদাসীন্য-মিশ্রিত আত্মগর্ব্বের ভাবটুকু। কারণ ঐ যে সব হাস্যধ্বনি, অপাঙ্গদৃষ্টি, ফিস্ ফিস্—সে-সব এপর্য্যন্ত সে গ্রাহ্যই করেনি।

গান শেষে কাঁধ দুইটা কুঞ্চিত করে মিটমিটিয়ে সে চাইতে লাগিল। কি দুষ্টামীভরা তার চাউনি। বিদ্রূপভরে বাঁকানো ঠোঁট দুইটি তার যেন পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছল— "তোমাদের জন্যে আমার উনুনে আগুন দেওয়া হয় নি, ওগো কচিখুকীরদল, তোমাদের জন্যে নয়!"

মনে হল অনেকবার সে যেন তার অন্তরের বিদ্রূপটা বাইরে প্রকাশও করতে চাইছে, যেন

অনেকবার সে নিজেকে তাদের কাছে গন্ধময় বলে জাহির করতে প্রস্তুত। গান শেষ করে অনেকবার সে গলার খেকর দিয়েছে। যাতে তারা আর না ভালবাসে তাই ইচ্ছা করে তাদের মুখে থুথু দিবার ভঙ্গীতেই কি তার ঐ কাজ? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তবু তারা তাকে গন্ধময় বলে মনে করতে পারল না, তবু তারা অনেকেই, এমন কি সকলেই তার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠল। কেউ কেউ এমন কথাও বলতে লাগল, তার ঐ ভঙ্গীটা নাকি প্রেম-গর্ব্বিতেরই অভিনয়!

যে বালিকাটি সর্ব্বপ্রথম তার প্রেম-অভিজ্ঞান প্রকাশ করতে গিয়ে আগে একটি টাকা, তারপর একটি মোহর তাকে দিয়ে ফেলেছিল, সে একদিন সকাল বেলা সকলের সামনে যখন তারা সব চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, সাহস ভরে বলে ফেলল,—"এস, এস, ওগো এখানে উঠে এস।" তারপর পূর্ব্ব অভ্যাসবশে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আমি তোমার মনস্তুষ্টি করব এখন, এস মাণিক।"

আর সব বালিকারা প্রথমে ত স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর তাদের মধ্যে জেগে উঠল হিংসা আর তার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল প্রমত্ত লালসা। তখন সব জানালা হতেই একযোগে অনর্গল আসতে লাগল আহ্বান—এস, এস, আমার কাছে এস, ওর কাছে যেয়ো না, আমার কাছে এস, ওর কাছে যেও না, আমার কাছে এস। আর ফেলতে লাগল দুয়ানী, সিকি, আধুলি, টাকা, মোহর, চুরুট, কমলালেবু, লেসের রুমাল, রেশমের গলাবন্ধ। হাওয়ায় উড়ে উড়ে সে সব গায়কের চারধারে পড়তে লাগল নানাবর্ণ আঁকা প্রজাপতির ঝাঁকের মত।

ধীরে ধীরে যেন আন্‌মনে সে গুলা সে কুড়াতে লাগল। কুড়িয়ে যথা স্থানে রেখে দাঁড়াল, তার পর টুপিটা মাথায় পরে তাদের ধন্যবাদ দিয়ে বলল, "আমি তোমাদের কথা রাখতে পারব না।"

এত লোকের সাধ এক কালে পূর্ণ করা বাস্তবিক অসম্ভবই বটে ভেবে, একজন বলল, "আচ্ছা ওকে নিজে পছন্দ করতে দাও।"

"হাঁ তাই করুক, তাই করুক"—সকলেই সায় দিয়ে বলে উঠল।

সে আবার বললে, "আমি পারব না বলছি।"

সকলের মনে হল নাগরের ভঙ্গীতেই তার এমন কথা। তখন অনেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে সজল চোখে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "মেয়ে মানুষ ত রক্তমাংসের গড়া নয়, সে যে হৃদয় দিয়েই তৈরী।"

যে মেয়েটা আগে কথা কয়েছিল, সে বলল, "আচ্ছা লটারী হোক না কেন?"

"হাঁ—হাঁ তাই হোক, তাই হোক।"

তারপর সব চুপ। সবার মুখে কি গভীর উৎকণ্ঠার চিহ্ন। হৃৎপিণ্ডের গুর্‌গুর্ ধ্বনিও বুঝি শোনা যায়!

গায়ক আস্তে আস্তে বলে গেল, "ওটাতেও আমি রাজি নই। একেবারে তোমাদের সকলকে আমি নিতে পারব না। একে একে? না, তাও না। অমি অক্ষম, ফের বলছি, আমি অক্ষম।"

"কেন? কেন?" সব দিক হতে সমস্বরে চীৎকার। সকলের মুখে রাগ আর ক্ষোভের চিহ্ন—নয়নের দীপ্তিতে আগুনের ফুলকী। কেউ কেউ হাত মুঠা করে কিল পর্য্যন্ত দেখাতে সুরু করল।

প্রথমকার বক্তাটী আবার বলে উঠল, "চুপ কর। ওকে বলতে দাও ওর মৎলবটা কি।"

"হাঁ—হাঁ বলুক, বলুক, ভগবানের নামে শপথ করে বলুক।"

তারপর আবার সব নীরব হয়ে গেল। সেই নীরবতা ভঙ্গ করে আপনার বাহুদুটি বাড়িয়ে দিয়ে অসামর্থ্যের ভঙ্গীতেই গায়ক বলে উঠল, "কি চাও তোমরা, বল ত? বুঝতে পারছি তোমাদের নিয়ে যেতে পারলে বেশ আনন্দ হয়। কিন্তু আমি যে তা আর পারছি নি, আমার নিজেরই যে দুটি মেয়ে ঘরে রয়েছে।"

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

আমার কৈফিয়ৎ

(বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক-সম্মেলনে পঠিত)

কলেজের নূতন সহকর্ম্মিগণ আমার কাছে কিছু শুনিতে চাহিয়াছেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই আসামীর কৈফিয়ৎসহ বন্ধুজন সকাশে উপস্থিত হইতেছি।

আপনারা প্রশ্ন করিতে স্বভাবতঃই পারেন গরীবের ঘোড়ারোগ হয়েছিল কেন? "ম্যাষ্টরী কর্ম্ম" করিতে করিতে হঠাৎ রাজনৈতিক গগনের উল্কা হইবার বাসনা হ'ল কি করে?

সত্যি এতদ্দেশে শিক্ষক শ্রেণীর যে দুরবস্থা হয়েছে তাতে পরের লিখিত পুঁথির নির্ঘণ্ট তৈয়ারী করা এবং প্রতিনিয়ত সুবোধ্য, দুর্ব্বোধ্য এবং অবোধ্য বস্তুর ব্যাখ্যা করা এবং মাসমাইনে নেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ যে এই শ্রেণীর জীবের দ্বারা সম্ভব এ ধারণা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে। পুঁথিতে পড়ান হয় ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ী ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের শিক্ষক; কাযে দেখি তাঁরা সমাজ-যানের বলীবর্দ্দমাত্র, চিনির বলদ হয়ে মোট ব'য়ে বেড়াচ্ছেন। বিশেষ করে সরকারী ও বেসরকারী এই দু'জাতের শিক্ষকের দু'পংক্তিতে বসে এবং সরকারী শিক্ষকদের মধ্যে বেতনভেদে মর্য্যাদাভেদটা বেশ আঁট হয়ে যাওয়ার দরুণ, শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে বেশ একটা বিশৃঙ্খলার সুবিন্যাস জন্মেছে। ক্রমে [illegible]

করেছিল এবং এঁদের মুখের অগ্নিতে আজ অন্য জীব না পুড়িয়ে নিজেদেরই দগ্ধ করে বেড়াচ্ছেন। ধোঁড়া সাপের বিষের দৌড় সুধীজনের জানা আছে।

কিন্তু চিরকালই এমনটা ছিল না—এখানেই বয়োবৃদ্ধ দু'চার জন প্রকৃত শিক্ষক হয়ত উপস্থিত আছেন যাঁরা আর একটু উন্নততর শিক্ষকদের কাছে কিছু শিখে বেড়িয়েছিলেন, এবং জীবনের প্রারম্ভে যাঁদের জীবনপথের সম্বল গোটাকতক তোতাপাখীর বাঁধা বুলির চেয়ে বেশী ছিল। এঁরা কিছু ব্রাহ্মণের শিক্ষকের গণ্ডীতে বৈশ্য শূদ্রকে বসাইতে রাজী হননি এবং নিজেদের নিলামে দর কসে' সর্ব্বোচ্চ হাঁকদাতার কাছে বিক্রী করাটাও সঙ্গত মনে করেন নি। তরুণদলের, "সবুজ"দলেরও দু'চারটি এখানে থাকতে পারেন যাঁদের রক্ষণার্থ আজও সুবিশাল এবং নৈতিক মেরুদণ্ড সোজা খাড়া রয়েছে যাদের উপর বাংলার কঠোর কোমলতা তার ছাপ দিয়েছে, বাংলার দুর্দ্দান্ত উন্মত্ত পদ্মা মেঘনা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মোহজালে যাদের অন্তর ছেয়েছে, বাংলার তপস্যা, ত্যাগ, কবিতা যাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই আশায়ই এই কৈফিয়ৎ খাড়া কর্চ্ছি কেননা অরসিকের কাছে রস নিবেদন করা অশাস্ত্রীয়।

আজ বণিক্‌বৃত্তির ক্ষুদ্রতায় দেশ ভরে গেল, অর্থের প্রভাব বিদ্যা ও চরিত্রের উৎকর্ষকে ছাপিয়ে উঠেছে—ব্রাহ্মণ লুপ্ত, ক্ষত্রিয় নিস্তেজ, এক শূদ্র-ভাবান্বিত বৈশ্যে দেশ আচ্ছন্ন হচ্ছে, সমাজের শিক্ষক আজ কেউ সমাজের ভক্ষক, কেউ বা অর্থশালী বৈশ্য-শূদ্রের চাটুকার। দেশ রাজা থাকতেও অরাজকতায় পূর্ণ; রাজপুরুষগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা কূটনীতির, ভেদপন্থারই বেশী অনুরাগী—কিন্তু তাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ থেকে ন্যায়বারিধি, ন্যায়বাগীশ উপাধি মণ্ডিত হ'তে রাজপুরুষদের কোন বেগ পেতে হয় না,—এবং হিন্দু সমাজের তথাকথিত কর্ণধারবৃন্দ অবাধে চাটুকারিতার ভেলা ভাসিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য সহ ভিন্নদেশীয় রাজপুরুষের বহরের নিকট—নিতান্ত উদ্ভট বিনয়ের সহিত সমুপস্থিত হয়েন। অতএব প্রথম বয়স অর্থাৎ কৈশোরের প্রারম্ভেই এই সব ভেবে দেখে, বিচার করে এবং যৌবনের প্রারম্ভেই "ম্যাষ্টারি" পদ নিয়ে এসকলের বিশেষ আস্বাদ পেয়ে ক্রমশঃ মনটি তিক্ত রসে ভরে যাচ্ছিল।

১৯০৫ সালে যখন প্রথম স্বদেশী আরম্ভ হয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলামখানা নাম করণের পরই তার অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা হয়, তখন প্রথম বয়সের উদ্দাম কল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সঙ্গে অসহযোগ করে বাংলায় প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় যা রংপুরে হয়েছিল তাহা প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তারপরে দ্রুত ফিরে এসে—পলিতকেশ বৃদ্ধদের কথা আপৎকালে শোনার রীতি এদেশে বরাবরই আছে—পরীক্ষা পাশ করে, অতি দ্রুত সরকারী কলেজে প্রবেশ করি—যদি চ বরিশালের ১৯০৬ সালের সেই মাথাভাঙ্গা কন্‌ফারেন্সে রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে এ কচি মাথাটিও ভাঙ্গবার উপক্রম হয়েছিল। তারপরে ১৪ বৎসর নানাস্থানে শিক্ষকতা কর্ত্তে চাইলাম—এবং ছেলেদের অভ্যস্ত বুলি না শিখিয়ে তাঁদের

অধ্যয়ন অর্থাৎ একটু কিছু আদর্শ (তা জাতীয়তাই বলুন, জনসেবাই বলুন, বুদ্ধি ও চরিত্রের উৎকর্ষই বলুন) লক্ষ্য করে মনের গতি-বেগ সৃষ্টি করতে গিয়ে—পথে পথে, অলিতে গলিতে এত বাধা পেলাম—এবং বেশীর ভাগ স্বদেশীয় শিক্ষক মহাশয়দের কাছ থেকে এবং তাদের মন্ত্রণার অনুবর্ত্তী বিদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষ, জাতীয় জীবদের থেকে যে কোস্তাকুস্তি কর্ত্তে কর্ত্তে খানিক মানসিক শক্তি আহরণ যেই হ'ল অমনি সুযোগ বুঝে—অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধি ও দেশবন্ধু দাসের সোণার কাঠি ও রূপার কাঠির ছায়ায় যখন নিদ্রিতা রাজকন্যা নেহাৎই গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠবার ভাব দেখালেন—তখন সরকারী চাকুরী, তার মোটা বেতন এবং পেন্সনের মোটা আশা দূরে ফেলে দেওয়া গেল।

এই হ'ল আমার সরকারী কলেজে শিক্ষকতার অবসানের অতি সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এ কাহিনীর ভিতরেও অনেক অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক উন্মুক্ত করে দেখাতে পার্ত্তাম। কিন্তু আজ আর নয়।

১৯২১ সালের ১৬ই মার্চ্চ দুপুর রাতে দেশবন্ধুর সঙ্গে অর্দ্ধঘণ্টা নিভৃত আলোচনার পরে বাসায় ফিরে এসে সারারাত ছট্‌ফট্ করে শেষরাত্রে স্তিমিত প্রদীপ শিখার সাহায্যে পদ-ত্যাগের মুসাবিদা খাড়া করে পতঙ্গবৎ বেড়া আগুনে ঝাঁপ দিলাম। দেশবন্ধুর সঙ্গে সেই নিভৃত একান্ত পরিচয়ের ছাপ মন থেকে আর মুছবে না। ইতিহাসটা একটু বলব—কারো মনের দ্বারে এক আধটু আঘাত দিতে পারে। "২১শে"র জানুয়ারী মাসে যখন দেশবন্ধু তাঁর আইন ব্যবসা ছেড়ে দিলেন এবং কলিকাতার ছাত্রসমাজে একটা বড় রকমের চাঞ্চল্য দেখা দিল, তখন থেকে (আমি সরকারি চাকর হয়েও ১৯২০শের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে দর্শক হিসাবে যোগ দিয়ে এসেছিলাম) বাংলার অন্যত্রও খুব সাড়া প'ড়ে গেল। চাটগাঁয় এই আন্দোলন তার কিছু আগেই সুরু হয়—মুসলমান প্রদেশ—খিলাফতি হৈ চৈতখন দেশকে বেশ সরগরম করেছে,—মাদ্রাসা ভাঙ্গা, মুসলমানী স্কুল ভাঙ্গা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যখন প্রথম বড় ভাঙ্গনি সুরু হ'ল তখন আমার তেজস্বী কয়েকজন হিন্দুছাত্র অসহযোগের জোর ব্যাখ্যা প্রকাশ্য সভা ডেকে ছাত্রমহলে আরম্ভ কর্ল—চাটগাঁয় সরকারী কলেজ দ্রুত দুল্‌তে লাগ্‌ল—constant "alarms and excursions"—এই একদল বেরয়;—আবার কতক ফেরে—আবার একদল ছাড়ে, আবার তার কিছু বাইরেই থেকে যায় এমনি করে দোললীলা চল্‌ল। তখনও আমি কলেজে discipline রক্ষা কর্‌তে বাহ্যতঃ সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর্চ্ছি—আর অন্তরে অন্তরে বাড়ী বসে, এবং বন্ধু মহলে, অসহযোগের সমর্থন সূচক মত প্রকাশ কর্চ্ছি—এবং এই দ্বৈতদ্বন্দ্বের ধস্তাধস্তিতে আমার মন ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে। এমন সময়ে দেশবন্ধু আমার বন্ধু বাংলার বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের আতিথ্য স্বীকার করে চাটগাঁয় এলেন। দূরে থেকে তাঁর বক্তৃতা শুনতে গেলাম। ১০।১২ হাজার লোকের ভিড়—সহরের মধ্যে খোলা জায়গা, তার পাশে উচ্চ মালভূমি এবং বাড়ীর ছাদ ও জানালায়

পিপ্‌ড়ের সারির মত নরনারী জমায়েত হয়েছে। আমি কিছু দূর থেকে এই জনগণের উচ্ছল কোলাহল শুনছি এবং দেশবন্ধুকে দেখছি—এমন সময় একটি বন্ধু বল্লেন, "নৃপেন বাবু, কাছে গিয়ে বসুন্ না।" সমস্ত অন্তর মথিত করে আমার মনের ক্রন্দন বেরিয়ে এল—"গোলামের আমার দেশসেবার এবং দেশসেবকের নিকটে যাবার অধিকার কি ?"

তার পরের দিনই গভীর রাত্রে নেহাৎ অদৃষ্টের ধাক্কায় (একরকম কিছুই আগে স্থির ছিল না) দেশবন্ধুর কাছে গিয়ে উপনীত হ'লাম। অসহযোগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার পরে আমি তাঁকে বল্‌লাম—এ সম্বন্ধে আমার নূতন কিছু জানবার নাই—আমার মন স্থির—শুধু বাসায় ২৫খানা পাতা প্রতিবেলায় পড়ে, অনেক কয়টী আত্মীয় আমার উপর নির্ভর করে আছে, দু একটী বাইরের ছাত্রও আমার বাড়ীতে থাকে—এদের কথাই ভাবছি। তিনি নিজে যে সমস্ত দানধ্যান charities এক রকম বাতিল করে পথে বেরিয়েছেন তা' বল্লেন। তারপরের যে কথাটী হ'ল—সেইটীই আমার সঙ্কল্প সুস্থির করে দিল—এবং সে কথাটী অনুধাবনযোগ্য। আমি দেশবন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম—"আচ্ছা দেখুন—আপনি আমার চেয়ে ১৪।১৫ বছরের বড়, আইন ব্যবসা করে পৃথিবীর ভালমন্দের অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করেছেন ঢের বেশী—আচ্ছা আমি আজ যদি দেশের জন্য সব ছাড়ি, সেই দৃষ্টান্তে অন্ততঃ ২০।২৫টী আমার মত চাকুরেও কি চাকুরির সুখলিপ্ত মোহ ছেড়ে আমাদের সহযাত্রী হবে না ?" এর উত্তরে একজন বিষয়ী চতুর চালবাজ রাজনৈতিক নেতা অবশ্যই বলে ফেলতেন—"নিশ্চয়! তা আর হবে না! আপনার একার দৃষ্টান্তে শত শত লোক অনুপ্রাণিত হয়ে কাজে বেরুবে।" (কারণ আমি তখন from the recruiter's point of view, an excellent capture!)

কিন্তু না—দেশবন্ধু অতিশয় অকপট সারল্য নিয়ে নির্ম্মম সত্য কথা বল্‌লেন, "দেখুন এ কিছু বলা যায় না। ১০০ লোকও বেরুতে পারে আপনার দেখা দেখি, একজনও না বেরুতে পারে। আপনি অন্যের মুখ চেয়ে কিছু কর্বেন না—নিজের কর্ত্তব্য নিজে স্থির করুন—আপনি ভেবে নিন, হয়ত আর একজনও আসবেনা।"

এই উত্তরই "clinched the matter"—আমার মনের ভিতর খুব একটা বিজলী খেল্‌ল—তাইত, এ একটা সত্যাশ্রয়ী মানুষ বটে! এর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ব।" এর পূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধীর কার্য্য ও বাক্যের খস্‌ড়া মনের মধ্যে ১৯১৫ সাল থেকে বেশ একটা ধরে রাখ্‌ছিলাম—নাগপুরে তাঁর কার্য্যকলাপ, স্থিরবুদ্ধি নেতৃত্বের ক্ষমতা,—Personal magnetism, লোককে চুম্বকের মত আকর্ষণ করবার শক্তি—লক্ষ্য করেছিলাম।

অতএব আমি জালে ধরা পড়লাম, খুব সহজে। তার পর ১৭ই মার্চ্চ সকাল বেলা ভোরে দেশবন্ধুকে—আমার পদত্যাগ পত্র (৮।১০ লাইন মাত্র—তাতে প্রবর্ত্তিত সরকারী শিক্ষায় কিছু হচ্ছে না—অতএব আমি এর সঙ্গে সাহচর্য্য আর রাখ্‌বনা এই কথাই ছিল এবং তৎক্ষণাৎ

বিনা নোটীশে মুক্তি প্রার্থনা করেছিলাম) দেখিয়ে তাহা কর্তৃপক্ষকে পাঠালাম। সেইদিন থেকে চাটগাঁয় খুব একটা সাড়া পড়ে গেল এবং সেনগুপ্ত ও আমি, অনেক উকিল, শিক্ষক, জমীদার, ব্যবসায়ী, শত শত ছাত্র, সাধারণ মজুর, মুটে, মেথর, মুচি, boy, butler প্রভৃতিকে দ্রুত দলভুক্ত করে ফেল্লাম। কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা সব জিলাময় ভেঙ্গে গেল। Post ও Railway এবং factoryর শ্রমিক, দলে দলে আমাদের মুঠোর মধ্যে এসে গেল—আমাদের প্রথম যুদ্ধ B.O.C.র বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর চাটগাঁর Agencyর বড় সাহেবের সঙ্গে। শ্রমিক সংগঠন করতে গিয়ে বাধা পেয়ে আমরা দল বেঁধে ফেল্লাম—এবং দুজন বড় বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে যেই বরখাস্ত কল্লে অমনি আমাদের labour organisation তার সমস্ত কারখানা এবং আফিস্ উল্টে দিল—৭।৮ দিনের মধ্যে এমন হ'ল যে অন্য সাহেব কোম্পানি সব ফেল হবার যো হ'ল—সমস্ত মজুর প্রায় আমাদের তাঁবে,—সাহেবদের boy, বাবুর্চ্চি, মেথর পর্য্যন্ত। ১৫ দিনের মধ্যে ৪ঠা মে তারিখে ১৪৪ ধারা প্রথম ভারতবর্ষে আমরা ১০০০০ লোক নিয়ে অমান্য করে চাটগাঁয় adminstration টাকে প্রায় paralyse করে, বর্ম্মাযাত্রী মেল ষ্টীমার, চাঁদপুরগামী রেলগাড়ী পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়ে— আমরা একটা বড় বাজি জিতে নিলেম। তৎক্ষণাৎ ১৪৪ ধারা উঠে গেল এবং আমাদের জয়জয়কার। সেই সাহেবটী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কল্লেন—আমাদের বাঙ্গালী কেরাণীদ্বয় পুনরায় চাকুরীতে প্রবেশ লাভ কর্ল্লেন,—মজুরদের বেতনাদি সম্বন্ধে বৈঠক হবে কথা হ'ল। এর পরে চাঁদপুরে কুলীর উপর গুর্খা পিটুনি যেই হ'ল (কোন স্বদেশীয় উচ্চ রাজ-পুরুষের হুকুমে ও সাক্ষাতে) অমনি সেনগুপ্ত ও আমরা মিলে সমস্ত Assam Bengal Railway protest strike ৪৮ ঘণ্টার ভিতরে একটুকরা কাগজে হুকুম লিখে (তার কিছু আগে আমরা দুজনে মিলে A.B Railway Union গঠিত করেছি এবং সেনগুপ্ত President এবং আমি general adviser হয়েছি) করিয়ে দিলাম। তারপরে ৩।৪মাস সারা চাঁদপুর থেকে গৌহাটী পর্য্যন্ত রেলের কর্তৃপক্ষ এবং সরকার-এর অমিত অর্থ ও শক্তির সঙ্গে, মোট লাখ—১½লাখ টাকা এবং কয়েক শত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে আমরা লড়েছিলাম। নানা কারণে মহাত্মা গান্ধীকে ডেকে নিয়ে ৪মাস পরে আমরা strike ভেঙ্গে দিলাম—আমাদের অর্থ নিঃশেষ হয়ে এসেছিল, দলে (বিশেষ ভদ্র কেরাণীদের) ভাঙ্গুনি ধরেছিল এবং অজানিত একদল আমাদের অজ্ঞাতসারে ট্রেইন উল্টে দিতেছিল। Strike ভেঙ্গে গেলেই আমাদের কারাকক্ষে প্রবেশ করতে হবে—এই political বোধ আমাদের ছিল—এবং তা জেনেই কর্ত্তব্য বোধে আমরা সেই পথই নিলাম। ফলে আমার ১ বৎসর এবং সেনগুপ্তের ৩ মাস কারাদণ্ড এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই ও অব্যবহিত পরে ছোটবড় উকিল, মাষ্টার, চাকুরী-ছাড়া কেরাণী, ছাত্র, সাধারণ হিন্দু মুসলমান, ৬।৭ শত চাটগাঁ থেকে জেলে আসে। এ আন্দোলনে হিন্দু মুসলমান দুই-ই সমভাবে লড়েছিল এবং কষ্ট বরণ করেছিল এবং বাংলাদেশে অন্য কোথাও বিদ্রোহের

বিরাট ছায়া এমনভাবে নেমেছিল না। জেলে এক বৎসরের কাহিনী দীর্ঘ। দেশবন্ধু, শ্যামসুন্দর, আবুল কালাম আজাদ, শাসমল, সেনগুপ্ত, সুভাস, কিরণশঙ্কর, হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত করোটিয়ার, জমীদার, পানিসাহেব, মুসলমান সম্পাদক মুজিবর রহমান, অভয়-আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার সুরেশ—গুর্খা দলবাহাদুর (এক্ষণে লোকান্তরিত) এবং অন্যান্য সহকর্ম্মী মাড়োয়ারী, শিখ, কলের মজুর, অসংখ্য যুবকও ছাত্র—এবং আশুতোষ লাহিড়ী প্রমুখ আন্দামান প্রত্যাগত কতিপয় স্বদেশী যুগের সর্ব্বস্বত্যাগী দেশসেবক এদের সঙ্গ পেয়ে সেই বৎসর নিরবচ্ছিন্ন সুখেই কেটেছিল—এখন তাই মনে হয়। পড়াশুনা, ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, ইতিহাস চর্চ্চা এবং গালগল্প, জেলের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে মাঝে মাঝে যুদ্ধাভিনয়, গুপ্ত উপায়ে পত্র চালাচালি ও সংবাদপত্রের স্তম্ভের সহিত পরিচয় এবং খানা পিনা—এতেই বছর কাটল। অবশ্য প্রথম কয় মাস যখন দলে পুরু ছিলাম না তখন এই বিষয়ে কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে হয়েছে। সে কষ্টের কথা আজ মনে নাই। আনন্দের লেশটাই রয়ে গেছে। এই জেলের ভিতরেই আমার "ভারতের বাণীর যুগবার্ত্তা" এবং "Gandhisim" এর রং প্রবন্ধ রচিত হয়। কিন্তু জেলে থাকতেই মতের ভিন্নতা দেখা দিল। একদল মহাত্মার বার্দ্দলী মন্তব্যের পক্ষপাতী। অন্যদল তার ভীষণ বিরোধী, এরাই ক্রমে No-changer ও Pro-changer দলে পরিণত হয়েন। আমি বার্দ্দোলী মন্তব্যের সমর্থন করে "Servent" এ এক Editoral, জেল থেকেই লিখে পাঠাই—এবং তাহা মুদ্রিত হয়। দেশবন্ধুর সঙ্গে এই নিয়েই প্রথম আমার সঙ্গে মন কসাকসি হয় এবং আমাকে বলে পাঠাতে হয় যে আমার স্বাধীন মত কারো মুখ চেয়ে ছাড়তে প্রস্তুত নই। জেলের ভেতরেই দল দুটী বেশ পাকা হয়ে উঠে। আমি বেরিয়ে ছয় মাস Servant সম্পাদক রূপে দেশবন্ধুর Programmeএর, বাক্যে ও কলমে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি, এবং পরে তাঁর দল যখন Provincial Committee দখল করে নেয় তখন বাংলা ছেড়ে Rangoon Mailএর সম্পাদকতার ভার নিয়ে (তখন ঐ পত্রের তৃতীয় সম্পাদক জেলে ঢুকেছেন) বর্ম্মায় চলে যাই। বর্ম্মায় দু' বৎসরের ইতিহাস হয়ত আপনাদের কারো কারো ভাল লাগতে পারে। সে কাহিনী বারান্তরে আজকের দক্ষিণার বরাদ্দ বুঝে বিবৃত হয়ত কর্ব্ব।

দেশবন্ধুর পরলোক গমনের পরে আমি বর্ম্মার ধূলি গা, পা থেকে ঝেড়ে ফেলে আবার বাংলার মাটীতে ফিরে এসেছি। স্বরাজ্য দলে নাম লিখিয়েছি এবং কংগ্রেসের প্রচার ও খাদি প্রচার কিছু কিছু দেশের নানাস্থানে একবৎসর করে বেড়িয়েছি। তার পর এখন রাজনীতি বক্রনীতিতে পরিবর্ত্তিত দ্রুত হচ্ছে দেখছি এবং আরো দেখছি হিন্দু মুসলমান পরস্পরের রক্ত পানে বিশেষ সমুৎসুক হয়েছে। কাল ধর্ম্ম এড়ান যায় না--অতএব যখন প্রায় সকলেই স্ব স্ব বিবরে প্রবেশ করেছেন এবং যার যার ঢাক পিটুচ্ছেন, তখন অগত্যা আবার যে ঢেঁকি সে ঢেঁকি হয়ে আপনাদের স্বর্গে প্রবেশ লাভ করেছি। এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই। পরন্তু আসা আছে ছেলেদের নিয়ে, একটু নাড়াচাড়া করে হাত পাকাতে পারব? তার পর ভবিষ্যৎ নিজের বুজ বুঝে নেবে। আজ এই পর্য্যন্ত এখন মিষ্টি মুখ করে তেঁতো বিষ ঝেড়ে ফেলুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

মানুষ গড়া—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত। পি ৫৭ রসারোড সাউথ হইতে আর্য্যপাবলিসিং কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

বইখানি কতকগুলি ছোট ছোট প্রবন্ধের সমষ্টি। এই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ বাহির হইয়াছিল বিজলীতে, দুই একটী বাহির হইয়াছিল নারায়ণে। প্রবন্ধগুলি নানা বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত; তবে তাহাদের মধ্যে একটী যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সে যোগসূত্রটী মানুষের স্বরূপ। বারীন্দ্রবাবু শ্রীযুক্ত অরবিন্দের নিকট হইতে মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন তাহাই স্বভাবসুলভ কল্পনায় রঞ্জিত করিয়া চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের স্বরূপটা পরের কাছে শুনিয়া অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা দুশ্চেষ্টা মাত্র। সেই জন্য বারীন্দ্রবাবু বইখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"আমার অনুরোধ এ বইখানি পড়তে গিয়ে অরবিন্দের নূতন যোগের সত্য এর মাঝে কেউ খুঁজবেন না, খুঁজবেন শুধু আমার কথা।" কিন্তু আমাদের মনে হয় বইখানিতে অরবিন্দের কথাও নাই, বারীন্দ্রবাবুর নিজের কথাও নাই। যাহা আছে তাহা শুধু অরবিন্দের কথার বিকৃত প্রতিধ্বনি।

বীরবলের হালখাতা—(১ম পর্ব্ব)—২য় সংস্করণ—শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী প্রণীত—১৪৮ পৃষ্ঠা,—কলেজষ্ট্রীট মার্কেট হইতে "ক্যালকাটা পাব্লিশার্স" কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

বীরবলের এই পুস্তকখানি সর্ব্বজন সুপরিচিত। ইহাতে বীরবলের ভাষা ও ভাবের বিশেষত্ব-যুক্ত ১৪টি সুচিন্তিত প্রবন্ধ আছে। ইহার ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অনবদ্য।

মানস-কমল—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য এক টাকা।

বইখানি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি এক একটি ছায়াচিত্রের ধরণের। এই চিত্রগুলির বিশেষত্ব এই যে লেখক রঙের মদিরতায় আত্মবিস্মৃত হন নাই, অল্প কয়েকটি রেখাপাতের সাহায্যে ছবিগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। চিত্রগুলি সজীব ও মনোহর হইলেও মোটের উপর ছায়াচিত্র মাত্র। লেখকের অধিকাংশ গল্পই এক একটা 'সমস্যা'র অবতারণা করিয়াছে এবং এইরূপে আজকালকার 'সমস্যা'-পীড়িত সাহিত্যের ধারাই বজায় রাখিয়াছে। শুধু 'ছবির খেয়াল' ও 'রাত দুপুর' এই দুটি গল্প পড়িয়া নিছক কল্পনার হাওয়ায় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচা যায়।

বইখানির ছাপা ও বাঁধান ভাল।

লক্ষ্মী (নাটক)—শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবাগীশ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবাণীনাথ চক্রবর্ত্তী, কিশোরগঞ্জ। মূল্য—একটাকা।

লেখকের হৃদয়সমুদ্র মন্থনে 'লক্ষ্মী' উঠিয়াছেন বটে, তবে সাহিত্যরসের সুধাভাণ্ড উঠে নাই, ইহা নিঃসন্দেহ। স্থানে স্থানে রসের পরিবর্ত্তে যে 'বদরসিকতা' অথবা 'বেরসিকতা'র হলাহল উঠিয়াছে তাহা কোন শিবই গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না।

নাটকটির গল্পাংশ অনেকটা রামায়ণের সীতা-হরণ ব্যাপারের মত। তবে বাল্মীকির রাবণকে যুদ্ধে মরিতে হইয়াছিল, আর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের রাবণকে অনুতাপের আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছে। বাল্মীকির সীতা অগ্নি-পরীক্ষায় নিজের সতীত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন; বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সীতা অগ্নি-পরীক্ষায় রাজি ছিলেন বটে, তবে আজকালকার দিনে সেটা নিতান্ত আজগুবি ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া নাট্যকার অগ্নি-পরীক্ষা আর হইতে দিলেন না।

নাট্যের পাত্রপাত্রীগুলি নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন; কিরূপ অবস্থায় কিরূপ কথা বলিতে হয় তাহা তাঁহারা জানে না। অনেকস্থলে তাহাদিগকে অর্ব্বাচীন বলিব অথবা পাগল বলিব তাহা ঠিক করা শক্ত।

স্থানে স্থানে নাট্যকার হাস্য-রসের অবতারণা। করিয়াছেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে রঙ্গরসটা অশ্লীলতায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বইখানির ছাপা ও বাঁধান ভাল, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের হাফটোন ছবিটিও ভাল উঠিয়াছে।

শ্রাবণে

ভারত ও জাপান—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কবি হেমচন্দ্র যেদিন লিখিয়াছিলেন "অসভ্য জাপান,—তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান", সেদিন যথার্থই এই পৃথিবীতে জাপান অতি নগণ্য ছিল, আর সেই সময় হইতে পঁচিশ বৎসরের চেষ্টায় আত্মশক্তি বাড়াইয়া জাপান প্রভুতার প্রভাবে দীপ্ত হইল, কিন্তু ভারত রহিয়া গেল—"যে তিমিরে, সেই তিমিরে।" জাপান উন্নত হইয়াছে ইউরোপীয় জ্ঞান ও কর্ম্মকুশলতা আত্মস্থ করিয়া; কিন্তু ভারতের লোকেরা আরও একশত বৎসর আগে হইতে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও কর্ম্ম-পদ্ধতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল ও রাজা রামমোহনের দিন হইতে সমাজ সংস্কারের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিল, তবুও তাহার উন্নতি হইল না কেন? এই প্রশ্ন তুলিয়া শ্রীযুক্ত সণ্ডরল্যাণ্ড (Dr. Sunderland) সম্প্রতি যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, Indian Messenger পত্রে তাহার সারভাগ পড়িলাম। লেখকের মন্তব্য এই, জাপানীরা আপনাদের অবাধ স্বাধীন উদ্যোগে কাজ করিয়া বড় হইয়াছে, আর পরাধীন ভারতবাসীদের সকল উদ্যোগ জেতা জাতির স্বার্থসংরক্ষণী নীতির চাপে বিড়ম্বিত হইয়াছে। লেখক বলেন যে ভারতের শিল্প ধ্বংস করিয়া কর্ম্মক্ষমতা নষ্ট করিয়া ইউরোপীয় প্রভুতার জাল এমনভাবে বিস্তৃত করা হইয়াছে যাহাতে ভারতের পক্ষে উন্নতিলাভ অসম্ভব হইয়াছে।

পরের চাপে ও আওতায় কেহ যে বাড়িতে পারে না, সেটা অত্যন্ত সত্য; তাহা ছাড়া আমাদের অনেক উদ্যোগ ও জাপানের উদ্যোগের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ ছিল বড় বেশি। আমরা জ্ঞানের ও কর্ম্মের মন্ত্র আওড়াইয়াছি পোষা পাখীর মত, অথবা জ্ঞানের ও কর্ম্মের অভিনয়ের আসরে উহাদের বাহিরের বর্ণের ও সাজ পোষাকের উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হইয়া; অভাবের উত্তেজনায় যেখানে জ্ঞানের জন্য কৌতূহল জন্মে অথবা কর্ম্মের জন্য সর্ব্বাঙ্গে সচল উৎসাহ জাগে, তখন যে চেষ্টায় ও উদ্যোগে মানুষ কাজ করে আমরা তাহা করি নাই। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি গোড়ায় আমাদের জাতীয় আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই,—আমরা চাকুরির আরামের লোভে বিদেশের সাহিত্যের পোষাক পরিয়াছিলাম ও ঔষধ গিলিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের জ্ঞানকে অর্থকরী বিদ্যা ছাড়া অন্য কিছু ভাবি নাই। স্বীকার করি যে এ অবস্থাও ঘটিয়াছিল বহুযুগের পরাধীনতার ফলে, কিন্তু যে চেতনায় পরাধীনতা এড়াইবার জন্য ও মনুষ্যত্ব লাভের জন্য সচলতা জন্মে, সে চেতনা জাগে নাই; তাই দু-চারিজন মহাপুরুষের বাণী সমাজে উপেক্ষিত ও উপহসিত হইয়াছে। প্রভুতাসম্পন্ন ইউরোপকে চিনিবার জন্য অথবা উহাদের প্রভুতার উৎস কোথায় তাহা ধরিবার জন্য যদি আন্তরিক আগ্রহ জন্মিত, তবে বিদেশ

শিখিত না অথবা কেবল অল্প কয়েকজন লোক কেবল

চাকুরি হাঁসিল করিতেই বিদেশ যাইতেন না; জাপানীদের মত দলে দলে নানা দেশে ছুটিতেন।

আমাদের উন্নতির বাধার দিকের আর একটি অবস্থাও বিচার্য্য। যখন ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্য আমাদের শিল্প-বাণিজ্যকে ধ্বংস করিতে লাগিল তখন মরিতে লাগিল সেই তাঁতি, কামার, রংরেজ প্রভৃতি লোকেরা, যাহারা এ দেশের "উচ্চ শ্রেণীর" আভিজাত্য গৌরবে স্ফীত "ভদ্র লোকদের" বিচারে "ছোটলোক"। ছোট লোকেরা যে আমাদের সমাজ-শরীরের ভিত্তি,—আমাদের সম্মান ও আদরের পাত্র, তাহা আমরা মনে করি নাই; তাহাদের মরণে দুঃখ হয় নাই,—আমাদের প্রয়োজনের জিনিষটুকু. বরং কিছু অল্প পয়সায় কিনিয়া সুখী হইয়াছিলাম ও বিদেশের শিল্পীদিগকে বাহবা দিয়াছিলাম। সণ্ডর্‌লাণ্ড সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহার একটি বর্ণও অস্বীকার করি না, কিন্তু যে চলৎশক্তিহীনতা ও চেতনার অভাব আমাদের উন্নতির বাধা ও অধীনতার হেতু, সেইদিকে অল্প পরিমাণে একটু মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলাম। আপনার স্বার্থে প্রভুতা বাড়াইবার দিকে সকল লোকেরই স্বাভাবিক গতি আছে; তাই আমাদের দুর্দ্দশার জন্য অন্যে অপরাধী হইলেও, সেই অন্যের অপরাধ অপেক্ষা আমাদের নিজের অপরাধ অত্যন্ত অধিক, যে অপরাধের ফলে আমরা অন্যকে অপরাধী হইতে সুবিধা দিয়াছি।

* * *

রিফ্ জাতির বিপদে যাহা শিক্ষণীয়—কোথাকার এই জাতি, আর তাহাদের বিপদই বা কি, তাহা হয়ত অনেকেরই জানা নাই। এ যুগে সারা পৃথিবীর খবর না রাখিলে চলিবে না, আর বিশেষভাবে যেখানে জয়দৃপ্ত ইউরোপীয়দের প্রভাবের বৃদ্ধিতে অন্য দেশের লোকের ক্ষয় হইতেছে সেখানকার কথা সযত্নে জানিতে হইবে। ইউরোপীয় প্রভাব অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি না, তাহা রিফ্ জাতির উদাহরণে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

রিফ্ জাতির লোকেদের বাস আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম কোনায়; উহাদের দেশের উত্তর ভাগের খানিকটা অংশ ফ্রান্স ও স্পেনের অধীনের মরক্কো দেশ। রিফেরা দেশের দক্ষিণ ভাগের পার্ব্বত্য অংশের খানিকটার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলে। ইহাদের গায়ের রঙ্গ ইউরোপীয়দের মত শাদা ও শারিরীক সৌষ্ঠব ইউরোপীয়দের চক্ষে প্রীতিকর; জাতি হিসাবে হয়ত উহারা ইউরোপীয় হইতে অভিন্ন, এইরূপই অনেক নৃতত্ত্ববিদের ধারণা। উহারা যদি মুসলমান না হইয়া খ্রীষ্টান হইত, অথবা মুসলমানী ছাড়িয়া শিক্ষিত ইউরোপীয়দের মত স্বাধীন ধর্ম্মপন্থী হইত তবে ইউরোপের লোকেরা উহাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়া এক জাতি হইতে পারিতেন। উহারা কালা আদমী বলিয়া ঘৃণিত নয়, তবে ইউরোপীয় সভ্যতায় সভ্য হয় নাই বলিয়া স্বাধীন থাকিবার অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত। রিফ্ জাতির যে সকল লোকেরা স্পেন ও ফ্রান্সের অধীনে বাস করে তাহারা পার্ব্বত্য অঞ্চলের লোকেদের

সঙ্গে জোট বাঁধিয়া স্পেনের অধীনতা এড়াইবার জন্য যুদ্ধ বাধাইয়াছিল। মরক্কোর বিবরণে জানা যায় যে, দেশের যে অংশ ফরাসীদের দখলে সেখানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপযোগী অনেক ভাল ব্যবস্থা হইয়াছে ও রিফ্ জাতীয়েরা ফরাসীদের ব্যবহারে কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ ছিল না। কিন্তু মরক্কোর যে ভাগ স্পেনের দখলে, সেখানে ভাল রাস্তা নাই, ভাল লেখা পড়া শিখিবার ব্যবস্থা নাই ও রোমান কেথলিক ধর্ম্মের অসহ্য রকমের গোঁড়ামি বড় বেশি আছে। যে সকল রিফ্ জাতির লোকেরা ইউরোপে গিয়া লেখা-পড়া শিখিয়াছে, ও কল কৌশল শিখিয়াছে তাহারা স্পেনের লোকদিগকে নিতান্ত হীন, বর্ব্বর ও উৎপীড়ক মনে করে। রিফ্দের এই ধারণা যে অমূলক নয় তাহা অনেক ইউরোপীয়েরা স্বীকার করেন। তবুও যখন স্পেনের বিরুদ্ধে রিফ্দের যুদ্ধ বাধিল ও স্পেনের লোকেরা পদে পদে হঠিতে লাগিলেন, তখন ফরাসীরা স্পেনবাসীদের পক্ষ হইয়া কোমর বাঁধিয়া লড়িতে আরম্ভ করিলেন; রিফেরা অনেক বুঝাইল, কিন্তু ফরাসীরা বুঝিলেন না। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের জন্য যে ফরাসীদের জাতি সাধারণের মধ্যে খুব জেদের আটা আছে তাহা নয়, তবে স্পেন পরাজিত ও তাড়িত হইলে ইউরোপীয় প্রভুতার দব্দবাই নষ্ট হইবে ইহাই হইল ফরাসীদের কথা। যুদ্ধ বিষয়ে ইউরোপীয়দের সমালোচনায় ইহাও বুঝিতে পারা গিয়াছিল, যে যদি ফ্রান্স ও স্পেনের যুক্তবল একটু হঠিয়া যাইত তবে ইউরোপের অন্য কোন "সুসভ্য" তাঁহাদের সঙ্গে জুটিয়া ইউরোপ নামের মাতব্বরি রক্ষা করিতেন। রিফ্দের নেতা আবদুল্ করিম্ (রিফের উচ্চারণে আবদেল্ ক্রিম্) যে শিক্ষায়, শৌর্য্যে ও মনুষ্যত্বের গৌরবে কেমাল পাশার মত উচ্চ ব্যক্তি তাহা ফরাসীরাও কয়েক বার স্বীকার করিয়াছিলেন। এই আব্দেল্ ক্রিম্ এখন বন্দী হইয়া নির্ব্বাসিত, আর স্পেনের লোকেরা রিফ্দের রাজ্যের স্বাধীন অংশেও অনেক দূর অধিকার বাড়াইয়াছে। যুদ্ধ থামে নাই, কিন্তু শীঘ্রই সন্ধি হইবে আর সে সন্ধির ফল যাহা হইবে তাহা কোন সংবাদদাতা আমাদিগকে না জানাইলেও চলিবে। রিফ্দের চরিত্র সম্বন্ধে একটা কথা বলিবার প্রয়োজন। ইহারা সচ্চরিত্রতার প্রতি এত অনুরাগী যে আরব দেশের লোকেরা মুসলমান হইলেও রিফেরা তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়বিলাসিতা প্রভৃতির জন্য অত্যন্ত ঘৃণা করে ও মরক্কো দেশে যেখানে আরব দেশের লোকেরা থাকে সেখানে তাহাদের সংস্পর্শে আসে না। ইহারা চরিত্র বজায় রাখিবার জন্য স্বধর্ম্মের লোকদিগকে দূরে রাখিতে ছাড়ে না কিন্তু ফরাসীরা মনুষ্যত্বের দিকে না তাকাইয়া অন্যদিকে দৃষ্টি দিয়া রিফ্দের সর্ব্বনাশ করিলেন।

*　　*　　*　　*

দাঙ্গার পৈশাচিক প্রকোপ—যাহারা বাহাদুরি দেখাইতে চায় আইন না মানিয়া, উৎসাহে অধীর হয় লুট-তরাজের লালসায়, আনন্দে নাচে মানুষ মারিবার সুযোগ দেখিয়া, তাহারা যে সমাজের লোক সেই সমাজের কিরূপ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মশাস্ত্র মান্য বলিয়া

ইতিহাসে লেখে, তাহার বিচারে কোন ফল নাই ; প্রবাদ বচনে বলে যে ঐ শ্রেণীর লোকেরা "না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।" সমাজের নেতারা উহাদের কানে সাধুতার উপদেশ ঢালিলে উহারা শান্ত হইবে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির পরিধি আমাদের অনায়ত্ত। যাহারা মূর্খ, চোয়াড় ও গোঁয়ার তাহাদিগকে নীতির বচন শুনাইয়া ভাল করার সম্বন্ধে প্রাচীন নীতিশতকের বচনে আছে, যে বরং কুমীরের মুখের মধ্যে হাত দিয়া মণিসগ্রংহ করা চলে, ক্রুদ্ধ সাপকে মাথায় রাখা চলে, বা সাঁতরাইয়া সমুদ্র পাড়ি দেওয়া চলে, কিন্তু এ শ্রেণীর লোককে উপদেশ দিয়া ঠাণ্ডা করা চলে না। খাঁটি বচনটি এই :—

প্রসহ্য মণিমুদ্ধরেৎ মকরবক্ত্রদংষ্ট্রান্তরাৎ,
সমুদ্রমপি সন্তরেৎ প্রচলদূর্ম্মিমালাকুলম্,
ভুজঙ্গমপি কোপিতং শিরসি পুষ্পবদ্ধারয়েৎ,
ন তু প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তম আরাধয়েৎ।

মানুষকে ভালবাসিয়া কৌশলে সৎপথে চালাইবার নীতি ত্যাজ্য নয়, তবে যেখানে কেহ পাপ কাজের অভ্যাসে পাপকে গৌরবের ভূষণ করিয়াছে আর সুবিধা পাইলেই উচ্ছৃঙ্খলতা টানিয়া আনিয়া সমাজকে বিড়ম্বিত করে, সেখানে আইনের বিধানে দণ্ড দেওয়াই হিতকর ব্যবস্থা। বিদ্বেষবুদ্ধিতে চালিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে যদি দেশের স্বার্থে একদিন পাকা মিল ঘটে, তবুও দুর্ব্বৃত্তদের পৈশাচিক ব্যবহার বজায় থাকিবে। ধর্ম্মের একটা নাম বা খোলস থাকিলে ইহাদের পাপের কাজ করিবার সুবিধা হয়, তাই উহারা ধর্ম্মের নামে চীৎকার করে। মুসলমান যদি মুসলমানের সম্পত্তি লুট করিতে যায় তবে নিজের সমাজে উৎসাহ পায় না ও বাহবা পায় না ; যদি সিয়া-সুন্নি-ওহাবির নামে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঘটিত, তবে সেখানে কোন দুর্ব্বৃত্ত কাহাকেও মুসলমান বলিয়া রেহাই দিত না। দাঙ্গাকে যাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মগত বিদ্বেষের ফল ভাবিতেছেন, তাঁহারা নানা দিক দিয়া নানা ভুল করিতেছেন। একদিকে এই ধরণের ভাবনার ফলে কোথাও কোথাও পাপিষ্ঠেরা সমাজে প্রশ্রয় পাইতেছে, আর অন্যদিকে কেহ কেহ এই অসম্ভব রকমের প্রতীকারের কল্পনা করিতেছেন যে, সারা হিন্দু-মুসলমান সমাজের সকলের মন হইতে বিদ্বেষ-বুদ্ধি মুছিয়া ফেলিয়া একটা মহামিলন ঘটাইবেন বা ভূতলে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন। মানুষকে সাধু করার চেষ্টা হিতকর চেষ্টা বটে, কিন্তু এই সাধুতার লবণটুকু বহুযুগের সাধনায় আনিবার আগেই মানুষের সুখ-শান্তির পান্ত ফুরাইবে। দুষ্টেরা শাসিত হইলেই মনের বিদ্বেষ সত্ত্বেও শান্তি আসিবে। পৃথিবীর কোথাও বিদ্বেষের বীজ আমূল উপড়াইয়া সামাজিক সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করা হয় নাই।

একদল ফন্দিবাজ নেতা আছেন, যাঁহারা এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানের সুযোগে আগামী

কাউন্সিলের নির্ব্বাচনের সময়ে ভোট-সংগ্রহের সুযোগ খুঁজিতেছেন। এই নেতারাই দাঙ্গাটির গায়ে ধর্ম্মের ছাপ দিয়া হিন্দু-মুসলমানের স্থায়ী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কথা ঢাক পিটাইয়া বলিতেছেন। নরহন্তা পাপিষ্ঠেরা যে কোরানিকও নয়, পৌরাণিকও নয়, তাহারা যে অন্ধকার রাত্রির সুবিধার মত সাম্প্রদায়িক বিবাদের ছল ধরিয়া আপনাদের পৈশাচিক প্রবৃত্তির টানে কাজ করিতেছে, তাহা বুঝিলে কোনদিকের নেতাই কোন পক্ষকে টানিয়া কথা কহিতেন না আর এই উচ্ছৃঙ্খলতার সময়ে শোভাযাত্রায় গান-বাজনা চলা উচিত কিনা, তাহার বিপুল বিচার ও তর্ক তুলিতেন না। হয়ত ভোটের স্বার্থে নেতারা এ কথায় কান দিবেন না।

যাহারা পুলিসকে আক্রমণ করিয়াছিল, বিজ্ঞানের মন্দির ভাঙ্গিতে বসিয়াছিল, দোকান লুটিয়াছিল, বিনা প্ররোচনায় পরের বাড়ী-ঘর ভাঙ্গিতেছিল, নিরপরাধ ব্যক্তিকে পথে পাইয়া হত্যা করিয়াছিল, তাহাদের সমাজের লোকেদের ধর্ম্মবিশ্বাসের ইতিহাস না খুঁজিয়া, যদি সকল পক্ষের নেতারা ন্যায়বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া পাপিষ্ঠদিগকে আদালতের বিচারাধীন করিতেন, তবে মিলনের মহোৎসব না করিলেও কেবল ন্যায়বিচারের ফলে সমাজে সুখ-শান্তি আসিত।

* * * *

পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণের নূতন প্রস্তাব—শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের অধীনে পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণের যে কমিটি আছে ও যে পদ্ধতিতে সেই কমিটিতে পুস্তক নির্দ্ধারিত হয় তাহার আমূল সংস্কারের জন্য ডিরেক্টর মহাশয় নূতন প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই নূতন প্রস্তাবটি বিধিবদ্ধ হইলে সুশিক্ষার পথে অধিকতর বাধা ঘটিবে। আমাদের জাতীয় উন্নতি ও ভবিষ্যতের সৌভাগ্য বালকদের সুশিক্ষার উপর নির্ভর করে; কাজেই সরকারি শাসন-প্রণালীর আলোচনা অপেক্ষা এ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন অধিক। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, যেন দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়া অবিলম্বে এই নূতন প্রস্তাবটি আলোচনা করেন, ও যাহাতে একটি হিতকর পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন।

এখন পাঠ্যপুস্তক বাছিবার জন্য দুইটি কমিটি আছে; একটির কাজ চলে কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের স্কুলের জন্য; আর একটি আছে ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গের স্কুলের জন্য। ডিরেক্টরের নূতন প্রস্তাবটি ভাল, যে কেবল একটি কমিটি রাখা হইবে ও সেটি কলিকাতায় কাজ করিবে। ভাষা শিক্ষায় সমতা রাখার জন্য ও শিক্ষা পদ্ধতিকে সর্ব্বত্র একটা বিধিবদ্ধ ধারায় চালাইবার জন্য এই নূতন ব্যবস্থা উপযোগী হইবে। তবে কিরূপ অভিজ্ঞতার ও কোন্ শ্রেণীর কত লোক কমিটিতে নিযুক্ত হওয়া উচিত, তাহা বিশেষ বিচারে স্থির করা চাই; এ বিষয়ে ডিরেক্টরের প্রস্তাবটির সমালোচনা করিতে গেলে এই পত্রিকার ৭।৮ পৃষ্ঠা ধরিয়া অনেক কথা লিখিতে হয়।

শিক্ষিতদের একটি সঙ্ঘ বসিয়া যদি ইহার বিচার করেন ও ডিরেক্টরকে মন্তব্য জ্ঞাপন করেন তবেই কিছু কাজ হইবার সম্ভাবনা। অন্য একটি নূতন প্রস্তাবিত বিধি হইয়াছে এই, যে আগেকার মত কমিটির মেম্বরেরা যত খুসি বই পাঠ্য বলিয়া সুপারিস করিতে পারিবেন না,—তাঁহারা সাধারণ সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে চারিখানির বেশি পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না, আর কোন কোন বিশেষ বিষয়ে কেবল দু-একখানি বই পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবেন। এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত অহিতকর। বিহার-ওড়িষায় ও আসামে ঐ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া লিখিত হইয়াছে কিন্তু সে নিয়ম যে কি কারণে সুসঙ্গত তাহা বলা হয় নাই। যদি নজির ধরিয়া কাজ করিতে হয় তবে বিলাতি পদ্ধতির দিকে তাকাইলে ভাল হইত। বিলাতে এ বিষয়ে এই শ্রেণীর কমিটি নাই; প্রত্যেক স্কুলের কর্ত্তারা নিজেদের দায়িত্বে পুস্তক নির্ব্বাচন করেন। কি ধারায় ও পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে, সরকারি নিয়মে বিলাতে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, আর স্কুলের অধ্যক্ষেরা সেই ধারা ও পদ্ধতি রক্ষা করিয়া যে কোন উপযোগী গ্রন্থ চালাইয়া থাকেন। একেবারে কমিটির শাসন ও বোঝা তুলিয়া দিয়া যদি এই পন্থা এদেশে চালান যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? ডিরেক্টর মহাশয় বলিতে পারেন যে, এদেশে যাহাতে কোন গ্রন্থে দূষিত রাজদ্রোহ বা অরাজকতার ইঙ্গিত না থাকে বা অন্য কোন কুৎসিৎ নীতির সমর্থন না থাকে, গবর্ণমেন্টকে তাহা দেখিতেই হইবে। সরকারের এই খবরদারির হিসাবে এইটুকু করিলেই কি যথেষ্ট হয় না যে, প্রত্যেক স্কুলের কর্ত্তারা তাঁহাদের নির্ব্বাচিত পুস্তকের তালিকা ইন্‌স্‌পেক্টরকে পাঠাইয়া দিবেন, আর ইন্‌স্‌পেক্টর প্রয়োজন বোধ করিলে কেবল আপত্তিজনক পুস্তকগুলির সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া ডিরেক্টরের অনুমতি অনুসারে সেই সেই পুস্তক ব্যবহারে বাধা দিবেন? এদেশে যখন রাজদ্রোহাদির কথা কোন পুস্তকে এক ছত্র থাকিলেই পুলিসে উহা ধরিয়া ফেলে, ও সে পুস্তক বাজারে থাকা বা ব্যবহার করা অসম্ভব, তখন ঐ নিয়ম থাকিলেই যথেষ্ট সাবধানতায় কাজ করা চলিবে। ইউরোপে এখন বল্‌শেভিকি আন্দোলন যে ভাবে চলিতেছে ও সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে ভাবে আদৃত ও রক্ষিত, তাহাতে এদেশের তুলনায় ইউরোপে দুঃশীলতা ও দুর্নীতির বই সরকারের অলক্ষ্যে বেশি চলিবার সম্ভাবনা; তবুও যদি সেখানে নিশ্চিন্ত মনে সরকারি লোকেরা পুস্তক নির্ব্বাচনে স্কুলের কর্ত্তাদিগকে অধিকার দিতে পারেন, তবে এদেশে এত কড়াকড়ির কমিটি করিবার প্রয়োজন কি? ডিরেক্টর মহাশয়ের নূতন প্রস্তাবের মধ্যেই আছে, যে এদেশের ইউরোপীয় স্কুলের কর্ত্তারা স্কুল কমিটির শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইবেন না। ইউরোপীয়দের শাসিত স্কুলে যে সুবুদ্ধির পরিচালনা আছে, আমাদের স্কুলে তাহার অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু পুলিসের নেঘাবানিতে যে একখানিও আপত্তিজনক বই চলিতে পারে না, সেখানে কোন আশঙ্কা রাখা অত্যন্ত অযথা। তাহা ছাড়া প্রত্যেক মুদ্রিত গ্রন্থ সরকারের অফিসে দাখিল করিবার কড়া নিয়ম আছে ও পুস্তকগুলি

বিচারের জন্য মোটা মাহিনার কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন ; যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়া সরকারে "রেজেষ্টারি" হইয়া যাইবে তাহার উপরে "রেজেষ্টারি করা" কথাটি ছাপিলে পুস্তকের শীলতার ও সুনীতির যথেষ্ট সার্টিফিকেট্ থাকিবে ; পুস্তক নির্ব্বাচনের জন্য মোটা বেতনের নূতন সেক্রেটারি নিযুক্তির প্রয়োজন হইবে না।

আমরা জানি আমাদের শ্রেষ্ঠতম পুরুষেরা একযোগে ঐরূপ ব্যবস্থার প্রার্থনা করিলেও তাহা গৃহীত হইবে না ও কমিটি বসিবে। এস্থলে মন্দের ভাল ধরিয়া কি করা উচিত তাহাই বিচার্য্য। এদেশে যাঁহাদের রচনা সুশিক্ষাবিধায়ক ও জীবনপ্রদ, যে কারণেই হউক তাঁহারা আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া কমিটির কাছে নিজেদের বই চালাইবার জন্য আবেদন করিতে পারেন না ; আবেদন করিয়া হাঁটাহাঁটি করেন তাঁহারাই যাঁহারা প্রাণের উদ্বোধনে কিছু না লিখিয়া পেটের আগ্রহে যাহা কিছু হউক ফরমায়েসি কলে খাড়া করিতে পারেন। এই জন্য অপাঠ্য পাঠ্যপুস্তকের চাপে ছাত্রদের জ্ঞানের কৌতূহল নষ্ট হইতেছে। এখন আবার যদি প্রচলিত স্ফীত নিয়মের গোদের উপর এই ফোঁড়াটুকু বসে যে চারিখানির অধিক বই গৃহীত হইবে না তবে ইংরেজ কোম্পানির টাকায় পোষা জনকতক লেখকের ফরমায়েসি রচনা ছাড়া কোন সতেজ সুন্দর সাহিত্য পাঠ্য হইবে না। মাক্‌মিলন্ প্রভৃতি যে সকল "সম্মানিত" পবলিশর্ পাঠ্যপুস্তকের ভিয়ান চড়াইয়াছেন (অর্থাৎ ফুলের বাগান রচেন নাই) তাঁহারা সংখ্যায় চারিটির কম নয় ; কাজেই প্রাণপদ সুরভি সাহিত্য পাঠ্য হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এ বিষয়ে পূর্ব্বের মত বহু গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হইয়া তালিকাভুক্ত হওয়া ভাল ছিল। ডিরেক্টরের নূতন প্রস্তাবের প্রসঙ্গে বহু বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন আছে ; আমাদের সানুনয় অনুরোধ দেশের শিক্ষিতেরা দিন থাকিতে তাহা করুন ও ডিরেক্টরকে ধরিয়া হিতকর পদ্ধতি প্রচলিত করুন।

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষামন্দির—গত ১২ই আষাঢ় চন্দননগরে স্থানীয় জজ মঁশিয়ে শ্যাঁনো'র সভাপতিত্বে এই শিক্ষা-মন্দিরের উদ্বোধন হইয়াছে। নারীগণের একাধারে মাতা, স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদান, ও জ্ঞান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে উন্নতির সাহায্য করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এক্ষণে ইহার সাধারণ-ছাত্রী শিক্ষা বিভাগ খোলা হইয়াছে, এবং যথেষ্ট আবেদন পাইলে ইহার পুরস্ত্রী শিক্ষাবিভাগও খোলা হইবে। আবশ্যক মত ম্যাট্রিক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন পরীক্ষার জন্যও ছাত্রীদের প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা এখানে থাকিবে। জ্ঞানানুরাগী, অক্লান্তকর্ম্মী, স্বদেশসেবী, সুলেখক, চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ এই প্রতিষ্ঠান, পুস্তকাগার সম্বলিত তাঁহার পিতৃদেবের স্মৃতি মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়, এবং বালক ও বালিকাগণের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বসমেত একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা দান করিয়াছেন। দেশে ধনী লোকের অভাব নাই, কিন্তু, নারীগণের প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে কেহ কিছুই করেন নাই। হরিহর বাবুর এই প্রতিষ্ঠান বাংলা দেশের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

নিখিল বঙ্গীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা দেশবন্ধুর পরলোক গমনের পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষ্যে দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি বঙ্গভাষায় পল্লীসংস্কার কার্য্য পদ্ধতি বিষয়ে সমগ্র বাংলা দেশের স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়াস্থিত গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত অথবা জাতীয় স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদিগকেও বাংলার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে পৃথক পৃথক বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয়ে ১টি স্বর্ণপদক ২টি রৌপ্যপদক ও ৪টী ১৩৲ টাকা মূল্যের পারিতোষিক বিতরিত হইবে।

প্রতিযোগীদের মধ্যে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণ মোট ৫০০ পংক্তি প্রতি পংক্তির শব্দ সংখ্যা ৭টী এবং কলেজের ছাত্র ছাত্রীগণ মোট ৭০০ পংক্তি প্রতি পংক্তিতে শব্দ সংখ্যা ৮টী করিয়া যথাক্রমে প্রবন্ধ রচনা করিবেন। প্রবন্ধের শেষে প্রতিযোগীর নামের সহিত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও কলেজের অধ্যক্ষের স্বাক্ষর বিশেষ আবশ্যক।

বিষয়—

স্কুল :—**আমাদের গ্রাম ও তাহার উন্নতি**,—এ প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলিরও অবতারণা করিতে হইবে।

আপনার নিজ পল্লী সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়—উহার অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা—আপনার গ্রামের অভাব অভিযোগ কি? বাংলার পল্লী—ধ্বংসের প্রধান প্রধান কারণ সমূহ—আপনার কার্য্যপ্রণালীর আদর্শ ও লক্ষ্য—আপনার কার্য্য পদ্ধতি—কি পরিমাণে পল্লীসংস্কার করিতে চান?

কালেজ :—**পল্লী সমস্যা ও তাহার সমাধান**—এ প্রসঙ্গে অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলিরও অবতারণা করিতে হইবে।

আপনার নিজ পল্লী সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়—উহার অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা—আপনার গ্রামের অভাব অভিযোগ কি? বাংলার পল্লী ধ্বংসের প্রধান প্রধান কারণ সমূহ—আপনার কার্য্যপ্রণালীর আদর্শ ও লক্ষ্য—আপনার কার্য্যপদ্ধতি গঠনপ্রণালী—আয়ব্যয় পদ্ধতি ও স্বাবলম্বী হইবার উপায়—পল্লীতে পল্লীতে স্বায়ত্বশাসনাধীনে প্রতিষ্ঠান—আত্মনির্ভরশীল—স্বাবলম্বী—প্রত্যেকটী পল্লীসংস্কারই ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ—পল্লীস্বরাজই জাতীয় স্বরাজের অগ্রদূত—পল্লীসংস্কার কার্যপ্রণালী মনুষ্যত্ব গঠনের প্রধানতম মন্ত্রস্বরূপ। প্রবন্ধ সকল ১৯২৬ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ঠিকানা—শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, ৫নং সমবায় ম্যানসন কলিকাতা।

Printed by Satyakinkar. Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.